"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

সম্পাদক—স্বামী সুন্দরানন্দ

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
তোমার না আমার?
LILY BRAND BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
গঠন করে
স্বাস্থ্যবান
হৃষ্টপুষ্ট
ছেলেপুলে
লিলি বিস্কুট কোং — কলিকাতা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

রাজযোগ—১১শ সংস্করণ। স্বামীজির ধ্যানাবস্থার হাফটোন ছবি ও ষট্‌চক্রের চিত্রযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ৩৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২৲ টাকা।

ভক্তিযোগ—১৬শ সংস্করণ। স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

কর্ম্মযোগ—১১শ সংস্করণ। স্বামীজি প্রণীত ইংরাজী কর্ম্মযোগের বঙ্গানুবাদ। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৭৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মদীয় আচার্য্যদেব—৭ম সংস্করণ। পাইকা টাইপে মুদ্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামীজির দুইখানি অতি সুন্দর হাফটোন ছবিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৷০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৵০ আনা।

জ্ঞানযোগ—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-প্রণীত ইংরাজী জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ। স্বামীজির সুন্দর হাফটোন ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২৷৷৵০ আনা।

পওহারী বাবা—৬ষ্ঠ সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত চরিত। ২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।০ আনা।

চিকাগো বক্তৃতা—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজির জগদ্বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার অতি সরল বঙ্গানুবাদ। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার এবং বক্তৃতাকালীন স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ৫৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৷৵০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৷৷/০ আনা।

ভক্তি-রহস্য—৭ম সংস্করণ। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

উদ্বোধন কার্য্যালয়—১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ভারতীয় নারী—৭ম সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান্ আদর্শ পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য—প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৸৵০ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজির নিউইয়র্কে প্রদত্ত সাতটি ইংরাজী বক্তৃতা "The Science and Philosophy of Religion" (উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত) নামক পুস্তকের অনুবাদ। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১০ম সংস্করণ। স্বামীজির হাফটোন ছবিসম্বলিত; মোটা কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৫৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১০ম সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরাজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। ডবল ক্রাউন, ৩২ পেজি, মূল্য /০ আনা।

সরল রাজযোগ—২য় সংস্করণ। স্বামীজি আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা, সি, বুলের বাড়ীতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিষয়ে উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ॥০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৩য় সংস্করণ। ইহাতে তাঁহার চারিটি ইংরাজী রচনার বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত নামে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥৵০ আনা।

বিবেক-বাণী—১২শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামীজির উপদেশাবলী। পকেট সংস্করণ, মূল্য ৴০ আনা।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট—২য় সংস্করণ। ভগবান ঈশার জীবনালোচনা। মূল্য ৵০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে /১০ পয়সা।

দেববাণী—৬ষ্ঠ সংস্করণ। আমেরিকায় 'সহস্র দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজি যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৵০ আনা।

উদ্বোধন কার্য্যালয়—১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

উদ্বোধন—৪৯শ বর্ষসূচী

(মাঘ, ১৩৫৩—পৌষ, ১৩৫৪)

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

বিষয়	লেখক-লেখিকা	

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ'

সম্পাদক

সমগ্র দেশময় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিজনিত নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া 'উদ্বোধনে'র আর একটি বৎসর অতীতের কাল-গর্ভে অন্তর্হিত হইল। বর্তমান মাঘ মাসে এই মাসিক পত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ 'উদ্বোধন' জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারীর জীবনে সত্য-শিব-সুন্দরকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। নববর্ষে পদার্পণ করিয়া এই মাসিক পত্র পুনরায় তাহার আরব্ধ কার্যে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিবে।

সংযম ত্যাগ সত্য অহিংসা সাম্য মৈত্রী অসাম্প্রদায়িকতা পরার্থপরতা বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সকল ধর্ম ও নীতি সমর্থিত উচ্চ ভাবাদর্শ যাহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠে তাঁহাদের মধ্যই সত্য-শিব-সুন্দর অভিব্যক্ত হন। এই সমূহ মানুষের শিবভাব বা দেবভাব এবং ইহাদের বিপরীত গুণগুলি মানুষের অশিব বা আসুরিক। যেমন মানুষমাত্রেরই ব্যক্তিগত জীবনে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার অন্তস্তর দেবভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ পশুভাবের, তেমন বিশ্বময় সংঘর্ষ চলিতেছে এক শ্রেণীর দেব-ভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে আর একশ্রেণীর আসুরিক-ভাবাপন্ন মানুষের। স্মরণাতীত কাল হইতে সকল দেশেরই ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রমুখ মানব-জীবনের সকল বিভাগেই এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন দলের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কৃষ্ণ বুদ্ধ তাও কংফুসে জরাথুষ্ট্র ঈশা যিশু মহম্মদ শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মাচার্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই আসুরিক ভাবাপন্ন নরনারীগণকে দেবভাবাপন্ন করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া পূর্বগ ধর্মাচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণে এই একই ভাব প্রচার করিয়াছেন। আবহমান কাল হইতে মানবেতিহাস বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এবং দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে নানা বিষয় লইয়া বিরোধে অত্যন্ত কলংকিত। এই কলংক দূর করিয়া বিশ্বমানব-সমাজে যথার্থ সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে গীতাদি শাস্ত্রসমর্থিত সর্বধর্মসমন্বয়সাধন এবং উপনিষৎ-বেদ্য 'জীব-ব্রহ্ম' ভাবাবলম্বনে নর-মাত্রকেই নারায়ণ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শনের মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ধর্মমতের বিশেষত্ব। 'উদ্বোধন' প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ এই লোকোত্তর মহাপুরুষদ্বয়ের এই মতবাদ-"বহুজন হিতায়" বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শত

শত প্রতিষ্ঠান এবং সহস্র সহস্র স্বদেশহিতৈষী গৃহী ও সন্ন্যাসী অক্লান্ত ভাবে কর্ম করিতেছেন।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, অধুনা উৎকট জড়বাদমূলক শিক্ষা ও সভ্যতা যতই বিস্তার লাভ করিতেছে, ততই পৃথিবীর ধর্মাচার্যগণের মহনীয় উপদেশ উপেক্ষিত হইয়া সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও সভ্য নামধেয় এক শ্রেণীর আসুরিক ভাবাপন্ন নরনারীর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। ইঁহারা পৃথিবীর সকল মানুষকে উৎসন্নের পথে পাঠাইয়াও আপনাদের দেশগত জাতিগত সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খল ভোগস্বার্থ চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর! গত মিরাট কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আচার্য কৃপালনী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে এই আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে "আন্তর্জাতিক দস্যু" নামে অভিহিত করিয়াছেন! ইঁহারা আপনাদের স্বার্থসাধনের জন্য বিশ্বশান্তির আবরণে অশান্তি, অবনত ও অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধানের আবরণে তাহাদের সর্বনাশ, ধর্মের আবরণে অধর্ম, নীতির আবরণে দুর্নীতি, মিলনের আবরণে বিরোধ, ডিমক্র্যাসির আবরণে মবক্র্যাসি চালাইতে সিদ্ধহস্ত! এই আন্তর্জাতিক দস্যুদিগের মধ্যে অনেকে গত বিশ্বযুদ্ধের নায়ক ছিলেন। বর্তমানে ইঁহারা বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার অছিলায় গত যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত জাতিসমূহের সর্বনাশসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। এই ধুরন্ধরগণ এখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের অজুহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের ধ্বংসসাধনের উদ্দেশ্যে জোরালো আণবিক বোমা তৈরি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইঁহাদের কার্যকলাপের ফলে ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় সকলেই বিচলিত হইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, * রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা-তাজা হচ্ছে, সে দল আমাদের দেশে নাই।" কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে অধুনা ভারতবর্ষেও এক শ্রেণীর উৎকট আসুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহারাই গত মহাযুদ্ধের সময়ে ব্ল্যাক-মার্কেট ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া অগণন নরনারীকে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন! সম্প্রতি ইঁহাদের চেষ্টায় ভারতের বহু স্থানে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ ও বিরোধ চরমে উঠিয়াছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতিরূপে কলিকাতায় এবং নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে ও বিহারে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে। এই সকল দাঙ্গায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেরূপ ব্যাপক নরহত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহ নারীহরণ বলপূর্বক-ধর্মান্তরিতকরণ ও বিবাহদান প্রভৃতি যে সকল পৈশাচিক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা এই বিংশ শতাব্দীতে কোন সভ্য দেশে যথার্থই কল্পনাতীত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী লুণ্ঠনকারী চেঙ্গিস খাঁ, নাদির সা ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি দ্বারাও এরূপ নৃশংস অত্যাচার সম্ভব হয় নাই। পাঠান মোগল প্রভৃতি বংশের উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদী বাদসাগণও এরূপ রোমাঞ্চকর উৎপীড়ন কল্পনায় স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু শিক্ষিত ও সভ্য নামধেয় আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ধর্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ইতর জনসাধারণের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও পরস্বাপহরণস্পৃহা জাগ্রত করিয়া তাহাদের দ্বারা এই সকল পাশবিক কার্য সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। মানুষের দানবীয় ভাব জাগ্রত হইলে তাহারা কতটা জিহীর্ষা ও জিঘাংসা-পরায়ণ হইয়া হিংস্র জন্তুর আকার ধারণ করিতে পারে, এই সকল দাঙ্গায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যে দেশে, যে পল্লীতে, যে পরিবারে এইরূপ

আসুরিক ব্যক্তিগণের প্রাধান্য, সে দেশ, সে পল্লী, সে পরিবারের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। যে ধর্ম-সম্প্রদায়ে এইরূপ বহুসংখ্যক নরপশুর উদ্ভব সম্ভব হয়, সে সম্প্রদায়ের অধঃপতন অনিবার্য। এই দানবীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানিয়াও জানেন না যে তাঁহারা প্রথমাবস্থায় সাফল্য লাভ করিলেও পরিণামে তাহাদিগকে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। জগতে বহুবার বহু ব্যক্তি ও জাতি অনন্যসাধারণ পাশবিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু পরে তাহাদের অস্তিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। খ্যাতনামা দার্শনিক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ কয়েক মাস হয় প্যারিসের বিশ্বশিক্ষা সম্মিলনে বলিয়াছেন, "When a nation ostentatiously turns away from God and concentrates on worldly success and prosperity it meets with its doom." 'যখন কোন জাতি বাহ্যাড়ম্বরে ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া জাগতিক সাফল্য ও অভ্যুদয় লাভের জন্য শক্তি নিয়োজিত করে, সে জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' এই জন্য 'উদ্বোধন' বরাবর মানব-সমাজে ঈশ্বরবিশ্বাসী দেবমানবসৃষ্টির আবশ্যকতা উদাত্ত স্বরে প্রচার করিয়াছে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ধর্ম সংযম ত্যাগ অহিংসা পরার্থপরতা অসাম্প্রদায়িকতা সর্বধর্ম-সমন্বয় ও নর-নারায়ণ সেবার পতাকা ধারণ করিয়া ইহার নিম্নে সকল নরনারীকে সমবেত হইতে আহ্বান করিতেছে। কেবল ধর্মসাধনার জন্যই যে মানুষের পক্ষে এই গুণগুলি আবশ্যক তাহা নয়, পরন্তু সকলে মিলিয়া মিশিয়া শান্তি-সুখে বাস করিতে হইলেও ইহাদের প্রয়োজনীতা অপরিহার্য। আচার্য কৃপালনী যথার্থই বলিয়াছেন, "দেশের নরনারীর প্রবৃত্তিনিচয় আত্মশুদ্ধির দ্বারা সংযত হইলেই গণতন্ত্র আইন প্রভৃতি বাহ্যিক উপায়গুলি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।"

ভারতের বর্তমান সর্বনাশকর সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভিতর দিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সকল ধর্মের সমন্বয়-সাধনের মাহাত্ম্য যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ আর পূর্বে কখনও হয় নাই। এখন দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল নরনারীই ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য তাঁহাদের ধন-প্রাণ অত্যন্ত বিপন্ন দেখিয়া তিক্ত অভিজ্ঞতামূলে স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ যদি পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ ও প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে এদেশে শান্তি-সুখে বাস করা সম্ভব হইবে না।—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হত্যা লুণ্ঠন ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়া কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ বা তাহাদের ন্যায্য স্বার্থ নষ্ট করা অসম্ভব। কোন অভিনব ধর্ম অথবা প্রচলিত সকল ধর্মের সারাংশ অবলম্বনে কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিয়া দেশের সকল নরনারীকে উহার অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব নয়। প্রচলিত সকল ধর্মকে ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে নির্বাসন করিবার সংকল্পও নিছক কল্পনাবিলাস মাত্র। এরূপ অবস্থায় স্ব স্ব ধর্মে অনুরক্ত থাকিয়া প্রতিবেশিগণের ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ভিন্ন সকল ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে মিলিয়া মিশিয়া শান্তি-সুখে বাস করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইদানীং হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং দেশ-বিদেশের দূরদর্শী মনীষিগণ সমস্বরে ইহাই বলিতেছেন। নোয়াখালি জেলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লীসমূহ পর্যটন করিয়া মহাত্মা গান্ধীও নানাভাবে ইহাই প্রচার করিতেছেন। কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন, "ধর্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে পূর্ণ সহনশীলতার পরিচয় দিতে হইবে।"

ভারতের নব জাগরণের প্রারম্ভে সর্বধর্ম-সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধন-জীবনে এই আদর্শই দেখাইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি কেবল সহনশীলতা দেখান নাই, অধিকন্তু সকল ধর্মের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া নিজ জীবনে সাধন করিয়া উহাদিগকে একই ভগবান লাভের বিভিন্ন পথ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ সকল ধর্মের উচ্ছেদ করিয়া কোন ধর্মবিশেষের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন বা ধর্মরাজ্যে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। তিনি সকল ধর্মসম্প্রদায়কে সমান মর্যাদা দিয়া ধর্মজগতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল রাষ্ট্রে নয়, পরন্তু ধর্ম এবং সমাজেও পরমত-অসহিষ্ণুতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অচল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন অভিনব ধর্ম প্রবর্তন বা প্রচার করেন নাই। তিনি প্রচলিত সকল ধর্ম সাধন করিয়া উহাদের সত্যতা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয় সকল ধর্মের সারাংশ-সংগৃহীত সমীকরণ বা সকল ধর্মের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া উহাদিগকে একজাতীয়করণ বা একী-করণ নয়। তাঁহার সমন্বয় সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতার মনোরম আবরণে আবৃত নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, অথবা যুক্তি-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বস্তুক (abstract) তত্ত্বমাত্রও নয়। পরন্তু ইহা প্রত্যক্ষ বস্তুগত বাস্তব সত্য। এই সমন্বয়ের অর্থ—সকল ধর্মকে একই ভগবান লাভের বিভিন্ন পথ জানিয়া উহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আপন ধর্মপথের অনুসরণ। এই উপায়ভিন্ন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নাই। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মজগতে ঐক্যস্থাপনের এই পথ কার্যত দেখাইয়াছেন। তিনি নিজ জীবনদ্বারা সন্তোষ-জনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও সম্মিলিত হইয়াছিল। ইহাই যথার্থ সর্বধর্মসমন্বয়। ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের জীবন এই সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে পরিচালিত করাই যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করিবার একমাত্র পথ ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বাঙালী হিন্দুসমাজের সাংঘাতিক অভ্যন্তর ব্যাধিগুলি যেরূপ ভাবে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এরূপ আর পূর্বে কখনও হয় নাই। এখন সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, হিন্দুসমাজে শতভেদ সহস্রবৈষম্য অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা ও ভোগাধি-কারে অসামঞ্জস্য এবং অনৈক্যবর্ধক বহু বিধি-নিষেধ প্রভৃতি প্রচলিত থাকায় সকল হিন্দুর ধন-প্রাণ অত্যন্ত বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিকার করা তাহাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হইতেছে না। হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভট্টপল্লী নবদ্বীপ বিক্রমপুর কোটালিপাড়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের খ্যাতিনামা সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ—যাঁহারা এতকাল যুগোপযোগী সমাজ-সংস্কারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও—আত্মরক্ষার অংকুশ তাড়নায় সমবেত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন : (১) হিন্দুজাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণিসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকার-বৈষম্য থাকিবে না। (২) হিন্দুর মন্দিরে ও দেব-দেবীর পূজামণ্ডপে হিন্দুমাত্রেই প্রবেশাধিকার থাকিবে। (৩) ব্রাহ্মণমাত্রই হিন্দুদের পূজার্চনাদি ধর্মকার্যে

পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন। (৪) হিন্দু-ক্ষৌরকার রজক প্রভৃতি হিন্দুমাত্রেরই কার্য করিবে। এতদ্ভিন্ন এই পণ্ডিতমণ্ডলী বলপূর্বক ধর্মান্তরিত বিবাহিত ও অপহৃত হিন্দুগণকে হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ করিয়া সম্মানিত স্থান দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুখের বিষয় যে, এই ঘোষণা সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে এখন আর মতভেদ দেখা যাইতেছে না। যদি কয়েক শতাব্দী পূর্বেও একটু দূরদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তাৎকালিক সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ এইভাবে সমাজ-সংস্কারের বিধান দিতেন, তাহা হইলে বাংলার হিন্দুজাতি যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া এরূপ বিপদের সম্মুখীন হইত না, ইহা নিশ্চিত।

বর্তমানে বাংলার হিন্দুগণকে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে পতিত দেখিয়া সমাজপতিগণ সমাজ-সংস্কারের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য মূলতঃ এই সকল উপায়ই অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুগণ এতকাল ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই, পরন্তু অনেকে তাঁহার সংস্কার-পদ্ধতির অপব্যাখ্যা করিয়া ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তবেদ্য "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—'জীবই ব্রহ্ম' এই ভাবাশ্রয়ে নরমাত্রকেই নারায়ণ জ্ঞানে সম্মান-প্রদর্শনমূলক চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ভিত্তির উপর সমাজসৌধ গঠন করিতে হিন্দুগণকে বারংবার উৎসাহিত করিয়াছেন। কেবল সমাজ-সংস্কার নয়, পরন্তু রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি প্রমুখ মানব-জীবনের সকল বিভাগ—এমন কি প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারিক জীবন এই সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শনের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিতে তিনি সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানেও হিন্দুসমাজ ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশে পরিচালিত না হইয়া কতকগুলি জনকল্যাণবিরোধী ও ভেদবিরোধবর্ধক দেশাচার ও লোকাচার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহার বিষময় ফলস্বরূপে হিন্দুরা তাহাদের ধর্মের দিক দিয়া যে উপদেশ পায়, সমাজের চাপে ব্যবহারিক জীবনে উহার বিপরীত আচরণ করিতে বাধ্য হয়! হিন্দুধর্ম বলে—'জীবই শিব', হিন্দুসমাজ বলে—'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না'! স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ধর্ম-জীবন ও সমাজ-জীবনের এই বিপরীত ভাবই হিন্দুজাতির সর্বনাশের মূলকারণ। ইহা দূর করিতে হইলে হিন্দুধর্মসার গীতা ও উপনিষদাদি শাস্ত্রের নির্দেশে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ভিত্তির উপর হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন করিতেই হইবে। গীতা ও উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যে, সকল নরনারীই স্বরূপতঃ একই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মার বিভিন্ন রূপ। সুতরাং মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয়, পরন্তু আত্মার দিক দিয়া সকল মানুষ এক ও অভেদ; নরমাত্রই নারায়ণ—জীবমাত্রই শিব। মানুষে মানুষে যে ভেদ দেখা যায়, ইহা তাহাদের আত্মার ব্রহ্মশক্তি বিকাশের তারতম্যপ্রসূত। যে কোন মানুষ তাহার আত্মারূপী নারায়ণকে পরিব্যক্ত করিয়া নারায়ণ হইতে পারেন। আপনার অভ্যন্তরে আত্মারূপী নারায়ণকে দর্শন এবং সকল নরনারীর মধ্যে আত্মারূপী নারায়ণের সেবা স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাত বেদান্তের অভিনব বিশেষত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "আমি মানুষকে দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। দু টুকরো কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরয়, ভক্তির জোর থাকলে তেমন মানুষেও ঈশ্বর দর্শন হয়। প্রেম হলে মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে।" তিনি সকল ধর্ম সাধন করিয়া সর্বভূতে ঈশ্বরকে যথার্থ ই দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা সকল ধর্মেরই সর্বোচ্চ আদর্শ। এই মহান্ আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নরনারায়ণ-সেবাধর্ম বিশেষ জোরের সহিত প্রচার

করিয়াছেন। ইহা উপনিষৎ প্রতিপাদ্য আত্মার উপাসনারই একটি অভিনব প্রণালী। এই মতবাদে যে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী অভিব্যক্ত, এরূপ সাম্য-মৈত্রী কেহ কল্পনায়ও স্থান দিতে পারে না। নর-নারায়ণবাদের মূলতত্ত্বই এই যে, মানুষ কেবল পঞ্চভূতের নির্মিত নশ্বর দেহধারী জীবমাত্র নয়; সে নররূপে নারায়ণ—জীবরূপে শিব। এমন ভাবে উচ্চ কণ্ঠে সকল মানুষের দেবত্ব ঘোষণা আর কোন মতবাদী করে না—এমন ভাবে মানুষের প্রতি সম্মান আর কোন মতবাদী দেখায় না। নর-নারায়ণবাদ যেমন আপনাকে বিশ্বাস ও সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়, তেমন অপরকেও বিশ্বাস ও সম্মান করিতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে মানুষের নিকট সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করিতে নর-নারায়ণবাদের তুল্য আর কোন মতবাদ দেখা যায় না। এই মতবাদের অন্তর্নিহিত আদর্শে মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে মানবজাতি যে সর্ববিধ ভেদ-বৈষম্য নির্মুক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্তমানে বিশ্বময় এক জাতি অপর জাতিকে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে, এক মানুষ অপর মানুষকে ধ্বংসমুখে পাঠাইয়াও আপনাদের ভোগস্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষে ধর্মসম্প্রদায়রক্ষার নামে মানুষে মানুষে চলিয়াছে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সমাজরক্ষার নামে মানুষে মানুষে চলিয়াছে অধিকার-বৈষম্য অপমান ও অসম্মান এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার নামে মানুষে মানুষে চলিয়াছে সম্প্রদায়গত দলগত ও ব্যক্তিগত প্রাধান্যের অতি জঘন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সকল নরনারীর আসুরিক ভাব দূর করিয়া তাহাদের আভ্যন্তর দেবভাব জাগ্রত করিতে হইবে। দেশের অধিকাংশ মানুষকে দেবভাবাপন্ন করিতে না পারিলে এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে না। দার্শনিক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন, "We must re-create man if we are to re-create a new world." 'নূতন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে মানুষকে নূতন করিয়া অবশ্য সৃষ্টি করিতে হইবে।' জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্ব বা নারায়ণকে জাগ্রত করা এবং তাহাদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা এই নূতন মানুষ ও নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

যাঁহারা মনে করেন যে নরকে নারায়ণরূপে দর্শন সম্ভব নয়, তাঁহারা অন্ততঃ চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী-মূলক সর্বোচ্চ নীতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও যদি এই মহান আদর্শে জীবন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও মানুষের প্রতি তাহাদের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত হইবে এবং ইহার ফলে মানুষে মানুষে সর্ববিধ অধিকারভেদ ও অনৈক্য বিরোধ-বিদ্বেষ অন্তর্হিত হইবে। ঈশোপনিষদে আছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

'যিনি সকল ভূতকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন এবং আপনার আত্মাকে সকলের আত্মা মনে করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।' কারণ, এস্থলে অপরকে ঘৃণা-হিংসা করা ও অপরের অধিকার নষ্ট করা, আর আপনি আপনাকে ঘৃণা-হিংসা করা ও আপনি আপনার অধিকার নষ্ট করা একই কথা।

'উদ্বোধন' বরাবর বেদান্তবেদ্য এই চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শনের মাহাত্ম্য প্রচার এবং এই আদর্শে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র এবং দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই মাসিক পত্র এই মহান আদর্শই সর্বপ্রযত্নে প্রচার করিবে। এই কার্যে 'উদ্বোধন' নববর্ষে পদার্পণ করিয়া দেশের হৃদিবান মনীষিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

ভগবান্ নারায়ণের অবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—অপর নাম—বাদরায়ণ বেদব্যাস ৫৫৫টী সূত্রে, ১৯১টী অধিকরণে বা বিচারে, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের আপাতবিরোধ মীমাংসার মুখে অথবা উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপলক্ষ্যে জীব, জগৎকারণ, জগৎ, সাধন এবং তাহার ফল এই কয়টী বিষয় নির্ণয় করিয়া যে দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাই "বেদান্ত দর্শন" বা "ব্রহ্মসূত্র" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি অপর আস্তিক দর্শনগুলি প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণগুলিকে বেদরূপ প্রমাণের সহিত সমান আসন দিয়া রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তদর্শনখানি বেদরূপ প্রমাণকে মুখ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়া রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ বেদ যেমন প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিও সেইরূপ প্রমাণ, কাহারও বল অন্য অপেক্ষা অল্প বা অধিক নহে। ইহার ফলে বেদরূপ প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বিষয়ের নির্ণয় হয়, সেই সমুদয় বিষয়ই প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এস্থলে প্রত্যক্ষ বলিতে যোগীর যোগজ শক্তির দ্বারা যে অসাধারণ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বেদান্তদর্শনে, মহর্ষি বেদব্যাস, বেদরূপ প্রমাণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলিকে সহকারী বলিয়াছেন, বা নিম্ন আসন প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগুলি অলৌকিক বিষয়ে বেদবিরোধী হইলে ত্যাজ্য, কিন্তু বেদানুকূল হইলে গ্রাহ্য। কিন্তু লৌকিক বিষয়ে তাহারা অনুবাদ বা পুনরুক্তি বিশেষ মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগুলি বেদের সমান আসন প্রাপ্ত হউক, অথবা বেদই নিম্ন আসন প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ বেদই দুর্ব্বল বা ত্যাজ্য হউক, অথবা লোক-বিরুদ্ধ বিষয়ে বেদের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করা হউক তাহাতে বেদান্তীর কোন আগ্রহ নাই। এই দৃষ্টিতে মহর্ষি বেদব্যাস অলৌকিক ব্রহ্মবস্তুর এবং তাহার সাধন প্রভৃতির মীমাংসার জন্য বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। অবশ্য বেদের এত সম্মানের কারণ, বেদ অনাদি অপৌরুষেয় ঈশ্বরবৎ নিত্য, সুতরাং মানব-বুদ্ধিদোষ দ্বারা তাহা বিকৃত বা কলুষিত হয় নাই, অর্থাৎ বেদ অভ্রান্ত। কেবল তাহাই নহে, সকল মুনি এবং ঋষিই বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পূজা করিয়াছেন, বেদের রক্ষার জন্য নারায়ণ বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য অলৌকিক বিষয়ে বেদের প্রমাণ অকাট্য বা অভ্রান্ত। আর এইজন্যই বেদব্যাস, ইহার শরণ গ্রহণ করিয়া বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। আর ইহাই এইজন্য বেদান্ত দর্শনের একটী বিশেষত্ব। অন্য সকল দর্শনের নিকট বেদ প্রমাণ না হইয়া অনুবাদরূপ বা পুনরুক্তিবিশেষ হইয়া যায়। ইহার কারণ তাঁহাদের মতে এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা যোগীর প্রত্যক্ষ হয় না, অথবা অনুমানাদির দ্বারা জানিতে পারা যায় না। এজন্য জগৎকারণও অন্যমতে ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয় বস্তু হন। কিন্তু এই কথা বেদান্তী স্বীকার করেন না। এই কারণে বেদের এই অনুবাদদোষ বেদান্তদর্শনে নাই। কারণ, বেদান্তের মতে

জগৎকারণ অলৌকিক বস্তু, তাহা বেদভিন্ন জানা যায় না। এক কথায় বেদভিন্ন তাহার সন্ধানই পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বের জন্যই বেদান্তদর্শনের এত আদর সুধীসমাজে হইয়াছে।

এস্থলে লৌকিক ও অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। কারণ, এ বিষয়ে মতভেদ বর্ত্তমান। বেদান্তমতে লৌকিক এবং অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাহা বেদভিন্ন অন্য প্রমাণগম্য, তাহা লৌকিক, এবং যাহা বেদমাত্র প্রমাণগম্য, তাহা অলৌকিক। অন্যদর্শন এবিষয়ে অন্যমতাবলম্বী। যেমন অন্যদর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে, পাপ ও পুণ্যকেও অলৌকিক বলা হয়। কিন্তু যোগী, যোগবলে তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এজন্য সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা অলৌকিক হইলেও বেদান্তের দৃষ্টিতে তাহা লৌকিকই হয়। তদ্রূপ পরমাণু সাধারণের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু যোগীর তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ সাধারণের দৃষ্টিতে পরমাণু অলৌকিক হইলেও বেদান্তের দৃষ্টিতে তাহা লৌকিক। বেদান্তের দৃষ্টিতে একমাত্র জগৎকারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই অলৌকিক, তদ্‌ভিন্ন সকলই লৌকিক।

বস্তুতঃ জগতের কারণ যে অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহা বেদই বলিয়াছেন বলিয়া জগৎ-কারণ ব্রহ্ম লৌকিক বস্তু হইতে পারেন না। তাঁহাকে অলৌকিক বস্তুই বলিতে হইবে। কারণ, কার্য্য যে ঘট এবং তাহার কারণ যে কুম্ভকার ও মৃত্তিকা প্রভৃতি তাহাদের ন্যায় কেহই ব্রহ্ম ও জগৎকে দেখিতে পান না। যিনি দেখিবেন তিনিও জগৎ। জগতের অন্তর্গত হইয়া জগৎ-কারণকে কি করিয়া দেখা যাইতে পারে? পুত্র কি কখন পিতৃজন্ম দেখিতে পায়? এই কারণে জগৎকারণ যে অসঙ্গ ব্রহ্ম, তিনি এক অলৌকিক বস্তু। এইজন্য এই অলৌকিক বস্তুকে বেদ হইতে কথঞ্চিৎ জানা যায়, কিন্তু ঘটপটের ন্যায় জানা যায় না, অর্থাৎ বেদ হইতে ইঁহার সন্ধান-মাত্র পাওয়া যায়; তদতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় না। এইজন্য অলৌকিক জগৎ-কারণ-বিষয়ে বেদই প্রমাণ হয়। অলৌকিক বিষয় অন্য কোন প্রমাণগম্য হয় না। এক কথায় ইহার কারণ এই যে, বেদ ভিন্ন সকল প্রমাণের জন্যই "সম্বন্ধ" বা "সন্নিকর্ষের" জ্ঞান আবশ্যক হয়। সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষের জ্ঞান না হইলে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণই তাহার কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে না। প্রত্যক্ষের জন্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ প্রয়োজন। অনুমানের জন্য "সাধ্য", হেতু ও "পক্ষের" সম্বন্ধের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। এইরূপ অন্যত্র। বেদেই কেবল এইরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। কারণ শব্দশ্রবণমাত্র শব্দ-শক্তিবলে অর্থের জ্ঞান স্বতঃই উপস্থিত হয়। এইজন্য অলৌকিক জগৎ-কারণবিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। যেমন অজ্ঞেয় বস্তুকে জানা যায় না, কিন্তু "অজ্ঞেয়" এই শব্দের দ্বারা অজ্ঞেয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়; এস্থলেও তদ্রূপ।

জগৎকারণ যে অলৌকিক বস্তু, তাহার অপর একটি কারণ এই যে, কারণের ধর্ম্ম কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। তদ্রূপ কার্য্যের ধর্ম্মও কারণের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। যেমন মৃত্তিকারূপ কারণের ধর্ম্ম, কার্য্যরূপ ঘটের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। আবার কার্য্যরূপ ঘটের ধর্ম্ম, মৃত্তিকারূপ কারণের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। যেহেতু মৃত্তিকা হইতে ঘট-শরাবাদি বহু বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু ঘট হইতে সে সব বস্তু উৎপন্ন হয় না। এজন্য কারণের ধর্ম্ম কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। আবার ঘটরূপ কার্য্যের ধর্ম্ম যে জলাহরণাদি, তাহা মৃত্তিকারূপ কারণে নাই। এজন্য কার্য্যের ধর্ম্ম কারণের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হয়। এস্থলে লক্ষ্য করিতে

হইবে যে, দ্বৈতবাদী সাংখ্যাদির মতে কার্য্যের সমুদয় ধর্ম্মই কারণে থাকে। তন্মধ্যে কতক ব্যক্ত এবং কতক অব্যক্ত থাকে। আবার দ্বৈতবাদী ন্যায়াদির মতে কার্য্যের সমুদয় ধর্ম্ম কারণে থাকে না বলা হয়। এজন্য দ্বৈতবাদী সাংখ্যাদিকে সৎকার্য্যবাদী এবং দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকাদিকে অসৎকার্য্যবাদী বলা হয়। সাংখ্যাদি-মতে অসৎ বা অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না। ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। এজন্য কার্য্যমাত্রই কারণে অব্যক্তভাবে থাকে। আর ন্যায়াদিমতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় বলা হয়। যেমন, ঘটপ্রাগভাব হইতে ভাবরূপ ঘটের উৎপত্তি হয়। কার্য্য কারণে সম্পূর্ণরূপে থাকে না বলা হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহা বস্তুতঃ শব্দের বিবাদ। সাংখ্যের অব্যক্ত আর ন্যায়ের এই অভাবের মধ্যে ভেদ এস্থলে নাই। কারণ, অব্যক্ত অর্থ ব্যক্তের অভাব, আর ঘটপ্রাগভাব ঘটাবয়ব কপালাদিতেই থাকে, এজন্য ফলতঃ ভেদ নাই। তথাপি এস্থলে সাংখ্যাদির মতই সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বিবেচিত হয়। যেহেতু অভাবের কারণ তা হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি। যাহা হউক, উভয় মতেই কার্য্য দেখিয়া কারণের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম নির্ণীত হইতে পারে না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং জগৎ দেখিয়া জগৎকারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইতে পারে না বলিতেই হইবে। যেহেতু প্রত্যক্ষ অনুমানাদি যে লৌকিক প্রমাণ, তাহার বিষয় জগৎকারণ হয় না। পরন্তু অপৌরুষেয় অনাদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরপ্রোক্ত বেদরূপ অলৌকিক প্রমাণ-গম্যই জগৎকারণ হইয়া থাকেন। বেদমধ্যে এই জগৎকারণের ধর্ম্ম যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় কথিত হইয়াছে। এজন্য বেদান্তদর্শন, জগৎকারণনির্ণয়ে বেদেরই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যদর্শন তাহা করেন নাই। তাঁহারা সাধারণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া জগৎকারণ নির্ণয় করিয়াছেন। দেখাই যায় বেদমধ্যে সেই জগৎকারণের ধর্ম্ম বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা "অসঙ্গত্ব" "নির্ব্বিশেষত্ব" "নির্গুণত্ব" "অদ্বৈতত্ব" প্রভৃতি। এইসকল ধর্ম্ম জগতের কোন বস্তুতেই নাই। এজন্য জগৎ দেখিয়া এরূপ অসঙ্গ, নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈত একটী জগৎকারণবস্তু যে হইতেই পারে, তাহার কল্পনাও করা যায় না। বেদ কিন্তু এই সন্ধানটী দিয়াছেন। এজন্য জগৎ দেখিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সাহায্যে জগৎকারণ নির্ণয় করিলে তাহা সসঙ্গ, সবিশেষ, সগুণ এবং দ্বৈতবস্তুই হইতে বাধ্য। এইজন্যই বলা হয় জগৎকারণ অলৌকিক বস্তু। এইজন্য অলৌকিক জগৎকারণনির্ণয়ে বেদান্ত-দর্শনই অনন্যসাধারণ দর্শন হইয়াছে। দ্বৈতাদি-মতবাদিগণ ঐসকল নির্গুণ নির্ব্বিশেষ অসঙ্গ অদ্বৈত প্রভৃতি জগৎকারণবোধক বাক্যের ব্যাখ্যা যুক্তির অনুরোধে অন্যথা করিয়া স্ব স্ব মতের পুষ্টিসাধন করেন। বেদান্ত তাহা করেন না। বেদান্তী বেদের স্পষ্টার্থের অনুগামী হন। এইজন্য বেদান্তমতের এত আদর, আর ইহাই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব। বেদ না মানিয়া যাঁহারা জগৎকারণ নির্ণয় করিবেন, তাঁহাদের মতের ঐক্য একপ্রকার অসম্ভব। বস্তুতঃ বেদ-অমান্যকারী দার্শনিকগণ জগৎকারণসম্বন্ধে কেহই একমত নহেন। অধিক কি, যাঁহারা বেদকে স্ব স্ব মতের অনুকূল করিয়া লইয়া বেদমান্য করিবেন তাঁহাদের মধ্যেও মতের ঐক্য হয় নাই। কিন্তু বেদ মানিলেই তাহা সম্ভব। কারণ শব্দার্থ-উপস্থিতিতে মানববুদ্ধির স্বাধীনতা বা কৃতিত্ব থাকে না।

এবিষয়ে বেদ-অমান্যকারীর একটী দৃষ্টান্ত বৌদ্ধগণকে দেওয়া যাইতে পারে। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া যোগশক্তিপ্রভাবে এবং

অসামান্ত অনুভব এবং অতি সূক্ষ্ম যুক্তিসাহায্যে জগৎকারণ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞানবাদী, শূন্যবাদী এবং সর্ব্বাস্তিবাদী প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী মতবাদীতে পরিণত হইয়াছেন। বেদ না মানিলে যে কোন একটী নির্ব্বিবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে "মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বনির্ণয়" পরিচ্ছেদে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় ন্যায়াচার্য্যশিরোমণি উদয়নাচার্য্যের বাক্যদ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর যাঁহারা স্ব স্ব মতের অনুকূল করিয়া বেদমান্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অংশতঃ বেদমান্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদের দৃষ্টান্ত—পাশুপত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, ন্যায় ও সাংখ্যাদি মত-বাদিগণের মধ্যে দেখা যায়। এই জন্যই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রমধ্যে এইসকল মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। আর এই খণ্ডনের মূলমন্ত্র "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদি ২।১।১ সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব জগৎকারণকে অলৌকিক বস্তু বলিতে আমাদিগকে বাধ্যই হইতে হয়। আর তদনুসারে বেদান্তদর্শনের নির্দ্দিষ্ট পথে জগৎকারণ নির্ণয় করিতে আমরা বাধ্য হই। ক্রমশঃ

গান্ধীজী স্মরণে

শ্রীচিত্তদেব (শান্তিনিকেতন)

জ্ঞানের কৃপাণ হস্তে কল্যাণের বাণীমুখে
হে মহাসৈনিক,
ভারতের পৃষ্ঠারূঢ়—শান্তির লাগাম টানি
সুখে সৌম্য দুঃখেতে নির্ভীক!
ওহে বীর, মানবতা-উচ্চসিংহাসনে
যেথা মহামানব আসন,
জগতের বক্ষ ভরি শ্রেষ্ঠ মহত্বের গানে
ঘোষিল জীবন তব কীর্তি চিরন্তন!
প্রভাতে সন্ধ্যায় তব
প্রার্থনা দৈনিক
বিভুপদে; অমর অক্ষয়, লোকহিত—লোকাতীত
হে বিশ্বসৈনিক!
জ্ঞানমন্ত্রদাতা গুরু, শান্তির অহিংসামন্ত্র
রুদ্ররূপে জাগি নির্নিমিখ
হিংসা-ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-নররক্ত-কলঙ্কিত-পৃথ্বী
গ্লানি মুছে হবে নিত্য শান্ত ও নির্ভীক!

ওহে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, ভোগে নিরাসক্ত
জগতের শান্তিকামী সন্ন্যাসিপ্রবর
চিরদিন চিরশান্ত তব পুণ্য স্মিত-ওষ্ঠাধর!
পরিপূর্ণ মঙ্গলের মাঙ্গলিক স্মৃতি
ভারতের সিংহদ্বারে উজ্জ্বল দ্যুতির আলিম্পন
আঁকি' দিল কী স্বর্গীয় শিবের বিভূতি!
শিব-সত্য-সুন্দরের মূর্তপ্রাণ শাশ্বত সাধক
অমোঘ সিদ্ধিশুভ্র সুমহান শান্তিপ্রদায়ক
তব জীবনের শুদ্ধ জ্যোতির্ময় আলো
তমাচ্ছন্ন ভারতের তমো করি দূর
শান্তিসুমহান মন্ত্রে দীক্ষা দিবে ভারতেরে;
ঘিরে ঘিরে কোটি জীবনেরে
দিকে দিকে জাগিবে সুমিলনের সুর।
জীবন-প্রদীপ-আলো তব উজ্জ্বলতর হোক্
তেজোদ্দীপ্ত বিভাবসু সম;
স্মরি' তোমা' জন্মদিনে জগদীশে নতশিরে
জাগে এ প্রার্থনা প্রাণে
আত্মময় হে অন্তরতম!

আণবিক শক্তি

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এস্‌সি

১৯০৫ সনে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আপেক্ষিকবাদ হইতে প্রমাণ করিলেন যে বস্তুর নাশে শক্তির উৎপত্তি। সাদা কথায় এক পাউণ্ড পরিমাণ যে কোন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে শক্তি বা তেজে রূপান্তরিত করিলে যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যাইবে, প্রায় ৯০ লক্ষ টন কয়লা পোড়াইয়া সেই পরিমাণ তেজ পাওয়া যায়। এখানে বলা আবশ্যক যে যখন কয়লা পোড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করা হয় তখন কয়লার অতি নগণ্য এক অংশ তাপে পরিণত হয় এবং বাকীটা ভস্ম, ধোঁয়া, বাষ্প ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হয়। যদি এক পাউণ্ড কয়লা এমন ভাবে পোড়ান সম্ভব হইত' যে বাষ্প, ধোঁয়া ইত্যাদি কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না—সম্পূর্ণ কয়লা তত্তৎমাত্র তাপে পরিণত হইবে তাহা হইলে এখন ৯০ লক্ষ টন কয়লা হইতে যে তেজ পাওয়া যায় এক পাউণ্ড পরিমাণ কয়লা বা যে কোন পদার্থ হইতে সেই তেজ পাওয়া সম্ভব। আইনষ্টাইনের এই মতবাদ বিজ্ঞান জগতে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। এতদিন পর্য্যন্ত জড়কে শক্তি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া দেখা হইত। এখন প্রমাণিত হইল যে জড় ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভেদ। এক কথায় জড়কে ঘনীভূত শক্তি (congealed energy) বলা চলে। সূর্য্য এবং নক্ষত্রের প্রচণ্ড তেজের মূলেও এই কারণ বিদ্যমান। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সূর্য্য তেজ বিকিরণ করিতেছে। এরূপ প্রচণ্ড তেজ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নহে যদি না ধরিয়া লওয়া হয় যে সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ তেজে রূপান্তরিত হইতেছে। হিসাবে জানা যায় যে সূর্য্য হইতে যে তাপ ও আলোক নির্গত হয় তাহাতে সূর্য্যের ওজন প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টন হ্রাস পায়।

বহুদিন পর্য্যন্ত আইনষ্টাইনের এই মতবাদকে বিজ্ঞানীরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তি এতই প্রবল যে ইহাকে অস্বীকার করাও চলে না; পরমাণুর গঠন এবং ভর অর্থাৎ (mess) লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া আইনষ্টানের মতবাদ প্রমাণিত হইল। অধ্যাপক রাদারফোর্ড সর্ব্বপ্রথম পরমাণুর গঠন নির্ণয় করেন। তাঁহার মতানুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর কোষ বা কেন্দ্রক একটি ভারী ধনতড়িৎসম্পন্ন কণিকাদ্বারা গঠিত এবং এই কেন্দ্রকের বাহিরে একটি ঋণতড়িৎসম্পন্ন কণিকা কেন্দ্রককে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভারী কণিকাকে বলা হয় প্রোটন্‌ এবং অপরটিকে বলা হয় ইলেকট্রন্‌। প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন্‌ ভরশূন্য অর্থাৎ প্রোটন্‌ ইলেকট্রন্‌ অপেক্ষা প্রায় ২০০০ গুণ ভারী বলিয়া ইলেকট্রনের ওজন নাই বলিয়া ধরা হয়। বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন্‌ ও ইলেকট্রন্‌ লইয়া বিভিন্ন পরমাণু গঠিত হইয়াছে। রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত 'আলফা' কণাদ্বারা হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের পরমাণু চূর্ণ করিয়া রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন প্রণালীর সন্ধান পান। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরে আরও একপ্রকার কণিকার

অস্তিত্ব তিনি জানিতে পারেন নাই। ১৯৩২ সনে বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাড্‌উইক্ নিউট্রন্ নামে এক মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন। ইহার ভর প্রোটনের সমান কিন্তু ইহা বিদ্যুৎশূন্য। এখন পরমাণুর গঠন আলোচনা করিলে কি প্রকারে আণবিক শক্তি নির্গত হইতে পারে তাহা বুঝা যাইবে।

হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার পরমাণুর কেন্দ্রক একটি প্রোটন্ এবং প্রোটন্‌কে বেষ্টন করিয়া একটি ইলেকট্রন্ আবর্ত্তিত হইতেছে। সেই জন্য ইহার ভর ধরা হয় এক এবং ইহা বিদ্যুৎ-শূন্য কারণ প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুৎ এবং ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ পরিমাণে সমান। হিলিয়ম পরবর্ত্তী ভারী পদার্থ। ইহার কেন্দ্রক দুইটি প্রোটন্ ও দুইটি নিউট্রন্ লইয়া গঠিত। সেইজন্য ইহার ভর ৪ এবং দুইটি ইলেকট্রন্ কেন্দ্রকের চারিদিকে ঘুরিতেছে। দুইটি প্রোটন্ ও দুইটি ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ সমান কিন্তু বিপরীত-ধর্ম্মী বলিয়া মোটের উপর পরমাণুটি বিদ্যুৎ-শূন্য। মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ৯২ সংখ্যক পদার্থটি হইতেছে য়ুরেনিয়ম। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ। ইহার পরমাণু ৯২টি ইলেকট্রন্, ৯২টি প্রোটন্ এবং ১৪৬টি নিউট্রন্ লইয়া গঠিত

হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে দুইটি প্রোটন্ ও দুইটি নিউট্রন্ রহিয়াছে। ইহাদের মোট ভর চার হওয়া উচিত; প্রকৃত পক্ষে পরমাণুটির ভর চার অপেক্ষা কিছু কম। দুইটি প্রোটন্ ও দুইটি নিউট্রন্ একত্রিত হইয়া যখন হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক গঠিত হয় তখন ইহাদের মিলিত ভর মোটের উপর ৩৭ ভাগের এক ভাগ হ্রাস পায়। তাহা হইলে এই ৩৭ ভাগের এক ভাগ জড়-পদার্থ গেল কোথায়? বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন যে প্রোটন্ ও নিউট্রন্ সংযোগে পরমাণু গঠিত হইবার কালে কিছুটা পরিমাণ শক্তি বা তেজ নির্গত হয়—যেমন কয়লা পোড়াইলে তেজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুইটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। চার গ্রাম কয়লা পোড়াইয়া যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যায়, দুই গ্রাম প্রোটন্ ও দুই গ্রাম নিউট্রন্‌দ্বারা হিলিয়ম পরমাণু গঠন করিলে তাহা অপেক্ষা ১৬০,০০০,০০০ গুণ অধিক তেজ পাওয়া যাইবে। প্রায় সমস্ত পরমাণু হইতে এই প্রকারে আণবিক শক্তি নির্গত করা যাইতে পারে। কতটা জড় কতটা শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে সে বিষয় আইনষ্টাইনের ফরমূলা যেরূপ নির্দ্দেশ দেয়, প্রোটন্ ও নিউ-ট্রন্‌দ্বারা পরমাণু গঠন করিলে ভর যে পরিমাণে হ্রাস পায় এবং শক্তি যে পরিমাণে নির্গত হয় তাহা আইনষ্টাইনের ফরমূলার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং বোঝা গেল এক একটি পরমাণু প্রভূত তেজের আধার।

প্রশ্ন এই যে কি উপায়ে এই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা যায়। প্রোটন্ ও নিউট্রন্‌দ্বারা পরমাণু গঠন করিয়া শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে কিন্তু ইহা সবক্ষেত্রে সম্ভব নহে, কারণ লক্ষ লক্ষ প্রোটন্ ও নিউট্রন্ একত্র করিলেই যে পরমাণু গঠিত হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অপর পক্ষে পরমাণু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলেও শক্তি নির্গত হইতে পারে। রাদারফোর্ড এই প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। রেডিয়ম হইতে নির্গত আলফাকণিকা নামক দুইটি প্রোটন্ ও দুইটি নিউট্রন্ দ্বারা গঠিত এক প্রকার কণিকাদ্বারা আঘাত করিয়া তিনি নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ভাঙ্গিয়া-ছিলেন বটে কিন্তু এখানে একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা রহিয়াছে। একটি মটরদানার আয়তনের পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাসে কতগুলি অক্সিজেন পরমাণু

রহিয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল। ধরা যাক, একটি পৃষ্ঠায় এক হাজার অক্ষর আছে; এইরূপ হাজার পৃষ্ঠায় একখানা বই। একটি লাইব্রেরীতে যদি এরূপ ১০ হাজার বই থাকে তবে এরূপ ৭০ লক্ষ লাইব্রেরীতে মোট যতগুলি অক্ষর থাকিবে একটি মটরদানার সম-আয়তনের অক্সিজেন গ্যাসে ততগুলি অক্সিজেন পরমাণু আছে। গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানী এই গণনা করিয়াছেন এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে এই গণনা অভ্রান্ত। একজন বিজ্ঞানী এই জন্যই বলিয়াছেন যে নিউইয়র্ক শহরের লোকসংখ্যা সঠিক বলা কঠিন কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে মোট কতগুলি প্রোটন্, ইলেকট্রন্ ও নিউট্রন্ আছে তাহা বলিয়া দেওয়া অনেক সহজ। এডিংটন সমগ্র বিশ্বে মোট কত ইলেকট্রন্ আছে তাহারও হিসাব দিয়াছেন। মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা $১০^{৭৯}$ অর্থাৎ দশের পর উনআশিটি শূন্য। ইহাও গণিতের সাহায্যে বাহির করা হইয়াছে। ডালটন যখন পরমাণুবাদ প্রচার করেন তখন বিজ্ঞানী দেখিয়াছিলেন যে যেমন ইটের পর ইট সাজাইয়া একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় তেমনি পরমাণুর পর পরমাণু সাজাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। তখনকার বিজ্ঞানি-সমাজ সৃষ্টিকর্ত্তাকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে বোঝা গেল যে গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতির রহস্যসমূহের কিনারা করা যায় না। বিজ্ঞানি-সমাজ তখন বলিয়া উঠিলেন—'ভগবান নিশ্চয়ই একজন গণিত-শাস্ত্রবিদ্ —অন্ততঃপক্ষে তিনি গণিত সাহায্যে চিন্তা করেন।' বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানী বুঝিলেন যে গণিতের সাহায্যে কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়—তারপর কিছুটা রহস্যাবৃত থাকে—গণিত বিশ্ব-রহস্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইজন্য বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানীরা বলেন যে ভগবান নিশ্চয়ই একজন দার্শনিক।

রেডিয়ম হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ আলফা-কণিকা নির্গত হইতেছে এবং এই কণিকা-সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ অক্সিজেন পরমাণু চূর্ণ করিতে পারে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়ত বা দু'একটি পরমাণু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বাকী কণিকাসমূহ পরমাণুর পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি সমস্ত পরমাণুকে আঘাত করা সম্ভব হইত তবে প্রচণ্ড তেজ নির্গত হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং এই উপায়ে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করা চলে না।

১৯৩৪ সনে ইটালীদেশীয় বিজ্ঞানী ফার্ম্মির মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইল। নিউট্রন্ আবিষ্কৃত হইবার পর দেখা গেল যে পরমাণুকে নিউট্রন্‌দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙ্গা চলে। ফার্ম্মি য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে নিউট্রন্ দ্বারা আঘাত করিয়া দেখিলেন যে এমন এক পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে যাহা তেজস্ক্রিয় এবং য়ুরেনিয়ম হইতেও ভারী। বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে ইহার জন্ম—প্রকৃতিতে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পরমাণুটি ক্ষণস্থায়ী—সৃষ্টি হইবার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইহা তেজ বিকিরণ করিয়া প্লুটোনিয়ম নামে এক মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থটির নাম নেপচুনিয়ম।

১৯৩৯ সনে বিজ্ঞানীর স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। জার্ম্মান বিজ্ঞানী অটোহান পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে য়ুরেনিয়ম পরমাণুকে নিউট্রনদ্বারা আঘাত করিলে পরমাণুটি দুইটি টুকরায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রচণ্ড তেজ নির্গত করে। একটি টুকরা 'ক্রীপটন' পরমাণু এবং অপরটি 'বেরিয়ম' পরমাণু। এই টুকরা দুইটির মিলিত ভর য়ুরেনিয়ম পরমাণু অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং য়ুরেনিয়ম পরমাণুর এক অংশ

হইতে দুইটি পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে এবং বাকী অংশ তেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়াকে য়ুরেনিয়মবিভাজন বলে। আইনষ্টাইনের ফরমূলা অনুসারে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে বিভাজন-দ্বারা এক পাউণ্ড য়ুরেনিয়ম হইতে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয় হাজার টন কয়লা পুড়াইয়া সেই তাপ পাওয়া যাইতে পারে।

দুই প্রকার য়ুরেনিয়ম দ্বারা মূল য়ুরেনিয়ম গঠিত। একটি সাধারণ য়ুরেনিয়ম; ইহার আণবিক ওজন ২৩৮ এবং অপরটি একটিনো-য়ুরেনিয়ম—আণবিক ওজন ২৩৫। অধ্যাপক নীল বর্ প্রমাণ করিলেন যে একটিনো য়ুরে-নিয়মকে একটি স্বল্পবেগবিশিষ্ট নিউট্রন্দ্বারা আঘাত করিলে ইহার পরমাণু দুইটি টুকরায় বিভক্ত হয় এবং বিভাজনের সময় দুইটি নিউট্রন্ ছাড়িয়া দেয়। সেই নিউট্রন্ দুইটি আবার দুইটি পরমাণুর বিভাজন ঘটায়। ফলে চারটি নিউট্রন্ নির্গত হয় এবং এইরূপে একবার নিউট্রন্দ্বারা আঘাত করিলে বিভাজন-ক্রিয়া আপনা হইতে চলিতে থাকে। সাধারণ য়ুরেনিয়ম হইতে একটিনো-য়ুরেনিয়মের তেজ নির্গমন ক্ষমতা হাজার গুণ বেশী। একটা অসুবিধা এই যে সাধারণ য়ুরেনিমের ১৪০ ভাগের এক ভাগ হইতেছে এই একটিনো-য়ুরেনিয়ম এবং য়ুরেনিয়ম হইতে ইহাকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। সেইজন্য একটিনো-য়ুরেনিয়ম হইতে বিভাজন দ্বারা আণবিক শক্তি নির্গত করিতে পারিলেও দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। বিজ্ঞানী নতুন একটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা হইতে আণবিক শক্তি নির্গত করিয়া ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি চালনা করা সম্ভব হইবে। এই পদার্থটির নাম প্লুটোনিয়ম্।

সাধারণ য়ুরেনিয়মকে এক বিশেষ বেগসম্পন্ন নিউট্রন্দ্বারা আঘাত করিলে য়ুরেনিয়ম দুইটি টুকরায় ভাঙ্গিয়া যায় না। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমে ৯৩ সংখ্যক স্বল্পকালস্থায়ী পদার্থ নেপচুনিয়ম এবং পরে ৯৪সংখ্যক পদার্থ প্লুটোনিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়। প্লুটোনিয়ম স্থায়ী পদার্থ এবং পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে প্লুটোনিয়মকে স্বল্পবেগসম্পন্ন নিউট্রন্দ্বারা আঘাত করিলে আণবিক শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি-নির্গমন নিয়মিত করা সম্ভব এবং প্লুটোনিয়মের কার্য্যকারিতা প্রায় একটিনো-য়ুরেনিয়মের সমান।

যুক্তরাষ্ট্রে আণবিক শক্তিকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত এক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে atomic pile বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানফোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ এরূপ একটি pile নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই pileএ য়ুরেনিয়ম হইতে প্লুটোনিয়ম প্রস্তুত হয়। ইহার গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যতদুর জানা গিয়াছে তাহা এইরূপ: বিশুদ্ধ কয়লাদ্বারা নির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট বাক্সের মত একটি পদার্থের মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কতকগুলি গোলাকার ছিদ্র রহিয়াছে। এলুমিনিয়মের নলের মধ্যে য়ুরেনিয়ম পুরিয়া নলগুলি এই সমস্ত ছিদ্রের মধ্যে রাখা হয় এবং নিউট্রন্ দ্বারা এই য়ুরেনিয়মকে ভাঙ্গা হয়। ফলে য়ুরেনিয়ম প্লুটোনিয়মে রূপান্তরিত হয়—অনেকটা কাঁচা কয়লা পুড়াইয়া কোক তৈরী করিবার মত। ফলে ভীষণ তাপের সৃষ্টি হয়। Pileটিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া কলরেডো নদীর এক অংশকে বিশেষ বন্দোবস্ত দ্বারা ঐ pileএর মধ্য দিয়া তীব্রবেগে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। জল এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে pileএর এক মুখে প্রবেশ করিয়া অন্য মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেও যখন এই জল

পুনরায় নদীতে পড়িতে লাগিল তখন সমস্ত নদীর জল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই জন্য pile-এর নিকট কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত করিয়া উত্তপ্ত জল ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ঐ ঠাণ্ডা জল নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এখন যদি ঐ pileএর মধ্যে জল ধীর গতিতে প্রবাহিত করা যায় তবে য়ুরেনিয়ম-নির্গত তাপে জল বাষ্পীভূত হইবে এবং ইহা দ্বারা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালনা করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা চলিবে। আবার যে প্লুটোনিয়ম উৎপন্ন হইল নিউট্রনের আঘাতে তাহা হইতে তাপ উৎপন্ন করা যাইবে এবং এই তাপে জল বাষ্পীভূত করিয়া যন্ত্রচালনা সম্ভব।

অধ্যাপক কম্প্‌টন্ বলিয়াছেন যে যদিও হাজার টন কয়লা হইতে উৎপন্ন তেজ এক পাউণ্ড য়ুরেনিয়ম হইতে পাওয়া যায় তথাপি আণবিক শক্তি দ্বারা রান্নাঘরের কাজ চলিবে না। রান্নাঘর কেন, মোটরকার, মোটর সাইকেল, এমন কি সাধারণ এরোপ্লেনেও আণবিক শক্তি ব্যবহার করা আপাততঃ চলে না। কারণ atomic pile প্রথমতঃ আকারে বৃহৎ, দ্বিতীয়তঃ খুব পুরু ইস্পাতের পাত দিয়া ইহাকে আচ্ছাদিত করিয়া না রাখিলে নির্গত তেজে প্রাণহানির সম্ভাবনা, তৃতীয়তঃ আণবিক শক্তির কাজ হইতেছে জলকে বাষ্পে পরিণত করা এবং তাহা দ্বারা ইঞ্জিন চালান। বাষ্পীয় ইঞ্জিন সাধারণ তৈলচালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা ভারী। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে এক একটি pileএর ওজন অন্ততঃ ৫০ টনের কম নহে। সুতরাং মোটর বা এরোপ্লেনে ইহার ব্যবহার বর্ত্তমানে সম্ভব নহে। সমুদ্রগামী জাহাজ বা সবমেরিনে ইহার ব্যবহার খুবই উপযোগী হইবে এবং সেই চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য বর্ত্তমানে য়ুরেনিয়ম ব্যবহার করা অপেক্ষা কয়লা বা তৈল ব্যবহার করায় ব্যয় কম। তবে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আণবিক শক্তি সহজলভ্য হইবে।

চিকিৎসাক্ষেত্রেও আণবিক শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে স্বল্পমাত্রায় আণবিক তেজ প্রয়োগ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সোডিয়ম, ক্যালসিয়ম প্রভৃতি ধাতুকে আণবিক তেজের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় করিয়া শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। শরীরের যে কেন স্থানেই এই তেজস্ক্রিয় সোডিয়ম থাকুক না কেন যন্ত্রসাহায্যে তাহার অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং শরীরের উপর ইহার ক্রিয়া বুঝা যায়। শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য এই এই উপায়ে জানা যাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার রোগে আণবিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভবিষ্যতের চিকিৎসা-প্রণালী আণবিক শক্তি সাহায্যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। এ্যাটম বোমা আবিষ্কারের পর হইতে আণবিক শক্তির প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এ কথা প্রায়ই শুনা যায় যে ছোট এক টুকরা কয়লাদ্বারা একখানা রেলগাড়ীকে হাজার মাইল টানিয়া লওয়া যাইবে। এই কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। এক টুকরা কয়লাকে যদি পরিপূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে সেই শক্তিদ্বারা বোম্বে মেলকে হাওড়া হইতে বোম্বে পর্য্যন্ত চালান সম্ভব। কিন্তু এ্যাটম বোমা বা atomic pile-এ য়ুরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম হইতে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা সম্পূর্ণ য়ুরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম নিঃশেষিত হইয়া শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলে যত শক্তি পাওয়া যাইত তাহার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিবার উপায় এখনও মিলে নাই। সুতরাং এক টুকরা কয়লাকে বিভাজন-প্রক্রিয়ায় যদিও বা শক্তিনির্গমনের উপায় উদ্ভাবন করা যায় তাহাদ্বারা বোম্বে মেল অতদূর চলিবে না। আণবিক শক্তির কথা শুনিয়া লোকে ভবিষ্যতের পৃথিবীর নানাপ্রকার চিত্র আঁকিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে ইহার পর আণবিক শক্তির বড়ি বাজারে বিক্রয় হইবে। কয়েকটা বড়ি রেলগাড়ীতে জুড়িয়া দিলে গাড়ী চলিবে। ঐরূপে মোটর, এমন কি বড় বড় মিলও চলিতে পারে। এরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। বিজ্ঞানী খুব জোর দিয়া বলিতেছেন যে আণবিক শক্তির কাজ আর কয়লার কাজ এক—তাপ উৎপন্ন করা মাত্র। এই তাপদ্বারা জল বাষ্পীভূত করিয়া ইঞ্জিন চালনা করিতে হইবে। কাজেই ইঞ্জিনের প্রয়োজন—শুধু তেজদ্বারা কোন কাজ হইবে না। সাধারণ বাষ্পচালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা এই শ্রেণীর ইঞ্জিন অনেক বড়, ভারী এবং জটিল হইবে বটে তবে বহুলক্ষগুণ শক্তিশালী হইবে।

আণবিক শক্তিদ্বারা কি পরিমাণ কাজ পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল:

(১) এক পাউণ্ড জলের পরমাণুসমূহকে চূর্ণ করিয়া শক্তি নির্গত করিলে তাহা দ্বারা দুই শত লক্ষ টন জল বাষ্পীভূত করা যাইবে।

(২) একবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার সময়ে প্রত্যেক লোক যে পরিমাণ বাতাস টানিয়া লয় সেই বাতাসকে তেজে পরিবর্ত্তিত করিলে তাহা দ্বারা একটি বড় এরোপ্লেনকে এক বৎসর চালনা করা চলে।

(৩) পেষ্টবোর্ডের একখানা সাধারণ রেলের টিকিটের সমস্ত পরমাণু হইতে যে শক্তি পাওয়া যাইতে পারে তাহাদ্বারা একখানা বড় প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাঁচবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

(৪) আট আউন্স কেরোসিন তৈল হইতে এরূপ পরিমাণে শক্তি নির্গত করা যাইতে পারে যাহাদ্বারা কলিকাতা শহরে দুই বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করা চলে।

সুতরাং আণবিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার উপায় আয়ত্তে আসিলে কয়লা, তৈল বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি অচল হইয়া পড়িবে।

আসল কথা এ্যাটম বোমা মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার ধ্বংসকারিতা দেখিয়া প্রত্যেক শক্তিশালী জাতি আণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং শক্তিমদমত্ত জাতিসমূহের মধ্যে ইহা লইয়া রেষারেষির অন্ত নাই। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। বিজ্ঞানী এখন ইহার অন্তর্দিকটাও জগতের সামনে মেলিয়া দিন। ইহাদ্বারা যে মানুষের কল্যাণও সম্ভব সেই দৃষ্টিভঙ্গি আনা প্রয়োজন। পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহ লুপ্ত করিতে হইলে প্রত্যেক জাতিকে এই রহস্যের চাবিকাঠি দিতে হইবে। এই কথা উল্লেখ করিয়া আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর্ভিং ল্যাংমায়ার U. S. A. Senate Committee on Atomic Energyর এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন, "You cannot go to a nation and say—we hold atomic bombs in a sacred trust and we want them to stay permanently that way; you have got to trust us, but we don't trust you."

বিজ্ঞান এখন আর বিজ্ঞানীর হাতে নাই। কূটনৈতিক চালবাজিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারাইয়াছেন। এখন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ সকলের সমবেত চেষ্টায় পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সম্ভব। মহাসমর শেষ হইয়াছে কিন্তু শান্তি কোথায়? উত্তর বোধ হয় এই—"Peace is a war casualty." আবার যেন যুদ্ধের আভাস ঘনাইয়া আসিতেছে। আণবিক শক্তি ইহাই আমাদের বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে যে মানুষ কি প্রকারে পরস্পরের সহযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা শিখিতে হইবে নচেৎ আণবিক শক্তিদ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করিয়া দেওয়া চলে। পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ এবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ থাকিবে না—মানুষ মানুষকে প্রীতিভরে আপনার করিয়া লইবে। মানুষের অন্তরে শান্তি আসিলেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

'কে তোমারে জানতে পারে!'

শ্রীমাধুর্য্যময় মিত্র

আবির্ভাব উৎসবের উদ্‌যাপনা দেশ-দেশান্তরে
মহা সমারোহ ভরে,
আবার হয়েছে সুরু।
তুমি বিশ্বগুরু
ভক্তি-হিমে সাকার মায়ায়
এসেছো ধরায়।
স্মৃতির অতীত কাল হ'তে
ধরণীর আঙ্গিনাতে
বার বার নররূপে দেব-লীলা তব
অতি অভিনব।

অজ্ঞানের তমিস্রায় বিভ্রান্ত মানব চেনেনি তোমায়।
জ্ঞানীর ভাষায়—
সৃষ্টি মিথ্যা কথা,
নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ আত্মা, জন্ম মৃত্যু কোথা?
তাই তব আগমনী
তোমার অমিয় বাণী,
বিকশিত করে নাকো জ্ঞানীর হৃদয়ে
নব কিশলয়ে।
কৃপাবশে আপনারে দিয়েছ যে ধরা—
নিবিড় প্রেমেতে ভরা,
কামনা-কলুষ-হীন পবিত্র আধারে
ভক্তের মাঝারে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার
নিখিলের চারিধার,
সযতনে যত ফুলে তুলেছো বিকশি
শুচি স্মিত হাসি,
সে ফুল চয়ন করি
প্রাণ ভরি
গাঁথিবারে কী অপূর্ব্ব মালা,
এবারে কি এসেছো নিরালা?

আরবের শুষ্কমরু,
সমাচ্ছন্ন তরু—
বাংলার বুকে আনিয়াছ টানি।
বোধিদ্রুম ফিরে পেল অতীতের বাণী
পঞ্চবটী-মূলে।
যমুনার কূলে—
যে রাগিণী উঠেছিল বাঁশরী বিলাসে,
নবরূপে মূর্ত্ত হ'ল কল-কণ্ঠ-ভাষে—
সুরধুনী তীরে।
ক্রুশবিদ্ধ হৃদয়ের শেষ বিন্দুটিরে
নিঃশেষিত করেছিলে বিশ্বের কল্যাণে
হাসি মুখে;
নিষ্পাপ শরীরে তাই সুখে
সহিয়াছ রোগের যাতনা।

নাম গানে প্রেম অশ্রুকণা,
সিংহকণ্ঠে সঘন গর্জ্জনে
ক্ষণে ক্ষণে
কাঁপাইতে নবদ্বীপ ভূমি,
সেই তুমি
'রাম' 'কৃষ্ণ' একাধারে রামকৃষ্ণ রূপে
এসেছো যে সঙ্গোপনে অতি চুপে চুপে
তাই মনে পড়ে,—
"কে তোমারে জানতে পারে
তুমি না জানালে পরে?"

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম অপৃথক

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মিথিলার উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন হিন্দু ক্ষত্রিয় বংশজাত। বুদ্ধদেব যৌবন কাল পর্যন্ত হিন্দুরাজপরিবারে এবং হিন্দুসংস্কারের মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ বুদ্ধদেবের ছিল। ইহা সহজে বুঝা যায় যে হিন্দুধর্মের প্রভাব তাঁহার উপর যথেষ্ট কার্য করিয়াছিল। রাজার ছেলে হইয়াও কখনও বুদ্ধদেব আমোদ আহ্লাদ বা ভোগবিলাসে রত হইতেন না। সংসারে মানুষ রোগশোক, জরামৃত্যু প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করে দেখিয়া তিনি নিয়তই বিষণ্ণ থাকিতেন। অবশেষে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে মানুষের এই যন্ত্রণা দূর করা যায়? বুদ্ধদেব চিন্তায় নিরস্ত হইলেন না। তিনি মানুষকে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি দিবেন স্থির করিয়া ২৯ বৎসর বয়সে একদা রাত্রিতে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। জন্ম জরা মৃত্যু প্রভৃতি জনিত দুঃখের কারণ এবং তৎসমস্ত দূর করার উপায় উদ্ভাবনই বুদ্ধদেবের জীবনের ব্রত ছিল।

বুদ্ধদেবের বহু পূর্বে উপনিষৎ প্রচার করেন ব্রহ্ম নিত্য এবং জগৎ অনিত্য। জাগতিক মোহের কারণ অবিদ্যা, এই অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। এই মোক্ষের নামান্তরই নির্বাণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে জাগতিক নানাবিধ দুঃখের হেতু দূর করার উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের পূর্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব বলিতে হইবে পূর্ববর্তী হিন্দুশাস্ত্রের প্রভাব বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল এবং তিনি পূর্বাচার্যগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মাচার্য শঙ্কর ও জয়দেব বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবকে স্বয়ং নারায়ণ বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বুদ্ধকে নিবীত (অর্থাৎ উপবীতধারী) বুদ্ধ বলা হইয়াছে। উপালি সুত্তে তাঁহাকে ঋষিসত্তম, ত্রিবিদ্যাযুক্ত ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন, যিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। ইতিবুদ্ধকং নামক পালি গ্রন্থে তাঁহাকে ব্রহ্মভূত বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসাশ্রম ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রকারান্তর মাত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিনয়ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্যের অনুরূপ। বুদ্ধদেব ঘোষণা করিলেন যে মোক্ষ বা নির্বাণলাভই দুঃখনিরোধের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহা

সাংখ্যবেদান্তেরই প্রতিধ্বনি। বৌদ্ধধর্মে আত্মা-পরমাত্মা স্বীকৃত হয় নাই বটে কিন্তু তাহার পরিবর্তে বৌদ্ধধর্মে যাহা প্রচারিত দেখা যায় সেই ধর্মকায় প্রাচীন বৈদিক সত্যেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। তার পর নিরঞ্জনতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব ও সহজতত্ত্বকে অবৈদিক বৌদ্ধতত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু ইহার মূলে সত্য নাই। অঞ্জন নাই যাহাতে অর্থাৎ যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম তিনিই নিরঞ্জন।

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য,গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেই সমস্তের যিনি মূল, অথবা যাহাতে তৎসমুদয় অবস্থিত তাহার স্বরূপ অনুভব করিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বা নিরঞ্জন আখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য অনাদি। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে অনন্ত স্বরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত। বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন—বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। যোগীদের মতে নিরঞ্জনই ব্রহ্ম। প্রায় সকল যোগশাস্ত্রে নিরঞ্জনতত্ত্ব দৃষ্ট হয়। যোগী দত্তাত্রেয়ের অবধূত গীতায়, অষ্টাবক্র সংহিতায় এবং উপনিষৎসমূহে নিরঞ্জনতত্ত্ব আছে। বিবিধ উপনিষদের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হইয়াছিল। নিরঞ্জনতত্ত্ব ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তিকোপনিষৎ অনুসারে সর্বশুদ্ধ ১০৮ খানি উপনিষৎ আছে। ইহাদের দশখানি ঋগবেদের, ১৯ খানি শুক্ল যজুর্বেদের, ৩২ খানি কৃষ্ণ যজুর্বেদের, ১৬ খানি সামবেদের ও ৩১ খানি অথর্ব বেদের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে ধ্যান-বিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, হংসোপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, ত্রিশিখি ব্রাহ্মণোপনিষৎ, নির্বাণোপনিষৎ, শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, যোগশিখোপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ, ভস্মজাবালোপনিষৎ প্রভৃতিতে নিরঞ্জনতত্ত্ব দৃষ্ট হয়। দেখা যাইতেছে নিরঞ্জনতত্ত্ব ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব সব বেদেই আছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে শূন্য-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সহজ মানে সহ-জাত। অর্থাৎ যে ধর্ম যে বস্তুর সহিত জন্ম হইতেই থাকে তাহাই বস্তুটির সহজ। শূন্যতত্ত্বের মধ্যেই সহজ ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

হঠযোগপ্রদীপিকায় সহজোলী ব্রজোলী প্রভৃতি যোগের কথা আছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্র যোগমূলক। অথর্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ রামপ্রসাদ সেন বলেন—"বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মে পাতঞ্জল সূত্রের প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছেন" (Oldenburg's Buddha, Page 62)। রাইস ডেভিডস্ বলিয়াছেন—

"Buddha was a Hindu and the best of the Hindus." একদিন এক ব্রাহ্মণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন 'আমি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ বা মনুষ্য নহি, আমি বুদ্ধ।' ইহার সঙ্গে হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি "অহং ব্রহ্মাস্মি"র কোনও প্রভেদ নাই। বেদে —'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং' বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে তাহার সহিত নিরঞ্জনের কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু বেদে নিরঞ্জন সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। এভাবে যতই আলোচনা করা যাইবে ততই দৃঢ় ধারণা জন্মিবে যে বেদই বৌদ্ধধর্মের মূলে নিহিত আছে।

বুদ্ধদেব নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। বুদ্ধের তিরোধানের পর তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম রাজগৃহে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। ইহার মোটামুটি একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সভা আহূত হয়।

রাজা অশোকের সময় তৃতীয় সভা হয় পাটলিপুত্রে এবং মহারাজ কণিষ্কের সময়ে চতুর্থ সভা হইয়াছিল। এই সব সভায় বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্রাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এভাবে চেষ্টার ফলে যে সব বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম নামধেয় তিন পিটক বা পেটিকা নামক সংগ্রহগ্রন্থই প্রধান।

বৈদিক ধর্ম কালবশে রূপান্তরিত হইয়া এক ও ঐক্যবদ্ধ হিন্দুজাতির মধ্যে বহু জাতির সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছে। ঠিক সেইরূপ বৌদ্ধধর্মও কালবশে রূপান্তরিত হইয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়া হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ডাঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন—"যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের কঙ্কাল-স্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম দারুণ ব্যাধির ন্যায় ভারতের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যে যুগে শৈব হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই ঘোর ধর্মকলহের দিনে (১০—১১শ শতাব্দীতে) নাথধর্ম আবির্ভূত হইয়া কলহ-পরায়ণ ধর্মদ্বয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া শান্তিবারি সেচনে প্রয়াসী হইয়াছিল" (ইতিহাস ও আলোচনা—শ্রাবণ, ১৩২৮)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হডসন বলিয়াছেন—"Matsyendra Nath is the introducer of Nathism into Buddhism." অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মে নাথধর্ম আনয়ন করেন। হডসন এ প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে গোরক্ষ নাথের নাথধর্ম ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংযোজক সেতুস্বরূপ। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol, 18) হেষ্টিংস বলেন গোরক্ষ নাথ নেপালী বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেন (Goraknath and Kanpanath in Encyclopaedia of Religions and Ethics)। Geuseppe Tucchi বলেন—"Nath Siddhas tried to harmonise Buddhism and Hinduism." অর্থাৎ নাথসিদ্ধারা বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সমন্বয় সাধন করেন। Sir Charles Eliot বলেন ১৪শ শতকে নাথদের প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই নাথদের পূজা করিত। (Hinduism and Buddhism, Vol 2, Page 117) সুতরাং দেখা যাইতেছে নাথাচার্যেরাই বৌদ্ধধর্মে নাথধর্ম আনয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

মনের কথা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি শক্তি আছে। আমরা চোখ দিয়া দেখি, কান দিয়া শুনি, নাক দিয়া ঘ্রাণ লই, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ এবং ত্বক দ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। এই সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখিতেছে। আমাদের দেহের বাহিরের যাহা কিছু ঘটনা, যাহা কিছু ব্যাপার সমস্তই ইন্দ্রিয়পথে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় জগৎকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভ্যন্তরে গ্রহণ করি। একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে আমরা জগতের একাংশ উপভোগে বঞ্চিত হই, আমাদের কষ্ট হয় অসাধারণ। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে আমরা বাঁচিতেই পারি না। ইন্দ্রিয়ের শক্তিতেই আমাদের শক্তি, তথাপি ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি থাকিলেও তাহারা শক্তিহীন।

আমাদের দেহ জড়। ইহার মধ্যে প্রাণ নামক শক্তি না থাকিলে ইহা কোন কাজেই লাগে না। অকেজো চিঠি-পত্রের মতই ইহাকে ফেলিয়া দিবার দরকার হয়। চোখ, কান, নাক প্রভৃতি জড়-অঙ্গের এক একটি অংশ বা প্রত্যঙ্গ জড়দেহের অংশ বলিয়া জড়, তাই শক্তিহীন। একটা তৃতীয় শক্তি সর্ব্বদাই ইহাদের পিছনে থাকিয়া ইহাদিগকে চালিত করিতেছে। এই চালকই মন।

চোখের সঙ্গে মন থাকে বলিয়া দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়। কানের সঙ্গে মন থাকে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। মনোযোগের অভাবে সকল কার্য্যই অসিদ্ধ। আমরা যখন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাজ করি, মনকে তখন অন্যদিকে না রাখিয়া সেই কার্য্যের মধ্যে আনিতে পারিলেই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মনোযোগের অর্থ—যে কাজ করি, সেই কাজের সহিত মনের যোগ।

মন একটি বস্তুবিশেষ নয় যে, হাতে করিয়া আনিয়া কোন কাজের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া যায়। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা কার্য্য সম্পাদন হয়, সেই ইন্দ্রিয়-পথেই মন বাহিরের কাজের মধ্যে আসে। পড়া মুখস্থ করিবার সময় মনের যোগ হইলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়। যাহার মন অন্যদিকে যায়, তাহার সমস্ত দিনেও মুখস্থ হয় না। কোন পড়া একবার পড়িলে আয়ত্ত হয়, কোনটা দশবারেও হয় না। ইহার কারণ, যেটা বেশী ভাল লাগে, সেটার মধ্যে মন নিবিষ্ট হইয়া বসে, মুখস্থও হয় সত্বর। সেই রকম, আমরা সমস্ত দিনই চোখ খুলিয়া থাকি। দেখিবার সামগ্রী অনেক কিছুই থাকে। তাই বলিয়া সব কিছুই আমরা দেখি না। ইহার কারণ, সকল সময় মন দেখিবার কাজে থাকে না। সেইজন্য পাশ দিয়া চেনা লোক চলিয়া গেলেও অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই না, যখন কোন কাজে নিবিষ্ট হইয়া থাকি, তখন কেহ ডাকিলেও শুনিতে পাই না; অনেক বার ডাকিলে তবে শোনা যায়। কারণ মন তখন কানের পথে থাকে না। যাহাদের একাগ্রতা অধিক তাহারা দশবার ডাকেও

শুনিতে পায় না। অতিরিক্ত মনোযোগী ব্যক্তিরা সহজেই উন্নতি লাভ করে; কেন না, কাজের সময় তাহাদের মন একাগ্র থাকে। ঢাক পিটাইলেও তাহাদের মনোযোগ নষ্ট হয় না।

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ গৌরীশঙ্কর দে'র জীবনে এই রকম একটা ঘটনা শুনা যায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেক সময় কাগজ ও পেন্সিলের অভাবে ঢিল দিয়া মাটি বা ভূমির উপর অঙ্ক কষিতেন। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাস্তার ধারে একটা রোয়াকে বসিয়া তিনি অঙ্ক কষিতেছেন, এমন সময় একটি বিরাট শোভাযাত্রা সেই পথ দিয়া চলিয়া যায়। অঙ্ক কষা শেষ হইলে অপর বালকের সহিত কথা বলিতে গিয়া তিনি ঠকিয়া গেলেন। অতবড় শোভাযাত্রার বাদ্য, কলরব, হৈ চৈ তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। বালক গৌরীশঙ্কর এত মনোযোগী ছিলেন যে, বাহিরের যথেষ্ট আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়ের পথে মন কিছুতেই আসিতে পারে নাই। এই রকম উদাহরণের ছোটখাট পরীক্ষা প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। অন্যমনস্ক থাকিলে যে অনেক শব্দ এবং অনেক দ্রষ্টব্য গ্রহণ করা যায় না, ইহা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে। তবে, যার মনোযোগের সাধনা বেশী, তার জীবনেই গৌরীশঙ্করের মত ঘটনা সম্ভব।

মনকে কোন কিছুর মধ্যে আটকাইয়া রাখিলে অনেক অজানা বস্তুর সন্ধান মিলে। অনেক সমস্যা, অনেক জ্ঞাতব্য আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাতে আনন্দও হয় প্রচুর। সাধু-সন্ন্যাসীরা দারুণ শীতে পাহাড়ের উপর, ভীষণ গ্রীষ্মে আগুনের ধারে বসিয়া মনঃসংযম অভ্যাস করেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের বুঝি খুবই কষ্ট হয়। বাস্তবিক, কষ্ট তাঁহারা বেশী পান না। গৌরীশঙ্করের মতই তাঁহারা মনকে স্বেচ্ছায় একটি বিশেষ বস্তুর মধ্যে আটকাইয়া রাখেন। উঁহাদের মনের বৃত্তি আয়ত্তাধীন হইলে মনোযোগ দৃঢ় হইতেছে বুঝিতে হইবে। অনর্থক দেহকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে চেষ্টা করেন না।

মন একটি। কাজেই একই সময়ে একটার বেশী ইন্দ্রিয়পথে তাহার যাতায়াত অসম্ভব। সেই জন্যই আমরা একসঙ্গে দুইটি কাজ করিতে পারি না। হাতে কাজ করিয়া মুখে কথা কহিতে গেলে একটি কাজ খারাপ হইবেই। মন চঞ্চল বলিয়া একবার কথার দিকে এবং একবার কাজের দিকে বেড়াইবে। মন যখন যার মধ্যে থাকে, তখন সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। কাজের দিকে মন গেলে কথা এলোমেলো হয়, আর কথার মধ্যে মন গেলে কাজে ভুল হইয়া যায়।

আমাদের ইন্দ্রিয়পথগুলি সব সময়েই খোলা আছে। দেখা, শোনা, কথা বলা কতবারই এক সঙ্গে হইয়া যায়। ইহা হয় কেমন করিয়া? বায়স্কোপ, থিয়েটারে দেখা এবং শোনার কাজ এক সঙ্গেই হয়। মন যদি একই সময়ে একের অধিক ইন্দ্রিয়পথে যাইতে না পারে, তবে এ সমস্ত সম্ভব হয় কি ভাবে?

ইহাদ্বারা মন যে চঞ্চল, তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া মন এত দ্রুত যাওয়া আসা করে যে আমরা সময়ের পার্থক্যটুকু বুঝিতেই পারি না। আমাদের মনে হয় যেন, মন একই সময়ে স্থানে যাইতেছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, একই সময়ে দুইটি পথে মন যায় না। নাটক দেখিতে গিয়া যখন পোষাক বা রূপের দিকে আকৃষ্ট হই তখন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কথা বুঝা যায় না। আবার কথা বা সুরের দিকে অধিক মনোযোগ দিলে রূপসজ্জার দিকে লক্ষ্য থাকেনা। এ জিনিষটা অতি অল্প চেষ্টাতেই

বুঝা যায়। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে শিক্ষকের বলিবার ভঙ্গীর উপর নজর দিয়া আমোদ উপভোগ করে; কিন্তু ইহা খুব সত্য কথা যে সে সময় তাহারা পড়া কিছুই শুনিতে বা বুঝিতে পারে না। দর্শন-ইন্দ্রিয়ের পথে মন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শ্রবণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তিহীন। তাহা হইলে এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে মন একই সময়ে একের অধিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাইতে পারে না। একটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একসঙ্গে মন অতি অল্প সময় দাঁড়ায়—কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। এক মিনিট ধরিয়া রাখিতে পারিলে মনের শক্তি আছে জানিতে হইবে।

কোন শব্দের দিকে কান বা কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে কিছুক্ষণ বাদে বুঝা যায়, দৃষ্টি সেখানেই আছে, মন কোথায় কত দূর চলিয়া গিয়াছে, টেরও পাওয়া যায় না। বহু দিন চেষ্টা করিয়া মনকে সেখানে ধরিয়া রাখিলে দেখা যায়, বস্তুটার মধ্যেই দৃষ্টিটা এক পাশ হইতে আর এক পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটা ছোট পেরেকের মাথায় দৃষ্টি রাখিলেও দেখা যায়, তারই মধ্যে মন বিচরণ করিয়া তার চঞ্চল নাম সার্থক করিতেছে। একটা বিষয়ের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মনকে আটকাইয়া রাখিতে পারিলে সে সেখানে এমনই আনন্দ পায় যে তখন আর অন্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাইতে চাহে না। সেই অবস্থায় অনেক সময় ঢাক পিটাইলেও সাড়া পাওয়া যায় না। এমন কি যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মন স্থির করিয়াছিল তাহাও ভুলিয়া যায়। শুধু একটা মত্ততায় বিভোর হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ জ্যামিতিকার ইউক্লিড সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি সর্বদাই জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। যখন কোন সমস্যার সমাধান হইত তখন তাহা অপরকে বুঝাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তখন সামনে যাহাকে পাইতেন তাহাকে ধরিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। একদিন তিনি পথ চলিবার সময় চিন্তা করিতে করিতে একটা Theorem-এর সমাধা করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় পথ দিয়া এক জন ঝাড়ুদার যাইতেছিল। তিনি তাহাকেই ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন। "ওহে শোন, একটা ভারি মজা আছে।" সে দাঁড়াইল না এবং বলিল "আমার সময় নেই।" পণ্ডিতপ্রবর তাহার জামার একটি বোতাম ধরিয়া বলিলেন,—"শোনই না, ভারি আরাম পাবে! এই ধর, একটি জিনিষ আর একটি যে কোন জিনিষের সঙ্গে কেমন মিলে যায়।" সে ব্যক্তি শুনিবে না। ইউক্লিড্ তাহার বোতামটি ধরিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে সে ছুরি বাহির করিয়া বোতাম কাটিয়া চলিয়া গেল। শুনা যায় ইউক্লিড্ অনেকক্ষণ বোতাম ধরিয়া সেখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পথ দিয়া কত লোক চলিয়া গিয়াছে, সকলেই তাঁহাকে পাগল ছাড়া কিছু ভাবে নাই। ইহা অসাধারণ মনোযোগের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনকে আটকাইয়া রাখিলে অন্য ইন্দ্রিয়ের পথ বন্ধ হইয়া আসে। তখনই সত্যের সন্ধান মিলে। এক অপরূপ আনন্দে মানুষ তখন আত্মহারা হইয়া থাকে। জগতে বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্টই পাওয়া যায়।

কাফির

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থান কাল হইতেই কাফির ও ইসলাম-ধর্ম্মিগণের মধ্যে জেহাদ[1] আরম্ভ হইয়াছিল। যে কোনও দেশে নূতন কোনও রীতি, নীতি বা ধর্ম্ম-মতের পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই প্রাচীন রক্ষণশীল জন-সমূহের সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ইসলাম ধর্ম্মের প্রারম্ভেও ইসলামীয় রীতি, নীতি ও তদ্ধর্ম্মীয় আচরণের অভিনবত্ব প্রাচীন আরব ও পারস্যের অধিবাসীরা সহজে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং উভয়বিধ মতানুযায়ীদিগের মধ্যে বিরোধ ও 'জঙ্গ' বা যুদ্ধ হওয়া অতি স্বাভাবিক।

ইসলামধর্ম্মিগণ আরব ও পারস্যের আদিম অধিবাসিগণকে 'কাফির' বলিতেন। 'কাফির' শব্দটী আরবী; এবং ইহার আভিধানিক অর্থ[2]—'পোশীদাহ্ করনেওয়ালা, ছিপানেওয়ালা'। ফারসীতে 'পোশীদন' শব্দের অর্থ 'গোপন করা'। যাহারা 'খুদা' বা ঈশ্বরকে গোপন করিয়া থাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে মানে না, তাহাদিগকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ইসলাম-ধর্ম্মিগণ 'কাফির' বলিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কয়েক শতাব্দী পরে যখন তাঁহারা দিগ্‌বিজয় করিতে করিতে ভারতবর্ষে পৌছিলেন, তখন হইতে ভারতীয় হিন্দুগণের জন্যই কেবল এই শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। ইহার ব্যুৎপত্তি এই সময়ের বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাহা হইলে 'হিন্দু'র সহিত 'কাফির' শব্দের যোজনা কি করিয়া ও কখন হইতে হইল, ইহাও বিবেচ্য।

হিন্দুগণ 'খুদা' বা ঈশ্বরকে 'পোশীদন' বা গোপন করেন না। হিন্দুগণের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল জাতি দেখা যায় না। সুতরাং জোর করিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসী হিন্দুগণকে মুসলমান-রাজ্য-বিস্তারের পরবর্ত্তী কালে 'কাফির' শব্দদ্বারা অভিযুক্ত করা হইলেও মৌলিক ইসলাম-ধর্ম্মিগণ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক ব্যক্তিগণকেই আরব ও পারস্যদেশে 'কাফির' বলিতেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে পারস্য আদি দেশেও সে সময়ে 'হিন্দু'দিগের বসবাস ছিল। আমরাও ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এতদ্বিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে ঐ পারস্য আদি দেশ-নিবাসী তদানীন্তন 'হিন্দু' ও ভারতবর্ষীয় 'হিন্দু' এক কি না?

ফারসী ভাষাতে 'হিন্দু' শব্দের 'মুহাবরা' (অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যবহারিক গ্রাম্য ভাষা) অর্থ[3] হইতেছে—'চোর', 'ডাকাত' ও 'গোলাম'। পারস্যবাসিগণ স্বদেশবাসী 'হিন্দু'গণকে এই সকল শব্দে কেন অভিহিত করিতেন, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

পারস্য আদি দেশ হইতে এদেশে আসিতে গেলে সর্ব্ব-প্রথম প্রধান 'দরিয়া' সিন্ধু-নদী

১ 'জেহাদ' শব্দটি আরবী। ইহার অর্থ হইল 'লিজা' বা 'কাফিরোঁসে লড়না'। কেবল ধর্ম্মের জন্যই নহে, ধন, দৌলত ও রাজ্য যে কোনও কারণে কাফির-আদির সঙ্গে লড়াই করাকেই 'জেহাদ' বলে। পরবর্ত্তী কালে এই শব্দটি ধর্ম্ম-যুদ্ধ অর্থে রূঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

২ "লুগাত কিশোরী"; পৃষ্ঠা ৩৭৫।

৩ ফারসী অভিধান "লুগাত কিশোরী", পৃষ্ঠা ৫৭৪

পড়ে। এই সিন্ধু-নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ও পূর্ব্ব-প্রান্তীয় যে সকল লোক পারস্য আদি দেশে গিয়াছিলেন ও যাঁহারা এই নদীদ্বারা উপলক্ষিত দেশে নিবাস করিতেন, তাঁহাদিগকেও পারস্য-আদি দেশবাসীরা 'হিন্দু' বলিতেন। 'সিন্ধু'র 'স' 'হ'তে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় সর্ব্বত্রই 'স'-কে 'হ' বলিবার রীতি বা ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন হিন্দী ও উর্দ্দুতে 'সপ্তাহ' হইতে 'হপ্তাহ' হইয়াছে। (শেষের 'হ' হসন্ত) এখনও পূর্ব্ববঙ্গে চলিত ভাষায় অনেক স্থানে 'স' কে 'হ' বলিতে, যেমন 'সে লোকটা'কে 'হে লোগডা' বলিতে শুনা যায়। অন্য পক্ষে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক শব্দ-জন্য 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি না ধরিয়া প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেও যদি এই 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ ধরা যায় ও ভারতবর্ষীয় বিশিষ্ট ধর্ম্ম-মতানুগামী সম্প্রদায়কেও 'হিন্দু' বলা হয়, তাহাতেও আমাদের কোনও আপত্তি নাই। এই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ গ্রহণেও আমাদের বক্তব্যের সহিত কোনও বিরোধ হইবে না।

ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান হইতে যাঁহারা ভারতের বাহিরে নানা দিগ্‌দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এ দেশ হইতে প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণই ধর্ম্ম-প্রচারাদি নানা উদ্দেশ্যে ভারতের বাহিরে চারি দিকে নানা দেশে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মিগণই ঈশ্বরকে 'গোপীদন' বা গোপন করিয়া থাকেন; তাঁহারাই ইসলাম বা হিন্দু-ধর্ম্মীদিগের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। সুতরাং আরব ও পারস্য আদি দেশবাসিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী স্বদেশবাসী বৌদ্ধ ও অন্যান্য নাস্তিক জন-সমূহকেই 'কাফির' বলিতেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বৌদ্ধ আদি সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল ব্যক্তি হিন্দুস্থান (ভারতবর্ষ) হইতে পারস্য আদি দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তাঁহারা 'হিন্দু' শব্দ দ্বারাই অভিহিত করিতেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী 'হিন্দু' নামক যে এক রূঢ়ার্থ-যুক্ত শব্দদ্বারা অভিধেয় অন্য জাতি-বিশেষ আছে, তাহা জানিতেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'মুহাবরা' বা 'চলতী বোলী'-তেই (গ্রাম্য ভাষা) 'হিন্দু' শব্দের অর্থ ফারসীতে 'চোর' বা 'ডাকাত'। যাহারা বিদেশে দলবদ্ধ ভাবে যায় ও নিজেদের গ্রাম বা জমি-জমা আদি সম্পত্তি থাকে না, তাহা-দিগকে স্থানীয় অধিবাসিগণ চোর বা ডাকাত আদি অবশ্যই ভাবিতে পারে। বাঙ্গালা দেশেও যে সকল 'ইরাণী' বা অন্য জাতীয় যাযাবর ব্যক্তিগণ যাইয়া থাকে, তাহাদিগকেও গ্রাম-বাসিগণ চোর, ডাকাত ও দুষ্ট লোক রূপ আখ্যা দিয়া থাকে। তাই বলিয়া সকল 'ইরাণী' জাতিই চোর বা ডাকাত এবং দুষ্ট স্বভাবের বলিয়া মনে করিয়া লওয়া অন্যায় ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। এইরূপ পারস্য দেশের গ্রামবাসি-গণ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণই হিন্দুস্থান হইতে আগত বৌদ্ধাদি ব্যক্তিগণকে 'হিন্দু' বলিয়াই জানিত ও তাঁহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত বলিয়াই 'হিন্দু'কে চোর বা ডাকাত মনে করিত।

সুতরাং বাঙ্গালায় ইরাণীগণকে চোর, ডাকাত ও দুষ্ট লোক রূপে মনে করিবার মতই পারস্যের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তদ্দেশবাসী হিন্দুকেও চোর ও ডাকাত মনে করায় 'হিন্দু' শব্দের চলতি অর্থ ('ইরাণী' শব্দের মতই) সে দেশে চোর ও ডাকাত হইয়াছিল; এবং তাঁহারা ঐ সকল বৌদ্ধাদি অর্থাৎ হিন্দুস্থান হইতে আগত ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক ব্যক্তিগণকেই 'কাফির' বলিতেন। এই প্রকার ঐতিহাসিক ও বিদেশীয় তথ্য-বিষয়ে বিরাট্ অজ্ঞতার জন্যই কোনও কোনও

ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় হিন্দুকেও 'কাফির' শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন।

এবংবিধ শাব্দিক ও আভিধানিক পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সকল ঈশ্বর-বিশ্বাসী হিন্দুগণ 'খুদা' বা ঈশ্বরকে 'পোশীদন' বা গোপন করেন না, তাঁহারা আরবী 'কাফির' শব্দ বা ফারসী ভাষার 'হিন্দু' শব্দ দ্বারা অভিধেয় জাতি বা ব্যক্তি কোনও প্রকারেই হইতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক পারস্য-নিবাসী তথাকথিত 'কাফির হিন্দু'গণের সদৃশ না হওয়ায়, ভারতবর্ষীয় ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী, আদর্শ শ্রদ্ধাশীল ও নির্ব্বিরোধবিশিষ্ট ঈশ্বর-ভক্ত হিন্দু-সম্প্রদায় যথার্থ ও পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্মিগণের নিকট কোনও প্রকারেই 'কাফির' শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না।

সুতরাং, বাঙ্গালার বা ভারতের কাফিরদের সঙ্গে 'জঙ্গ' বা 'জেহাদ'-ঘোষণাকারী ব্যক্তিগণ পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা কতখানি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা সুধী 'আইন' ও 'দরবেশ' এবং কুরাণমজীদের 'আয়াত'-সমূহের বিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেরই বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। কুরাণ-মজীদের তৃতীয় "সীপারা"তে (অধ্যায়) প্রারম্ভে স্পষ্ট বলা হইয়াছে—

"লা এক-রাহা ফী-(ইল্-)-দীন"

—অর্থাৎ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মজহব বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ জবরদস্তী বা জঙ্গ বা লড়াই করা যাইতে পারে না; ইহা ইসলাম-ধর্ম্ম দ্বারা নিষিদ্ধ। ইসলাম-ধর্ম্মীদের বিরোধ কেবল তাহাদেরই সঙ্গে, যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক 'কাফির'। অতএব বাঙ্গালা বা ভারতের ঈশ্বরাস্তিত্বে পরম বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল হিন্দু-গণের সঙ্গে যথার্থ ইসলাম-ধর্ম্মের কখনও কোন বিরোধ বা 'জেহাদ'-ঘোষণা হইতে পারে না।

সুতরাং বেদান্তাদি-মার্গ এবং হিন্দু, ইসলাম ঈশাই আদি ধর্ম্ম-সমূহের সকল অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস-সঙ্গত মতানুসারে সাধনা করিয়া যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্ম-মতকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও জগতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় ও সর্ব্ব-মত-সহনশীলতার অপূর্ব্ব শিক্ষা এবং আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আদর্শে বাঙ্গালা ও ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, প্রেম ও সমভাব প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমাদের সকল ধর্ম্ম-মতাভিহিত ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শি নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানায় সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বৈদিক ধর্ম্ম ও খৃষ্টসাধনা

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বেদবিজ্ঞানের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের কতগুলি মৌলিক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যসমূহ এমনই যে মনে হয়—একটি অন্যটিকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব, যাহা তাহার আচার-ধর্ম্ম, তাহা বেদবিজ্ঞান ও বেদাচারের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

বেদের বয়ঃক্রম, প্রতীচ্যপ্রথায় নিরূপিত হইয়াছে—খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় সহস্র বৎসর। এদিকে সর্ব্বজন-অভিমত যে—খৃষ্টের আবির্ভাবকাল মাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে। অতএব বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্ম বহু অর্ব্বাচীন। বেদ অপেক্ষা বাইবেল বহু কনিষ্ঠ।

বেদসিদ্ধান্তে বাক্ই ব্রহ্ম। বাগ্ বৈ ব্রহ্ম। বাক্ শুধু ব্রহ্মই নহেন, এই বাক্ তাঁহার স্বদেহ দিয়া নিখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋগ্-বেদের দশম মণ্ডলে স্বয়ং বাক্ দেবতা বলিতেছেন :—

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।

ঊর্দ্ধলোকে পিতা দ্যৌকে আমি প্রসব করিয়াছি। আমার গর্ভ রহিয়াছে অন্তঃসমুদ্রে।

বাক্রূপী ব্রহ্ম আবার বলিতেছেন :—অহমেব বাত ইব প্রবামি—আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা—বিশ্বভুবন নির্ম্মাণপ্রবৃত্ত হইয়া বায়ুর মত আমি সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই।

ছান্দোগ্যশ্রুতি বাক্ দেবতার উক্তির ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিতেছেন—গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ—নিখিল ভূতসত্তা যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সমস্তই গায়ত্রী। এই গায়ত্রীই বাক্—বাক্ বৈ গায়ত্রী। আরও স্পষ্ট করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ ঘোষণা করিতেছেন —বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।

খৃষ্টীয় শাস্ত্রকারগণও বেদের ঋষিগণের সম-বোধিসম্পন্ন হইয়া বলিয়াছেন—বাগ্ বৈ ব্রহ্ম। ইহার সঙ্গে Word is God তত্ত্বটির সৌসাদৃশ্য অনুধাবন-যোগ্য। বাগ্ বৈ ব্রহ্ম এবং Word is God একই তত্ত্ব—কেবল ভাষার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়া অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

বেদসিদ্ধান্ত সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শুধু ব্রহ্ম বাক্। বাক্রূপী ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম। খৃষ্ট-তান্ত্রিকগণও ঐ সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—"In the beginning was God". খৃষ্ট-পন্থীর এই word বেদপন্থীর শব্দব্রহ্ম।

বৈদিক ধর্ম্মের ও খৃষ্টপদ্ধতির সৌসাদৃশ্যের পরিসমাপ্তি এইখানেই নহে। খৃষ্টতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত —"In the beginning was the word and the word was with God, and the word was God. All things made by Him."

এইবার ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ বাক্সূক্ত এবং ছান্দোগ্যশ্রুতির 'বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ'-এর অভিন্নত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না। বেদের বাক্ই ব্রহ্ম। স্বয়ং বাক্ আপনার ব্রহ্মত্ব ঘোষণা করিতেছেন :—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

শ্রুতিসিদ্ধান্তের সহিত খৃষ্টতত্ত্বের আরও রহিয়াছে। "ঈশ"-শ্রুতির নির্দেশ পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তাই শুধু অবতার, শুধু ঈশ্বরকোটি মানবই পূর্ণ নহে, প্রত্যেক জীবই পূর্ণ, প্রত্যেকই ব্রহ্ম।

খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের সন্তান—Son of God. এ কথা অন্যের নহে, প্রকৃত খৃষ্টপন্থী একথা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি সন্তান হইলেও পূর্ণ ঈশ্বর। Nicene Creed খৃষ্টের পূর্ণতা এই ভাবে মান্য করিয়াছেন:— "We believe in one God, the father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one lord, Jesus Christ, the word of God from God."

সিদ্ধান্তটি আরও একটু স্পষ্টতর ভাষায় স্বয়ং খৃষ্টদেব বলিয়াছেন—"I and my father are one." উপনিষৎপ্রচারিত অহং ব্রহ্মাস্মি তত্ত্বের সহিত খৃষ্টের আমি ও আমার পিতা এক এই উক্তির কি বিভিন্নতা আছে? শব্দের প্রয়োগ ও ভাষার বিভেদ ব্যতীত সিদ্ধান্তটির মর্ম্মবস্তু একই।

খৃষ্টান ঈশ্বরের দ্বৈতত্ব স্বীকার করে না—There is but one God. এইটুকু বলিয়া খৃষ্টানের তৃপ্তি হয় নাই, সেইজন্য ঈশ্বরের অদ্বৈত সত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন but not two Gods. কিন্তু যিশু মেরীনন্দন হইয়াও ঈশ্বর। এই ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য খৃষ্টীয় ঋষিদিগকে একই সত্য বারম্বার বলিতে হইয়াছে—খৃষ্ট True God, very God, perfect God. কেন অংশ অংশী না হইয়াও পূর্ণ হইলেন? ইহার উত্তর দিয়াছেন ঔপনিষদিক ঋষি—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। এইবার Nicene Creed এর অঙ্গীকারটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে God from God শ্রুতিসিদ্ধান্তের পুনরুক্তি মাত্র। Very God from very God. আর পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—একই সিদ্ধান্তের দুইটি রূপ।

শাশ্বত সত্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যসমাজেই একরূপে আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান? তাহাতেও দেখিতেছি যে বৈদিক ঋষির সহিত খৃষ্টান যাজকের আচারগত একটা ঐক্য রহিয়াছে।

খৃষ্ট জগদ্ধিতায় ক্রুশে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন। খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তটি এইরূপ—"Man's sin was so great that God only could pay it, therefore one must pay it who is God and man. * * * * The son of God died for man."

এইবার বেদের পুরুষসূক্তের কথাটি অনুধাবন করিতেছি। পরম পুরুষ যিনি তিনিই হইলেন যজ্ঞিয় পশু—'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।' এই যজ্ঞিয় পশুই কি খৃষ্টানের bond man নহেন? ব্রহ্ম যজ্ঞিয় যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিলেন, পশুপতি হইয়াও পশু হইলেন, আর খৃষ্টদেব perfect God হইয়াও ক্রুশে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। যূপই খৃষ্টানের ক্রুশ। খৃষ্টানে ও বেদপন্থীতে আর একটি সাদৃশ্য আছে—বৈদিক ইড়া ভক্ষণ খৃষ্টপন্থীর ইউকেরিষ্ট ভক্ষণ। খৃষ্টানে ও বৈদিক ধর্মাবলম্বীতে এ সৌসাদৃশ্য কিরূপে হইল, ঐতিহাসিকগণ তাহা অনুসন্ধান করিবেন।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রয়াগতীর্থে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মেটার্লিঙ্কের একটি প্রবন্ধে আছে: We are there in life, man against man, soul against soul, and day and night are spent under arms. জীবনের পথ দিয়ে আমরা চলেছি—কিন্তু কারও সঙ্গে কারও প্রীতির সম্পর্ক নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, আত্মার সঙ্গে আত্মার সংঘর্ষ লেগেই আছে। আমাদের সকলেরই হাতে উদ্যত খড়্গ। আমাদের সকলেরই অন্তরে উগ্র হয়ে রয়েছে ভেদবুদ্ধি। We never see each other, we never touch each other. আমরা কেউ কাউকে চোখ মেলে কখনো দেখলাম না, ভালোবেসে কারও হাতে হাতে রাখলাম না। We see nothing but bucklers and helmets, we touch nothing but iron and brass. জীবনের পথে যেতে যেতে আমাদের কোলাকুলি শুধু বর্মে বর্মে, বুকে বুকে নয়। প্রতিবেশীর মাথায় যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ এবং হাতে গুলিভরা পিস্তল ছাড়া তার আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। প্রতিবেশীর মধ্যে আমরা দেখি কেবল বৈরনির্য্যাতনস্পৃহাকে, তাকে মনে করি একটা হিংস্র বাঘ।

মানুষের মধ্যে একটা বন্যশূকর দাঁত উঁচিয়ে আছে—এতে কোন সন্দেহ নেই। ডারউইনপন্থীরা ব'লে থাকেন, Man is barbarous in the core. Civilisation is only skin-deep. মানুষের ভিতরে রয়েছে আদিম বর্ব্বর। সভ্যতা শুধু চামড়ার নীচে পর্য্যন্ত। কথাটা একদিক দিয়ে সত্য। মহাযুদ্ধে পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেল নররক্তের মহাপ্লাবন। হাজার হাজার মানুষ হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে প্রতিবেশীদের বুকে বসিয়ে দিয়েছে আমূল ছুরিকা। নিশার আকাশ থেকে সুরু হয়েছে বোমাবৃষ্টি। শিশু আর নারী মরেছে হাজারে হাজারে। মানুষের অন্তরের গভীরে রয়েছে একটা নোংরা কসাইখানা। যুদ্ধের মধ্যে এই তিক্ত সত্যেরই ইঙ্গিত। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বর্ব্বরনৃত্যের মধ্যেও নরমাংসভোজী আদিম মানুষের হিংস্রতারই অভিব্যক্তি। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে জড়ো হ'য়ে সুরু ক'রে দিল বর্ব্বরতার অভিযান। যারা একসঙ্গে পাশাপাশি বাস ক'রে এসেছে পুরুষানুক্রমে—সেই নিকটতম প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ী পুড়ে গেল অগ্নিশিখায়, তাদের কন্যারা হলো ধর্ষিতা, তাদের রক্তধারায় পৃথিবী হোলো কলঙ্কিত। এই হিংস্রতার মধ্যে মানুষের স্বভাবকে যে আদিম বর্ব্বর এখনও আঁকড়ে আছে তারই প্রকাশ। এই বর্ব্বরকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু এই বর্ব্বরতাই মানুষের সবটুকু নয়। বর্ম্মের নীচে ঢাকা রয়েছে শিশুর নির্ম্মল হাসির মাধুর্য্য। আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি a combination of strength and weakness. আমাদের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আমাদের স্বভাবের মধ্যে রাম-রাবণের লড়াই সর্ব্বদাই চলেছে। সমস্ত দুর্ব্বলতা নিয়েও মানুষমাত্রেই অন্তরে বহন ক'রে চলেছে একটি অনির্ব্বচনীয় সুষমা, আলোর একটি চিরপবিত্র শিখা। বর্ম্মপরা যে মানুষটি চলেছে হাতে বর্শা

নিয়ে—বাইরে থেকে তাকেই আমাদের চোখে পড়ে। চোখে পড়েনা বর্শ্মের আড়ালে ঢাকা আর একটি মানুষকে যাকে কবি বলেছেন, the man within the man.

"দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি, ল'য়ে গেল সবে মাটির ঢেলা।" এই দেবতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে—যেমন রয়েছে তার মধ্যে হিংস্র অসুরটা। "যারে তুই ভাবিস ফণী তারও মাথায় আছে মণি।" মানুষের মধ্যে এই দেবতাকে দেখতে পারলে তবেই তাকে ভালোবাসা যায়। মেটার্লিঙ্ক বল্‌ছেন, To learn to love, one must first learn to see. ভালো যদি বাসতে চাও তবে আগে দেখতে শেখো মানুষের অপাপ-বিদ্ধ আত্মার চির-অম্লান মাধুর্য্যকে। For to love one's neighbour does not mean only to give oneself to him, to serve, help, and sustain others. প্রতিবেশীকে ভালোবাসা মানে শুধু পরোপকার করা নহে, সেবাকার্য্য নহে। We may possibly be neither good, nor noble, nor beautiful even in the midst of the greatest sacrifice; and the sister of charity who dies by the bedside of a typhoid patient may perchance have a mean, rancorous, miserable soul. মেটার্লিঙ্ক বলছেন, বৃহত্তম ত্যাগের মধ্যেও আমাদের হৃদয়টা অত্যন্ত হীন এবং নোঙ্‌রা থাকতে পারে। ভিতরে নোংরামি আর ক্ষুদ্রতা নিয়েও মানুষের পক্ষে চরম আত্মোৎসর্গ করা বিচিত্র নয়। মেটার্লিঙ্ক এখানে একটা বিরাট সত্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করছেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মানুষের উপকার করাটা সকলের বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হোলো মানুষকে ভালবাসতে পারা, আর প্রতিবেশীকে ভালোবাসার অর্থ হোলো তাঁর মধ্যে যা সর্ব্বোত্তম, যা পবিত্রতম, যা অনন্ত, তাকেই ভালোবাসা—to love all that is best and purest in man.

আমরা 'মানবতা' 'মানবতা' ব'লে চেঁচাই। এই মানবতার মধ্যে মানুষকে আমরা কতখানি স্বীকার করি? বনটাই আমাদের চোখে পড়ে, গাছ আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়। আমরা হরিজনপল্লী পরিষ্কার করি, নাইট্‌স্কুলে পড়াই, দেশের মুক্তির জন্য জেলে যাই, আরও অনেক-রকমের বড়ো বড়ো পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাই কিন্তু যাদের উপকার করছি ব'লে আমরা মনে করি তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা কি interested? St. Francis of Assisi সম্পর্কে ইংরেজ লেখক Chesterton লিখছেন, To him a man was always a man and did not disappear in a dense crowd any more than in a desert. তাঁর কাছে প্রত্যেকটি মানুষের মূল্য ছিল। পোপ থেকে আরম্ভ করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্য্যন্ত যে কেউ তাঁর চোখের দিকে তাকাতো বুঝতে পারতো Francis Bernardone was really interested in him. প্রত্যেকটা মানুষকে এমনি ক'রে মর্য্যাদা দিতে পারাটাই হোলো ভালো-বাসার মূল কথা। মানুষ জনতার একটা অংশ মাত্র নয়। মানুষ হোলো নরদেবতা। যত্র জীব, তত্র শিব। এমনি ক'রে যারা মানুষকে নর-নারায়ণ ব'লে সম্মান করতে পেরেছে তাদেরই পিছনে মানুষ দৌড়েছে। রুটি অথবা সোনা দিয়ে তো মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না, শুধু পরোপকারের দ্বারা মানুষকে আত্মীয় ক'রে তোলা সম্ভব নয়। দূরকে নিকটবন্ধু এবং পরকে ভাই করবার একটীমাত্র পথই আছে, আর সেই পথটী হোলো Chesterton যাকে বলেছেন a certain grand manner. অন্যের প্রতি

আমাদের আচরণের মধ্যে শ্রদ্ধার প্রকাশ থাকা চাই। St. Francis হাজার হাজার মানুষকে পরমাত্মীয় করতে পেরেছিলেন। For he treated the whole mob of men as a mob of kings. তাঁর কাছে জনতা তো শুধু লোকারণ্য ছিল না। জনতার প্রত্যেকে তাঁর কাছে ছিল মুকুটহীন এক একজন সম্রাটের মত। সবাইকে তিনি রাজসম্মান দিতে জানতেন।

মানুষমাত্রকেই আমরা এই রাজসম্মান দিতে পারি তখনই যখন তার মধ্যে দেখি image of God. মানুষের মধ্যে এই নারায়ণকে যতক্ষণ নমস্কার করতে না পারছি ততক্ষণ তাকে আমরা ভালোবাসতে পারিনে, আর যাকে ভালোবাসতে পারিনে তাকে আমরা কোন সাহায্যও দিতে পারিনে। মানুষের আত্মা তো সোনার কাঙাল নয়, রুটিরও কাঙাল নয়। সে শুধু প্রেমের কাঙাল। যুগযুগ ধরে সে উপবাসী হয়ে আছে। সে সব পাচ্ছে, পাচ্ছে না কেবল ভালোবাসা, পাচ্ছে না কেবল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাতেই তার পরিতৃপ্তি। তাই মানুষকে যেখানে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি সেখানেই শুধু তার হৃদয়ে আসন পাবার আশা করতে পারি। মানুষকে যেখানে ভালোবাসতে পারিনে, শ্রদ্ধা করতে পারিনে, যেখানে তাকে শুধু করুণা করি, অনুগ্রহ করি সেখানে আমাদের দয়ার দান বিরাট হোলেও তার দ্বারা কিছুতেই তাকে আপন করা যায় না। যেখানে মানুষকে আত্মীয় করতে পারিনে সেখানে তার উপকার করাও সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) লিখেছেন: For Ramakrishna' charity meant nothing less than the love of God in all men ; for God is incarnate in man. Nobody can truly love man and hence no body can help him unless he loves the God in him. মানুষের মধ্যেই নারায়ণ। মানুষকে তারাই সত্যিসত্যি ভালোবাসতে পারে যারা তার মধ্যে দেখতে পারে নারায়ণকে।

মানুষের আত্মার গভীরে সৌন্দর্য্যের যে সম্পদ লুকানো আছে তার কোন কালেই ক্ষয় নেই। মেটার্লিঙ্ক বলছেন, It is unmistakably borne home to us that even the unhappiest and the most destitute of men have at the depths of their being and in spite of themselvss a treasure of beauty that they cannot despoil. যারা সবচেয়ে দুর্ভাগা, সবচেয়ে দুঃখী তাদেরও সত্তার গভীরে এমন একটা সৌন্দর্য্যের সম্পদ রয়েছে যাকে তারা চেষ্টা করেও নষ্ট করতে পারে না। মানুষের মধ্যে এই মহিমাকে, এই সুষমাকে যখন আমরা দেখি তখন আমরা তার প্রতি শুধু কর্ত্তব্য করতে পারিনে, হৃদয়ের জীবন্ত অনুভূতি নিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, তাকে দয়া না ক'রে তার কাছে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিই। হুইটম্যানের কবিতায় আছে:

I give nothing as duties,
What others give as duties I give
as living impulses.

মানুষের মধ্যে যেখানে দেবতাকে দেখি সেখানে কর্ত্তব্যের কথা নেই, আছে হৃদয়ে প্রেমের জীবন্ত অনুভূতি নিয়ে নরদেবতার বেদীমূলে নিঃশেষে আত্মদান। এমনি করে মানুষের অন্তরের চির নির্ম্মল আলোর শিখাকে ভালোবেসে যখন তার কাছে শ্রদ্ধা নিয়ে যাই তখন কি হয়? মেটার্লিঙ্ক বলছেন, There is in this love a force that nothing can resist. এই ভালোবাসার মধ্যে এমন একটা শক্তি থাকে যা দুর্ব্বার, যার

প্রভাবকে স্বীকার না ক'রে উপায় থাকে না। আবার বলছেন, To love thus is to love according to the soul; and there is no soul that does not respond to this love. এই ভালোবাসা হচ্ছে আত্মাকে আত্মা দিয়ে ভালোবাসা আর এমন কোন আত্মা নেই যা এই ভালোবাসার দুর্জ্জয় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে। পাতঞ্জলে আছে, অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। সত্যি সত্যি যদি আমরা যত্র জীব তত্র শিব—এই বুদ্ধিতে মানুষকে ভালোবাসতে পারি—ভালোবাসার দুর্ব্বার শক্তির সামনে শত্রু কখনো শত্রু থাকতে পারে না। ঠিক এই কথাই R. G. Gregg তাঁর The Power of Non-violenceএ বলেছেন। সেখানে আছে: To love is to feel the unity of all life and things and realise it so strongly that all people near us, however vaguely, come to sense it too, and thereby come to have a stronger sense of unity and security. ভালোবাসা মানে সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্যকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা। ভালোবাসলে আমাদের হৃদয়ে এই ঐক্যের অনুভূতি এমন জীবন্ত আর জোরালো হ'য়ে ওঠে যে আমাদের সান্নিধ্যে যারা আসে তাদেরও হৃদয়ে ঐক্যবুদ্ধি সঞ্চারিত হয়ে যায় এবং আমরা তাদের মনে কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করিনে।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তবাদ প্রচার করেছিলেন—মানুষ অন্তরে দেবতা—এই পরম সত্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। জ্ঞানযোগে আছে: "একটী মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের এবং সকল ধর্ম্মের কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।" আজকের দুর্দ্দিনে চারিদিকের আবহাওয়া যখন বিদ্বেষ বুদ্ধিতে বিষাক্ত তখন মানুষকে ভালোবাসতে পারা খুবই কঠিন মনে হোতে পারে। কিন্তু এই বেদান্তের দেশে, উপনিষদের দেশে মানুষকে ভালোবাসা কি সত্যই এত কঠিন? জীবের মধ্যে আমরা তো জানোয়ারকে বড়ো ক'রে দেখিনি, দেখেছি তার মধ্যে দেবভাবকে। তাই ভারতবর্ষই শুধু অমঙ্গলের দিগন্ত-ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ঐক্যের বাণী উচ্চারণ ক'রে কল্যাণের পথ দেখাতে পারে।

"যাহাকে তুমি সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বাবুরাম মহারাজ নামে ভক্তসমাজে পরিচিত। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার আঁটপুর নামক ক্ষুদ্র জনপদে ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতামাতার মধ্যম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সমাধিযোগে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। প্রায় সাতান্ন বৎসর কাল তিনি আমাদের এই হাসি-কান্না ও আশা-নিরাশার মায়া-জগতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর প্রায় আটাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই কাল মধ্যে তাঁহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাপ্রসঙ্গে বা কথোপকথন-আকারে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তগণের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রাবলী ও তদীয় চরিত্র এবং জীবনের উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ-সম্বলিত কোন পুস্তকাদি আজিও প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর অদ্ভুত জীবনচাঞ্চল্য ও ভোগসর্ব্বস্বতার তাণ্ডব নৃত্যের দিনে স্বামী প্রেমানন্দের ন্যায় পরার্থে উৎসর্গীকৃত, নিষ্কলুষ মহাপুরুষের দিব্য-জীবনালোচনার আবশ্যকতা আছে। নিঃস্বার্থ, অকপট প্রেম ও পবিত্রতা এই রক্তমাংসের দেহে গড়া মানুষের জীবনে কিরূপ অপূর্ব্ব মহিমময় রূপ নিতে পারে তাহা বাবুরাম মহারাজের জীবন আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষেরই মত দেহ ধারণ করিলেও তাঁহার দেহবুদ্ধি ছিল না।

তিন ভাই ও এক ভগ্নীর মধ্যে পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তানরূপে শিশু বাবুরামের জন্ম হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণভামিনী দেবী ভক্ত-প্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর পত্রাবলী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত তাঁহাদের পরিচয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। বাবুরাম মহারাজ দেহ-মনে নিষ্পাপ ও নির্ব্বিরোধ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ ও কল্পনা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে উদাসীন করিয়া তুলিত। লতায় পাতায় ঘেরা ছোট একটি নির্জ্জন কুটিরে দিবা-রাত্র সাধনা ও তপস্যায় কাটিয়া যাইতেছে, মাধুকরী ভিক্ষায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে—এইরূপ একটি ভবিষ্যৎ-জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখিতেন। বিবাহের নামে একটা আতঙ্ক, এমনকি জীবনান্ত ঘটিবারও ভয়, যেন সংস্কার-গত ভাবেই তাঁহার মধ্যে আশৈশব সঞ্জাত ছিল। তদীয় পিতার চরিত্র-প্রভাব তাঁহার জীবনে কতটা কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই কিন্তু ভক্তিমতী মায়ের চরিত্র গভীর ভাবে তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য দর্শন ও সস্নেহ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সেবকভাবে থাকিবার অনুমতি, গর্ভধারিণী মায়ের নিকট হইতে বাবুরাম মহারাজ যে-ভাবে

লাভ করিয়াছিলেন, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাহা অনন্যসাধারণ। ধর্ম্ম-ভাবে ভাবিত মাতা সাধারণভাবে বিচার না করিয়া সেদিন পুত্রের যথার্থ কল্যাণ কামনা করিয়াছিলেন এবং দিব্য গুরুর আশ্রয়ে পুত্রের জীবন ধন্য হইলে নিজেও ধন্য হইবেন মনে করিয়া পরম উল্লসিত হইয়াছিলেন।

আঁটপুর ছাড়িয়া সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাবুরাম মহারাজ বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং প্রথমে এরিয়ান স্কুলে, পরে মেট্রোপলিটান্ স্কুলের শ্যামপুকুর শাখায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রধানশিক্ষক ছিলেন এবং সেইকালে তিনি নিয়মিত ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। সারল্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কিশোর বাবুরামের কমনীয় মুখশ্রী মাষ্টার মহাশয়কে যে প্রথমাবধিই আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আবার এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া কতকটা দৈব নির্দ্দেশেই যেন বাবুরাম রাখাল মহারাজকে সহপাঠী রূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং সংস্কারগত প্রেরণাবশে প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি একটা অপার্থিব আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। সহজেই উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের নিবিড় মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং বিধাতার নির্ব্বন্ধে সেই প্রীতি ও সৌহার্দ্দ দিনে দিনে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এবং মধুর হইতে মধুরতর হইয়া আধ্যাত্মিক শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল। বন্ধুত্ব গুরু-ভ্রাতৃত্বে পরিণতি লাভ করিয়া উভয়কে সর্ব্বকালের জন্য মিলিত করিয়া দিয়াছিল।

পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং বাবুরাম মহারাজকে নিজ সৌভাগ্যের অংশ দিবার আগ্রহ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের সেই আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষের মর্ম্মস্পর্শী আহ্বানধ্বনি চিহ্নিত ভক্তগণকে তখন দুর্ব্বার শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছিল। ফলে, বন্ধুবর রাখালচন্দ্রের সহিত বিংশবর্ষীয় যুবক বাবুরাম একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সেদিন দিবাশেষে স্বল্পালোকিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষুদ্রকক্ষে গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন হইয়াছিল। তৈলপ্রদীপের স্তিমিত আলোকে অপাপবিদ্ধ সে মুখখানি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথম দেখিয়াছিলেন, এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বাবুরামের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানা নিজের হস্তে লইয়া কনুই পর্য্যন্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'বেশ'।

প্রথম দর্শনের রজনী বাবুরাম অবস্থা-চক্রে দক্ষিণেশ্বরেই যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই প্রথম রজনীর অভিজ্ঞতাও একটু বিচিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি সেই রাত্রি একরূপ বিনিদ্রভাবেই যাপন করিতে দেখিয়াছিলেন। নরেন্দ্র নামধেয় এক যুবকের জন্য সে ভাবপ্রেমিক পুরুষের কী সকরুণ তীব্র ব্যাকুলতা! এক একবার ঘরে যাইতেছেন, আবার অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় পরিধানের বস্ত্রখানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের অজস্র গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই অব্যক্ত বিরহব্যাকুলতায় "মাগো, তাকে না দেখে আমি যে আর থাকতে পারি না" ইত্যাদি বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছিলেন। বিস্মিত বাবুরাম স্তম্ভিত হৃদয়ে সেদিন ভাবিয়াছিলেন,—কে এই নরেন্দ্রনাথ যাঁর জন্য এই অদ্ভুত পুরুষের এমন অদ্ভুত ভালবাসা!

সে পবিত্র রজনী পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া গেল কিন্তু তাহার মধুময় স্মৃতি বাবুরামের অন্তরের

মণিকোঠায় চির জাগ্রত হইয়া রহিল। প্রভাতে মন্দির ও পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ দেখিবার জন্য তিনি বাহির হইলেন। কিন্তু পঞ্চবটীতে পৌছিয়া অকস্মাৎ যেন তাঁহার চমক লাগিয়া গেল! এস্থান তো তাঁহার একান্ত পরিচিত! যে জনকোলাহলমুক্ত, স্তব্ধ তপোবনের তপস্যা-নিবিড় জীবনস্বপ্ন তাঁহার কিশোর-মনকে আন্দোলিত ও উদাস করিত—ঠিক সেই তপোবনটিই হুবহু বাস্তবে মূর্ত্ত হইয়া এখানে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উল্লাস ও বিস্ময়ে তাঁহার সমগ্র মন পূর্ণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য সঙ্গের সহিত তাঁহার জীবনের সম্বন্ধসূত্র এইরূপেই প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল।

উহার কয়েক দিন পর, এক রবিবার তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ করেছ। আজ নরেন্দ্র এসেছে। তারা পঞ্চবটীতে আছে। যাও, তার সঙ্গে দেখা করগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথমদিন দেখিয়াই বাবুরাম যেমন চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখিয়াও তিনি অনেকটা সেইরূপই বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের পরিচয়েই যেন বুঝিয়াছিলেন কি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই নরেন্দ্রনাথ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন যে এত উৎকণ্ঠিত দেখিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের জন্য সেই প্রথম দর্শনের রজনীটিতে তাহারও হেতু যেন তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন

ইহার পর দিনে দিনে আসা-যাওয়া বাড়িয়াছিল, পরিচয়ের নিবিড়তায় প্রেমসম্বন্ধ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাহচর্য্যে অন্তরের শুভসংস্কার জাগ্রত হইয়া ভগবান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র সত্তা উদ্বেল হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ-মন নিঃশেষে তাঁহার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অপাপবিদ্ধ, স্নেহ-কোমলতায় পূর্ণ এই আধারটিকে একান্ত অন্তরঙ্গ জানিয়া, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি বলিয়া চিনিতে পারিয়া অশেষ স্নেহে চিরকালের জন্য আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাতে 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার'—এই বাক্যের সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের পাঁচ ছয় বৎসরের পরবর্ত্তী যে ইতিহাস—অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ ত্যাগের দিন পর্য্যন্ত সময়ের যে কাহিনী—তাহা বহুরূপে, বহুভাবে শ্রীগুরুর বহুমুখী লীলার অংশভাগী। তুচ্ছ খেলাধূলা, হাসিঠাট্টা হইতে সুরু করিয়া ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বলতম, গভীরতম বিকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও আচরণের মধ্য দিয়া কী স্বাভাবিক, সহজ ও সাবলীল উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যেককে স্ব স্ব পথে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যে পরিচালিত করিতেন এইকাল মধ্যে তাহাই নিজ এবং অন্যান্য সকলের জীবনে তিনি অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা তখন ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট 'করামলকবৎ' বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। অন্তর জীবনের যে কোন অনুভূতি, আধ্যাত্মিক রাজ্যের যে কোন উপলব্ধি শ্রীগুরুর কৃপায় যখন ইচ্ছা তখনই লাভ করা যাইবে এম্নি একটা দৃঢ় বিশ্বাস ইঁহাদের প্রত্যেকের মনে তখন গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি অহেতুকী ভালবাসা ও স্নেহের যে স্পর্শ তখন তাঁহারা এই দেবমানবের নিকট লাভ করিয়াছিলেন তাহা এককালে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ছিল এবং সেই স্নেহ-ভালবাসাই চিরদিনের মত তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, উত্তরকালে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের মুখে আমরা শুনিতে

পাই, 'আবার যদি কখনো এসে জন্মাই তখন না হয় খুব বড় দেখে একটা গুরু খুঁজে নেওয়া যাবে, এবারের মত এ শরীর-মন সে মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।' আরও শুনি, 'একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন। সংসারের অন্যসকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া থাকে।' এইসকল উক্তিরই মত বাবুরাম মহারাজও একদা ভক্তদের কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তিনি আমাদের যেমন ভালবাসতেন তেমনটি কি আর আমরা তোমাদের বাস্‌তে পারি? আহা, সে ভালবাসার তুলনা হয় না। ভাষায় তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না।' বলিতে বলিতে পূর্ব্বস্মৃতির আলোড়নে ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, অপার্থিব আনন্দের মধ্য দিয়া সুখের দিন অতীত হইয়া ক্রমে দুঃখের অমানিশা আগত হইয়াছিল, কঠিন গলরোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলা সম্বরণের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থার কালে অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সহিত বাবুরাম মহারাজও গুরুর সেবায় নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরের বাগানবাটীতে এইকালে ঠাকুরের অসুখ উপলক্ষে দুঃখ ও আনন্দের যে যুগপৎ লীলাভিনয় হইয়াছিল; একদিকে দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর দিন দিন জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া প্রত্যাসন্ন বিদায়ের সুস্পষ্ট আভাসে ভক্তগণকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে আবার অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তির মুহুর্মুহু বিকাশে গৃহী ও ত্যাগী—সকল স্তরের ভক্তগণই দিব্যানন্দে ভরপুর হইতেছেন এবং তাহারই মধ্য দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বীজ রোপিত হইতেছে—নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গুরু ভ্রাতাগণের সহিত বাবুরামও সে সকলেরই সাক্ষী ও অংশভাগী হইয়াছিলেন। দিনের পর দিন এইরূপে অতিক্রান্ত হইয়া পরিশেষে শ্রাবণশেষের সেই চরমদিনটি উপস্থিত হইয়াছিল। রজনীর শেষযামে সহসা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গভীর সমাধি হইল এবং তৎপরদিন ১লা ভাদ্র সেই সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হইল—যুগাবতার লীলাসংবরণ করিলেন। কী মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও বিপদের সে দিন! শ্রীশ্রীমা পরিবর্ত্তী কালে এই দিনটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"যেদিন এগ্নি হবে, খিচুড়ি রান্না হয়েছিল, খিচুড়ি ধরে গেল—নীচেরটা পুড়ে গেল। ...আমার একখানা দিশী কাপড়—আচলদরি ছাতে শুকুচ্ছিল, কে চুরি করে নিলে। পরদিন আমি হাতের বালা খুলতে যাচ্ছি তিনি খপ করে আমার হাত দু'টো ধরে বললেন, আমি কি কোথাও গেছি গো? এই যেমন এঘর আর ওঘর।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই কাশীপুরের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং জীবনের প্রথম অধ্যায়ে ছেদ টানিয়া বাবুরাম ও অন্যান্য যুবক ভক্তগণ সাময়িকভাবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু মহামায়া যাঁহাদিগকে গৃহছাড়া করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছেন, যুগগুরু অদৃশ্য হস্তে যাঁহাদের ললাটে ত্যাগ-চন্দন লেপন করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুদ্র গৃহের তুচ্ছ সুখাকর্ষণ তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবে কিরূপে? তাই অনতিবিলম্বে গৃহাশ্রয়হীন লাটু প্রভৃতি দু'একজন ভক্তকে উপলক্ষ করিয়া বরাহনগরের একটি ভগ্ন বাড়ীতে ধীরে ধীরে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। এই বরাহনগর মঠ ও পরবর্ত্তী কালের আলমবাজার মঠে বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে অনুপম, অপার্থিব ও আদর্শকেন্দ্রিক স্নেহ-ভালবাসায় ইঁহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, দিনে দিনে, মাস-বর্ষে,—উত্তরকালের রামকৃষ্ণমঠ-মিশনরূপ

বিশাল মহীরুহের আলবালে নিরন্তর তপস্যা-সাধনার যে অবিশ্রাম জলধারা সেচন করিয়াছিলেন, সেই অত্যদ্ভুত কাহিনী শুধু রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিবৃত্তে নহে, ইহা সমগ্রজাতির ধর্ম ও আধ্যাত্মিক প্রগতির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। এইকালে শ্রীগুরুর অদর্শনে একান্ত নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব হইয়া ইঁহাদের প্রত্যেকেই মুহ্যমান ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। অজস্র সুখস্মৃতিভরা অতীতকে ঢাকিয়া মহাকাল তাহার কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে, ভবিষ্যৎও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য—তাই, একটানা দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া পদে পদে লড়াই করিয়া বর্ত্তমানের দিনগুলি আর যেন তাঁহাদের কাটিতে চাহিতেছেনা। একদিকে অন্তরের প্রেরণা ঔদাসীন্যের পথে দুর্ব্বার গতিতে টানিতেছে, অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গৃহের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে ; এইরূপ বিপরীত আকর্ষণের নিষ্পেষণে ইঁহারা তখন বিশেষভাবে নিপীড়িত। শুধু অপরাজেয় দিব্য শুভ-সংস্কার, সঙ্ঘনেতা নরেন্দ্রনাথেরই অদম্য মানসিক শক্তি ও প্রেরণা এবং সর্ব্বোপরি লোকোত্তর গুরুর অলৌকিক জীবনের পুণ্যস্মৃতি—সেই নিরাশার যুগের ঘন তমিস্রার মধ্যে পথ দেখাইয়াছিল। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্"—এইরূপ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই তখন অকুতোভয়ে সাধনসমুদ্রের তলদেশ লক্ষ্য করিয়া ডুব দিয়াছিলেন। তথাপি ভিতরের দীন নিরাশ্রয় ভাব, হতাশা ও বিরহের তীব্র হাহাকার ভাবে ভঙ্গীতে, কথায় ও গানে অহরহই প্রকাশ পাইয়াছে। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের এইকালের মনোভাব শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—"বাবুরাম মহারাজের মনের ভাব তখন অতি দীন হীন, একেবারে যেন নিরাশ্রয় হইয়াছেন। সকলের কাছে বিনীত—যেন জোড়হাত করে রহিয়াছেন, কেহ গাল দিলে প্রতিবাদ করিতেন না এবং এত অমায়িক যে তাহার কথা কিছু বলা যায় না ; কাদার মত নরম হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যে কথাগুলি মুখ দিয়া বলিতেন বা যে টুকু কাজকর্ম্ম করিতেন সেগুলি কি ভালবাসামাখা স্নেহপূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল! সারা দিনরাত জপ করা তাঁহার একমাত্র সহায় সম্বল হইয়াছিল।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সহসা একদিন বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুরে গুরুভ্রাতাগণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং অজ্ঞাত দৈবপ্রেরণায় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে সমস্তরাত্রি তদীয় জীবনালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা বিবিধ কারণে ইঁহাদের সকলেরই জীবনে, বিশেষ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়াছিল। এই জন্যেই শ্রীগুরুর প্রতিকৃতির সম্মুখে যথাবিধি বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইঁহারা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর নরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকের মূলপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাস নামে প্রত্যেককে অভিহিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বাবুরাম মহারাজের স্বামী প্রেমানন্দ নাম এই সময়েই প্রদত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার বিশিষ্ট যে ভাবধারা নিষ্কলুষ প্রেমবন্যায় বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়াছে—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে নূতন অর্থ ও নূতন প্রাণশক্তি লইয়া তাহাই যে কালে স্বল্পভাষী, আজন্মশুদ্ধ বাবুরামের দেহমনে প্রবুদ্ধ হইবে—ভবিষ্য-দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাহাই যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অখণ্ড পবিত্রতাই যে বাবুরাম মহারাজের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেন। তাঁহার লুপ্ত-বাহ্য-দশায় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকারী হইত না। সুতরাং ভাবী জীবনে

এই অপার্থিব অনন্যসাধারণ পবিত্রভাব অমায়িক প্রেমে পরিণতি লাভ করিয়া বহু নরনারীকে সংসার জ্বালার হাত হইতে রক্ষা করিবে এবং উন্নত জীবনপথে আকর্ষণ করিবে ইহা নরেন্দ্রনাথ সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যে 'প্রেমানন্দ' নামে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিণত উত্তর জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপে, ছোটবড়, প্রত্যেকের সহিত ব্যবহারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে এই নামটি অনুপম সঙ্গতি ও সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

বরাহনগরের মঠবাসিগণের সাধনার তীব্রতা ও দৈহিক কঠোরতার মাত্রা কিন্তু দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হইতেছিল এবং পরিশেষে ভারতীয় সাধনার চিরাচরিত রীতি-অনুসারে গুরুভ্রাতাগণ একে একে নগ্নপদে, ভিক্ষান্নমাত্রে জীবনধারণ ব্রত লইয়া, পরিব্রাজকবেশে বিশাল ভারতের বিচিত্র জনারণ্যে দীর্ঘকালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ-জীবনের প্রথম পর্ব্বও সেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছিল। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের মত বাবুরাম মহারাজও এই সময় পরিব্রাজকজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার এই জীবন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পবিস্তৃত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রভৃতির মত প্রায় সমগ্র ভারতভূমি পায়ে হাঁটিয়া, পরিব্রাজকবেশে পরিভ্রমণ করা বাবুরাম মহারাজের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কখনো কাশীধামে, বৃন্দাবনে কিংবা বরাহনগর মঠেই ফিরিয়া আসিয়া নীরব অবিশ্রাম জপ-ধ্যানের মধ্য দিয়াই তাঁহার এই কালের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাঁহার পরিব্রাজকজীবনের বিশেষ কোন সংবাদই আমরা অবগত নহি। কিন্তু এই কালের অন্তে আলমবাজার মঠে যখন তাঁহাকে আমরা পুনর্ব্বার দেখি তখন অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের মত তাঁহাকেও যেন নূতন মানুষ হিসাবেই দেখি। দেখি, গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ সে তনুখানি ঘেরিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ জ্যোতি খেলিতেছে, দৃষ্টিকোণ হইতে করুণা ও শান্তির নির্ঝর যেন অবিশ্রাম ঝড়িয়া পড়িতেছে, ধীরস্থির পাদবিক্ষেপের মধ্য দিয়া অন্তরের আনন্দ ও গাম্ভীর্য্য যেন স্বতই প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বেকার সে দীন, নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব ভাব নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে, সিদ্ধির অপরিমেয় শক্তি অধুনা প্রতি কথায় ও কাজে বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং আগন্তুকমাত্রকেই আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। বস্তুতঃ, বাহিরের দিকেও যেমন বরাহনগরের অপ্রতুলতার স্থলে প্রাচুর্য্যের উচ্ছলতায় আলমবাজার মঠ হাসিতেছিল, মা লক্ষ্মীর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের অকুণ্ঠ পরিবেশনে ভাণ্ডারগৃহ ভরিয়া উঠিতেছিল—অন্তরের দিকেও তেমনি সাধকজীবনের বিরহব্যাকুলতা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বাবসানে বিমল আধ্যাত্মিক আনন্দে গুরুভ্রাতাগণ সকলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা ১৮৯৩। ৯৪ খৃষ্টাব্দের এবং বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের দ্বিতীয় পর্ব্বের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ তখন সুদূর আমেরিকায়। গুরুভ্রাতাগণের দু'একজন ব্যতীত তাঁহার আমেরিকাগমনের সংবাদই বিশেষ কেহ অবগত ছিলেন না। তাঁহার 'বিবেকানন্দ' নামটি পর্য্যন্ত তখনও সকলের অজ্ঞাত। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ, তাঁহার তথাকার কার্য্যকলাপের বিচ্ছিন্ন সংবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তারপর যেদিন নিঃসংশয়ে বোঝা গেল যে আমেরিকায় প্রচাররত 'বিবেকানন্দ' তাঁহাদেরই গুরুভাই 'নরেন্দ্রনাথ'—সেদিন আলমবাজার মঠ সহসা যেন সচকিত হইয়া উঠিল। সহসা যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য নূতন করিয়া দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে মঠের ঠিকানায়ই সরাসরি স্বামিজীর পত্রাদি আসিতে লাগিল

প্রথমে দু'একখানি সংক্ষিপ্তভাবে, পরে ক্রমশঃ দীর্ঘ চিঠি, বক্তৃতার অংশ বা অনুলিপি আসিয়া পৌছিতে লাগিল, আর গুরুভ্রাতাগণও যেন একটা নূতন সম্ভাবনা, একটা অভিনব পরিণতির জন্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। মঠে তখন অবিশ্রাম কেবল স্বামিজীরই কথা, তাঁহারই বক্তৃতাও কার্য্যাদির আলোচনা চলিতে লাগিল। শোনা যায়, স্বামী প্রেমানন্দজী এই সময়ে স্বামিজীর মত ও কার্য্যাদি ঠিক ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবানুযায়ী নহে মনে করিয়া প্রথমতঃ একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে যখন স্বামিজী নিজে তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপ্রণালীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন তখন তিনি নিজের ভুলধারণা সংশোধন করিয়া লইলেন, এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত স্বামিজীর একান্ত অনুগামী হইয়া তৎপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম ও আদর্শের সফলতার জন্য নিজের সকল সাধনা ও শক্তি অকুণ্ঠভাবে নিয়োগ করিয়া সত্যনিষ্ঠা, আদর্শনিষ্ঠা, আনুগত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে কর্ম্ম করিবার যে কৌশল তিনি দেখাইয়া গেলেন তাহার নিদর্শন জগতে খুব বেশী পাওয়া যাইবে না। স্বামিজীর নামটি উল্লেখ করিতে হইলেও 'সাক্ষাৎ শিব স্বামিজী' বলিয়াই তিনি উল্লেখ করিতেন।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

প্রদীপ

শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার

অকূলে আমার খেয়াটী ডুবায়ে
ভেসে চলি ধীরে একা
জানি পাব নাকো এ পথে যে কোন
ক্ষীণ আলোকের দেখা।
সুদূর আকাশ ওপারে আমার
ডুবে গেছে ধ্রুব তারা শতবার
পথের দাবীটী পাথারে চুকায়ে
আঁধারে ধরেছি পাড়ি,
মোর মাঝে মোর শেষের প্রদীপ
নিভে যায় শতবারই।

ওরে গেছে মোর গানের বালাই
মিলায়ে দহনশ্বাসে
কূলহারা ওই গহনশূন্যে
জনমের পরিহাসে!
দুখ তবু নাই, চলি আমি মোর
চলার নেশায় শত ব্যথা-ভোর,
মেলেনিতো কোথা কভু কোন হিয়া
করুণ মরমী আঁখি,
আমি শুধু তবু চলেছিই চির
আমারেই দিয়ে ফাঁকি।

কিছু নাহি চাই, দাওনি কিছুই
রিক্ত যে আমি ঘোর
সান্ত্বনা শুধু না পাওয়া আমার
না হারানো আঁখিলোর;
সকল আলোক করেছে ব্যর্থ
দিয়েছ যে এক বিপুল অর্থ—
তুমিই বুঝেছ মর্ম্ম আমার
এই সুবিশাল ভবে,
সান্ত্বনা শুধু তোমারি এ পথে
চলিতে আমার হবে!

বিশ্বে আমার আর কিছু নাই,
আছ শুধু তুমি একা,
যেদিকে ফিরাই আঁখি দু'টী মোর
তোমারি যে পাই দেখা।
তুমি হয়ে আজ মহাদুর্গতি
হয়েছ আমার নিখিলের গতি,
অগতির গতি তুমি যেগো সখা,
তাই কিছু নাহি চাই।
সায়র হউক অশ্রু আমার—
অশ্রুতে মিশে যাই।

তোমারি বিশ্ব, তোমারি সায়র,
বিশ্বের বিপথ রেখা,
সায়রেই যেন যুগে যুগে সখা
তোমারেই পাই দেখা।

গীতামৃত—দ্বাদশ বিন্দু

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

মদনূদিত গীতার বহু পাঠকপাঠিকা গীতাতত্ত্ব সরল ভাবে লিখিবার জন্ত আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের হার্দিক অনুরোধে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্ত উপনিষদ্রূপ গাভী-সমূহ দোহন করিয়া যে অষ্টাদশ বিন্দু গীতামৃত প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহারই এক এক বিন্দু গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিহিত। এই নিবন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অমৃতবিন্দুটী সুধী পাঠককে উপহার দিতেছি। উক্ত অধ্যায়ের বিশটী শ্লোকে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যাত।

গীতার দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত নির্বিশেষ নিরুপাধি পরমাত্মা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনা উভয়ই কথিত হইয়াছে। বিশ্বরূপাধ্যায়ে উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরীয় আন্ত জগদাত্মস্বরূপ বিশ্বরূপ অনুগ্রহ-পূর্বক অর্জুনকে দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভাগবত কর্মাদিতে নিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় প্রকার উপাসনার কোনটী বিশিষ্টতর ইহা জানিবার জন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান্ নিরন্তর ভাগবত কর্মাদিতে নিযুক্ত হইয়া যে সকল অনন্তশরণ ভক্ত সমাহিত চিত্তে আপনার যথাদর্শিত বিশ্বরূপের আরাধনা করেন এবং যাঁহারা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বোপাধি-রহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয় প্রকার উপাসকদের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠতর? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, পরমেশ্বরের আরাধনার দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয় এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া যাঁহারা আমার বিশ্বরূপে মনো-নিবেশপূর্বক মচ্চিত্ত হইয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করেন তাঁহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসক। কিন্তু যাঁহারা সর্বদা ইষ্ট ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে যথাক্রমে অনুরাগ ও দ্বেষরহিত যাঁহারা সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত ও ইন্দ্রিয়সংযমী এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন সেই জ্ঞানিগণও আমাকেই প্রাপ্ত হন। কারণ, জ্ঞানিগণই আমার আত্মা।"

উপরোক্ত ভগবদ্বাক্যে ভগবৎস্বরূপদিগের যুক্ততমত্ব বা অযুক্ততমত্ব বক্তব্য নহে; কারণ, সাকার ও নিরাকার উপাসনার মাহাত্ম্য পূর্বে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বহু জন্মের তপস্যার ফলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং এইরূপ জ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। তিনি আবার ১১শ অধ্যায়ের অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বেদাধ্যয়ন, উগ্র তপস্যা, প্রভৃত দান বা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন হয় না; একমাত্র অনন্তভক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। অধিকারী ভেদে সাকার ও নিরাকার উপাসনা উভয়ই শ্রেয়স্কর। বরং সাকার উপাসনার দ্বারা নিরাকার উপাসনা সুগম হয়। এই আধ্যাত্মিক সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নিঃসন্দেহে পুনরায় প্রমাণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যে উপাসনার একটী সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাস্ত্রানু-যায়ী উপাস্য বস্তুকে চিত্তের বিষয়ীকরণের দ্বারা তাহার সমীপস্থ হইয়া তৈলধারার ন্যায় সমান-প্রত্যয়-প্রবাহে দীর্ঘ কাল অবস্থিতির নাম উপাসনা। তুলসী দাস

বলেন, 'নিগুর্ণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহতারী। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারী॥' অর্থাৎ নিগুর্ণ ঈশ্বর আমার পিতা, সগুণ ঈশ্বর আমার মাতা। কাকেই বা নিন্দা করি, আর কাকেই বা বন্দনা করি; কারণ উভয়ই সমানভাবে শ্রেয়স্কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন, রসগোল্লা যে ভাবেই খাও, মিষ্টি লাগিবেই। ঈশ্বরের উপাসনা যে ভাবেই কর না কেন তাহাতে জীবের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন, যে যে ভাবে আমার প্রপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাকে কৃপা করি। কিন্তু যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে যাহাদের অভিমান বা আমি বোধ দৃঢ়ভাবে বর্তমান তাহাদের পক্ষে নিগুর্ণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা অতিশয় কষ্টকর। যদি দেহাভিমানিগণ নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের পক্ষে সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগই অবলম্বনীয়। কলিযুগে জীবের প্রাণ অন্নগত এবং দেহবুদ্ধি প্রবল। সুতরাং সাধারণ সাধকগণের পক্ষে এই যুগে ভক্তিসাধনই অনুকূল। সাকার উপাসনার সুকরত্ব এবং নিরাকার উপাসনার দুষ্করত্ব প্রদর্শন প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় এই স্থলে প্রদত্ত হইল। যদিও সগুণোপাসনা অতিশয় ক্লেশসাধ্য, তথাপি তাহা সালম্বন অর্থাৎ বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। তদুপাসকগণ সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিতে করিতে চরমে পরমা গতি (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহাদিগের ধ্যান নিরালম্বন, অর্থাৎ যাঁহারা নিগুর্ণোপাসক, তাঁহাদিগের আয়াস বায়ুর সহিত সংগ্রামের ন্যায় নিষ্ফল হয়। সগুণ ধ্যানের তত্ত্ব ও ক্রম এইরূপ: শুদ্ধ চিন্মাত্রের উপর মায়া দ্বারা বিশ্বরূপ অধ্যস্ত। তাহাতে আতিবাহিকরূপে যাবতীয় জড় অধ্যস্ত। ভগবান বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, আতিবাহিক অবলম্বনে ক্রমশঃ উর্ধ্বে আরোহণ করা যায়। যাহা দুর্গম ও কঠিন প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ইষ্টদেশে যাত্রীকে লইয়া যায় তাহাই অতিবাহী। মায়ার দ্বারা অধ্যস্ত জড়ে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিন্মাত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব ও সুকর। সহসা কোন স্থানে নিপতিত রজ্জু দর্শনে সর্পভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু তীব্র অভিনিবেশ সহায়ে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ও তাহার গতিক্রিয়ার পর্যালোচনা করিলে স্বতই সেই ভ্রম অপনীত হয়, এবং রজ্জুতে রজ্জুই উপলব্ধ হয়। জড়প্রতিমাসমূহ চৈতন্যস্বরূপের অনুকল্প মাত্র। তৎপ্রতি চিত্ত দীর্ঘকাল অভিনিবিষ্ট থাকিলে ক্রমশঃ তাহাদের জড়তা অপগত হইয়া চিত্তে তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপ বা চিন্ময়তার বিকাশ হয়। এই কারণেই ভক্তবর্গ মহাত্মাগণ স্বকীয় আরাধ্য দেবতাকে প্রভুজ্ঞান করিয়া ভৃত্যবৎ সেবা করেন। আরাধ্যদেবের মূর্তি সপ্রেমে পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তত্রস্থ বিশ্বরূপের শুদ্ধভাব অনুভূত হয়। অর্জুনও ভক্তিপূর্বক নিরন্তর বাসুদেবকে দেখিতে দেখিতে ক্রমে তদ্দেহে বিশ্বরূপের আবির্ভাব দর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সগুণ উপাসক সোপানপরম্পরা অবলম্বনক্রমে মুক্তিমার্গাভিমুখী হইয়া পরা সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু নিগুর্ণোপাসকগণ বিহঙ্গমের ন্যায় অকস্মাৎ উর্ধ্বগতি লাভের চেষ্টা করিয়া পরিণামে বিক্ষেপ ও লয়াদি হেতু বিড়ম্বিত হন। গাছের ডালে উঠিতে হইলে ভূমি হইতে উল্লম্ফন অপেক্ষা সিঁড়ির সাহায্যে অথবা কাণ্ড ধরিয়া আরোহণ করাই অধিকতর সহজ। সেইজন্য নিগুর্ণ সাধকগণের পদে পদে পরাভবসম্ভাবনাই অধিক। কারণ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য, শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা-সমাধানরূপ ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে নিগুর্ণ উপাসনা অসম্ভব।

এই কারণে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, "হে পার্থ, যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক

'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্ত'—এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগের দ্বারা আমার সগুণ জগদাত্মরূপ অথবা আমার শ্রীকৃষ্ণ, রাঘব, নরসিংহাদি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি রূপের উপাসনা ও ধ্যান করেন আমাতে প্রবিষ্ট-চিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে আমি অচিরে উদ্ধার করি। অতএব, বিশ্বরূপ আমাতেই মন সমাহিত কর; আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করিলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।" বিশ্বরূপে চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে শ্রীভগবান অর্জুনকে অভ্যাসযোগ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। অভ্যাসই সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভের অমোঘ উপায়। সকল বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া কোন দেবতার মানসমূর্তি বা প্রতিমাদি স্থূল মূর্তি একমাত্র আলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১।৩১) আছে, নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন 'কেনাপ্যুপায়েন রাজন্ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।' হে রাজন্, যে কোন উপায়েই হউক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা উচিত। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্যের মতে ঈশ্বরকে সাতিশয় সৌন্দর্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম, সর্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসংকল্প, সর্বকারণ প্রভৃতি অসংখ্য গুণের আধার জানিয়া তাঁহার নিরতিশয় প্রেমপূর্ণ স্মৃতিই অভ্যাস। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার টীকাতে এই প্রসঙ্গে বলেন, "সাগরাভিমুখী গঙ্গার ন্যায় যাঁহাদের চিত্ত দ্রুতবেগে ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত তাঁহারা ত্বরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। চিত্ত ঈশ্বরপ্রবণ হইলেই সিদ্ধিলাভ অচিরে হয়। কিন্তু যাঁহাদের ঈশ্বরমুখী চিত্তবৃত্তি সেরূপ বেগবতী নহে, যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই তাঁহারা ভগবদ্ব্যতীত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট চিত্তকে তত্তৎ বিষয় হইতে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করিয়া ঈশ্বরে স্থাপনরূপ অভ্যাসযোগের অনুষ্ঠান করিবেন। ধ্যানাভ্যাসই মানসিক উপদ্রবাদির অব্যর্থ অস্ত্র। জলের আঘাতে যেমন কঠিন প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অভ্যাস যোগেও কালে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।"

অভ্যাসযোগে অসমর্থ হইলে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হইতে হইবে। কারণ, ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষলাভ হইবে। শ্রীধর স্বামীর মতে একাদশী আদি তিথিতে উপবাস, ব্রতচর্যা, পূজা, ইষ্টনাম জপাদি ভাগবত কর্ম। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ, নাম সংকীর্তন, বন্দনা, অর্চনা, মন্দির মার্জনা ও অভ্যুক্ষণ, মন্দিরাঙ্গন পরিষ্করণ, পূজারাত্রিকাদি কালে বাদ্যাদি বাদন, প্রেমভাবে নর্তন, দীপদান, শ্রীমূর্তিকে প্রণাম প্রদক্ষিণাদি কর্মে ইষ্টস্মরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ হয়। একাদশী তিথিতে হরিভক্তগণের বিধিবিহিত উপবাস একান্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি অবিসংবাদিত। পদ্মপুরাণে আছে—'একাদশ্যাম্ উপবসেৎ ন কদাচিৎ অতিক্রমেৎ' অথবা একাদশীতে উপবাস করিবে, কদাচ বাদ দিবে না। রঘুনন্দনকৃত একাদশীতত্ত্ব ও হরিভক্তিবিলাসে আছে 'রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যম্ ন ভোক্তব্যম্ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥' অর্থাৎ পুরাণসমূহ পুনঃ পুনঃ প্রচার করেন, হরিদিনে (= একাদশীতে) কদাচ আহার করিবে না। উপবাসে শরীর শুদ্ধ, মন সংযত হয়। সুতরাং সাধকের পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক। আহারসংযমের প্রধান উপায় উপবাস। আহারসংযম ব্যতীত দেহমন ধর্মসাধনের উপযুক্ত হয় না। ভাগবতে আছে,—'তাবৎ জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েৎ রসনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে॥' অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয় বিজিত হইলেও সাধক

জিতেন্দ্রিয় হইবেন না। রসনাজয় না হওয়া পর্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। রসনা বিজিত হইলে সকল ইন্দ্রিয় বিজিত হয়। নিত্য শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বা তদুদ্দেশ্যে দীপদানের অশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদিতে পরিকীর্তিত। তিথি, মাস বা পর্ব-বিশেষে শ্রীহরির উদ্দেশে দীপদানের অশেষ ফল স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে। বামন পুরাণে কথিত আছে যে, পিতৃগণ বলিরাজকে বলিলেন, 'আমাদের কুলে এরূপ পুত্র জন্মলাভ করুক যে একাদশী তিথিতে উপবাস করতঃ দেবদেব শ্রীহরিকে সর্ব-পাতকহর দীপদান করিবে।' বলি পিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আয়তনে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ, ঘৃতপূর্ণ প্রভৃতি দীপ প্রদান করিলেন। এবং তৎকালে অন্ধতামিস্র নামক নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভার্যার সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।

ভগবৎকর্মে অক্ষম হইলে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া যাবৎ অনুষ্ঠিত কর্মের ফলত্যাগ কর্তব্য। অবিবেক পূর্বক জ্ঞানার্থ শ্রবণরূপ অভ্যাস শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞান উৎকৃষ্ট। এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানপূর্বক ধ্যান হইতে কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই সহেতুক সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়। শ্রীভগবান এখানে অবশ্য কর্তব্য কর্মের ফলত্যাগ প্রশংসা করিলেন মাত্র। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফলরূপ সর্বকামনা ত্যাগের অনন্তরই জ্ঞাননিষ্ঠের শান্তিলাভ প্রসিদ্ধ। উক্ত কামনাত্যাগের সহিত সর্বকর্মফলত্যাগের সাদৃশ্যবশতঃ সর্বকর্মফলত্যাগের এই স্তুতি। কামনাত্যাগ ও কর্মফলত্যাগ—উভয় ত্যাগে এই সাদৃশ্য।

১২শ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ-পর্যন্ত সপ্তশ্লোকে শ্রীভগবান প্রিয়ভক্তের বর্ণনা করিতে-ছেন। যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে রাগ ও দ্বেষ বর্জিত, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিত তিনিই ভগবানের প্রিয়ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত কোনও প্রাণীকেই উদ্বেগ দিবেন না; তিনি সকলকে আশ্বাস, উৎসাহ অভয় প্রদান করিবেন। মহাভারতে আছে, 'পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনঃ। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥' অর্থাৎ যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া সকরুণ পিতার ন্যায় পুত্রবৎ সকলকে অবলোকন করেন, সেই শুদ্ধচিত্ত ও প্রেমযুক্ত ভক্তের প্রতি ভগবান শীঘ্র প্রসন্ন হন। আবার ভগবদ্ভক্ত সর্বদা সর্বত্র ভয়মুক্ত থাকেন। ভাগবতে (৬।১৭।৫২) আছে—ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোন বিষয়েই ভীত হন না। যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কাহারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, এবং যিনি হর্ষ ও বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিই ভগবানের প্রিয়ভক্ত। যিনি অনপেক্ষ, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য শুচি এবং সচ্চিন্তা দ্বারা অভ্যন্তর শুচি, যিনি উপস্থিত কার্যে তৎক্ষণাৎ যথাযথ প্রতিপত্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত, যিনি পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন, এবং সকল সকাম কর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগী, তিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত। যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত। যিনি আসক্তিহীন, শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মান ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখ ও দুঃখে নির্বিকার, যিনি পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, নিন্দায় বিষাদশূন্য, প্রশংসায় হর্ষহীন ও সংযতবাক্, যিনি সর্বাবস্থায়

যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট এবং অনিকেত তিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত।

শ্রীভগবান প্রিয়ভক্তের যে সকল বিশেষণ দিয়াছেন তন্মধ্যে অনপেক্ষ, অনিকেত এবং যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট—এই তিনটী বিশেষণের ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রথমে অনপেক্ষ শব্দের অর্থ টীকাকারগণ কি ভাবে করিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। শঙ্কর মতে উক্ত বাক্যের অর্থ দেহেন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধাদিতে অপেক্ষাশূন্য; রামানুজ মতে আত্মব্যতিরিক্ত সকল বিষয়ে অপেক্ষাহীন; শ্রীধর মতে যদৃচ্ছা উপস্থিত বস্তুতেও নিঃস্পৃহ; বলদেব মতে স্বয়ং সমাগত ভোগ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষাহীন; মধুসূদনমতে যদৃচ্ছোপনীত ভোগোপকরণে নিরপেক্ষ; নীলকণ্ঠমতে সুখপ্রাপ্তিতে ও দুঃখহানে বা তৎসাধনে লিপ্সাশূন্য এবং বিশ্বনাথ মতে ব্যবহারিক কার্যাপেক্ষারহিত। অনিকেত শব্দের অর্থও টীকাকারগণ নানাভাবে এইরূপ করিয়াছেন। হনুমৎকৃত পিশাচভাষ্যে অনিকেত শব্দের অর্থ অগ্রহ; রামানুজমতে আত্মাতে স্থিরমতিত্বহেতু নিকেতনাদিতে অসক্ত; বলদেবমতে নিয়তনিবাসরহিত; নীলকণ্ঠ মতে গৃহশূন্য; বিশ্বনাথ মতে প্রাকৃত সম্পদে আসক্তিশূন্য। ভগবদ্ভক্ত যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণগণের সেই আদর্শ ছিল পুরাকালে। মহাভারতের শান্তিপর্বের নিম্নোক্ত শ্লোকটী শঙ্করভাষ্যে উদ্ধৃত আছে:—

যেন কেনচিদ্ আচ্ছন্নো যেন কেনচিৎ আশিতঃ।
যত্র কচন শায়ী স্যাৎ তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যিনি যে কোন পরিধেয় দ্বারা শরীর আবৃত করেন, যে কোন খাদ্য দ্রব্য ভোজন করেন, এবং যে কোন স্থানে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করেন, দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। টীকাকার আনন্দগিরি উক্ত শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে স্মৃতির এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন।

ন কুড্যাং নোদকে সঙ্গো ন চৈলে ন ত্রিপুষ্করে।
চাসনে বসনে নান্নে যস্য বৈ মোক্ষবিৎ তু সঃ॥

যাঁহার দেওয়ালে, উদকে, বস্ত্রে, পুষ্করাদিতীর্থে, আসনে, বসনে, অন্নে আসক্তি নাই তিনিই মুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'যে সকল মৎপরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ভক্তিধর্ম উক্তপ্রকারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাধন করেন তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়। এখানে প্রিয় শব্দ ভক্ত ও ভগবানের আত্মিক অভেদত্ববাচক। শঙ্করমতে পরমার্থ বস্তুর জ্ঞানরূপ ভক্তিতে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই ভক্ত। সাধনের অন্তিম অবস্থায় ভক্ত ও জ্ঞানী একই তত্ত্বে উপনীত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শুদ্ধাভক্তি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান এক। ভক্ত উপরোক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে কালে জ্ঞান লাভ করিবেন। মুক্ত পুরুষের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম, মুমুক্ষুগণের তাহাই যত্নপূর্বক অনুষ্ঠেয়। নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় এই প্রসঙ্গে বার্তিকের নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যেব নতু সাধনরূপিণঃ॥

আত্মজ্ঞান যাঁহার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণ বিনাযত্নে তাঁহার লাভ হয়। সেই সকল গুণের সাধন তাঁহাকে করিতে হয় না। কিন্তু সেই গুণগুলি মুমুক্ষুগণের সাধনলভ্য।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

শ্রীচুনীলাল মিত্র, এম-এ, বি-টি

১৯২১ সনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের মধ্যে শুধু যে অন্যতম ছিলেন তাহাই নহে, পরন্তু অগ্রগণ্য ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই উদীয়মান কবির বিয়োগব্যথায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন। কবিগুরুর ন্যায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম পাইলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা আরও কতদূর বিকাশ হইত তাহা বলা যায় না।

কথিত আছে, বিদেশীয় ভাষা হইতে কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতে সত্যেন্দ্রনাথের অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। উপরন্তু, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতায় অনেক অভিনব ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই সকল গুণাবলী ব্যতীত স্বতন্ত্র কারণে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকি। তিনি কল্পনার অপেক্ষা বাস্তবতার কবি ছিলেন। কাব্যে যতটুকু অপরিহার্য্য চিন্তা ও ভাবের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত তাহাতে কিছুই ছিল না। উহাকে নিছক ভাবুকতা বলা যায় না, তিনি ছিলেন দরদী কবি। সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যাই ছিল তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু। তাঁহার কবিতামালায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল দেশের জন্য আন্তরিক দরদ, জাতির দুর্দ্দশায় মর্মবেদনা। তাঁহার ন্যায় দেশহিতব্রতী কবি সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "তীর্থসলিল" "অভ্র আবীর" এবং "কুহু কেকা" সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বটে কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থও কম প্রণিধানযোগ্য নহে। "বেণু ও বীণা" গীতি কবিতাপুস্তক। "হোমশিখা" তেজস্বিতা ও পুণ্যভাবে ভরা। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবিতার পদ্যানুবাদ তাঁহার "তীর্থরেণু"। একান্ত আতুর অনাথ পীড়িত দরিদ্র জীবনের করুণ কাহিনীর উপন্যাস "জন্মদুঃখী", চীন, জাপান ও ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদ "রঙ্গমল্লী"। তাঁহার "ফুলের ফসল" ও "তুলির লিখন"-এ মানবের সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তিগুলির পরিচয় পাই। কবির হাস্য কৌতুক ও ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্য "হসন্তিকা"। "মণি-মঞ্জুষা" ও বিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ "বিদায় আরতি" ও উল্লেখযোগ্য।

কবি মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি অপরাধকে ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখেন নাই। কেবল তিরস্কার করা তাঁহার ধর্ম্ম নহে। মানব-জীবনের দোষ-অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াই তিনি আমাদিগকে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন মহৎ হইবার জন্য। তিনি পঙ্কোদ্ধারের পক্ষপাতী। তাঁহার "নষ্টোদ্ধারে" শুনি :—

'করতে হবে নূতন বোধন জাগিয়ে তারে তুলতে
মানুষ দোষে-গুণেই মানুষ, পারব না সে ভুলতে

সঙ্গীদের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ সরল নির্ম্মল অথচ প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তাহা তাঁহার "সুদূরের যাত্রী"তে দেখিতে পাই :—

"তোমরা খুঁজবে কিনা জানি না,
সকলে চাহিয়াছি আমি
খেলায় দিয়েছি যোগ আমি
তোমাদের ছিনু অনুগামী।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিকের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথের "গান"এও স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমিকতার বাণী শুনিতে পাই :—

"মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটী,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোণার চাইতে খাঁটি।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি মানুষের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত মিলন স্বীকার করিয়াছেন। মানবের ঐক্যই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ"-এর স্থায় তাঁহারও বাণী শুনিতে পাই :—

"মিলনধর্ম্মী মানুষ আমরা মনে মনে আছে মিল
খুলে দাও খিল হাসুক নিখিল, দাও খুলে দাও দিল্।"

এই চিন্তাধারা আরও বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন "হাতির পাঁতি" কবিতায় :—

"কেউ হেয় নয় সমান সবাই আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল জাতির তর্ক
কেন গো তবে ?"

সমস্বরে তিনি নবযুগের মানবজাতিকে মিলনের আহ্বান জানাইয়াছেন :—

"তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহরে জয়
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।"

শিশুই জাতির মেরুদণ্ড এবং ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল। কিশোরের মধ্যেই যে বিরাট মানবের সম্ভাব্যতা আছে কবি তাহা দেখিয়াছেন। তাহারা যে আবার সারল্য ও পবিত্রতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি কবি তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কাজি নজরুল তাঁহার "মায়ামুকুরে" কিশোরকে এবং সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তেজোদীপ্ত বিরাটের বাণী শুনাইয়া :—

"তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর,
প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণা-প্রতাপ
আকবর।"

অথবা,—

তুমি নহ শিশু দুর্ব্বল, মহতো মহীয়ান!
জাগো দুর্ব্বার, বিপুল বিরাট, অমৃতের সন্তান!"

কবি সত্যেন্দ্রনাথও ছেলের দলকে চিত্রিত করিয়াছেন তেমনি ভাবে :—

"হোমের শিখা ওরাই জ্বালে
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
* * * *
তবু ওরাই আশার খনি
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল,
ওই আমাদের ছেলের দল।"

"বন্দরে" শীর্ষক কবিতায় কবি দেশের তরুণদের বজ্রনির্ঘোষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা প্রাণস্পর্শী। একই আহ্বানে তিনি দেশের একাধিক কুসংস্কারের প্রতিবাদে অভিযান করিয়াছেন।

তাঁহার আহ্বানবাণী—

"শাস্ত্র শাসন রইল মাথায় তর্কে মিছে নেইকো ফল
বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।"

তাঁহার অভিযানের বাণী—

"চলবে না কেউ মোদের নিয়ে! সাগরে ত চলছে জল
পরের কথা ভাব্‌বো পরে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।"

'কালাপানি' পার হইলে যে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি ঘোষণা করিয়াছেন :

"সাগর পারে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তিও
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভরা শুক্তিও।"

আন্তর্জ্জাতিক হওয়ায় এবং সর্ব্বজাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণেই যে প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি, ইহাই তাঁহার প্রতীতি। ইহাই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ। পাশ্চাত্যকে কেবল ঘৃণা অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিয়া জাতির যথার্থ কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা একান্তই ভ্রান্ত। তাই স্বামী বিবেকানন্দও একাধিকবার উপদেশ দিয়াছেন যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে ও উভয়ের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি গ্রহণে।

মহদুদ্দেশ্যে ত্যাগ ও আত্মবলিতে কবি :ত্যেন্দ্রনাথ আজীবন শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন। মহতের তিগানে ও মহিমাকীর্ত্তনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন লা যাইতে পারে। "সাগরতর্পণে" বিদ্যাসাগরের ।তি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া কবি বলিয়াছেন :

"অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।"

এই একটিমাত্র ছন্দেই তিনি বিদ্যাসাগরের মগ্র রূপটিরই পরিচয় দিয়াছেন। একই কবিতায় তনি ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এবং ান-বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ভ্রূকুটি প্রকাশ ·রিয়াছেন :

"বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।"

এমনি ভাবে তিনি মনীষী টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ, তলক, গান্ধী, নিবেদিতা ও হরিনাথ দের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন।

যে দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা মানুষকে বিশাল ত্যাগ এমন কি আত্মদানেও সহায়তা করে, কবির চক্ষে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। তাই "নফর কুণ্ডুর" প্রাণদানের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন :

" * * পঙ্কে কি মানে সে অগৌরব,
সে শুধু মানসচক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব।"

বর্তমানে যে দুর্ভিক্ষ মহামারীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে, কবি সত্যেন্দ্র নাথ "দুর্ভিক্ষ" শীর্ষক কবিতায় তাহার একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক এবং স্পষ্ট পরিচয়ের জন্যও তাঁহার বাক্য প্রণিধানযোগ্য। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন :

"প্রথম প্রথম লুকিয়ে যেতাম,
চোরের মত হেথা হোথা
নিজের ক্ষিধেয় ভুলতে হ'তো
ছেলেমেয়ের ক্ষিদের কথা।
ঘাস পাতাতে চলবে ক'দিন?
ক'দিন ওসব সইবে পেটে
শুকিয়ে আসছে ক্ষুধায় নাড়ী,
কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে।"

আরও মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য—

"ক্ষিধের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে
দেছে সেদিন গলায় দড়ি
ক্ষিধের জ্বালায় কচি কাঁচা
মরছে নিত্যি ঘড়ি ঘড়ি।"

তাঁহার "মেথর" কবিতা সর্বজনবিদিত। প্রতীক-স্বরূপ ইহাতে তিনি কুলী মজুর, চাষী ও নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সেবার মর্যাদা দিয়াছেন এবং ব্যাপক সামাজিক জীবনে তাহাদের স্থান কত যে উর্দ্ধে তাহাই তিনি প্রমাণ করিয়াছেন দুটি ছত্রে :—

"নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বোধ নির্বিষ
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।"

"শূদ্র" কবিতায় সেই একই নিকৃষ্টের মাহাত্ম্য তিনি ঘোষণা করিয়াছেন :—

"শূদ্র মহান গুরুগরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে
শূদ্রে রেখেছে সংসার ওগো!
শূদ্রে দেখোনা বক্র চোখে।"

কবি সর্বকালের শিশুপুত্রহারা পিতামাতার বেদনা জানাইয়াছেন তাঁহার "ছিন্নমুকুলে" :

"হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে ওরে!
হারিয়ে গেছে বোলবলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।"

তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল যেন নির্ম্মল, অতীন্দ্রিয় এবং বিদেহী। সহজাত স্বতঃপ্রাণোদিত ভাল-বাসার যে তিনি প্রত্যাশী ছিলেন, তাহা তাঁহার কথায় বুঝা যায় :

"ফুলের যা দিলে হয়না ক্ষতি অথচ আমার লাভ
আমি চাই সেই সৌরভ শুধু অতনু অতল ভাব।"

দেশের এক সঙ্কটমুহূর্তে কবি আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। দেশে তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। সমগ্র দেশ তখন স্বাধীনতাসংগ্রামে লিপ্ত। একদিকে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ধর্ষণ এবং উৎপীড়ন, অপরদিকে অহিংস সত্যাগ্রহ। ইহার ছবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনীতুলিকায় আঁকিয়াছেন "বিদায় আরতি"র 'কয়াধু' কবিতায়। প্রহ্লাদজননী, কয়াধুই ভারতমাতা আর হিরণ্যকশিপুর হস্তে শতনির্য্যাতিত প্রহ্লাদই সত্যাগ্রহী। তাই প্রহ্লাদের মুখের কথায়:

"প্রশ্ন হোল—কি শিখেছ ?
রাজার সভামাঝে
কয় শিশু—তাঁর নাম শিখেছি
রাজার রাজা যে।"

আমরা এখানে গান্ধীনীতিবিশ্বাসী যুবকের কথাই শুনিতে পাই। দারুণ যন্ত্রনা ও নির্য্যাতনের মধ্যেও শিষ্ট উপেক্ষাই যে প্রকৃত সত্য ও অহিংসার বিগ্রহ সত্যাগ্রহীর রূপ, তাহা কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়াছে তাঁহার উক্তিতে:

"কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধল কষে তায়,
শান্ত শিশু হাসল শুধু মিষ্ট উপেক্ষায়।"

বলা বাহুল্য যে দেশের দাবী সঙ্গত ও স্বাভাবিক সেই দেশের পক্ষে ইহা—

"আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশ-মাতৃকার বেদনাব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন কয়াধুর মুখ দিয়া:

"নারীত্বে মোর নাইরে রুচি নাই কিছুরই সাধ
যেদিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ
যেদিকে চাই মলিন অধর উপবাসীর চোখ
যেদিকে চাই গগন ছোঁওয়া নীরব অভিযোগ।"

মায়ের মনোবেদনা আরও স্পষ্ট হইয়াছে এই বাক্যে:

"কি দোষ বাছার বুঝতে নারি অবাক চোখে চাই
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই।"

একটি মাত্র কবিতায় এত সময় ব্যয় করার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে কবির দৃষ্টি কতদূর ব্যাপক অতলস্পর্শী এবং যুগপৎ সুষ্ঠু ও হৃদয়গ্রাহী তাই দেখানো এবং দাসত্ব ও পরাধীনতা মোচনের জন্য তিনি যে কত উৎকণ্ঠিত তাহা বুঝান।

আজ দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী কালেরও উর্দ্ধ সময়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ সত্যনিষ্ঠা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার দাবী জানাইতেছে কিন্তু শাসক-শ্রেণী এই দাবী আমাদের অযোগ্যতার দোহাই দিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইহা নিতান্তই অসংগত ও অসহনীয়। তাই কবি দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষ সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও কলাবিদ্যায়, শিল্প ও যুদ্ধনীতিতে এমন কি রাজনীতিতেও সর্ববিষয়ে পারদর্শী। শাসকশ্রেণীর অসংগত মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা করিয়া কবি 'দাবীর চিঠি'তে দেখাইয়াছেন যে সভ্যতার ইতিহাসে ইংরাজের দান ভারতের দানের নিকট অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ভারতমাতা অগণিত কৃতবিদ্য বীরপ্রসবিনী। তাঁহার দুই একটি সমালোচনামূলক কথা এইখানে উল্লেখযোগ্য:

"গোরার আছে ম্যাগনাকার্টা কালার না হয়
নেইকো তা
Bill of Rights নয় কখনো নয় জীবনের
শেষ কথা।

* * *

গোরা যারে ভব্যতা কয় তিনশ বছর বয়স তার,
কালার যা গৌরবের জিনিষ তার অন্ততঃ
তিন হাজার।

* * *

তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখতে
চাও ?
দাবীর কথা পাড়তে গেলে কুঁচকে ভুরু দাব্‌ড়ি
দাও ?"

জাতির বুকে দুর্দ্দশা ও অত্যাচারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড। সে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের বিশদ এবং নিখুঁত বিবরণ মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই তেমনভাবে দেন নাই। তিনি যে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার দুই একটি স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি:

"বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়্‌ল মারা বাচ্চা নিয়ে বুকে
গুলির ঘায়ে জোয়ান ছেলে সারাটা রাত
কাঁতরে মলো ধুঁকে।"

আবার—"ময়দানেতে খেলতে এসে ভীড় দেখে
হায় গিছ্‌ল জন যারা,
দুধের ছেলে মায়ের দুলাল মায়ের কোলে ফির্‌ল না
আর তারা।"

সমাজের খুঁটিনাটি বিষয় লইয়াই তাঁহার কাব্যসম্ভার গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজের সকল সমস্যা তিনি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। বাংলার বিধবাদের দুঃখেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। অযথা কৃচ্ছ্রসাধনা ও নির্জ্জলা-একাদশী প্রভৃতি তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন:

"শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতের নিঃশ্বাসে হায় সকল শুভ ভস্ম শেষ।"

তিনি সুনির্ব্বাচিত শব্দ যোগ্যস্থানে ব্যবহার করিতেন। বড়দিনে যীশুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলিয়াছেন:

"টিটকারী দেয় সন্দেহীরা ভাবে বুঝি তোমার ফাঁকা,
ক্রুশের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন করলে
দলিল পাকা।"

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলা যে একজন বিশিষ্ট কবিকে হারাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কবি রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়াছেন। আমরা গংগোদকে গঙ্গাদেবীর পূজার ন্যায় কবির ভাষায়ই কবিকে বলি, তিনি ছিলেন আমাদের "নিখাদসোনা", "অমরপ্রদীপ", "আশার স্থল" ও "পদ্মকোষের বজ্রমণি"।

সম্বন্ধ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

যতক্ষণ দেহজ্ঞান থাকে প্রভু মনে
তোমার দাসের দাস এই শুধু জেনে
করিতে সকল কাজ শক্তি দিও মোরে,
আর যেন কোন ভাব না আসে অন্তরে।

যখন নিজেকে আমি জীব ব'লে জানি
তোমা হতে ভিন্ন এক বস্তু ব'লে মানি
'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' আমি অংশ তাঁর
এ ভাব হৃদয়ে যেন থাকে অনিবার।

আত্মা ব'লে অনুভূতি হ'লে আপনারে
দেহ কিবা জীবসত্তা ভুলি' একেবারে
তোমার মাঝারে যেন লীন হ'য়ে যাই
তোমায় আমায় ভেদ দেখিতে না পাই

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের গোড়ার কথা

শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত

ঊনবিংশ শতকের প্রদোষক্ষণে শ্রীঅরবিন্দকে আমরা দেখেছিলাম দেশাত্মবোধের অন্যতম উদার উদ্গাতারূপে; স্বদেশ-মন্ত্রের নির্ভীক পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন স্বাধীনতালাভের এক সুতীব্র প্রেরণা। স্বদেশ-সাধনার এই মহান ব্রত ত্যাগ করে কেন তিনি নির্জ্জন আধ্যাত্মিক-জীবন গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই। তাঁর "পত্রাবলী" এবং "উত্তরপাড়া বক্তৃতায়" এইটুকু জানা যায় যে তিনি জেল হতে মুক্তিলাভ করবার পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) অর্থাৎ বলপূর্ব্বক স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপর বিশ্বাস হারাতে আরম্ভ করেন। এখন তিনি বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আত্মিক শক্তি দ্বারাই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। প্রকৃতপক্ষেও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে কোন তর্কমূলক আলোচনায় আমরা বর্ত্তমানে প্রবেশ করব না। আমরাও বিশ্বাস করি, যে এক মহান দিব্য আদর্শে সমগ্র মানবজাতিকে উন্নীত করবার সুগভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন। আজও তিনি এক উচ্চ সাধনায় নিমগ্ন আছেন। সেজন্য যে মাতৃভূমির কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন তা নয়; বরঞ্চ দেশকে আরও মহত্তর ভাবে সেবা করবার যোগ্য শক্তি এবং ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করবার জন্যই হয়তো বা তিনি আজও গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা করব না। আমি শুধু শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের গোড়ার কথাটি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রাচীন কাল থেকে যে আধ্যাত্মিক চিন্তারাশি, যে ভাবধারা ও দর্শনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে আসছি, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে যে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে তা নয়। কোন নূতন আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস তিনি আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু এক নবতর রূপান্তরের পথে, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব এক অভিব্যক্তির পথে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে পরিচালনা করছেন। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ-বর্ণিত যোগসাধনায় ব্যক্তিগত মোক্ষপ্রয়াসের কোন স্থান নেই। তাঁর সাধনার ফলাফল সমগ্র বিশ্বমানবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। সমুচ্চতমা ভাগবতী শক্তিকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো এবং একে সক্রিয় করে তোলাই শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের লক্ষ্য। এই ভাগবতী মহাশক্তির নাম তিনি দিয়েছেন "supramental power" বা "অতিমানস দিব্যশক্তি"। অতিমানস দিব্যশক্তির সহায়ে মানবচেতনাকে পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করা এবং মানব-জীবনকে ভাগবত-জীবনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করা শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে দৃশ্যমান বাহ্যিক জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বেদান্তদর্শনও স্থূলজগতের অস্তিত্ব বা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না। উচ্চতম মহাশক্তি জড়কেই আশ্রয় করে আছে; স্থূলজগতের

উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্থাপন করে কাজ করে যাচ্ছে। মোটকথা পৃথিবীর বুকের উপর অতিমানস শক্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সমগ্র মানবজাতিকে দেবত্বে উন্নীত করাই শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। এই রূপান্তর সাধন করতে হলে চাই সাধকের অটল অভীপ্সা, ভাগবতী শক্তির কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ঐকান্তিক আত্ম-উন্মীলন (self-opening)। যতক্ষণ মানুষ তার অহমিকার কাছে, অসরলতার কাছে, অবিশ্বাসের কাছে বন্দী হয়ে থাকবে ততক্ষণ দিব্য-রূপান্তরের (Divine transformation) পথ তার কাছে রুদ্ধ হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত চেতনাকে দিব্য-চেতনায় রূপান্তরিত করতে হলে সাধকের চাই অখণ্ড আত্মসমর্পণ, অনন্যমুখী আত্ম-উন্মীলন, অভীপ্সা এবং পরিবর্জ্জন (elimination)। "ভাগবতী শক্তি যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য চাই……সেই আনুগত্য যার কল্যাণে আমাদের অন্তর্যোদ্ধা মিথ্যার, তামসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলে।" হৃদয়ে শান্তি, অচঞ্চলতা, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ রেখে সাধক ভাগবতী শক্তির অব্যর্থ নির্দেশে, সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে কাজ করে চলবেন। এই যে দিব্য সাধনা, এই যে আত্মপ্রস্তুতি তাকেই শ্রীঅরবিন্দ আখ্যা দিয়েছেন, "পূর্ণযোগ" (Integral yoga)। দিব্য রূপান্তরকে চিরস্থায়ী করতে হলে, সক্রিয় করে তুলতে হলে দু'টি জিনিষের প্রয়োজন—এক হচ্ছে নীচ থেকে ভাগবতী শক্তিকে পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ উপর থেকে পরমেশ্বরের কৃপা ও অনুমতি পাওয়া। মানবজাতিকে দিব্য, সত্যাত্মক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর কিনা বা শ্রীঅরবিন্দের Ideal of Superman-এর পূর্ণ বাস্তব রূপ দেওয়া মানব-জীবনের পক্ষে সহজ কিনা সে বিষয়ে যুক্তিবাদীদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ-হেন তর্কের প্রশ্রয় দিতে আমরা অক্ষম। শ্রীঅরবিন্দ কি বলছেন তাই দেখা যাক—"অতিমানস রূপান্তর নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে; পৃথ্বীচৈতন্যের (Earth Consciousness) ক্রমবিবর্ত্তনে তা অনিবার্য্য। কারণ এই চেতনার উর্দ্ধমুখী গতি শেষ হয় নাই; মন তার সর্ব্বোচ্চ শিখর নয়।" (মা—শ্রীঅরবিন্দ)

এই অতিমানস শক্তির উৎসের পরিচয়, এর পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক দর্শনে পাই। ব্যক্তিগত জীবনে এই পরমা শক্তির অবতরণ বোধ হয় বহুবার সম্ভব হয়েছে কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা কোন কালে কোন সাধক করেছিলেন কি না সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। যীশুখৃষ্ট অবশ্য "Kingdom of Heaven"-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অতিমাতস দিব্য রূপান্তরের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Riddle of The World" বইটীতে বলেছেন, "……There have been glimpses of it till now. Sometimes an indirect influence or pressure, but it has not been brought down into the Consciousness of the earth and fixed there."

আমরা সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের গোড়ার কথাটি আলোচনা করলাম। বিশ্ব-দর্শনে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আমরা আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে শ্রীঅরবিন্দ দিব্য মানব-জীবনের অমৃতময় বাণী নিয়ে আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন। সেই শুভদিনের আগমনী সঙ্গীত গাওয়ার সময় আজ হয়ে এসেছে। হৃদয়ে অতন্দ্র অক্লান্ত আশা নিয়ে আজ আমরা ভবিষ্যৎ দিব্য-সৃষ্টির প্রতীক্ষা করছি। কবিগুরুর ভবিষ্যৎ-বাণী আজ আমাদের আবার নতুন করে স্মরণ করতে হবে—

"ঐ মহামানব আসে
　দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে;
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
স্বরলোকে বাজে জয়শঙ্খ
　এল মহাজন্মের লগ্ন।"

সমালোচনা

ভারতের পুণ্যতীর্থ—ডক্টর বিমলাচরণ লাহা প্রণীত। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সার্বজনীন গ্রন্থমালার তৃতীয় পুষ্প। ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৭, মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তীর্থদর্শনকামিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেক অপরিচিত স্বল্প-পরিচিত তীর্থের কথা জানিতে পারিবেন।

জৈনগুরু মহাবীর—ডক্টর বিমলাচরণ লাহা প্রণীত। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সার্বজনীন গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুষ্প। ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৯, মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানিতে জৈনগুরু মহাবীরের জীবনী ও বাণী এবং জৈনধর্মের কথা সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহাপুরুষগণের জীবন-কথা যত আলোচিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। পরিশিষ্টে বিশিষ্ট জৈন সাধুদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী পুস্তকটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

আমরা এই পুস্তকের প্রচার কামনা করি।

ব্রহ্মচর্য্য-বিজ্ঞান—শ্রীললিতমোহন জ্যোতি-র্ভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—হেমচন্দ্র বণিক, রংপুর। পৃষ্ঠা ৫২, মূল্য দুই টাকা।

স্বল্পায়তনের এই সুলিখিত বইখানিতে যোগপন্থা অনুসরণ করে লেখক ব্রহ্মচর্য রক্ষা বা ঊর্ধ্বরেতা হ'বার কয়েকটি সহজ পথ নির্দেশ করেছেন। যোগাসনের ছবি দু'টি বইখানির উপ-যোগিতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে ব্রহ্মচর্য ও যোগ-সাধনার প্রতি অনেক পাশ্চাত্য মনীষীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এইজন্য আশা হয়, হয় তো আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন এ দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। ব্রহ্মচর্য শুধু ধর্মের অঙ্গ নয়। একটা সুস্থ, সবল ও সংহত জাতি গড়ে তুলতে হ'লে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে হ'লে ব্রহ্মচর্য একমাত্র উপায় বললে বেশী বলা হয় না।

লেখক এই পুস্তকখানিতে ব্রহ্মচর্যের বহু গুণ কীর্তন করেছেন আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

খাদি-পুরাণ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃমন্দির শিমুল-তলা শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে স্বামী যোগবিলাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকাটিতে লেখক কবিতায় খাদির গুণকীর্তন করেছেন।

শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয় চিন্তা—শ্রীল সিদ্ধকৃষ্ণ-দাস বাবাজী প্রণীত। শ্রীললিতমোহন জ্যোতি-র্ভূষণ কর্তৃক রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত। ৩১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানিতে কবিতায় বৈষ্ণবধর্মের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী পরমানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী পরমানন্দ মহারাজ কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। ১৯০৪ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া তিনি কয়েক বৎসর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করেন। পরমানন্দজী গয়াধামে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের একটি গুহায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাতরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। পরমানন্দজীর সাধুত্ব ও অমায়িক ব্যবহার আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

রামকৃষ্ণ বেদান্তকেন্দ্র, সিয়াটল্, ওয়াশিংটন—১৯৪৬ সনের ১লা অক্টোবর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজীর পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা, প্রতি শুক্রবার পাতঞ্জল যোগসূত্র, প্রতি রবিবার জনসভায় বক্তৃতা, ছাত্র ও সদস্যগণের জন্য প্রতি সপ্তাহে আলোচনা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি, ক্রিস্‌মাস ও ইষ্টার উৎসব হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের পরিচালিত রজার্ উইলিয়াম্‌স্ ক্লাবে "বেদান্তের মূলতত্ত্ব" সম্বন্ধে তিনটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

উত্তর-ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি, সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো—১৯৪৬ সনের নভেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন:—(১) "মৃত্যুর আহ্বান," (২) "যেখানে আছ সেখান হতেই যাত্রা কর," (৩) ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ," (৪) "ভারতের সমস্যা ও ভারতের ধর্ম," (৫) "আধ্যাত্মিক উন্মেষের ছয়টি অবস্থা," (৬) "অমঙ্গল কেন?" (৭) "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শঙ্কর", (৮) "আত্মসমর্পণের অভ্যাস"। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি সপ্তাহে "বেদান্তের সাধারণতত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১৪ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠ, উদ্বোধন (কলিকাতা) শ্রীশ্রীমায়ের বাটী, জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন, বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমার পূজা ভোগ ও ভজনাদি হইয়াছে।

কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী কাশীপুর বাগানবাটীতে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগ— শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট বন্ধু, ভক্ত, সভ্য ও কর্মী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে গত ২৮শে নভেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্বে তিনি বসিয়া কয়েকবার শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করেন।

বিজয় বাবু তরুণ বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সংস্পর্শে আসেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে তিনি যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া তাঁহাদের আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং ১৯১২ সালে মন্ত্রদীক্ষা দানে ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি কয়েকবার তাঁহার নিজের ল্যান্সডাউন প্লেসস্থ বাড়ীতেও লইয়া গিয়াছিলেন।

বিজয় বাবু আলিপুর আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে বহু বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিনি একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। কয়েক বৎসর বঙ্গীয় শাসনপরিষদ ও কলিকাতা করপোরেশনেরও তিনি সভ্য ছিলেন। বিজয় বাবু সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সগোষ্ঠীয় খুল্লতাত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুকার্যে বিজয় বাবু অক্লান্ত ভাবে সহযোগিতা ও সহায়তা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব পরিচালনায় তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, ধর্মপরায়ণ, অমায়িক এবং উদার দেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন। ইদানীং কয়েক বৎসর বহুমূত্র রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তিনি কর্মজীবন হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুতে মঠ ও মিশন একজন পুরাতন ভক্ত এবং অকৃত্রিম বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হারাইলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি— গত ১৪ই ডিসেম্বর এই সোসাইটি ভবনে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, ২২শে ডিসেম্বর স্বামী সুন্দরানন্দজী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী, ২৪শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "খৃষ্টের জন্ম ও বাণী", ২৮শে ডিসেম্বর স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী ও শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত পূজ্যপাদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দিব্য জীবনী, ৪ঠা জানুয়ারী স্বামী সুন্দরানন্দজী, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জীবন-কথা আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত সোসাইটি ভবনে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্বামী বোধাত্মানন্দজী "শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন হইয়াছে।

জনকল্যাণ সংঘ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) —এই প্রতিষ্ঠান গত ১০ বৎসর যাবৎ নদীয়া জেলায় এবং কলিকাতায় ৫টি কেন্দ্র স্থাপন

করিয়া জনহিতকর কার্য করিতেছেন। নোয়াখালি হইতে আগত দুর্গতদের সেবার জন্য কৃষ্ণনগরে একটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে; উহাতে ১৮টি পরিবার এখন সাহায্য পাইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে সেবা করিবার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক নোয়াখালিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি শিবপুরে (নদীয়া) একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। শীঘ্রই এই বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে। এই সংঘ হইতে দুঃস্থগণকে দুগ্ধ ও ঔষধ বিতরণ এবং নানাভাবে সাহায্য করা হইতেছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১৩ই ডিসেম্বর সাতক্ষীরা (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, বার্ণপুর (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতিতে, নন্দিগ্রাম (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ সেবাসদনে এবং ২৯ শে ডিসেম্বর খুলনা গীতামন্দিরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা ভোগ ভজন ও আলোচনাদি হইয়াছে।

কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার নাগ মহাশয়ের কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাসাবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে পূজা, ভোগ ও ভজনাদি হইয়াছে।

এই দিন মুরাদাবাদে (যুক্তপ্রদেশ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আহুত এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর

সাহায্যের জন্য আবেদন

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রচারের ফলে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবন ও শিক্ষা যতই বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শান্তির সঞ্চার করিতেছে, ততই এই গ্রাম এক মহাতীর্থে পরিণত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কামারপুকুর অগণিত মানবকে তীর্থযাত্রায় আকর্ষণ করিবে। বিগত মহাযুদ্ধের দুঃখময় স্মৃতিহেতু ভারতে ও ভারত বহির্ভূত দেশসমূহের জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে।

যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতকে বিশ্বের দরবারে সম্মানার্হ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় আসিয়াছে। তাঁহার গ্রামের উন্নতিবিধান, তাঁহার জন্মস্থানটির সংরক্ষণ ও তথায় তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির নির্মাণ উপস্থিত কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা কামারপুকুরে একটী আশ্রম স্থাপনার সূত্রপাত করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈতৃক ভবনসহ ১৬ বিঘা জমি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইস্থানে উপযুক্তভাবে তাঁহার জন্মস্থানটি সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটি চিকিৎসালয়, স্কুল ও আন্তর্জাতিক অতিথিভবন স্থাপন করা হইবে।

পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে লক্ষাধিক টাকা আবশ্যক। মিশনের পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমাদিগকে এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করেন। এতদুদ্দেশ্যে সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে :—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন গত ২২শে অক্টোবর ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুরে এবং ১১ই নভেম্বর হাইমচরে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া ২৯শে নভেম্বর নোয়াখালি জেলায় রামগঞ্জে সেবাকার্য বিস্তার করেন। শ্রীহট্ট এবং হবিগঞ্জেও মিশন হইতে নোয়াখালির গৃহহারাগণকে সেবা করা হইতেছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্য-বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

চাঁদপুরকেন্দ্র হইতে ৯টি গ্রামের ১০৯টি পরিবারের ৫৭৮জন বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ এবং ১১৫টি বালক-বালিকাকে ৩৮।৭ সের চাল ও ১১১খানা নূতন কাপড় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৬০ জন সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছেন।

হাইমচরকেন্দ্র হইতে চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ১৫টি গ্রামের প্রায় ১০০০ পরিবারভুক্ত ৫০০০ জনের মধ্যে ৬২৬খানা পশমী কম্বল, ৯০২খানা নূতন ও পুরাতন কাপড়, ৩৪১০খানা বাসন এবং আবশ্যকীয় সিন্দুর শাঁখা ও তুলসীর মালা বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মিশনস্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ৩৭১জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

রামগঞ্জকেন্দ্র হইতে রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ১১টি গ্রামের দুঃস্থ জনগণের মধ্যে ৩২৬খানা পশমী কম্বল এবং ৬০৬খানা কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য দুর্গত ব্যক্তিগণকে সাময়িক অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

শ্রীহট্ট কেন্দ্র হইতে গড়ে ২২০ জন গৃহহারাকে দৈনিক দুইবার ভোজন করান হইতেছে এবং প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২০০ জন রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইতেছে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানসমূহে দুঃস্থদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। ইহাদের জন্য শীতবস্ত্র ও ধুতি শাড়ী অত্যাবশ্যক।

গৃহত্যাগী দুর্গতদের সাহায্য দান ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সমস্যা অত্যন্ত জটিল। আমরা সহস্র সহস্র দুর্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নীদের সাহায্যার্থ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :

(১) **সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,**
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

(২) **কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়,**
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(৩) **কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,**
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
২১. ১২. ৪৬

রাজযোগের মূলতত্ত্ব

সম্পাদক

(২)

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি লাভের উপায় স্বরূপে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য মনঃসংযম সহায়ে বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে শরীর ও মন ভিন্ন নয়; উহা শুক্তি ও উহার বাহ্য আবরণের ন্যায় একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন অবস্থা। সূক্ষ্ম মনের শক্তিই স্থূলভূতের সাহায্যে শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে। স্থূলজগৎ সূক্ষ্মজগতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাজেই মনকে সংযম করিয়া সূক্ষ্ম মনোজগৎ বা অন্তর্জগৎকে বশীভূত করিলে স্থূলশরীর বা স্থূলজগৎকে অতি সহজেই বশে আনা যায়। মনোজগৎকে বশীভূত করিবার উপায় বিবেকজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে মনকে নিগ্রহ করিয়া অজ্ঞান নাশ করা। পতঞ্জলি বলেন, "নিরন্তর বিবেকের অভ্যাস অর্থাৎ পুরুষ হইতে প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান অর্জনই অজ্ঞান নাশের উপায়।"[১৯] তাঁহার মতে যোগাঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের ফলে অপবিত্রতা দূর হইলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বিবেকজ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানের চরম অবস্থার নাম বিবেকখ্যাতি। ইহা লব্ধ হইলে অজ্ঞান নাশ হয়।

১৯ বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ
পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ২৬

রাজযোগশাস্ত্রে যোগাঙ্গ আট প্রকার, যথা: "যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি।"[২০] এই যোগাঙ্গগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি সমাধিলাভের ভিত্তি।

"অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে যম বলে।"[২১] শরীর মন ও বাক্য দ্বারা অপর প্রাণীকে কোন প্রকারে ব্যথিত না করাই অহিংসা, দুরভিসন্ধি বর্জন বা ছলনা ত্যাগ করিয়া দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত বিষয় যথাযথ ব্যক্ত করাই সত্য, পরদ্রব্য অপহরণ বা তদিচ্ছা পরিত্যাগই অস্তেয় (অচৌর্য), শুক্রকে অবিকৃত অস্খলিত ও অবিচলিত রাখা বা কামভাব সম্পূর্ণ পরিত্যাগই ব্রহ্মচর্য এবং অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ। পরিগ্রহ করিলে গ্রহীতার অন্তরে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আসক্তি জন্মে। ইহার ফলে গ্রহীতার মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যোগিগণ বলেন, যাঁহার

২০ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণা-
ধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।
পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ২৯

২১ অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।
পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৩০

অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহার নিকট অপর প্রাণী বৈরিতা পরিত্যাগ করে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের বা অপরের জন্য কোন কর্ম না করিয়াই উহার ফল লাভ হয়। অচৌর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট ধনাদি আসিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা ওজঃশক্তি লাভ হয়। অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। যমসাধনা দেশ কাল জাতি ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই অনুষ্ঠেয়। যোগাভ্যাসে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই সকল প্রাথমিক নিয়মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি বিধান একান্ত আবশ্যক।

"শৌচ সন্তোষ তপস্যা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে।"[২২] বাহ্য শৌচ দ্বারা শরীর এবং অন্তঃশৌচ দ্বারা মনের শুচিতা বা পবিত্রতা সাধিত হয়। এই দ্বিবিধ শৌচ দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি একাগ্রতা ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মে। সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ভোগের আশা বা লালসা দমনজনিত মানসিক পরিতৃপ্তিই সন্তোষ, চিন্তা ভাব ও কার্যকে ঈশ্বরমুখী করাই তপস্যা, শাস্ত্র ও মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাসই স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের স্তুতি স্মরণ পূজা প্রভৃতির নাম প্রণিধান।

আসন-অভ্যাস যোগসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। "যাহাতে স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায় উহার নাম আসন।"[২৩] পূর্বলিখিত বত্রিশটি আসনের মধ্যে সিদ্ধাসন পদ্মাসন যোগাসন প্রভৃতি স্থির-ভাবে সুখে বসিয়া থাকিবার এবং অন্যান্য কতকগুলি আসন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষের শক্তি বৃদ্ধি ও রোগ দমন করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও রোগ দমন রাজযোগের উদ্দেশ্য নয়। এইজন্য প্রথমোক্ত সিদ্ধাসনাদি রাজযোগীর অনুষ্ঠেয়। আসন জয় হইলে শীত-গ্রীষ্ম দ্বন্দ্বপরম্পরা যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না এবং তাঁহার সহনশক্তি বৃদ্ধি পায় ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। আসন-গুলির মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন প্রণালী এইরূপ:—

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিতে এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ ও দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া রাখিতে হইবে। এইসঙ্গে নাসিকার অগ্রভাগে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপন করিয়া চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া রাখিলে পদ্মাসন হয়।

এক পায়ের গোড়ালী দ্বারা গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের ঠিক মধ্য ভাগ এবং অপর পায়ের গোড়ালী দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের ঠিক উপরিভাগ চাপিয়া রাখিতে হইবে। শরীর অবক্র অবস্থায় রাখিয়া চিবুক হৃদয়োপরি স্থাপন করিয়া ভ্রূমধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে সিদ্ধাসন হয়।

এই দুইটি আসন প্রাণায়ামের পক্ষে প্রশস্ত।

প্রাণায়াম যোগের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠেয় বিষয়। প্রাণ—মানে প্রাণ-বায়ু বা জীবনী-শক্তি এবং আয়াম অর্থ—সংযম অর্থাৎ "শ্বাস-প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত করাই প্রাণায়াম।"[২৪] যতক্ষণ প্রাণ-শক্তি থাকে ততক্ষণ প্রাণী জীবিত থাকে, প্রাণ-শক্তি নষ্ট হইলে প্রাণীর মৃত্যু হয়। প্রাণ-বায়ু চঞ্চল হইলে চিত্ত চঞ্চল এবং প্রাণ-বায়ু স্থির থাকিলে চিত্ত স্থির থাকে। যোগিগণ বলেন, প্রাণ-বায়ুরূপী প্রাণ-শক্তিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ ও স্থানবিশেষে ধারণ করিতে পারিলে মানুষ তাহার শরীর ও মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে।

২২ শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৩২

২৩ স্থিরসুখমাসনম্। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৪৬

২৪ তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৪৯

প্রাণায়াম আভ্যন্তরবৃত্তি স্তম্ভবৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। শ্বাস গ্রহণ দ্বারা বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া উহাকে শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম আভ্যন্তরবৃত্তি বা পূরক, প্রপূরিত বায়ুরাশিকে শরীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখার নাম স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক এবং প্রশ্বাস দ্বারা বা শ্বাস ত্যাগ করিয়া শরীরমধ্যস্থ বায়ুরাশিকে বাহির করিয়া দেওয়ার নাম বাহ্যবৃত্তি বা রেচক। পর্যায়ক্রমে এই পূরক কুম্ভক ও রেচক অনুষ্ঠানই প্রাণায়াম।

যোগিগণ বলেন যে, মানুষের মেরুদণ্ডের বাম দিকে ইড়া ও দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা এবং মেরুমধ্যস্থ মজ্জার মধ্য দিয়া সুষুম্না নাড়ী নামে তিনটি নাড়ী বা নালী আছে। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নস্থ ত্রিকোণাকার মূলাধার কুণ্ডলিনীর মধ্যভাগ হইতে সর্বোপরি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম পর্যন্ত অবস্থিত। মূলাধারে কুণ্ডলাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা। মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ীতে গুহ্যের উপরে ও লিঙ্গের নিম্নে মূলাধারপদ্ম, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, নাভিমূলে মণিপুরপদ্ম, হৃদয়দেশে অনাহতপদ্ম, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধপদ্ম, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আজ্ঞাপদ্ম আছে। ইহাদের নাম ষট্‌চক্র। যোগী প্রাণায়াম দ্বারা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া সুষুম্না নালীর ভিতর দিয়া ক্রমে ষট্‌চক্র ভেদ বা অতিক্রম করিয়া মস্তিষ্কস্থ সহস্রারে উপনীত করেন। কুণ্ডলিনী শক্তি এক এক চক্র ভেদ করিলে যোগীর এক এক প্রকার (ক্রমেই অধিকতর) অলৌকিক দিব্যানুভূতি হইয়া থাকে। পরিশেষে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে উপনীত করিলে তিনি সমাধি লাভ করেন।

প্রাণায়ামের সাধারণ প্রণালী এইরূপ: প্রথমে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা চারি সেকেণ্ড কাল ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ করিতে হইবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসা ষোল সেকেণ্ড কাল বন্ধ রাখিয়া দৃঢ় ভাবে ভাবিতে হইবে যেন স্নায়ুপ্রবাহ নিম্নদেশে যাইয়া ত্রিকোণাকার পদ্মস্থিত সুষুম্নার মূলদেশে আঘাত করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতেছে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে আট সেকেণ্ড কাল বায়ু রেচন করিতে হইবে। ইহাই একটি প্রাণায়াম। তৎপরে বাম নাসা তর্জনী দ্বারা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ এবং পুনরায় পূর্বের মত উভয় নাসা বন্ধ রাখিয়া আবার রেচন করিতে হইবে। পূরক কুম্ভক ও রেচক কালে তালে তালে ওঁকার স্মরণ করা বিধেয়। প্রাণায়াম প্রথমতঃ উষাকালে চারিবার ও সূর্যাস্তের সময়ে চারিবার অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে প্রাণায়ামের সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উচ্চতর প্রাণায়াম করিতে হইবে। উত্তম প্রাণায়ামে দেহ আসন হইতে উত্থিত, মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন এবং অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম হয়। আনন্দলাভ, মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি, সুন্দর কণ্ঠস্বর, মানসিক প্রশান্তি, জ্যোতির্দর্শন, মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতি উত্তম প্রাণায়ামের লক্ষণ।

প্রাণায়ামক্রিয়ায় নাড়ীসমূহের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালন করিতে হয়। নাড়ীগুলি সাধারণতঃ মলপূর্ণ থাকে বলিয়া উহা দূর করিবার জন্য প্রাণায়ামের পূর্বে নাড়ী শুদ্ধ করা উচিত। নাড়ীশুদ্ধির সহজ প্রণালী: বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা (পিঙ্গলা) বন্ধ করিয়া বাম নাসা (ইড়া) দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিতে হয়, পরে কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্জনী দ্বারা বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচন এবং পুনরায় পূরণ করিয়া বাম নাসা

দ্বারা রেচন করিতে হয়। উষা মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে নাড়ীশুদ্ধিক্রিয়া চারি পাঁচবার করিলে এক মাসের মধ্যেই নাড়ীশুদ্ধি হইয়া থাকে।

"যখন ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন উহাকে প্রত্যাহার বলে।"[২৫] ইন্দ্রিয়সমূহ মনেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র। উহারা বিষয়গুলির সম্পর্কে আসিলেই উহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাদের আকার ধারণ করে। মনের এই বিভিন্ন আকৃতিধারণ নিবারণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়-গুলি বশীভূত এবং মন শান্ত হয়। ইহাই প্রত্যাহার। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে মন কাম ক্রোধাদি রিপু এবং লাভ-ক্ষতি সুখ-দুঃখ সুগন্ধ-দুর্গন্ধ সুশ্রাব্য-অশ্রাব্য পুরস্কার-তিরস্কার প্রভৃতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বরূপাবস্থায় শান্ত ভাবে অবস্থান করে। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ, জীবের দুঃখে করুণা প্রকাশ, সৎকর্মে মুদিতা (আনন্দ) জ্ঞাপন এবং অসৎকর্মে উপেক্ষা প্রদর্শন প্রত্যাহার অভ্যাসের সহায়ক। এতদ্ভিন্ন প্রত্যাহার সাধনের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক যৌগিক ক্রিয়া আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ হইতে মনকে তুলিয়া আনিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত রাখাই এই সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

"মনকে শরীরের ভিতরে বা বাহিরে কোন বস্তুতে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা।"[২৬] যে বস্তুতে মনকে ধারণ করা হয়, সেই বস্তু ভিন্ন অন্যান্য বস্তু চিন্তার অবিষয় হইলে ধারণা সিদ্ধ হয়। আসন দ্বারা দেহ, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু এবং প্রত্যাহার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া ধারণা সাধন করিলে উহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। রাজযোগিগণ চিত্তকে নাসাগ্রে ভ্রূমধ্যে হৃৎপদ্মে নাড়ীচক্রে দেবদেবী ও গুরুমূর্তিতে এবং হঠযোগিগণ পঞ্চভূতের পঞ্চতত্ত্বে ধারণা করিতে উপদেশ দেন। এই ধারণাসমূহের মধ্যে এক এক প্রকার ধারণায় এক এক প্রকার অলৌকিক অনুভূতি হয়।

ধারণার পরিপক্ক অবস্থাই ধ্যান। "যে বস্তুতে মনকে আবদ্ধ করা হয়, সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর এক ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে উহাকে ধ্যান বলে।"[২৭] মনকে কোন বস্তুবিশেষে ধারণ করিয়া তদ্বিষয়ক কতকগুলি বিশেষ বৃত্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে অন্যান্য বহু বৃত্তি মনে উপস্থিত হয়। এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলিকে অধ্যবসায় সহকারে দমন করিতে পারিলে উহারা নষ্ট হয় এবং প্রথমোক্ত বৃত্তি-গুলি প্রাধান্য লাভ করে। শেষে বহু বৃত্তিও নাশ হইয়া একটি বৃত্তিমাত্রে পর্যবসিত হইলে ধ্যান সিদ্ধ হয়। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যদি মনকে কোন স্থানে বার সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বাদশগুণিত হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে এক সমাধি হইবে।"[২৮] ধ্যান পরিপক্ক হইলেই সমাধি হয়। এই জন্য ধ্যানই যোগীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য সমাধিলাভের একমাত্র উপায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "ধ্যানই জীবগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ।"[২৯]—অর্থাৎ ধ্যান না করিলে

২৫ স্ববিষয়াসম্প্রয়োগভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৫৪

২৬ দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। পাঃ যোঃ, বিভূতিপাদ, ১

২৭ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। পাঃ যোঃ, বিভূতিপাদ, ২

২৮ স্বামী বিবেকানন্দ কৃত রাজযোগ, ১১৮পৃঃ

২৯ ধ্যানমেব হি জন্তূনাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

জীব বদ্ধ থাকে এবং ধ্যান করিলে মুক্ত হয়। যিনি যে ধর্মমতে বা যে ধর্মপথেই সাধন করুন না কেন, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুর সকল ধর্মসম্প্রদায়েই ধ্যানযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া পরিগৃহীত।

ধ্যান প্রধানতঃ স্থূলধ্যান জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যান ভেদে ত্রিবিধ। হঠযোগিগণ মূর্তিময় ইষ্টদেবদেবী ও গুরুর ধ্যানকে স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের ধ্যানকে জ্যোতির্ধ্যান এবং বিন্দুময় কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যানকে সূক্ষ্মধ্যান বলেন। এই তিনটি পর্যায়ক্রমে অধম মধ্যম ও উত্তম। কিন্তু স্থূলধ্যানে পরিপক্কতা না জন্মিলে সূক্ষ্মধ্যানে অধিকার জন্মে না। রাজযোগমতে আত্মস্বরূপের ধ্যানই সূক্ষ্মধ্যান। এতদ্ভিন্ন সগুণধ্যান ও নির্গুণধ্যান নামক দুইপ্রকার ধ্যান আছে। হৃদয়পদ্মে ইষ্টদেবদেবী অবতার ও গুরুর ধ্যানকে সগুণধ্যান এবং আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মারূপে চিন্তা করাই নির্গুণধ্যান। সগুণধ্যান অপেক্ষা নির্গুণ ধ্যান শ্রেষ্ঠ। শূন্যধ্যানই নির্গুণধ্যান। ইহা অতি উচ্চাঙ্গের ধ্যান বলিয়া স্বীকৃত। যোগশাস্ত্রে আছে, "যে যোগী অবস্থানকালে গমনকালে শয়নকালে ও ভোজনকালে অহর্নিশি শূন্যধ্যান করেন তিনি আকাশময় হইয়া চিদাকাশে লয় প্রাপ্ত হন।"[৩০] ইহাই বৌদ্ধ শূন্যবাদীদের শূন্যধ্যান। এই ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। ইহাতে সর্বশূন্যরূপ নির্বিষয়ের ধ্যান করিতে হয় বলিয়া মনকে একেবারে বিষয় বা বৃত্তিশূন্য করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন যোগশাস্ত্রে বহুবিধ ধ্যানের প্রণালী বর্ণিত আছে।

ধ্যান গাঢ় হইলে যখন ধ্যানজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না এবং চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়, তখন সমাধি হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই প্রকাশ করে, তখন উহাকে সমাধি বলে।"[৩১] সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুই প্রকার। যে সমাধিতে বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে উহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে। এ জন্য ইহাকে সম্যক জ্ঞানযুক্ত সমাধি বলে। এই সমাধি বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিপ্রকার। বিতর্ক মানে প্রশ্ন। বিতর্ক সমাধি আবার সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক ভেদে দ্বিবিধ। যে সমাধিতে দেশ-কালের অন্তর্গতরূপে বাহ্য স্থূল ভূত ধ্যেয় উহাকে সবিতর্ক বলে। ইহাতে শব্দ অর্থ এবং তৎপ্রসূত জ্ঞান থাকে। এই জন্য ইহাকে সবিতর্ক বা বিতর্কযুক্ত সমাধি বলা হয়। যে সমাধিতে দেশ-কালের অতীতরূপে ভূতের স্বরূপ চিন্তা করা হয় উহাকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। এই সমাধি লাভ করিলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় বলিয়া স্মৃতিতে গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ)-সম্পর্ক থাকে না এবং উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থ মাত্র প্রকাশ করে। এইজন্য ইহাকে নির্বিতর্ক বা বিতর্কশূন্য সমাধি বলা হয়। যখন ভূত-তন্মাত্রগুলিকে দেশ-কালের অন্তর্গতরূপে চিন্তা করা হয়, তখন উহাকে সবিচার সমাধি এবং যখন ভূত-তন্মাত্রগুলিকে দেশ-কালের অতীত রূপে ভাবা হয়, তখন উহাকে নির্বিচার সমাধি বলে। এই সমাধির পরবর্তী অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভূত এবং উহাদের তন্মাত্রগুলির চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। অন্তঃকরণকে রজঃ ও তমঃ গুণযুক্ত

৩০ তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥
—যোগতত্ত্ববারিধি

৩১ তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।
পাঃ যোঃ, বিভূতিপাদ, ৩

রূপে চিন্তা করিলে উহাকে সানন্দ সমাধি এবং অন্তঃকরণকে রজঃ ও তমঃ লেশশূন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপে চিন্তা করিলে ও সমাধি গাঢ় হইলে স্থূলসূক্ষ্ম ভূতের চিন্তা ছাড়িয়া মনের স্বরূপাবস্থা যখন ধ্যেয় হয় ও সাত্ত্বিক অহংকার মাত্র অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক হইয়া বিদ্যমান থাকে, তখন উহাকে সাস্মিতা সমাধি বলে। এই অবস্থা লাভ করিলে যোগী বিদেহ নামে অভিহিত হন। বিদেহ যোগীর স্থূল দেহজ্ঞান থাকে না। তিনি আপনাকে স্থূলদেহী মনে না করিয়া সূক্ষ্মদেহী বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থায় লয়প্রাপ্তিকে প্রকৃতিলয় বলে। যে যোগী এইরূপ সূক্ষ্মভোগেও সন্তুষ্ট হন না তিনিই চরম লক্ষ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। এই সমাধিতে সমুদয় মানস ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি-সমূহ দমিত হইয়া সংস্কার বা বীজাকারে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই উহারা পুনরায় প্রকাশিত হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সংস্কারগুলি নির্বীজ হয়। এইজন্য এই সমাধিকে নির্বীজ সমাধিও বলে। নির্বীজ সমাধিতে সংস্কার-বীজ একেবারেই থাকে না। এই সমাধিতে মন সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জিত হয়। এই অবস্থায় মনের সর্ববিধ বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় মন শূন্য আকার ধারণ করে এবং যোগী জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হন। যোগশাস্ত্র মতে অজ্ঞান নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা এবং জ্ঞানাতীত উচ্চাবস্থা। জ্ঞানাতীত অবস্থাকে বিজ্ঞানী অবস্থা বলে। এই বিজ্ঞান-ভূমিতে উপনীত হইলে সৎ ও অসৎ উভয় বৃত্তি ও অজ্ঞান অন্তর্হিত হয়। ইহার ফলে যোগী সর্ব-বন্ধনবিমুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুচক্রের বাহিরে চলিয়া যান এবং তাঁহার আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তরূপে স্বমহিমায় প্রকাশিত হন।

ধ্যানাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি অভ্যাস করিলে যোগীর 'সংযম জয়' হয়। "ধারণা ধ্যান ও সমাধি যখন একত্র ও এক বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, তখন উহাকে সংযম বলে।"[৩২] সংযমজয় হইলে বস্তুর বাহ্য আকারটি চলিয়া যায়, মনে কেবল উহার অর্থ (বিষয়) মাত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংযম-জয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে যোগীর অনেক প্রকার যোগ-বিভূতি প্রকাশ পায়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞা বা সর্বজ্ঞতা এবং নিম্নলিখিত অষ্টসিদ্ধি প্রধান: (১) অণিমা (শরীরকে অণুতে পরিণত করা), (২) লঘিমা (শরীরকে লঘু করা), (৩) মহিমা (শরীরকে বৃহৎ করা), (৪) প্রাপ্তি (দূরের পদার্থ নিকটে আনয়ন), (৫) প্রাকাম্য (ইচ্ছামত কাজ করা), (৬) বশিত্ব (ভূতসকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা), (৭) ঈশিত্ব (ভৌতিক পদার্থের উপর প্রভুত্ব স্থাপন), (৮) যত্রকামাব-সায়িত্ব (সত্যসংকল্পতা বা ভৌতিক পদার্থে যাহা মনন করা যায় তাহাই হওয়া)।

যে কোন ভাব বা বিষয়ের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে তদ্বিষয়ক সর্ববিধ অলৌকিক শক্তিলাভ করিতে পারেন। যথা—মৈত্রী করুণা মুদিতা নামক ভাবত্রয়ের উপর সংযম করিলে যোগীর এই তিনটি বিষয়ক শক্তি জন্মে। ইহার ফলে সকল প্রাণী তাঁহার মিত্র হয় এবং তিনি জীবের সুখ দান ও দুঃখ দূর করিতে পারেন। কিন্তু মুক্তিকামী যোগীর পক্ষে এই সকল যোগৈশ্বর্যে আসক্ত হওয়া বা আনন্দ বোধ করা উচিত নয়। কারণ, এইগুলি মুক্তিপথের প্রবল বিঘ্ন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "এইগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যোগীর কৈবল্যলাভ হয়।"[৩৩]

৩২ ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।
পাঃ যোঃ, বিভূতিপাদ, ৪

৩৩ তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।
পাঃ যোঃ, বিভূতিপাদ, ৫১

এই বিঘ্নগুলি দূর করিবার উপায় সদসদ্‌বিচার— আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান— তত্ত্বজ্ঞান। একমাত্র পুরুষ বা আত্মাই সত্য, অন্যান্য সকলই অজ্ঞানজাত প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া মিথ্যা, এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই যোগ-বিভূতিরূপ বিঘ্নসমূহ দূর করিয়া কৈবল্য লাভের একমাত্র উপায়। ইহাই যোগশাস্ত্রে বিবেক-খ্যাতি। কৈবল্য মানে আত্মা বা পুরুষের কেবল হওয়া অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া আপনাকে পূর্ণকাম ও পূর্ণতৃপ্ত বোধ করা। যখন তত্ত্বজ্ঞান-বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন যে, মন আত্মা নহে, উহা প্রকৃতির অন্তর্গত নশ্বর পদার্থ, তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায়ও মাঝে মাঝে সংস্কার হইতে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানই এই বিঘ্ন বা ক্লেশ নাশ করিবার উপায়। কিন্তু কৈবল্যকামী যোগীর পক্ষে এই তত্ত্বজ্ঞানজনিত ঐশ্বর্যও ত্যাগ করা আবশ্যক। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, এই ঐশ্বর্য ত্যাগ করিলে যোগীর ধর্মমেঘ সমাধি হয় বা আত্মা স্বরূপপ্রাপ্তির যোগ্য হন। তখন যোগীর পাপ তাপ ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয় কিছুই থাকে না। তিনি আপনার ব্রহ্মস্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়া কেবল অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই নির্বিকার কেবল অবস্থা লাভই কৈবল্য বা মোক্ষ-প্রাপ্তি।

স্বপ্ন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমি মোরে খুঁজিয়া না পাই
এই বিশ্বকোলাহলে। মোর যেন ঠাঁই
হেথাকার সীমা ছাড়া দূর কোন শান্ত স্বপ্নলোকে।
এ আকাশ এ বাতাস এ মাটি আলোকে
সে জগৎ নহে সৃষ্ট—সেথায় জীবন
লক্ষ্যহীন ভ্রান্তিপূর্ণ মূঢ় প্রহসন
নহে হেথাকার মত। মুক্ত স্বচ্ছ জ্ঞান
জন্মমৃত্যু-কুহেলিকা ভেদি অবিরত করে তথা দান
অক্ষয় অনাদি সত্য বস্তুতে বস্তুতে—
জীবে জীবে, মানুষের কর্মে, চিন্তাস্রোতে।

সেই মম নিজ গৃহ মাঝ
নিজ অন্বেষণে প্রাণ চাহে ছুটে যেতে আজ।
ক্ষান্ত হোক, ক্ষান্ত হোক খেলা কান্নাহাসি
ধাবমান পৃথিবীর। শুভ্র নিদ্রা আসি
মুছে দিক্‌-হেথাকার মত্ত জাগরণ। নিস্পন্দতা বুকে
রচিয়া উঠুক নব সত্য-জ্ঞান-আনন্দ আলোকে
আমার হৃদয় স্বপ্ন সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব ক্লান্তিহর
আপন অন্তর সত্তা নিত্য স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাস্বর।

সংশয়নিবৃত্তি

সাধু প্রজ্ঞানাথ (উত্তর কাশী)

সংশয় বিচারের হেতু। বিচারমূলে যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দুইপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। অযথার্থ জ্ঞান আবার দুইপ্রকার, যথা—সংশয়রূপ ও নিশ্চয়রূপ। ভ্রমকেই অযথার্থ বলা হয়। অতএব সংশয়ও ভ্রমই বটে। কোন অধিষ্ঠানে অন্য বস্তুর অবভাসকে ভ্রম বলে। অতএব সংশয়জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ উভয়কোটিক হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে অন্যতরের অভাব হয়। অতএব সংশয়জ্ঞানে ভ্রমের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সংক্ষেপে সংশয়ের এরূপ লক্ষণ করা যাইতে পারে—একই বিশেষ্যে দুই বিরুদ্ধ বিশেষণজ্ঞানের নাম সংশয়। যথা—একই স্তম্ভে, স্তম্ভ বা অন্য কিছু অথবা পুরুষজ্ঞান। এখানে স্তম্ভ বিশেষ্যপদ, স্তম্ভত্ব ও স্তম্ভত্বাভাব বিশেষণজ্ঞান। একই অধিকরণে উভয় জ্ঞান থাকিতে পারে না। এজন্য উভয়ই স্তম্ভের বিশেষণ হইতে পারে না। কারণ, এখানে সংশয়ের লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন স্তম্ভে স্তম্ভত্ব ও তাহার অভাব একই কালে থাকিতে পারে না, তেমন একই স্তম্ভে স্তম্ভত্ব ও পুরুষত্ব পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণ একই কালে থাকিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী সংশয় পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবাভাবকে বিষয় করিতেছে, দ্বিতীয়টি কিন্তু বিরুদ্ধ দুই বস্তুর ভাবকেই বিষয় করিতেছে। সংশয়ে বিশেষ্যভাগ ধর্ম্মী ও বিশেষণভাগ ধর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব একই ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশয় বলা যায়। আমরা সোম পান করিয়াছি অতএব অমর হইয়াছি। দক্ষিণাদাতা যজমান অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্ম্মের মুক্তি-হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার আত্মবিৎ শোক হইতে পরিত্রাণ পান, জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়, কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন ও বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে, ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি-বাক্য দ্বারা জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, এ বিষয়ে সংশয় যাহার হয়, এরূপ মুমুক্ষু সম্যক্ অধীতবিদ্য হইলেও সংশয়-গ্রস্ত হওয়ায় জ্ঞানের ফল মোক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। সংশয়াত্মার কেবলমাত্র যে মুক্তি হয় না এমন নহে, ইহলোকে ও পরলোকে উভয়লোকেই তাহার সুখ হইতে পারে না। মহাপাপ হইতেই মুমুক্ষুর এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংশয়ই সকল অনর্থের বীজ। অজ্ঞান ও বিপর্য্যয় মোক্ষের বিরোধী, পরন্তু সংশয় ভোগ ও মোক্ষ উভয়েরই বিরোধী। পরস্পরবিরুদ্ধ কোটিদ্বয়কে অবলম্বন করায় যখন সংসারভোগের জন্য প্রবৃত্তি জন্মে তখন মোক্ষমার্গের বুদ্ধি তাহাকে রোধ করে। মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে ভোগবুদ্ধি তাহাতে প্রতিবন্ধ জন্মাইয়া থাকে। এজন্য মুমুক্ষুর সর্ব্বপ্রযত্নে শাস্ত্র গুরু আত্মজ্ঞত্বাদি বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া কর্ত্তব্য। সংশয় তত্ত্ব-জ্ঞানের মহাশত্রু। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত পুরুষের বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না।

এবিষয়ে একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা আছে। এক রাজার ভর্ত্তৃ নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

রাজা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহার উপর অমাত্যগণের বিদ্বেষ জন্মে। তাঁহারা একত্র হইয়া প্রতিহারীকে বলিয়া সেই ব্রাহ্মণের রাজদর্শন বন্ধ করিয়া দেন। কিছুদিন রাজা তাঁহাকে না দেখিয়া অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, সে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে।" রাজা তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন। একদিন রাজা শিকার করিবার জন্য বনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাস্তাঘাট পরিষ্কার হইতেছিল। ভর্চ্ছু খবর পাইয়া মনে করিলেন উত্তম সুযোগ ঘটিয়াছে, আমি রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষে উঠিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং অমাত্যগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিব। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। যখন রাজার রথ বৃক্ষের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভর্চ্ছু বৃক্ষ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমি জীবিত আছি।" রাজা অমাত্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা বলিয়াছিলে, ভর্চ্ছু মরিয়া গিয়াছে, এখন সে কোথা হইতে আসিল?" অমাত্যগণ বলিলেন, "মহারাজ, ভর্চ্ছু মরিয়া ভূত হইয়াছে। এখান হইতে শীঘ্র চলুন, নতুবা আপনার অনিষ্ট হইতে পারে।" উঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন।

সন্দিগ্ধ বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ও সন্দিগ্ধ হইলে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। মহাবাক্যজন্য জ্ঞানও যদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

সংশয় আবার দুই প্রকার—প্রমাণগত সংশয় ও প্রমেয়গত সংশয়। প্রমাণবিষয়ক সংশয়কে প্রমাণসংশয় কহে। উপনিষদ্বাক্য অদ্বৈত ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ কি না, এইরূপ সংশয়কে প্রমাণসংশয় বলে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় পাঠ করিলে এই সংশয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রমেয়গত সংশয় আত্মানাত্মভেদে দ্বিবিধ। অনাত্মসংশয়ের অসংখ্য ভেদ আছে। যে বিষয়ে যে অভিজ্ঞ, সে বিষয়ে তাহার উপদেশ লইয়া উক্ত সংশয় দূর করা কর্ত্তব্য। এজন্য রোগ হইলে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ লওয়া, মকদ্দমাতে উকিলের ও রাজনৈতিক বিষয়ে রাজনীতিজ্ঞের পরামর্শ লওয়া লোকসমাজে চলিয়া আসিতেছে। এমন কোন লোক পৃথিবীতে নাই যিনি সব বিষয়েরই একটা অসন্দিগ্ধ উপদেশ দিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ সকল বিষয়ের উপদেষ্টা হইতে যান, তাঁহাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। অনধিকারচর্চ্চা করিতে গেলে অনধিকারী পুরুষকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। একটী দোঁহা আছে—

জিস্‌কা বানরীয়া সো নাচাবে।
দুস্‌রা নাচাবে তো কাটকে খাবে॥

অনাত্মসংশয়ের অন্ত কেহ কখনও পাইতে পারে না। উহার অন্ত করিবার জন্য চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। অনর্থক জানিয়া উহাদের বিষয়ে উদাসীন থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আত্মসংশয়েরও অন্ত নাই। যথা—আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? অভিন্ন হইলে সর্ব্বদা অভিন্ন অথবা মোক্ষকালে অভিন্ন? সর্ব্বদা ভিন্ন হইলে আনন্দাদিসম্পন্ন অথবা নহে? আনন্দাদিসম্পন্ন হইলে অনন্তাদি ইহার গুণ অথবা স্বরূপ?—ইত্যাদি নানা সংশয় হইয়া থাকে। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, ভিন্ন হইলে অণুপরিমাণ মধ্যমপরিমাণ অথবা বিভুপরিমাণ বিভু হইলে কর্ত্তা অথবা অকর্ত্তা অকর্ত্তা হইলে এক অথবা অনেক?—ইত্যা[দি] অনেক প্রকার সংশয় হইতে দেখা যা[য়।] তৎপদার্থবিষয়কও তদ্রূপ অনেক প্রকার সং[শয়]

হইয়া থাকে। যথা, বৈকুণ্ঠাদি লোকবাসী পরিচ্ছিন্ন হস্তপদাদিসম্পন্ন অথবা নহে? শরীর-রহিত হইলেও বিভু অথবা অবিভু? বিভু হইলে পরমাণুসাপেক্ষ জগৎকর্ত্তা অথবা নিরপেক্ষ জগৎকর্ত্তা? যদি পরমাণুনিরপেক্ষ হন তবে কেবল কর্ত্তা অথবা অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কর্ত্তা? কর্ত্তা প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ অথবা প্রাণিকর্ম্ম-সাপেক্ষ? ইত্যাদি তৎপদবিষয়ক প্রমেয়গত অসংখ্য সংশয় হয়। মননের দ্বারা অথবা ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বিচার দ্বারা ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হয়।

সংশয় লইয়া কেহ বসিয়া থাকিতে পারে না। মেঘ দ্বারা আকাশ যেরূপ আবৃত হয় তদ্রূপ সংশয় দ্বারা মন আবৃত হয়। সংশয় জ্ঞানের প্রকাশ হইতে দেয় না। যতক্ষণ সংশয়চ্ছেদ না হয় ততক্ষণ মনের আবরণ দূর হয় না, মন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সংশয় মনের ধর্ম্ম। বুদ্ধি যখন নিশ্চয় করিয়া দেয় যে এই বস্তু মনের অনুকূল, তখন মন উহাকে গ্রহণ করে এবং বুদ্ধি যখন উহাকে প্রতিকূল বলিয়া নিশ্চয় করে, তখন মন উহাকে ত্যাগ করে। মনের বস্তুগ্রহণের নাম সঙ্কল্প এবং ত্যাগ করার নাম বিকল্প। মনের এই সঙ্কল্প ও বিকল্প বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। অতএব নিশ্চয় না করা পর্য্যন্ত মন প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সংশয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের রোধক। অতএব নিশ্চয় দ্বারা সংশয়কে জয় করিতে হয়।

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সংশয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির বধের ভয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যদিও পরে বিচারপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি সাময়িক মোহবশতঃ শস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। যুদ্ধ যাহাতে না হইতে পারে, তাহার জন্য অশেষ যত্ন করা হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান দুর্য্যোধনের নিকট যাইয়া পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচ খানা গ্রাম ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও দিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সাম দান ভেদ—এই তিন উপায়ের মধ্যে যখন কোন উপায়ই কার্য্যকরী হইল না, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। এরূপ যুদ্ধে বিচারপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবশতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে ক্ষুক হইলেন। র গুরু প্রভৃতিতে মমত্ববুদ্ধিনিমিত্ত শোক মোহ হইয়াছিল। ইহার নিবৃত্তির গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ধর্ম্মে সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। জিজ্ঞাসা না হইলে উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। অতএব শুভক্ষণেই অর্জ্জুনের সংশয় হইয়াছিল এবং তাহার সংশয় নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের এক মহান লাভ হইল। কেবলমাত্র অর্জ্জুন নহেন, পৃথিবীর যাবতীয় জীবই শোকমোহাবিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ স্বধর্ম্মত্যাগ ও নিষিদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কাজ করেন তাঁহাদেরও শারীরিক বাচিক মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলাভিসন্ধি ও অহংকারবশতঃই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ফলে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপচয়বশতঃ ইষ্টানিষ্ট হইয়া থাকে। বিচার ও জ্ঞান ব্যতীত সংসারের উপশম কখনও হইতে পারে না। অতএব ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত

ক শোকসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া ভগবান সর্ব্বপ্রাণিসাধারণের হিতের জন্য অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া প্রথমে শোকমোহ নিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের উপদেশ করিয়াছেন। আত্মা স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ; তাঁহাতে সাংসারিক ধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ ত্রিবিধ

শরীরের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিলে সত্যত্ব-বুদ্ধি ও ধর্ম্মত্বাদির আভাসরূপ যে মোহ জাত হয় তাহা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধে হিংসাদির বাহুল্য দেখিয়া তৎকালীন স্নেহদোষাদি-বশতঃ অর্জ্জুনের অধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তিন প্রকার উপাধির বিবেকদ্বারা শুদ্ধাত্মার জ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্ত্তক। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বধর্ম্ম বলিয়া হিংসাদি আচরণ করিলেও অধর্ম্ম হয় না, এইরূপ বোধই অসাধারণ মোহের নিবর্ত্তক। মমতা হইতেই শোক হইয়া থাকে। মমতার নিবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা হইলেই শোক থাকিতে পারে না। অতএব ইহার জন্য কোন পৃথক সাধনের প্রয়োজন নাই। সেইজন্য শ্রীভগবান্ অশোচ্যান্ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ইত্যন্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব ও শোক-মোহাদির অত্যন্তাভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই উপায়কে অপবাদমার্গ বলে। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে ইত্যাদি হইতে সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি পর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা অধ্যারোপমার্গে সর্ব্বব্রহ্মময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা অর্জ্জুনের আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন শোকমোহ দূর হইবে না মনে করিয়া শ্রীভগবান প্রথমে আত্মজ্ঞানেরই উপদেশ করিয়া-ছিলেন। আত্মজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা মোহ দূর করিয়া তাঁহার অধিকারানুরূপ কর্ম্মযোগেরই উপদেশ করিতেছেন। অর্জ্জুনের যদিও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার ছিল না—তাহাতে বৈরাগ্যবান বিরক্তেরই অধিকার —তথাপি জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন শোকমোহনিবৃত্তির উপায় নাই বলিয়া জ্ঞানেরই উপদেশ করিয়াছিলেন। শোক অজ্ঞানেরই লিঙ্গ। শ্রীভগবান ইহাও দেখাইয়াছেন যে যাহার অজ্ঞান আছে, তাহারই ভ্রম (ধর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি ও অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধি) হইয়া থাকে। ভ্রমযুক্ত ব্যক্তির তৎপদার্থ পরিশোধনক্রমে মহাবাক্য দ্বারা সম্যক জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে। ইহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের নিয়মও সূচিত হইল। প্রথমা-ধ্যায়ে সংশয় ও তাহার নিমিত্তকারণ দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার সূত্রিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া শমাদিসাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম পালন করা উচিত—দেখান হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের অন্তে শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥"

এখানেই অর্জ্জুনের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ শেষ হইয়া গেল। অর্জ্জুন নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের অধিকারী—সন্ন্যাসের অধিকারী নহেন। এজন্য সংশয় ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ পালন করিতে ভগবান তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানযোগের অধিকারী হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে হয়, অন্যথা জ্ঞানের ফল লাভ করা যায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বলিয়াছেন, তৃতীয় ও চতুর্থাধ্যায়ে কর্ম্ম-যোগ বলা হইয়াছে। অতএব অর্জ্জুনের সংশয় হইল ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী পালন করা কর্ত্তব্য? স্থিতি ও গতির ন্যায় একই পুরুষ উভয়কে একই কালে পালন করিতে পারে না। এজন্য পঞ্চমা-ধ্যায়ের প্রথমেই প্রশ্ন হইতেছে উক্ত কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোনটী অর্জ্জুনের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ভগবান বলিলেন, অধিকারিভেদে উভয়ই নিঃশ্রেয়স্কর হইলেও অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ।

ভাগবতেও উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে একাদশ স্কন্ধে ভগবান ইহাই বলিয়াছেন। "হে উদ্ধব, আমি তিন প্রকার যোগ মনুষ্যমাত্রের জন্যই বলিয়াছি

যাঁহারা বৈরাগ্যবান তাঁহাদের জন্ম জ্ঞানযোগ, কামিপুরুষের জন্ম কর্ম্মযোগ ও বিশেষ বিরক্তও নহে, বিশেষ আসক্তও নহে, এইরূপ মুমুক্ষুর জন্ম আমি ভক্তিযোগ বলিয়াছি। যাহার যাহাতে অধিকার আছে, সে অধিকারানুসারে যত্ন করিলে তদ্দ্বারাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। যতদিন না জীব প্রবল বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ততদিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে। ভগবৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে কর্ম্মত্যাগ করিবে। নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিলে স্বর্গ বা নরকাদি প্রাপ্তি হয় না। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে জীব ভক্তি বা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান ও ভক্তির সাধক বলিয়া দেবতাগণ এই লোকের ইচ্ছা করিয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের এই সংবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনটিই শ্রেয়ের সাধন। সেই শ্রেয়ঃ আত্যন্তিক বা আপেক্ষিক এখানে ইহাই বিচার্য্য।

যোগ্যতা প্রাপ্ত না হইয়া জ্ঞানের জন্ম যত্ন করিলে জ্ঞানলাভ ত হইবেই না, সময়ও বৃথা নষ্ট হইবে। যাহার অক্ষরজ্ঞান হয় নাই সে কি শাস্ত্র পড়িতে পারে? তাহাকে বর্ণবোধাদি পড়িয়াই শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সেরূপ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তি হইলে জ্ঞান লাভ করা স্বাভাবিক। মুক্তির জন্ম জ্ঞান ভিন্ন অন্ম উপায় নাই। ইহা শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" উক্ত জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বিবিধ উপায় ভগবান সাংখ্যযোগ ও বুদ্ধিযোগ দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন। উপায় দুই হইলেও উপেয় একই। অতএব একই নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও যোগ ভেদে দুইপ্রকার বলিয়াছেন। সাংখ্যগণ আত্মা ও অনাত্মার বিচারক্রমে বেদান্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করেন। যোগিগণ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বযোগ আশ্রয় করিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ভক্তি কর্ম্মযোগেরই এক অঙ্গ। এজন্ম যোগদর্শনে—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ভক্তিকে সমাধির উপায় বলিয়াছেন। ইহজন্ম বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হইলে বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষের গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণমাত্র পূর্ব্বাভ্যস্ত বিদ্যার ন্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। যাহারা মধ্যমাধিকারী তাহাদের শ্রবণের পর মনন করিতে হয়। কেহ কেহ বিঘ্নবাহুল্য বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করেন। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্ম করিলেও কর্তৃত্বাদি না থাকায় কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না। অতএব জ্ঞানী কর্ম্ম করেন বা করেন না ইহা চতুর্থাধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠাধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাস জ্ঞানীর জন্ম বলা হইয়াছে। সপ্তম হইতে দ্বাদশাধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তিনিষ্ঠা দেখাইয়া তৎপদার্থের শোধনের উপায় বলিয়াছেন। অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও বাসনাক্ষয় দেখান হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে সমগ্র গীতার সিদ্ধান্ত শুনাইয়া সংশয় দূর হইয়াছে কিনা জানিবার জন্ম শ্রীভগবান বলিতেছেন—

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

অর্জ্জুনের মোহ দূর হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। মূঢ় ভীত ও ব্যাকুল ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। মোহ ও সংশয়ই

কার্য্যের বাধক। এই সংশয় শুধু অর্জ্জুনেরই হইয়াছিল আর কাহারও হইতেছে না এমন নহে। অজ্ঞানী মাত্রেরই শত শত সংশয় প্রত্যহ হইতেছে ও যাইতেছে। যতদিন না পূর্ণজ্ঞান হয় ততদিন সংশয়ের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। যে গ্রন্থের যে বিষয় নহে, সে গ্রন্থে তদ্বিষয়ক শঙ্কা সমাধান থাকিতে পারে না। এজন্য কোন্ গ্রন্থে তাহার সমাধান রহিয়াছে ইহা জানিবার জন্যও বিদ্বানের শরণাগতি প্রয়োজন। যখন পিপাসায় বুক ফাটিতেছে, তখন কূপ খনন করিয়া জলপান করিতে যাওয়াও যে কথা, শাস্ত্র দেখিয়া নিজেই সংশয়ের একটী সমাধান করাও সেকথা। মহাপুরুষগণ অতি সহজেই যুক্তিদ্বারা সংশয় নিবৃত্ত করিয়া যে যে বিষয়ের অধিকারী তাহাকে তদনুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিতে নিয়োগ করিয়া তাহার পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন। এজন্য মুমুক্ষু মাত্রেরই কোন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। শরণাগত না হইলে ভগবানও সহায়তা করেন না। শরণাগতিবলে মনুষ্য সর্ব্বসংশয় ছিন্ন করিয়া সাধনজগতে শীঘ্র আরোহণ করিতে পারে। সাধনকালে যদি গুরু নিকটে নাও থাকেন তথাপি গুরুশক্তি ভিতরে থাকিয়া সাধককে সকল সংশয় হইতে পরিত্রাণ করে। যতই সাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, ততই যাবতীয় শঙ্কার সমাধান নিজ হইতেই হইতে থাকে। যতদিন ঐরূপ অবস্থা লাভ না হইবে ততদিন গুরু বা তৎসদৃশ কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নিকট থাকিয়া যখন যে শঙ্কার উদয় হইবে তখনই তাহার সমাধান করা আবশ্যক। সংশয়ারূঢ় হইয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। সংশয় থাকিলে মুক্তিও হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—

অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াসক্তচেতসাম্।
ন মুক্তির্জন্মজন্মান্তে তস্মো বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তাহাদের সংশয় কখনও উৎপন্ন হয় না। ইহাদিগকে অতিমূঢ় জানিতে হইবে। অতিমূঢ়ের ও অতিপ্রাজ্ঞের সংশয় হইতে পারে না। ইহারা অতিপ্রাজ্ঞ নহে, অতএব অতিমূঢ়। যাঁহারা শাস্ত্রাবলোকন করিয়া থাকেন এবং সৎসঙ্গ করেন, তাঁহাদেরই সংশয় হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সর্ব্বসংশয় দূর হইয়া যায়। মূঢ়গণ কখনও শাস্ত্রাবলোকন করে না এবং তাঁহারা জ্ঞানবানও নহে। এই সকল ব্যক্তির সংসার-নিষ্ঠা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহারা নির্ব্বোধ এবং সংসারের ইষ্টানিষ্টের সংযোগ-বিয়োগে তাহারা সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। তাহাদের শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দুর্লভ হইয়া থাকে। শাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন তাঁহাদেরই সংশয় উৎপন্ন হয়। যথা—

বিরুদ্ধানীহ শাস্ত্রাণি যে পশ্যন্তি কুরূদ্বহ।
বিধিৎসা জায়তে তেষাং তত্ত্বজ্ঞানাগ্নিবর্ত্ততে॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৬২।১১

প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় দেখিয়া উত্তর দিতে হয়। কেহ শঙ্কা করিলেই উত্তর দিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। শ্রদ্ধালু সেবকের শঙ্কার সমাধান করা বিধেয়। ভগবান্ মনু বলেন—

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্নান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥

ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু সংশয় দোষ দ্বারা দূষিত-অন্তঃকরণে ঐরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এ বিষয়ে মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা আছে। উদঙ্ক নামক এক ঋষি ভগবানকে তপস্যা দ্বারা তুষ্ট করিয়া দেবরক্ষিত অমৃতের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান ইন্দ্রকে বলিলেন 'ইঁহাকে অমৃত দান কর।' ইন্দ্র বিষ্ণুর আজ্ঞা পাইয়া অমৃতের কলস লইয়া চণ্ডালের বেশ ধারণ করিয়া উহা লইয়া উদঙ্কের নিকট গেলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছা ছিল

না যে উদঙ্ক ঋষি অমৃত পান করেন। অমৃতের কলসের উপর বসিয়া প্রস্রাবের ভান করিয়া ঐ কলস উদঙ্ককে দিতেই উদঙ্ক অমৃতকে চণ্ডাল-মূত্র মনে করিয়া উহা গ্রহণ করিলেন না। উদঙ্কের মূত্রাশঙ্কা যেমন প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত অমৃতকে পাইয়াও গ্রহণ করিতে পারিল না, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-উপাধিবিহিত কর্ম্মনাশ ভয়ে আত্মজ্ঞান গুরু ও শাস্ত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেও মূঢ় জীব গ্রহণ করিতে পারে না। পদার্থের স্বরূপবোধাভাব, বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়ই প্রত্যক্ ব্রহ্মাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের বিরোধী হইয়া থাকে। এজন্য ভাষ্যকার উপদেশ-সাহস্রীতে বলিতেছেন—

মূত্রশঙ্কো যথোদঙ্কো নাগ্রহীদমৃতং যথা।
কর্ম্মনাশভয়াজ্জন্তোরাত্মজ্ঞানাগ্রহস্তথা॥

বুদ্ধ্যপরাধপ্রকরণ

বিচার করিয়া দেখিলে সূক্ষ্ম শরীর কত শরীরে কত প্রকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐসকল জন্মের কথা যদি কাহারও স্মরণ হয় তবে সে তখনই বিরক্ত হইয়া জাতি-আশ্রমাদির অভিমান ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করিবে। গর্ভোপনিষদে গর্ভের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি দেখাইয়াছেন, সেখানে বহু জন্মের স্মৃতি হইয়া থাকে। গর্ভ হইতে নির্গত হইবামাত্র বৈষ্ণবী মায়া জীবকে ভুলাইয়া দেয়, সেজন্য পূর্ব্বজন্মের স্মরণ থাকে না। মায়ামুগ্ধ জীব অহং মম রূপ জ্ঞান লইয়া আবার সংসারে বদ্ধ হয়, গর্ভের স্মৃতি ও যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। ভগবান কৃপা করিয়া যাহাকে শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ জুটাইয়া দেন, তাহার সর্ব্বসংশয় দূর হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শন

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

খৃষ্টভক্ত অনেক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়রে, যদি উনিশশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিতাম!" শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত একজন বলিয়াছিলেন, "যদি ঠাকুরের সময়ে থাকিতাম!" তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে, তাহা হইলে নিজের উপাস্য দেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন। লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দর্শনের অভিলাষ একবার জন্মিয়াছিল। সাধু অভিলাষ ভগবানের বিধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, মরদেহ ত্যাগ করিলে মানুষমাত্রই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হয়; সেই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব কি?

কোনও মহাপুরুষ, যুগমানব, যুগাবতারকে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয়; কিন্তু মানুষ তো দেখিয়াও দেখিতে পায় না, চিনিয়াও চিনিতে পারে না। ভগবান যীশুকে দেখিয়াছিল সহস্র সহস্র লোক; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং এরিমেথিয়ার যোসেফ যে যীশুকে দেখিয়াছিলেন, সেই যীশুকে তো ফ্যারিসীদিগের সৈন্যরা দেখিতে পায় নাই! যদি দেখিতে পাইত তবে যীশুকে নির্য্যাতন করিতে, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিতে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সুতরাং চর্ম্মচক্ষুতে দর্শনই চরম দর্শন নহে।

এ সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয়

নীলমণি, কানা ছেলে হয় পদ্মলোচন। প্রণয়ী Helen's beauty দেখেন in Ethiope's brow. যে নারীকে একজন করে অবহেলা, তাহাকে আর একজন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বরণ করে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ, চর্ম্মনেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেত্রে দর্শন শ্রেষ্ঠ। চর্ম্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ভাবনেত্রে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায়।

কেহ মনে করিতে পারেন, ভাবনেত্রে দর্শন তো কল্পনারঞ্জিত, সুতরাং অবাস্তব; কিন্তু এ কথা যথার্থ নহে। মায়ের চোখে সন্তানের যে সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে, সে সৌন্দর্য্য সন্তানে যথার্থই বিদ্যমান থাকে, তাহা বাস্তব। সুতরাং চর্ম্মচক্ষুতে দর্শনের ফল যেরূপ সত্য, ভাবচক্ষুতে দর্শনের ফলও সেরূপই সত্য।

ভগবান যীশু একস্থানে নিজকে দ্রাক্ষালতার সঙ্গে এবং শিষ্যগণকে দ্রাক্ষাশাখার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। যে শাখা দ্রাক্ষালতার সহিত এক ও অবিচ্ছিন্ন সেই শাখা বহুফলবতী হয়; কিন্তু যে শাখা ছিন্নভিন্ন তাহা শুকাইয়া যায়। তেমনি যে শিষ্য যীশুতে এবং যীশু যে শিষ্যেতে বিদ্যমান সেই শিষ্যই বহুফলান্বিত; যীশুকে ছাড়িয়া শিষ্যেরা কেহই কিছু করিতে পারেন না। "I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same shall bring forth much fruit: for without me ye can do nothing." —John 15.5.দ্রাক্ষালতা রস আকর্ষণ করিয়া শাখায় শাখায় সঞ্চারিত করে তাই শাখা পুষ্ট হয়। লতার প্রাণশক্তি শাখাতে সঞ্চারিত হয়, তাই শাখা সজীব হয়, তাই শাখা ফলদান করিতে পারে। সুতরাং শাখার ফল লতারই ফল। শাখা দেখিলে লতাই দেখা হয়। শাখা লতা হইতে পৃথক নহে, অপৃথকও নহে। সাধারণ ভাষায় এই সম্বন্ধকে বলা যায় অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ছিল এই অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। যীশু অঙ্গী, শিষ্যেরা তাঁহার অঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ বিদ্যমান। নগরে প্রান্তরে গ্রামে কান্তারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যে সাধুদিগকে দেখি তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার এক একটি অঙ্গ; তাঁহা হইতে কোনও প্রকারেই ইঁহারা ভিন্ন নহেন। "He that abideth in me and I in him."—একথা তাঁহাদের সম্বন্ধেও সমভাবেই প্রযোজ্য। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণেরই আত্মভূত। বেলুড় মঠের এক কোণে যে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহাতে সমগ্র পৃথিবী আলোড়িত হইতেছে। কারণ, তাহার মূলে বিদ্যমান শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার মধ্যে সাধনের প্রযত্ন, শুভকর্ম্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা দেখিলে ঐ যে সাধুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, সেই মধুর হাসি শ্রীরামকৃষ্ণেরই, প্রিয়জনের দুরারোগ্য রোগে আমি যখন ভীত ও কাতর হই, তখন আমাকে উৎসাহ দিতে, অভয় দিতে ঐ সাধুর কণ্ঠে বাজিয়া উঠে শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী; সংসারের জ্বালায় অশান্ত-চিত্তে নিকটে গেলে ঐ সাধুর চক্ষুতে ফুটিয়া উঠে আমার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অনন্ত করুণা! শুধু দর্শনের আগ্রহে নিকটে গিয়া প্রণাম করিলে ঐ সাধুর হস্ত হইতে আমার মস্তকে বর্ষিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণেরই অজস্র আশীর্ব্বাদ! তবুও কি প্রশ্ন করিবে, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব কি?

আদর্শ রাষ্ট্র

নীলিমা

গ্রীক্ দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস্ (Socrates), প্লেটো (Plato) ও এরিষ্টটল্ (Aristotle) প্রমুখ মনীষিগণের নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। এই মহাপুরুষগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপের অধিবাসিগণ মানব-সভ্যতার দিক দিয়া অনেক পিছনে পড়িয়া ছিল। ইঁহারাই স্ব স্ব জ্ঞান এবং অভিনব বিচার-শক্তি দ্বারা ইউরোপের অধিবাসীদিগের জ্ঞান-চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মীলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। প্লেটো গ্রীক্ (Greek) ও ল্যাটিন্ (Latin) ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'রিপাব্লিক' (Republic) নামক গ্রন্থ অন্যতম। এই গ্রন্থখানিতে বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অধ্যাত্ম-বিদ্যা, সামাজিক রীতি-নীতি ও পদ্ধতি এবং অর্থশাস্ত্র-সম্বন্ধী বিবিধ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন; এ জন্য ইহাতে আমরা তাঁহার ভাবের প্রবীণতা ও বিচারশক্তির নিপুণতা দেখিতে পাই।

সক্রেটিস্, প্লেটো ও এরিষ্টটলের সময়ে গ্রীস্ (Greece)-এ প্রত্যেক শহর একটা রাষ্ট্র (State) রূপে পরিচালিত হইত; এবং তাহাকে 'City state' বা 'নাগরিক গণরাষ্ট্র' বলা হইত। সক্রেটিস্, প্লেটো ও এরিষ্টটলের সময়ে গ্রীস্-এ 'স্পার্টা (Sparta) ও 'এথেন্স্' (Athens) এই দুইটী নাগরিক গণ-রাষ্ট্র খুব বিখ্যাত ছিল। সক্রেটিস্, প্লেটো ও এরিষ্টটল্ কিরূপে নাগরিক গণ-রাষ্ট্রকে এক আদর্শ রাষ্ট্ররূপে নির্ম্মাণ করা যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ভিন্নভিন্ন নূতন নূতন উপায় ও পদ্ধতির নানাবিধ পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন।

প্লেটো তাঁহার পরিকল্পিত আদর্শ নাগরিক গণ-রাষ্ট্র (Ideal city state)-কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—শাসক (Rulers), দ্বিতীয়—যোদ্ধা (Fighters) এবং তৃতীয়—কৃষক (Farmers)। তিনি এই তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ শাসক যাঁহারা, তাঁহারা দেশে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির মত রাজ্য-শাসন করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ যোদ্ধা যাঁহারা, তাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ কৃষক-পর্য্যায়-ভুক্ত যাহারা, তাহারা রাজ্যের জন্য শস্যোৎপাদন, ধনোপার্জ্জন ও উপর্য্যুক্ত প্রথম দুই শ্রেণীর লোকদের যথাপ্রয়োজন সেবা করিবে। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে প্লেটোর শ্রেণিবিভাগ অনেকটা হিন্দুদিগের চারিবর্ণ ও জাতি বা শ্রেণিবিভাগেরই সমতুল্য।[১]

১ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'গীতা'য় বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" এখানে গীতার ও প্লেটোর কল্পিত ক্ষত্রিয়ের (শাসকের) গুণ ও কর্ম্ম শৌর্য্য, তেজঃ ও যুদ্ধাদির সমরূপ। কিন্তু ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্ম একরূপ নহে। প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল্

প্লেটো প্রত্যেক শ্রেণীর (class) জন্য পৃথক পৃথক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনায় শাসক ও যোদ্ধাগণের জন্য তিনি যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি ও ব্যায়াম-বিদ্যা (Gymnastics), সঙ্গীতবিদ্যা, কলা (Arts) ও দর্শন (Philosophy) আদি সর্ব্ববিধ শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ কৃষকদের জন্য কোনোও প্রকারের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাই।

আজকাল 'কমিউনিজম্' (Communism)[২] শব্দটি সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীর সকল দেশেই একদল লোক আছেন, যাঁহারা এই মতবাদের উপর সকল দেশে গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। প্লেটোর 'কমিউনিজম্' অদ্ভুত ধরনের। তিনি উপযুক্ত দুই শ্রেণীর লোকের জন্য কোনোও রূপ বিষয়-সম্পত্তি, মূল-ধন বা পরিবার রাখিবার অধিকার দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ও অভিমত ইহাই যে যদি উক্ত দুই শ্রেণীর লোকের নিকট ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি ও পরিবার রাখিতে অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বস্ত ভাবে ষোল আনা মন রাজ্যের সেবা ও পরিচালনার জন্য ঠিক ঠিক লাগাইতে পারিবে না।

প্লেটো সমগ্র আদর্শ রাষ্ট্রটিকে একমাত্র পরিবার (single family) রূপে পরিণত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার মত ইহাই যে প্রথম দুই শ্রেণীর লোক অর্থাৎ শাসক ও যোদ্ধাগণ সারাজীবন স্বামি-স্ত্রী রূপে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের কিছুকালের জন্য অস্থায়ী (temporary) বিবাহ হইবে এবং প্রয়োজনীয় সন্তানোৎপত্তির পরেই তাহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই প্রকার বিবাহগুলিও রাজ্য-পরিষদের (State) ঘটকতা ও অধীনতায়ই হইবে। এবংবিধ বিবাহসম্বন্ধ-জাত সন্তানদিগকে সাধারণ রাজ্যাবাস-সমূহে (common barracks of the state) রাখা হইবে এবং তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যে যাহারা সম-সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা পরস্পরে উক্ত পরিবারে ভ্রাতা ও ভগ্নী। পিতা-মাতাদিগকেও এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যে রাজ্যাবাসে যে সকল সন্তান তাহাদের সন্তানোৎপত্তির সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই তাহাদের সন্তান। এই সন্তানগণ রাজ্যের (State) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইবে। তাহাদের শিক্ষার জন্য তাহাদের পিতা-মাতাকে ভাবিতে হইবে না; রাজ্য-পরিষদ্ হইতেই রাজ্যের সকল বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগের জন্য প্লেটো ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি ও পরিবার রাখিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন।

প্লেটোর ধারণা এই যে রাজ্য কখনোও

তাহার সংশোধন করিয়া, গীতোক্ত ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্মের মতই, শাসকবর্গ হইতে এক শ্রেণীকে পৃথক্ করিয়াছেন, যাঁহাদের গুণ ও কর্ম্ম হইতেছে গীতোক্ত ব্রাহ্মণের মতই শম, দম, তপস্যা ও দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার (Philosophy)। গীতা ও প্লেটোর কল্পনায় শূদ্রের ধর্ম্ম সমরূপ। পার্থক্য এখানে ইহাই যে গীতায় কৃষি-কর্ম্ম ও বাণিজ্যাদির জন্য 'বৈশ্য'-শ্রেণীর কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্লেটো কৃষি ও সেবা আদি কর্ম্মের জন্য কৃষক ও শূদ্র (সেবক) একই শ্রেণি-ভুক্ত করিয়াছেন। (গীতোক্ত এই শ্লোকের ভাষ্যকার শঙ্করের ব্যাখ্যাবলম্বনে এখানে তুলনা-মূলক আলোচনা করা হইল)।

২ Communismএর সংজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুবাদ এক শব্দে দেওয়া কঠিন। এই মতবাদ অত্যন্ত আধুনিক এবং ইহার স্বরূপ বা রূপ-রেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা সঙ্কুচিত, পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাকে 'আন্তররাষ্ট্রীয় রাজ্যক্রম', 'প্রজাধীন রাজ্যক্রম' বা 'সার্ব্বলৌকিক রাজ্যপরিষদ্' ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। প্লেটোর মতে এই ব্যাখ্যা করা যায়।

জ্ঞানহীন[৩] স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদ্বারা যথাযথ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। তাঁহার মত এই যে রাষ্ট্র জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। তাঁহার মতে সত্যকার জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারাই অর্জ্জন করা যায়। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে রাষ্ট্র দার্শনিকগণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত।

এতদ্বিষয়ে আমরা প্লেটোর সঙ্গে তাঁহার শিষ্য এরিষ্টটলের মতের অত্যন্ত ভিন্নতা দেখিতে পাই। এরিষ্টটলের মতে দার্শনিক কখনও রাজ্য পরিচালন[৪] করিতে পারেন না। তিনি (Aristotle) দার্শনিক-গণকে জাগতিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে নিরেট মূর্খ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্লেটোর এবংবিধ পরিকল্পনা অতি শ্রুতি-মধুর এবং আমরা তাঁহার বিচার-ধারা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসাও করি। কিন্তু তথাপি তিনি সমালোচক-দিগের তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। বিভিন্ন সমালোচনাসমূহ সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে: যথা—(১) প্লেটো তাঁহার পরিকল্পিত আদর্শ রাজ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, তৃতীয় শ্রেণীর লোক-দিগের জন্য কোনোও রূপ বিশেষ শিক্ষার অধিকার ও ব্যবস্থা পরিকল্পনায় তিনি করিয়া যান নাই। (২) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে এবংবিধ বৃহৎ এবং একমাত্র পরিবারভুক্তরূপে কার্য্যতঃ পরিণত করা একেবারে অসম্ভব। (৩) প্লেটোর পরিকল্পিত বিবাহ-পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিলে স্ত্রীজাতির সতীত্ব, পবিত্রতা এবং মাতৃত্বের দিকে বিশেষ কোনও মহত্ত্ব দেওয়া হয় না, এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একাধিক স্বামী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। (৪) প্লেটো State কেই প্রধান ধ্যেয় করিয়াছেন, এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের (personality) দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাজ্যের জন্য নিজের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি সবই ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কোনোও বস্তু থাকিবে না। (৫) প্লেটোর শাসকদের পরিকল্পনায় এরূপ সিদ্ধান্ত করাও এক বিরাট্ মূর্খতা যে দার্শনিকেরাই রাজ্য পরিচালনা করিবেন।[৫]

৩ 'গীতা'-আদি পাঠেও স্পষ্ট জানা যায় যে পুত্র, দার, গৃহ, সম্পত্তি, দায়াদ ও ভৃত্যগণের প্রতি অত্যধিক আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা জগতে কোনোও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। জ্ঞানহীন ব্যক্তির এই আসক্তি, 'আমি আমার' ভাব ও স্বার্থ কখনও দূর হয় না। যিনি বিচারশীল ও জ্ঞানবান্ তাঁহারই কর্ম্ম-পরায়ণতার ভাব সম্ভব, অপরের পক্ষে নহে। সুতরাং রাজ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ কর্ম্মী তিনিই হইতে পারেন, যিনি এবংবিধ বিচারশীল জ্ঞানবান্ ও স্বার্থবিষয়ে অনাসক্ত।

৪ বাহ্য ভোগ-লালসায় মোহ-গ্রস্ত বিবদমান পাশ্চাত্য জগতে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু ভারতের আদি সভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে এরিষ্টটল হইতে তাঁহার গুরু প্লেটোর সিদ্ধান্তই ঠিক। যখন পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয় নাই, তখনও এদেশের বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ বা ঋষি-মুনিদের মতানুসারে দেশ-নায়ক নৃপতিবৃন্দ রাজ্যের পরিচালনা করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজা দশরথ এমন কি মহাভারতে উক্ত রাজন্যবৃন্দেরও রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস দেখান যাইতে পারে। "পরিষদ্" শব্দটির আভিধানিক সংজ্ঞা ইহাই যে—"প্রাচীন কালের বিদ্বান্ (জ্ঞানবান্) ব্রাহ্মণগণের সভা, যাহা কোনও বিষয়ে ব্যবস্থা দিবার জন্য (রাজ্য পরিচালনার্থ) রাজা আহ্বান করিতেন এবং যাহার নির্ণয় সর্ব্বমান্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত।"

৫ সমালোচকদের এই মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। ইহলোকসর্ব্বস্ব ও যথার্থ দার্শনিক বিচারে

এবংবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও প্লেটোর পরিকল্পনা, ভাব ও বিচারধারা সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি একজন কবি ও কল্পনা-প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কল্পনা ও ভাবগুলি (ideas) পড়িতে ও শুনিতে বেশ আনন্দ হয় এবং তাহাতে বহুমুখী বিভিন্ন অভিনব বিষয়সমূহের সন্নিবেশ পাওয়া যায়। কিন্তু ইদানীন্তন ব্যবহারিক জগতে তাঁহার ভাব-সমুদায়ের কতখানি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

আজকাল ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনেও "আদর্শ রাজ্য" স্থাপনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা ও কর্ম্ম-পন্থা দেখাইতেছেন। যেমন, মূল কংগ্রেসপক্ষীয় দল (Rightists of the Indian National Congress), অগ্রগামী দল (Forward Bloc), সমাজতন্ত্রী দল (Socialists), প্রজা-তন্ত্রী দল (Communists), আন্তররাষ্ট্রীয় রাজ্যক্রমী দল (Provincial Autonomists), অখণ্ড ভারতীয় গণরাজ্য-কামী দল (All India Republicans) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন কর্ম্ম-পন্থা অবলম্বনে বিভিন্ন সংজ্ঞাযুক্ত ভারতীয় "আদর্শ রাষ্ট্রের" পরিকল্পনা করিতেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক গুরুদের মধ্যে কেহ কেহ প্লেটোর "আদর্শ রাজ্যের" পরিকল্পনারও স্বপ্ন দেখিতেছেন।

অসমর্থ পাশ্চাত্য জগৎ ইহা বলিতে পারেন, এবং পাশ্চাত্য গুরুর পদাঙ্কানুসারী ও নিজের ঘরের প্রাচীন গৌরব-বিষয়ে অজ্ঞ ভারতীয় সমালোচকও ইহার পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু যুক্তি ও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে (১) দার্শনিকনিয়মবদ্ধ সূক্ষ্ম বিচারে সিদ্ধ মস্তিষ্কই দর্শন-শাস্ত্রাতিরিক্ত যে কোন বিষয়েও সাধারণ বিদ্বান্ ও বিচারশীল ব্যক্তিগণ হইতেও অধিক সূক্ষ্ম ও কার্য্যকরী উত্তম বিচার এবং সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবেন। (২) দ্বিতীয়তঃ, ভারতের গৌরব রাজা রামচন্দ্র, জনক, শ্রীকৃষ্ণ আদি ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ সূক্ষ্মতম দার্শনিক বিচারসম্পন্ন হইবার ফলেই রাজ্য পরিচালনাদি সকল বিষয়ে অতি নিপুণ ও নিঃস্বার্থ ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের অনুশীলনে এরূপ অসংখ্য নিদর্শন মিলিবে।

কেন ?

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

কেন মরুর বুকেতে স্নেহ-মন্দাকিনী
　　বহাইলে প্রিয়তম,
যদি নিদাঘের-তাপে শুখাতে প্রয়াস
　　কঠিন-শিলার সম ?

কেন বিজন বিপিনে ফুটালে হে ফুল
　　মধুহীন মধুকরে,
যদি অন্তক-রূপে মিশাবে অন্তে
　　ঝরাবে ক্ষণিক পরে ?

কেন প্রাবৃট্ নিশায় জাগালে হে প্রিয়
　　চকিত-চপলা-হাসি,
যদি জীবন-জঞ্জালে না দেখাবে পথ
　　মুছাবে কলুষরাশি ?

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

(২)

যদি বলা যায় জগৎকারণকে অলৌকিক বস্তু বলিব কেন? জগৎকারণকে অলৌকিক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। আমরা বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব কেন? পরমর্ষি কপিল প্রভৃতির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিব। এজন্য জগৎকারণকে দ্বৈত অথবা বিশেষ প্রকারের অদ্বৈত অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত বলিব, অর্থাৎ সগুণ সবিশেষই বলিব। জগদ্রূপ কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে জগৎকারণের ধর্ম্ম কিছু অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিব কেন? অসঙ্গ অদ্বৈত বস্তু হইতে কোন বস্তুরই উৎপত্তি সম্ভব হয় না। জগৎ যখন উৎপন্ন হইয়াছে তখন তাহার কারণকে জগৎ দেখিয়াই নির্ণয় করিব। জগৎ দেখিয়া জগৎকারণ নির্ণীত না হইলে তাহা জগৎকারণই বা হইবে কেন? ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা করিলে তোমার যে জগৎকারণ, তাহা জগৎই হইবে, তাহা আর জগৎকারণ হইবে না। ইহার কারণ, তাহা করিলে "কার্য্য হইতে কারণে যে অতিরিক্ত ধর্ম্ম থাকে" এই নির্ব্বিবাদী সত্য নিয়মকে লঙ্ঘন করা হইবে; তাহা করিলে মৃৎপিণ্ডের দ্বারা ঘটের জল আহরণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই কারণে যাহা যথার্থ জগৎকারণ, তাহা এক অদ্বৈত বস্তুই হইবে, তাহা বহু বা দ্বৈত বস্তু হইতে পারে না। এই হেতু সাংখ্যাদিমতে বা ন্যায়াদিমতে মূল জগৎকারণ বস্তুর নির্ণয়ই হয় নাই। যেহেতু সেই সেই মতে জগৎকারণ একাধিক বা বহু। যেমন সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইটী দ্রব্যকে জগৎকারণ বলা হয়। ন্যায়াদিমতে ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ুর পরমাণু আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মন এই নয়টী দ্রব্যকে জগৎকারণ বলা হয়। অন্যান্য দর্শনেও এইরূপ বহু মতভেদ বর্ত্তমান। এই জন্য একমাত্র বেদান্তদর্শন ভিন্ন অন্য মতে জগৎকারণ বহু বলিয়া স্বীকার করা হয়। একমাত্র বেদান্তদর্শনই জগৎকারণকে এক অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য মূলজগৎকারণ নির্ণয় একমাত্র বেদান্তদর্শনই করিয়াছেন, অন্য কোন দর্শন করেন নাই বলা হয়।

বলা বাহুল্য বেদ না মানিলে জগৎকারণ সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় হয় না, কিন্তু কেবল বিবাদেই পর্য্যবসান হয়। ইহার নিদর্শন বৌদ্ধ জৈনাদি দার্শনিক মতের পরস্পর বিরোধ। আর এই বিরোধের জন্যই বৌদ্ধগণের শূন্য স্বীকার। তাঁহারা বলেন—যখন কিছুই নির্ণয় হয় না, যখন কেহই একমত নহেন তখন শূন্যই তত্ত্ব ইত্যাদি। আর সেই শূন্য দ্বৈত বস্তু নহেন কারণ, দুই বা বহুর কারণ, একই হয়, একের জ্ঞান না হইলে দুইএর জ্ঞানই হয় না। কিন্তু একের আর কারণ নাই অথবা একের জ্ঞানের জন্য দুইএর জ্ঞানের অপেক্ষা হয় না। এই কারণে—যাহা সকলের মূল কারণ, তাহা শূন্য হউক আর সদ্‌বস্তুই হউক, তাহা একই বস্তু হইতে বাধ্য। বৌদ্ধের শূন্যও সেই কারণে

এক বস্তু, এই জন্য তাহাদিগকে অমরকোষে "অদ্বয়বাদী" বলা হইয়াছে। ফলতঃ মূল জগৎকারণ একটী বস্তু না হইলে তাহা মূল জগৎকারণই হয় না। বেদান্তমতে এই জন্য মূল জগৎকারণ একটী বস্তুই বলেন। ইহাই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব, আর এই জন্যই বেদান্ত-দর্শনের এত আদর।

যদি বলা হয়—কারণের ধর্ম্ম কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে কিছু অতিরিক্ত হইলেও কার্য্যের কতক ধর্ম্ম কারণে থাকেই। আর যে কতকটা থাকিবে, তাহাই ব্যক্ত, আর যে কতক থাকে না, তাহা অব্যক্ত ভাবে থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যের কতক ধর্ম্মও কারণে থাকে না বলিলে অভাবকারণতাবাদ স্বীকার করা হয়। অভাবকারণতাবাদ অসঙ্গত। কারণ, অভাব হইতে কোন ভাববস্তুরই উৎপত্তি হয় না। ভগবানই বলিয়াছেন নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ইত্যাদি। ন্যায়মতে প্রাগভাবকে কার্য্যের কারণ বলা হয় বলিয়া অভাবকারণতাবাদ স্বীকার করা হয়। এজন্য বেদান্তভাষ্যে ন্যায়-মতকে অর্দ্ধবৈনাশিক বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। এ জন্য কার্য্যের ধর্ম্ম কারণে থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে কতকটাকে কারণে থাকে না বলা হয়, তাহাকে সাংখ্যমতে অব্যক্ত ভাবে থাকে, ইহাই বলা হয়। একেবারে থাকে না বলা হয় না। ঘটের জলাহরণ ধর্ম্ম ঘটের কারণ মৃত্তিকাতে একেবারে থাকে না কিন্তু অন্যত্র অকারণ বস্তুতে থাকে—ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে যাহা ঘটের কারণ একেবারেই হয় না, যথা—বায়ু, আকাশ প্রভৃতি তাহাতেও কেন জলাহরণ ধর্ম্ম থাকিবে না? অতএব কার্য্যের ধর্ম্ম যাহা কারণে থাকে না বলিয়া দেখা যায় তাহা একেবারেই যে থাকে না তাহা নহে, কিন্তু তাহা অব্যক্তভাবেই থাকে বলিতে হইবে। মৃত্তিকা হইতেই ঘট হয়, বায়ু আকাশাদি হইতে ঘট হয় না। অতএব কার্য্যের ধর্ম্ম কারণে কতক ব্যক্ত কতক অব্যক্ত ভাবে থাকে। আর তাহা হইলে জগতের যে সগুণত্ব সসঙ্গত্ব দ্বৈতত্ব ও সবিশেষত্ব ধর্ম্ম তাহাও জগৎকারণে অব্যক্তভাবেই থাকে বলিতে হইবে। একেবারে থাকে না বলা সঙ্গত হইবে না। অতএব কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে কারণের ধর্ম্ম কিছু অতিরিক্ত হয় বলিয়া জগৎ-কারণকে কেবল নির্গুণ নির্ব্বিশেষ অসঙ্গ অদ্বৈত না বলিয়া তাহাকে সগুণ সবিশেষ সসঙ্গ ও দ্বৈতও বলিতে হইবে। অর্থাৎ জগৎ-কারণকে নির্গুণ সগুণ, নির্ব্বিশেষ সবিশেষ, অসঙ্গ সসঙ্গ, অদ্বৈত দ্বৈত উভয়রূপই বলিতে হইবে। বস্তুতঃ বেদমধ্যেও এই উভয়রূপই জগৎকারণ, ইহাই বলা হইয়াছে। ইহাই দ্বৈতা-দ্বৈতবাদী নিম্বার্ক ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। রামানুজ মতে অনুরূপ কথা থাকিলেও সূক্ষ্মজগদাদি ও ঈশ্বর বস্তু, অংশাংশি-ভাবে বা বিশেষ্যবিশেষণভাবে সম্বদ্ধ বলা হয়, কিন্তু নিম্বার্কাদির মতে উক্ত দুইটী বস্তু স্বতন্ত্র অথচ অবিরুদ্ধভাবে অবস্থিত বলা হয়। রামানুজমতে সগুণই সত্য, নির্গুণ মিথ্যা, কিন্তু নিম্বার্কাদির মতে উভয়ই সত্য—সংক্ষেপে ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের প্রভেদ। এইরূপে কার্য্য কারণে থাকে বলিয়া কার্য্য এই জগৎ দেখিয়া জগৎকারণের নির্ণয় হইবে না কেন? আর নির্ণয় হয় বলিয়া জগৎকারণকে অলৌকিক বস্তু কেন বলিব ইত্যাদি।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। একই বস্তু নির্গুণ ও সগুণ বলিলে একবস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকে বলিতে হয়। এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব বা ইহা বুদ্ধি ধারণ বা গ্রহণ

করিতে পারে না। আর যাহা বুদ্ধির গোচর নহে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। আর সেরূপ কথা বেদই বা উপদেশ করিবে কেন? অতএব জগৎকারণ সগুণ নিগুর্ণ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি উভয়রূপই এইরূপ নিম্বার্কমত সঙ্গত হয় না। জগৎকারণ উভয়রূপ ইহা বেদ বলিয়াছেন বলিয়া অদ্বৈত বেদান্তী সগুণকে মিথ্যা ও নিগুর্ণকে সত্য বলিয়া উভয়-রূপাক্রান্ত জগৎকারণকে বুদ্ধির ধারণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য করিয়াছেন। মিথ্যার অধিষ্ঠান-রূপে নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু দুইটীই বিরুদ্ধ অথচ সত্য এবং একত্র অবস্থিত, এরূপ জ্ঞান করার সামর্থ্য বুদ্ধির নাই। রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয়, তাহা সর্প মিথ্যা হয় বলিয়াই হয়। রজ্জু ও সর্প উভয় সত্য হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইত না। অন্যত্র সর্প সত্য হউক, কিন্তু রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায় তাহা মিথ্যাই, তাহা নাই অথচ দেখা যায়। এজন্য সগুণ ও নিগুর্ণ—উভয়ই সত্য, ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুর্ণ উভয় রূপই বটে ইহাই বেদ বলিয়াছেন —এইরূপ যে নিম্বার্কমত অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মত তাহা সঙ্গত মতবাদ হইতে পারে না। এজন্য জগৎকারণকে অলৌকিক বস্তু বলিতেই হইবে।

যদি বলা হয় একই বস্তুতে ভিন্ন ধর্ম্মে, বা ভিন্ন সম্বন্ধে, বা ভিন্ন অবচ্ছেদে, দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিবে না কেন? যেমন সুবর্ণরূপে কটক ও কুণ্ডল অভিন্ন হয় কিন্তু কটকত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে তাহারাই আবার ভিন্নও হয়? যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে থাকে কপালে থাকে না। কপালে ঘট সমবায় সম্বন্ধেই থাকে, সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না, ইত্যাদি। সুতরাং ভিন্ন ধর্ম্মে, ভিন্ন সম্বন্ধে ও ভিন্ন অবচ্ছেদে, কোন বস্তু কোন স্থলে থাকে এবং থাকে না বলা যায়। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ এরূপ স্থলে যে বিরোধ তাহা বিরোধই নয়। যে ধর্ম্মে "আছে" সেই ধর্ম্মে যদি "নাই" হয়, বা যে সম্বন্ধে "আছে" সেই সম্বন্ধে যদি "নাই" হয়, অথবা যে অবচ্ছেদে "আছে" সেই অবচ্ছেদে যদি "নাই" হয়, তবেই বিরোধ হয়, নচেৎ বিরোধই হয় না। এজন্য একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব। এজন্য জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুটি একই ভাবে বা একই দৃষ্টিতে সগুণ ও নিগুর্ণ উভয় রূপ ইহা বলা সঙ্গত হইবে না। বেদে উভয় রূপের কথা আছে বলিয়া একটীকে সত্য আর একটীকে মিথ্যাই বলিতে হইবে। আর সগুণত্বটী নিগুর্ণত্বের সাপেক্ষ বলিয়া সগুণকেই মিথ্যা বলিতে হইবে।

বেদমধ্যে যে জগৎকারণ ব্রহ্মকে সগুণ ও নিগুর্ণ—উভয়রূপ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সগুণ মিথ্যা আর নিগুর্ণ সত্য এইরূপ যে অদ্বৈত বেদান্তীর মত, তাহাই সঙ্গত মতবাদ হইয়া থাকে। দুইটি বিরুদ্ধ সত্য একত্র থাকে না, কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধের মধ্যে একটী মিথ্যা ও একটী সত্য হইলে তাহারা একত্র থাকিতে পারে। এইরূপে বেদবাক্যের মধ্যে সগুণ নিগুর্ণ প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধের যে সমন্বয়, তাহাই অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে করা হইয়াছে বলিয়া ইহাও বেদান্তদর্শনের একটী বিশেষত্ব বলা হয়।

যদি বলা হয় "জগৎকারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎসংসার মিথ্যারূপে থাকে"—ইহা বলিলেও জগৎসংসার থাকে ইহা ত স্বীকার করা হইল! নিগুর্ণ ব্রহ্ম সত্য এবং সগুণ ব্রহ্ম মিথ্যা—ইহা বলিলেও সেই মিথ্যা সগুণের থাকা বা সত্তা ত স্বীকার করা হইল। আর সগুণের কোন-রূপ সত্তা স্বীকার করিলে সেই সগুণের অন্তর্গত সূক্ষ্ম বা অব্যক্তরূপে জগৎসংসারেরও সত্তা স্বীকার করা হইল। আর তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম

জগৎকারণ এই মতবাদই অসিদ্ধ হয়। এতদুত্তরে বেদান্তী বলেন, এই যে থাকা, তাহা শক্তির আকারে থাকা বলা হয়। অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়রূপে থাকা বলা হয়। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সূক্ষ্মরূপে থাকা বা সাংখ্যের অব্যক্তরূপে থাকা নহে। সূক্ষ্মরূপে থাকা, আর অব্যক্তরূপে থাকা একই কথা কিন্তু শক্তিরূপে থাকা আর সূক্ষ্মরূপে থাকা বা অব্যক্তরূপে থাকা এক কথা নহে। সূক্ষ্মরূপে থাকা ও অব্যক্তরূপে থাকাও দৃশ্য বা সৎপদার্থের অন্তর্গত, শক্তির আকারে থাকাকে দৃশ্য বা সৎপদার্থের অন্তর্গত বলা যায় না। তাহা অনির্ব্বচনীয়রূপে থাকা বলা হয়; কারণ, এই শক্তি "আছে" কি "নাই" "সতী" কি "অসতী"—কিছুই বলা যায় না। কারণ "শক্তি আছে" ইহা বলিলে কার্য্য অবশ্যই থাকিবে কিন্তু সকল সময় কার্য্য ত থাকে না, কার্য্য যে উৎপাদবিনাশী তাহা ত দেখাই যায়। আর "নাই" বলিলে কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অথচ কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে এবং 'ভবিষ্যতেও উৎপন্ন হইবে' এই জ্ঞানের পর উৎপত্তি হইতেও দেখা যায়। অতএব শক্তিকে "নাই" বলা যায় না। এখন শক্তির "আছে" ও "নাই" এই উভয়পক্ষ মিলাইলে শক্তির আকারে থাকা এক প্রকার বিলক্ষণ আকারে থাকাই বলিতে হইবে। এক কথায় ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়।

যদি বলা হয়, শক্তিকে অনির্ব্বচনীয় বলিলে শক্তিসম্বন্ধে একপ্রকার কিছুই বলা হইল না। ইহা বাগাড়ম্বর মাত্র হইয়া পড়িল। অতএব কার্য্য তাহার কারণে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মরূপে বা অতি সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিলে লোকে একটা কিছু বুঝিতে পারিল; কিন্তু অনির্ব্বচনীয় বলিলে "নাই" নয় "আছে" নয় ইত্যাদি বলিলে কিছুই বুঝা গেল না। অতএব এই অনির্ব্বচনীয়বাদ ব্যর্থ মতবাদ মাত্র, ইত্যাদি।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা অস্বীকার করিলে সকল ব্যবহারই অস্বীকার করা হয় না কেন? প্রমাণসিদ্ধ বস্তু কতক স্বীকার করিব এবং কতক স্বীকার করিব না—ইহা সঙ্গত কার্য্য হয় না। এই কারণে প্রমাণসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয় বিষয় অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তি যে আমরা স্বীকার করি তাহা কার্য্য দেখিয়াই স্বীকার করি। কার্য্য না দেখিলে আমরা শক্তি স্বীকার করি না। অগ্নি দগ্ধ করে ইহা দেখিয়াই আমরা অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বীকার করি। এজন্য শক্তির যে স্বীকার তাহা কার্য্য দ্বারা অনুমান করিয়া স্বীকার। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—

"কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া"

তবে অকার্য্যকালে শক্তি, শক্তিমান্ হইতে পৃথগ্‌ভাবে বোধ্যরূপে থাকে না। কিন্তু শক্তিমানের স্বরূপেই থাকে। আর কার্য্যকালে শক্তি, কারণে থাকিয়াই পৃথগ্‌ভাবে বোধ্যরূপে থাকে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি তৃণাদি দহনকালে অগ্নি হইতে পৃথগ্‌ভাবে বোধ্যরূপে থাকে, কিন্তু অগ্নি যে সময় তৃণাদির অভাবে দাহক্রিয়া করে না, সেই সময় সেই দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে পৃথগ্‌ভাবে বোধ্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহাকে তখন "নাই" বলিতেই হয়। কিন্তু "একেবারেই নাই" বলাই বা যায় কি করিয়া? কারণ, অনেক সময় আবার তাহার কার্য্য দেখা যায়। এজন্য সেই দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে হয়। অভিন্নস্বরূপ হইলে তাহাকে আর পৃথক্

ভাবে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণে এই শক্তিকে সতী বা অসতী অর্থাৎ "আছে" বা "নাই" কিছুই বলা চলে না। কার্য্য থাকিলে শক্তি আছে আর কার্য্য না থাকিলে শক্তি নাই ইহা বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। সাংখ্যমতে বেদান্তের এই "আছে-নাই" রূপিণী শক্তিকে অব্যক্ত-ভাবাপন্ন কার্য্যবস্তুর স্বরূপ বা অব্যক্ত বা প্রধান বা প্রকৃতি বলা হয়। অথচ তাহাকে জড়া বলা হয়। জড়া বলিলে কিন্তু যেন ধূলির মত কিছু বুঝাইয়া যায়। আবার তাহার সত্ত্ব গুণে জ্ঞান, রজোগুণে ক্রিয়া এবং তমোগুণে মোহ বা অজ্ঞানভাব জন্মে বলা হয়। তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন একটী বস্তু। বেদান্তে কিন্তু ইহাকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ কারণের আত্মভূতা বলা হয়। কারণ হইতে পৃথক্ ভাবিলে তাহাকে মিথ্যাই বলা হয়। বিচার করিলে কিন্তু ইহাই সঙ্গত পক্ষ বলিতে হইবে। কারণ, অব্যক্ত বলিলে ঠিক্ অনির্ব্বচনীয় বুঝায় না। উহা এক প্রকার নির্ব্বচনীয় মধ্যেই পরিগণিত হয়। এজন্ত এস্থলে বেদান্তের নির্ণয়টী সত্যস্পর্শী বলিতে হয়। যাহাকে সৎ অসৎ বা সদসৎ কিছুই বলা যায় না, তাহাকেই বেদান্তে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। অব্যক্ত বলিলে তাহা সদ্বস্তুবিশেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা আছে এইরূপ কোন কোন বস্তুবিশেষ হইয়া যায়। আর তজ্জন্ত এই অনির্ব্বচনীয়কে একটা কিছু মনে করিয়া পুনরায় তাহাকে "আছে কি নাই" বলিয়া যাহারা শঙ্কা করেন অর্থাৎ তাহাকে "আছে" বলিয়া সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা সঙ্গত কার্য্য করেন না—ইহাই বলিতে হইবে। যাহা "আছে নয়" "নাই নয়" "আছে ও নাই" উভয় রূপ নহে, তাহাকে আবার "আছে" বলিয়া কি করিয়া শঙ্কা করা যায়? রামানুজাদি মতে এই রূপ শঙ্কা করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি বলা হয়, কার্য্য না থাকিলে কারণের কার্য্যজননী শক্তি নাই বা থাকে না তাহা কেন বলিব? কিন্তু সেই শক্তিকে অনভিব্যক্তরূপে আছে বা থাকে বলিব। যেস্থলে পরবর্ত্তীকালে কার্য্য জন্মে, সেস্থলেও শক্তি অনভিব্যক্ত-রূপে থাকে—ইহা বলাই ত সঙ্গত।

তাহা হইলে বলিব, তাহা অনেক স্থলে ঐরূপেই বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহাও সকল অবস্থাতে বলা চলিবে না। যেস্থলে পুনরায় কার্য্য উৎপন্ন হইবে না, সে স্থলে শক্তি অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে—ইহা কি করিয়া বলা যায়? ভ্রষ্টবীজ ও অভ্রষ্ট বীজ দেখিতে ত একই রূপ, না বলিয়া দিলে কেহই তাহাদের ভেদ বুঝিতে পারে না। সেই ভ্রষ্ট বীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। কিন্তু অভ্রষ্ট বীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অভ্রষ্ট বীজে শক্তি অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে বলা চলে, কিন্তু ভ্রষ্টবীজে শক্তি অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে ইহা ত বলা সঙ্গত হইবে না। অতএব শক্তি কার্য্য না জন্মাইলেও অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে—ইহা সাধারণ ভাবে বলা যায় না। উহাকে তখন নষ্টই বলিতে হইবে।

তাহার পর জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর নিকট জগৎ সংসার আর থাকে না। জগৎকারণের জগজ্জননী শক্তি চিরতরে চলিয়া যায়। ইহা না হইলে মোক্ষই সিদ্ধ হইবে না। আর এই কারণে তাহাকে জগৎকারণে অনভিব্যক্তরূপে থাকে কি করিয়া বলা যায়? ইহা অলৌকিক বিষয় বলিয়া শ্রুতির সাহায্যে ইহার মীমাংসা আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন "ন স পুনরাবর্ত্ততে" অর্থাৎ সে আর ফিরিয়া আসে না, আর জগৎ সংসার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। অতএব জ্ঞানের

পরও আবার সৃষ্টি হয় ইহা আর বলা চলে না। শক্তির নাশ হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শক্তির নাশ না হইলে আবার সৃষ্টি হইবে। যদি বলা হয়—জ্ঞানের পর সৃষ্টি হইবে না বা থাকিবে না কেন? শক্তিরূপা প্রকৃতিই সৃষ্টি করিবে? জ্ঞান হইলেও শক্তিরূপা প্রকৃতি নষ্ট হয় না। প্রকৃতি থাকায় জগৎ সংসারও থাকে। ইহাই সাংখ্যমত। এই মতে, সতী বলিয়া পতির নিকট পরিচিতা কুলটা স্ত্রীর ব্যভিচার প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সে যেমন পতির নিকট হইতে চিরতরে পলায়ন করে, আর মুখ প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে প্রকৃতি সেই জ্ঞানী পুরুষের নিকট অদৃশ্য হইয়া যান। কিন্তু সেই কুলটা স্ত্রীরূপিণী প্রকৃতি নষ্ট হয় না। জ্ঞান হইলে যাহা নষ্ট হয় তাহা প্রকৃতি পুরুষের অনাদি অবিবেক বা ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে যখন সেই ভ্রম নষ্ট হয়, তখন রজ্জুও নষ্ট হয় না, সর্পও নষ্ট হয় না। এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক রূপ ভ্রমস্থলে সেই ভ্রম নষ্ট হইলে প্রকৃতি বা পুরুষ কেহই নষ্ট হয় না।

কিন্তু এরূপ কল্পনাও সঙ্গত নহে। কারণ প্রকৃতি থাকিলেই আবার অবিবেক হইবে। তাহার ফলে আবার বন্ধন হইবে। আর বন্ধন হইলে আবার সংসার অর্থাৎ সৃষ্টি আবশ্যক হইবে। অবিবেকটী ভ্রম, তাহা জ্ঞানবিশেষ। তাহা প্রকৃতিজাত বুদ্ধির ধর্ম্ম, এই ভ্রমরূপ অবিবেকটী অনাদি হইলে তাহা বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির জননী প্রকৃতিতেই থাকিবে। প্রকৃতি নিত্যা হইলে তাহাও নিত্য হইবে। অতএব বুদ্ধির সহিত প্রকৃতি নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবিবেকের সম্পূর্ণ নাশ অসম্ভব। এই জন্য সম্পূর্ণরূপে অবিবেকের নাশ হইতে গেলে প্রকৃতিরও নাশ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতির সহিত অবিবেকের নাশ হইলেই পুনঃ সৃষ্টি অসম্ভব, নচেৎ নহে। দেখাই যায় পরোক্ষজ্ঞানী বৃদ্ধ বা রোগীর বিষয়ভোগে বৈরাগ্য হয়, কিন্তু রসায়নসেবন দ্বারা যৌবন ফিরিয়া আসিলে আবার ভোগ-বাসনা জন্মে। এইরূপ অবিবেকনাশের সহিত অবিবেকের আশ্রয়রূপ হেতু প্রকৃতি পর্য্যন্ত নষ্ট না হইলে অনাবৃত্তিরূপ মোক্ষের আশা দুরাশা মাত্র। এজন্য এ মতে মোক্ষ অসম্ভব। সাংখ্য-মতে কুলটা নারীর দৃষ্টান্তটী নিতান্ত অসঙ্গত। সে কুলটা কি অন্য পুরুষের বন্ধন জন্মাইবে না? সাংখ্যমতে পুরুষ ত বহু। অতএব প্রকৃতি সত্ত্বে মোক্ষ অসম্ভব। অন্য পুরুষের বন্ধন জন্মাইলে পুরুষের মোক্ষ আর সিদ্ধ হয় না।

বেদান্তমতে ভ্রমরূপ অবিবেকের নাশে প্রকৃতি পর্য্যন্তেরও নাশ হয়। কারণ তন্মতে প্রকৃতি একটী মিথ্যাবস্তু। তাহা নাই তথাপি দেখা যায় এইরূপ একটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের স্থলে সর্পভ্রমের নাশে সেই ভ্রমের বিষয় সর্পও নাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক রূপ ভ্রমের নাশে সেই ভ্রমের বিষয় এই সমূল জগৎ সংসারেরও নাশ হয়। আর তাহা হইলেই মোক্ষ সম্ভব হয়। সাংখ্যমতে মোক্ষ অসম্ভব। এজন্য ইহাই বেদান্ত-দর্শনের বিশেষত্ব।

সাংখ্যমতে আরও দোষ আছে। প্রথম—তন্মতে জড়া প্রকৃতি এক, এবং জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ বহু। অথচ তাহারা পৃথক্ বস্তু। প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। এ অবস্থায় প্রকৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রসব করে না। প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক বশতঃই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন বুদ্ধির জন্ম হয়, তখনই জ্ঞান জন্মে। প্রকৃতি পুরুষের এই অবিবেকও এই জ্ঞানবিশেষ। অতএব উক্ত অবিবেক, বুদ্ধি না জন্মিলে জন্মে না। অথচ এই

অবিবেককেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গের হেতু বলা হয়। ইহা কিন্তু অন্যোন্যাশ্রয় দোষ। অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলে অবিবেক হয়, এবং অবিবেক হইলে সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় বলিতে হয়। অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহাই কারণ হইল। ইহা কিন্তু অসম্ভব। আমাদের বুদ্ধি ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। বেদান্তী ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলেন। সাংখ্য কার্য্য কারণ উভয়কে সত্য বলেন, সুতরাং তাহাদের অভেদ স্বীকারে যে বিরোধ তাহা সত্য বিরোধ, আর বেদান্তী কার্য্যকে মিথ্যা এবং কারণকে সত্য বলিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে যে বিরোধ তাহা মিথ্যাবিরোধ, একথা কিন্তু বুদ্ধির গ্রহণের অযোগ্য নহে। বস্তুতঃ এই হেতু বেদান্তমতের শ্রেষ্ঠতা, আর ইহাই বেদান্ত দর্শনের একটী বিশেষত্ব। দ্বিতীয় দোষ এই যে, প্রকৃতির সত্ত্বগুণে যখন জ্ঞান জন্মে তখন জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ আবার স্বীকার করা কেন? আর এই প্রকৃতি যখন পুরুষ হইতে ভিন্ন তখন জ্ঞান দ্বিবিধ হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া তখন অনুভব হয় না। আর জ্ঞান তাহা হইলে জড়ের ধর্ম্মই হয়। বেদান্তমতে প্রকৃতি জড়া নহে, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি। তাহারা একত্র থাকে, সাংখ্যমতে একত্র থাকে না। এজন্য সাংখ্যের প্রকৃতিকে পুরুষের শক্তি বলাই যায় না। অথচ শ্রুতিতে আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি"। শক্তিনাশের লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। যেমন যে অগ্নি যখন তৃণাদি দগ্ধ করে তখন সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকে বলিতে হয়, আর তখন যদি সেই অগ্নির নিকট চন্দ্রকান্ত মণি আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে আর তৃণ দগ্ধ হয় না। সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইল। আবার সেই চন্দ্রকান্তমণি সত্ত্বেও যদি সেই অগ্নির নিকট সূর্য্যকান্তমণি আনয়ন করা যায়, অথবা সেই চন্দ্রকান্তমণিকে যদি অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে আবার দাহ হয়। সুতরাং সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হইল বলিতে হয়। অতএব শক্তির উৎপত্তি ও বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। এইজন্য অকার্য্যকালে সকল সময় শক্তিকে অনভিব্যক্ত বলিয়া তাহার সত্তা সিদ্ধ করা সঙ্গত হয় না। এস্থলে চন্দ্রকান্তমণি আনয়নের সময় শক্তি নষ্ট না বলিয়া অনভিব্যক্ত, এবং সূর্য্যকান্তমণি আনয়নের সময় শক্তি উৎপন্ন না বলিয়া অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে অভিব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত বলিলে শক্তিকে উৎপাদশীলা না বলিলেও চলে বটে, কিন্তু এস্থলে এই সকল স্থলেই যে সেই এক শক্তি তাহা বলিবার পক্ষে প্রমাণ নাই। নিয়ত নষ্ট উৎপন্ন দীপশিখাকে যেমন লোকে সেই দীপশিখা বলিয়া ব্যবহার করে, এস্থলেও যে সেইরূপ নহে তাহা কে বলিল? বস্তুতঃ পূর্ব্বের দীপশিখা পরে থাকে না, ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষই হয়। অতএব লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিরোধ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত হয় না। এস্থলে শক্তিকে উৎপাদবিনাশশালী বলাই সঙ্গত। জ্ঞানীর নিকট জগৎকারণ বস্তুতে শক্তি নষ্টই হয়। তাঁহার নিকট জগৎ তিনকালেই নাই। কেবল "আছে" বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। বস্তুতঃ তাহা নাই, তন্মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অথবা অজাতবাদই গ্রাহ্য। কোন এক কালেও যাহার সত্তা সিদ্ধ হয় তাহার রূপান্তর হইলেও নাশ অসম্ভব হয়। যাহা বস্তুতঃ নাই কিন্তু আছে বলিয়া বোধ মাত্র হয় তাহারই নাশ ঘটে। এইজন্যই বলা হয় জ্ঞানীর নিকট জগৎ তিন কালেই নাই। আর যে স্থলে পূর্ব্বে কার্য্য ছিল, মধ্যকালে কার্য্য নাই এবং ভবিষ্যতে কার্য্য জন্মে—দেখা যায় সে স্থলে এই কার্য্যজননী শক্তিকে অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ফলতঃ শক্তিকে দ্বিবিধ স্বীকার করা হয়। যথা—একরূপা শক্তি উৎপাদ-বিনাশশীলা, অন্যরূপা শক্তি এক সময়ে অনভিব্যক্তরূপা এবং অন্য সময় অভিব্যক্তরূপা, ইত্যাদি। কিন্তু ইহা বলিলে গৌরবদোষ হয়। উৎপাদ-বিনাশশীলরূপা একই প্রকার বলিলে লাঘব হয়। কল্পনাস্থলে গৌরবটী দোষ, লাঘবটী গুণ। আর শক্তি সর্ব্বত্রই অনভিব্যক্তরূপা বলিলে প্রমাণের অভাব হয়; যেহেতু শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়াই হয়। অনভিব্যক্ত অবস্থায় কার্য্য দেখা যায় না যে অনুমান করা হইবে। এজন্য প্রমাণের অভাব হয়। দীপশিখার দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তির একত্বও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু তাহা ভ্রম। কিন্তু উৎপাদ-বিনাশশীলা বলিয়া একরূপা বলিলে প্রত্যক্ষাদিই তাহার প্রমাণ হয়। এজন্য সর্ব্বস্থলেই শক্তি উৎপাদবিনাশশীলা ও নানা বলাই সঙ্গত।

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি সমাপ্ত)

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্সি, বি-টি

আলমবাজার মঠে বাবুরাম মহারাজ প্রথম একবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে বেলুড়ে স্বামী রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হইলে সেই সুমহান কার্য্যভার গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনো কখনো ভক্তগণের কাহারও কাহারও অন্তরের বিকাশভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ছোট ফুল দু'দিনেই যেমন ফোটে দু'দিনেই আবার তেমনি ঝরেও পড়ে কিন্তু বড় ফুল ধীরে ধীরে দীর্ঘদিনে প্রস্ফুটিত হয় আর দীর্ঘকাল উহার সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। প্রেমানন্দ মহারাজের চরিত্রালোচনায় অগ্রসর হইয়া এই উপমাটির পূর্ণ সার্থকতা যেন আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেখিতে পাই যে তাঁহার স্বভাব-কমল শনৈঃ শনৈঃ সহজ সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহার অনুপম চরিত্রের স্ফূর্ত্তি ধীরে ধীরে, বহু বর্ষ ধরিয়া ক্রমিক ধারায় আনন্দ, শান্তি ও উন্নত প্রেরণা চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ করিতে করিতে স্বামীজির দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, আলমবাজার হইতে বেলুড়ে স্থানান্তরিত হইয়া রামকৃষ্ণ মঠের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে রূপান্তর কাল পর্য্যন্ত কয়েক-বৎসর তাঁহার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে নিজস্ব বাটীতে মঠ যখন স্থানান্তরিত হইল, যখন হইতে মঠ-পরিচালনার গুরু দায়িত্বের অনেকখানি তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল, তখন হইতেই তাঁহার চরিত্রের অনুপম স্নিগ্ধ মাধুরিমা প্রত্যেক নরনারীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দুই চারি মাস বা দু'একটি বৎসর নয় পরন্তু জীবনের শেষ কিঞ্চিন্ন্যূন বিংশ বর্ষকাল তিনি মঠের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের নিয়ামক ছিলেন। শত শত নরনারী সুখ-দুঃখের অশেষ দাবদাহ ও সমস্যা বুকে লইয়া এইকালে নিয়ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তরুণ যুবকদল স্বামীজির পৌরুষ-পাঞ্চজন্যে আকৃষ্ট হইয়া দুটি একটি করিয়া মঠে যোগ দিত এবং তাহাদের শিক্ষার ভার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, তাঁহার বিরাট ধর্ম্মসংসারের কুটনো-কোটা, গরুর আহার দেওয়া হইতে ধ্যানজপের দুর্গম পথে প্রবর্ত্তকদিগকে চালিত করিয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। কী কোমলতা, কী দরদ ও সহনশীলতার মধ্য দিয়াই যে তাহা তিনি সম্পন্ন করিতেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন শুধু ভাষার সাহায্যে তাহা বুঝা যাইবে না। যে এক বারও তাঁহার নিকটসম্পর্কে আসিয়াছে, সে বলিতে বাধ্য হইয়াছে,—"মানুষ নিষ্কাম ভাবে কিরূপে এত ভালবাসিতে পারে?" মঠবাসী প্রত্যেকের দেহ-মনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তাঁহার সমগ্র সত্তা সতত জাগ্রত থাকিত। ছেলেদের লইয়া তরকারি কুটিতে কুটিতেই যে কত দিব্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তিনি

তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতেন, সামান্য ঘটনার মধ্য হইতে জীবন গঠনের কত মূল্যবান উপাদান আহরণ করিয়া তাহাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই কালে মঠে যোগ দিয়া যাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের মুখ হইতে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিকথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। কী গভীর শ্রদ্ধা, অপার্থিব প্রেম-সম্বন্ধের কী অব্যক্ত স্মৃতি-আলোড়ন তাঁহাদের ভাবাবেগরুদ্ধ প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া যে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি—স্তম্ভিত হইয়াছি—তাহা প্রকাশ করিবার নহে। তাঁহাদের একজন একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, দুঃখ ও অশান্তির বিষটুকু নিজের ভাগে রাখিয়া আনন্দ ও শান্তির মধুটুকু কী কৌশলে যে তিনি আমাদিগকে বাঁটিয়া দিতেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সহজ-কঠিন যাবতীয় কর্ম্মে কী স্নেহ-স্পর্শ দিয়াই যে তিনি আমাদিগকে নিয়োজিত করিতেন, প্রত্যেক কাজকে উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিবার কী পদ্ধতিই যে তাঁহার জানা ছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, একদিন রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মের খর দ্বিপ্রহরে, বেলা প্রায় ২টার সময় কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে তিনি মঠে পৌঁছিয়াছেন। মঠের সাধুগণ আপন আপন কক্ষে তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন কিন্তু প্রেমানন্দ মহারাজ মঠ-বাটীর গঙ্গার দিকের বারান্দায় কি একখানা কাগজ লইয়া বসিয়াছিলেন। আগন্তুকগণ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি হাতের কাগজখানা রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহাদের রৌদ্রক্লিষ্ট, ঘর্ম্মাক্ত মুখ দেখিবামাত্র নিমেষমধ্যে তাঁহার মুখে বেদনার যে গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিল তাহার স্মৃতি ইহ জীবনে ভুলিবার নহে। তাঁহাদিগকে একটি বেঞ্চিতে বসাইয়া ঐরূপ রৌদ্রে থাকিবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর নিজে ভাঁড়ার হইতে প্রসাদ আনিয়া প্রত্যেককে প্রসাদ ও জল দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া তবে যেন শান্ত হইলেন। অথচ আগন্তুকদের কেহই তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন না। এজাতীয় ঘটনা সে সময়ে তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারেরই মত ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মনোবেদনা শুধু যে এ সকল আগন্তুকদের শারীরিক কষ্ট দেখিয়াই জাগিয়া উঠিত তাহা নহে, তিনি মনে করিতেন—কখনো প্রকাশ করিয়াও বলিতেন—"আহা, এরা ঠাকুরকে দেখে নাই, তাঁর স্নেহভালবাসার কখনো আস্বাদই লাভ করে নাই। তবু কত দূর দেশ থেকে শুধু তাঁর নামের আকর্ষণে তাঁর স্থানে ছুটে আসছে। আমরা যদি এদের দুঃখ না বুঝি, বুকে টেনে আপনার করে না নি তবে ঠাকুরের মর্য্যাদাই বা এরা বুঝবে কিরূপে, মঠের প্রতি লোকের টানই বা হবে কিরূপে?"

তাঁহার অপূর্ব্ব ভালবাসার অমোঘ প্রভাবে কত যুবক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ত্যাগপূত জীবনের দিব্য আকর্ষণে কত যুবক গৃহের মায়া ভুলিয়া উদাসীন হইয়াছে!

নিঃস্বার্থ-প্রেম-সঞ্জাত অনন্যসাধারণ সহন-শীলতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রভাতকালে নিত্যপূজা ও ধ্যানাদি শেষ করিয়া মন্দিরের সিঁড়ি বাহিয়া যখন তিনি নীচে নামিয়া আসিতেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অমূল্য উপদেশবাণী প্রতিদিন তিনি স্মরণ করিতেন, নিজ মনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন—'যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' তাই অন্যের দোষ তিনি দেখিতে পারিতেন না। ভালবাসার অঞ্জন চোখে মাখিয়া অন্যের দোষকে

গুণ আর নিজগুণকেও অন্যের দোষের হেতুরূপে দেখিতে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। ফলে নিতান্ত অপদার্থ বহুদোষ-দুষ্ট ব্যক্তিও তাঁহার নিকট উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করিয়া সংশোধনের পথ পাইত, মানুষ হইবার প্রেরণা লাভ করিত।

স্বভাবগতভাবে প্রেমানন্দ মহারাজ স্বল্পভাষী ছিলেন। এমনকি বেলুড়ে মঠপ্রতিষ্ঠার বহু বৎসর পর পর্য্যন্তও তিনি কথাবার্ত্তা বেশী বলিতেন না। কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটের এক জনসভায় ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়া সহসা তাঁহার মুখ খুলিয়া যায়। সে সভায় তিনি দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং উহার পর হইতে আর তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন না। নবাগত ভক্ত ও সন্ন্যাসিগণের শিক্ষানুকূল্যের জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে। জীবনের প্রান্তে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা ও গ্রাম তিনি একবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বহু নরনারী এইকালে তাঁহার পুণ্যদর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছিল। যখন যেখানে তিনি যাইতেন সেইখানেই অসংখ্য নরনারীর ভিড় জমিয়া যাইত। তাহাদের সকলেই যে ভক্তির উচ্ছ্বাস বা জ্ঞানের পিপাসা লইয়া সমাগত হইত ইহা সত্য নহে। নিছক কৌতূহল এবং হুজুগেও অনেকে আসিয়া জুটিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল হুজুগপরবশ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অদ্ভুত স্নেহস্পর্শের আনন্দ-স্মৃতি জীবনের অক্ষয় সম্পদজ্ঞানে আজ পর্য্যন্ত অন্তরের নিভৃতকোণে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। অথচ তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার কোন সংবাদই রাখে না, মঠ বা মিশনের সহিতও কোন দিক দিয়া কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। এরূপ ব্যক্তির কথা আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত করিতেছি। এই সময়ে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কোন একটি গ্রামে এক ভক্তগৃহে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা জনৈক ব্যক্তির বিবৃতি অনুসারে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন সন্ধ্যাকালে বহু নরনারীপরিবৃত হইয়া প্রেমানন্দ মহারাজ নানা ভগবৎপ্রসঙ্গে রত ছিলেন। এই সময়ে উপস্থিত এক মুসলমান ভদ্রলোক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনাদের সর্ব্বভূতে সমদর্শন কথাটা অনেকটা মুখস্থ কথার মত। কৈ, আমার ছোঁয়া খাদ্য আপনি গ্রহণ করুন দেখি! তা যদি পারেন, তবেই বুঝবো আপনাদের ঠাকুর সমদর্শী ছিলেন এবং আপনাদেরও কথায় ও কাজে মিল আছে।" কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বাবুরাম মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সে কি, আপনার দেওয়া আমি খেতে পারব না কেন? আচ্ছা, কাল আপনি দুপুরে এখানে খাবেন—তখনই সব পরীক্ষা হয়ে যাবে।" কিয়ৎক্ষণ পর সে মুসলমান ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে উপস্থিত অনেকেই ঐ ব্যক্তির চরিত্রগত দোষ থাকায় মহারাজকে তাঁহার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। পরদিন যথাসময়ে সে মুসলমান ভদ্রলোকটিকে পার্শ্বে বসাইয়া তিনি আহারে বসিলেন, তাঁহার থালা হইতে নিজে আহার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং নিজের থালা হইতে আহার্য্য তুলিয়া তাঁহার পাতে দিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসুস্থ বোধ করিতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে সুরু করে। অনেকে অনুমান করেন যে ঐরূপ অসচ্চরিত্র ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণের ফলেই তাঁহার শুদ্ধ-সত্ত্ব দেহে প্রথম রোগ প্রবেশ

করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—পাথরের দেয়ালে ঝড়ের ধাক্কা লাগলেও কিছু হয় না কিন্তু কাঁচের শার্সি সামান্য বাতাসেই ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। তেমনি স্থূল ভোগলিপ্সু মনে অশুচির ঝড় উঠলেও তেমন কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সিদ্ধ শুদ্ধ মনে সামান্য অশুচির স্পর্শও বিষম ক্ষতির কারণ হয়। সুতরাং উক্ত ঘটনায় বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য-হানি হওয়া অসম্ভব না-ও হইতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে ঐ ব্যাপারটির মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের যে অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশিত হইয়াছিল, শুচি-অশুচিভেদে সকলকে টানিয়া তুলিবার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছিল তাহাও অনন্যসাধারণ। আমরা শুনিয়াছি, ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটির জীবন ঐ ঘটনার পর হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরদিন বাবুরাম মহারাজ যখন ঐ গ্রাম হইতে রওনা হইয়াছিলেন তখন দীর্ঘ ৮।৯ মাইল পথ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে নগ্নপদে সেই ভদ্রলোকটি তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বিবেকের তীব্র দংশনে অধীর হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে, করজোড়ে পুনঃ পুনঃ নিজ হঠকারিতার জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, আপনি দেবতুল্য পুরুষ আর আমি অত্যন্ত পাপী। জেদের বশে যে গুরুতর অন্যায় আমি করিয়াছি তাহার কি শাস্তি হইবে?" বাবুরাম মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্টি কথায় তাঁহাকে অভয় দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা, স্বভাবগত ধ্যান-শীলতা ও উচ্চ অনুভূতির পরিচয় দিবার অধিকার বা শক্তি আমাদের নাই। উহাদের বাহ্য প্রকাশও খুব বেশী ছিল না। যে দু'একটি ঘটনা উহাদের আংশিক বাহ্য পরিচয় প্রদান করিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই উহাদের সহিত পরিচিত আছেন। একদিন সকাল বেলা বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যবর্গের সহিত কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কিরূপে ব্রহ্মভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাবুরাম মহারাজকে পূজার উপকরণাদি হস্তে ঠাকুরঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কীভাবে "এই—এই প্রত্যক্ ব্রহ্ম" বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধির গভীর প্রদেশে ডুবিয়া গিয়াছিলেন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। অন্য আর একদিবস সন্ধ্যারতির পর বেলুড় মঠের পূর্ব্বেকার ঠাকুরঘরের বারান্দায় ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। জনৈক অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী বুঝিতে না পারিয়া এবং তাঁহার ঘাড় একদিকে ঝুঁকিয়া, বাঁকিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিয়া জাগাইতে ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছিলেন। পরে তিনি উহা জানিতে পারিয়া ভবিষ্যতে ঐরূপ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ কোনদিন আবার দেখলে কানে ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করবি।" এই জাতীয় কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়া যে তাঁহার সমাধিপ্রবণতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা বিশেষভাবে জানিও না এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও রাখি না। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ—আমাদের নিকট মনে হয় তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে ভগবানের নিত্যলীলার অবিরাম প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অনুমান করিয়া নহে, কল্পনা করিয়া নহে পরন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধির ভিত্তিতে শ্রীশ্রীমার বিষয়ে তিনি জনৈক ভক্তকে একদা লিখিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্য্যের লেশ নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ

সমাধি এসব আমরা দেখেছি—কত দেখেছি! কিন্তু মার—তাঁর বিস্তার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত! একি মহাশক্তি!—জয় মা!! জয় মা!! রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন। এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার করছেন। ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল, রামকৃষ্ণসঙ্ঘ তৈরীর জন্য—আর মা জয়রামবাটীতে থেকে এত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য—অপরিসীম করুণা—সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য।" আর একবার জয়রামবাটীতে তিনি ও স্বামী সুবোধানন্দজী আহারে বসিলে একটি বিড়াল পুনঃ পুনঃ বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল বলিয়া সুবোধানন্দ মহারাজ বিড়ালটিকে হঠাৎ আঘাত করেন। উহাতে চমকিত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"খোকা, করলি কি? বিড়ালটাকে মেরে বস্‌লি? এ মায়ের বাড়ী, কোন্ দেবতা এখানে কী বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার কি ঠিক আছে?"—শ্রীশ্রীমার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুরোধ করেও তিনি কখনো কোন কথা বলিতেন না। বলিতেন, "মহামায়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে কার সাধ্য? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।" এইরূপ কত ঘটনারই না উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন 'নরলীলায় বিশ্বাস হ'লে পূর্ণ জ্ঞান হয়।' তাহারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রেমানন্দ মহারাজের জীবনে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি।

অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত অব্যাহত আনন্দ ও পরার্থানুভূতি তাঁহার জীবনে একান্তই সহজ হইয়া ফুটিয়াছিল। তাই নিরাশা বা নিরুৎসাহের বাণী কখনো তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। অবিশ্রাম সদসদ্‌বিচারের অনির্ব্বাণ দীপশিখা তিনি অন্তরে জ্বালিয়া রাখিতেন,—প্রেমের অঞ্জন চোখে মাখিয়া বহির্জগতের সহিত তাঁহার মেলামেশা চলিত। ভূতে ভূতে ইষ্টদর্শন করিতেন বলিয়া অন্যের দোষ তাঁহার চোখে পড়িত না। বলিতেন, "কার দোষ আর দেখব বল, সব সোনাতেই খাদ আছে। আমরা ঠিক মত শেখাতে পারি না বলেই তো ছেলেরা ভুল করে, সুতরাং দোষ তো আমাদেরই।" এইরূপে দীর্ঘকাল পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম ও ভগবদ্-বিশ্বাসের জলন্ত উদাহরণরূপে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন জাতির চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ভক্তপ্রধান নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ, বিক্রমপুরের কলমা নামক গ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান ঘুরিয়া তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহার কিছু কাল পরেই রোগাক্রান্ত হন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই রোগ ক্রমে কালাজ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফলোদয় না হওয়ায় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে দেওঘর পাঠান হয়। তথায় স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইলেও পরে আবার সহসা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে পুনর্ব্বার কলিকাতা লইয়া আসা হয়। এইখানে, বলরামমন্দিরে, মাত্র তিনদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া চতুর্থদিনে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার মহাপ্রস্থানে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। চিরস্থির শ্রীশ্রীমা অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া-

ছিলেন—"আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে। বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিষ ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।"

তাঁহার চরিতালোচনা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন-বলতেন—'বাবুরাম নৈকুষ্য, ওর হাড় শুদ্ধ, দেহে পাপ কর্ম্ম, মনে কুচিন্তা পর্য্যন্ত হতে পারে না।' ঠাকুরের মহাভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন অন্ত কেহ তাঁকে ছুঁতে পারতেন না—স্বামীজি, মহারাজ এঁরা সকলে বীরভাবের সাধক। বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না—তাই হাড় শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলা সহচর-রূপে একমাত্র বাবুরাম মহারাজ সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন—সেখানে স্বামীজি নেই, আমাদের ত কা কথা। তোমরা বাবুরাম মহারাজের কথা যত বেশী চিন্তা করবে—তত বেশী তোমাদের কল্যাণ হবে।"

বাবুরাম মহারাজের দেবরক্ষিত জীবনের যথার্থ মাহাত্ম্য ও মূল্য নিরূপণের পক্ষে এই উক্তি মহামূল্যবান বলিয়া আমরা মনে করি। সুক্ষ্মভাব-সমৃদ্ধ সাধকজীবনের যথার্থ মর্ম্মকথা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিলাম তাহার ফলে সে দিব্য, অনুভূতিপুষ্ট, অহংলেশ-হীন জীবনের বিশেষ কিছু প্রকাশ যে হইয়াছে তাহাও আমরা মনে করি না।

আলোকের আশা

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল

হে ঈশ্বর, আরো কতকাল
জ্বালাইব এ ভঙ্গুর ক্ষীয়মাণ ধূপ?
আমিতো চাইনি হ'তে বিলাসী কুসুম
সৌরভের ভারে যার স্বপ্নীল আবেশ,
আমি শুধু শম্পাশীর্ষ জগৎ অঙ্গনে
জীবনের পদতলে নিত্য নিষ্পেষিত।
জীবনের পাত্র মোর আয়ুর কংকরে গেল ভরি;
কেহ তাহে ঢালিল না এতটুকু সুধা,
রচিল না কেহ মোর রক্তিম আবেশ।
জগতের হাটে হাটে শুধু বেচাকেনা,
তুলাদণ্ডে সবই শুধু মেপেজুপে দেওয়া,
নাই কোন হৃদয়ের অফুরন্ত দান,
মানুষ কখনো প্রভু ছিল কি মহান্?
মানুষের সুন্দরবনেতে
অন্ধকারে শ্বাপদের গুপ্ত বিচরণ,
সুন্দর বিহঙ্গদল কোথা গেছে উড়ে
যারা আনে আকাশের মধুর পরশ,
গানের কাজলে আনে তন্দ্রার জড়িমা;
কোথা গেল সূর্যের আলোক
উদয় অস্তাচলে যার নিতি নিতি
নব আলিম্পন
জীবনের নব নব রঙে!
ফুল আর ফোটে নাকো,
আনে নাকো স্বর্গের বিশ্বাস—
তারা নেই, সব শেষ।
পশ্চিম তিমির পথে যাত্রী,
অস্তমিত বুদ্ধির আলোক,
শর্বরীর অন্ধকারে আহতের আর্তনাদ,
এখনো হিংসায় ভরা পশ্চিমী শ্বাপদ,
শেষ চেষ্টা আহারের সন্ধানে তাহার
বীভৎস করিয়া তোলে জীবনের রূপ।
শুধু পূরব গগনে জাগে আলোকের আশা,
তারি লাগি ধরণীর 'পরে মোর
জাগে ভালবাসা।

আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন ঘটনা যখন ঘটে তখন বুঝ্তে হবে সেই ঘটনা আপনা-আপনি অকস্মাৎ ঘটেনি। সেই ঘটনাকে ঘটানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, আবহাওয়া অনুকূল ছিল। কারণ না থাক্‌লে কিছু ঘটতে পারে না। বিবেকানন্দ আমেরিকায় গেলেন এবং সেখানে ভারতের বেদান্তবাদ প্রচার করলেন। আমেরিকা উপনিষদের বাণী গ্রহণ করলো। হাজার হাজার নর-নারীর কাছে গীতার কথা তিনি শোনাতে লাগলেন আর আমেরিকানরা সে কথা কান পেতে শুনতে লাগলো মন্ত্রমুগ্ধের মত। আমেরিকা ভারতবর্ষকে এমন ক'রে সহজে যে নিতে পারলো বিবেকানন্দের জীবনীতে রোমঁ্যা রলঁ্যা (Romain Rolland) তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। রলঁ্যা বলছেন, এমার্সন এবং হুইটম্যান সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমেরিকানদের মনকে তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। তাদের মনের জমি তৈরী ছিল আর সেই জমিতে বেদান্তদর্শনের বীজ যখন পড়লো—ফসল ফলতে বিলম্ব লাগলোনা। স্বামীজী জ্ঞানযোগে বলছেন, 'বেদান্ত দর্শনের এক উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান।' আমেরিকায় স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির মধ্যে ঐক্যের জয়গান। তিনি বলতেন, 'যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ, ইহা মিলন-সম্পাদক, ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্ববিধায়ক—পৃথক্‌কারক। ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য; ইহা একটি বিনাশিনী শক্তি; ইহাতে পৃথক করে—নাশ করে।' এই ঐক্যের বন্দনাগীতি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায়। হুইটম্যানের কবিতার বই Leaves of Grass এ আছে:

I do not ask the wounded person how
he feels, I myself become the
wounded person."

"আহত ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করি না সে কেমন আছে, আমি নিজেই যে সেই আহত ব্যক্তির সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাই।" 'The Base Of All Metaphysics' কবিতাটিতে আছে:

Yet underneath Socrates
clearly see, and
underneath Christ the divine I see,
The dear love of man for his
comrade, the
attraction of friend to friend,
Of the well-married husband and wife,
of children and parents,
Of city for city and land for land.

হুইট্‌ম্যান বলছেন, সক্রেটিসের বাণীর মধ্যে, যীশুখ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে একই সত্যকে দেখতে পাচ্ছি, আর এই সত্য হোলো মানুষের জন্য মানুষের প্রেম, বন্ধুর জন্য বন্ধুর দরদ, দম্পতির ভালোবাসা, সন্তানবাৎসল্য, শহরের জন্য শহরের এবং দেশের জন্য দেশের সহানুভূতি।

এমার্সনের প্রবন্ধগুলির মধ্যেও ভারতীয় ঋষিদের অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ। এমার্সন আর হুইট্‌ম্যানের দৌলতে আমেরিকানরা ভারতীয় চিন্তাধারার মূলসত্যের সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই পরিচিত ছিলো

গীতা ও উপনিষদের মধ্যে যে শাশ্বত সত্যের সুর বাজছে আমেরিকানরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল Leaves of Grass এর কলগর্জ্জনের মধ্যে। The soil, the climate, the seeds, were there, and the forest grew. জমি ছিল আবাদ-করা, আবহাওয়া ছিল অনুকূল, বীজ ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং অরণ্য উঠলো জেগে।

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হচ্ছে কংগ্রেস। জাতির মর্ম্মবাণীর প্রকাশ কংগ্রেসের কণ্ঠে। এই কংগ্রেসের সারথি গান্ধী। এর সর্ব্বাঙ্গে গান্ধীর পাঁচ আঙুলের ছাপ। সারাদেশ গান্ধীর বাণীকে এত সহজে যে নিতে পারলো তারও একটা কারণ আছে। অহিংস অ-সহযোগের অগ্নিমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে গান্ধী আবির্ভূত হ'লেন কলিকাতা-কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে। তখন তাঁর পাশে শুধু আলী-ভ্রাতৃদ্বয়, আর কেউ নেই। বিপিন পাল, দেশবন্ধু, আনি বেশান্ত প্রমুখ মহামহারথীদের—কারও সমর্থন তিনি পেলেন না। তবুও জয়লক্ষ্মী তাঁরই কণ্ঠে পরিয়ে দিলো জয়মাল্য। এক নিমেষে ভারতবর্ষ বুঝতে পারলো, গান্ধীই তার প্রাণের রাজা। গান্ধীর বাণীর মধ্যে ভারতবর্ষ শুনতে পেলো তারই প্রাণের গভীরতম বাণী। একটী খর্ব্বকায় মানুষ এসে এমন ক'রে জনগণের হৃদয়কে এক নিমেষে যে জয় ক'রে নিতে পারলো—এতো যাদুমন্ত্রে নয়! গান্ধীর এই ঐতিহাসিক সাফল্যের হেতুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।. আর এই অনুসন্ধানের শেষে দেখতে পাবো, স্বামীজী তাঁর বাণী দিয়ে ভারতবর্ষের মনের জমিকে আগে থাকতেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন, আর সেই জমিতে সত্যাগ্রহের বীজ যখন পড়লো—তা অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হ'তে বিলম্ব লাগলো না। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের বাণীর মধ্যে শক্তির জয়গান। গান্ধী দেখলেন ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম শ্মশানের সামিল আর কোটী কোটী মানুষ জীবন্ত নরকঙ্কাল হয়ে আছে। কোটী কোটী ভারতবাসীর এই দুর্ভাগ্যের মূলে তাদের নিজেদেরই অজ্ঞতা এবং শক্তিহীনতা। কাকা কালেলকারের ভাষায়: To-day the masses do not know their own rights and interests. They do not understand who is sucking away their life-blood like a leach. They are not conscious of their own strength. Therefore, they are to-day like beggars instead of being the real owners. জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের নিজেদের শক্তিকে তারা জানে না। সেই জন্যই তারা আজ ভিখিরীর মত হ'য়ে আছে।

গান্ধী এসে নব্যভারতের কর্ণে বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করলেন, শক্তি রয়েছে জনসাধারণেরই মধ্যে। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে পার্লামেন্টের কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। Civil Disobedience is the storehouse of power. Imagine a whole people unwilling to conform to the laws of the legislature, and prepared to suffer the consequences of non-compliance! They will bring the legislative and executive machinery to a standstill.* আইন অমান্যের মধ্যে রয়েছে শক্তির উৎস। কল্পনা করো, একটা সমগ্রজাতি ব্যবস্থাপক সভার আইনগুলিকে মানতে অনিচ্ছুক আর সেই না-মানার জন্য যে-কোন দুঃখ আসে তাকে বরণ করতে প্রস্তুত। তারা আইন সভাকে এবং

* Constructive Programme by M. K. Gandhi, 2nd Ed, P. 9.

গবর্ণমেণ্টকে অচল ক'রে দেবে। গান্ধী বলছেন, It has been my effort for the last twentyone years to convince the people of this simple truth. শক্তি যে জনসাধারণেরই মুঠার মধ্যে এবং চরম দুঃখ বরণে সেখানে তারা প্রস্তুত, সেখানে কোন সামরিক বলপ্রয়োগই তাদের শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারে না—এই মহাসত্যই তো গান্ধী জনসাধারণকে আজ এত বছর ধ'রে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে রাজা বলছে নন্দিনীকে :

"আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেলতে পারি।"

নন্দিনী উত্তর দিলে,

"তারপর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।"

যারা শক্তিমান তারা শুধু ভয় দেখিয়েই শাসন করতে পারছে—মেরে ফেলবার ভয় দেখিয়ে। আমরা মরার ভয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে অত্যাচারীর শাসনকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। আমাদের বশ্যতা-স্বীকার অত্যাচারীর স্পর্দ্ধাকে আকাশস্পর্শী ক'রে রেখেছে। অত্যাচারীরা নিপীড়িতের দলকে নিরস্ত্র ক'রে রেখেছে। পাছে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে তার জন্য রেখে দিয়েছে হাজার হাজার গুপ্তচর, যাদের দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি। নিপীড়িতের দল মনে করেছিল, মারবার যখন ক্ষমতা নেই তখন অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ কোথায়? তাদের কানে ক্রমাগত রক্তকরবীর রাজার কথা বাজছিল, "তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তে মেরে ফেলতে পারি।"

এমন সময় গান্ধী এসে বললেন, মারুক, তবু প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের কাছে মাথা নত কোরো না। অস্ত্র নেই, তাতে কি হয়েছে? মারতে পারো না, কিন্তু মরতে তো পারো বীরের মত। বীরের মত মরবার সাহস আছে যাদের বুকে তাদের অসম্মান করে কার সাধ্য? গান্ধী বললেন, The police and the military are of use to coerce minorities however powerful they may be. But no police or military coercion can bend the resolute will of a people, out for suffering to the uttermost. জনসাধারণ যেখানে বলতে শিখেছে, সর্ব্বনাশকে ভয় করিনে, ভয় করি দাসত্বের অসম্মানকে সেখানে কে তাদের বশ্যতাস্বীকার করাতে পারে? ভয়ে বশ্যতাস্বীকার যেখানে নেই সেখানে অত্যাচারও নেই। নন্দিনী উত্তর দিলো, "আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।" গান্ধী দেশের হাজার হাজার নর-নারীকে বলতে শেখালেন, "আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।" মৃত্যুমন্ত্রে তিনি স্বদেশকে দীক্ষা দিলেন। দুঃখের আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকে তিনি নির্ম্মল ক'রে তুললেন। নিজেদের যারা একান্ত শক্তিহীন এবং অসহায় বলে মনে করতো তাদের তিনি শোনালেন, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের শক্তিকে পর্যুদস্ত করবার উপায় শক্তি। নিপীড়িতের দল নিরস্ত্র হয়েও শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। এই শক্তি, মুক্তির জন্য মরবার শক্তি, এই অস্ত্র মৃত্যুর অপরাজেয় অস্ত্র।

বিবেকানন্দের কণ্ঠেও এই শক্তিরই মহামন্ত্র। তিনি দেখলেন, শক্তির ঔদ্ধত্য হাজার হাজার মানুষকে 'তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেলতে পারি'—এই মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ক্রীতদাস করে রেখেছে, আর তাদের দুর্ভাগ্যের মূলে দাসত্ব। তিনি আরও দেখলেন, ক্ষমতার সুরা আকণ্ঠ পান ক'রে মত্ত হ'য়ে আছে যারা তারা ন্যায়ের কাছে সহজে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত নয়। প্রবলতর শক্তির কাছেই শুধু তারা মাথা নত করতে

প্রস্তুত। তাই নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্ত তিনি তাদের কর্ণে দিলেন আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র। তিনি বললেন, "অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তিসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যদি ধনীদের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ।" (জ্ঞানযোগ—৩৩৩-৩৩৪)

মানুষ যদি মনে করতে পারে—সে দেহ নয়, অবিনাশী আত্মা তবেই সে সমস্ত দুর্বলতার ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে সক্ষম হয়। তাই বিবেকানন্দ নব্যভারতকে যে মন্ত্র জপ করাতে শেখালেন তা হোলো, 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'—দিনরাত্রি শ্রবণ কর যে, তুমিই সেই আত্মা। গান্ধীও বলছেন: No one can destroy the soul. গান্ধী বিবেকানন্দেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছেন। গান্ধীর কণ্ঠে বিবেকানন্দেরই প্রতিধ্বনি। গান্ধী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক। সত্যাগ্রহের মধ্যে আত্মার অফুরন্ত শক্তিরই স্বীকৃতি। নোয়াখালিতে সংখ্যালঘুরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো:

How can we create a sense of security and self-confidence?

গান্ধী উত্তর দিলেন: 'By learning to die bravely.

তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো:

To whom should we appeal—the Congress, the League or the British Government?

গান্ধী আবার উত্তর দিলেন:

To none of these. Appeal to yourselves, therefore, to God.

নিজের উপরে নির্ভর কর, আত্মশক্তিতে শক্তিমান হও, বীর্য্যের সঙ্গে মরতে শেখো। এই আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার মন্ত্রই গান্ধীর মন্ত্র, আর এই মন্ত্রই স্বামীজী ভারতের কানে উচ্চারণ ক'রে প্রথম তার ঘুম ভাঙালেন।

ভুল

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সরকার

তীর্থভ্রমণ মানসে বাহির হইনু হেসে
গৃহদ্বার ছাড়ি;
হেনকালে দীনবেশে পথে দাঁড়াইল এসে
জনৈক ভিখারী।
করি যুক্ত কর ভিক্ষুক প্রবর
কইল কাতর স্বরে,
অন্ন-বস্ত্রহীন কাটে নিশিদিন
করুণা কর গো মোরে।

অতীব অবজ্ঞা ভরে কিছুই না বলে তারে
চলিনু আপন কাজে,
মহা উল্লাসে পৌছিনু এসে
গয়ার মন্দির মাঝে।
নমি দেবতারে উঠিলাম ধীরে
শুনিলাম দৈববাণী:
হেথা আমি নহি তব দ্বারে রহি
বহি শীর্ণ দেহ খানি।

হিন্দু বীজ-মন্ত্র এবং ইস্‌লামী আয়ত ও আল্‌ফাজ

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

সীপারা, আয়ত ও আল্‌ফাজ

মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'কুরাণ-শরীফ'কে 'কুরাণ-মজীদ'ও বলে। ইহাতে ত্রিশটী 'সুরত' বা 'সীপারা' অর্থাৎ অধ্যায় আছে। ফারসী ভাষায় 'সী' শব্দের অর্থ 'ত্রিশ' এবং 'পারা' শব্দের অর্থ 'টুকরা' বা অংশ; এই ব্যুৎপত্তিতে কুরাণ-মজীদের এক এক ত্রিংশাংশকে 'সীপারা' বলা হইয়াছে।

হিন্দুদিগের বেদে যেরূপ একটী বা কয়েকটী বাক্যকে 'মন্ত্র' বলা হয়, সেইরূপ কুরাণ-মজীদের প্রতি 'সীপারা' বা অধ্যায়ের মধ্যবর্ত্তী এক-একটী বাক্য বা বাক্য-সমুদয়যুক্ত অংশ-বিশেষকে 'আয়ত' বলে। এই 'আয়ত' শব্দের অর্থ হইতেছে 'ফিকরাহ্‌' বা মন্ত্র অথবা ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূতের উক্তি। কুরাণ-মজীদ বা যে কোনও গ্রন্থের বাক্য-সমূহবর্ত্তী শব্দকে ফারসী আদি ভাষায় 'লফ্‌জ' বলে। 'লফ্‌জ' (word)-এর বহুবচন ফারসী ব্যাকরণ অনুসারে 'আল্‌ফাজ' (words) হয়। এইরূপ 'ফিক্‌র্‌' বা 'ফিকর্‌' (খটকা বা চিন্তা) শব্দেরও বহুবচন ('লফ্‌জ' হইতে 'আল্‌ফাজ'-এর মতই) 'আফ্‌-কার' হইয়া থাকে।

মন্ত্র ও বীজ-মন্ত্র

'মন্ত্র' শব্দের অর্থ গোপ্য বা রহস্যপূর্ণ বাক্য। দেবতাগণের প্রীতি-সাধন নিমিত্ত 'গায়ত্রী' আদি ও অন্যান্য বৈদিক বাক্য যাহাদের বিনিয়োগ বা ব্যবহার যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে হইয়া থাকে, উহাদিগকেও 'মন্ত্র' বলে। এইরূপে সম্পূর্ণ বেদের বাক্য-সমূহকেই মন্ত্র বলা হয়। ইহাতে বিশেষত্ব এই মাত্র যে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র-সমূহকে 'ঋক্‌' বলা হয় এবং অন্য বেদ-ত্রয়ের বাক্য-সমূহকে মন্ত্রই বলা হয়। যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমূহে বিনিয়োগ নিমিত্ত মন্ত্রাংশ-বিশিষ্ট বেদকে 'সংহিতা' বা 'মন্ত্র-সংহিতা' বলে।

অথর্ব্ব-বেদে দেবতা-প্রীতি ও বিশিষ্ট কামাদির সিদ্ধি নিমিত্ত কতকগুলি মন্ত্র-বিশেষ আছে, যাহা অন্য বেদ-ত্রয়ের ভাষা, তাৎপর্য্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। অথর্ব্ব-বেদেরও বহু পরবর্ত্তী কালে তন্ত্র-যুগ আরম্ভ হয়। এই তন্ত্র-সমূহেরও শব্দ বা বাক্য যাহার জপ দ্বারা দেবতাদিগের প্রসন্নতা লাভ হয় এবং যাহা সাধকের স্বার্থে বা পরার্থে বিভিন্ন কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেও 'মন্ত্র'ই বলে। বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মত নানা বিষয়ে ব্যবহৃত না হইয়া এবংবিধ ইষ্ট-দেবতার প্রসন্নতা ও সাধকের কামনা-সিদ্ধির নিমিত্তই কেবল প্রযোজ্য হয় বলিয়া পরবর্ত্তী যুগে 'মন্ত্র' বা 'মন্ত্র বিদ্যা' বলিতে 'তন্ত্র'কেই বুঝাইত। এখনও 'তন্ত্রে'র সহিত 'মন্ত্র' শব্দ যোগ-রূঢ়বৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (যেমন, 'তন্ত্র-মন্ত্র')।

উপর্য্যুক্ত অথর্ব্ব-বেদ বা তন্ত্র-সমূহে যে সকল মন্ত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, উহাদের মধ্যে বিভিন্ন দেবতা-বাচক এক বা একাধিক 'একাক্ষরী' শব্দরূপবিশিষ্ট মন্ত্রও রহিয়াছে। বিভিন্ন দেবতার

বিভিন্ন নাম বা বিশেষণাত্মক শব্দ-সমুদায় ব্যবহৃত হইলেও, প্রতি দেবতার একটী অভিধানাত্মক বিশেষ প্রিয় নাম বা গোপ্য একাক্ষরী শব্দ আছে, যাহাকে ঐ দেবতা-বিশেষের 'বীজ-মন্ত্র' বলা হয়। যেমন, অগ্নির অনল, হুতাশন আদি বিভিন্ন নাম থাকিলেও তাহার 'রং' বিশিষ্ট অভিধান বা নাম অথবা বীজ-মন্ত্র। এইরূপ লক্ষ্মীর 'শ্রীং', মহাশক্তির 'হ্রীং' এবং শ্রীকৃষ্ণের 'ক্লীং' ইত্যাদি বিশিষ্ট অভিধানাত্মক বীজ-মন্ত্র।

মন্ত্র ও আয়ত এবং -মন্ত্র ও আল্‌ফাজ

উপরি-উক্ত 'বীজ-মন্ত্র'-সমূহ তৎ-তৎ-দেবতার ঋষি-দৃষ্ট বা সিদ্ধ সাধকগণের নিকট অভিব্যক্ত বিভিন্ন প্রকারের মন্ত্র-সমূহের প্রারম্ভে অথবা অন্তে কিংবা আদি ও অন্তে উভয়ত্রই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গোপাল আদি মন্ত্রে কেবল মন্ত্রের আরম্ভে বীজ-মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দক্ষিণাকালী ও বটুক-ভৈরবাদি মন্ত্রের আদি ও অন্ত উভয় স্থানেই বীজ-সমূহের প্রয়োগ রহিয়াছে।

ইস্‌লাম-ধর্মে 'নমাজ' আদিতে যে সকল আয়ত বা মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, উহাদের সাধারণতঃ শেষে একটী এমন শব্দ বা 'লফ্‌জ' আছে, যাহা খুদা বা ঈশ্বরের বিশেষ অভিধান বা বিশেষণরূপে

।

হিন্দুদিগের পূজাদিতে বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র-সমূহও সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা দেবতা-প্রীতির নিমিত্ত পূজা ও প্রার্থনাদি করা হয়। ইস্‌লাম-ধর্মেও পবিত্র 'কুরাণ-মজীদ'-এর বিশেষ বিশেষ 'আয়ত' মুসলমানগণের 'পরস্তিশ' বা পূজাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'পূজা'কে ফারসী ভাষায় 'পরস্তিশ' বা 'ইবাদত' বলে। এই পরস্তিশ বা ইবাদতের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ 'নমাজ', যাহা আমরা মুসলমানদিগকে করিতে দেখি। 'হাফিজ'-গণ বলিয়া থাকেন যে কুরাণ-মজীদের যে কোনও 'আয়ত' দ্বারাই নমাজ পড়া যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের 'বুজুর্গ'-গণ (পূজ্য মহাজনেরা) যে সকল আয়ত বা মন্ত্র 'নমাজ' ও 'পরস্তিশে' ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, উহাদেরই ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ এবং সেইজন্য নমাজ আদির জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সংগৃহীত আয়ত বা মন্ত্র আছে।

এই প্রবন্ধে আমরা হিন্দুদিগের দুই একটী বীজ-মন্ত্রের সঙ্গে ইস্‌লামী আয়তে ব্যবহৃত আলফাজের হুবহু এক-রূপতা দেখাইব। এই প্রকার আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে জগতের সকল ধর্ম্মই বাহ্য দেশ, কাল, ভাষা ও অধিকারী পাত্রাদির বিভিন্নতায় পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হইলেও, তাহাদের সকলেরই মূল উদ্ভব এক প্রাচীনতম সনাতন ধর্ম্ম-প্রকাশক পরমেশ্বর হইতেই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিবেচ্য ও অনুসন্ধেয় যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক প্রাচীনতম ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত এবং দেশ, কাল, ভাষা ও পাত্রাদির বিভিন্নতায় ক্রমশঃ বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত মাত্র। এক কথায় প্রাচীনতম, অধুনা অজ্ঞাতবৎ, সনাতন ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত ইদানীন্তন রূপ-রেখা-প্রাপ্ত হিন্দু-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম, ইসাই-ধর্ম্ম, জোরষ্ট্রিয়ান ধর্ম্ম আদি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকেই Sister Religions বলা যাইতে পারে। একই প্রাচীনতম আদি সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন লোক-গুরুদিগের বিভিন্ন রুচি অনুসারে ঋজু বা কুটিল নানাবিধ পথ, মত বা মজহবের উদ্ভব হইয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে সকল ধর্ম্ম-মতের মধ্যেই পূজা, প্রার্থনা ও ঈশ্বরীয় তাত্ত্বিক-রূপ এবং অনেক শব্দের সামঞ্জস্য বা অদ্ভুত এক-রূপতা রহিয়াছে। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ

হিন্দুদিগের বীজ-মন্ত্র 'ক্রীং', 'হ্রীং' ও 'ক্লীং'-এর সহিত ইস্‌লামী উপাসনায় ব্যবহৃত শব্দত্রয়ের হুবহু এক-রূপতা দেখান যাইতেছে।

ক্রীং, ক্রীম্=ক্‌রীম্

দুর্গা ও কালী আদি মহাশক্তির উপাসনায় ব্যবহৃত বীজমন্ত্র 'ক্রীং'-এর বর্ণ-বিন্যাস করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—ক্+র্+ঈ+ম্=ক্রীম্।

মুসলমানদিগের নমাজে ব্যবহারের জন্য কুরাণ-মজীদের সপ্তদশ 'সীপারা' হইতে গৃহীত মন্ত্র বা 'আয়তে' আছে যে—

"লা ইলাহা ইল্লা হোআ রব্ব্‌ল্ আর্‌শিল্ করীম।"

—লা=নহী, নাই; ইলাহা=ঈশ্বর; ইল্লা=কিন্তু; হোআ=তিনি; রব্ব্‌ল্=মালিক, প্রভু; আর্‌শ=সিংহাসন; করীম=দয়ালু, পাপহরণ-কারী। এই আয়তের সমুদায় অর্থ ইহাই যে—"(সপ্তম স্বর্গের[১]—আসমানের—উপরে[২] রমণীয়) সিংহাসনস্থ তিনিই (আল্লাই) ঈশ্বর—মালিক; (তিনি ছাড়া) দ্বিতীয় পাপ-নাশকারী—দয়ালু—ঈশ্বর কেহ নাই।"

উর্দ্দু বা ফারসীতে 'করীম' লিখিতে বাঙ্গালার 'ক্র' বা 'ক্‌'-এর মত 'কাফ্' (ক)-এর নীচে সঙ্গে সঙ্গেই 'রে' (র) অক্ষর লেখা হয়। 'প্রীতি' শব্দ উর্দ্দু বা ফারসীতে লিখিতে গেলে 'পে' (প) এবং 'রে' (র) যেরূপ লেখা হইবে, ইহাতেও সেইরূপ। পড়িতে 'প্রীতি'কেও তাঁহারা 'পরীতি' পড়িবেন; এইরূপ 'প্রেম' ফারসীতে 'পরেম' হইয়া যায়। সুতরাং 'ক্রীম্'কেও তাঁহারা 'করীম্' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এইটি ইংরাজীতে লিখিলে আরও স্পষ্ট হইবে:—Kareem. এখানে 'K'-এর পরে 'a' vowel ফারসীতে নাই; ফারসীতে 'K' ও 'r' এক সঙ্গে লেখা হয়, কিন্তু পড়িতে 'a' vowel-এর যোগ করা হয়। সুতরাং ফারসীর K-reem, হিন্দুদের 'Kreem' বা 'ক্রীম্'-ই হইতেছে। এই উভয় শব্দের মধ্যে কাল-ক্রম বা ভাষান্তর-প্রাপ্তিতেও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

হ্রীং, হ্রীম্=র্‌হীম্

এই 'হ্রীং' বীজটি অধিকাংশ দেবতারই বীজ-মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ 'পরস্তিশ', 'নমাজ' ও জপ আদি সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই হিন্দুদিগের আচমন[৩] ও 'পুণ্ডরীকাক্ষ' বিষ্ণু-স্মরণাদির[৪] মত নিম্নলিখিত মন্ত্র বা 'আয়ত' সর্ব্বদা ব্যবহার করেন:—

"বিস্‌ম্ ইল্লা হির্ রহমান্ ইর্ রহীম্"

অর্থাৎ রহমান্ (দয়ালু) ও রহীম্ (ভক্তজনের প্রতি 'কৃপাশীল') আল্লার 'ইস্‌ম্' (নাম) লইয়া সুরু করিতেছি।

এই বীজ-মন্ত্র ও ইস্‌লামী লফ্‌জের সমরূপতাকে ইংরাজীতে লিখিলে আরও সহজে বোঝা যাইবে। যথা—'Raheem'-এর 'R'-এর পরবর্ত্তী 'a' vowel ফারসীতে না থাকায় উহা বাদ দিলে ইহা 'Rheem'-ই হইয়া পড়িতেছে।

ক্লীং, ক্লীম্=ক্‌লীম্

'ক্লীং' বীজ শ্রীকৃষ্ণের বীজ-মন্ত্র রূপে ব্যবহৃত

১ হিন্দু-ধর্ম্মেও সপ্ত 'ব্যাহৃতি'র উল্লেখ আছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য লোক এই সপ্ত ব্যাহৃতি। সৌর-জগতে ভূঃ (পৃথিবী)-ও স্বর্গাদিবৎ অন্তরীক্ষেই অবস্থিত। সুতরাং এবংবিধ সাত আসমানও হইতে পারে।

২ এখানে 'উপরে' অর্থ 'এতদতিরিক্ত' (Beyond these), এই অর্থ করিলে হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে ইহার এক-রূপতা হইতে পারে। অন্যথা 'বৈকুণ্ঠে সিংহাসনে আসীন ভগবানে'র মত অর্থ ধরিতে হইবে।

৩ যেমনী—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদি।

৪ "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

হয়। অন্যান্য কোনও কোনও দেবতার মন্ত্রের সঙ্গে ইহার ব্যবহার হইলেও প্রধানতঃ ইহাকে কাম-বীজ রূপেই ধরা হয়। ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রন্থেও 'কলীম্‌' লফ্‌জটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই লফ্‌জ বা শব্দটী হজরত মুসারই খাস বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য 'ক্লীং' শব্দ।

ইস্‌লাম-ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করেন যে যখন যখন যে কোনও দেশে ধর্ম্মের অবনতি ও পাপ-কর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন সেই সেই দেশে ঈশ্বর ধর্ম্মসংস্থাপনের[৫] জন্য এক এক জন পয়গম্বরকে পাঠান। ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণ বিশ্বাস করেন যে হজরত মহম্মদের পূর্ব্বেও অনেক পয়গম্বর[৬] জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মী কোনও কোনও ব্যক্তি একথা স্বীকার করেন যে হিন্দুস্তানেও শ্রীকৃষ্ণ আদি অনেক পয়গম্বর[৭] জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ইস্‌লামীদের হজরত মুসা, যিনি হজরত মহম্মদের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত ও জীবন-চারিত্র্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও জীবন-ব্যবহারের সঙ্গে অনেক স্থানে মিলিয়া যায়। মুসার জীবনী পড়িলে মনে হইবে যেন শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ছাঁচে অপর একটী কাহিনী লেখা হইয়াছে।

হজরত মুসা মিশরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় মিশরের রাজা ফীরণ অত্যন্ত অত্যাচারী ও পাপ-কর্ম্মী ছিলেন। খুদা তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। মুসা জন্মিবার সমকালে জ্যোতিষিগণ রাজা ফীরণকে বলেন যে তাঁহারা পূর্ব্বাকাশে বিশিষ্ট নক্ষত্র-দর্শনে[৮] জানিতে পারিয়াছেন যে শীঘ্রই এক মহাপুরুষ তাঁহার রাজ্যে জন্ম-গ্রহণ করিবেন, যিনি তাঁহাকে হত্যা করিবেন এবং তদানীন্তন সব রীতি-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া কংস রাজা যেরূপ গোকুলের সকল সদ্যজাত শিশুগণকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, সেইরূপ রাজা ফীরণের আদেশে তাঁহার রাজ্যের সকল সদ্যজাত শিশুকে মারিয়া ফেলা হয়। মুসার মা পলাইয়া নীল নদীর ধারে এক পাহাড়ে চলিয়া

৫ এ কথাটী হিন্দু-শাস্ত্রেরই অনুরূপ। পার্থক্য ইহাই যে হিন্দু-ব্যতিরিক্ত ইস্‌লাম আদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, পয়গম্বর বা ঈশ-পুত্রাদির আগমন মানেন এবং হিন্দুগণ পাপাচারীদের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বরেরই আগমনে বিশ্বাস করেন। যথা—

> "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
> ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
>
> —গীতা, ৪।৭-৮।

৬ ফারসীতে 'পয়গাম' শব্দের অর্থ সন্দেশ, বার্ত্তা বা খবর। যিনি 'পয়গাম' লইয়া আসেন, তাঁহাকে 'পয়গম্বর' বলে। দেশ ও কালোপযোগী ঈশ্বরীয় বার্ত্তা-বাহককে 'পয়গম্বর' বলে।

৭ হিন্দু-ব্যতিরিক্ত পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্ম্মে সাধারণতঃ ঈশ্বরকে জীব ও জগতের অভিন্ন উপাদান কারণ বলা হয় নাই। এজন্য ঊর্জ্জিত বিভূতিমান্‌ ব্যক্তি-বিশেষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইবার শাস্ত্রীয় কোনও যুক্তি নাই। তাই তাঁহারা এবংবিধ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া থাকেন। হিন্দুগণ পরমেশ্বরকে জীব ও জগতের অভিন্ন উপাদান কারণ মানায় তাঁহাদের পক্ষে যুগে-যুগে স্বয়ং ঈশ্বরেরও জীবরূপে প্রকট হইবার ধারণা ও বিশ্বাস সহজ ও যুক্তিযুক্ত। এইজন্য এখানে ইস্‌লামী দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে পয়গম্বর বলা হইয়াছে।

৮ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'বাইবেল' পাঠে জানা যায় যে তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্টেরও জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে মধ্য-প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ আকাশে এইরূপ নক্ষত্র-বিশেষ দেখিয়া তাঁহারও জন্ম-কালাদি বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন।

যান। সেখানে মুসার জন্ম হইলে তাঁহার মা খুদার (ঈশ্বরের) বাণী ও আদেশ অনুসারে মুসাকে এক পাত্রে রাখিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। ঐ শিশুসহ পাত্র ফীরণের রাজধানীর নিকটে ভাসিয়া আসিল। ফীরণের রাণী ঐ শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে রাখেন। রাণীর হঠকারিতায় ফীরণ ঐ শিশুকে মারিতে পারেন নাই। বাল্যকালে এমন অনেক ঘটনা হয় এবং এমন সব অত্যাচার মুসাকে সহ্য করিতে হয় যে প্রতি বিপত্তিতে, হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার মত, খুদা মুসাকে রক্ষা করেন। মুসাকে এজন্য সকলে বিকট জাদুকর বলিয়া মনে করিত। মুসা ঈশ্বরীয় বাণী শুনিয়া পলায়ন করিয়া মিশরের 'মদীন' নামক এক শহরে যান। এই শহরে এক ইন্দারার পার্শ্বে মেষপালিকা বালিকাদ্বয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গৃহে গমন করিয়া মুসা সেখানে অবস্থান করেন এবং তাহাদের বড়টিকে বিবাহ করেন। দশ বৎসর পরে সস্ত্রীক মুসা মদীন হইতে ফীরণের রাজধানীতে ফিরিবার পথে মুসার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। মুসা অদূরে এক 'তুড়' পাহাড়ে কাষ্ঠ ও অগ্নি সংগ্রহ করিতে গিয়া ঈশ্বর-সন্দর্শন লাভ করেন। ঐস্থানে খুদা তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য আদি বলিয়া দেন। মুসা রাজধানীতে আসিলে রাজা ফীরণ তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরাদেশে মুসা নীল নদীর জল স্বীয় যষ্টিদ্বারা স্পর্শ করিতেই নদীর জল দ্বিধাকৃত হইয়া নদী-মধ্যে রাস্তা হইয়া যায়। মুসা পরপারে পৌছিতেছেন দেখিয়া রাজা ফীরণ যোদ্ধাদের সহিত ঐ রাস্তায় যেমন নদীর মধ্যস্থলে পৌছিয়াছেন, অমনি নদীর প্রবল তরঙ্গায়িত জল-প্রবাহ তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়ে ও সসৈন্য রাজা ফীরণ জল-সমাধি-প্রাপ্ত হন। কংস ও অন্যান্য পাপাচারীদের বধকারী শ্রীকৃষ্ণের মত মুসার জীবনেও অনেক গল্প আছে।

ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণ বলেন যখনই প্রয়োজন মুসা তখনই খুদার সহিত 'কলাম' করিতেন অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত কথা বলিতেন। সাধারণ লোক মুসার সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিত এবং এখনও করে। কিন্তু যথার্থ সত্য ইহাই যে মুসার জীবনের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোঝা যায় তাঁহার ঈশ্বরাত্ম-বোধ এত বেশী ছিল যে ব্রহ্মাত্ম-বোধযুক্ত মহাপুরুষদের মতই তাঁহার গতি-বিধি, আচার-ব্যবহার ও জীবন-ক্রিয়া ছিল। ইস্‌লামীগণ মুসাকেও পয়গম্বর বলিয়া মানেন। মুসা খুদার সঙ্গে 'কলাম' (বার্ত্তালাপ) করিতেন বলিয়াই তাঁহাকে "কলীম" বলা হইত। মুসার[১] খাস (স্বীয় বিশিষ্ট) নাম বা অভিধানই "কলীম", যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট অভিধান বা বীজ-রূপী নাম 'ক্লীং'।

'ক্লীং' বা 'ক্লীম্' এবং 'কলীম' শব্দও পূর্ব্ব-কথিত 'ক্রীং' ও 'করীম' শব্দের মতই বুঝিতে হইবে যেহেতু ইংরাজীতে 'kaleem' লিখিত হয়; কিন্তু ফারসী ভাষায় 'কাফ্' (ক) ও 'লাম্' (ল) এক সঙ্গে লেখা হয়; এই বর্ণ-দ্বয়ের মধ্যে 'a' বা অ কোনও স্বরবর্ণ নাই। সুতরাং উহা বস্তুতঃ 'k-leem' (ক্লীম্)-ই হইতেছে।

উপসংহার

দুইটী বর্ণ সংযুক্ত থাকিয়া ঐ মিলিত বর্ণ-দ্বয়ের মধ্যে কোনও স্বরবর্ণ না থাকিলেও স্বরের উচ্চারণ,

১ 'মুসা' ফারসীতে সাধারণতঃ 'মুসিআ' লেখা হয়। উচ্চারণ খানিকটা 'মুস্‌আ'র মত এবং 'স' এর উচ্চারণ কোমল হইবে, যেমন 'মদ্রাস' (Madras)-এর 'স' একটু 'ছ'-এর মত উচ্চারিত হয়।

ফারসী ও উর্দ্দুর মত, হিন্দীতেও করা হইয়া থাকে। যেমন, 'কর্ম্ম', 'শর্ম্ম' ও 'বিরক্ত' আদি শব্দে 'র্ম'-এর 'র্' ও 'ম' এবং 'ক্ত'-এর 'ক্' ও 'ত'-এর মধ্যে কোনও স্বরবর্ণ না থাকিলেও সংযুক্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অনেক স্থানে অনেকেই 'করম্', 'শরম্' ও 'বিরকত্' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লিখিতে হুবহু এই 'করম্', 'শরম্' ও 'বিরকত্' শব্দ বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের মতই 'কর্ম্ম', 'শর্ম্ম' ও 'বিরক্ত' (বৈরাগ্যযুক্ত) লেখা হয়। এই প্রকারে দেখা যাইতেছে 'ক্রীম্'ও 'ক্লীম্' উর্দ্দু বা ফারসীতে সংস্কৃতের মতই একই প্রকারে লেখা হইলেও উচ্চারণে 'জবর' (অ)-স্বরযুক্তবৎ 'করীম্'[১০] ও কলীম্ আদি বলা হয়।

এবংবিধ পবিত্র শব্দ-সমূহের বা আল্‌ফাজের[১১] বিভিন্ন ধর্ম্মে বা মজহবে পূজা বা 'পরস্তিশ' আদিতে ব্যবহার হইতে দেখিয়া এবং ঐ সকল শব্দাবলীযুক্ত সাধন-বিধি ও সাধনার প্রচারক ধর্ম্ম-গুরুদের উদ্ভব-কাল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির অনুসন্ধানে সহজেই বোঝা যায় পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী দেশের বিভিন্ন ছাঁচে ঢালা ধর্ম্মেরও পরম্পরারূপে মূল উদ্ভব-স্থান জগতের প্রাচীনতম ও স্বয়ং পরমেশ্বর-প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্ম।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলিয়াছেন—"যত মত তত পথ", এবং সকল মতেই তাঁহার দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার হেতুও ইহাই মনে হয় যে বিভিন্ন ধর্ম্ম-গুরু তাঁহাদের বা তাঁহাদের শিষ্যদিগের দেশ, কাল ও পাত্রানুরূপ রুচি অনুসারেই নানাবিধ পথের আবিষ্কার ও উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই গম্য বা জ্ঞেয় একমাত্র পরমেশ্বর। ধ্যেয় ঈশ্বর 'এক' বলিয়াই ইসলাম-ধর্ম্মে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে—"লা ইকরাহা ফীদ্দিন"—অর্থাৎ মজহব বা বিভিন্ন মত বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও জবরদস্তী বা বিবাদ-বিসংবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই কথাই হৃদয়ে অনুভব করিয়া ইসলাম-ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শ্রীপুষ্পদন্ত তার-স্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান বা উপাসনা-মার্গ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও এবং 'ওটা মন্দ এইটাই (আমারটাই) উত্তম উপাদেয়' এইরূপ বিবাদ-বিসংবাদ অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকিলেও, বক্রাবক্র বিভিন্ন মার্গ-গামী নদনদী-সকলের গম্য-স্থান এক সমুদ্রের মতই, সরল বা কুটিল সকল মত-মার্গগামীদিগেরই ধ্যেয় ও গম্য 'এক'-ই পরমেশ্বর।

[১০] যাঁহাদের উর্দ্দু বর্ণমালার সহিত পরিচয় আছে, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিবেন যে সংস্কৃত ও ফারসীতে এই শব্দসমূহের এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেশান্তরীয় ভাষায় কালক্রমে কিঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে; কিন্তু উহাদের বিনিযোগ উপাসনাতেই হইতেছে। 'গুরুমুখী' ভাষায় ষ্টেশনকে 'সটেশন' বলা ও ভাষায়ও লেখা হয়। কিন্তু এই 'ক্রীম্' আদি শব্দ-সমূহে, 'সটেশনে'র মতও 'স্'-অক্ষরে 'অ'-বর্ণের আগমনবৎ, ফারসীতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

[১১] 'কুরাণ-মজীদ' আদি ইসলামীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে ব্যবহৃত 'অল্লা' (বা আল্লা'), 'ইল্লা', 'কবর' ও 'ইল্ললা' আদি 'আলফাজ' (শব্দ-সমূহ) হিন্দুদিগের অথর্ব্ব-বেদীয় একখানি উপনিষদেও পাওয়া যায়। তবে উপনিষদে হিন্দুগণের ধারণা ও ধাতুজ ব্যুৎপত্তিগত শব্দ-শক্তির বাচকতা ও সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন ইসলাম-ধর্ম্মে 'অল্লা' শব্দের অর্থ 'খুদা' বা ঈশ্বর এবং উক্ত উপনিষদে 'অল্লা' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম'।

বাঁশরি

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

মোহন বাঁশরি
মরম নিঙাড়ি
বাজাতো যে সুর
যমুনা কূলে,

সে সুর-লহরী
মন-প্রাণ হরি
কোথা নিয়ে যেতো
আপনা ভুলে।

শান্ত যমুনা
হ'তো আনমনা
নীল জলে যেতো
উজান বহি,

তার ঢেউগুলি
আকুলি বিকুলি
লুটায়ে পড়িত
দুকূল বাহি।

শুনি সে বাঁশরি
গৃহ কাজ ছাড়ি
ব্রজকুলবালা
আসিত ছুটি,

বলিত কানাই
যেথা আছে যাই
দেখিয়া জুড়াই
নয়ন দুটি।

বন পাখী সব
থাকিয়া নীরব
শুনিত বাঁশরি
তাঁহাকে ঘিরে,

ভুলে যেতো তারা
হ'য়ে দিশে-হারা
কেমনে ফিরিবে
আপন নীড়ে।

মৃগশিশু দল
প্রেমেতে বিহ্বল
মার কোল ছাড়ি
আসিত ছুটি,

বাঁশরির তালে
নাচি তালে তালে
যমুনার কূলে
পড়িত লুটি।

এখনো বাঁশরি
বাজিছে গুমরি
যমুনা পুলিনে
সে তান ধরি,

সেই তাহা শোনে
সেই তাহা জানে
সেই শোনা লাগি
আছে যে পড়ি।

বাঙ্গলার কৃষিসমস্যা ও আর্থিক সঙ্কট

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

কৃষি-সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হইবে মাটির দিকে। কেননা, চাষীর অবস্থার উন্নতি নানাভাবে সম্ভব হইলেও ফসল আসে মাটি হইতেই। মাটির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি নির্ভর করে সার-প্রয়োগের উপরে। তার সঙ্গে প্রয়োজন হয় জলের। কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশের কৃষি-ব্যাপারে দুইটি জিনিসের অভাব দেখা যায়।

বাঙ্গলা দেশে গোবর ব্যবহৃত হয় সারের জন্য। কিন্তু গোবরের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়, জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রন্ধনাদি কার্য্যে 'ঘুঁটে' হিসাবে। জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যাপ্ত হইলে সমগ্র বা অধিকাংশ গোবর সারের জন্য ব্যবহার করা যায়। সুতরাং জ্বালানি কাষ্ঠের বৃদ্ধির দিকে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। এস্থলে বিশেষভাবে বক্তব্য এই যে, বিষ্ঠা অন্যান্য দেশে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা সারের জন্য ব্যবহৃত হইলে কৃষির বহুতর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। জলের জন্য সাধারণ ভাবে পুকুর কাটা, কুয়া খোঁড়া, বাঁধ দেওয়া প্রভৃতি যে সব কাজ চাষীদের আয়ত্তাধীন তাহা তাহাদিগকে করিতে হইবে, যদিও বৃহৎ-সেচন, জলাশয় তৈয়ারী, খাল কাটান ইত্যাদি কার্য্যের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই যে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ হইল এবং তারপরও যে দুর্ভিক্ষ চারিদিকে রহিয়াছে তাহা আকস্মিক নহে, তাহা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নয়। ইহার সূচনা হইয়াছে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে। এতদিন যে মেঘ তিলে তিলে জমিয়া কাল হইয়া উঠিতেছিল, যুদ্ধের দুর্য্যোগে হাহাকারের মধ্যে তাহাই পরিণত হইয়াছে ঝড়ের আকারে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারী মতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল বাইশ কোটি; আজ তাহা চল্লিশ কোটির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জনসংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ছিল চার কোটি, এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ছয় কোটির মত। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্গলা দেশ খাদ্যসমস্যা সমাধানের দিকে বিশেষ মনোযোগী হয় নাই। অবহেলা ও ঔদাসীন্যে ভারাক্রান্ত হইয়া এখানকার কৃষি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রায় একই অবস্থায় অচল হইয়া পড়িয়া আছে। খাদ্যসামগ্রীর জন্য আমরা দিন দিনই পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছি। এই পরনির্ভরতা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বহির্বাণিজ্যের আমদানীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে উপলব্ধ হয়। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে কি পরিমাণ খাদ্যজাতীয় দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম তালিকা

বিদেশ হইতে ভারতে ও বাঙ্গলায় আমদানি

জিনিসের নাম	ভারতে মোট আমদানি		বাঙ্গলার অংশ	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
ধান-চাল ...	১৩'৭ লক্ষ টন	১১'৯ কোটি টাকা	২'৮ লক্ষ টন	২'৩ কোটি টাকা
বিবিধ ডাল ...	৭০'৬ হাজার টন	৬৯ লক্ষ টাকা	৪'৮ হাজার টন	৪'৮ লক্ষ টাকা

জিনিসের নাম		ভারতে মোট আমদানি		বাঙ্গলার অংশ	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
গম	...	১'৬ লক্ষ টন	১'২ কোটি টাকা	৭৬'৮ হাজার টন	৫৫'৫ লক্ষ টাকা
লবণ	...	৩ লক্ষ টন	৩৭ লক্ষ টাকা	৩ লক্ষ টন	৩৭ লক্ষ টাকা
সুপারী	...	১৮ লক্ষ হন্দর	২ কোটি টাকা	১২ লক্ষ হন্দর	১'৩ কোটি টাকা
লঙ্কা	...	৬৩ হাজার হন্দর	১০ লক্ষ টাকা	৩'৬ হাজার „	৫২ হাজার টাকা
লবঙ্গ	...	৭০ হাজার হন্দর	৩৬'৬ লক্ষ টাকা	২৭ হাজার „	১৫ লক্ষ টাকা
গোলমরিচ	...	২৪ হাজার হন্দর	৪'৬ লক্ষ টাকা	১২'৬ হাজার „	২'৪ লক্ষ টাকা
তামাক	...	৭৮'৯ লক্ষ পাউণ্ড	১ কোটি টাকা	৫ লক্ষ পাউণ্ড	৬'৪ লক্ষ টাকা
মাখন	...	৮ হাজার হন্দর	৮'৬ লক্ষ টাকা	৪'৫ হাজার হন্দর	৬'৮ লক্ষ টাকা
চিনি	...	৩৫'৭ হাজার টন	৪৫'৬ লক্ষ টাকা	৩ হাজার টন	৪'৭ লক্ষ টাকা
টাট্‌কা ফল			৯ লক্ষ টাকা		৪ লক্ষ টাকা
আলু	...	৬৮ লক্ষ হন্দর	৩৫'৯ লক্ষ টাকা	৫'৯ লক্ষ হন্দর	৩ লক্ষ টাকা
মাছ	...	১৪ হাজার হন্দর	৬'৯ লক্ষ টাকা	৪ হাজার হন্দর	১ লক্ষ টাকা
বিস্কুট ও কেক্	...	২৯ হাজার হন্দর	২৪'৭ লক্ষ টাকা	৭'৯ হাজার হন্দর	৬ লক্ষ টাকা
ঘন দুধ ও ক্রীম ইত্যাদি		৬২ হাজার হন্দর	২০ লক্ষ টাকা	২৬'৬ হাজার হন্দর	৬'৯ লক্ষ টাকা
আচার, চাটনি, শস ইত্যাদি	...	৮'৫ হাজার হন্দর	৫'৯ লক্ষ টাকা	২'৯ হাজার হন্দর	১'৯৫ লক্ষ টাকা

দ্বিতীয় তালিকা

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আমদানি

জিনিসের নাম		পরিমাণ		আমদানি-কেন্দ্র
গম	...	৩৬১১ হাজার মণ	...	পাঞ্জাব, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ
আটা	...	১৬২২ হাজার মণ	...	পাঞ্জাব, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ
ছোলা	...	১৭৫৮ হাজার মণ	...	বিহার ও যুক্তপ্রদেশ
বিবিধ ডাল	...	৫৯৪২ হাজার মণ	...	বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ
চিনা বাদাম	...	১০৭১ হাজার মণ	...	মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ
তিসি	...	৪০৬৪ হাজার মণ	...	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
সরিষা	...	৪০৯৪ হাজার মণ	...	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম
ঘি	...	৩৭৯ হাজার মণ	...	যুক্তপ্রদেশ, বিহার
চিনি	...	৫৬৫৬ হাজার মণ	...	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
গুড়	...	৪০৪৭ হাজার মণ	...	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
তামাক	...	৭৬২ হাজার মণ	...	বিহার, মাদ্রাজ
বিবিধ তেল (কৃষিজ)		১৭৪২ হাজার মণ	...	বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ
শুকনো ফল		১৪১ হাজার মণ	...	সীমান্তপ্রদেশ ইত্যাদি

উপরি-উক্ত প্রথম তালিকা হইতে মনে হয়, কৃষিপ্রধান ভারতের ন্যায় দেশের পক্ষে এতদপেক্ষা বিড়ম্বনা, ইহার মত অকল্যাণ আর কি হইতে পারে? নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের বলে প্রথম তালিকায় উল্লিখিত সমস্ত কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্য ভারতবর্ষ নিজ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, ভারত ইহার অধিকাংশ জিনিস এত জন্মাইতে পারে যে, সে নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া তাহার মোটা এক অংশ বিদেশে রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্ত ও করিতে পারে। যেখানে উচিত ছিল পরকে জোগান, সেখানে আমরা হইয়াছি পর-মুখাপেক্ষী, পরভৃত।

বাঙ্গলা দেশের বেলা এই পরনির্ভরতা আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম তালিকা হইতে একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, বিদেশ হইতে ভারতে যে সব খাদ্যদ্রব্যের আমদানি হয়, তাহার এক বড় অংশ আসে মুখ্যতঃ বাঙ্গলা দেশের বরাদ্দহিসাবে। দ্বিতীয় তালিকা দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের জন্য অত্যন্ত নির্ভরশীল। দ্বিতীয় তালিকায় উল্লিখিত দ্রব্য ব্যতীতও নেবু, ফুলকপি, পেঁয়াজ, এমন কি আম পর্য্যন্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আসে।

মোটের উপর বাঙ্গলার মত কৃষির দৈন্য আর কোথাও উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। বোম্বাই ছাড়া, ভারতের আর কোনও প্রদেশ খাদ্য সরবরাহের জন্য এভাবে পরাধীন নয়। বোম্বাইএর পক্ষে পরাধীনতা দুই কারণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। বোম্বাইএর মাটি তেমন উর্ব্বরা নয়, চাষের জন্য জলের ব্যবস্থাও তথায় তত সহজ নয়। তাহা ছাড়া, বোম্বাই শিল্পের দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক উন্নত। সুতরাং বৃহত্তর ক্রয়ক্ষমতার জন্য বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

বাঙ্গলা দেশে আপাততঃ যে চাষের জমি আছে, তাহার প্রায় বার আনা অংশেই হয় ধান চাষ। পাট চাষ হয় ইদানীং দেড় আনা অংশে আর বাকী আড়াই আনা অংশে গম, বার্লি, ভূট্টা, ডাল, আলু, অন্যান্য তরিতরকারি, ফলমূল, সরিষা, আখ, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত জমিতে ধান চাষ করিয়াও আমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় চাউলের অভাব মিটাইতে পারিনা; বর্ম্মা হইতে চাউল আনিয়া আমাদের ঘাটতি পূরণ করিতে হয়।

কেন এই ঘাটতি-পূরণ করিতে হয়?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আমাদের বিঘাপিছু ফলনের পরিমাণ মাত্র চারি মণের মত। চীনের ফলন এতত্তুলনায় দ্বিগুণ, জাপানের ত্রিগুণ, অথচ বাঙ্গলা দেশের জমির উর্ব্বরতা বেশী, জলের অভাব নাই, সাধারণ আব-হাওয়া ও ধান চাষের পক্ষে অনুকূল। বাঙ্গলার ঘাটতির মূলে রহিয়াছে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির দৌরাত্ম্য, আর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ও সারপ্রয়োগের অভাব। এই সব উপদ্রব ও অভাব দূর হইলে বাঙ্গলা দেশের ফলনও অন্ততঃ দ্বিগুণ হইতে পারে।

একদিকে গম, আটা, ডাল, সরিষা, তেল, ঘি, ফল, আলু, তরিতরকারি ইত্যাদি বাঙ্গলায় আসে বাহির হইতে, তাহার জন্য আমাদিগকে দিতে হয় পুরা দাম বা তারও বেশী। অন্য দিকে, বর্ম্মা-চালের প্রতিযোগিতায় এবং পাটকলের মালিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের চাষীর ভাগ্যে ধান ও পাটের উচিত মূল্য জুটে না। ধান ও পাটের উপর বেশী নির্ভর করিয়াই আমাদের চাষীরা হইয়া পড়ে নিরুপায়। কেননা,

বর্ম্মার সস্তা দামের চালের প্রতিযোগিতায় এখানকার চালের বাজার হইয়া পড়ে মন্দা, আর পাটকলওয়ালাদের সম্মুখীন হইয়া বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্বল নিরুপায় চাষীরা নিজেদের প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বাঙ্গলার কৃষিকে নানা দিক দিয়া বিচিত্র করিয়া তোলা দরকার। একই জমি হইতে প্রয়োজনানুসারে বিবিধ শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন পাটের বাজার লাভজনক না হইলে চাষীরা পাট কমাইয়া অন্য ফসল বুনিতে পারিবে। এইভাবে চাষীরা দাঁড়াইতে পারিলে পাটকল-ওয়ালাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে এবং তখনই কলের মালিকরা নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাষীদের উচিত মূল্য দিতে বাধ্য হইবেন।

দো-ফসলী জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে ও সারের প্রয়োগে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে, অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদির চাষ বর্দ্ধিত করা সহজেই সম্ভব হইবে। গমের চাষ, বিভিন্নপ্রকার ডালের চাষ, আলুর চাষ, সরিষার চাষ—এতজ্জাতীয় চাষের জমি বাড়াইয়া তিন চারি গুণ ফসল ফলান অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া নানাবিধ ফলমূল, তরিতরকারি-চাষের দিকেও অধিকতর অবহিত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ফলের চাষে বাঙ্গলা সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্-গামী। গ্রামে চাষীরা নিজেদের বাসগৃহের সংলগ্ন জমিতেও আম, নেবু, পেঁপে, কুল ইত্যাদির, চাষ অনায়াসেই বাড়াইতে পারে। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, গোচর ভূমির দিকটাও ভাবিবার বিষয়। গরু মহিষের খাদ্য হিসাবে নানাপ্রকার সবুজ ঘাসের চাষ কৃষিপ্রধান দেশে অত্যাবশ্যক।

কিন্তু কৃষির উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে শিল্প শিক্ষার প্রসার একান্ত আবশ্যক। স্বাধীন দেশমাত্রেই কৃষির সঙ্গে শিল্প ও শিক্ষা পাশাপাশি চলিয়াছে। আর একথাও সত্য যে, জীবনের যেমন এক অংশকে একান্ত করিয়া তুলিলে প্রগতি সহজেই সীমাবদ্ধ হয়, তেমনি কেবল কৃষিকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে কৃষির উন্নতিও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, রাশিয়ায় শিক্ষা, শিল্প ও কৃষির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ,—নিবিড় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিক্ষাবিস্তার, কলকারখানা, পথঘাট, রেলওয়ে নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাদিক দিয়া রাশিয়ার উন্নতি গত বিশ বৎসরের মধ্যে সুদূরপ্রসারী হইয়াছে।

অজ্ঞতা ব্যাপক হইলে চিত্তবৃত্তি হয় নিশ্চেষ্ট, আর কর্ম্মোদ্যম থাকে সুপ্ত। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা তাই আজ আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়—কি কৃষিতে, কি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। অধিকন্তু, শিল্পের উন্নতিতে কৃষি লাভবান হয় দুই দিক হইতে। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা মালের চাহিদা বাড়ে। বিক্রয়ের জন্য চাষীকে দূর দেশের উপর নির্ভর করিতে হয় না—ঘরের কাছেই নূতন বাজার গড়িয়া উঠে। তখন কৃষক উৎপাদন সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়। আর শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নূতন নূতন শহর। তার ফলে আশ পাশের গ্রামগুলিও কৃষিজাত দ্রব্য সরবরাহের সুবিধা পায় এবং তৎসঙ্গে ঐ সকল গ্রামের রাস্তাঘাট, জল, আলো, চিকিৎসা প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হয়। এই ভাবে শহর ও গ্রামের মধ্যে কেবল পণ্য চলাচলই যে সহজ ও সুগম হয় তাহা নহে, নূতন ভাব নূতন ধারণা গ্রামে প্রবেশ করে এবং আধুনিকতার স্পর্শে সেখানে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যেটুকু শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে কলকারখানা আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে কলিকাতায় ও তাহার আশে পাশে। ফলে কলিকাতা বিশাল হইতে বিশালতর

হইতে চলিয়াছে। আমাদের নাগরিক জীবনে কলিকাতার শিল্পবিষয়ক একাধিপত্য বাঙ্গলার পক্ষে মঙ্গলসূচক নহে। ইহাতে শহর ও গ্রামের প্রভেদ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের অন্য সব শহর প্রায়ই গড়িয়া উঠিয়াছে শাসনকেন্দ্র হিসাবে। এই প্রকার শাসনকেন্দ্রিক শহরের সৃষ্টিতে দেশ তেমন লাভবান হইতে পারে না। কারণ, শিল্পকেন্দ্রিক শহর না হইলে দেশকে ও তৎসঙ্গে কৃষিকে নানাদিক দিয়া উন্নতিশালী করা যায় না। এইজন্য প্রয়োজন দেশের মধ্যে বহু শিল্পকেন্দ্রিক শহর-সৃষ্টির। তাহা হইলেই গ্রাম ও কৃষির নানাদিক দিয়া উন্নতি হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন শহরের মধ্যেও যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়, রাস্তাঘাট, যানবাহনাদি চলাচলের সুবিধার দিকেও অধিকতর লক্ষ্য হয়, জীবনও সুন্দর ও আনন্দময় হইয়া উঠে। এই জন্য বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থলে নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই জামসেদপুর, বার্ণপুর ইত্যাদির মত নূতন নূতন শহর বাঙ্গলাদেশে গড়িয়া উঠিবে এবং গ্রামগুলিও সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইয়া উঠিবে, আর কলিকাতাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

গুরুত্বের দিক দিয়া কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পের সঙ্গে মনে আসে বাঙ্গলাদেশের নদনদীর কথা। বর্তমানে নদীগুলি নানা কারণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। জলপথে চলাচল প্রায় স্থগিত হইয়া আসিতেছে। বহু জায়গায় নিস্তব্ধজল ম্যালেরিয়ার আকর হইয়াছে এবং বিস্তৃত চাষের জমি কচুরীপানার আশ্রয়স্থলরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহা ছাড়া, এই সব নিস্তেজীকৃত নদীগুলি যেন প্রতিশোধের মত বর্ষাকালে আমাদের আবাসস্থল ও ক্ষুধার অন্ন ভাসাইয়া লইয়া যায়। যদি নদীগুলি সংস্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি বর্ষার বিরাট জলের এক অংশ নীরস কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে চালিত করা যায়, আর অবশিষ্ট জলের নিকাশনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। তবে এই সব বৃহৎ কার্য্যের ভার সরকারের উপর ন্যস্ত না হইলে ব্যক্তিগত বা দলগত চেষ্টায় এসব ক্ষেত্রে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার দুর্গতি যেরূপ দ্রুততর চরমে উঠিতেছে, তাহাতে দেশের কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান অবিলম্বে করিতে হইবে। এতকাল আমাদের লব্ধ জ্ঞান মস্তক ও পুস্তককেই কেবল ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহা সফল হইবার সুযোগ পায় নাই। কেবল কমিশন বসিলেই অনশন থামিবে না। মনে রাখিতে হইবে, যেখানে প্রাণ আছে, দৃষ্টি সেখানে স্বতঃই খুলিয়া যায়, তাহার জন্য আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। তবে শুভ লক্ষণ এই যে, দেশের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সব চেষ্টা সামান্য মাত্র, তথাপি বাঙ্গলার অগণিত নরনারীর জীবন-মরণের মাঝখানে সম্বল এক্ষণে ঐ সামান্য তুচ্ছ সম্ভাবনা—ঐ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

হিন্দোলন-লীলা

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী

দেবদোল

উত্তর-ফাল্গুনী-নক্ষত্রাশ্রিত ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনটি স্বধর্মনিরত বাঙালীর মনোরাজ্যে দুইটি বিশেষ কারণে অতীব গৌরবময়। একটি শ্রীগোবিন্দের দোলারোহণ-যাত্রা এবং অন্যটি নদীয়ার চাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের শুভ আবির্ভাব। দোলারোহণ-যাত্রা বা হিন্দোলন-লীলা জাতীয় বিজয়োল্লাসজ্ঞাপক এক বিরাট উৎসব। ইহার গৌরবময় উচ্চ আদর্শ ধারণা করিবার শক্তি স্বাধীনতাহীন মুমূর্ষু জাতির নাই, আছে মাত্র প্রাচীন স্মৃতির গতানুগতিক ও প্রাণহীন অনুষ্ঠান! জাতি যখন স্বাধীনতার অতুলনীয় সম্পদে সৌভাগ্যবান্ ছিল, তখন শক্রনিসূদন গোপপূজিত শ্রীগোবিন্দকে সুসজ্জিত উচ্চ দোল-মঞ্চোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কি যে সম্মান প্রদর্শন, পূজার্পণ এবং প্রেমাভিনন্দন করিত তার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য দিবার জন্যই বোধ হয় দোল-যাত্রার মন্ত্রগুলি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। দোলন ও ফল্গুদানের মন্ত্র যথা,—

> দামোদর হৃষীকেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
> গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥
> নারায়ণং মহাদেবং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
> লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবেষ্টিতম্॥
> গোপীভির্বেষ্টিতো নাথঃ খেলয়েৎ পরমেশ্বরঃ।
> লোকযাত্রা-হিতার্থায় ফল্গুদানং করোম্যহম্॥
>
> ... ...
>
> পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মণা নির্মিতঃ স্বয়ম্।
> অসুরাণাং বিনাশায় গৃহ্ন ফল্গুং সুরোত্তম॥
>
> ... ...
>
> জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দ-বর্দ্ধক।
> ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥

ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশের দিনেই পূজা-উৎসবের সার্থকতা, অভাব-রাক্ষসের উৎকট দংশনে নিত্য প্রপীড়িত পরাধীন জাতির নিকট এ সব প্রাণহীন নীরস অনুষ্ঠান মাত্র। এমনও দিন ছিল, যখন দেবদোল, দেবীদোল, রামদোল, ফুলদোল ইত্যাদি কত ভাগবতী বিলাসলীলা মহানন্দে উদ্‌যাপিত হইত।

> গোবিন্দানুগৃহীতস্য যাত্রায়াং তৎপ্রকীর্তিতম্।
> ফল্গুৎসবং প্রকুর্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহাণি বা॥

—এই শাস্ত্র-নির্দেশ মতে সর্বাশ্রয়-তত্ত্ব শ্রীগোবিন্দের অশেষ অনুগ্রহ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে বিলানো থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববাসী নরনারী আরও অধিকতর অনুগ্রহলাভেচ্ছায় ঐকান্তিক ভক্তি-ভরে এই হিন্দোলন লীলা বা ফল্গুনিক্ষেপোৎসব পাঁচ দিন বা তিন দিন অনুষ্ঠান করে।

অমৃত পানে যেমন তৃষ্ণা মিটে না, যত পান করা যায় ততই প্রবল পানেচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া আরও অমৃতাহরণে পানার্থীকে সমুৎসাহিত করে, তেমনই গোবিন্দানুগ্রহ জীবনে অফুরন্তভাবে পাইয়াও জীব তৃপ্ত হইতে পারে না, আরও পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে সচেষ্ট হয়। ভক্তিরাজ্যের কথাই হইতেছে যা কিছু করা হবে, সব 'তৎতৃপ্তয়ে'। তাঁহার তৃপ্তি তাঁহার সন্তোষ যদি সাধন করা যায়, তবে ভক্তের সন্তোষ-সাধনার্থ তাঁহার অদেয় কিছুই থাকে না, কারণ—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'। সচ্চরিত্র হইয়া সাধু কর্মানুষ্ঠান অনলস প্রচেষ্টাদ্বারা করিতে পারিলে, তাঁহার সন্তোষ বিধান হয়; তখন পরম কারুণিক বিশ্বৈকনিয়ন্তা

শ্রীগোবিন্দ বিশ্বতোষণার্থ স্বয়ং আনন্দে হল্লিস-ক্রীড়ায় মত্ত হন।

হল্লিসক্রীড়া বা হোলী

শ্রুতি, সাংখ্য প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে বিঘোষিত অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম তাঁহার আনন্দলীলা-সহায়ক প্রকৃতি এবং তৎ-সঞ্জাত জীবের সহিত পরমানন্দপ্রদ এই হল্লিস-ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হল্লিস-ক্রীড়া বলিতে একজন পুরুষের আট বা দশজন রমণীর সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্যবিলাস বুঝায়। হোলাকা শব্দে বসন্তকালীন বহ্নি-উৎসব বা ঐ নাম্নী রাক্ষসীকে বুঝায়। বিশ্বপ্রাণাতি-রঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলায় ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে মেঢ়াসুর এবং হোলাকা রাক্ষসীকে বধ করিয়া ঐ গুলিকে ভস্মীভূত করার জন্য বহ্নি-উৎসব করিয়াছিলেন। এই শত্রু-নিপাতের আনন্দে ব্রজবাসিগণ পরদিন বালক কৃষ্ণকে উচ্চ মঞ্চোপরি আরোহণ করাইয়া তাঁহার দিব্যরূপ দর্শনে ধন্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সুসজ্জিত দোলনায় বসাইয়া আন্দোলন করিতে করিতে নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে বিরাট শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিজয়োল্লাসের আনন্দ-তরঙ্গ যেমন সবার দেহমনকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তেমনই আনন্দরক্তিমাভ ফল্গুচূর্ণ সিঞ্চনে এবং প্রেমরসরঞ্জিত বিবিধ বর্ণের সুগন্ধ বারিপূর্ণ পিচকারীর ধারাভিষেকে পরস্পর অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। সে আনন্দোৎসবের তুলনা নাই, সেই গৌরবোজ্জ্বল মহানন্দের স্মৃতি-কণিকাই বহন করিতেছে সনাতন আর্যকৃত্য এই দোললীলা বা হোলীখেলা। দোল-পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে এখনও যথারীতি চাঁচর বা মেষ-মন্দির-দাহরূপ বহ্নি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা দিনে মঞ্চোপরি দেবপূজা, ফল্গুসিঞ্চন ও হিন্দোলন এবং পরদিন পঙ্কোৎসব, আবিরখেলা ও পিচকারীখেলা সমাপনান্তে অপরাহ্নে দোলারোহণে দেবতাকে লইয়া নৃত্যগীতের শোভাযাত্রা সহ বনবিহার-লীলাদিতে ত্রিদিবসীয় কৃত্য সুসম্পন্ন হয়।

মানবের পরম লাভ আনন্দানুভূতি

বহির্জগতে এই দোললীলা যেমন মঞ্চোপরি পুরুষোত্তমের হিন্দোলন-উৎসব বা মণ্ডলাকারে শ্রেণিনৃত্যকে বুঝায়, তেমনই অন্তর্জগতেও এই মহোৎসব এবং আনন্দনর্তন প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। পরমেষ্ট-বিগ্রহকে উচ্চ বেদিকার উপর মকরচিহ্ন শোভিত সুসজ্জিত দোলাসনে স্থাপন করিয়া লোকযাত্রা-হিতার্থায় দোল দেওয়া হয়। বিগ্রহবাহী দোলনা একবার ভক্তদের কাছে আসে আবার দূরে সরিয়া যায়। এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই প্রকট-লীলায় লীলাময় রসবিগ্রহের হিন্দোলন-লীলা। জীবহৃদয় যখনই সংসার কোলাহল হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া পরমার্থ চিন্তায় সমাহিত হয়, তখন সর্বজন-হৃদয়বল্লভকে নিকটে, অতিনিকটে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লাভ করে এবং স্বকীয় আত্মাতে পরমাত্মার মিলন, স্পর্শন, চুম্বন, নর্তন অনুভব করে; আবার যখন পরমার্থ চিন্তায় বিমুখ হইয়া সংসারের নানা প্রলোভনে বিক্ষিপ্তচিত্তে মহাব্যাকুল হইয়া জীব ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, তখন এই অনুভূতি তার ত্রিসীমানায়ও স্থান পায় না, তখন হৃদয়বল্লভ তাহার নিকট হইতে যেন দূরে অতি দূরে সরিয়া যান। এইরূপে দেবদোলনা একবার নিকটে আসিতেছে, আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই হিন্দোলন-ক্রীড়া জৈব মনোরাজ্যে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার আরম্ভও নাই শেষও নাই। তারপর নৃত্য—আত্মপুরুষ হৃষীকেশ জীবের মনোরূপ অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া সারথ্যকার্য নির্বাহ করিতেছেন। জীব-মনে অসংখ্য বৃত্তি বিরাজিত, তাহারাই মনকে

অনন্ত বাসনা-কামনার মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া চঞ্চল ও বিধ্বস্ত করে। এই বৃত্তিগুলিকে পূর্ণ তৃপ্তি দিবার জন্যই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম তাহাদিগকে লইয়া আত্মকুণ্ডলিনী চক্রে শ্রেণিনৃত্য বা হল্লিসক্রীড়া করিয়া থাকেন। পরমানন্দঘনকে কাছে পাইয়া বৃত্তিরূপিণীরা সাধ মিটাইয়া খেলা করিয়া থাকে। তাহারা নিজ নিজ প্রেমরঙে বাসনা-পিচকারী ভরিয়া নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমময়ের উপর সিঞ্চন করে এবং আনন্দ-ফল্গু মুষ্টি মুষ্টি ভরিয়া আনন্দস্বরূপের অঙ্গে মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করে। সে আনন্দ, সে নৃত্য এবং সে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য অনশন অর্ধাশন-ক্লিষ্ট মূর্ত নিরানন্দ জনগণের অনুভবের অতীত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এর কথঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া যে সব অমর আনন্দসঙ্গীত রচিয়া, গাহিয়া ও শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দিয়া আমাদের এই নিরানন্দময় প্রাণে আনন্দ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছি, যথা—

আজ হোলী খেলব শ্যাম তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।
একেলা পেয়েছি হেথা,
পালায়ে যাইবে কোথা ?
ঘিরিয়া রাখিব সব সঙ্গিনীগণে।

* * *

শ্যাম মনোমোহিনী রাঙা হুরী খেলে,
শ্যামসনে একাসনে বসিয়ে বিরলে।
চৌদিকেতে সহচরী, করে করে ধরি' ধরি'—
রাই কানু ঘুরি-ঘুরি নাচে সকলে।
আতর গোলাপ ভরি' মারে ত পিচকারী,
দোলায়ে চামরী, দাস উদয়চাঁদ বলে।

* * *

ভুবনদোলন-মঞ্চে হিন্দোল-উৎসব,
শ্যামা, শ্যাম, শিব, রাম—অঙ্গে ফাগ সিঞ্চিব।
ফাগুন-পূর্ণিমানিশি হাসিরাশি দশদিশি,
দেবতা-মানবে মিলি হোলাহোলী খেলিব।
অনন্ত নভোমণ্ডলে রবি শশী তারা দোলে,
স্থাবরজঙ্গম ভরি' দোলন উৎসব।
স্পন্দন-হিন্দোলমেলা সৃষ্টিস্থিতিলয়-খেলা
জীব শিবময় প্রিয় সবে আলিঙ্গিব।
আনন্দ হিল্লোল বয় চরাচর বিশ্বময়,
এ শুভ সময়ে প্রাণ চরণে সঁপিব।
(শ্যামাশ্যাম শিবরাম-চরণে সঁপিব)
(সীতারাম রাধাশ্যাম-চরণে সঁপিব)
(জননী আনন্দময়ী-চরণে সঁপিব)
(সহাদ্বৈত গৌরনিতাই চরণে সঁপিব)
ষট্‌চক্রময় পিচকারী ত্রিগুণ রঙেতে ভরি'
পরমাত্মা প্রিয়তমে আনন্দে ছুঁড়িব।
ভকতি আবির লাল ভকতানুরাগ লাল,
রঙীন বসন্তকাল লালেতে রঞ্জিব।
গগন পবনলাল দশদিশি সব লাল,
রঙীন ভকতিরাজ্যে জনম লভিব।
(ভক্তিরাণীর পদতলে নবজীবন লভিব)
(আনন্দময়ী-চরণে তনুমন সঁপিব ॥

পূর্ণ বসন্তের আনন্দ-পূর্ণিমা দিনে 'দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্‌' প্রাণের দোলায় স্থাপন করিয়া আনন্দানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইবার সৌভাগ্যলাভ প্রত্যেকে যেন করিতে পারে .সেই প্রার্থনা শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদন ক্রমে স্তব করিতেছি,—

জয় গোপীমুখাম্ভোজ-মধুপান মধুব্রত।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—আগামী ১১ই ফাল্গুন, রবিবার, বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বাদশাধিক-শততম জন্মতিথিপূজা এবং ১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

স্যানফ্র্যান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত জানুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন:

(১) "অহংকে আধ্যাত্মিক করণ", (২) "আমার পিতার বহু সম্পদ্ আছে", (৩) "শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্ট", (৪) "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার মানুষ গঠনের ধর্ম", (৫) "প্রভু আমার রক্ষক, আমি কিছু চাহিব না", (৬) "জ্ঞানের আদর্শ ও ভক্তির আদর্শ" (৭), "প্রতিনিধিক প্রায়শ্চিত্তের অর্থ", (৮) "আত্মার ঊর্ধ্বগতি"।

এতদ্ভিন্ন প্রতি শুক্রবার তিনি বেদান্তের ক্লাস করিয়াছেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী অখিলাত্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—স্বামী অখিলাত্মানন্দজী কয়েক মাস যাবৎ নানা রোগে ভুগিয়া গত ২রা মাঘ ৬৪ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। সংসার-আশ্রমে অবস্থান কালে তিনি ফরিদপুর কোর্টে ওকালতি করিতেন। ১৯২৮ সনে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ফরিদপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অখিলাত্মানন্দজী প্রকাশ মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩১ সনে তাঁহার সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষা হয়। প্রকাশ মহারাজ তেজস্বী ও নির্ভীক ছিলেন এবং তাঁহার সাধুত্ব ও কর্মশক্তি অসাধারণ ছিল। গত দুর্ভিক্ষের সময়েও তিনি ফরিদপুর শহরে ও তন্নিকটবর্তী স্থানে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া অক্লান্ত ভাবে দুঃস্থ নরনারীগণের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

বেলুড় মঠে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৮শে পৌষ বেলুড় মঠে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, ভজন, বৈদিক আবৃত্তি, কঠোপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং কালীকীর্তন হয়। সমগ্র দিবসব্যাপী মঠপ্রাঙ্গণ উৎসবমুখরিত ছিল। অপরাহ্নে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

দেশের বর্তমান সঙ্কটক্ষণে জনসাধারণকে স্বামীজীর জীবন ও বাণী অনুধাবন করিতে আবেদন করিয়া সভাপতি ডাঃ মজুমদার বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে হিমালয়ের সহিত তুলনা করা যায়। হিমালয়ের মতই তিনি ছিলেন প্রশান্ত ও গম্ভীর। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সমস্যা, বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানের জন্য এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে কত বড় মহাপুরুষ তাহা তাঁহার বাণী ও জীবনী অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। দেশের বর্তমান সঙ্কটক্ষণে স্বামীজীর বাণী ও উপদেশ অনুসরণ করিলে উহার সমাধান হইবে। মহাত্মা গান্ধী যে বাণী আধুনিক যুগে প্রচার করিতেছেন, তাহা পড়িলে

মনে হয়, স্বামীজীর বাণীই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, দরিদ্র ও তথাকথিত নিম্ন জাতির প্রতি গভীর দরদ ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। তাঁহার সেই মহান আদর্শের অনুসরণ করিলেই এইরূপ উৎসব সফল হইবে। স্বামী পুণ্যানন্দজী ও স্বামী গম্ভীরানন্দজীও সভায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

সভারম্ভের পূর্বে জেলিয়াপাড়া সমিতি ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করে।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা—গত ১৭ই মাঘ দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত সভায় বিহারের মাননীয় শিক্ষাসচিব আচার্য বদ্রিনাথ বর্মা পৌরোহিত্য করেন। তিনি সমস্ত দিন বিদ্যাপীঠে থাকিয়া ইহার কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া খুবই প্রীত হন। বিদ্যাপীঠের চরকা ও তকলী বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, লাইব্রেরী ও রিডিংরুম, ছেলেদের ব্যাঙ্ক, সমবায় ভাণ্ডার, ড্রিল, কুচকাওয়াজ, শারীরিক ক্রীড়া কৌশলাদি এবং এখানকার গোশালা, ফল ও সব্জী বাগান, ছেলেদের হাতে গড়া ফুলের বাগান দেখিয়া তিনি আনন্দিত হন।

বৈকালে আচার্যজী কর্তৃক পতাকা উত্তোলনের পর সভা আরম্ভ হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতটি সভার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে! সভায় বিশিষ্ট বিদ্বমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তাঁহার বিবৃতিতে দেশবাসীকে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রসারে উদারভাবে সাহায্য করিবার জন্ম আহ্বান জ্ঞাপন করেন। এখানে প্রতিবৎসর প্রায় চারিশত ভর্তির আবেদন আসে। ইহাদের মধ্যে মাত্র ২০।২৫ জন ছাত্রকে করা সম্ভব হয়। এই জন্ম ছেলেদের বাসোপযোগী একটি গৃহ বর্তমানে একান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন একটি প্রার্থনা-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদির পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্থানীয় গুরুকুলের অধ্যক্ষ, পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী এবং উত্তর-বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় সুন্দর বক্তৃতা দিয়া বিদ্যার্থিগুলীকে উৎসাহিত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ইহার প্রসারকল্পে সুধী জনসমাজকে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে এই আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র হওয়া প্রয়োজন এবং একমাত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠানই দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

শেষে শারীরিক ক্রীড়াকৌশলাদি প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব—আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৮শে পৌষ বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, যন্ত্রসঙ্গীত, আলোচনা-সভা এবং নর-নারায়ণ-সেবার অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই দিবস প্রায় ছয়শত ভক্ত ও নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পূর্বদিন রবিবার সকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুইটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম হইতে তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগকে ছয়টি উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। অপরাহ্নে অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে আহূত একটি

জনসভায় মেদিনীপুর শহরের পনরটি প্রতিষ্ঠান স্বামীজীর প্রতিকৃতি মাল্যে ভূষিত করেন। সভায় স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ সেন মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত অভি-ভাষণের পর সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৮শে পৌষ বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চারি শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞদের একটি সম্মেলনে আশ্রমে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভজন এবং নানাবিধ যন্ত্রসঙ্গীত হয়। পরবর্তী শনিবার শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণের একটি সভায় সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ এবং বক্তৃতা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় স্বামীজির জীবনের বিভিন্ন দিক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। পরদিন রবিবার একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্থানীয় জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ সুফি হোসেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে সরকার, স্বামী পরশিবানন্দজী এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র কৃষ্ণ ভাদুড়ী পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামীজি বর্তমান সমস্যাসমূহের সমাধানের যে উপায় ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৮শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যায় কাঁথির অতিরিক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যশোদাকান্ত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, শ্রীযুক্ত সমরেশ বাগচী মহোদয়গণ বক্তৃতা দান করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক স্বামীজির পুস্তক হইতে নির্বাচিত অংশ পঠিত হইলে আশ্রম-সম্পাদক স্বামী অন্নদানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ ও মিশন-বিদ্যাপিভবনের অভিনেতৃবর্গকে রৌপ্য পদক প্রদান করিলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

বলিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৮শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজা ও ভজনাদি এবং অপরাহ্নে এক জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, বি-এ, বি-টি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ধর্মানন্দজী, শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্-এ ও শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস সাহা স্বামীজীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১১ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ দিন শহরে অন্যান্য উৎসবের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী, শ্রীযুক্ত তামস রঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বর্মণ মহাশয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও উদ্যোগে অতঃপর ১৫ই মাঘ ছাত্র-ছাত্রীদের আর একটি সভা হয়। অধ্যাপকগণ, বহু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং স্কুল-কলেজের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে স্বামী অজয়ানন্দজী একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিবিধ সংবাদ

সালেপুর (কটক) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৬ই পৌষ শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে পূজা, কীর্তন, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ হইলে অপরাহ্ণে এক সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মিশ্র এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী উৎকল ভাষায় সংগীত আকারে গীত হয়। অনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যতীর্থ ন্যায়-সাংখ্য-শাস্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অপর এক সভায় আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মিশ্র, "জনতা" সংবাদ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মহান্তি, স্থানীয় হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৈরাগীচরণ সাহু এবং শ্রীমান্ অক্ষয় কুমার পলাই স্বামীজীর পুণ্য জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামৃত পাঠ ও ভজনাদি হইলে উৎসব শেষ হয়।

বজবজ বিবেকানন্দ-সংঘে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভা—গত ৫ই মাঘ বৈকালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিস-হলে স্বামী সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভার আরম্ভে গান আবৃত্তি ও মুষ্টিযুদ্ধ হয়। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নর-নারায়ণবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে আচার্য স্বামী বিবেকান্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-মহোৎসব গত পৌষ মাসের ২৮শে তারিখে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে তিথি-পূজা, উপনিষদাদি পাঠ এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ ও অপরাহ্ণে একটি ছাত্রসভা ও সন্ধ্যায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় স্বামীজির জীবনের বিভিন্ন দিক্ আলোচিত হইয়াছে।

যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৫ই মাঘ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে পূজা ও হোম হইলে বৈকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনগুপ্ত, মিঃ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী স্বামীজি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে বহু নরনারীকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ ভোজন করান হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৯শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন-বর্মার সভা-পতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের জন্মতিথিপূজা—শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের জন্মতিথিপূজা গত ১২ই মাঘ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গর থানার অন্তর্গত 'নাও-ওরা' গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান সরকার বাটিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পানিহাটীতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১২ই মাঘ অপরাহ্ণে পানিহাটী ফ্রেণ্ড্স্ লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রবি রায় মহাশয় ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রহড়া বালক আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজী। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র এম্-এ, পানিহাটী হিন্দু-সংগঠন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন সেন ও শ্রীযুক্ত প্রভাত

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ স্বাধীনতা দিবসে স্বামীজী ও নেতাজী এই দুই বিরাট পুরুষের জীবনী আলোচনা করার সার্থকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে স্বামী পুণ্যানন্দজী একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় স্বামীজী ও নেতাজীর বিরাট কর্ম ও ত্যাগপূত জীবনী বিশ্লেষণ করেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় স্থানীয় হিন্দু-সংগঠন সমিতির কার্যালয়ে সমিতির পক্ষ হইতে স্বামী পুণ্যানন্দজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি সমিতির সংগঠন, সেবা, অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ এবং স্বাস্থ্যানুশীলন এই তিন আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-সেবাকার্য

গত ১৩৪৬ সনের ২২শে অক্টোবর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন তিনটি কেন্দ্রে দাঙ্গা-সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন। সম্প্রতি ত্রিপুরা জেলায় করইতলি ও পাইকপাড়ায় এবং নোয়াখালি জেলায় বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে চারিটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই কয়টির মধ্যে মাত্র করইতলি কেন্দ্রের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রের রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হইল :

হাইমচর কেন্দ্র (১১ই নভেম্বর স্থাপিত)—তিনটি ইউনিয়নের অন্তর্গত ১৫টি গ্রামে মালা, সিন্দুর ও শাঁখা ভিন্ন ১২৫০ খানা পশমী কম্বল, ৩৯৮৪ খানা কাপড়, ৬৫৮টি সোয়েটার ও বেনিয়ান এবং ৩৮৩৪টি বাসন বিতরণ করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দৈনিক ১৬৫টি বালক-বালিকা ও ১৬ জন রোগীকে ২০৩ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭৪৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

চাঁদপুর কেন্দ্র (২২শে অক্টোবর স্থাপিত)—তিনটি ইউনিয়নের অন্তর্গত ১৩টি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে ৩২৩৷৷৩ সের চাউল দেওয়া হইয়াছে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ৮৯৬ জন দুঃস্থ চাল পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ১৩৪ খানা কাপড়, ১৫টি বেনিয়ান, ৫টি পশমী সোয়েটার এবং কিছু শাঁখা দেওয়া হইয়াছে।

রামগঞ্জ কেন্দ্র (২৭শে ডিসেম্বর স্থাপিত)—চারটি ইউনিয়নের অন্তর্গত ষোলটি গ্রামে ৪৮৬ খানা পশমী কম্বল, ৯৪৯টি বেনিয়ান, ১১২টি পশমী সোয়েটার, ৩০০টি বাসন ও ৯৫০ খানা কাপড় এবং কিছু মালা, সিন্দুর ও শাঁখা বিতরণ করা হইয়াছে।

করইতলি কেন্দ্র (২৭শে ডিসেম্বর স্থাপিত)—চারটি ইউনিয়নের অন্তর্গত তেরটি গ্রামের ৫৩৩টি পরিবারকে ১০৯টি পশমী সোয়েটার, ৪৩৫টি বেনিয়ান, ৫৩৫টি বাসন ও ৯৯২ খানা কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

নোয়াখালি হইতে আগত ২২১ জন দুঃস্থকে সিলেট ক্যাম্পে দৈনিক দুই বেলা খাওয়ান হইয়াছে, হবিগঞ্জ ক্যাম্প হইতে ৩১৭ জনকে ১৮৷৷০ সের চাল এবং বহরমপুর ক্যাম্প হইতে ২৫ খানি পশমী কম্বল ও ২১ খানা চাদর বিতরণ করা হইয়াছে।

গৃহত্যাগী দুর্গতদের পুনর্বসতির জন্য এখনও বহু অর্থ আবশ্যক। আমরা দুর্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নীদের সাহায্যার্থ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :

(১) **সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,**
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া,

(২) **কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়,**
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(৩) **কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,**
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
২২. ১. ৪৭

হিন্দুসমাজের আভ্যন্তর ব্যাধি

সম্পাদক

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় রোমাঞ্চকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পূর্ববঙ্গের আতংকজনক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি হিন্দুসমাজের আভ্যন্তর মারাত্মক ব্যাধিসমূহ বাহিরে প্রকাশ করিয়া উহাদের প্রতি সকলেরই চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বগৃহে ভোগাধিকার-বৈষম্যমূলক বর্ণভেদ, প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত বহু জাতি বা শ্রেণিভেদ, অনাচরণীয় অস্পৃশ্য ও অদর্শনীয় ভেদ, জাতিতে জাতিতে অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার এবং হিংসা বিদ্বেষ অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য, বলপূর্বক অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারী ও ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণকে পুনর্গ্রহণে এবং কোন অহিন্দুকে হিন্দুসমাজে স্থান দানে অসমর্থতা প্রভৃতি হিন্দুর আভ্যন্তর মারাত্মক ব্যাধি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, এই আত্মঘাতী ব্যাধিগুলি পোষণ করার জন্য হিন্দুদের ধন-প্রাণ অত্যন্ত বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকার করা সম্ভব হয় নাই। এই দুরন্ত ব্যাধিগুলিদ্বারা হিন্দুর সমাজ-শরীর দীর্ঘকাল আক্রান্ত থাকার জন্যই যে ইদানীং বাংলার হিন্দুগণ ঐক্যবদ্ধ হইতে একান্ত অসমর্থ হইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করেন, বাংলায় হিন্দুদের সংখ্যা-লঘিষ্ঠতাই তাহাদের এই বিপদের একমাত্র কারণ। ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও বলা যায়, বাংলার বাহির হইতে বহুসংখ্যক মুসলমান আসিয়া বাঙালী হিন্দুকে সংখ্যা-লঘিষ্ঠে পরিণত করে নাই। বহু শতাব্দী যাবৎ সযত্নে পোষিত ঐ আভ্যন্তর ব্যাধিগুলিই বাংলার হিন্দুকে দলে দলে মুসলমান হইতে বাধ্য করিয়াছে। কেবল তরবারির ভয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মান্তরিত হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রধানতঃ বাংলার সুলতান সুলেমান কররানীর সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ-বংশীয় কালা-পাহাড়, গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের পুত্র যদু ওরফে সুলতান জালালুদ্দীন ও ব্রাহ্মণ-তনয় মুর্শিদকুলি খাঁ এই তিনজন হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমানের প্রতিহিংসামূলক প্রচেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর বাঙালী হিন্দুরা ব্যাপকভাবে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে। বাংলার অগণন হিন্দুর ধর্মত্যাগের পশ্চাতে যে তাহাদের স্বধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের উৎপীড়ন অপমান ও অসম্মানজনিত মর্মান্তিক বেদনা পুঞ্জীভূত ছিল, ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে প্রধানতঃ এই সকল কারণেই এই ইংরাজ-যুগেও বহু হিন্দু স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টানদের সংখ্যা পুষ্ট করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় হিন্দুই ধর্মের আকর্ষণে ধর্মান্তরিত হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দুগণ তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের ধর্মান্তর

গ্রহণে সংঘবদ্ধভাবে এ পর্যন্ত কোন বাধা দেন নাই। তাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণের কারণগুলি দূর না করিয়া ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণকে কেবল উপেক্ষা ও বিদ্রূপই করিয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে ধর্মান্তর গ্রহণে উৎসাহই দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান-যুগ হইতে এ পর্যন্ত বলপূর্বক ধর্ষিতা ও অপহৃতা হাজার হাজার অসহায় হিন্দুনারী বহু চেষ্টা করিয়াও হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার পায় নাই। সমাজপতিগণ যে এই সহায়হীনা অবলা নারীগণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদেরই অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহারা নিজেদের অক্ষমতার দোষ ঢাকিয়া রাখিয়া নিরপরাধা নারীগণের উপর সকল দোষ চাপাইয়া তাহাদিগকে মুসলমানের অঙ্কে ঠেলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে দোষী ব্যক্তিগণকে দণ্ড না দিয়া নির্দোষিগণকেই দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য অনেক হিন্দুনরনারী নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শেষে আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করিয়াও হিন্দুসমাজে স্থান পায় নাই। প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়মই এই যে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা সাময়িক প্রলোভনে কোন হিন্দু নর বা নারী একবার কোন অহিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিলে রক্ষণশীল সমাজপতিগণ তাহাকে আর হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ করেন না। ইহার ফলে কত হিন্দু-নরনারী যে মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। পক্ষান্তরে বহু অহিন্দুও স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিয়াও হিন্দুসমাজে স্থান পায় নাই। বর্তমানেও হিন্দুসমাজ নবাগত কোন অহিন্দুকে স্থান দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতি তাহাদের ঘর হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নির্মম ভাবে কেবল তাড়াইয়াই দিতেছে কিন্তু কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অহিন্দু ব্যক্তিকে পর্যন্ত তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এইরূপ ভাবে এতকাল হিন্দুসমাজ নিজের সমাধি নিজেই স্বহস্তে রচনা করিয়াছে।

সম্প্রতি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় বহু নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মর্মভেদী কাহিনী বাংলার রক্ষণশীল সমাজপতিগণেরও বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা সবিস্ময়ে বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছেন যে, ঐ দুইটি জেলার বহু হিন্দুনারী দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক অপহৃতা ও বলপূর্বক অহিন্দুদের সঙ্গে বিবাহিতা এবং হাজার হাজার নরনারীকে জোর করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। জটিল ব্যাধিগ্রস্ত বাংলার হিন্দুসমাজ এই হৃতসর্বস্ব অসহায় নরনারীগণকে গুণ্ডাদের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। যদি প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই ধর্মান্তরিত নরনারীগণকে হিন্দু-সমাজে সসম্মানে পুনর্গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত ঐ অঞ্চলে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিবার কেহ থাকিবে না, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াই নবদ্বীপ ভট্টপল্লী বিক্রমপুর কোটালিপাড়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ করিতে বিধান দিয়াছেন। সুখের বিষয় যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ সকলেই হিন্দুসমাজে পুনর্গৃহীত হইয়াছেন। যদি কয়েক শতাব্দী পূর্বেও একটু দূরদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ এইভাবে সমাজ-সংস্কারের বিধান দিতেন, তাহা হইলে বাংলার হিন্দুগণ বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া এরূপ সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইত না, ইহা নিশ্চিত।

অস্পৃশ্যতা অদর্শনীয়তা ও অনাচরণীয়তা

হিন্দুসমাজের অন্যান্য আভ্যন্তর ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলি যে হিন্দুজাতির পক্ষে কিরূপ গুরুতর তাহা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তফসিলভুক্তশ্রেণীর আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিশেষ ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধের দুর্দিনে স্থানে স্থানে তফসিলী জাতিসমূহ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করে নাই এবং এখনও অনেক স্থানে তাহারা হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে না। বর্তমানে ভারতের প্রায় সর্বত্রই তফসিল-ভুক্ত এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাধীনতা আন্দোলনেরও বিরোধিতা করিতেছেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিক্রিয়া-পন্থী মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহাদের স্বজাতিগণকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতেও প্রকাশ্য ভাবেই বলিতেছেন। অবশ্য বাংলায় তফসিলীদের মধ্যে এখনও প্রায় সকলেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণও উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আদায় করার পক্ষপাতী। কিন্তু তফসিলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিবার পক্ষে প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যাও ভারতে নগণ্য নহে। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে অস্পৃশ্য-সমস্যা গুরুতর নয়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তি-মূলক। অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় এই সমস্যা তত মারাত্মক না হইলেও এখনও কম আত্মঘাতী নয়। বাংলাদেশে বড় বড় শহর-গুলিতে অস্পৃশ্য-সমস্যা প্রায় নগণ্য হইলেও পল্লীগ্রামসমূহে এখনও এই ব্যাধির অত্যন্ত প্রকোপ আছে। আমরা বাংলার বিভিন্ন জেলায় অনেক পল্লীতে দেখিয়াছি—এখনও উচ্চবর্ণের ক্ষৌরকারগণ তফসিলভুক্ত জাতিসমূহের ক্ষৌরকার্য করে না, ধোপারা তাহাদের কাপড় কাচে না, মাঝি ও জেলেরা তাহাদিগকে নৌকা ভাড়া দেয় না, বেহারা ও মালীরা তাহাদের কাজ করে না, বহু মন্দিরে এবং পূজাপার্বণক্ষেত্রে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, উচ্চবর্ণের পরিচালিত বহু পাঠশালা ও টোলে তাহাদের পড়ান হয় না, কূয়া ও ইন্দারা হইতে তাহাদিগকে জল আনিতে দেওয়া হয় না, কোন কোন অস্পৃশ্যজাতি হাটে বাজারে চাল দুধ ও তরকারি আনিলে উচ্চবর্ণের অনেক হিন্দু তাহা ক্রয় করেন না, তাহারা বস্ত্রাদি স্পর্শ করিলেও গোঁড়া হিন্দুরা স্নান করেন, ইত্যাদি। স্থানে স্থানে দেখিয়াছি—অভিজাত হিন্দুগণ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ দিয়া অস্পৃশ্যশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুগণকে পাল্কী ও ঘোড়ায় চড়িয়া—এমন কি ছাতা মাথায় দিয়াও যাইতে দেন না। কোন কোন গ্রামে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অন্যত্র যাত্রাকালে ঘরের বাহির হইয়াই অদর্শনীয় জাতিভুক্ত কাহাকেও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে দেখিলে যাত্রা অশুভ হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে অপমান ও অসম্মান করেন। এমন কি যাত্রাকালে এই সকল অদর্শনীয় জাতির উপাধি শ্রুতিগোচর হওয়াও উচ্চশ্রেণীর নিকট অশুভ যাত্রার পরি-চায়ক! দেবস্থানে, রেলে, ষ্টিমারে, হোটেলে, গয়লার দোকানে ও ময়রার দোকানে উচ্চবর্ণের অশিক্ষিত ও অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিদের দ্বারা শিক্ষিত ধনবান অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য ব্যক্তিগণের অপমানিত ও অসম্মানিত হইবার দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামসমূহে এখনও বিরল নহে। অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রচলিত সামাজিক প্রথা মনে করিয়া এই অপমান ও অসম্মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহ্যত সহ্য করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের

অন্তর উচ্চবর্ণের এই অযৌক্তিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পূর্ণ হইয়া আছে।

এই দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অনাচরণীয়তা অস্পৃশ্যতা ও অদর্শনীয়তা ব্যাধিগুলি দ্বারা বাংলার হিন্দুজাতি এখনও কম আক্রান্ত নয়। দুঃখের বিষয়, অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যেও এক জাতি অপর জাতিকে অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে পদে পদে অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার করে। আচরণীয় অনাচরণীয় জাতিসমূহের ভেদ-বিদ্বেষ অপেক্ষা অনাচরণীয় জাতিসমূহের পারস্পরিক ভেদ-বিদ্বেষ এবং অনাচরণীয় অস্পৃশ্য জাতিগুলির ভেদ-বিদ্বেষ অপেক্ষা অস্পৃশ্য জাতিগুলির পারস্পরিক ভেদ-বিদ্বেষ আরও সাংঘাতিক—আরও মারাত্মক। এই সকল কারণে পল্লীগ্রামের হিন্দুরা স্বগৃহে বিরোধ ও অনৈক্যে আজও উত্থানশক্তিহীন পঙ্গু। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে হিন্দুজাতিগুলির মধ্যে এরূপ সর্বনাশকর ভেদ-বিরোধ থাকিতে হিন্দুদের স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। হিন্দুদের এই গৃহবিবাদ দূরীভূত না হইলে অহিন্দু জাতিসমূহের সহিত মিলন সুদূর-পরাহত।

এই সকল কারণে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত দেশপূজ্য সকল নেতাই হিন্দুর সমাজ-শরীরের অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতারূপ মহাব্যাধি দূর করিবার জন্য বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু পল্লীসমূহের সমাজপতিগণ এই কার্যে এ পর্যন্ত তেমন উৎসাহ দেখান নাই। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ফলে হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিত-গণের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাঁহারা বাংলার হিন্দুগণকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতা অবিলম্বে দূর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা আশা করি যে তাঁহাদের নির্দেশে হিন্দুজাতি এই মহাব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তাহাদের স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিবে।

হিন্দুসমাজে অসংখ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভেদ বিরোধ বিদ্বেষ এবং সামাজিক ভোগাধিকার-বৈষম্য হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান আভ্যন্তর ব্যাধি। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, এইগুলিই হিন্দুজাতিকে রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক পরা-ধীনতায় নিমজ্জিত করিয়া উত্থানশক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুজাতি ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতিতে পৃথিবীর সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়াও তাহাদের এই সকল আত্মঘাতী সমাজ-ব্যবস্থার জন্যই তাহারা এখনও জাতি হিসাবে অবনত অনুন্নত। কালচক্রের আবর্তে হিন্দুসমাজ উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্রের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া সংখ্যাতীত ভেদ-বিরোধ ও অনৈক্যবর্ধক দেশাচার লোকাচার ও স্ত্রী-আচার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, হিন্দুরা তাহাদের ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ হইতে যে উপদেশ পায়, সমাজের চাপে পড়িয়া উহাদের বিপরীত আচরণ করিতে বাধ্য হয়। হিন্দুশাস্ত্রসমূহ সমস্বরে শিক্ষা দেয়—'ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়দেশে বিরাজিত,' 'একই দেবী সকল ভূতে শক্তিরূপে সংস্থিতা,' 'জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়,' 'পাশবদ্ধ জীবই পাশমুক্ত শিব,' 'নর আত্মাস্বরূপে নারায়ণ,' 'মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয় পরন্তু আত্মা হিসাবে এক ও অভেদ,' 'মানুষে মানুষে বৈষম্য কেবল আত্মার শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে,' 'সকল ভূতকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে,' ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ-ক্ষেত্রে হিন্দুরা মানুষে মানুষে শত ভেদ সহস্র বৈষম্যকে আজও আঁকড়াইয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, হিন্দুদের ধর্মজীবন ও সমাজ-

জীবনের এই বৈপরীত্যই হিন্দুজাতির সকল অনর্থের মূলকারণ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে উপনিষৎ ও গীতাদি সার্বজনীন শাস্ত্র-প্রচারিত চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতেই হইবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দুধর্ম ও বর্ণাশ্রম-সমাজ সনাতন হইলেও উভয়ের ব্যবহারিক রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। উভয়েই বরাবর যুগোপযোগী অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাঁচিয়া আছে। ধর্মসংস্থাপনের জন্য ধর্মাচার্যগণ এবং সমাজ-ব্যবস্থা দানের জন্য সমাজ-ব্যবস্থাপকগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ মুসলমান-যুগে আবির্ভূত রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক চৈতন্য-নিত্যানন্দ বল্লভ রামানন্দ কবীর দাদূ নানক তুলসীদাস প্রভৃতি এবং ইংরাজ-যুগে আবির্ভূত রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের প্রবর্তিত যুগধর্মের সমষ্টি। এই মহাপুরুষগণ কেহই ধর্মক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক প্রথা এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্রভেদ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই হিন্দুরা ধর্মবিষয়ে এই ধর্মাচার্যদের মত অনুসরণ করিলেও সামাজিক ব্যাপারে দেশাচার লোকাচার ও স্ত্রী-আচার অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। দুঃখের বিষয় যে খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত মনুর পর সর্বভারতে প্রভাবশীল কোন সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মৃতিকার এ পর্যন্ত আবির্ভূত হন নাই। এইজন্য সমাজক্ষেত্রে হিন্দুরা মনুস্মৃতির দোহাই দিয়াই চলিয়াছে বটে কিন্তু ভারতের কোন প্রদেশেই মনুর মত প্রচলিত দেখা যায় না। এ যুগে মনুর সকল মত মান্য করিয়া চলা অসম্ভব, এমন কি আইনতঃও দণ্ডনীয়! স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি কোথাও ঋষি-শাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার, আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে।" ইহাই হিন্দুসমাজের অধঃপতনের কারণ। বর্তমান যুগ গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ। এ যুগে কোন প্রভাবশালী স্মৃতিকারের পক্ষেও জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার করা সম্ভব নয়। কাজেই এখন হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দকেই প্রচলিত ধর্মের প্রবর্তকগণ এবং উপনিষৎ ও গীতাদি প্রচলিত শাস্ত্রের নির্দেশ মতে জনমতের সমর্থনমূলে সাম্য-মৈত্রী ভিত্তির উপর সমাজের সংস্কার করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তথাকার হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণ সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া মূলতঃ এই ভাবেই সমাজ-সংস্কারের বিধান দিয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, "হিন্দুজাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক অধিকারবৈষম্য থাকিবে না।" ইহা কার্যে পরিণত হইলে যে হিন্দুজাতি বহুকালের গৃহবিবাদ মুক্ত হইয়া ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণবিভাগ দোষের নয় কিন্তু তাহাদের ভোগাধিকার-বৈষম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অনর্থ দূর করিবার জন্য তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রমুখ সকল বিষয়ে সমাজের সকল নরনারীকে সমান অধিকার দান করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজে সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই কোন-না-কোন আকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ-

বিভাগ বিদ্যমান। সর্বত্রই গুণ ও কর্মানুসারে একশ্রেণীর লোক অধ্যাপনা ও যজনাদি, একশ্রেণীর লোক দেশ শাসন ও রক্ষাদি, একশ্রেণীর লোক কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যাদি এবং একশ্রেণীর লোক এই তিন শ্রেণীর কার্য পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই চারিটি শ্রেণীর মধ্যে কোন এক শ্রেণীকে বাদ দিয়া অপর শ্রেণী কয়টির জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। মানব-সমাজ পরিচালনের জন্য এই চারিটি শ্রেণীর আবশ্যকতা অপরিহার্য বলিয়াই সকল দেশেই চতুর্বর্ণ প্রয়োজনের তাড়নায় স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণ চারিটি সকল জাতির মধ্যেই পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং কোন-না-কোন আকারে ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই জন্য হিন্দুদের মতে চাতুর্বর্ণ্য সনাতন বা চিরন্তন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ভারতে যতদিন এই চারিবর্ণের এক বর্ণ অপর বর্ণের ন্যায্য অধিকার নষ্ট না করিয়া তাহাদের আপন আপন স্বধর্ম বা কর্তব্য পালন করিয়াছে, ততদিন তাহারা সকলে মিলিয়া শান্তি-সুখে বাস করিয়াছে। কিন্তু যখনই কোন এক বর্ণ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে অপর বর্ণের ন্যায্য অধিকার নষ্ট করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের পরবর্তী যুগ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের স্বার্থ-সংঘাতে অত্যন্ত কলংকিত। এই উভয় বর্ণ আবার বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের ন্যায্য অধিকার নষ্ট করিয়া আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়াছে। পরে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ মিলিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও সংঘশক্তিহীন শূদ্রবর্ণের উপর অত্যাচারের অভিযান চালাইয়াছে।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসও ধর্মযাজক ও রাজন্যবর্গের স্বার্থ-সংঘর্ষে কম কলংকিত নয়। এই উভয় শ্রেণীই তথাকার বৈশ্য ও শূদ্রদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়াছেন। পরে পাশ্চাত্যের বৈশ্য-শ্রেণী প্রতিভাবলে কেবল তথাকার রাজন্য-বর্গ ও ধর্মযাজকদের উপর নহে, অধিকন্তু সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন প্রতীচ্যের অজ্ঞ ও দরিদ্র শূদ্রগণ বৈশ্যদের স্বার্থে ইন্ধন যোগাইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে এখন ইউরোপের শূদ্র-জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্মযাজক সম্রাট ও বৈশ্যগণের উপর ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। রাশিয়ায় সকল শ্রেণীর উপর শূদ্রদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রও এখন শূদ্রশক্তি লেবারপার্টির করতলগত। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্স জার্মানী ও ইতালি প্রভৃতি দেশেও শূদ্রশক্তি মস্তক উত্তোলন করিতেছে। চীনদেশে কমিউনিষ্টদের ব্যাপক প্রভাবের ভিতর দিয়া তথাকার শূদ্র-জাগরণ প্রকট। ভারতেও শিক্ষাবিস্তারের প্রভাবে শূদ্রগণ ক্রমেই অধিকতর সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী উপস্থিত করিতেছে। এ দাবী পূরণ না করিলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেই ব্রাহ্মণদের প্রভুত্বে পুরোহিতকুলের অত্যাচার, ক্ষত্রিয় রাজশক্তির প্রাধান্যে আসুরিক শক্তির উৎপীড়ন, বৈশ্যদের প্রতিপত্তিকালে ধনিকদের শোষণ এবং শূদ্রদের আমলে ধর্মনীতি দার্শনিকতা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি উপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যে হইবে ইহার সকল লক্ষণ সুপ্রকট। এইজন্য ভাবী রাষ্ট্র ও সমাজে কোন বর্ণবিশেষের প্রাধান্য থাকা সঙ্গত নহে। চতুর্বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যে যখনই কোন বর্ণ বা শ্রেণী সকলের স্বার্থ নষ্ট করিয়া আপন বর্ণগত বা শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই জন-সাধারণের শান্তিসুখ নষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চতুর্বর্ণের স্থানে বহুবিধ শ্রেণী গঠিত হইয়া পরস্পর স্বার্থসংঘাতে লিপ্ত। এখন ধর্মযাজক-সংঘ, ব্রাহ্মণ-সমিতি, ক্ষত্রিয়-সমিতি, বৈশ্য-সমিতি, আর্মি-নেভি সোসাইটি, ফ্লাইং সোসাইটি, মহাজন-সভা, মিলমালিক এসোসিয়েসন, দোকানদার-সমিতি, কর্মচারী-সমিতি, জমিদার-সভা, প্রজা-পার্টি, কৃষক-সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও বিবিধ শ্রমিক-সংঘ প্রভৃতির মধ্যে স্বার্থসংঘাত ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করিতেছে। এই সংঘাতজনিত অশান্তি হইতে দেশকে মুক্ত রাখিতে হইলে সকল শ্রেণীর সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমানাধিকার ভিত্তির উপর সাধারণতন্ত্র-মূলক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিতেই হইবে। এই জন্য পৃথিবীর উন্নত দেশ মাত্রই সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ভারতেও বিভিন্ন ধর্ম জাতি ও শ্রেণীর সংঘাত দূর করিয়া সকল অধিবাসীর মধ্যে সাম্য-মৈত্রী স্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্র ও সমাজ ভোগাধিকার-বৈষম্যহীন সাধারণতন্ত্রনীতিমূলে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। ইহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ভারতের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই রাষ্ট্র ও সমাজে কোন বর্ণ জাতি সম্প্রদায় ও শ্রেণীর কোন বিশেষ অধিকার থাকিবে না, পরন্তু সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজ-সংস্কারও এই আদর্শে অবশ্য করিতে হইবে। প্রচলিত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে নানা বিষয়ে ভোগাধিকার-তারতম্যরূপ ব্যাধি আছে। ইহার উপর প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত বহু জাতির মধ্যে ভোগাধিকার-বৈষম্য, প্রায় প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র গোত্র কুল প্রভৃতি ভেদ, বৃত্তিমূলক উচ্চ-নীচ ভেদ এবং তৎপ্রসূত সামাজিক মর্যাদাভেদ, প্রাদেশিক ভেদ প্রমুখ সংখ্যাতীত ভেদ বিদ্যমান। হিন্দু-সমাজে এত ভেদ বৈষম্য অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য-রূপ ব্যাধিগুলি থাকিতে হিন্দুজাতির অভ্যুদয় অসম্ভব। অবশ্য মানব-সমাজে বহু বৃত্তির আবশ্যকতা যতদিন থাকিবে, ততদিন বহু বৃত্তিমূলে প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত বহু জাতি বা শ্রেণী সমস্বার্থমূলে স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিবে। এক বর্ণের অন্তর্গত বহুবৃত্তিমূলক বহু জাতির বিদ্যমানতা দোষেরও নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যে দেশে বৃত্তিমূলক জাতির সংখ্যা বেশি, সে দেশে শিল্পাদি বেশি উন্নত। কিন্তু তাঁহার মতে এক বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বহু বৃত্তিমূলক বহু জাতির মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ হওয়া অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। বর্তমানে এক জাতির মধ্যেও উভয় পক্ষের ধর্ম, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও সংস্কৃতির সমতায় সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে। সমজাতীয় হইলেও অত্যন্ত ধনবানের সঙ্গে অত্যন্ত দরিদ্রের বা অতি উচ্চপদস্থের সঙ্গে অতি নিম্নপদস্থের বিবাহ হইতে দেখা যায় না। কাজেই উক্ত কয়টি বিষয়ে সমতা থাকিলে অন্ততঃ এক বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহে কোন বাধা থাকা সঙ্গত নয়। ইদানীং প্রত্যেক জাতির বিবাহের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় অনেক জাতির বহু বিষয়ে অসুবিধা এবং অনেক বিষয়ে অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। এখন সকলেই স্পষ্ট দেখিতেছেন যে প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত অসংখ্য জাতির মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অনৈক্য বিরোধ বিদ্বেষের মাত্রাও চরমে উঠিয়াছে। ইহার ফলে হিন্দুজাতি গৃহবিবাদে উৎসন্নের পথে প্রধাবিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই গৃহবিবাদ দূর করিয়া হিন্দুজাতির স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে চতুর্বর্ণের

প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অবান্তর বিভাগ আছে উহা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আদান-প্রদান স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণ জাত গড়তে হবে। এইরূপে সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে।" তিনি কেবল প্রাদেশিক ভাবে নয়, পরন্তু সর্ব-ভারতীয় চতুর্বর্ণভিত্তিতে সমাজ সংস্কার করিতে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সামাজিক ব্যবস্থায় কোন বর্ণ ও জাতির বিশেষ কোন অধিকার থাকিবে না, পরন্তু সকল বিষয়ে সকলেরই সমান সুযোগ এবং উন্নতিলাভে সমান স্বাধীনতা থাকিবে। বিভিন্ন বর্ণ জাতি ও শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ-সংঘর্ষ দূর করিয়া সমাজ-তান্ত্রিক নীতিমূলে সর্বভারতীয় ঐক্য-ভিত্তিতে সমাজ-সংস্কারের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পক্ষান্তরে ইহাই হিন্দুসমাজের আভ্যন্তর ব্যাধি দূর করিয়া হিন্দুজাতির স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের একমাত্র পথ। আমরা যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত এই উপায় অবলম্বনে অবিলম্বে হিন্দুসমাজের সংস্কার করিয়া হিন্দুগণকে সুস্থ সবল সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিবার জন্য সকল হিন্দুকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

বঙ্গের দিগন্তরালে একে একে বহু দিক পাল
বিকিরিয়া উদ্ভাসিয়া প্রতিভার নব রশ্মিজাল
ছন্দে গানে কর্ম্মে কাজে অন্তরের ত্যাগে ও নিষ্ঠায়,
আপনার নাম টুকু লিখে গেছে অনাগত কালের পৃষ্ঠায়।
একে একে এসেছিল—একে একে চলে গেছে সবে।
বাকি ছিল একজন অতি বৃদ্ধ মৃত্যু মহোৎসবে
মর্ত্ত্যের বন্ধন টুটি অমর্ত্ত্যের পথে পাড়ি দিয়া
তিনিও গেছেন চলি বাঙ্গালীর হৃদয় মথিয়া।
শেষ দীপ নিবে গেল ; এতদিনে আমরা বাঙ্গালী
নিঃস্ব রিক্ত হতভাগ্য নেতৃহীন যথার্থ কাঙ্গালী।
জাতির জীবনে যবে পশ্চিমের রুদ্র শাপ নামে,
নবীন শিক্ষার মোহে পঙ্গু তারা জীবন-সংগ্রামে।
বর্ষে বর্ষে বেড়ে চলে শত শত বেকারের দল—
উদর পূর্ত্তির লাগি অভাগারা ভাবিয়া বিকল।
যৌবনে সায়াহ্ন নামে—কত্র দেহে বিষাদ-কালিমা,
নিজ কার্য্য লজ্জা মানে,—এ জাতির কোথায় গরিমা ?
স্বদেশে প্রবাসী মোরা—হেথায় কাদের রাজ্যপাট।
সমুদ্র মন্থন করে মাড়োয়ারি কাবুলি ও রাঠ।
সেদিন কে বীর্য্যবান্ কম্বুকণ্ঠে বলে বারে বারে—
"ফিরে আয়, ফিরে আয়, ও পথে ঐশ্বর্য্য মিলে নারে।
কাব্য ও বিলাস নহে, জীবনটা নহে ছেলেখেলা।
বাস্তবের পটভূমে বসিয়াছে ভয়ঙ্কর মেলা।"
নহে শুধু বাক্যচ্ছটা—অশোভন দাম্ভিক উচ্ছ্বাস,
এ বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে কর্ম্মে তার পরম প্রকাশ।
ত্যাগী ছিলে, যোগী ছিলে, ভরেছিলে বিজ্ঞানের থালি,
সব চেয়ে সত্য মানি ছিলে তুমি একান্ত বাঙ্গালী।
আজীবন ব্রহ্মচারী, নিরাসক্ত কাম ও কাঞ্চনে,
পার্থিব সম্বল সবি দিয়েছ দরিদ্র-নারায়ণে।
পাত্রাপাত্র মান নাই, অট্টহাস্যে দাও নাই কান,
অন্ধ ও আর্ত্তের লাগি কাঁদে, গুরু, তোমার পরাণ।
অন্যায় ও অপন্যায়ে গর্জ্জিয়াছ কেশরীর মত,
সহস্র বিপত্তি মাঝে উচ্চ শির করনিকো নত।

* * *

তুমি দেব চলে গেছ—আঁধার শ্মশান করে ধুধু।
এত প্রেম, এত দয়া, সকলি কি মিছে হোল শুধু ?
মৃত্যু কি রে এত বড় ? প্রেম কি তাহারে মানে ভয় ?
না না তুমি মরনি তো, তুমি যে অমর মৃত্যুঞ্জয়।
বাঙ্গালীর সুখে দুঃখে, বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক কাজে,
যুগে যুগে বেঁচে রবে বাঙ্গালীর মরমের মাঝে।
তোমারে কি দিব আর, হে আর্য্য আচার্য্য পিতামহ,
বাঙ্গালীর অশ্রুসিক্ত একটি প্রণাম শুধু লহ।

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

(৩)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী জগজ্জননী শক্তিকে অনভিব্যক্তরূপা বলিয়া স্বীকার করিয়া অকার্য্যকালেও তাঁহার সত্তা স্বীকার করেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা জীব ও জগৎকে সূক্ষ্মরূপে জগৎকারণে অবস্থিত বলিয়াও স্বীকার করেন। আর তজ্জন্য তাঁহারা জগৎকারণকে স্বগতভেদবিশিষ্ট বা দ্রব্যগত ভেদবিশিষ্ট বলিয়া থাকেন।

কিন্তু একথাও বলা চলে না। কারণ যে শক্তিকে এবং সূক্ষ্ম জীব ও জগৎকে এই স্থূল জীব-জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া জগৎকারণে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করা হয়, কার্য্য না দেখিয়া যাহাকে অনুমান করা যায় না, তাহাকে অকার্য্যকালে অর্থাৎ কার্য্য না দেখার কালে কিরূপে স্বীকার অর্থাৎ অনুমান করা যাইবে? অনুমানের হেতু কোথায় যে অনুমান করা যাইবে? অনুমানের হেতু এই স্থূল জীবজগৎ অকার্য্যকালে দেখা যায় না। এজন্য জগজ্জননী শক্তি ও সূক্ষ্ম জীব-জগৎটি জগৎকারণে থাকে বলা যাইবে।

যাহা যথার্থই অনভিব্যক্ত হয়, তাহা কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না। যদি অনভিব্যক্ত বস্তু ব্যক্ত হয়, তাহা সেই অনভিব্যক্ত অবস্থাতেও কথঞ্চিৎ ব্যক্তই থাকে। কেবল প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাকে ব্যক্ত বলিতে পারা যায় না। অনভিব্যক্তকে ব্যক্ত করার অর্থ,—ব্যক্তভাবের যে প্রতিবন্ধক থাকে তাহাকে অপসারিত করা। এইজন্য অনভিব্যক্ত ব্যক্ত হয়—এইরূপ যে আমরা বলি তাহা ব্যবহার মাত্র। অনভিব্যক্ত কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না। ঐরূপ যে ব্যবহার তাহা ভ্রমমূলক ব্যবহার। এই কারণে এই উভয় মতবাদকে সঙ্গত মতবাদ বলা যায় না।

আর বিশিষ্টাদ্বৈত মতে দ্রব্যের অংশের ন্যায় যে জীব ও জগৎকে অংশ এবং ঈশ্বরকে অংশী বলা হয়, তাহাও একান্ত অসঙ্গত। কারণ, জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চেতন বলিয়া সজাতীয় বস্তু হইলেও জগৎকেও অচেতন বস্তুই বলিতে হইবে। অর্থাৎ তাহারা বিজাতীয় বস্তু ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু সজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অংশাংশী সম্বন্ধই হয় না। যেমন দুইটি বৃক্ষ সজাতীয় বস্তু, উহারা কেহ কাহারও অংশ হয় না। অথবা যেমন বৃক্ষ ও প্রস্তর এই দুইটি বিজাতীয় বস্তু, কেহ কাহারও অংশ হয় না। অবশ্য স্বগতভেদ-বিশিষ্ট বস্তুদ্বয় মধ্যে, যেমন বৃক্ষ ও উহার শাখা পল্লবের মধ্যে, অংশাংশী সম্বন্ধ হয় বটে, কিন্তু সেই ভেদসাধক আবার অন্য বিজাতীয় বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়। যেমন বৃক্ষ ও উহার শাখাপল্লবের মধ্যে ভেদের জন্য আকাশরূপ বিজাতীয় বস্তুর আবশ্যকতা হয়। জগৎকারণে স্বগতভেদ সিদ্ধ করিতে হইলে সেই জগৎকারণ হইতে আবার অন্য বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়। আর তাহা হইলে জগৎকারণ বস্তুটি আর সেই বস্তুর কারণ হন না। এজন্য মূল জগৎকারণ যে একটি অদ্বৈত বস্তু হওয়া উচিত, তাহা আর সিদ্ধ হইতে পারিবে না। এই কারণে বিশিষ্টাদ্বৈত মতটি আর কোন প্রকার অদ্বৈত মতই হইবে না। এজন্য এই মতটি অসঙ্গত।

যদি বলা যায়—পরবর্ত্তী কালে যখন কার্য্য জন্মে, তখন সেই কার্য্যজননীশক্তিকে অনভিব্যক্ত ত বলিতেই হইবে। যেমন গোলার মধ্যে রক্ষিত ধান্য অঙ্কুর উৎপাদন করে না, কিন্তু দুই এক বৎসরান্তেও তাহাকে রোপণ করিলে তাহাই অঙ্কুর উৎপাদন করে। এস্থলে সেই গোলার ধান্যের অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি ছিল না বলা সঙ্গত নহে। অতএব অকার্য্যকালে কারণের কার্য্য-জননীশক্তি অনভিব্যক্ত থাকে ইহা আমরা অনুমান করিয়াই লইব। বস্তুতঃ মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত ৫০০০ বৎসরের পুরাতন গমের চাষ করিয়া গম উৎপাদন করা হইয়াছে শুনা যায়। ঐ গমগুলি কয়লার আকার ধারণ করিয়াছিল। ঔষধির দ্বারা তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়া আসে। এজন্য শক্তি একেবারে থাকে না বা নষ্ট হয় তাহা বলা সঙ্গত হয় না। যোগ-বলেও নষ্ট শক্তি পুনর্জীবিত হয়। অর্থাৎ অকার্যকালে কারণ বস্তুটী শক্তিশূন্য হয় না। ইহাই সঙ্গত কল্পনা। আর এই কারণে মহামতি অভিনব গুপ্ত প্রমুখ শৈব আচার্যগণের শক্তি-বিশিষ্ট অদ্বৈত তত্ত্বই জগৎকারণ—ইহা বলা সঙ্গত। বৃক্ষের সহিত উহার শাখা-পল্লবাদির যে স্বগত ভেদ অর্থাৎ দ্রব্যগত ভেদ তাহা বীজে দৃষ্ট না হইলেও, সুতরাং তাহার সত্তা অস্বীকার্য্য হইলেও, সেই শাখাপল্লবাদির জননী শক্তি যে বীজে ছিল, তাহা বলিতে হইবে। এই কারণে রামানুজাদি মতের স্বগতভেদবিশিষ্ট বা দ্রব্য-গত ভেদবিশিষ্টই জগৎ কারণ—ইহা স্বীকার না করিলেও অভিনব গুপ্তাচার্য্যের প্রচারিত শৈব-মতের শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈত বস্তুই জগৎকারণ—ইহার স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। রামানুজাদির মতে জীব ও জগৎবিশিষ্ট জগৎকারণ স্বীকার করা হয়। জীব ও জগদ্রূপ দ্রব্যগুলি অতিসূক্ষ্ম-ভাবে জগৎকারণে থাকে। এ জন্য তাহাকে স্বগত ভেদবিশিষ্ট বা দ্রব্যগতভেদবিশিষ্ট মতবাদ বলা হয়। আর উক্ত শৈবমতে জীব ও জগৎ প্রভৃতি শক্তির আকারে পরিণত হইয়া জগৎকারণে থাকে। দ্রব্যরূপে বা কার্য্যরূপে যে সূক্ষ্মভাব, সেই সূক্ষ্মভাবে থাকে না বলা হয়। এই জন্য এই মতবাদকে শক্তিবিশিষ্ট জগৎকারণবাদ বা শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলা হয়। শক্তি ও দ্রব্যের মধ্যে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। দ্রব্যে শক্তি থাকে বলিয়া দ্রব্য ও শক্তিকে অভিন্ন বলা হয় না। আধার আধেয় কখন অভিন্ন হয় না। সূক্ষ্মরূপে থাকা ও শক্তির আকারে থাকা, এক কথা নহে। অঙ্কুরিত বটবীজ ভঙ্গ করিলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অতিসূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত বটবৃক্ষই দেখা যায়। কিন্তু বটফলের বা বটফল জন্মিবার অগ্রে পল্লব মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি তাহাকে আছেই বলিতে হইবে। "নাই" বলা চলে না। এই অবস্থায় বটবৃক্ষটী শক্তির আকারে থাকে বলা হয়। শক্তি অদৃশ্য, সূক্ষ্ম কিন্তু দৃশ্য। এই মতে শক্তি এবং শিব অর্থাৎ শক্তিমান এই বস্তুদ্বয় অভিন্ন বলা হয়, শক্তিই জগৎ আকারে পরিণত হয়। শিব অসঙ্গ অবিকারী রূপে থাকেন, আর তাঁহার শক্তি নিত্যা কিন্তু বিকারী হন, ইত্যাদি।

কিন্তু শৈবগণের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একথা সঙ্গত নহে। কারণ, এই মতে শিব ও শক্তি অভিন্ন অথচ শক্তি বিকৃত হইয়া জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং জগৎকে সত্য বলা হয়; অদ্বৈতবাদের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলা হয় না। শিব ও শক্তি যদি অভিন্ন হন, আর শিব যদি অবিকার্য্য তত্ত্ব হন, তাহা হইলে শক্তিও অবিকার্য্য তত্ত্ব হইবেন না কেন? সেই শক্তি বিকৃত হইয়া সত্য জগৎ আবির্ভূত হইবে কি প্রকারে? অবিকারীর বিকার ইহা কি বিরুদ্ধ

কথা নহে? এজন্য এতাদৃশ শিব বা শক্তি হইতে অথবা শিব ও শক্তি উভয় হইতে যাহাই আবির্ভূত হইবে, তাহাকে মিথ্যা বলিতেই হইবে। যেহেতু কারণ বস্তুটী অবিকৃত থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হইলে সে কার্য্যটী স্বরূপতঃ অর্থাৎ কার্য্যরূপে মিথ্যাই হয়। এই কারণে শক্তি-বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদটী নির্দ্দোষ মতবাদ হইতে পারে না। শক্তিকে অচিন্ত্য বলিলেও সেই অচিন্ত্য এস্থলে মিথ্যারই নামান্তর হইবে। বেদান্তে শক্তি অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মকে অচিন্ত্য অর্থাৎ সত্য বলা হয়। অনির্ব্বচনীয় অর্থ যাহা নির্ব্বচন অর্থাৎ নির্ণয় করা যায় না—যেমন ইন্দ্রজাল এবং অচিন্ত্য অর্থ যাহা চিন্তা করা যায় না, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ। আসল কথা এই যে, শক্তিকে যদি কারণের স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলা হয়, তবে কার্য্যের অনুরোধে সেই শক্তির বিকার বা উৎপাদ ও বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহা বহ্নি ও চন্দ্রকান্ত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর যদি শক্তিকে কারণের স্বরূপ বা কারণতার অবচ্ছেদক বলা হয়, যেমন বহ্নির দাহিকা শক্তির স্থলে, দাহিকা শক্তিকে বহ্নির স্বরূপ বলা হয়, অর্থাৎ শক্তিকে কারণ হইতে অতিরিক্ত না বলা হয় তাহা হইতে জগৎকারণ নির্ণয়স্থলে তাহার উৎপাদ বিনাশ বা বিকার নাই, অথবা তাহা অনভিব্যক্ত অবস্থায় জগৎকারণে থাকে ইত্যাদি বলিতে কোনও বাধা নাই। অর্থাৎ শক্তি শক্তিমান হইতে অতিরিক্ত হইলে মিথ্যা এবং অতিরিক্ত না হইলে নিত্যা, জগৎকারণস্বরূপা বলিয়া ব্যবহার করিতে বাধা হয় না। নচেৎ শক্তিকে শক্তিমান হইতে অতিরিক্ত বলিব, অথচ নিত্যা অনভিব্যক্ত-রূপা বলিব ইহা কখনই সঙ্গত হয় না। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই সকল কারণে শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক ভাবিয়া অনির্ব্বচনীয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। নচেৎ শক্তিকে শক্তিমান হইতে অভিন্ন দৃষ্টিতে মিথ্যা অনির্ব্বচনীয়া বলা হয় না। তখন তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপই বলা হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের বিশেষত্ব। ইহা অপর কোনও মতেই নাই। উপনিষদে বা বেদান্তে এই মতের সযুক্তিক সমর্থন এবং সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্য বেদান্তদর্শন, বেদের শরণ গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করিয়াছেন। জগতের সত্যতাবাদী কোন দার্শনিকই বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, এই সকল কারণে বেদ বা উপনিষদের অনুরোধে বেদান্তী জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, আর জীব ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নহে, এই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

বেদ না মানিয়া বা অংশতঃ মানিয়া জগৎ-কারণ নির্ণয় করিলে কোনও একটী নির্দ্দোষ এবং নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। এজন্য ইহাই বেদান্ত দর্শনের একটী বিশেষত্ব। এই জন্য সুধীসমাজে বেদান্ত-দর্শনের এত আদর।

তবে ইহাও বলিতে হইবে, যে অন্য দর্শন-গুলি জগতের সত্যতা সংস্কারাপন্ন অধিকারী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। আর এজন্য অন্য দর্শনগুলিকে ভ্রান্ত বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাহাদেরও উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা থাকিলেও অভ্রান্ত বলিবার ব্যবহার আছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভ্রান্ত না বলিতে পারিলেও উপযোগিতার দৃষ্টিতে অভ্রান্ত বলিতে পারা যায়। এই কারণে সাধারণতঃ অপর অনেক দর্শনকে অভ্রান্ত বলা থাকে। বাস্তবিক পক্ষে যে জ্ঞানধারা

ব্যবহারে কোনও বাধা হয় না, তাহাকেও সাধারণ-লোকে সত্য জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করে। এই দৃষ্টিতে অপর অনেক দর্শনকেই অভ্রান্ত দর্শন বলা হইয়া থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কিন্তু বেদান্ত দর্শনই অলৌকিক জগৎকারণ বস্তুকে বেদরূপ অলৌকিক প্রমাণ দ্বারা যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অভ্রান্ত দর্শন বলা হয়। অন্য দর্শনগুলি উপযোগিতার দৃষ্টিতে অভ্রান্ত, বেদান্তদর্শনকে কিন্তু তাত্ত্বিক ও উপযোগিতা উভয় দৃষ্টিতেই অভ্রান্ত বলা হয়। ইহাও বেদান্তদর্শনের একটা বিশেষত্ব।

ভগবান্ নারায়ণের অবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (অপর নাম বাদরায়ণ) এই পন্থা প্রদর্শন করিয়া জগতের অভাবনীয় এবং অতুলনীয় উপকার সাধন করিয়াছেন অর্থাৎ যথার্থ সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিলেও পরিতৃপ্তি হয় না। আর এই মতের সযুক্তিক ব্যাখ্যাতা শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকেও সেই সঙ্গে কোটি কোটি প্রণাম। কারণ তিনিই সেই নারায়ণ-ব্রহ্মা-বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর-ব্যাস-শুক-গৌড়পাদ-গোবিন্দপাদ বা পতঞ্জলিদেবক্রমে লব্ধ এই সাম্প্রদায়িক বিদ্যার প্রভূত প্রচার ও সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্যার যে কত উপযোগিতা তাহা—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ॥"

এই প্রসিদ্ধ পুরাণবাক্যে ঘোষিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণাম মন্ত্রে ইঁহাদের উক্ত সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। যথা—

নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রং
পরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্র-
মথাস্য শিষ্যম্॥ ১
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ
শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যান্ অস্মদ্গুরূন্ সন্ততমান-
তোঽস্মি॥ ২

অনাগত

শ্রীশান্তশীল দাশ

অনাগত ভবিষ্যের পানে
বিশ্বের নরনারী চেয়ে আছে ব্যাকুল পরানে।
আসিবে সে একদিন, তাই আছে পথ চেয়ে তার,
স্বপনের মাঝে বুঝি রথধ্বনি শোনে বার বার।
প্রতীক্ষিয়া কাটে দিন, কাটে মাস, বর্ষ হয় গত,
পথপানে চেয়ে রয়, কভু নাহি হয় আশাহত।
তারি লাগি যুগে যুগে চলিয়াছে কত আয়োজন,
নিতি নব উপচারে হয় কত পূজার্ঘ্য-রচন।
কত আশা, কত হর্ষ, মনে লয়ে যাপে রাত্রিদিন।
জীবনের গুরুভার তারি লাগি' বহে ক্লান্তিহীন।
আসিবে সে একদিন মানুষের আরাধ্য দেবতা
ভবিষ্যের রূপ ধরি; পৃথিবীর যত মলিনতা,
যত পাপ, যত গ্লানি, মুছে যাবে পদস্পর্শে তাঁর,
নিমেষে নিঃশেষ হবে ধরণীর ব্যথা-বেদনার।

আমাদের বর্তমান দুর্গতি ও স্বামীজি*

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, এম্-এ, বি-এল্

প্রতি বছর এমন দিনটি ফিরে ফিরে আসে। আমাদের নিজ নিজ কর্মব্যস্ততার মাঝে একটু অবসর করে নিয়ে স্বামীজির উৎসবের আয়োজন করি। স্মরণ করি তাঁকে, যাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও অলৌকিক কর্মশক্তি একটা নবযুগের সূচনা করেছিল। তাঁর স্মৃতিপূজার উদ্দেশ্যে সভা করি, তাঁর গুণকীর্তন করি, এত ছোট ছোট বালিয়াড়ির মাঝখানে হঠাৎ সেই শক্ত পাথরে গড়া গগন-স্পর্শী চূড়াটিকে মনশ্চক্ষে অবলোকন করে বিস্ময়ে অভিভূত হই, শ্রদ্ধায় তাঁকে প্রণতি জানাই। কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয় এখানেই। তারপর যে যার ঘরে ফিরি, রোজকার কর্ম-কোলাহলের মাঝে স্বার্থের খুঁটিনাটি দাবীগুলি পূরণ করার মাঝে কোথায় তলিয়ে যায় আমাদের ক্ষণিকের জন্মে ভাবা সেই উঁচু আদর্শ! নূতন করে জীবন-বীণার তার বাঁধবার সংকল্প আর আমাদের মনের গণ্ডী পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে আসবার সুযোগই পায় না। তাইতো মনে হয়, এত বড় জীবন দিয়ে গড়া আদর্শ আর কার আছে, আবার আদর্শকে কর্মপথে এ ভাবে ক্ষুণ্ণও বা আর কে করছে?

তাই বুঝি মরণ এসে আমাদের শিয়রে আজ ডাক দিয়েছে। আমি বিশেষ করে বাংগালী হিন্দুদের কথা বলছি—তাদের কথা, যারা শিক্ষায় দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, স্বাদেশিকতায়, ত্যাগে ও কর্মে এত বড় হয়েও আজ কোন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে! আজ সত্যই আমাদের বড় দুর্দিন—এ একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা। কতো যে আমাদের দুর্গতি ঘটেছে, আরো কতো যে ঘটবে—তা কি আর তালিকা করে বলবার দরকার হবে? যে অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, তার জন্য ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের উপর দোষারোপ করে আর মুস্লীম লীগের মারাত্মক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' নীতিকে তীব্র ভাষায় কেবল নিন্দা করেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। আজ সাবধানে বিচার করবার দিন এসেছে।

আমরা যদি আত্মবিশ্লেষণ করতে বসি তবে দেখতে পাবো আমরাই ওদের সুযোগ করে দিয়েছি এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটাবার। মধ্য-যুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার খোসাটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে বসে আছি—ভাবছি এই আমাদের হিন্দুধর্মের প্রাণ। সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিধান শির পেতে নি বিনা বিচারে—তাইতো জাতিভেদের আনুসংগিক কত কি, পাঁজির সহস্র বিধান আজও আমাদের জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত কচ্ছে। শত শত বৎসরের আবর্জনার সংগে যুক্ত হয়ে ওগুলি এনেছে আমাদের মধ্যে কত গলদ, কত শক্তিহীনতা! অপর দিকে কৃত্রিম বিদেশীয় ভাবে চলেছে বাংগালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা বড় চাকুরে এবং বড়লোক। এভাবে সৃষ্ট হয়েছে বাংগালীর জীবনে কত ভেদ-বিভেদ, কত শ্রেণিবিভাগ ও আপন-পর বোধ। আজ এসব গ্লানি জগদ্দল

* মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে আহূত জনসভায় পঠিত।

পাথরের মত জমাট বেঁধে আমাদের বুকে চেপে বসেছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা নেতা বা নেতৃস্থানীয় তাঁরা "হাই পলিটিক্স" নিয়ে সদাই ব্যস্ত। দলে উপদলে এদেশটা ছেয়ে গেছে; সংক্রামক ব্যাধির ব্যাসিলির মত অসংখ্য 'ইজম্‌' বা মতবাদ আমাদের যুবকদের আক্রমণ করেছে। প্রত্যেকে তার দল গড়তে, রাখতে ও বাড়াতে ব্যস্ত। কত হানাহানি, কত লেখালেখি, কত তর্কবিতর্ক! আমি কিন্তু একথা বলছি না যে দলাদলি মানে সর্বদাই খারাপ কিছু—বিভিন্ন মতবাদ সব দেশেই থাকে, পন্থাও বিভিন্ন হয় একই লক্ষ স্থলে পৌছবার জন্য, থাকে পরস্পর রেষারেষি কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে দলাদলি কি তাই? আমরা তো দেশের উধ্বে' যার যার দলকে স্থাপন করে বসে আছি—তাতেই হচ্ছে আমাদের শক্তিক্ষয়; একতার অভাব আমাদের সব কাজে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। দেশসেবার পংকজটি আজ শুধু পংকের মাঝেই গড়াগড়ি যাচ্ছে। জাতিভেদ ও আনুসংগিক সামাজিক বিভিন্নতার আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে যাদের জীবন, কর্মক্ষেত্রে নেমে এ দলাদলি তো তাদের স্বাভাবিক পরিণতি। বাংলাদেশ যেমন করে এর কুফল ভোগ কচ্ছে, এমনটি আর কোন প্রদেশ কচ্ছে কিনা জানি না। আজ সর্বভারতীয় ব্যাপারে বাংগালী কোথায় নেমে এসেছে, তাতো আর চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। এর জন্য কে দায়ী? যোগ্যতা ও শক্তিকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য? নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে, খুঁটিনাটি স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিয়োজিত থেকে আজ আমরা তাই সব হারিয়ে বসে আছি। একতাই শক্তি—সমষ্টিগত ভাবে দাবী জানানোই যোগ্যতার পরিচয়; নইলে ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাব আজও তো বাংলায় নেই। আর আমরা যারা রাজনীতির ধার ধারি না, তারাও চা খেতে খেতে গল্প-গুজব করি ওই রাজনীতিকেই ঘিরে—দীর্ঘনিঃশ্বাসও না ফেলি এমন নয়—হায়রে, বাংগালী হিন্দুর আজ কি দুর্দিন! কিন্তু কই সে বলিষ্ঠ কর্মধারা, কই সে গলদ শোধরাবার চেষ্টা,—কই সে সৎসাহস! এদিকে না আছে আমাদের নেতা, না আছে স্বদেশ-সেবায় আগ্রহ; কতকাল আগে স্বামীজি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে—বাংলার তথা ভারতের উচ্চবর্ণদের তীব্র ভর্ৎসনা করে বড় দুঃখে বলেছিলেন—"এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরুমরীচিকা তোমরা! * * বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন! ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য! স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী কচ্ছ কেন? ভূত ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কংকালকুল তোমরা,—কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?"—তাতে আজও তো আমরা কান পাতি না। আমাদের দুঃখ আজ ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে—একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মুখে আজ আমরা দাঁড়িয়ে। তবুও চলেছি আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে। ঈশান-কোণের গাঢ় কৃষ্ণমেঘের রেখা আজ এতটা প্রকট হয়েও আমাদের চোখের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছে। বাঁচবার চেষ্টা আমাদের কৈ—আসন্ন ঝড়ে কি কুটোর মতই আমরা উড়ে যাবো? আজও কেন আমরা বলতে পারি না উদাত্ত কণ্ঠে—"দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই!" এই সত্যিকারের একতাবোধই তো আমাদের বেঁচে থাকবার মন্ত্র কানে দেবে। অবশ্য রাজনীতিতে দল বা নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য আমরা ঐসব তথাকথিত ছোটলোকদের টানতে পারি, তাদের হয়ে দুটো

কথা বলতেও হয়তো এগিয়ে যাই। কিন্তু নিজের রক্ত-মাংসের সঙ্গে জড়ানো আত্মীয় বলে তাদের ভালবাসতে পারি কি? পারি না বলে আজ কত জুজুর ভয় আমাদের মাঝে ঢুকেছে। উদারতা নেই বলেই আজ ভীরুতা এসে আমাদের গ্রাস করেছে। আমরা যে ভাবি যার যার ব্যক্তিগত কথা; সমগ্রভাবে সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করার শক্তি আমাদের নেই। এ দুর্বলতার খবর ওরা রাখে, যাদের হাত থেকে এসেছে আমাদের এ নিঃশেষ করবার আঘাত। আমাদের অনুদারতা, স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতাই ওদের এমন অত্যাচার করবার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই সংখ্যায় আড়াই কোটি হয়েও বাংগালী হিন্দু আজ তিন কোটি বাংগালী মুসলমানের তথাকথিত পাকিস্তান স্থাপনের প্রয়াসে এত শংকিত হয়ে পড়েছে। 'সব গেল, সব গেল'—ধ্বনিতে আমরা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছি—কাজের মত কাজ তো কিছুই হচ্ছে না। আজও ব্যক্তিগত চিন্তা ও স্বার্থ, নিকৃষ্ট দলাদলি, সামাজিক বৈষম্য ও তীব্র উঁচু-নীচু বোধ—যার জন্ম ওই কংকালময় জাতিভেদে—আরো কত ভণ্ডামি ও কালোবাজারের জোচ্চুরি সমানে চলেছে। বাংগালীর জাতীয় চরিত্র আজ কী গভীর ক্লেদক্লিষ্ট—এ কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এত আঘাত খাচ্ছি, তবুও আমাদের চৈতন্য হচ্ছে না। বেঁচে থাকবার ইচ্ছা প্রাণিজগতে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—আমাদের সে প্রবৃত্তিও যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; এ বাংলাদেশের আড়াই কোটি হিন্দু যদি শুধু হিন্দু বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, তবে কার সাধ্য আমাদের মরণ ঘটায়! ওই যে নোয়াখালির সুদূর গ্রামাঞ্চলে দুর্গম পথে প্রান্তরে অশীতিপর এক বৃদ্ধ উন্মাদের মত ছুটে চলেছেন—পরনে তাঁর কটিবাস, খালি পা, খালি গা, হাতে বাঁশের লাঠি, মুখে 'মাভৈঃ' বাণী, প্রতিনিঃশ্বাসে শান্তির মন্ত্র—এ সব কি বৃথাই যাবে? স্বামীজির বাণীকে এ ভাবে আর কে কাজে পরিণত করতে পেরেছেন জানি না! জগতের শ্রেষ্ঠ মহামানব, সমগ্র ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিসম্বাদী নেতা আজ এ দেশের বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে উচ্চ রাজনীতির বড় বড় কাজগুলি ফেলে রেখে ছুটে গেছেন ওই অজানা অচেনা গ্রামগুলির মাঝে—যেগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামায়। আপাতদৃষ্টিতে এ তো তাঁর মত লোকের পক্ষে ছোট কাজ—না আছে আড়ম্বর, না আছে কোলাহল। তবুও তিনি বলছেন, এই তাঁর জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা—তাঁর সারা-জীবনব্যাপী সাধনার শক্তি ওখানেই যাচাই হবে।

এ কথা শুধু তাঁর মুখেই সাজে। মানুষকে বাঁচাতে হবে, তাকে সাহসী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে তার আত্মবিশ্বাস—তবে তো রাজনীতি। তাইতো তিনি হরিজন উন্নয়নকল্পে, দুর্গতজনের সেবায় এমন করে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। শতধাবিভক্ত হিন্দুসমাজকে শুধু হিন্দুর পরিচয়ে গৌরবান্বিত করবার প্রচেষ্টা পুষ্ট করেছে তাঁর কর্মধারাকে। শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানেরও নয়—সমগ্র হিন্দুস্থানের বেঁচে থাকার মন্ত্র বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন গান্ধীজি ওই নোয়াখালির পথে-প্রান্তরে, চাষার কুটিরে, ভগ্ন অট্টালিকার মাঝে। তাঁর এই মূর্তির পিছনে ভেসে উঠছে স্বামীজির বাণী। তাঁরই সাধনাকে জয়যুক্ত করতে ছুটে এসেছেন গান্ধীজি আমাদেরই কাছে। ঝিমিয়ে পড়া বাংগালীকে ওই স্বামীজির সুরেই তিনি আবার ডাক দিচ্ছেন—ওগো অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা যে অমৃতেরই অধিকারী, ভুলোনা তোমাদের আদর্শ, তোমাদের ঐতিহ্য, ভুলোনা তোমাদের গীতা উপনিষদের শিক্ষা! সাহস সঞ্চয় কর, এগিয়ে যাও—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। যারা

রয়েছে অবহেলিত, পদদলিত—তাদের কিন্তু সংগে নিতে ভুলো না। মানুষের অধিকারে আর তাদের বঞ্চিত কোরো না। "যারে তুমি ফেলিছ পশ্চাতে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" ওদের নিয়েই তোমাদের শক্তি—তোমাদের উত্থান, তোমাদের পতন। দিনের পর দিন প্রার্থনা-সভা করে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানের একতা প্রচার করছেন—তাঁর উদার দৃষ্টির কাছে মানুষে মানুষে শুধু ধর্মের বাহ্যরূপের জন্য যে কলহ তা একেবারে অর্থহীন মনে হয়—অথচ এই তো চলেছে আজ হিন্দুস্থানের বুকে। এ সব তাঁকে ব্যথা দেয়, সংগে সংগে আরো ব্যথা দেয় তাঁকে হিন্দু যে কাপুরুষতা দেখিয়েছে ওই অঞ্চলে—তাই। এ কাপুরুষতার কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন, তাই ব্যক্তিগত সাহস সংঘগত শক্তির উদ্বোধন সংগীত গেয়ে গেয়ে তিনি ওখানকার হিন্দুদের প্রাণে আশার সঞ্চার করছেন—এর ফল যে কত সুদূরপ্রসারী তা আমরা কি সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারি না?

কিন্তু তবুও আমাদের বর্ণহিন্দুদের অভিমান যায় না। আমরা ভদ্রলোক শিক্ষিত সুন্দর মার্জিতদেহ—কেমন করে ভাবি ওই গেঁয়ো নোংরা চাষা ও শ্রমজীবী আমাদের আত্মার আত্মীয়, আমাদেরই একজন! স্বামীজির কথাতেই বলি—"তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে।" এরই সাথে জুড়ে দেওয়া যায়,—আমরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে, ইংরেজের গোলামী করে, বিদেশী পোষাকে দেহটাকে সাজিয়ে, নকল সুরে আধো আধো ইংরেজি বলে—কী কৃত্রিম জীবনযাপন করেই না আত্মপ্রসাদ লাভ করছি! কখনও বা নাকসিঁটকই কখনও বা মনে মনে তাদের বলি ছোটলোক, স্বামীজির কথায় বলতে গেলে—"যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, যেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্য্যকারিতা" তাদের তিনি প্রণাম জানিয়েছেন; আর সিংহের মত গর্জে উঠেছেন উচ্চবর্ণদের সম্বোধন করে—"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাংগল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জংগল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে।" আজ স্বামীজির এই ভবিষ্যৎ বাণী একেবারে ফুটে বেরিয়েছে। গণশক্তি আজ জাগ্রত আমাদের দেশে—একে স্বীকার করে চলতেই হবে আমাদের বাঁচতে হলে। এই তো সত্যিকারের সাম্যবাদ—হিন্দুস্থানের মুক্তির ইংগিত। এর জন্য রাশিয়ার দিকে আমাদের অন্ধের মত তাকাতে হবে কেন? যদি এ বোধটুকু আমাদের হয়, যদি আমরা আপন আপন সুখ-দুঃখ ওদের সংগে সমান করে ভাগ করে নিতে পারি, তবেই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী আমরা বাঁচবো। আর স্বামীজির সৃষ্ট নবযুগের এ ভাবধারার সংগে যদি আমরা আজিও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারি, তবে আমাদের বর্ণহিন্দুদের ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের দশা হবে ওই রাশিয়ারই 'কুলাকদের' মত—যাদের সমূলে ধ্বংস করে সাম্যবাদ তার পথ করে নিয়েছে।

বর্তমান বিপর্যয়ে এই তো আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞান। এ চরম দুর্দশার মাঝে, মহাশ্মশানের এ ভীষণতার মাঝে শিবকল্প স্বামী বিবেকানন্দকে যদি আবাহন করার সাহস আমাদের থাকে তবেই আমরা আলো দেখতে পাবো। শুনেছি, দুর্দশা যখন চরমে পৌঁছে তখনই হয় নবজাগরণের সূচনা। গাছে,

যখন নূতন ফুলের কুঁড়ি ধরে তখন পুরাতন ফুলগুলি একেবারে ঝরে পড়ে যায়। তেমনি করে ঝরে পড়ুক আমাদের আবর্জনাগুলি সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে, হোক নবজীবনের উন্মেষ। এ পথে চলবার শক্তি তিনিই দেবেন, তাঁরই বাণী দেবে আমাদের প্রেরণা, তাঁর পটে আঁকা ছবি আবার সজীব হয়ে ধরবেন আমাদের কর্মের রথের যে ধাবমান অশ্ব তার বল্‌গা—যেমন করে অবসাদগ্রস্ত অর্জুনের রথাশ্ব চালিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ জয়ের পথে। অন্তরীক্ষ থেকে উৎসাহ-বাণী ভেসে আসবে—"জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠ ওঠ জয়রথে তব।"

লম্বা কথা না হয় কদিনের জন্য শিকেয় তোলাই রইলো। এবার যেন চোখ পড়ে আমাদের সংগঠনের দিকে, জাতিভেদের গ্লানি সমূলে বিনাশ করার দিকে, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচারকে দূর করে দেবার দিকে, শতভাগে বিভক্ত হিন্দুজাতিকে এক শক্তিশালী জাতি করে তোলবার দিকে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। একতার জন্য, বাঁচবার জন্য, বাঁচাবার জন্য ছাড়লামই না হয় উচ্চজাতির গর্ব, ইংরেজি শিক্ষার অভিমান, দিলামই না হয় সে কৃত্রিম জীবন বিসর্জন—যা জনসাধারণ ও আমাদের মধ্যে মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ এতবড় এক প্রাচীর গড়ে তুলেছে। এতে আমাদের শেষ পর্যন্ত লাভই হবে বেশী। দুর্যোগের ঘনঘটার মাঝে অনুষ্ঠিত এ সভায় তাঁর কথা স্মরণ করে, তাঁর আদর্শকে বরণ করে এবং সেই অনুসারে জীবনের মোড়টি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি যদি দিতে পারি তা হলে আমাদের কোন ভয়ই থাকবে না। আমাদের সাথে থাকবে স্বামীজির বাণী, পথ দেখাবেন স্বামীজিরই উত্তরসাধক গান্ধীজি।

মনোবসন্ত

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

হে বসন্ত,
জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে লহো নমস্কার!
মোর দ্বারপ্রান্তে এসে ফিরে গেছ তুমি বারবার।
তোমার দক্ষিণ হাতে
সন্ধ্যায় প্রভাতে
খুলিতে চাহিয়াছিলে হৃদয়-দুয়ার,
বন্ধ ছিল দ্বার
করো নাই অবহেলা হে সখা আমার!
মধুময় মাধবীর মন্ত্র-গুঞ্জরণে
আজ ক্ষণে ক্ষণে
উতল উল্লাসে দোলে হৃদি-শতদল,
সহজ চঞ্চল।
উদয়-সাগর-তীরে ভীরু পথহারা
ম্লান শুকতারা
সহসা নয়ন মেলি' করে উন্মোচন
নিশাবগুণ্ঠন!
আমার ভুবনে আজ
হে রাজাধিরাজ,
তোমার রথের চক্র থেমেছে সহসা!
অসীমের বক্ষ হ'তে খসা
জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্কের মত
খুঁজিয়া ফিরিছে পথ
আমারি মাঝারে।
শুনেছি আজিকে মোর হৃদয়-স্পন্দনে
ভেসে আসা অস্ফুট ক্রন্দনে
মহাকলরোল—
দে-দোল্‌……দো দোল্‌……
প্রণাম আমার
পলাশের পূজা-উপচার
মাধবীর বনে বনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
দক্ষিণের দোদুল দোলায়
তোমার চরণ 'পরে আপনি মিলায়।

কোরানে ধর্ম্মের রূপ

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্-এ

কোরানের ধর্ম্মের নাম 'ইস্‌লাম' ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ইহার তৃতীয় অধ্যায়ের (বা সুরার) ৮৩ শ্লোকে (বা আয়াতে) বর্ণিত হইয়াছে, "অফঘঈর দীনি ইল্লাহি ইয়ব্‌ঘূন ব লহু অস্‌লম মন ফী অস্‌-সমাবতি ব অল্‌-অর্‌জি ত্বৌ 'আন্ ব কর্‌হান্ ব ইলয়হি ইয়ুর-জ'য়ূন।—তাহারা কি ভগবৎ-ধর্ম্ম (দীনিইল্লাহি) ব্যতীত (অন্য কোন ধর্ম্ম) অনুসরণ করে? বস্তুতঃ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সকল জীবই ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকটই নিজকে উৎসর্গ করিয়াছে (অস্‌লম) এবং তাঁহার নিকটই সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" কোরানে বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে দীনি-ইল্লাহি বা ভগবৎ-ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম নাই এবং পৃথিবীর সকলই বস্তুতঃ তাঁহাকেই অন্বেষণ করে। এই ভগবৎ উপলব্ধির একমাত্র উপায় নিজেকে ভগবানের নিকট উৎসর্গ করা, এবং যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট নিজেকে বলিদান করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্মের অনুসরণকারী; তিনিই ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত 'ইমান্‌দার' (বা বিশ্বাসী), আর সকলই কাফির্ (বা অবিশ্বাসী), অর্থাৎ তাহারা জানে না বা বিশ্বাস করে না যে ভগবানই একমাত্র প্রভু এবং তাঁহার সত্তা হইতেই সকল জীব জীবন লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকটই সকলকে অন্তিমে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট রূপ আরো বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার আদেশ-বার্ত্তা-বহনকারী (বা পয়ঘম্বর্) হজরৎ মহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে পয়ঘম্বর্ সকলকে বল (কুল্) যে আমরা ভগবৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী (আমন্না বি-ইল্লাহি) এবং আমাদের নিকট যাহা (বা যে গ্রন্থ) প্রকাশিত হইয়াছে, এবং (এইরূপ ভাবে) ইব্রাহীম্, ইস্‌মাঈল্, ইস্‌হাক্, ই'য়কূব্ এবং (তাঁহার) বংশধরগণের নিকট যাহা (যে সকল গ্রন্থ) প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মূসা, 'ঈসা (যীশুখৃষ্ট) এবং (অন্যান্য) পয়ঘম্বরগণের নিকট যাহা (বা যে সকল গ্রন্থ) তাঁহাদের প্রভু বা পালন কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, (তাঁহাদের সকল ধর্ম্মগ্রন্থই আমরা বিশ্বাস করি)। আমরা এই পয়ঘম্বরদের মধ্যে কোনই প্রভেদ দেখি না, এবং তাঁহার নিকটই নিজেদের আত্মসমর্পণ করিয়াছি (মুস্‌লিমূন)। যদি কেহ এই ইসলাম (বা আত্মোৎসর্গরূপ) ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের অন্বেষণ করে, ইহা কখনই তাঁহার (ভগবানের) নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।" কোরানের মতে ধর্ম্ম এক; ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না, কারণ সেই পরম সত্য (বা অল্‌-হক্) এক, এবং সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ একই সত্যের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র সেই পরম সত্যকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপলব্ধির জন্য আমাদের সকলকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে এবং এই স্থির-বিশ্বাস রাখিয়া যে, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মপথে

অগ্রসর হইতে পারিবে, সে সেই পরমসত্য কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই গ্রহণীয় হইবে; কিন্তু যে তাঁহার সেই পরমসত্তা এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সেই পরম-সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হইয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "সে অন্তিমকালে (সেই পরমসত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া) ধ্বংসপ্রাপ্তগণের শ্রেণিভুক্ত হইবে।"

কোরানের ধর্ম্ম চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও সনাতন। সেই পরম সত্য এক, এবং এই এক সত্যকেই সকলে মান্য করিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকিতে পারে না। ভগবদ্‌বিশ্বাসী মাত্রই ভগবৎসান্নিধ্য লাভে চেষ্টিত এবং যে সেই পরমসত্তায় আস্থাবান নহে, সে সেই সরল সত্য পথ হইতে বিপথগামী হইতেছে। যে ভাগ্যবান সেই পরমসত্তায় বিশ্বাস লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক। কারণ সে অন্তিমে নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিবে, ইহা অন্যথা হইবার নহে। কোরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৫৬ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "ধর্ম্মের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই (লা ইক্‌রাহ ফী অল্‌-দীনি)। সত্য মিথ্যা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ইহা প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত। বস্তুতঃ যে মিথ্যার প্রতি আস্থাবান নহে, এবং ভগবানের প্রতি স্থিরবিশ্বাসী, সে দৃঢ় রজ্জু ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং ইহা কখনও ছিন্ন হইবার নহে এবং ভগবান সকলই শুনিয়া ও জানিয়া থাকেন।" ভগবৎবিশ্বাসী মাত্রই অন্তিমে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে এবং সেই পরম সত্তা সকল জীবেরই অন্তরের খবর জ্ঞাত আছেন। তিনি জানেন, কে প্রকৃত বিশ্বাসী এবং কেই বা কাফির্ অর্থাৎ ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাবান নহে। প্রকৃত পক্ষে কেহ ভগবদ্‌-বিশ্বাসী কি না, ইহা মুখে ব্যক্ত করিলেই চলিবে না। ভগবানই ইহার উপযুক্ত বিচারক, কারণ তিনি সকলই জ্ঞাত আছেন।

কোরানের ধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই; ইহা কখনই ধর্ম্মের নামে ঝগড়া বা বিবাদ করিতে বলে না। কোরানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫৯ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "(হে পয়গম্বর,) যাহারা তাহাদের এই (সনাতন) ধর্ম্মে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই। তাহাদের কার্য্যাবলী ভগবানের নিকটই সমর্পিত হউক; তিনিই অন্তিমে তাহার ভালমন্দ বলিয়া দিবেন।" যে সকল লোক ধর্ম্মের সরল পথ হইতে বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদের বাহুবল দ্বারা ধর্ম্মের সরল পথে আনয়ন করার দরকার নাই। সময়ে ভগবদ্‌ অনুগ্রহে অবিশ্বাসীও তাহার ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। বস্তুতঃ অবিশ্বাসিগণ তাহাদের প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চালিত হয় বলিয়াই ধর্ম্মের সত্যপথ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রধান কর্ত্তব্য ভগবৎসত্তায় সৃষ্ট মানুষকে তাহার নিজ সত্তা উপলব্ধি করাইতে যত্নবান হওয়া, এবং যখন মানুষ তাহার বৈশিষ্ট্য প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন আপনা হইতেই সে ধর্ম্মের সরল সত্যপথে চালিত হইতে থাকিবে। এইজন্য কোন ঝগড়া বা বিবাদের দরকার করে না। এই সম্বন্ধে কোরানে (৩০; ৩০) বর্ণিত হইয়াছে, "বস্তুতঃ অত্যাচারীরা অজ্ঞানতা বশতঃ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। কাজে কাজেই, যাহারা ভগবদ্‌-ইচ্ছায় বিপথগামী হইয়াছে, তাঁহাদের আবার কে সত্য পথে চালিত করিবে? এইরূপ লোকের কোন সাহায্যকারী নাই। অতএব, হে পয়গম্বর, তুমি কেবল

সত্যধর্ম্মের প্রতিই তোমার লক্ষ্য স্থির রাখ; এবং ভগবৎসত্তায় সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ভগবৎ-চরিত্র প্রকাশমান করিতে যত্নশীল হও। এই ভগবৎসৃষ্ট (চরিত্রের) কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।" মানুষের স্বভাবগত ধর্ম্ম সৎ হওয়া, এবং সেই পরম-সত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া; কিন্তু মানুষ স্বার্থান্বেষী এবং প্রবৃত্তির অধীনে চালিত হয় বলিয়াই, সেই পরম সত্য হইতে বিপথগামী হয়। যে ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছে, তাহাকে সৎপথে আনয়ন করার শ্রেষ্ঠ উপায় নিজের কার্য্যাবলী দ্বারা সেই পরম সার মাহাত্ম্য প্রচার করা।

কোরানের মতে সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণ একই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই এক সনাতন ধর্ম্মে যে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ স্বার্থান্বেষীদের প্রবৃত্তির প্রাধান্য। এই পৃথিবীর সকলের জন্যই এক ধর্ম্ম ও একই ভগবান। তবে এই সত্যধর্ম্ম প্রকৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, হয়ত বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম্মপথে চালিত হওয়ার কার্য্যাবলীর প্রথা বা ধারার পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু অন্তিমে সকলই জানিতে পারিবে যে এক ভগবানই সকলের উপর বিরাজ করিতেছেন এবং তিনিই সকলের আদর্শ। ইহার কার্য্যধারা নিয়াও ঝগড়া করার কোন আবশ্যকতা নাই। সৎব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে তাঁহার নিজের স্থির বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ ধর্ম্মপথে চালিত হওয়া। কোরানে (৪২; ১৩-১৫) বর্ণিত হইয়াছে, "নূহ (নবী বা অবতারের) প্রতি যে ধর্ম্ম তিনি (ভগবান) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম তোমার (মহম্মদ) প্রতিও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমাদের (ভগবান) নিকট ধ্যানযোগে যে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম ইব্রাহীম্, মূসা এবং ঈশাও আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। (তাহারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল যে) 'ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা কর, কিন্তু ইহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিও না।' যাহারা ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করে, তাহাদের (ধর্ম্মের পথে) আহ্বান করিয়া আনা অতি কষ্টকর। ভগবান যাহাকে ইচ্ছা নির্ব্বাচন করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, এবং যাহারা তাঁহার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার সন্নিধানে পৌঁছিবার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে হিংসাপরবশ হইয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে পয়গম্বর্, তুমি কেবল (লোকদিগকে সত্য পথে) আহ্বান করিতে থাক, এবং যেভাবে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেইরূপে (নিজের ধর্ম্মে) স্থায়ী থাক। লোকদের প্রবৃত্ত্যনুযায়ী পথে চালিত হইও না। তাহাদিগকে কেবল মাত্র বল যে ভগবৎপ্রেরিত গ্রন্থ (কোরান) দ্বারা যাহা কিছু আমার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে, আমি সকলই বিশ্বাস করি এবং আমি তোমাদের (বিভেদ) মীমাংসা করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ ভগবান আমাদের এবং তোমাদের উভয়েরই প্রতিপালক (আল্লাহ রববুনা ব রববুকুম্)। আমাদের জন্য আমাদের কার্য্যাবলী এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যাবলী (লনা আ'মালুনা ব লকুম্ আ'মালুকুম্)। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিভেদের কারণ নাই। অন্তিমে তিনি আমাদের উভয়কেই একত্রিত করিবেন। বস্তুতঃ তিনিই আমাদের চরম উদ্দেশ্য।"

প্রবৃত্তির প্রাধান্য ছাড়াও মানুষ সামাজিক আচার, ব্যবহার ও কুসংস্কারাদির জন্য সত্য পথে চালিত হইতে শিখে না। সত্য সকল সময়ই

সত্য; ইহার আলো সকল সময়ই লোকচক্ষে উদ্ভাসিত—তবু কেন মানুষ আলোর পথে ধাবিত না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নামে ঝগড়া ও মারামারি করে? কোরাণে (৪৩; ২২-২৪) বর্ণিত হইয়াছে,—"বরং তাহারা বলিয়া থাকে, আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে যে প্রথা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পথ অনুসারেই আমরা চালিত হইব। এইপ্রকারে যখনই আমরা (ভগবান) তোমাদের কোন দলের নিকট কোন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্য হইতে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা বলিয়া আসিয়াছে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এক নির্দ্দিষ্ট পথ বা ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয়ই তাহাদেরই পদানুসরণ করতে থাকিব। ইহার উত্তরে তাহাদের পয়গম্বর তাহাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদের পিতৃপিতামহদের যে পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়াছ, আমি যদি তাহা হইতেও ভাল পথ দেখাইতে পারি তাহা হইলে কি আমাকে অনুসরণ করিবে না? ইহার উত্তরে তাহারা বলিয়াছে, সে যাহাই হউক, তোমরা যে আদেশ-বাণীতে প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।"

ধর্ম্ম উপলব্ধির ব্যাপার, ইহার পথ সকলেই দেখাইতে পারে না; কেবল যাঁহারা ধর্ম্মপথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন বা ভগবানকে সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এই সম্বন্ধে উপদেশাদি দিতে পারেন। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কোরানে (৪; ১৭১) বর্ণিত হইয়াছে, "হে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দেশিত লোকগণ (ইয়া অহলাল্-কিতাবি), তোমাদের ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিও না, এবং ভগবান সম্বন্ধে যাহা সত্য নয় অর্থাৎ যাহা তোমরা সঠিক জান না তাহা কখন ও প্রকাশ করিতে যাইও না। বস্তুতঃ মেরীর পুত্র ঈশা (যীশুখৃষ্ট) একজন ভগবদ্-বাণী বহনকারী ছিলেন মাত্র। ভগবদ্-আদেশ মেরীর উপর অর্পিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা হইতে একটি আত্মার আবির্ভাব হয় (অর্থাৎ ঈশা জন্মগ্রহণ করেন); সুতরাং, ভগবানকে এবং তাঁহার আদেশবাহকদের বিশ্বাস কর। তাঁহাকে তিন (অর্থাৎ এক ভগবানই তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছেন এইরূপ) বলিও না। এইরূপ ধারণা হইতে বিরত থাক; কারণ ইহাই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক। বস্তুতঃ ভগবান এক; এবং তাঁহার নিকটই সকল শ্রদ্ধা অর্পিত হউক। তিনি পরম পবিত্র; তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে না এবং পৃথিবী ও আকাশ সমূহে যাহা কিছু আছে, সবলই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত।"

ধর্ম্ম খেলা বা কৌতুকের জিনিষ নহে; ইহাই জীবন পথের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মের শব্দগত অর্থও তাহাই,—যাহা ধারণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহারা মানুষজন্ম লাভ করিয়া ধর্ম্মের সত্যপথ হইতে বিরত থাকে; ধর্ম্মের নামে কেবল মিথ্যা আলোচনাদি নিয়াই ব্যস্ত থাকে এবং কখনও সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রাণদের উপদেশার্থে কোরাণে (৬; ৭০) বর্ণিত হইয়াছে, "যাহারা ধর্ম্মকে কেবল খেলার জিনিষ বা কৌতুকস্বরূপ মনে করে এবং এই পার্থিব জীবনদ্বারা প্রলোভিত হয়, এইরূপ লোক হইতে দূরে থাক। তবে তাহাদিগকে এই সত্যটি জানাইয়া দাও যে প্রত্যেক প্রাণী নিজের কার্য্যদ্বারাই বিপদগ্রস্ত হয় (তুব্সল নফ্সুন্ বিমা কসবৎ), এবং সেই সময়ে ভগবান ব্যতীত আর কেহই তাহার সহায়ক বা মধ্যস্থ হইবে না; যত যুক্তিই তখন প্রদর্শন করা হউক না কেন, কোনটাই গ্রহণীয় হইবে না। যাহারা নিজেদের কার্য্যানুসারে চালিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের এইরূপই বিষময় ফল—তাহাদের জন্য অন্তিমে অত্যুষ্ণ জল ও অতিশয় বেদনাময় শাস্তি তৈয়ার থাকিবে, কারণ তাহারা তাহাদের পরমসত্তায় বিশ্বাস করে নাই।"

কোরানের ৪৫ অধ্যায়ের অষ্টাদশ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "তৎপর, হে পয়গম্বর, আমি তোমাকে শরী'য়ৎ (বিধিনিষেধযুক্ত আইন-কানুন) অনুযায়ী ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিয়াছি এবং তুমি ইহা অনুসরণ করিয়া চল। অজ্ঞানীদের প্রবৃত্ত্য-নুযায়ী পথে চালিত হইও না।" সুতরাং আমাদের উচিত কোরান নির্দ্দেশানুযায়ী পথে চালিত হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা। কারণ, ভগবান হইতেই আমরা উদ্ভুত হইয়াছি, আবার তাঁহার নিকটই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।

'হিন্দু' শব্দ ও হিন্দুধর্ম্ম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

স্বামী চিন্ময়ানন্দজী মাঘসংখ্যার উদ্বোধনের 'কাফির' নামক প্রবন্ধে হিন্দুশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই শব্দের উৎপত্তি সিন্ধু হইতেই হউক, আর চোর-ডাকাত অর্থজ্ঞাপক ফারসী হিন্দু শব্দ হইতে হউক, ইহা বিদেশী শব্দ এবং বিদেশীয়দের দ্বারা প্রদত্ত আখ্যা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বিদেশীয়গণ আমাদের হিন্দু বলিয়াছেন কিন্তু আমরা আমাদের কি আখ্যায় পরিচায়িত করিতাম? হিন্দু শব্দ সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণে পাওয়া যায় না। পিঙ্গলের ছন্দের পুস্তকে বোধ হয় এই শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ। আখ্যা বা অভিধার প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়া উঠে যখন এক বস্তুর অন্যবস্তু হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দরকার হয়। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর আমাদের স্বাতন্ত্র্য-নির্দ্দেশের জন্য একটা অভিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের নিজেদের কোন অভিধা না থাকায় মুসলমানগণ আমাদের যে অভিধান দিল আমরা তাহাই নির্ব্বিচারে অর্থ না বুঝিয়াই গ্রহণ করিলাম।

মুসলমানগণ এদেশে আসিয়াছিলেন মিত্রভাবে নয়, শত্রুভাবে। ভারতের লোকে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিয়াছিল। যে বাধা দেয় সেই-ত শত্রু। শত্রুকে বিদেশী আক্রমণকারীরা যে অভিধান দেয় তাহা কখনও গৌরবজনক নয়। মুসলমানগণ হীনার্থেই হিন্দুশব্দের প্রয়োগ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই হিন্দু অভিধান গ্রহণ করার একটা কারণ, এই শব্দটাও আমাদের অপরিচিত ছিল না, যদিও আমরা আমাদের পরিচয়ে এই শব্দের ব্যবহার করিতাম না। গ্রীক, রোমক ইত্যাদি ইউরোপীয় জাতি আমাদের দেশকে Indus, Hindus, Hind নামে অভিহিত করিয়াছিল। তাহা হইতে আমাদের জাতির হিন্দু নামটা আমাদের কানে পৌঁছিয়াছিল। আমরা জানিতাম, বিদেশী মাত্রেই আমাদের ঐ নামে জানে। অতএব হিন্দুনাম গ্রহণে আমরা আপত্তি করি নাই। আজিও হিন্দুদের শতকরা ৯৯.৯ জন জানেই না—ফারসীতে হিন্দু শব্দের কি অর্থ। মুসলমান-বিজয়ের সময়ে লাখে একজনও হয়ত ঐ শব্দের কি অর্থ তাহা জানিত না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে—মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ছিল তাহাদের সঙ্গে পার্থক্যসৃষ্টির জন্য আমাদের কি অভিধান ছিল? জৈনের সংখ্যা কোন দিনই বেশি ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধের সংখ্যা এক এক সময়ে এখনকার মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল। বৌদ্ধদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য-নির্দ্দেশের জন্য আমরা কি নামে অভিহিত হইতাম? বর্ণাশ্রমী, আস্তিক, বৈদিক, বেদ-বিশ্বাসী এইরূপ একটা কিছু? বৌদ্ধদের যখন হিন্দুসমাজেরই একটা শাখা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল, তখন না হয় হিন্দুদের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এইরূপ একটা আখ্যা দিলেই চলিত কিন্তু এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যে দ্বন্দ্বও কম হয় নাই। বৈষ্ণবদের প্রাধান্যের যুগে বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধদের বলিত 'পাষণ্ডী'। কিন্তু বৌদ্ধরা আমাদের কি অপনামে অভিহিত করিত? বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্ম্মকে বলিত সদ্ধর্ম্ম, আমাদের ধর্ম্মকে তাহারা কি নামে অভিহিত করিত? ব্রহ্মন্

শব্দের অর্থ বেদ—তাহা হইতে বেদমূলক হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বলা হইত। হিন্দুধর্ম্মকে আজ আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বলা চলিবে না। সকলেই ভাবিবে ব্রাহ্মণকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া বুঝি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ-প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন।

মুসলমানী ভাষায় হিন্দুশব্দের যখন অর্থ অতি হীন, তখন এ নাম আমাদের বদলানো কর্ত্তব্য। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ নাম আর কিছুতেই যাইবে না, তবে বিদ্বৎসমাজে কোন একটি ভারতীয় অভিধান চলা উচিত। আর্য্যধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কোনটাই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়। হিন্দু বলিতে আমরা ভারতের ব্রাহ্ম, জৈন, বৌদ্ধ আর্য্যসমাজী, সৎনামী, বেদে অবিশ্বাসী উদারতন্ত্রী বিবিধ সম্প্রদায় সকলকেই বুঝি। শিখ ও পারসীকরাও আমাদের পর নহে। নানক, কবীর, দাদু, রামদাস ইত্যাদি অবৈদিক ধর্ম্মপ্রচারক সাধুসন্তদেরও আমরা নমস্য ও অনুবর্ত্তনীয় মনে করি। অতএব হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের এমন কোন আখ্যার প্রয়োজন যাহা ভারতীয় ধর্ম্মের সকল অনুবর্ত্তীদের গ্রহণীয় হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায়, মুসলমান জাতিকে প্রাধান্য দিয়া ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকদের অমুসলমান অভিধান দিয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের Division by Dichotomy. সকল অমুসলমানদের অদৃষ্ট-যখন একসূত্রে গাঁথা, তখন রাজনীতির ব্যবস্থার দিক হইতে ইহা যথাযথই বটে। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য দিক হইতে এই নেতি-বাচক নাম আমাদের পক্ষে মর্য্যাদাজনক নয়।

এখন মুসলমান নেতারা বৈরিতার দিক হইতে বিচার করিয়া সমস্ত অমুসলমানকে হিন্দু বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা অনুন্নত হিন্দুদের নিজেদের দলে টানিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বর্ণহিন্দুর দল বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই ঘোষণায় শিখ, পরাসীক, খৃষ্টান, জৈন ইত্যাদি ভারতীয়দের বর্ণহিন্দুদের অনুবর্ত্তী বলিয়া উপেক্ষাই করিতেছেন। জানি না শাসক-সম্প্রদায় হিন্দুদের এখন কি নামে অভিহিত করিবেন।

হিন্দুধর্ম্মটা যে কি তাহা মুসলমানগণও জানেন না—ইংরাজ শাসকসম্প্রদায়ও জানেন না। ভারতের এই ধর্ম্মই বিশ্বধর্ম্ম, মহামানবধর্ম্ম। মানবজাতি যখন সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে এবং রহিবে, তখন কোন একটি স্তরের উপযোগী ধর্ম্মমত বিশ্বধর্ম্ম হইতে পারে না। কোন মানুষের জীবনের শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মমত এক হইতে পারে না। দেহমনের সকল বৃত্তি বয়ঃক্রমের সহিত রূপান্তরিত ও বিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মমতও ক্রমে ক্রমে উদ্বর্ত্তিত হয়। ইহাই জীবনধর্ম্মের পক্ষে স্বাভাবিক। মনোবৃত্তির স্থাবরতা মানসিক মৃত্যুর লক্ষণ। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতিবিশেষ এমন কি সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। হিন্দুধর্ম্মে অসভ্য বর্ব্বরদের Animism, Fetishism হইতে আরম্ভ করিয়া Highest Spiritualism অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরের উপযোগী ধর্ম্মমতের স্থান আছে, এমন কি নাস্তিকতারও স্থান আছে। নাস্তিকতাও ধর্ম্মমতের ক্রমবিবর্ত্তনে একটা স্তর। সেজন্যই হিন্দুধর্ম্ম—বিশ্বধর্ম্ম—মহা-মানবধর্ম্ম। যে প্রেতপূজা করে, যে গাছ পাথর পূজা করে, যে ওলাবিবি বা ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করে হিন্দুসমাজ তাহাকে বিধর্ম্মী মনে করে না। আবার যে ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক লৌকিক আচার-বিচার কিছুই মানে না অথবা যে সর্বসংস্কারমুক্ত অঘোর-তন্ত্রী কাপালিক, তাহাকেও হিন্দুধর্ম্মমহামণ্ডলী সমান সমাদরেই আত্মীয়জন মনে করে। অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নাস্তিক, অজ্ঞেয়-

বাদী, বহুদেববাদী, প্রতীক-উপাসক, জ্ঞানমার্গী, ভক্তিমার্গী, কর্ম্মযোগবাদী, পিতৃপুরুষপূজক, গুরুবাদী ইত্যাদি সকল মতাবলম্বী-ই হিন্দু। জগতে যত প্রকারের ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের কোন-না-কোন স্তরের ধর্ম্মমতের সহিত অভিন্ন। ফলে, জগতের যে কোন ধর্ম্মের লোক হিন্দুসমাজের মধ্যে সধর্ম্মার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আচার-ব্যবহারের পার্থক্য আছে—তাহা থাকিবেও। সেগুলি বাহ্য ও গৌণ। সেগুলির অধিকাংশই ধর্ম্মেরও বহিরঙ্গ নয়। যাহারা এই বহিরঙ্গীয় আচার-ব্যবহারকে এবং লৌকিক অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করে, তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে অনুস্যূত গভীর ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারে না। মুসলমানধর্ম্মমত আমাদের বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত নয়,—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতের সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষে ও আরব দেশের ভৌগোলিক সংস্থিতি ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই আচার-ব্যবহারে দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রামমোহন কোরান পাঠ করিয়াই আমাদের শাস্ত্রে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধানেও প্রেরণা পান। তিনি মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, কারণ নিরাকার একেশ্বরবাদ তিনি উপনিষদ্ ও বেদান্তেই লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানকে তিনি কোন দিন অনাত্মীয় মনে করিতেন না—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে মুসলমানেরও ঠাঁই ছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের কবিতা উৎকলন করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন। মুসলমান সাধকদের সুফীতত্ত্ব ও বেদান্তমূলক রসতত্ত্বে কোন ভেদ নাই।

. . . . .

হিন্দুধর্ম্ম প্রতীক-উপাসনা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহার কারণ, জগতের বহু মনুষ্যই একটা কোন প্রতীক না পাইলে শ্রীভগবানের উদ্দেশে তাহাদের ভক্তি নিবেদন করিতে পারে না। ইহা মানবমনের একটা বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক বৃত্তি। আরবদেশের যে শ্রেণীর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে হজরৎ মোহম্মদ অভিযান করিয়াছিলেন—আমাদের প্রতীক-উপাসনা কি সেই শ্রেণীর? প্রতীক-উপাসনা আর বুত্‌পরস্ত্‌ কি এক? আমাদের প্রতীক-উপাসনা ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বে চরাচরে জড়ে জীবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কোন একটি মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের সংস্থিতির কল্পনা নিম্নস্তরের ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়। অবশ্য এই স্তরেই যদি কেহ চিরজীবন রহিয়া যায় তবে সে কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যাশা করে সকলেই একদিন এ স্তর অতিক্রম করিবে। যদি কেহ না করে তবে তাহারই দোষ, হিন্দুধর্ম্মের দোষ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে স্তর অতিক্রম করিতে পারে না—তাহার স্কন্ধে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ চাপাইয়া দেওয়া যায় না।

হিন্দুসমাজের মধ্যে সাকার, নিরাকার, একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী সবই আছে। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এক ধর্ম্মমতের মানবগোষ্ঠী মনে করা ঠিক নয়। কাফের বলিতে হজরৎ মোহম্মদ যাহাদের বুঝিতেন—হিন্দুরা কি ঠিক তাই? মসজিদে গিয়া প্রার্থনা না করিলেই কি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্ম্মভীরু হিন্দুরা কাফের হইল? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা যাহাদের শূদ্র বলিত, এখনকার ব্রাহ্মণেতর জাতির লোক কি সেই শ্রেণীর? একদিন ভ্রান্তবুদ্ধি ব্রাহ্মণরা বিবেকানন্দকেও শূদ্র মনে করিতেন। হিন্দুদের সম্বন্ধে মুসলমানরাও সেই ভুল করিয়া থাকে।

এ সমস্ত বিচারের কথা, যুক্তির কথা, মীমাংসার কথা। এসব কথা বলিয়া ফল নাই। কারণ, ভারতবর্ষে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা আদৌ ধর্ম্মদ্বন্দ্ব নয়, ইহা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ধর্ম্মদ্বন্দ্বের যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের

শিক্ষা ও সভ্যতা ধর্ম্মান্ধতা বা ধর্ম্মদ্বন্দ্বের বিরোধী। যাঁহারা এ দ্বন্দ্বের সূত্রধার তাঁহারা সকলেই বর্ত্তমান যুগের উচ্চশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত—তাঁহাদের মনে ধর্ম্মবিদ্বেষ থাকিবার কথাই নয়। যতটা ধর্ম্মপ্রাণতা থাকিলে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া চলে, ততটা ধর্ম্মপ্রাণতা বিলাতী শিক্ষা-সভ্যতার সহিত সমঞ্জসও নয়। বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতা অন্য যে অনিষ্টই করুক, ধর্ম্মান্ধতা যে দূর করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে দ্বন্দ্বের ফলে আজ ভারতবর্ষ হাহাকার করিতেছে, তাহা কতকটা রাষ্ট্রনীতিগত, কতকটা অর্থনীতিগত। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের জন্য এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। দীন দুর্গত দুঃস্থজনগণের জন্য প্রাণ কাহারো কাঁদিতেছে না। সেজন্য প্রয়োজন হয় আধ্যাত্মিক চিৎপ্রকর্ষ, সেজন্য প্রয়োজন হয় কৃচ্ছ্রসাধনা। সে সাধনায় মানুষ মহাপ্রাণ হয়—সে সাধনা থাকিলে সাধক স্বাধীনতা চায় সকলেরই জন্য, মুক্তি চায় শুধু ঐহিক বন্ধন হইতে নয়—পারমার্থিক বাধা-বন্ধন হইতেও, সে সাধনা থাকিলে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ থাকে না। মানুষ বাছিয়া বাছিয়া হিসাব করিয়া তাহাদের জন্য যে ব্যথিত হয়, সে মহাপ্রাণ নয়—সে সাম্প্রদায়িক নেতা হইতে পারে—জননেতা হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিক প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে জনসাধারণের পোষকতা চাই। যে সর্বস্বত্যাগ করে জনসাধারণের জন্য, যে চিরদিন কৃচ্ছ্রব্রত পালন করে জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য, যে চির জীবন জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে, তাহার পক্ষে জনসাধারণের অনুবর্ত্তিতা বা পোষকতা লাভ করা সোজা। আর যে এসবের কিছুই করে না—তাহার পক্ষে জনসাধারণের অনুবর্ত্তিতা ও পোষকতা লাভ করিতে হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না—স্বাধীনতালাভের ফলে কি সুযোগসুবিধালাভ হইতে পারে তাহাও তাহাদের কাছে স্পষ্ট নয়—ভবিষ্যৎ তাহাদের কাছে রহস্যময়—ভবিষ্যতের দিকে তাহাদের বেশিদূর দৃষ্টিও যায় না। তাহারা মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাদির চেয়ে প্রচলিত চিরাচরিত ধর্ম্মটাকে ভাল করিয়া বুঝে। তাহাদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আদৌ উদার নয়। এমন কি ধর্ম্মান্ধতাও তাহাদের মধ্যে এখনো আছে। তাই ধর্ম্মের দোহাই দিলেই তাহাদের পোষকতা লাভ করা যায়। তাই রাজনীতিক দ্বন্দ্ব ধর্ম্মদ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে—রাজনীতিক প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য—ধর্ম্ম তাহার সহায় মাত্র। এ যেন পুরোহিত দিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটানো।

বাংলা দেশে যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বের মূলেও রাজনীতিক অভিসন্ধি আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতিক অভিসন্ধিই প্রবল। বাংলাদেশে দুই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যায় খুব বেশি তফাৎ নাই, কিন্তু অর্থনীতিক পার্থক্য খুব বেশি। এই পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টাই ধর্ম্মদ্বন্দ্বের রূপ ধরিয়াছে। অর্থনীতিগত সমুন্নতিও সাধনাসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ। বিনা সাধনায় তাড়াতাড়ি আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মবিদ্বেষকে জ্বালাইয়া ও জাগাইয়া রাখিতে হয়।
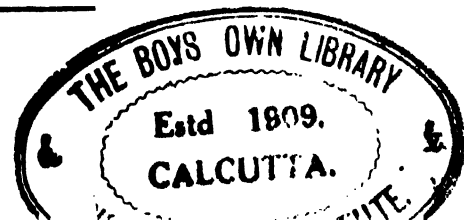
অল্‌ডাস্‌ হাক্সলি ও অবতারবাদ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রতিমাপূজার সার্থকতা নিয়ে আধুনিক আর আধুনিকাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর কেমন ক'রে মাটির পুতুল হ'তে পারেন? মাটির পুতুল তো জড়—কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী চৈতন্য। জড়ের পূজা আর চৈতন্যের পূজা এক কখনই নয়। সুতরাং প্রতিমাপূজা যখন নিছক পৌত্তলিকতা তখন ওপথে ঈশ্বরের করুণা পাওয়া কেমন ক'রে সম্ভব?

সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে একটি তরুণ বন্ধু বল্‌ছিলেন, হিন্দুসমাজের এই যে অবনতি—এর মূলে পৌত্তলিকতা। আমি বললাম, পৌত্তলিকতার জন্যই হিন্দুসমাজের এই দুর্গতি—এই সিদ্ধান্তে তুমি আস্‌ছো কেমন ক'রে? বন্ধু বল্‌লেন, গাছের পরিচয় ফলে। হিন্দুসমাজের নৈতিক অবনতি একটি অনস্বীকার্য্য সত্য। আর এই অবনতির কারণ পুতুলপূজা। আমাদের নৈতিক জীবন ভাল হবে, না মন্দ হবে—আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে আমরা অবনত হবো, না উন্নত হবো—তা' নির্ভর করছে আমরা অন্তরে কিরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস পোষণ করি, অনেকখানি তারই উপরে। বন্ধুর মতে, হিন্দুসমাজের অধোগতির মূলে তার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস—এ সিদ্ধান্ত ক'রে যুক্তির প্রাধান্যকেই স্বীকার করা হয়েছে।

বন্ধুটির সঙ্গে দিনের পর দিন যখন এই ধরণের বাদানুবাদ চল্‌ছে তখন হাতে এলো The Perennial Philosophy ব'লে অল্‌ডাস্‌ হাক্সলির (Aldous Huxley) একখানা বই। হাক্সলি বল্‌ছেন, What we do depends in large measure upon what we think অর্থাৎ আমাদের আচরণ বহুলপরিমাণে নির্ভর করে আমরা যা চিন্তা করি তারই উপরে। আমরা যা করি তা যদি অশুভ হয় তবে সেই অশুভ কর্ম্মের মূলে আমাদের চিন্তারই কোন গলদ—এই যুক্তির মধ্যে ভুল নেই। তার পরেই হাক্সলি বল্‌ছেন, খ্রীষ্টানদের ইতিহাস বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বহু অভিযানের দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে আছে। যাদের বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ম্মান্ধ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অনৈক্য ঘটেছে তাদের পাদ্রীরা পুড়িয়ে মেরেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের পাতায় পাতায় পরমত-অসহিষ্ণুতার প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। পরধর্ম্মাবলম্বীদের উপরে খ্রীষ্টানদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীগুলি পাঠ করলে শরীরের রোম খাড়া হ'য়ে ওঠে। হিন্দুধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসেও পরমত-অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে যে সব রক্তাক্ত অভিযানের দৃষ্টান্ত আছে, হাক্সলির মতে সেগুলির কাছে হিন্দুদের আর বৌদ্ধদের নৃশংসতা কিছুই নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে এই বর্ব্বরতার প্রাচুর্য্যের মূলে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসেরই গলদ—এই সিদ্ধান্তে হাক্স্‌লি উপনীত হয়েছেন। হাক্স্‌লি লিখ্‌ছেন তাঁর The Perennial Philosophy-র ৬২ পৃষ্ঠায়: Because Christians believed that there had been only one Avatar, Christian history has been disgraced by more and bloodier crusades, interdenominational wars, persecutions and proselytising imperialism than has

been the history of Hinduism and Buddhism. এর ভাবার্থ হোলো, যেহেতু খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেছে যে ঈশ্বর একবারই মাত্র মানবদেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন সেই হেতু খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে ধর্ম্মমতের অনৈক্য নিয়ে হানাহানির দৃষ্টান্ত এত প্রচুর, বিধর্ম্মীর প্রতি নৃশংস আচরণ এত বেশী। এত হানাহানির দৃষ্টান্ত আমরা হিন্দুধর্ম্মের অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে পাইনে।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুদারতাই যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে এত অসহিষ্ণু করেছে এই মতই হাক্সলি পোষণ করেন। হিন্দুরা অথবা মহাযানী বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর যুগপ্রয়োজনে বারবার নরবপু গ্রহণ করেন। ভগবদ্গীতায় রয়েছে, যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই তখনই ঈশ্বর মানবদেহ নিয়ে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে সাধুগণকে পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের দমন ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। বৌদ্ধেরাও বলেন, বুদ্ধ বহুবার জন্ম নিয়েছেন। খ্রীষ্টানদের মত কিন্তু স্বতন্ত্র। খৃষ্টানদের মতে ঈশ্বরের অবতার যীশুখ্রীষ্ট ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দের বিশ্বাস, মহাকালের একটীমাত্র মুহূর্ত্তে ঈশ্বর আপনাকে প্রকটিত করেছেন প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে। তার আগেও ঈশ্বরের কোন অবতার নেই, পরেও নেই। এই রকমের ধর্ম্মমতকে অন্তরের মধ্যে পোষণ করে যারা তারা তো অন্য ধর্ম্মমতকে নিকৃষ্ট ব'লে মনে করবেই। তারা তো বলবেই, মানুষের মুক্তি সম্ভব শুধু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, আর কারও মধ্য দিয়ে নয়। যারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার ব'লে স্বীকার করেনি তারা খ্রীষ্টানদের চোখে দুর্ভাগা ব'লে প্রতিভাত হয়েছে, অপরাধী ব'লেও। তারা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হস্তে অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করেছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা পৃথিবীর তথাকথিত অনুন্নত জাতিগুলিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের ভুজচ্ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তা' শিক্ষিতসমাজে অবিদিত নেই। হিন্দুরা অথবা বৌদ্ধেরা যেহেতু ঈশ্বরের বহু অবতারে বিশ্বাসী সেই হেতু তারা বলে, খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ নিজের নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসে থেকে সকলেরই মুক্তি আছে।

প্রাচ্যের এই উদারতার প্রশংসা ক'রে হাক্সলি লিখ্ছেন: but because they have not believed in an exclusive revelation at one sole instant of time, or in the quasi-divinity of an ecclesiastical organisation, oriental peoples have kept remarkably clear of the mass murder for religion's sake, which has been so dreadfully frequent in Christendom. এর ভাবার্থ হচ্ছে: যেহেতু প্রাচ্যের লোকেরা ঈশ্বরের এক অবতারে বিশ্বাসী নয় সেই হেতু ধর্ম্মের জন্য ব্যাপকভাবে মানুষ মারার নৃশংসতা থেকে তারা আশ্চর্য্যভাবে আপনাদিগকে মুক্ত রেখেছে। কিন্তু এই মানুষ মারার (ধর্ম্মের জন্য) ব্যাপারটা খ্রীষ্টানদের দেশে বারে বারে সংঘটিত হয়েছে।

আমার তরুণ বন্ধুটী প্রাচ্যের ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে কোন কিছুই ভাল দেখতে পান না। খ্রীষ্টধর্ম্ম বলতে তিনি কিন্তু অজ্ঞান। আজও ঘরের ঠাকুরকে ফেলে বিদেশের কুকুর পূজা করবার সর্ব্বনেশে মোহ থেকে আমাদের তরুণদের মন মুক্ত হতে পারেনি। খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রতি আমার মনে কোন অবজ্ঞার ভাব নেই; কিন্তু যাঁরা হিন্দুধর্ম্মকে খ্রীষ্টানধর্ম্মের তুলনায় নিকৃষ্ট ব'লে মনে করেন, যাঁরা প্রতিবেশীর ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না তাঁরা আমার কাছে কৃপারই পাত্র। কমিউনিষ্টদিগকেও আমি যে কৃপার

পাত্র ব'লে মনে করি সেও তাদের পরানুকরণ-প্রিয়তার জন্য। তাদের মতে ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির মধ্যে শ্রদ্ধা করবার কিছু নেই। শ্রদ্ধা যা কিছু আছে তা শুধু পাওয়া যাবে মার্ক্সের মতবাদে। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টরা জড়বাদের পূজারী, অধ্যাত্মবাদের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে, আত্মার কথা তাদের কাছে অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। এরা আর একরকমের গোঁড়া পাদ্রী, জড়বাদের পাদ্রী।

আমার তরুণ বন্ধুটী যত অধোগতির নমুনা শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যে দেখেছেন। এর কারণ নাকি পৌত্তলিকতা। খ্রীষ্টানদের দেশে ধর্ম্মমত নিয়ে কিরকম বর্ব্বরতা চলেছে, কত রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তার সম্পর্কে চোখ বন্ধ ক'রে রাখা উচিত নয়। আর খ্রীষ্টানদের নৃশংসতার মূলে খ্রীষ্টীয় মতবাদের অনুদারতা—এতে কি কোন সন্দেহ আছে? হাক্স্লি বলেছেন, প্রাচ্যের অধিবাসীদের চেয়ে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে উন্নত এমন ধারণা পোষণ করবারও কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরা তো প্রতিমাপূজা করে না। প্রতিমাপূজাই যদি মানুষের নৈতিক অধোগতির কারণ হয় তবে নিরাকার ঈশ্বরের পূজারী খ্রীষ্টান পাশ্চাত্যের নৈতিক চরিত্র সাকারবাদী হিন্দুসমাজের তুলনায় অনেক উন্নত হওয়া উচিত ছিল।

প্রতিমাপূজা সম্পর্কে হাক্স্লির মত হ'চ্ছে: What the poet and the painter see, and try to record for us, is actually there, waiting to be apprehended by any one who has the right kind of faculties. Similarly, in the image or the sacramental object the divine Ground is wholly present. এর ভাবার্থ হ'চ্ছে, কবি অথবা শিল্পী যা দেখেন এবং আমাদের জন্য রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন তা অবাস্তব নয়। যার শিল্পীর অনুভূতি আছে সে কবির আর চিত্রকরের অনুভূতির বিষয়কে সত্য বলেই জানে। তেমনি প্রতিমা সম্পর্কেও। প্রতিমাতেও ঈশ্বর পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। হাক্স্লি বলছেন, Knowledge is a function of being. আমরা যে স্তরের মানুষ আমাদের জ্ঞানও হবে সেই স্তরের। কথা-মালা-পড়া দশবৎসরের ছেলের কাছে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনেক কবিতা অর্থহীন হেঁয়ালি মাত্র। ঐ ছেলেই বড়ো হ'য়ে সংস্কৃতির একটা বিশেষ স্তরে উঠলে গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখেছেন। তাঁর কবির দৃষ্টি ছিল ব'লেই জলে স্থলে ফুলে ফলে একই অপার্থিব নিত্য সত্তার বিচিত্র প্রকাশ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। যার সে দৃষ্টি নেই তার কাছে গাছ শুধু গাছ মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তেমনি প্রতিমাতে ঈশ্বরদর্শন যদি সকলের পক্ষে সম্ভব না হয়—সে প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরের অভাবের জন্য নয়। যাঁর পরমহংসদেবের জ্ঞানের চোখ আছে তিনি প্রতিমার মধ্যে ঠিকই ঈশ্বর দর্শন করবেন। সুতরাং প্রতিমাপূজার প্রতি অবিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিছু নেই। প্রতিমা পূজার প্রতি ঘৃণাও একরকমের গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। হাক্স্লি বলছেন: All that need be said here is that the iconoclast's contempt for sacraments and symbols, as being nothing but mummery with stocks and stones, is quite unjustified. (The Perennial Philosophy : P. 73). এর ভাবার্থ হচ্ছে, কালাপাহাড়দের প্রতিমার প্রতি বিতৃষ্ণা, প্রতিমা পূজাকে প্রহসন ব'লে উপেক্ষা যুক্তির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

ব্রহ্মচারী শ্রীধর চৈতন্য

(১)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক গগনে যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হইয়াছিল, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য হিসাবে স্বামী অদ্বৈতানন্দ বরাহনগর মঠে সর্ব্বপ্রথম যোগদান করেন[১]। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য যুবক সেবকবৃন্দ, যাঁহারা তাঁহার মহাসমাধির পর কাশীপুর উদ্যান হইতে অনন্যোপায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন বা যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহারা অদ্বৈতানন্দ মহারাজের পথ অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ত্যাগ ও আত্মানুভূতির জ্বলন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং গুরুসেবাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা কাশীপুরে তাঁহার প্রেম-পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক ভালবাসা, ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে তাঁহাদের মধ্যে 'বিভেদ ভুলাল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'। এক মনপ্রাণ হইয়া তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকারে যত্নপর হইলেন। পর্য্যায়ক্রমে গুরুসেবার সহিত ধ্যান-ধারণাও সমানতালে চলিতে লাগিল। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এই কাশীপুরে অনেকের ভাব সমাধি এবং ইষ্টসাক্ষাৎকার প্রভৃতি দুর্লভ দর্শন হইয়াছিল। সেবকেরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাপ্রস্থানের আয়োজন করিতেছেন— অনতিবিলম্বে সে সময় একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে তাঁহাদের অবস্থা কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় হইল। ইহার কিছু পরে কাশীপুরের ভাড়াটিয়া বাগান বাড়ী গৃহী ভক্তদের নির্দ্দেশানুযায়ী তুলিয়া দেওয়া হইলে ত্যাগব্রতী যুবকবৃন্দের কর্ম্মপন্থা এবং জীবনযাত্রা এক প্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র[২] তাঁহার বদান্যতায় রামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের মধ্যে সবিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীগুরুর অদর্শন জনিত দুঃখে ব্যথিত হইয়া তিনিও একটি 'জুড়াইবার আড্ডা' করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার মনোবাসনাকে রূপদান করিতে যত্নপর হইলেন।

ত্যাগী ভক্তদের নেতা নরেন্দ্রকে তিনি আসিয়া

১ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তারক (স্বামী শিবানন্দ) গৃহে ফিরিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই গোপাল ও তারক গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট রহিয়া গেলেন। লাটু প্রথমে ভৃত্য হিসাবে আসিয়াছিলেন পরে তিনিও ফিরিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তারকও লাটু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। গোপালকে লইয়া প্রথম মঠ স্থাপিত হইল। পরে নরেন্দ্রনাথের তার পাইয়া তারকও আসিয়া যোগদান করিলেন।—লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ (পরিশিষ্ট)।

২ ইঁহার প্রকৃত নাম সুরেশচন্দ্র মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'সুরেন্দর' বলিয়া ডাকিতেন, তদবধি তিনি 'সুরেন্দ্র' বলিয়া ভক্তদের মধ্যে পরিচিত।

সব নিবেদন করিলেন এবং মঠ স্থাপনের জন্ম একটি বাড়ী খুঁজিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বরাহনগরে টাকির মুন্সীবাবুদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ী ছিল। উহা অতিশয় জীর্ণ এবং সাপ ও শৃগালের আবাসে পরিণত হইয়াছিল। ভূতুড়ে বাড়ী বলিয়া কেহই ঐ বাড়ী ভাড়া লইত না। ঐ বাড়ীখানি ১১৲ টাকায় ভাড়া করা হইল[৩]। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই গৃহে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়।

দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে অবস্থান কালে শ্রীযুত সুরেন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীকে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি ঐ টাকা তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের ভরণ-পোষণে ব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। মঠ স্থাপনের প্রথম অবস্থায় তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। বাড়ীভাড়া এবং পাচককে ৬৲ টাকা বেতন দিয়া বাকী টাকা মঠবাসীদের জন্ম ব্যয়িত হইত। পরে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ টাকা দ্বিগুণ করিলেন। পরে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য করিতেন। এই স্থানে ত্যাগী ভক্তেরা একত্রিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আদর্শাবলম্বনে নিজ নিজ জীবন গঠনে তৎপর হইলেন।

কাশীপুরের বাগানবাড়ী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বলরামবাবুর বাড়ীতে নীত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় বরাহনগরে আনীত এবং মঠের একটি গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইল। শশী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় যেমন তন্ময় হইয়া সেবা করিতেন তেমনই এইস্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকাশ অনুভব করিয়া সেবা-পূজায় নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য সকলেও মনে করিতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন। উহা একদিনকার ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। একদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহার দেবমানব চরিত্রের অনুধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলিলেন, "যাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদিত হইবে তাহা যেন সযত্নে রক্ষিত হয়।" অদ্বৈতানন্দজী ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দজীর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, "কাশীপুরে অবস্থান কালে আমি একদিন তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের উপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলায় তাহা তিনি খাইতে পারিলেন না।" জীবিতাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা খাইতেন বা খাইতে পারিতেন না, এবং যে সব বিষয়ে তাঁহার পরিতুষ্টি দেখা যাইত, মঠবাসীরা সাধ্যানুসারে তাহা পরিপালন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এই বরাহনগর মঠে গুরুসেবাকে কেন্দ্র করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ত্যাগ, তপস্যা ও সেবাব্রতের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা কালে মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া আজ বহু সংসারক্লিষ্ট নরনারীকে শান্তির শীতল ছায়া প্রদান করিতেছে।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ সংসারাশ্রমে গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোবর্দ্ধন ঘোষ। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে (ভাদ্র মাসের অঘোর চতুর্দ্দশীতে) তিনি ২৪ পরগনা জেলার জগদ্দল নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। কাজকর্ম্মের জন্ম তিনি পরে কলিকাতার তিন মাইল উত্তরে সিঁথি নামক পল্লীতে বাস করিতেন এবং ব্রাহ্মভক্ত বেণীমাধব পালের অধীনে তাঁহার চীনাবাজারের দোকানে কাজ করিতেন। তিনি জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন[৪]।

৩ মতান্তরে ১০৲ টাকা। (Life of Swami Vivekananda, Vol. I : Advaita Ashrama, P. 188)

৪ শ্রীযুত গোপালের প্রকৃত নাম ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নানা পুস্তকে মতভেদ দেখা যায়; উহাদের একটি সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সব মতই উদ্ধৃত করা হইতেছে—

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল সিঁথিতে বাস করিতেন। প্রতিবৎসর ব্রাহ্মসমাজের শারদীয় ও বসন্তোৎসব তাঁহার বাগান বাড়ীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁহার গৃহে আসিতেন ও কীর্ত্তনানন্দে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। সিঁথিতে অবস্থানকালে সম্ভবতঃ গোপাল বেণীমাধবের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। নতুবা এই দর্শন তাঁহার জীবনে কোন রেখাপাত করে নাই। পরে তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার বিবরণ আমরা দেখিতে পাই।

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"—ত্রিতাপে তাপিত জীবের মনে যখন দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তির প্রশ্ন জাগে তখন তাহাকে ধর্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করে। সত্যসন্ধানের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। দুঃখের কঠিন স্পর্শ গোপাল অনুভব করিলেন তাঁহার পত্নীবিয়োগে। গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনি প্রকৃত শান্তির পথ নির্দ্ধারণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। মহেন্দ্র পাল নামে তাঁহার জনৈক কবিরাজ বন্ধু ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন। বন্ধুর শোকে ব্যথিত হইয়া তিনি গোপালকে একবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট একদিন উপস্থিত হইলেন। ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ কি এপ্রিল মাসে হইবে। অন্যান্য শিষ্যদের সহিত প্রথম দর্শনেই যেমন তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিত,—তেমনই আবার গোপালের সহিত তিনি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে তিনি এমন কিছু অত্যাশ্চর্য্য দেখিতে পাইলেন না

(ক) 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'; অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী হইতে মুদ্রিত 'Life of Sri Ramakrishna' এবং 'Disciples of Sri Ramakrishna' গ্রন্থ প্রভৃতিতে তিনি 'গোপাল শূর' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। আবার ভগিনী দেবমাতার 'Sri Ramakrishna and His Disciples' নামক পুস্তকে তিনি 'গোপাল সেন' এই নামে কথিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে যে দানপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে গোপালকে—'গোপালচন্দ্র ঘোষ' নামে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শেষোক্ত মতটী আমরা প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ বলেন—"গোপালদার পদবী আমি 'শূর' বলেই জানতুম। তবে 'ট্রাষ্টডিডে' যদি 'ঘোষ' থাকে তাহ'লে সেইটেই গ্রাহ্য। আদালতের কাগজ, ওতে ভুল হতে পারে না।"

(খ) 'Life of Sri Ramakrishna' এবং 'Disciples of Sri Ramakrishna' গ্রন্থে তাঁহাকে যথাক্রমে 'কাগজ ব্যবসায়ী' ও 'বেণীপালের কর্ম্মচারী' রূপে দেখিতে পাই। ভগিনী দেবমাতার পুস্তকে তিনি 'বস্ত্রব্যবসায়ী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া আমাদের বলিতে হয় তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই সব কাজ করিতেন।

(গ) 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' তিন জন গোপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—'সিঁথির গোপাল' বা 'বুড়ো গোপাল' (যিনি আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য) একই ব্যক্তি। ঠাকুর ইঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' বলিয়া ডাকিতেন। দ্বিতীয়—'ছোট গোপাল'; ইঁহার নামও গোপালচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর ইঁহাকে 'হুটকো গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। তৃতীয়—'গোপাল সেন,' বাড়ী বরাহনগরে। তাঁহার এত ভাবসমাধি হইত যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে হইত। সংসার, তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইত। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবার কিছুদিন পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

যাহা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে বা যাহাতে তাঁহার শোকাবেগ মন্দীভূত হইতে পারে। সে কারণে তাঁহার আর যাইবার ইচ্ছা হইল না। 'কিন্তু সাধুসজ্জনেরা প্রথম দর্শনে আত্মপ্রকাশ নাও করিতে পারেন' এই কথা বুঝাইয়া তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাইতে বলিলেন। এইরূপে পৌনঃপুন্যের দ্বারা পরিচয় জন্মিলে তাহা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হইল। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার অমৃতময়ী বাণীতে তিনি সংসারের অনিত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া শোকের হাত হইতে মুক্ত হইলেন। চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুসেবায় মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

গোপাল বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন; তাই ঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' বলিয়া ডাকিতেন। গুরু হইয়াও বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যকে তিনি সর্ব্বদাই সম্মান দেখাইতেন। কার্য্যদক্ষতা ও সুশৃঙ্খলতার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে খুবই প্রশংসা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সাক্ষ্য দেয়, আধ্যাত্মিকতার উন্নতশীর্ষে আরোহণ করিলে লোকব্যবহারে ও কর্ম্মকুশলতায় মানুষের জীবনে এতটুকুও ব্যত্যয় দেখা যায় না। কিন্তু, সাধারণের ধারণা ইহার বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের অনাড়ম্বর জীবনযাপনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের সকলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। কোন জিনিষ লইয়া যথাস্থানে না রাখিলেই তাহা তাঁহাদের বিরক্তির কারণ হইত। পূর্ণত্বকে লাভ করিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেমন মানুষের অপ্রতিহত গতি জন্মে তেমনই জাগতিক কার্য্যেও তাহার কোন অপূর্ণতা দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যটির চরিত্রে সুচারুতা, সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলতা যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

দেবতার সন্ধানে

শ্রীপরিমলবিকাশ বিশ্বাস, বি-এস্‌সি

দেউলে তোমার সন্ধ্যার দীপ কত না দিয়েছি জ্বেলে।
তবু, তুমি মোরে, দেবতা আমার, চাহিলে না চোখ তুলে?
নিভে আসে ঐ প্রদীপের শিখা, ঘনায় অন্ধকার,
ব্যর্থ হবে কি তবে রে আমার শেষের এ অভিসার?
খুঁজিতে তোমারে চাহিনিক পথ,
পূজিতে তোমারে বরেছি বিপদ,
তবু, তুমি মোরে চাহিলে না প্রিয়, আঁখিটি খুলে?
দেউলে তোমার সন্ধ্যার দীপ কত না দিয়েছি জ্বেলে।

সন্ধ্যা ঘনায় মন্দির দ্বারে এলো বলে কালোরাতি,
আঁধারে তোমারে কাছে পাবো বলে নিবায়ে পূজার বাতি।
তিমিরের কোলে একেলা কাটাই প্রাণের দেবতা পেতে,
কোথায় দেবতা? আঁধারের বানে কোথা যে গিয়েছে যেতে।

উচাটন মন হল রে চপল,
সাধনা কি তবে হবে রে বিফল?
কান পেতে রই, অশোনা বাণীর ঝঙ্কার যদি পাই,
পবনের ডাকে শিউরে তাকাই, কেউ ত কোথাও নাই?

সহসা কে যেন চকিতে কহিল, "কে তুই খুঁজিস মোরে?
আমি যে রে হেথা পড়ে আছি হায়, তোর প্রতি অণু জুড়ে।"
শিহরি পুলকে উঠিনু চমকি, একি বাণী আজি শুনি!
আমাতেই জুড়ে রয়েছে আমারি জীবন-সাধন-মণি?
সন্দ আবেশে নিজেরে তাকাই,
দেবতা রে মোর কোথা আছ হায়?
নিজেরে হেরিতে পাইনু দেবতা বিরাট রূপের মূলে,
আমাকেই জুড়ে আছে রে দেবতা, খুঁজিনু বাহিরে ভুলে।

ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পদ্ধতি

শ্রীমতী নীলিমা দেবী, বি-এ, এল্-টি

আধুনিক শিক্ষা

শিক্ষাই দেশের প্রাণ—শিক্ষাই দেশের যুবকগণের মধ্যে সকল প্রকারে প্রাণ-স্পন্দন আনয়ন করে এবং যথার্থ শিক্ষার দ্বারাই দেশ সর্বতোভাবে উন্নত হয়। শিক্ষার অভাবে কোন দেশ অগ্রগতি প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং প্রতিভাসম্ভূত কোনরূপ অবদানও জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হয় না। বহুমুখী শিক্ষার ফলেই পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ এত উন্নত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ বর্ত্তমান কালানুযায়ী শিক্ষার অভাবেই জগতের অন্যান্য দেশ-সমূহ হইতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

শিক্ষার দুই প্রকার শ্রেণিবিভাগ দেখা যায়। প্রথম প্রকারের শিক্ষার প্রচার ও প্রাপ্তি দ্বারা শিক্ষালাভের সঙ্গে দেশের যুবকগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষা দ্বারা বিদ্যার্থিগণ গ্রন্থ বিশেষের ভাষা ও ভাবার্থ মুখস্থ করিয়া কেবল বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের শিক্ষা-প্রথার প্রচলনের জন্যই ভারতবর্ষে আজ বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার

চাকুরীই ভারতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য দেখিয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বর্ত্তমান শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবংবিধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ডক্টর গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডক্টর গুরুদাস ব্যানার্জ্জী ও শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় যে শিক্ষা প্রণালীসম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। ডক্টর সীতারামিয়া তাঁহাদের এই শিক্ষার নব-বিধানসমূহের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহু দিন ধরিয়া মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রিকায় শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে স্বীয় পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্দ্ধায় একটী 'সম্মেলন' হয়। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে ভারতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং কংগ্রেস-শাসিত সাতটী প্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

'ওয়ার্দ্ধা সম্মেলনে' গৃহীত প্রস্তাব

মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির নব-বিধানের পর্য্যালোচনা ও বিচার করাই এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আলোচনার পরে এই অধিবেশনে তাঁহারা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত-চতুষ্টয়ে উপনীত হইলেন :

(১) এই সম্মেলনের মতানুসারে ভারতের সকল প্রদেশের বালক-বালিকাগণকে সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনা মাহিনায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(২) শিক্ষা প্রদানের বাহন (Medium of Education) মাতৃভাষা হইবে।

(৩) সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রধানতঃ হাতের কাজ অবলম্বনে দেওয়া হইবে এবং উহা যতদুর সম্ভব বিদ্যার্থীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুসরণে দিতে হইবে। হাতের কাজের মধ্যে কৃষি, সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) এই পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার প্রবর্ত্তনে বিদ্যার্থিগণই অধ্যাপকের বেতন দিতে পারিবে এবং পিতা-মাতাদিগকে পুত্র-কন্যাদিগের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কারণ, শিক্ষার্থিগণ যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করিবে উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতেই অধ্যাপকের বেতন দিতে পারিবে।

এই সম্মেলনে দশজন সভ্য লইয়া একটী 'কার্য্যকরী সমিতি' গঠিত হয়। এই 'কার্য্যকরী সমিতি'কে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁহারা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত-চতুষ্টয়ের অনুসরণে একটি Syllabus (পাঠ্য পুস্তকাদির তালিকা) প্রণয়ন করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণী ও ঐ পাঠ্য-ক্রমাদির পরিকল্পনা এক মাস সময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

নব-পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির রূপ-রেখা

এই 'কার্য্যকরী সমিতি'র পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা ও কার্য্যক্রম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) বিদ্যার্থীকে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা-প্রণালীতে এমন উপায় অবলম্বিত হইবে, যাহাতে বিদ্যার্থী স্বীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিষয়-সমূহেরও সম্যক্ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে।

(২) এই শিক্ষার প্রবর্ত্তনে বিদ্যার্থিগণ কর্ম্মশীলতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে। যেহেতু স্বহস্তে কিছু প্রস্তুত করিতে থাকিলে তাহারা পরিশ্রম ও উদ্যোগশীলতার মূল্য বুঝিতে পারিবে।

(৩) শিক্ষা-পদ্ধতির এই নবপরিকল্পনার প্রবর্ত্তনে বিদ্যার্থিগণ পরিশ্রমী ও সহনশীল হইতে শিখিবে।

(৪) এই শিক্ষা বিদ্যার্থীর দৈনন্দিন জীবনা-চরণের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে একরূপতা প্রাপ্ত হইবে।

(৫) এই শিক্ষালাভে প্রথম হইতে বিদ্যার্থি-গণ আত্ম-ভরণপোষণোপযোগী হইতে পারিবে

নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য-ক্রম

এই পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যার্থি-গণের 'নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য-ক্রম' এইরূপ হইবে :

(১) প্রত্যহ ৫½ ঘণ্টা, কমপক্ষে অন্ততঃ ৩½ ঘণ্টা বিদ্যার্থিগণকে হাতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা হইবে।

(২) এই শিক্ষা সাত বৎসর বয়স হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

(৩) বিদ্যার্থিগণকে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের মাতৃভাষায় পড়ান হইবে। যাঁহারা 'ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা' করিয়াছেন তাঁহারা 'হিন্দুস্তানী'[১] ভাষাকেই আন্তরাষ্ট্রীয় ভাষা[২] (Lingua Franca) করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১ 'সংস্কৃত'-মূলক হিন্দী ও আরবী ফারসী প্রধান 'উর্দ্দুর' সংমিশ্রণে প্রচলিত ভাষার নাম 'হিন্দুস্তানী' রাখা হইয়াছে।

২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় আন্তরাষ্ট্রীয় ভাষার বর্ণমালায় 'রোমান' অক্ষর (যে অক্ষরে ইংরেজী আদি ইউরোপীয় ভাষাগুলি লেখা হয়) প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষপাতী। কারণ, এই অক্ষর ভারতের সকল প্রদেশের ইংরাজী শিক্ষিত

(৪) বিদ্যার্থিগণকে এমন ভাবে শিক্ষিত করা হইবে, যাহাতে তাহারা জনসমাজের আদর্শ হইতে পারেন।

(৫) বিদ্যার্থিগণের শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ থাকিবে।

(৬) শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই কোনও না কোনও প্রকার ক্রিয়াশীলতা বা কার্য্যকারিতা থাকিবে।

ওয়ার্দ্ধায় পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধীর পৌরোহিত্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্দ্ধায় আহূত বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণের সম্মেলনে পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

(১) এই পরিকল্পনার মধ্যে কোনও মৌলিকতা নাই; কেন না, ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বেই 'পেষ্টালজী' (Pestalozzi) কোনও রূপ ক্রিয়াশীলতা বা হাতে নাতে কাজ সহায়ে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

(২) কলাবিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্যতম রূপে গ্রহণের পরিকল্পনাও নূতন নহে। কারণ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকায় স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে কলা-বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। 'সীজেক' (Cizek) নামে একজন নরওয়েনিবাসী শিল্পী স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে কলা-বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন বা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনার মধ্যে এবিষয়ে কোনও বিশেষ মৌলিকতা নাই।

(৩) এই পরিকল্পনায় স্কুলের সময় অসমঞ্জস রাখা হইয়াছে। কারণ, ইহাতে কম পক্ষে তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় কেবল হাতের কাজের জন্য নির্দ্ধারিত আছে। ফলে ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনাকারিগণ স্কুলের পঠন-পাঠনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

(৪) ওয়ার্দ্ধায় নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তকাবলীর (curriculum) সঙ্গে ইদানীন্তন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হাই স্কুলের পাঠ্যপুস্তকাবলীর অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।[৩]

(৫) এই পরিকল্পনায় ধর্ম্মকে শিক্ষণীয়রূপে গ্রহণ করা হয় নাই।

(৬) ইহাতে ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করা হইয়াছে।[৪]

(৭) এই পরিকল্পনায় বিদ্যার্থিগণের শারীরিক ব্যায়াম-বিস্তারও অনাদর করা হইয়াছে। হাতের কাজকে বাধ্যতামূলক অবশ্যকরণীয় বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়া হইলে বিদ্যার্থিগণের ক্রীড়া বা চিত্তবিনোদনের খেয়াল কখনই থাকিতে পারে না। যে শারীরিক পরিশ্রমে ব্যায়াম বা

ব্যক্তিগণ জানেন। নাগরী বা উর্দ্দুর সকল প্রদেশে প্রচলন নাই। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী ও উর্দ্দুর সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত 'হিন্দুস্তানী'তে 'নাগরী' (আধুনিক হিন্দীভাষায় ব্যবহৃত অক্ষর) ও উর্দ্দু বর্ণমালার (আরবী ও ফারসী হইতে গৃহীত) অক্ষর রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

৩ যতদিন ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকাবলী ও শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততদিন এরূপ কিছু পরিবর্ত্তনের ফল বিশেষ বিজ্ঞাপিত কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের মতই নৈরাশ্যপূর্ণ ও অকার্যকরী হইবে।

৪ আমাদের মতে এখনও ইংরেজী ভাষা পরিত্যাগ করিবার সময় আসে নাই। ভারতের শিক্ষা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত আন্তঃ-প্রাদেশিক ও বহির্জ্জাতির সহিত মিলনের জন্য ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখনও ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা জানা থাকিলে পৃথিবীর সকল দেশে অক্লেশে পর্য্যটন করিয়া আসা যায় কিন্তু ভারতীয় কোনও ভাষা-অবলম্বনে এখনও পৃথিবী পর্য্যটন করা সম্ভব নহে।

ক্রীড়াসুলভ চিত্তবিনোদ হয় না, তাহাতে স্বাস্থ্য গঠনও হইতে পারে না। বিদ্যার্থিগণের শারীরিক ও আঙ্গিক সুগঠনের জন্য খেলাধূলা ও ব্যায়াম আদি অতি আবশ্যক।

যদিও সমালোচকের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী বা ওয়ার্দ্ধায় পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে মৌলিক নবীনতা কিছুই নাই, তবুও অনতিবিলম্বে এবংবিধ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষাজাত প্রচেষ্টার মধ্যে এক নূতনত্ব রহিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে শিক্ষার ফলে দেশবাসী দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয় এবং অবসর সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চায় দিন যাপন করিতে পারে। এবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বহু পূর্ব্বে বহু স্থানে নানা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

শতাধিক বর্ষ হইতে ভারতে প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"এ দেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুই জন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারী করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা কেরাণীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটীগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হল শিক্ষার পরিণাম!"

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি বিদ্যার্থিগণকে কেবল নিপুণ কেরানী তৈয়ার করিতেই সমর্থ হয়। এ শিক্ষার ফলে স্বীয় ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেরও সংস্থান হয় না; সুতরাং তাঁহারা পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যের—দেশ-সেবা, পরহিতকর কার্য্য বা ধর্ম্মচর্চ্চার—সময় ও সুযোগ পায় না। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"সংসারের ভারে উচ্চকর্ম্ম ও উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না,—পরার্থে সে আবার কি করবে?"

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"দেখতে পাচ্ছিস্ না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্ব্বাপেক্ষা তোদের পরস্পরের ভিতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থি-মজ্জা খেয়ে ফেলেছে।"

এই সকল দুঃখ-জনক পরিণামের মূলকারণ ভারতে জাতীয় শিক্ষার অভাব ও কেরানী-প্রস্তুতকারী বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও গ্রহণ। পরমুখাপেক্ষিতা দাসত্ব ও পরস্পরে ভেদ ও ঈর্ষাদি পরজাতীয় শিক্ষার কুফলবশতঃ হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে শিক্ষায় বিদ্যার্থী নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া স্বাধীন ভাবে দুই পয়সা অর্জ্জন করিতে পারে এবং নিজের, দশের ও দেশের কোনও রূপ উপকারে আসিতে পারে, এমন শিক্ষাই ভারতে প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষাদি সকল বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে সকল মৌলিক চিন্তাজাত কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে আজ দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নানারূপ নূতন তত্ত্ব ও পদ্ধতি শুনাইতেছেন। এ বিষয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজীকে একদিন বলিয়াছিলেন—

"আমার মনে হয়, আপনার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটী আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তা-প্রবাহ ছুটিয়াছে!—

কি জীব-সেবা, কি দেশ কল্যাণ-ব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চ্চা, কি ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে। আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে।"

এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে আমরা ইহা বলিতেছি না যে, ভারতীয় ইদানীন্তন মনীষিগণ অভিনব বা কার্য্যকরী উদ্ভব কিছুই করিতেছেন না। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই যে স্বামীজী ভারতে এক নবীন দেশাত্মবোধের জাগরণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-চর্চ্চা আদি সকল ক্ষেত্রেই এক অপূর্ব্ব নবীন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সূত্রাকারে যাহা দিয়া গিয়াছেন বা বীজরূপে যাহা বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ভাষ্যাকারে প্রচার বা অঙ্কুররূপে রক্ষণ ও বৃক্ষরূপে পরিবর্দ্ধনের জন্য বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতীয় মনীষিগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কেবল ওয়ার্দ্ধায় পরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনেই নহে, ভারতীয় কল্যাণকর সর্ব্ব ক্ষেত্রীয় সংস্কার প্রসঙ্গেই আমাদের দৃঢ় ধারণা ইহাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিগণের অনুমোদিত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে নবীন শিক্ষা-পদ্ধতি, নৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক বিধি-নিয়মাদির উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করিলেই ভারতের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে।*

* এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য আমাদের কোন দায়িত্ব নাই।—উঃ সঃ

প্রার্থনার উপকারিতা সম্বন্ধে কি তোমার সংশয় হয় ?*

শ্রীমতী শান্তি দেবী

ডাঃ লিভিংষ্টোন একবার একজন আফ্রিকা-বাসীর নিকট তুষারের বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলে সে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হাসিয়াছিল। আফ্রিকাবাসিগণ কখনও বরফ দেখে নাই। সেই জন্য তাহারা লিভিংষ্টোনের বক্তব্যের একটি শব্দও বিশ্বাস করিতে রাজী হয় নাই। এই পৃথিবীর লোক প্রার্থনার উপকারিতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয়াপন্ন; সেই কারণে বন্য আফ্রিকাবাসীর ন্যায় আমরাও এই জগতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যের বাহিরে কোন জিনিষ আছে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক।

* Reader's Digest-এর ১৯৪৪ সালের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত "Are you Sceptic About Prayer ?" প্রবন্ধের অনুবাদ।

একজন মনস্তত্ত্ববিৎ যুদ্ধসম্বন্ধীয় কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একপ্রকার বৈদ্যুতিক Dynamo বা আকর্ষণ-যন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের শক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া আমরা ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারি। আবার প্রার্থনার সাহায্যে এই শক্তির সহিত একাত্মতা স্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে এই অদৃশ্য শক্তি আমাদের জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। সেই রুচি সম্পূর্ণ নিজেদের।"

একজন বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎকে (Physicist) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে যদি তিনি একটী লৌহদণ্ডকে বাতাসে ভাসিতে দেখেন তবে তিনি ইহার কারণ কি বলিবেন?—তিনি বলিলেন—"কেন, আমাকে যদি এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয় তবে আমি বলিব যে ইহা কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে কোন একটীর ক্ষণস্থায়ী ব্যতিক্রম মাত্র।"

কিন্তু যখন একজন প্রধান প্রাণিতত্ত্ববিৎকে (Thomas Huxley) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি একটী লৌহখণ্ডকে বাতাসে ভাসিতে দেখি তবে আমি বলিব যে ইহা আমার অজানা কোনও একটী প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।"

আজকাল প্রার্থনা সম্বন্ধে অগণনীয় প্রমাণ-সমূহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আসিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে মানুষ প্রয়োজন সময়ে তাহার বাহিরে সেই শক্তির সাহায্য লইবেই লইবে। ইহা তখনই আশ্চর্য্য-জনক হয় যখনই আমরা ইহাকে আশ্চর্য্যরূপ ভাবি। এই প্রার্থনাকারী সৈন্য, নাবিক এবং বৈমানিকগণ কেবলমাত্র Washington-এর উদাহরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন, যিনি Valley Forge নামক তুষার অঞ্চলে নতজানু হইয়া ভগবানকে ব্যাকুলভাবে ডাকিয়াছিলেন ও তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং Lincoln যিনি সেই অসভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে প্রচার করিয়াছিলেন, "দৈব শক্তি ভিন্ন আমি সফলতা লাভ করিতে পারিব না এবং তাহার সাহায্যে আমি কখনও অকৃতকার্য্য হইব না।" পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নাই এবং অব্যক্ত এমন প্রেরণা নাই যাহাতে সেই অনন্ত শক্তির দিকে স্বতঃই ধাবিত না হয়।

যখন Mayor Allen Lindberg of Westfield, New Jersey একটী বোমারু বিমানের চালক ছিলেন তখন তিনি অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে সমুদ্রে নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং নিজের ও তাঁহার নয়জন বৈমানিকের জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের এমন এক সময় আসিয়াছিল যে একবিন্দু জল অথবা এক টুক্‌রা খাবার না পাইয়া আমরা রবারের তক্তা আশ্রয় করিয়া ভাসিতেছিলাম। আমাদের প্রধান বন্দুকধারী ডালাসের Albert Hermandez ভিন্ন সকলেই খুব ক্লান্ত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে সেই ছেলেটী প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল এবং সে এই বলিয়া আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দিল যে ভগবান্ তাহার ডাক শুনিয়াছেন এবং আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।"

উত্তপ্ত সূর্য্যের নিম্নে আসিতে আসিতে শুষ্ক ওষ্ঠে, স্ফীত ও জড়িত জিহ্বায় Hermandez, যখন উপাসনা-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন তখন অন্য লোকেরা সেই একই প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। তিনদিন পর রাত্রিসমাগমের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাহারা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাইল

এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটি অবিশ্বাস-যোগ্য এই দৃশ্য দেখিল যে নগ্ন মনুষ্যে পূর্ণ তিনটি নৌকা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের উদ্ধারকারিগণকে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী বলিয়া বোধ হইল। কয়েক শত মাইল দূরে কোনও দ্বীপের কালচর্ম্ম এবং কুঞ্চিত কেশযুক্ত ধীবর বলিয়া মনে হইল। তাহারা শিশুবার্গকে বলিয়াছিল যে গৃহে ফিরিয়া আসার দিন যখন তাহারা তাহাদের মাছ ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া ফিরিতেছিল সেই সময় এক অদ্ভুত প্রেরণা তাহাদের গতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং এই জন-মানবহীন দ্বীপের দিকে তাহারা যাত্রা করিল; সেই প্রবালস্তূপ হইতে তাহারা শিশুবার্গ এবং তাহার সঙ্গীদের দেখিতে পাইল। আত্যন্তিক বিপদের সময়েই মানুষের ভগবানকে ডাকিবার চরম সুযোগ।

John Flavel সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার সারাংশ বর্ণনা করিয়াছিলেন। এইরূপ অলৌকিক আধ্যাত্মিক ঘটনা তাহাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহারা কখনও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে নাই তাহাদের বিপদের সময়ে ভগবানের হস্ত তাহাদেরই জন্য প্রসারিত হইতে দেখিয়াছে। যত বড় বিপদই মানুষের সম্মুখীন হউক না কেন তাহাদের শক্তির বাহিরে ও উপরে ভগবানের অসীম শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে সমস্ত ভয় এবং সংশয় মানুষের মন হইতে দূর হইয়া যায়। যেমন Dr. Alexis Carrel একবার বলিয়াছেন—"প্রার্থনা যাহা আমাদের শক্তির মূল ও পূর্ণতার প্রধান সহায় তাহা নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।"

গীতামৃত—দশমবিন্দু

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতার দশম অধ্যায়ে বিয়াল্লিশটী শ্লোকে বিভূতিযোগ বিবৃত। পূর্বাধ্যায়ত্রয়ে ভগবানের সোপাধিক ও নিরুপাধিক তত্ত্ব এবং সবিশেষ ও নির্বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইলেও ভগবত্তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া শ্রীভগবান্ পুনরায় তাহা অর্জুনকে বলিতেছেন। অর্জুন স্বধর্মপালনে ও মহৎ-পরিচর্যায় সুনিপুণ এবং ভগবদ্বাক্য শ্রবণে পরমানন্দিত হন। সেইজন্য তাঁহার হিতকামনায় শ্রীভগবান পরম তত্ত্বকথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেছেন। তত্ত্বকথার বিশেষণ পরম শব্দটীর অর্থ শ্রীধরমতে পরমাত্মনিষ্ঠ এবং শঙ্করমতে নিরতিশয় বস্তুর প্রকাশক। একমাত্র ঈশ্বরই নিরতিশয় বস্তু; কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে অর্জুন বলিতেছেন, 'ঈশ্বরের সমান বা অত্যধিক বিশ্বে কিছুই নাই। আনন্দগিরিমতে ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ রূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সবিশেষ ধ্যানান্তর নির্বিশেষ ধ্যান সুগম হয়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ বা ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ ঈশ্বরের প্রভব বা প্রভাব অবগত নহেন। কারণ, তিনি সর্ব দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি কারণ। প্রভব শব্দের সাধারণ অর্থ উৎপত্তি কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ শ্রীধরমতে জন্মরহিত ঈশ্বরের নানা বিভূতিসহ আবির্ভাব এবং বলদেবমতে অনাদি দিব্যস্বরূপ ঈশ্বরের গুণ বিভূতিমান হইয়া অবতার রূপে

বিদ্যমান। মধুসূদন বলেন, ভগবান দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপাদক এবং বুদ্ধ্যাদির প্রবর্তক; তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই ঈশ্বর। যিনি অবতার পুরুষকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন মর্ত্যগণের মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হন। অবতার ও ঈশ্বর অভেদ। অবতারকে ঈশ্বররূপে জানিলেই ভক্ত নিষ্পাপ ও মুক্ত হন।

ঈশ্বর কেন সর্বলোকের মহেশ্বর তাহা চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন। অন্তঃকরণের সূক্ষ্মবিষয়ের বোধসামর্থ্য, আত্মাদি পদার্থের জ্ঞানে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষমা, সত্য, বাহেন্দ্রিয়-সংযম অন্তরিন্দ্রিয় উপশম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্ম-নিমিত্ত কীর্তি এবং অধর্ম-নিমিত্ত অকীর্তি—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্মানুসারে ঈশ্বর হইতে আগত হয়। উপরোক্ত সত্যের যে সংজ্ঞা শঙ্কর দিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। তিনি বলেন, 'যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় বা বস্তুর যে আত্মানুভব হয় তাহা পরবুদ্ধিতে সংক্রান্তির জন্য সেইরূপ উচ্চার্যমাণ বাক্যকে সত্য বলে। আনন্দগিরির মতে মুমুক্ষুগণের আরাধনের নিমিত্ত এই সকল বন্ধ-মোক্ষসাধন সোপাধিক বিভূতি বিবৃত হইয়াছে।

ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই সপ্তব্রাহ্মণ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—পুরাকালের এই চারিজন মহর্ষি; এবং স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি এই চতুর্দশ মনু ভগবানের শক্তিযুক্ত ও সংকল্পজাত। তাঁহাদিগেরই সন্তান সন্ততি ও শিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে ভূরাদি লোক সমূহের স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে।

ইঁহারা কিরূপে ঈশ্বরের সংকল্পজাত মানসপুত্র? এ সম্বন্ধে শ্রীধর বলেন 'সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর-উপহিত-চৈতন্য হিরণ্যগর্ভের সংকল্পমাত্রেই সৃষ্টি। মধুসূদন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ইঁহারা যোনিজ নহে, সংকল্পজাত। ভগবানের এই বিভূতি ও বিভূতি-সম্পাদন-সামর্থ্য যথার্থরূপে অবগত হইলেই সম্যক দর্শন লাভ হয়। ঈশ্বর জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এবং নিমিত্তরূপে তাঁহার যোগৈশ্বর্যসামর্থ্য এবং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদানরূপে তিনি সর্বাত্মক। গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তগণকে অভয় দিতেছেন যে, তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা এবং বৈভব জ্ঞাত হইলেই সম্যক্ দর্শনরূপ স্থৈর্য নিঃসংশয়ে লাভ হয়।

ঈশ্বর স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থল এবং সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ ঈশ্বর হইতেই স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহা জানিয়া ভাবযুক্ত বিবেকিগণ ঈশ্বরের ভজনা করেন। ভাবশব্দের অর্থ শঙ্করমতে পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ এবং শ্রীধরমতে প্রীতি। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই স্থলে অবতার তত্ত্বের একটী গূঢ়কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই জগতের উৎপত্তি-স্থল। অবতার সর্বদাই আমি শব্দটী পরব্রহ্মনির্দেশার্থ ব্যবহার করেন। তিনি সর্বদা পরব্রহ্মপদে আরূঢ় থাকেন।

যাঁহারা ঈশ্বরে সমগ্র মন অর্পণ করিয়াছেন ও যাঁহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঈশ্বরে উপসংহৃত তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানবলবীর্যাদিযুক্ত ঈশ্বরের কথাপ্রসঙ্গ করিয়া ও তদ্বিষয়ে পরস্পরকে বুঝাইয়া পরিতোষ ও রতিপ্রাপ্ত হন। মৎস্য যেমন জল ব্যতীত প্রাণধারণে অক্ষম, বা কলিযুগে অন্নগত প্রাণ মানুষ যেমন অন্ন ব্যতীত জীবন ধারণে অক্ষম তদ্রূপ ভক্তগণ যখন

শ্রীভগবানের অভাব সেইরূপ তীব্রভাবে অনুভব করেন তখনই তাঁহার ভক্তির উদয় হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, ঈশ্বরে যে রতি হয় তাহা রাগানুগা ভক্তির ফল; আর তাহাতে তৃপ্তি বৈধী ভক্তির ফল। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ-শ্রবণে বা কথনে ভক্ত যখন পরিতৃপ্ত হন তখন বৈধীভক্তি লাভ করেন। এই বৈধীভক্তি পরিপক্ক হইলে রাগানুগা ভক্তিতে পরিণত হয়।·

সেইরূপ সততযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজনকারী ভক্তকে শ্রীভগবান্ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগের সহায়ে ভক্ত ঈশ্বর প্রাপ্ত হন। শঙ্কর বুদ্ধিযোগের অর্থ সম্যক্‌দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধরমতে বুদ্ধিযোগের অর্থ বুদ্ধিরূপ যোগ অর্থাৎ উপায়। ভক্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে ঈশ্বর-কৃপায় যে সদুপায় উদ্ভাসিত হয় তাহার সাহায্যেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব। বলদেব ইহার ভাবার্থ পরিস্ফুট করিতে যাইয়া বলেন, কেবলমাত্র গুরূপদেশ দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান ও তাঁহার বিভূতি-পরিবৃত মহত্ত্ব প্রণিধান করা কখনই সম্ভবপর নহে। এইজন্য তাঁহার কৃপা একান্ত আবশ্যক। শ্রীভগবান্ সেইজন্য এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন যে তদ্‌গতপ্রাণ সাধককে তিনি অনুগ্রহপূর্বক ভগবদ্‌বোধানুকূল পরম বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই ভগবান তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানজনিত উজ্জ্বল বিবেকরূপ প্রদীপদ্বারা তাঁহাদের অবিবেকজ মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার নাশ করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—হে ভগবান, আপনি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আপনি নিজেও আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিতেছেন। ইহা অবতারত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবতার মায়া-মনুষ্য। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা তাঁহার অবতারত্ব অন্তরংগ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দেন। ভগবান্ মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেও তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণজ্ঞান সর্বদা জাগ্রত থাকে। ভগবান পরম ধাম। এই ধাম শব্দের অর্থ টীকাকারদের মতে আশ্রয় বা জ্যোতিঃ। শঙ্কর ধাম শব্দটি তেজ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আনন্দগিরি শঙ্করকৃত উপরোক্ত শব্দার্থের টীকায় বলেন, উক্ত অর্থে ধাম শব্দের স্থানবাচিত্ব ব্যাবর্তিত ও দেশাতীতত্ব প্রকটিত হইয়াছে। রামানুজাচার্য শঙ্কর ও আনন্দগিরির ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া অবতারকে জ্যোতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অবতার দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আবির্ভূত হন—ইহা দেবতাগণ জানেন না। তিনি অসুরদের নিগ্রহের জন্য অবতীর্ণ হন—তাহা অসুরগণও অবগত নহে। তাঁহার পরম স্বরূপ তিনিই জানেন; অপর কেহ জানে না। তিনি কৃপাপূর্বক তাহা ভক্তকে না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার উপায়ান্তর নাই। এইজন্য অর্জুন ভগবদ্রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা করিলেন, "হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, আপনি বাহ্যসাধন-নিরপেক্ষ। আপনি নিরতিশয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বলাদিশক্তিবিশিষ্ট এবং নিরুপাধিক। আপনি যে যে বিভূতিদ্বারা এই লোকসমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। হে যোগেশ্বর, কিরূপে আপনার চিন্তা করিলে আমি আপনাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আপনাকে আমি ধ্যান করিব? হে জনার্দন, আপনার সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য এবং ধ্যানাবলম্বন

বস্তুসমূহ আমাকে কৃপা করিয়া বিস্তৃতভাবে বলুন। কারণ, আপনার কথামৃত পান করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না; আমি আরও আপনার কথা আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। অর্জুনের ব্যাকুল প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবদ্-ধ্যানের অবলম্বন প্রধান প্রধান দিব্য বস্তুসমূহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন। অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক হইতে চল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবদ্‌বিভূতির বর্ণনা আছে। ধ্যানস্তিমিতনয়নে হৃদয়ে ভগবানের চিন্ময় মূর্তি ধ্যেয়। কিন্তু চিত্ত যখন বহির্মুখ হয় তখন বহির্জগতের নিম্নোক্ত বস্তুসমূহে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হয়। ভগবান প্রত্যগাত্মারূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সকল প্রাণীর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা। ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য বিদ্যমান। ভগবান এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু। বলদেব ও মধুসূদন মতে এখানে বিষ্ণু শব্দের অর্থ পঞ্চমাবতার বামনদেবও গ্রহণ করা যায়; কারণ, অবতারে ঈশ্বরের যোগৈশ্বর্যের বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং অবতারও ঈশ্বরের বিভূতিরূপে ধ্যেয়।

শ্রীমৎ নীলকণ্ঠসূরি প্রভৃতি টীকাকারগণ বিষ্ণুশব্দে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড মার্তণ্ড লক্ষিত বলিয়া মনে করেন। জ্যোতিষ্কগণ তমোনাশক ও বস্তু-প্রকাশক। সেই জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ দিবাকররূপে ধ্যেয়। আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ ও পরিবহাদি ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে ভগবান মরীচি এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে তিনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিযুক্ত শশী। চারি-বেদের মধ্যে তিনি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে তিনি ইন্দ্র। তিনি ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মন এবং প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত চেতনা। একাদশ রুদ্রের মধ্যে তিনি শঙ্কর; যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে তিনি ধনপতি কুবের। অষ্টবসুর মধ্যে তিনি অগ্নি এবং উচ্চশৃঙ্গযুক্ত পর্বতসকলের মধ্যে তিনি মেরু। পুরোহিতগণের মধ্যে তিনি বৃহস্পতি, সেনানায়কগণের মধ্যে তিনি দেবসেনা-পতি কার্তিকেয় এবং দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে তিনি সাগর। মহর্ষিগণের মধ্যে তিনি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে তিনি একাক্ষর ব্রহ্ম-বাচক ওঁকার, শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞসকলের মধ্যে তিনি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে তিনি হিমালয়। বৃক্ষসকলের মধ্যে তিনি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, এবং গন্ধর্বগণের মধ্যে তিনি চিত্ররথ। যে সকল মুনি আজন্ম অতিশয় ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি কপিল। অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমন্থনকালে উচ্চৈঃশ্রবা এবং ঐরাবত উদ্ভূত হইয়াছিল। অশ্বগণের মধ্যে তিনি উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা। অস্ত্রসমূহের মধ্যে তিনি দধীচির অস্থি-জাত বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, প্রাণিগণের প্রজননশক্তি কাম এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি। নাগগণের* মধ্যে তিনি নাগরাজ অনন্ত, জলদেবতাগণের মধ্যে তিনি রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে তিনি পিতৃরাজ অর্যমা এবং নিয়ামকগণের মধ্যে তিনি যম, দৈত্যগণের মধ্যে তিনি প্রহ্লাদ, সংখ্যাকারিগণের মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে পশুরাজ সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে বিনতাতনয় গরুড়। বেগবানদিগের মধ্যে তিনি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে তিনি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে তিনি মকর, এবং নদী-সমূহের মধ্যে তিনি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। তিনি আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসকলের কর্তা ঈশ্বর। সুতরাং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁহার বিভূতিরূপে

* নাগ নির্বিষ ও সর্প সবিষ।

ধ্যেয়। বিদ্যাসমূহের মধ্যে তিনি মোক্ষপ্রদ পরমার্থবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে তিনি বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য তর্ককে বাদ, পরপক্ষদূষণরূপ তর্ককে বিতণ্ডা এবং জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া আত্মপক্ষ স্থাপনরূপ তর্ককে জল্প বলে। তন্মধ্যে বাদ ভগবানের বিভূতিরূপে ধ্যেয়, অক্ষরসমূহের মধ্যে তিনি অকার। কারণ, শ্রুতিতে আছে "অকারো বৈ সর্ববাক্।" অকার ব্যতীত ব্যঞ্জন বর্ণমালার কোন বর্ণই উচ্চারিত হইতে পারে না। অপিচ ওঙ্কাররূপ শ্রেষ্ঠ অক্ষরের আদ্য অক্ষর অকার। সর্ববাঙ্ময়ত্ব-হেতু অকার ভগবদ্‌বিভূতিরূপে ধ্যেয়। ছয়টি সমাসের মধ্যে তিনি উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব। তিনি ক্ষণাদিরূপে প্রসিদ্ধ অক্ষীণকাল এবং সর্বকর্মফলের বিধানকর্তা। তিনি ধনাদিহারী বা প্রাণহারী মৃত্যু। উৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্য ভাবিকল্যাণসমূহের মধ্যে তিনি উৎকর্ষ ও তল্লাভের কারণ। তিনি নারীগণের মধ্যে ধর্মের সপ্তপত্নী—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। উক্তনারীগণের আভাসমাত্রযোগে প্রাণিগণ শ্লাঘ্য হয়।

মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার টীকায় সপ্ত নারীর মধ্যে কয়েকটীর এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্মনিমিত্ত প্রশস্ত নানাদিগ্‌দেশীয় লোকজ্ঞান-বিষয়ক খ্যাতিই কীর্তি। ধর্মার্থ-কাম সম্পৎ শরীর-শোভাই শ্রী। সর্বার্থপ্রকাশিকা সংস্কৃতা বাণীই বাক্। এইগুলি ঈশ্বরের বিভূতিরূপে ধ্যেয়।

ঈশ্বর সামসমূহের মধ্যে মোক্ষপ্রতিপাদক বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ এবং ষড় ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। মৃগশীর্ষ-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অগ্রহায়ণে থাকায় এই মাসের নাম মার্গশীর্ষ। 'ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে' এই গীয়মান ঋকে ইন্দ্রের সর্বেশ্বরত্ব স্তুত হওয়ায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। গায়ত্রী মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ জপ করেন। ইহা বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। এইগুলি ঈশ্বরের বিভূতি। ঈশ্বর ছলনা-কারিগণের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, উদ্যমকারিগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণ। তিনি যাদব-গণের মধ্যে অর্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস, এবং সূক্ষ্মার্থবিবেকিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য, তিনি শাসক-গণের দণ্ড, জিগীষুগণের নীতি, গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান। যাহা সর্ব-ভূতের বীজস্বরূপ তাহাও ঈশ্বর। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নাই যাহা ঈশ্বর ব্যতীত সত্তাবান্ হইতে পারে। সবই ঈশ্বরাত্মক। ঈশ্বরের দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতিসকল বর্ণনা করিলেন। যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী সেই সকলই ঐশ্বরশক্তির অংশসম্ভূত। সেই সেই বস্তুতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দর্শন করিতে হইবে। এইরূপে ভক্তের দৃষ্টি অন্তরে ও বাহিরে ঈশ্বরগত হয়। ঈশ্বরের বিভূতি পৃথক্‌ভাবে জানিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ, তিনি একপাদ মাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১২।৬) আছে, 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' ব্রহ্মের একপাদ সর্বভূতরূপে, বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত এবং ত্রিপাদ অব্যক্ত।

শ্রীধর স্বামীর উপসংহার-বাক্য এই। ইন্দ্রিয়-দ্বার দ্বারা বাহ্যবিষয়াকৃষ্টচিত্তে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার জন্য এই সকল বিভূতি বর্ণিত। বলদেব উপসংহারে বলেন, 'যাঁহার কণিকামাত্র শক্তিপ্রভাবে সূর্যাদি অতিমাত্র তেজঃসম্পন্ন হইয়াছেন, যিনি একাংশে এই বিরাট বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দশমাধ্যায়ে অর্চিত।' বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

প্রদত্ত বুদ্ধিদ্বারা এই বিশ্ব তিনি ধারণ করিয়া আছেন—এইরূপ জ্ঞানে তাঁহারই সেবা করিতে হইবে; এবং তাঁহারই মাধুর্য আস্বাদনীয়—ইহাই দশম অধ্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে। যামুন মুনি বলেন, 'ভক্তির উৎপত্তি বর্ধনের নিমিত্ত স্বকীয় অনন্ত কল্যাণ-গুণ এবং সর্ব বিষয়ে স্বকীয় স্বাধীন বুদ্ধির বিষয় বিস্তীর্ণরূপে দশমাধ্যায়ে কথিত হইল। ভগবদ্বিভূতি ধ্যান করিলে ভগবৎশক্তির জ্ঞান হয় এবং ভগবৎশক্তির জ্ঞান পরিপক্ব হইলে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হয়।

শ্রীভগবান ও তাঁহার বিভূতিসমূহে অভেদবুদ্ধি কর্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, বিভূতিসমূহে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইবে। কিরূপে তাহা করা উচিত সেই সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ইঙ্গিত নিম্নোক্ত ঘটনায় পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য অনেক সময় গঙ্গায় শৌচাদি কার্য করিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে এইকথা বলাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে কি গো! গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।' গুরুবাক্য শ্রবণে উক্ত শিষ্য আর কখনও ঐরূপ করিতেন না। গঙ্গাবারি ভগবদ্বিভূতি এবং ভগবানের একটি স্থূলরূপ। সকল বিভূতিকে ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান করিলে সর্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি দৃঢ় হইবে।

ধর্ম্ম বনাম বিজ্ঞান

শ্রীমণিরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম্মের সাথে বিজ্ঞানের কলহ আজকের নয়, বহুদিনের। তবে এটা গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল পাশ্চাত্য জগতে এবং তার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের লাঞ্ছনা বড় কম ভোগ করতে হয়নি।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম দুটী শাস্ত্রই সত্যের উপাসক—একটী ব্যবহারিক জগতের, অপরটী পারমার্থিক জগতের; সেই জন্যে দুটীর দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের নিয়ম শৃঙ্খল নিয়েই থাকে ব্যস্ত, আর ধর্ম্মশাস্ত্র তার ঊর্দ্ধে উঠে ব্যবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্ব বা প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলের সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ আলোচনার স্পর্দ্ধা রাখে। বিজ্ঞান-জগতে কাল্পনিক বস্তুর স্থান নেই। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যন্ত্রের সাহায্যেই সত্য উপলব্ধি করতে চায়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আরম্ভে বিজ্ঞান জড়জগতের নানা তথ্য আবিষ্কার করে বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে জনসাধারণের জন্য যে সব ভক্তিমূলক কাহিনী বা ভৌগোলিক বর্ণনা ছিল, সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণের অভাব দেখিয়ে সেগুলিকে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলেই সাধারণের কাছে প্রচার করেছিল। যেমন রাহুর চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করা, বাসুকির মাথা বদলান, কূর্ম্মের পিঠে পৃথিবীর অবস্থান, ছয়দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, মুসার লোহিতসাগরের জল দ্বিধা বিভক্ত করা ইত্যাদি। তারপর বিজ্ঞান যন্ত্রদানব সৃষ্টি করে নানা অসাধ্য সাধন দ্বারা যেন ভগবানের সিংহাসন পর্য্যন্ত দিয়েছিল কাঁপিয়ে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের বিজয়রথ মানবসমাজের সেবায় লেগে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতে গোঁড়া ধর্ম্মাচার্য্যেরা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি কোনদিনই মেনে নিতে পারেন নি,

উপরন্তু অমানুষিক লাঞ্ছনা করেছেন গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের, অবমাননা করেছেন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ থিওরীকে। বৈজ্ঞানিকরা দেশের তদানীন্তন ধর্ম্মের বাঁধন ছিঁড়ে স্বাধীন ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহ। এই জগৎ-যন্ত্রে ঈশ্বর নামে কোন অজ্ঞাত শক্তিকে একটী ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত দিতে তাঁরা হয়েছিলেন নারাজ। বৈজ্ঞানিক ল-প্লাস (La-Place) স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন, "ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন হয় নি।" ক্রমে ঈশ্বরবিদ্বেষী নাস্তিকবাদ পাশ্চাত্য-জগতের মনোরাজ্যে বেশ কিছু স্থান অধিকার করে বসল। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখে-কষ্টে, রোগে-শোকে বা ব্যর্থতায় কচিৎ একটা মহাশক্তির কাছে শান্তি প্রার্থনা করার বাসনা মনে জাগে কিন্তু বর্ত্তমান প্রগতিশীল চিন্তাধারা পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তিগত জীবন লোপ করে দিয়ে সমাজগত জীবন সুরু করে দিয়েছে—তার আদর্শ হল দেহ এবং দেহের ক্ষুধা মেটান। এই দুটীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নূতন চিন্তা-ধারা, নূতন সমাজ। সেখানে ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা প্রভৃতির চিন্তা হ'ল আফিমের মত মানুষকে পঙ্গু করবার জিনিষ।

বর্ত্তমানের এই পটভূমিকায় দেখা দিয়েছে নূতন আলো। বৈজ্ঞানিকদের সজাগ চির অনুসন্ধিৎসু মনে এসেছে নূতন অনুভূতি পারমার্থিক সত্তার—যেটী মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় কিন্তু বিচার-গম্য। বৈজ্ঞানিক মরিসন নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছেন, সাতটী কারণের জন্য বৈজ্ঞানিক-দের বিশ্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করতেই হবে। অবশ্য ভারতের কাছে তাঁর কথা বা কারণগুলি বিশেষ নূতন নয়, তবে বৈজ্ঞানিকদের নাস্তিকবাদের আসন হ'তে এহেন নির্ভীক উক্তিই হ'ল বড় বিস্ময়ের। তিনি বলেছেন—

(১) অঙ্কশাস্ত্র দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীটা অতি চতুর সৃজনী শক্তির দ্বারা সুকৌশলে পরিকল্পিত ও সৃষ্ট হয়েছে; এটা প্রকৃতির খেয়াল বা একটা হঠাৎ বিকাশ মাত্র নয়।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—পৃথিবী তার কক্ষে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ঘুরছে, যদি সে ঘণ্টায় শতমাইল বেগে ঘুরত, তা হ'লে দীর্ঘ-দিনগুলি গাছ-পালা পুড়িয়ে ফেলত আর দীর্ঘরাতে ঠাণ্ডায় সব জমে যেত। জীবনের উৎস সূর্য্যদেবের তাপ হ'ল ১২০০০ ফারেণহিট্ ডিগ্রী—পৃথিবী তা থেকে এমন মাপ করা দূরে আছে যাতে উত্তাপটা সৃষ্টিরক্ষারই কাজে লাগে। এই উত্তাপের অর্দ্ধেক কম পেলে সব ঠাণ্ডায় নষ্ট হয়ে যেত, আর অর্দ্ধেক বেশী পেলে সব পুড়ে ছাই হ'ত। পৃথিবী যে ২৩ ডিগ্রী হেলে আছে তার জন্যে ছয় ঋতু আসা যাওয়া করছে—যদি হেলে না থাকত তবে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে পৃথিবীর উপর জমে গিয়ে এটা হ'ত বরফের দেশ। চাঁদ যদি আমাদের থেকে ৫০ হাজার মাইল দূরে থাকত তা হ'লে দিনে দুবার জোয়ার এসে স্থলভাগ জলপ্লাবিত করে দিত। পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডল যদি আর একটু পাতলা হ'ত তা হ'লে চারদিক হতে জ্বলন্ত উল্কাপাত হয়ে পৃথিবীতে জ্বলতো নরকাগ্নি। এই ভাবের বহু প্রমাণ দিয়ে দেখান যেতে পারে যে এই গ্রহে জীবের বাস হঠাৎ একটা কিছু নয়—পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

(২) জীবনের পূর্ণবিকাশের ছন্দে ও গতিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তিনি বলেছেন জীবনটা যে কি কেউ (বিজ্ঞান?) জানে না—এর ওজনও নেই, আয়তনও নেই, আছে অসীম শক্তি। সামান্য গাছের শিকড় পাহাড় পর্য্যন্ত ফাটিয়ে দেয়। চতুর শিল্পী ফল-ফুল-লতা-পাতা, রূপ-রস-শব্দ-

গন্ধ-স্পর্শ সৃষ্টি করে তাঁর মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করছেন।

(৩) অসহায় ইতর জীবের স্বভাবজাত সংস্কার (instinct) সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পচাতুরীর আর একটা পরিচয়।

স্যামন মাছ অনন্ত সমুদ্রে বিচরণ করে, কিন্তু কোন্ অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে তারা উজান বেয়ে আবার ফিরে যায় শান্ত জলস্রোতে ক্ষুদ্র উপনদীতে তাদের জন্মস্থানে? বোল্‌তা ডিম পাড়বার আগে তার ভাবী সন্তানদের খাদ্যের জন্য একটী ফড়িংকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান করে পুঁতে রেখে তার পাশে ডিম পেড়ে মরে যায়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের মাঝে নানা রকমের সংস্কার-ধারা ঠিক একরকম ভাবেই যুগযুগান্তর ধরে চলে আসছে।

(৪) তিনি মানবজাতিকে ইতর জীবের জন্মগত সংস্কারের উপর দিয়েছেন বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা। পশু-জগতে বাঁশীর একটী সুর যেন সংস্কারের মাঝ দিয়ে বার বার বাজছে—কিন্তু মানব-সমাজে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্বে গড়ে উঠেছে বিরাট ইতিহাস, দেখা দিয়েছে বিভিন্ন চিন্তাধারা দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে। যেন নানা সুরের বিরাট জলসা বসেছে। বিজ্ঞানময় পুরুষের অনন্ত জ্ঞানের একটী স্ফুলিঙ্গের অধিকারী করেছেন মানব-সমাজকে।

(৫) জগতের সকল জীবের বংশ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার কি সুদূরপ্রসারী রহস্যময় প্রচেষ্টা! অনুবীক্ষণযন্ত্রে অদৃশ্য অতি সূক্ষ্মতম অণুবৎ জগতের সকল সৃষ্ট জীবের বীজ (genes) যা সারা বিশ্বের উদ্ভিদ, পশু ও মানবজাতি একত্রে করলে একটি ছোট আঙ্গুল পরিমিত স্থান (thimble) পূর্ণ হয় না, তার মাঝে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি ভাবে লুক্কায়িত থাকে তা বিজ্ঞানের হিসাবের বাহিরে। কার অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টিপ্রবাহের মাঝ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে?

(৬) প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলের মাঝে সাম্য রক্ষার কাজেও অসীম দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন অষ্ট্রেলিয়ায় বাগানে বেড়া দেবার জন্যে মনসা জাতীয় এক প্রকার গাছ ব্যবহার করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে সেই গাছগুলি ভীষণ ভাবে স্থলভাগে ছড়িয়ে পড়ল আর প্রায় ইংলণ্ডের আয়তনের মত স্থান অধিকার করে বসল বাঙ্গলা দেশের কচুরী-পানার মত। কিছুতেই সে গাছগুলিকে ধ্বংস করা গেল না। পরিশেষে কীটতত্ত্ববিদেরা একটী কীটের সন্ধান এনে দিল যারা মনসাগাছ খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে। সেই কীটের সাহায্যে আজ ঐ গাছগুলি সংযত রাখা হয়েছে। জগতের সর্ব্বত্রই নানাবিষয়ে সাম্য রক্ষার জন্য সুচিন্তিত অদৃশ্য ব্যবস্থা আছে।

(৭) মানুষের মনে পরম কারুণিক বুদ্ধিমান ও শক্তিমান ঈশ্বরের যে কল্পনা জাগে সেইটেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

খুবই আনন্দের বিষয় যে, যে বৈজ্ঞানিকরা একদিন সৃষ্টি মেনেছিলেন কিন্তু স্রষ্টাকে মানেন নি, এবং এই জগৎটী একটী অন্ধ জড়প্রকৃতির শক্তির বিকাশ বলে মনে করেছিলেন এখন তাঁরাই জগতের পারম্পরিক কার্য্যধারার মাঝে একটী প্রচ্ছন্ন সক্রিয় চৈতন্যময়ী শক্তির আভাস পেয়েছেন। *মরিসন * খুবই আশার কথা জানিয়েছেন—

"আমরা এখনও বৈজ্ঞানিক যুগের শৈশবাবস্থায়। জ্ঞানের আলোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পচাতুর্য্য আমাদের কাছে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠছে। ডারুইনের পর ৯০ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমরা বহু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছি এবং আমরা ক্রমেই বৈজ্ঞানিক নম্রতা ও বিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে জগদীশ্বরকে জানবার নিকটবর্ত্তী হতেছি।"

* A. Cressy Morrison—Former President of the New York Academy of Sciences.

যোগেশ্বর আদি নাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

নাথপন্থার অন্যতম গুরু আদি নাথ। ইনি নাথগুরু মীন নাথ মৎস্যেন্দ্র নাথের গুরু। জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর আদি নাথ। বৌদ্ধদের আদিগুরু আদি বুদ্ধ বা আদি নাথ। এই জন্য নাথ, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এখন বিচার করিতে হইবে ইঁহারা একই ব্যক্তি কি না? বৌদ্ধ ও জৈনেরা আদি নাথকে তাঁহাদের আদি গুরু বলিয়া থাকেন, কিন্তু নাথেরা নিরঞ্জন নিরাকারকে তাঁহাদের আদি গুরু বলেন। এই নিরঞ্জন নিরাকার নাথাচার্য আদি নাথ হইতে ষষ্ঠ পুরুষ উর্দ্ধে[১]। জৈন শাস্ত্রানুসারে আদি নাথের সময়নির্ণয় অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যাদ্বারা দুঃসাধ্য। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে আদি বুদ্ধ বা আদি নাথ সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর নাথদের আদি নাথের সময় ৫ম খৃষ্টাব্দ। ইনি নাথগুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ বা মীন নাথের গুরু। এই মীন নাথের সময় যে ৫ম খৃষ্টাব্দ তাহা আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছি[২]। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। এইজন্য বলিতেই হইবে ঐ তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক নহে। যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বৌদ্ধ ও জৈনগণও স্বীকার করেন। এবং এইখানেই এই তিন সম্প্রদায়ের বেশ মিল আছে। তবে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে জৈন ও বৌদ্ধেরা ছিলেন নিরীশ্বর এবং নাথেরা সেশ্বরবাদী। নাথেরা যোগের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদের সেশ্বর করার জন্য বহু যুগব্যাপী বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। একটি ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতে হইলে বা ধর্ম-সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইলে বিরুদ্ধধর্ম্মের মূল অংশগুলি গ্রহণ এবং তাহার অনেক ভাব অবলম্বন করিতে হয়। নাথেরা তাহাই করিয়াছিলেন। এর ফলেই নাথ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কোথাও কোথাও মিল দেখা যায়। জৈনদের সকল তীর্থঙ্করের উপাধি 'নাথ' কিন্তু বৌদ্ধদের তাহা নহে। নাথদের নব নাথ, চুরাশী সিদ্ধার সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা বুদ্ধের কিছুমাত্র মিল দেখা যায় না। এই সমস্ত বিচার করিলে বলিতে হয় ধর্ম হিসাবে বা বংশ-পরম্পরা হিসাবে নাথদের সঙ্গে ইঁহাদের মিল নাই। বৌদ্ধ ও জৈনেরাও যোগের প্রাধান্য স্বীকার করেন। এখানেই এই তিনটি ধর্মসম্প্রদায়ের বেশ মিল আছে দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"নাথপন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্র নাথযোগীরা গিয়াছিলেন, এবং লোককে আপন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট প্রভৃতি দূরদেশেও নাথেরা গিয়াছিলেন" (সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩২৮ ২৪৪ পৃষ্ঠা)। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন—"শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্বতীর সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। * * * নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম। * * * ক্রমে নাথপন্থ-

১ নাথপন্থ—অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮।

২ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫৩, ৬৭০ পৃঃ।

প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা নাথদের উপাসনা করিত" (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২)। শিব বা মহাদেব যোগধর্মের প্রবর্তক। নাথেরা শিবের সন্তান। তাহা হইলে অন্যান্য সম্প্রদায় নাথদের নিকট হইতে যোগধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিহীন হইবে না।

নাথগুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ কৃত 'যোগবিষয়' গ্রন্থে আছে—

"আকুলেনাদিনাথেন কেজ্জাপুবীনবাসিনা।
কৃপয়েব পরং তত্ত্বং মীননাথোঽপি বোধতঃ॥"

এখানে দেখা যাইতেছে যে গুরু আদি নাথ কেজ্জাপুবীন নামক স্থানের অধিবাসী। এই কেজ্জাপুবীন কোথায়? চট্টগ্রামের কক্সবাজারের সন্নিহিত সমুদ্রের মহেশখালি দ্বীপে বহুকাল আদি নাথ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে যথারীতি তাঁহার পূজা-অর্চনা হয়। ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। প্রাচীন আমলে ইহা নাথদের দখলে ছিল। ইহা কেজ্জাপুবীন বলিয়া অনুমিত হয়। মহানাদ, চন্দ্র নাথ, কপিলমুনি প্রভৃতি নাথধর্মের প্রসিদ্ধ স্থান সবই প্রায় বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। বঙ্গীয় যোগিজাতি আপনাদিগকে আইপন্থী, আদিপন্থী অর্থাৎ আদি নাথপন্থী বলিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে আদি নাথ সম্বন্ধীয় অনেক গাথা প্রচলিত আছে। এসব কারণে আদি নাথকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। আদি নাথের শিষ্য হইলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ বা মীন নাথ। মৎস্যেন্দ্র নাথ যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে[৩]।

৩ ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হঠযোগ-প্রদীপিকায় যোগমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে আদি নাথের পরে মৎস্যেন্দ্র নাথের উল্লেখ রহিয়াছে (চারু বাবুর শূন্যপুরাণের ভূমিকা)। ঋষি দত্তাত্রেয় কৃত 'দত্তাত্রেয়বোধ' নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যোগশাস্ত্রে আদি নাথের কথা আছে। বহু প্রকার যোগের বিষয় বর্ণনা করিয়া দত্তাত্রেয় বলিতেছেন আদি নাথ যোগের সার্ধকোটি সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছেন। দত্তাত্রেয় আরও বলিতেছেন—নিয়মের মধ্যে অহিংসাই মুখ্য। আদি নাথ আসনের মধ্যে পদ্মাসন সর্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। দত্তাত্রেয়কে কেহ কেহ ১০ম শতাব্দীর লোক মনে করেন[৪]। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ঋষি দত্তাত্রেয়ের বহু পূর্বে আদি নাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদি নাথের শিষ্য মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ। ঘেরণ্ডসংহিতায় যোগের উপযুক্ত আসনের মধ্যে ৩২টী প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী আসনের নাম নাথগুরুদের নামানুসারে রাখা হইয়াছে। যথা—(১৩) মৎস্যম, (১৪) মৎস্যেন্দ্র, (১৫) গোরক্ষ। ঘেরণ্ডসংহিতা বার্লিন হইতে Schmidt কর্তৃক সর্বপ্রথম জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হয়। পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২১ খৃঃ অব্দে Faquire and Faquirtum নামে প্রকাশিত হয়। ভুবনচন্দ্র বসাক ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ঘেরণ্ডসংহিতা প্রথম সম্পাদন করেন। ঘেরণ্ড নামক বাঙ্গালী মুনি ঘেরণ্ডসংহিতার লেখক।

৪ Religious Thought and Life in India By Monier Williams, Page 267.

"মৃত্যু-শ্মশানে জেগে ওঠ্ শঙ্করী"

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

নর-কঙ্কাল ডাকে তোরে—কোথা শ্যামা ?
কোটী সন্তান রুধির-অর্ঘ্য নে মা।
ত্রিনয়নে তোর জ্বালা না অনল-শিখা,
রুধিরে রাঙিয়ে তোল্ তোর ললাটিকা।
অট্ট-অট্ট-খল-খল হাসি খান,
মরণের বুকে জাগাক্ নবীন প্রাণ।

যেদিকেতে চাই আঁধারের বিভীষিকা,
ছেয়েছে ধরণী তমসার যবনিকা।
কোথা আলো মাগো—কোথা বল্ কোথা আলো ?
আঁধারের বুকে দীপশিখা মাগো জ্বালো।
হৃত সন্তানে দেখায়ে নতুন পথ,
আঁধারের বুকে চালা আলোকের রথ।

সবলেরা পায়ে দুর্ব্বলে আজি দলে,
পিপীলিকাপ্রায় তারা মরে পলে পলে।
তাদের অশ্রু-বন্যা বহিয়া যায়,
সেদিকেতে হায় কেহ নাহি ফিরে চায়।
দৈত্যকুলের উদ্ধত অসি মুখে,
ঝর ঝর ঝর রুধির ঝরিছে বুকে।

ধ্বংসের স্তূপে বাজিয়ে সৃজন বাঁশী,
বরাভয়করা—ফুটা মা আবার হাসি।
দৈত্যেরে বধি রক্ষিতে জীবকুল,
শক্তিময়ী মাগো, কেবা তব সমতুল ?
মৃত্যু-শ্মশানে জেগে ওঠ্ শঙ্করী,
রক্তলোলুপ খর্পর করে ধরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১১২তম জন্মতিথি-পূজা—গত ১১ই ফাল্গুন, রবিবার, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১২তম জন্মবার্ষিকী বেলুড় মঠে নৈষ্ঠিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, বৈদিক আবৃত্তি, উষাকীর্তন, পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ ও দশাবতারের বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজন হয়। সমগ্র দিবসব্যাপী অসংখ্য নরনারীর সমাগমে মঠ-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখর ছিল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভক্তগণ মন্দির অভ্যন্তরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমগ্ন শুভ্র প্রতিমূর্তিতে তাঁহাদের অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠে। দীপালোকে উদ্ভাসিত ভাগীরথীকূলে শঙ্খঘণ্টামুখরিত দেবালয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অপরাহ্ণে মঠের সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ববাসীকে পরমতসহিষ্ণু হইতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন অনুধাবন করিলে জানা যায়, উহাই

ছিল এই মহাপুরুষের জীবনের আদর্শ এবং নীতি, বস্তুতঃপক্ষে পরমতসহিষ্ণুতাই হইতেছে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম। সমগ্র বিশ্বের নিকট তিনি এই মহাবাণী উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষি-বৃন্দ তাঁহার বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু জড়বাদে জর্জরিত পাশ্চাত্য দেশ এখনও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এইজন্য সেখানে হিংসা-দ্বেষ রেষারেষি চলিতেছে। পরমত-অসহিষ্ণুতার জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই অশান্তি দেখা যায়। স্বামীজী অতঃপর বলেন, নিজের এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কল্যাণই ভারতবর্ষের কামনা। এই সনাতন নীতি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তাহা আবার নূতন করিয়া দেখিতে পাইয়াছি। স্মরণাতীত যুগ হইতে যে ধারা ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা এখনও অব্যাহত আছে। কত দেশ হইতে কত লোক এই দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম প্রচার করিয়াছেন; ভারতবাসী তাহাতে বাধা দেয় নাই, বরং উদারভাবে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবনের মধ্য দিয়া সেই শাশ্বত সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই অবনত শিরে বিশ্বের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

স্বামী শর্বানন্দজী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু প্রাচীন ভারতের নয় ভবিষ্যৎ ভারতেরও অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা তিনি তাঁহার নিজের জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ভারত কি হইবে তিনি তাহার সূচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কি তাহা আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই। পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া যে প্রাচীন ভারত সাধনা করিয়া আসিয়াছে,—ঐতিহাসিকদের মতে তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন জাতির মূলে যাহা আছে, তাহার প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের সাধনা হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য দেশ জড়কে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী জড়কে উপেক্ষা করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন দিয়া এক পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সত্যকে অনুভব করিলে মানুষ শান্তি ও আনন্দ পায়। জড় কখনও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না—যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ ইহাই উপলব্ধি করিয়াছে। চৈতন্যকে ধরিলে শান্তি ও আনন্দ আসে। ভারতবাসী সেই চৈতন্যের অভিলাষী—জড়ের নহে। এই জড় ও চৈতন্যের মধ্যেই সংগ্রাম চলিতেছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাই ভারতবর্ষ এত উন্নত।

অতঃপর তিনি বলেন যে, বিশ্বে যে মহাবিদ্বেষের আগুন জ্বলিতেছে তাহার কারণ ভেদবুদ্ধি। আধ্যাত্মিকতার অভাবে এই ভেদ-বিদ্বেষ আরও প্রবল হইয়াছে। তাই মানুষের ভিতর যে দেবতা আছেন তাঁহাকে জাগ্রত করিতে হইবে। প্রকৃত ধর্ম কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ঠাকুর তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম দেখাইয়া গিয়াছেন।

সভাপতি ডাঃ নাগ বলেন, ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা জগতের নিকট অসভ্য ও বর্বর বলিয়া পরিগণিত ছিলাম। বাঙ্গলা দেশ নব্যন্যায় ও দর্শনের প্রতিষ্ঠা-ভূমি, এই সত্য পাশ্চাত্য দেশ তখনও জানে নাই। যে বাঙ্গলা ভাষার আমরা উত্তরাধিকারী—সেই বাঙ্গলার শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য-জগৎ উপলব্ধি করে নাই। এই স্পর্ধাকে অবনমিত করিতে হইলে প্রয়োজন একজন সাক্ষাৎ জীবন্ত মানুষের। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সঙ্কট-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তার আগে ছিল এক বিরাট অজ্ঞানের

যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে দেশ তখন ডুবিয়া গিয়াছিল।

অতঃপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা এই বইখানি লইয়া তিনি ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কি ভাবে তিনি রামমোহনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দের যুগ পর্যন্ত এক বিরাট মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন ডাঃ নাগ তাহার উল্লেখ করেন। রোমাঁ রোলাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার কারণ ঐ মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উপসংহারে তিনি জড়বাদী পাশ্চাত্যদেশ-সমূহকে ভারতের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিবার জন্য আবেদন করেন।

এই দিন রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা হয় এবং ১৪জন সন্ন্যাস এবং ১৮ জন ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেন।

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব—গত ১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, বেলুড় মঠে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মঠে দুই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

এইদিন অতি প্রত্যুষেই দূরদূরান্ত হইতে নরনারী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দলে দলে মঠের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক কীর্তন-দল ও ব্যাণ্ডপার্টি উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হয়। প্রভাত-সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত-কণ্ঠে 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিত হইয়া উঠে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মঠে জনসমাগম বৃদ্ধি হইতে থাকে। ভজন, কীর্তন, ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশাল মঠ-প্রাঙ্গণ সর্বক্ষণ মুখরিত ছিল।

এই উৎসব উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরে একটি প্রদর্শনী হয়। ইহাতে সযত্নে রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষপত্রাদি এইস্থানে ভক্তমণ্ডলীকে দেখান হয়। রাত্রি সমাগমে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং লক্ষ-কণ্ঠের সমবেত রামকৃষ্ণ নামে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়। ঐ সময় অনেক আতসবাজী পোড়ান হয়। এই দিন রেল-কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বেলুড় মঠের সন্নিকটে সাময়িক ভাবে একটি ষ্টেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কোন প্রকার দুর্ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত রাখেন। জনতা-নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বেচ্ছা-সেবকগণ সর্বসময়েই কার্যরত ছিলেন। ভীড়ে অথবা অন্য কোন কারণে কেহ আহত বা অসুস্থ হইলে ভারতীয় জাতীয় য়্যাম্বুল্যান্স বাহিনীর কর্মিবৃন্দ তাহার সেবা করেন। এই উপলক্ষে বাহিনীর একটি সাময়িক কেন্দ্র খোলা হয়। ঐ দিন বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী—ফরাসী দেশে প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে বেদান্ত-প্রচার-কার্য পরিচালনা করিয়া স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী কয়েক মাসের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। বেলুড় মঠ হইতে প্রথমতঃ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব-সভায় বক্তৃতা দানের জন্য প্রেরিত হন। বেদান্তসম্বন্ধে তাঁহার মনোজ্ঞ আলোচনা তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহাদের অনুরোধে স্থায়ী ভাবে প্রচার-কার্য পরিচালনের

জন্ম বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ১৯৩৭ সনে প্যারিসে গমন করিয়া তথায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র (Centre Vadantique Ramakrishna) স্থাপন করেন। তিনি প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত ফরাসী দেশে নানাস্থানে ইংরাজী ভাষায় ক্লাস ও বক্তৃতা দেন। ইতিমধ্যে তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ১৯৪০ সন হইতে উক্ত ভাষায় আলোচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী, মনীষী ধনগোপাল মুখার্জির "ফেস অব্ সাইলেন্স" এবং খ্যাতনামা ফরাসী লেখক জীন হারবার্টের অনূদিত স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ফরাসী দেশে বেদান্ত প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তথাকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহূত হইয়া বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের ফলে ক্রমেই অধিক-সংখ্যক নরনারী বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

গত ২৪শে ফাল্গুন কলিকাতা নাগরিকদের পক্ষ হইতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে একটি মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত একটি জন-সভায় কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় মানপত্র পাঠ করেন। ইহার উত্তরে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ফরাসী দেশে বেদান্ত-প্রচার-কার্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। এই সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হলটি শ্রোতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজা, ভজন, প্রসাদবিতরণ এবং অপরাহ্নে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন-সংগীতের পর জেলা জজ শ্রীযুক্ত অন্নদা শঙ্কর রায়, স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মী শ্রীযুক্ত মতি লাল পুরকায়স্থ, মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র লাল রায়, স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র দে এবং স্বামী বিমলানন্দজী স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন।
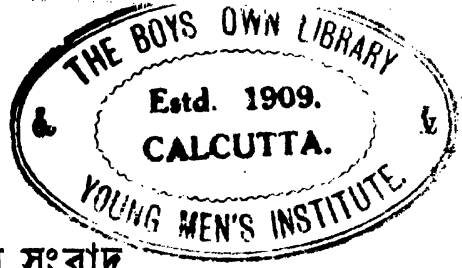
বিবিধ সংবাদ

কামারপুকুর (হুগলি) গ্রামে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১১ই ফাল্গুন হইতে ১৩ই ফাল্গুন পর্যন্ত কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে, ভূতির খালের পশ্চিম তীরে আম্রকাননে, ভূতির খালের পূর্বতীরে মহাশ্মশানে, ধনী কামারনীর মন্দিরে, বুধুই মোড়লের শ্মশানে, চিনু শাঁখারীর বাড়ীতে, লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে, সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে, কামারপুকুর বাগদিপাড়ায় এবং মুকুন্দপুর বুড়োশিবের মন্দিরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা হোম ভজন প্রসাদ-বিতরণ প্রত্যেক স্থানের উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত নর-নারী আগমন করিয়াছিলেন।

বালিচক (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৮ই ফাল্গুন বালিচক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া স্থানীয় স্কুলের বালক ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্তন সহকারে একটী শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী উৎসবাঙ্গের তত্ত্বাবধান করেন। পূর্বাহ্নে স্বামী বিবিক্তানন্দজী কর্তৃক পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার নর-নারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী এবং আধুনিক যুগে তাহা বিশেষ ভাবে প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের মনোজ্ঞ বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়। এতদুপলক্ষে ঘাটাল তমলুক খড়্গপুর ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন।

লোয়াদা (মেদিনীপুর) গ্রামে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার লোয়াদা এম-ই-স্কুলের সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারতি ও পরমহংসদেবের প্রতিকৃতিসহ নগর ভ্রমণান্তে মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী বিবিক্তানন্দজী ষোড়শোপচারে পূজা ও স্বামী প্রশান্তানন্দজী চণ্ডী পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় দেড় হাজার নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। অপরাহ্নে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দেব মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। আরাত্রিক অন্তে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন ও ভজন গীত হয়। এই প্রথম উৎসবে এই পল্লী অঞ্চলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

গয়া (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—পুণ্যতীর্থ গয়াধামে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম শুভ জন্মোৎসব যথারীতি

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ১১ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজাদি অন্তে প্রায় আট শত ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণকে প্রসাদ বিতরণে পরিতৃপ্ত করা হয়। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী ভাগবতানন্দজী এবং বিহার রিলিফের ভারপ্রাপ্ত স্বামী বেদান্তানন্দজী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুত অমরেন্দ্র নারায়ণ এম্-এস্‌সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আদিদেবানন্দজী, অধ্যাপক কান্‌তা প্রসাদ প্রমুখ বক্তাগণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

নবদ্বীপ (নদীয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব গত ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৪ই ফাল্গুন পর্যন্ত সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথম দিন শোভাযাত্রা, পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজা, হোম, উপনিষদাদি পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, তৃতীয় দিন বিশেষভাবে ভজন কীর্তনাদি এবং স্থানীয় ছাত্র ও ছাত্রীগণের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়" সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। চতুর্থ দিন পূর্বাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-কথকতা এবং অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধব দাস সাংখ্যতীর্থ, এম্-এ মহোদয় সমিতি-ভবনে "শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের" উদ্বোধন করেন। তৎপর স্বামী চৈতন্য গোবিন্দ ভারতী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধব দাস সাংখ্যতীর্থ, প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামপদ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ১৪ই ফাল্গুন বুধবার সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণকে শ্রদ্ধার সহিত সেবা করা হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা—এই সোসাইটি ভবনে গত ১৮ই মাঘ স্বামী সুন্দরানন্দ ও শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পূত জীবনী", ২৫শে মাঘ শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের দিব্য জীবন-কথা", ৩রা ফাল্গুন বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী "পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের পূত জীবনী" এবং ১৭ই ফাল্গুন স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্ত গুপ্ত ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্য জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পর ভজন ও কালী কীর্তন হইয়াছিল।

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ) কালী বাড়ীতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভা—গত ১৬ই ফাল্গুন একটী জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দজী 'জাতিগঠনে বিবেকানন্দ' শীর্ষক একটী চমৎকার বক্তৃতা করেন। তৎপর দিন তিনি স্থানীয় চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে ছাত্র ও অভিভাবকদিগের নিকট শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

পানিহাটীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব—"গত ১১ই ফাল্গুন পানিহাটী হিন্দুসংগঠনসমিতির উদ্যোগে 'অমৃততীর্থে' পানিহাটীবাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করেন। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবের এই কার্যসূচী ছিল : উষাকীর্তন, মঙ্গলারতি, অর্ঘ্যপ্রদান ও বাল্যভোগ, পূর্বাহ্ণে কথামৃত পাঠ, কীর্তন ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা। অপরাহ্ণে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন

পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা-সেবাকার্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

রামকৃষ্ণ মিশন গত ২২শে অক্টোবর চাঁদপুরে দাঙ্গা-সেবাকার্য আরম্ভ করেন। ক্রমে মিশনের কার্য-পরিধি ত্রিপুরা জেলার ফরিদগঞ্জ ও চাঁদপুর থানা এবং নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ও রায়পুর থানার ৩৪টি ইউনিয়নের অধীন ১২০টি গ্রামে বিস্তার লাভ করে।

গত ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৩,৯২৪টি পরিবারের মধ্যে ৩,৭৪০ খানা পশমী কম্বল, ৪,৬৩৭টি বেনিয়ান ও সোয়েটার, ৪২০খানা তুলার কম্বল, ৩,৫১৬ গাছা মালা, ৯০ জোড়া শাঁখা, ৩৯৬ মণ চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, ৭ বস্তা ডাল, ১০,৬৯১খানা কাপড়, ৪,৯২৫খানা বাসনপত্র এবং ৩২৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে।

চাঁদপুর, শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জস্থ আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতেও মিশন বহু লোককে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে চারটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও পরিচালনা করা হইতেছে।

মিশনের অন্যান্য কাজের মধ্যে দুঃস্থগণ যাহাতে মানসিক বল ফিরিয়া পায় তাহার জন্য তাহাদের বাড়ী এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাইয়া ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা, কীর্তন, ইত্যাদি করা হইতেছে।

ভবিষ্যতে মিশনের সেবাকার্য কেবল উপরোক্ত সাহায্যদানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি গ্রামে হালচাষের জন্য বলদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিদ্বারা দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হইবে। এতদ্ভিন্ন পিতৃ-মাতৃহীন এবং অসহায় পরিবারসমূহের বালক-বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও মিশন অনুভব করিতেছেন। মিশনের যে সকল কেন্দ্রে দরিদ্র ছেলেদের রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কতক ছেলেকে সেই সকল কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া ভিন্ন ইহাদের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে স্কুলগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যও আংশিক সাহায্য করা হইবে। অসহায় বিধবা এবং নিঃস্ব পরিবারবর্গকেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। জনগণের ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক উন্নতির জন্য মিশন কয়েকখানা ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ এবং ছায়াচিত্রের সাহায্যে উপদেশাদি দানের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থা অনুকূল হইলে কয়েকটি গ্রাম্যশিল্প প্রবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে। মিশনের চিকিৎসা-কেন্দ্রও বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। দরিদ্র পরিবারের লোকসমূহ গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে নগদ টাকা এবং সরঞ্জামাদি দ্বারা সাহায্য করা হইবে। যখনই যেখানে প্রয়োজন উপস্থিত হইবে সেখানে খাদ্য প্রভৃতি দ্বারা মিশন অবশ্য দুঃস্থজনগণকে সাধ্যানুসারে সহায়তা করিবেন।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে সাহায্যদান ও পুনর্বসতি-কার্যে মিশন সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া

আসিতেছেন এবং সাধ্যায়ত্ত হইলে সকল প্রকার গঠনমূলক প্রস্তাব মিশন সাদরে গ্রহণ করিবেন।

উপরিউক্ত কার্যের জন্য এখনও বহু অর্থ আবশ্যক। আমরা দুর্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নীদের সাহায্যার্থ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া,

(২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়,
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম
৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
২৩. ২. ৪৭

শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ মহারাজের মহাসমাধি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ মহারাজ গত ১১ই মার্চ মঙ্গলবার প্রাতে ৮টা ২৫ মিনিটের সময়ে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭১ বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি নানাপ্রকার রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার নশ্বরদেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকায় জল-সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

স্বামী অচলানন্দ মহারাজ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯০০ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ১৯০২ সনের মে মাসে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৺কাশীধামে তাঁহার পূর্বাশ্রম ছিল এবং তাঁহার নাম ছিল কেদারনাথ মৌলিক। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি "কেদার বাবা" নামে অভিহিত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেদার বাবা বৎসরাধিক কাল মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে কার্য করেন।

স্বামী অচলানন্দ মহারাজ কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনে তিনি কয়েক বৎসর অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহার উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। ১৯০৯ সনে রামকৃষ্ণ মিশনকে রেজিষ্টার্ড বডিতে পরিণত করিতে কেদার বাবা প্রভৃত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। সাধুত্ব ও কর্মশক্তি গুণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভার্নিং বডির সভ্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ সনে কেদার বাবাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রায় সকল সন্ন্যাসীশিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার ফলে তাঁহাদের অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহার সমীপাগত ভক্তগণের নিকট তিনি সুযোগ পাইলেই এই মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ করিতেন। সাধন-ভজনে তাঁহার খুব নিষ্ঠা ছিল। কাশী সেবাশ্রমের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করেন। কেদার বাবার সারল্য সংযম ও অমায়িক ব্যবহার আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।*

* উদ্বোধন ছাপানো প্রায় শেষ হইলে এই সংবাদটি পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য ইহা অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে পরে সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—উঃ সঃ

হিন্দুসমাজে ভোগাধিকার-বৈষম্য

সম্পাদক

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যুদস্ত হিন্দুদের দুরবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই হিন্দুসমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছেন। সকলেই চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুগণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আত্মঘাতী গৃহবিবাদের ফলে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কোন অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। কেবল পূর্ববঙ্গ নয়, পরন্তু ভারতের সর্বত্রই হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বহু জাতি বা শ্রেণীর ভোগাধিকার-বৈষম্যের জন্য হিন্দুজাতি স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হইয়া উৎসন্নের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অধিকার-তারতম্য বিদূরিত না হইলে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াই কয়েক মাস হয় ভট্টপল্লী নবদ্বীপ কোটালিপাড়া বিক্রমপুর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের সমাজ-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, "হিন্দুজাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণিসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকার-বৈষম্য থাকিবে না।"

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর ভোগাধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ দোষের নহে, কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * * যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই, কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় যে এই অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে। * * ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহার সাধনই আমাদের প্রধান ব্রত। এইরূপ আরও বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুসমাজের ভোগাধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত স্পষ্ট ভাবে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রক্ষণশীল সমাজপতিগণ তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে এ পর্যন্ত চেষ্টা করেন নাই। যদি এই দীর্ঘকালের মধ্যেও যুগধর্মাচার্য স্বামীজীর এই উপদেশ কার্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ বর্তমানে যে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, এরূপ বিপদের সম্মুখীন হইত না।

হিন্দুসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগাধিকার-তারতম্যরূপ মহা অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে বিভিন্ন জাতির উপর বলপূর্বক আরোপিত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ হইতে। এই বিধি-নিষেধের বোঝা চাপাইয়াছেন সমাজ-ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণগণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যখনই ব্রাহ্মণেরা যাহা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার

থেকে বঞ্চিত করবেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দিবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে।" অবশ্য প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের অনন্যসাধারণ বহু গুণও ছিল। হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতি তাঁহাদেরই দান। ব্রাহ্মণদের অসাধারণ গুণাবলীর জন্যই প্রকৃতিদেবী তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। দেখা যায় যে, মানুষবিশেষের মধ্যে বিদ্যা ধন বীর্য প্রভৃতি সঞ্চিত হয় সর্বসাধারণকে বিতরণ করিবার জন্য। এইগুলি বহুর মধ্যে বিতরিত না হইয়া দীর্ঘকাল একাধারে সঞ্চিত থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা হইতে নানারূপ অনর্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। বহুকালের গচ্ছিত ধনের ন্যায় বহু কালের গচ্ছিত শক্তিতেও অধিকাংশ মানুষেরই আত্মবুদ্ধি জন্মে। তখন তাঁহারা উহা প্রত্যর্পণ না করিয়া আপনাদের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করেন। কালক্রমে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অধঃপতিত হইয়া তাঁহাদের অসাধারণ শক্তিকে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে থাকেন। তখন ক্ষত্রিয়াদির সহিত তাঁহাদের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। ভারতের ইতিহাস এই বিরোধে অত্যন্ত কলংকিত।

অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে গোড়া হইতেই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যেও নানা বিষয়ে স্বার্থ-সংঘাত ছিল। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বংশ বা কুলের গৌরব, যজ্ঞের প্রাধান্য ও পৌরোহিত্য প্রভৃতি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈর্ষা ও মনোমালিন্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের জাঁকজমকপূর্ণ মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডকে প্রাধান্য বিস্তারের উপায় মনে করিয়া ক্ষত্রিয়েরা উহাতে ক্রমেই অধিকতর বিরক্ত হইয়া পড়েন। উপনিষৎ গীতা এবং বহু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এই বিরক্তির অনেক স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অসন্তুষ্টি ক্রমে উভয় বর্ণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদে পরিণত হয়। ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যলিপ্সাও কম ছিল না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-দ্বন্দ্বে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের উপর এবং ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। আবার ক্ষত্রিয় রাজাদের সহায়ে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্য ও শূদ্রদের করতলগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর বহু বিধি-নিষেধের বোঝা চাপান। মন্বাদি স্মৃতিকারগণ শূদ্রদের বেদপাঠ, ওঁকার উচ্চারণ, ধর্মসাধন প্রভৃতিতে—এমন কি বিদ্যার্জন ও স্বাধীনভাবে সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জনের অধিকারও নষ্ট করেন। সেকালে শূদ্রদের ওঁকার উচ্চারণ ও বিদ্যালাভের চেষ্টারূপ গুরুতর অপরাধের জন্য "জিহ্বাচ্ছেদ" ও "শরীরভেদ" ইত্যাদি অমানুষিক দণ্ড প্রচলিত ছিল! স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে যে অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে অত্যন্ত লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা, সেই অপরাধের জন্য শূদ্রবর্ণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুদণ্ড বা প্রাণদণ্ডের বিধান দেখা যায়! তখন শূদ্রগণ "চলমান শ্মশান" ও "ভারবাহী পশু" বলিয়া পরিগণিত হইতেন!

বৈশ্য এবং শূদ্রদেরও যথেষ্ট দোষ ছিল। ধনবান বৈশ্যদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বদান্যতার পরিচয় দিলেও অধিকাংশই অর্থদ্বারা রাজশক্তি এবং সেবাদ্বারা ব্রাহ্মণকে বশে রাখিয়া শূদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যদের মধ্যে কুসীদজীবীদের অত্যাচারই বেশী ছিল বলিয়া জানা যায়। শূদ্রবর্ণের জনগণের বিদ্যার্জনে, নৈতিক উন্নতিতে, পরার্থপরতায় ও ত্যাগে আগ্রহ ছিল না এবং তাঁহারা দাসত্বে, অপমানে ও অসম্মানে বেদনাবোধ করিতেন না। তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রমেই ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়দের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যদের ধনসম্পদ সম্ভব

হইলেও তাঁহারা দারিদ্র্য অজ্ঞতা ঈর্ষা স্বজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি এবং সংঘশক্তির অভাবে ত্রিবর্ণ কর্তৃক বরাবর উৎপীড়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভাবে এবং ক্ষত্রিয়েরা শারীরিক ও মানসিক শক্তিবলে সমাজের নিয়ন্তা হইয়া উভয় বর্ণ মিলিয়া বৈশ্যদের উপর এবং এই তিনবর্ণ সমবেত ভাবে শূদ্রগণকে শত বিধি, সহস্র নিষেধ এবং অগণন দেশাচার লোকাচার ও স্ত্রী-আচারের পাষাণ চাপে পিষ্ট করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে বিদ্যা ধর্ম্ম সংস্কৃতি এবং স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন হইতেও বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম-প্লাবনের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রভাব হ্রাস পায়। বৌদ্ধধর্মে বর্ণভেদ ও মানুষে মানুষে ভোগাধিকার-বৈষম্যের স্থান নাই। এ জন্য অধিকারবঞ্চিত বৈশ্য ও শূদ্রগণ দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলা দেশের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরভ্যুদয় হইলে বাংলার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বাংলায় হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। অতঃপর সেনবংশের রাজা বল্লালসেন কর্তৃক হিন্দু-সমাজ সংস্কৃত হয়। তিনি প্রথম-জীবনে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী ছিলেন। পরে তিনি শৈব সন্ন্যাসী সিংহগিরির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া হিন্দু হন। বল্লালের সংস্কারের ফলে গুণভেদ বৃত্তিভেদ ও ভোগাধিকারভেদ প্রভৃতি মূলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রত্যেকটির অন্তর্গত বৃত্তিমূলক বহু জাতি বা শ্রেণী সৃষ্ট হয়। যে সকল জাতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে অনেক জাতিকে অনাচরণীয় এবং বহু জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হয়। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে মুসলমানগণ বাংলাদেশ দখল করে। বাংলার হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহাদের ঘর গুছাইতে না গুছাইতেই বাংলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়। মুসলমান প্রভাব-প্লাবনে ভারতের সর্বত্রই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পাইলেও তাঁহাদের নির্দেশেই নির্জীব হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইতে থাকে। এই সময়ে মুসলমানদের প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ভোগাধিকার-বৈষম্যমূলক বহু বিধি-নিষেধ নূতন করিয়া প্রবর্তন করেন এবং বৃত্তিভেদমূলক জাতির সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পায়। সোনা লোহা চাল মদ তেল বাসন মাছ পান চুন ফুল প্রভৃতি বিক্রেতাগণ এক একটি পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে হিন্দুসমাজ বিভিন্ন জাতির বিরোধ-বিদ্বেষের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই কালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অনুদারতা ও অদূরদর্শিতার ফলে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু হিন্দুসমাজে সম্মানিত স্থান না পাইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধদের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাহারাই দলে দলে মুসলমান হয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হিন্দুসমাজে চতুর্বর্ণের ভোগাধিকার-তারতম্য অনেক শাস্ত্রকার একেবারেই সমর্থন করেন নাই। রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষৎ চণ্ডী শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পদ্ম-পুরাণ বরাহপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ কাশীখণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে এবং পরবর্তী কালের শৈব তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের বহু স্থানে ধর্মসাধনে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদের সমর্থন দেখা যায় না। মহাভারতের যুগে গুণ ও কর্মানুসারে যে নিম্নবর্ণের বহুলোক উচ্চবর্ণে উন্নীত এবং উচ্চবর্ণের অনেকে নিম্নবর্ণে অবনমিত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। মনুসংহিতা যমসংহিতা পরাশরসংহিতা আপস্তম্ব-সংহিতা প্রভৃতিতে এরূপ উন্নয়ন ও অবনয়নের স্পষ্ট সমর্থন আছে। কেবল ত্রিবর্ণের মধ্যেই উন্নয়ন সীমাবদ্ধ ছিল না, অধিকন্তু বহু গ্রীক

শক হুন প্রভৃতি অহিন্দু জাতিও হিন্দুসমাজের অঙ্কে যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান-যুগ হইতে সমাজপতিগণ অত্যন্ত অনুদার হইয়া অহিন্দু জাতিকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং গুণ-কর্মানুসারে নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণে উন্নয়ন ও উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণে অবনমন বন্ধ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান-আমল হইতে বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল ধর্মাচার্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভোগাধিকারবৈষম্য ও বর্ণভেদ সমর্থন করেন নাই। মুসলমান-যুগে আবির্ভূত রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক রামানন্দ নানক বল্লভ চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতি হইতে ইংরাজ-যুগের রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ এবং ইঁহাদের খ্যাতনামা শিষ্যগণ চতুর্বর্ণের ভোগাধিকারে ও ধর্মসাধনে কোন ভেদ মানেন নাই। এই মহাপুরুষগণ ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। মুসলমান-যুগে অস্পৃশ্য শ্রেণী হইতে রুহিদাস কবীরদাস দাদু গরীবদাস কামাল জামাল সধ্ন চরণদাস মুলুকদাস চণ্ডীদাস বলরামহাড়ি সুরদাস হরিদাস নন্দ তিরুপ্পন চোকামেলা ছোক্কা প্রভৃতি ধর্মাচার্য আবির্ভূত হইয়া এক একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও এই মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন—এমন কি অনেকে ইঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। উল্লেখ বাহুল্য যে এই যুগধর্মপ্রবর্তকদের প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্রভেদ দেখা যায় না। ইঁহারা আবির্ভূত না হইলে নিম্নশ্রেণীর আরও বহু হিন্দু যে মুসলমান হইত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। হিন্দুর ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিসাধনে এই মহাপুরুষদের অবদান অপরিসীম।

বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ মুসলমান ও ইংরাজ যুগে আবির্ভূত এই ধর্মাচার্যগণের প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহের সমষ্টি। এখন সকল প্রদেশের অধিকাংশ নরনারীই এই মহাপুরুষদের ধর্মমত অনুসরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, রক্ষণশীল সমাজপতিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় কোন প্রদেশেই এই সকল ধর্মাচার্যদের ধর্মমত সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে হিন্দুসমাজ-নিয়ন্ত্রণে খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মনুসংহিতার প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় বটে কিন্তু মনুর মত ইদানীং কোন প্রদেশেই প্রচলিত দেখা যায় না। এখন ভেদবিরোধবর্ধক কতকগুলি দেশাচার লোকাচার ও স্ত্রী-আচার দ্বারা সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজ প্রকৃতপক্ষে শাসিত হইতেছে। এজন্য হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিয়াছে। ইহা দ্বারা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুসমাজের ভেদ-বিরোধের জন্য হিন্দুধর্ম একেবারেই দায়ী নয়, বরং প্রচলিত হিন্দুধর্মের নির্দেশে হিন্দুসমাজ পরিচালিত না হওয়াতেই উহা অনৈক্য-বিরোধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুরা ধর্মক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনের মাহাত্ম্য অতি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেও সমাজ-জীবনে ব্যবহারক্ষেত্রে ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। হিন্দুধর্মসম্প্রদায়সমূহ সমস্বরে বলে—"জীবই শিব", হিন্দুসমাজ বলে—"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা"! বাংলা দেশে ধর্মক্ষেত্রে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের প্রাধান্য বর্তমান, কিন্তু তন্ত্র ও বৈষ্ণব কোন শাস্ত্রই ধর্মসাধনে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদ সমর্থন করে না। তথাপি বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। এ যুগেও সমাজের পক্ষ হইতে ধর্মসাধনে অনেক নিম্নশ্রেণীর

শূদ্রদের অধিকার স্বীকার করা না হইলেও সকল শ্রেণীর হিন্দুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছে। এখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ধর্মসাধনে স্বাধীন। হিন্দুমাত্রই দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত ভাব এবং জ্ঞান ভক্তি কর্ম যোগ অবলম্বনে যে কোন দেবদেবী অবতার বা ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার যে কোন ভাবে উপাসনা করিতে পারে, অথবা এই সকলে অবিশ্বাসী হইয়া প্রকাশ্য ভাবে নিরীশ্বরবাদ পোষণ ও প্রচার করিতেও কাহারও পক্ষে কোন বাধা নাই। পৃথিবীর কোন অহিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মক্ষেত্রে মানুষের এরূপ স্বাধীনতা নাই। কোন একজন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক, একটি ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মমত মান্য করা অহিন্দু ধর্মাবলম্বিমাত্রের পক্ষেই একান্ত বাধ্যতামূলক। ধর্মক্ষেত্রে হিন্দুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলিয়াই হিন্দুধর্ম ও দর্শন জগতের যে কোন ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। পক্ষান্তরে বর্তমান গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগেও হিন্দুদের সমাজক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা নাই। ইহাই হিন্দুজাতির অবনতির প্রধান কারণ। হিন্দুমাত্রেরই জন্ম শিক্ষা জীবিকার্জন-বৃত্তি বিবাহ আহার বিহার প্রভৃতি হইতে জীবনের সমগ্র কার্যাবলী অসংখ্য সামাজিক বিধি-নিষেধ দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের কোন একটির অন্যথা করিলে রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টিতে কেহ আর হিন্দু বলিয়া গণ্য হয় না। বহুকাল যাবৎ হিন্দুসমাজে অবনত ও অনুন্নত হিন্দুদের সামাজিক উন্নতির দ্বার চিররুদ্ধ। তাহারা শিক্ষায় ও ধর্মে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, সমাজক্ষেত্রে তাহাদিগকে চিরকাল অবনত ও অনুন্নত হইয়াই থাকিতে হইবে। সমাজে উন্নতি লাভে তাহাদের একেবারেই স্বাধীনতা নাই। এই সকল কারণে বলা যায় যে হিন্দুমাত্রই তাহার সমাজের ক্রীতদাস। পক্ষান্তরে অহিন্দু ধর্মাবলম্বী মাত্রেরই সমাজক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাহাদের মধ্যে আজ যে নানা বিষয়ে অনুন্নত, কাল সে সকল বিষয়ে উন্নত হইতে পারে। ইচ্ছামত বিবাহে, যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহে এবং আহারে বিহারে যে কোন জাতির সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া উন্নতিলাভ করিতে তাহাদের পক্ষে কোন বাধা নাই। সমাজে এইরূপ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহাদের ঐহিক জীবনের উন্নতির মূল কারণ।

সমাজক্ষেত্রে স্বাধীনতার ঐকান্তিক অভাবে এ যুগেও হিন্দুজাতি শত ভেদ বৈষম্য ও অনৈক্যের নাগপাশে আবদ্ধ। বর্তমানেও হিন্দুসমাজে চতুর্বর্ণের অধিকার-ভেদ, প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত অসংখ্য জাতিভেদ, ইহাদের মধ্যে আবার রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতিতে ভেদ, আচরণীয়ে অনাচরণীয়ে ভেদ, অনাচরণীয়ে অনাচরণীয়ে ভেদ, অনাচরণীয়ে অস্পৃশ্যে ভেদ এবং অস্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে ভেদ বিদ্যমান। মুসলমান-যুগে বিভিন্ন জাতির উপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে এই আত্মঘাতী ভেদ-বিরোধ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। সুখের বিষয় যে, অধুনা ইংরাজ-আমলে উচ্চনীচ সকল বর্ণ ও শ্রেণীরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ও স্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছে। এখন ধর্মসাধনে, শিক্ষালাভে, ইচ্ছামত যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহে, রাজকার্যে, অফিসে, কারখানায় এবং যানবাহনে যাতায়াতে কাহারও পক্ষে কোন বাধা নাই।

প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রসমূহেও জাতিতে জাতিতে অধিকারভেদের সমর্থন দেখা যায় না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভা প্রভৃতিও সকল বিষয়ে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর সমানাধিকার প্রচার করিতেছেন। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহও ভারতের অবনত অনুন্নত জাতির সকল বিষয়ে উন্নতি সমর্থন করেন। তথাপি

ভারতের প্রায় সর্বত্রই বড় বড় শহর-বন্দরে না হইলেও পল্লীগ্রামসমূহে বর্তমান যুগেও হিন্দুসমাজ জাতিতে জাতিতে নানাবিধ ভোগাধিকারতারতম্য আঁকড়াইয়া আছে। এখনও পল্লীগ্রামগুলিতে বহু জাতিকে অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার করা হইতেছে। এখনও বহু মন্দিরে অনেক অস্পৃশ্য জাতির প্রবেশাধিকার নাই, অনেক নিম্নজাতিকে পাঠশালা এবং টোলে পড়ান হয় না, ধোপা নাপিত মালী মাঝি প্রভৃতি বহু নিম্নজাতির কাজ করে না, অনেক গ্রামে নিম্নজাতিরা হাটে-বাজারে দুধ তরকারি প্রভৃতি আনিলে উচ্চ জাতিরা উহা ক্রয় করেন না, ইত্যাদি। এই সকল কারণে নিম্নজাতিসমূহের অসন্তোষ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। এ অবস্থায় অধিকারনিরাকৃত নিম্নশ্রেণিসমূহের ন্যায্য দাবী পুরণ না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের নিম্নশ্রেণীর অধিকার-বঞ্চিত জনসাধারণ এত দিন নিদ্রিত ছিল। ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যার্জন, ধর্মসাধন, জীবিকার্জন ও ন্যায্য কামনাপূরণ প্রভৃতিতে তাহাদের স্বাধীনতা ছিল না। এই জন্য দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার চাপে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এ যুগেও বিদেশী বণিক ও দুনিয়াদারিতে অভিজ্ঞ স্বদেশী ধনিকদের ক্রম-বর্ধমান প্রতিযোগিতা ও শোষণে তাহাদের সামান্য বৃত্তিগুলিও লুপ্ত হওয়ায় নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ওদিকে উচ্চবর্ণ শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়া অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছেন। এ জন্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে ক্রমেই পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে। এই ভেদই হিন্দুজাতির গৃহবিবাদের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতে সমস্ত দুঃখের মূল নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ সৃষ্টি হওয়া। এই ভেদ নাশ না হইলে কোন কল্যাণের আশা নাই।" এই ভেদের মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে অধিকার-নিরাকৃত নিম্নশ্রেণীর জনগণের লুপ্ত অধিকার তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে। তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছে যে উচ্চবর্ণ ইংরাজের নিকট দেশের স্বাধীনতা এবং বিশ্ব-জাতিসংঘের আসরে সকল বিষয়ে সমানাধিকার দাবী করিতেছেন, এ অবস্থায় আর দীর্ঘ দিন তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সমানাধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। মনে রাখিতে হইবে—নিম্নবর্ণের অজ্ঞ ও দরিদ্র জনসাধারণকে লইয়াই দেশ, তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড, জাতির প্রাণশক্তি, দেশের সমষ্টি। নিম্নশ্রেণীর এই সমষ্টির উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষা—এমন কি আত্মরক্ষাও এ যুগে অসম্ভব। এখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতেছেন যে এতকাল দেশের এই সমষ্টিকে ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়া এই সকল সম্পদ অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখায় হিন্দুজাতি এই সম্পদ-গুলিতে জগতের সকল জাতিকে অতিক্রম করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত জাতিহিসাবে উন্নত হইতে পারে নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে দেশের বহুসংখ্যক নরনারীকে অবনত ও অনুন্নত রাখিয়া অতি অল্পসংখ্যক লোকের উন্নতিতে সমগ্র দেশ বা জাতি উন্নত হয় না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের সকল বিষয়ে সমানাধিকার ও উন্নতিলাভের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, কোন ব্যক্তি

বা জাতিকে উন্নতিলাভের অধিকারে বঞ্চিত করা সেই ব্যক্তি বা জাতির উপর চরম অত্যাচারের নিদর্শন। এতকাল উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের উপর এই অত্যাচারের অভিযানই চালাইয়াছেন। ইহারই ফলে বিশ্বের উন্নত জাতিসমূহের আসরে হিন্দুজাতি আজও নিম্নস্থানে অধিষ্ঠিত। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের প্রত্যেকে যাহাতে উত্তম শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য, রোগে উত্তম চিকিৎসা এবং ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজে সমানাধিকার পায় উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নবর্ণের জনগণ এতকাল তাহাদের জন্মগত ন্যায্য অধিকার দাবী করিবার সুযোগ পায় নাই। এখন তাঁহারা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া সংঘবদ্ধ ভাবে সকল বিষয়ে সমানাধিকার বিশেষ জোরের সহিত দাবী করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানব-সাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত ও সুকৃত প্রণালীর মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতেও প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতিসকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্বার চাহিতেছে। এ সময়ে বিদ্যা ধর্ম ইত্যাদি যদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্মের নাশ হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে সম্বোধন করিয়া উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা, আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবেন, উহা ততই পচিবে, আর উহার মৃত্যুও ভয়ানক হইবে।" আমরা সময় থাকিতে স্বামীজীর এই অভিমত কার্যে পরিণত করিতে হিন্দুগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সত্য-সুন্দর

শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম্-এ

তুমি সত্য, তুমি পূর্ণ; তোমার আলোকে
আমার প্রয়াসরাশি এ নন্দিত লোকে
অমরার বাণী লয়ে যায় গুঞ্জরিয়া,
সার্থক বসন্তবন উঠে মুঞ্জরিয়া।
সৌন্দর্যের দ্বারে পাতা উজ্জ্বল শরণি
মঙ্গল-আলোক-দীপ্ত; নিখিল-ধরণী
বিভাসিত সে বিভবে, তাই এ হৃদয়ে
অসীম নিবিড় শান্তি অনন্ত বিস্ময়ে
স্মরে নিত্য সার্থকতা। পুষ্পের সৌরভে
বর্ণের বিচিত্রলীলা পরম গৌরবে,
বরিতেছে মহিমারে আনন্দ বিভায়,
সকলি স্পন্দিয়া উঠে দীপ্ত চেতনায়।
তুমি সত্য তাই সত্য আমার ভুবন,
অণু পরমাণু আর প্রতি পল-ক্ষণ।
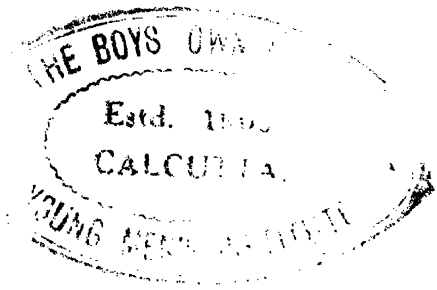
সুফীমতবাদ

শ্রীনীরদকুমার রায়

ভারতের ঋষিগণ গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা যে সকল সনাতন সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্য ও তত্ত্ব কালে কালে ভারতের বাহিরে অনেক দূরদেশকে পর্যন্ত আলোকিত ও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত তাহার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ, গণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসা-বিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সভ্যমানবের প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বহুবিষয়ের অংশই যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহুদেশকে দান করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায়। এমন কি, সুদূর আমেরিকাতেও যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অধুনা পাওয়া যাইতেছে। ভারতের এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতির ফলে সুপ্রাচীন কালে পারস্যদেশে, এবং পরে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তার আদান-প্রদানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং এই কেন্দ্র দুটিতে ভারতের সংযোগ ও চিন্তার প্রভাব যে বিশেষভাবে ছিল সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র লিখিয়াছেন, পারস্য ও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ, অর্থাৎ হিন্দুধর্মতত্ত্ববিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা বহুতর পারসিক ও গ্রীক প্রবাদ হইতে জানা যায়। এই সকল পরম্পরাগত প্রবাদ ম্যাক্‌সমূলার রিচার্ড গার্বে, হিবন্টারনিট্‌স্ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক তত্ত্বসমূহ হইতেই গ্রীকদর্শনের উৎপত্তি। থেল্‌স্ (৬০০ খৃঃ পূঃ), আনাক্‌সিমাণ্ডর, আনাক্‌সিমেনেস্, জেনোফেন্‌স্ (আনুমানিক ৫৭৫ খৃঃ পূঃ), এম্‌পিডক্‌লিস্ (৪৫০ খৃঃ পূঃ) প্রভৃতি গ্রীক মনীষিগণ হয় পারস্যদেশে, নয় ভারতবর্ষ পর্যন্ত আসিয়া বেদান্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ গঠিত করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের ভারতের সহিত সংযোগ সর্বজনবিদিত (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫৫০)। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার্থীদের এই সংযোগ সকল ক্ষেত্রে ভারতে না হইলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পারস্যে হইয়াছিল। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পিথাগোরাস্ "পৃথ্বীগুরু" নামে একজন হিন্দু ছিলেন এবং তিনি গ্রীসে গিয়া হিন্দু-দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রবাদ সকলে স্বীকার-যোগ্য বিবেচনা না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পুনর্জন্ম-মতবাদ এবং জ্যামিতির প্রসিদ্ধ সূত্রটি (ইউক্লিডের ৪৭শ সূত্র) নিঃসন্দেহে ভারত হইতে গৃহীত। জোন্‌স্, কোল্‌ব্রুক প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রোইডের (Schroeder) বলেন, ভারতই যে পিথাগোরীয় তত্ত্বসমূহের জন্মস্থান ইহা অবধারিত। সক্রেতিসের জীবনকালে (খৃঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯) ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ গ্রীসের রাজধানীতে যাতায়াত করিতেন।

একজন ভারতীয় দার্শনিকের সহিত এথেন্সে সক্রেতিসের তত্ত্বালোচনা হইয়াছিল এই কথা এরিস্‌টক্‌লিসের এক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। ইহা হইতে সক্রেতিসের চিন্তায় যে ভারতীয় প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সক্রেতিসের শিষ্য প্লেটোও (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) ভারতের কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী। মল্লিখিত "সুফীধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৫ দ্রষ্টব্য)। প্লেটোর মতবাদ স্পষ্টতঃই সাংখ্যীয় মত এবং পিথাগোরাস্ হইতে গৃহীত। কঠোপনিষদে উল্লিখিত আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের সহিত রথী, রথ ও রথাশ্বগণের প্রসিদ্ধ উপমাটি প্লেটো তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্লেটোর "রিপাব্‌লিক্" গ্রন্থে যাহা কিছু আছে সমস্তই ভারতীয় ভাব ও তত্ত্বসমূহের পুনরুক্তি। এইরূপে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের ভাব ও মতবাদ-সমূহ ভারতের মহনীয় চিন্তারাশির সংস্পর্শে ও প্রভাবে গঠন ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে ইহাতে সংশয় নাই। আর্যসংস্কৃতির এই মহা-প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল পারস্য।

পরবর্তী কালে আলেক্‌জান্দ্রিয়া ধর্মসংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মনীষার এই মিলন-মন্দিরেও ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দান বড় কম নয়। এই ভারতীয় সংস্কৃতির সমবায়েই ঈশাই ধর্মের ও নিও-প্লাটনিষ্ট্ মতবাদের মূল উপাদানগুলি উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছিল। এই নিও-প্লাটনিষ্ট্ মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা প্লটিনস্ (২০৫-২৭০ খৃষ্টাব্দ) ভারতীয় বৈদান্তিক ভাব গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আত্মসংযমের জন্য ভারতীয় যোগপদ্ধতি অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি জগৎকে যে ঐশ্বরিক সত্তার সম্প্রসারণ, বিস্তার বা ব্যাপ্তি মনে করিতেন, তাহাই বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের ভাব। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উপনিষদের 'সচ্চিদানন্দে'র ধারণার সহিত এক ছিল। বেদান্তের মতানুসারে তিনি বলিতেন, সকল পার্থিব বস্তুই বৃথা ও মূল্যহীন এবং মায়াজালমুক্ত হওয়াই মানুষের প্রধান কর্তব্য। তিনি সম্রাট গর্দিয়ানের দলবলের সহিত পারস্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সুফীধর্ম উদ্ভূত হয় প্রথমে তাঁহাদেরই মধ্যে যাঁহারা ছিলেন আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন এবং বেদান্ত-মতের দ্বারা প্রভাবিত। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার নিও-প্লাটনিষ্ট্ পন্থীদের প্রভাবও সম্ভবতঃ ইঁহাদের মনে বিস্তার লাভ করিয়া থাকিবে,—তাহাও মূলতঃ বেদান্তেরই প্রভাব।

সুফীধর্ম প্রচলনের কোনও নিদর্শন ১৫০ হিজিরার পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টমশতকের মধ্যভাগের অধিক পূর্বে পাওয়া যায় না। নবী মুহম্মদের দেহাবসানের অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে পারস্যদেশে ইস্‌লামধর্ম প্রবর্তিত হয়। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে প্রথম সুফীমতের উদ্ভব দেখা যায়। সুফীমতাবলম্বীদের দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তাঁহাদের নিজস্ব এক সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠে। পুরুষপরম্পরায় সুফীধর্মের পথ-প্রদর্শকগণের জীবনের আলোকে এই ধর্ম ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়াছে। ফলতঃ প্রাচীন পরম্পরাগত জরথুশ্‌ত্রীয় তথা বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং কোরানের নৈতিক অংশের মিশ্রণ হইয়াছে এই সুফীদের রীতিনীতিতে। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব এবং রাজযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ে ঈশ্বরলাভের উপায়—অর্থাৎ ঐশ্বরিক সত্তার সহিত এক হইয়া যাওয়ার প্রণালী ও উপায়। এইরূপে

এই ধর্মের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত এক একটি মূল ভাবের বহুপ্রকার অর্থ কালে কালে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, কেন না, পরে এক এক সুফী সাধক নিজ নিজ জীবনের বিশেষ বিশেষ উপলব্ধির ছায়াপাত সেই ভাবের উপর করিয়াছেন। সুফীরা বিশ্বাস করেন—

"নিজের জীবনে যে-ই করে
নিজ-কৃত নিয়ম পালন,
পৃথিবীতে সেই জন লভে
মহত্তম জীবন ও মরণ।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বোম্বাই-প্রবাস" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"মহম্মদীয় ধর্মের সহিত সুফীধর্মের অনেক প্রভেদ। এমন কি গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীকে স্বধর্মী বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সরস মধুর কবিতা-যোগে, কতক বা হিন্দুধর্মের সংশ্রবে বা অন্য কারণে কঠোর মহম্মদীয় ধর্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুফীধর্ম তার দৃষ্টান্ত-স্থল। এই ধর্মের আকরস্থান হিন্দুস্থান ব'লে অনেকের বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন যে মুসলমানদের ভারত আক্রমণ কালে কোনও এক হিন্দু ঋষি কর্তৃক এই ধর্ম প্রবর্তিত হয়। বস্তুতঃও সুফীধর্মের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের রিয়াজৎপ্রণালী হিন্দু যোগশাস্ত্রের প্রকারান্তর। এই যোগবলে জীবাত্মার উন্নত অবস্থা লাভ হয়। * * * সুফীমতে জীবাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই; জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি; পরমাত্মাই উহার চরমগতি। সাদী হাফিজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি ইহার পুরোহিত; আধ্যাত্মিক মদিরা নৃত্য গীত ইহার পূজোপচার; সুমন্দ বায়ুসেবিত পুষ্পসুবাসিত বিহঙ্গকলনাদিত সুরম্য উদ্যানকানন ইহার ভজনালয়।"

ইরাকী, শবিস্তরী ও জামী প্রমুখ প্রসিদ্ধ পারসিক সুফীকবিগণের গ্রন্থে সুফীমতবাদটি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুফীতত্ত্বানুসন্ধানিগণ সুফীতত্ত্বকে মুখ্যভাবে ও বিশিষ্টরূপে পারস্য দেশ জাত বলিয়াই মনে করেন। সুফীধর্মপ্রণালীর গোড়ার কথা এই যে—ঈশ্বরের শুধু যে সত্য অস্তিত্ব আছে তাহাই নয়, সৌন্দর্য ও কল্যাণ তাঁহারই নিজস্ব গুণ—যদিও এই গুণগুলি প্রত্যক্ষ জগৎপ্রপঞ্চে সহস্র সহস্র মুকুরে প্রতিবিম্বিত বা প্রকাশিত হইতেছে। ঈশ্বর পবিত্র সত্তা এবং যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে (মা সিবা উল্লাহ), তাহাদের অস্তিত্ব ততটুকুই, ঈশ্বরের যতটুকু তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আবার, ঈশ্বর বিশুদ্ধ কল্যাণ (খৈর-ই-মহজ) ও অকলঙ্ক সৌন্দর্য; সুফী কবিরা তাই তাঁহাদের রূপক-প্রণয়-কবিতায় তাঁহাকে 'প্রকৃত-প্রিয়' বা 'প্রেম-পাত্র,' 'চির-প্রিয়' 'সেই প্রেমাস্পদ' (মা'শূক্) প্রভৃতি সম্বোধনে বার বার সম্বোধিত করিয়াছেন। জামী বলিয়াছেন: "কোনও হৃদয় যখন প্রেমের অধীন হয়, সে তাঁহারই (ঈশ্বরের) মোহিনী শক্তির বলেই হয়। তাঁহার প্রেমে হৃদয় প্রাণ পায়। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে আত্মা জয়যুক্ত হয়। যখন কোনও হৃদয় এই পৃথিবীর সুন্দর বস্তুগুলিকে ভালবাসে বলিয়া মনে হয়, জানিবে সে তাঁহাকেই ভালবাসে। সাবধান! একথা বলিও না যে, তিনি নিখিল সুন্দর এবং আমরা তাঁহার প্রেমিক। তুমি ত দর্পণ মাত্র, এবং যে মুখখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই তিনি-ই। তিনিই শুধু স্বপ্রকাশ, এবং তুমি প্রকৃত পক্ষে প্রচ্ছন্ন। যে বিশুদ্ধ প্রেম সৌন্দর্যেরই মত তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছে, তাহাই তোমাতে প্রকাশিত হইতেছে। যদি একাগ্র চিত্তে দেখ, দেখিবে যে ঐ দর্পণও তিনিই;

তিনি রত্ন ও রত্নাধার দুই-ই হইয়াছেন। এখানে আমি ও 'তুমি'র স্থান নাই—উহা মিথ্যা কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র।"

এইভাবে সুফীরা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব তওহিদ্ বুঝেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনও প্রভু বা দেবতা নাই। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই—অদ্বৈত ভাব। এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ঘটনাপরম্পরাময় জগৎপ্রপঞ্চ একটা মরীচিকা মাত্র—শূন্যের বা অনস্তিত্বের উপর অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বে মূল অস্তিত্বের বা সত্তার গুণ প্রকাশিত অর্থাৎ প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। ঐ গুণের অংশমাত্রও তাহার মধ্যে আসে নাই—যেমন অস্তিত্বরূপী সূর্য অনস্তিত্বরূপী জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত। এখানে সূর্যের এই প্রতিবিম্ব (প্রকাশময় জগৎ) একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত লয়ধর্মী ঘটনা; উহা মুহূর্তমধ্যে একটা চলন্ত মেঘের দ্বারা, কিম্বা অকস্মাৎ বায়ুর সঞ্চালনে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণরূপে সূর্যের অধীন যদিও সূর্য ইহা হইতে সম্পূর্ণ অনধীন। তবু এই প্রতিবিম্ব যতক্ষণ প্রকাশিত থাকে ততক্ষণ ইহা সেই পরিবর্তনহীন মূল সত্তাটির প্রকৃতি ও গুণ অল্প বিস্তর প্রকটিত করিয়া দেয়। প্রসিদ্ধ সুফী সাধক কবি জলালুদ্দীন রূমী লিখিয়াছেন—

"মৃত্তিকার বিবর্ণ ভঙ্গুর এই ছবি
সেই দিব্য-নিদানের হীন প্রতিচ্ছবিঃ
কি হবে সে রূপে, যাহা ভাঙ্গে আর গড়ে
যা হতে রচিত ইহা, সে ত চিরজীবী!"
—দিবান্-ই শাম্‌শ্-ই-তব্‌রীজ্।

মনে হয়, সৌন্দর্যের স্বভাবই এই যে সে নিজেকে প্রকাশ ও প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হয়, এবং এই গুণটি সেই অনন্ত সৌন্দর্যের নিকট হইতেই লব্ধ। "আমি ছিলাম এক গোপন রত্ন, অজ্ঞাত রহস্য; প্রকাশিত হইতে আমার ইচ্ছা জাগিল, তাই আমি বিশ্বসৃষ্টি করিলাম। সকলের মধ্যে যেন আমি খ্যাত হই"—ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছিলেন, ইহাই সুফীদের ধারণা। ইহা বেদান্তের সেই একোঽহং বহু স্যাম্-এর ভাবানুসরণ।

এই ঈশ্বরসত্তাকে জানা যায় কি প্রকারে? কোন দুজ্ঞের্য় সত্তা বা বস্তুকে জানা যায় তাহার বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়া, যেমন অন্ধকার দিয়া আলো, মন্দ দিয়া ভাল, রোগ দিয়া স্বাস্থ্য, ইত্যাদি। অতএব অস্তিত্ব বা সত্তা প্রকাশিত হইতে পারে অনস্তিত্বের ('নেতি নেতি'র) মধ্য দিয়া; অর্থাৎ অলীক দৃশ্যময় জগতের ভিতর দিয়াই সেই একমাত্র সত্যবস্তু প্রকাশ পায়। তবে দেখা যাইতেছে, একপ্রকার স্বশূন্যতা বা আত্ম-বিলোপের দ্বারাই অনন্ত সৌন্দর্য প্রকাশমান হয়। সুতরাং ভাল ও মন্দের মধ্যে এই মন্দের রহস্যও সৃষ্টি-রহস্যের সঙ্গে একীভূত এবং সৃষ্টি-রহস্য হইতে অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু মন্দকে একটা পৃথক সত্তা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। যেমন অন্ধকার একটা পৃথক সত্তা নয়, আলোকের অভাব বা শূন্যতা মাত্র, তেমনি মন্দও ভাল'র অভাব মাত্র বা সত্তাহীনতা। আবার, যেমন বর্ণহীন উজ্জ্বল শুভ্র আলোক ত্রিকোণ কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইলে নানা রঙ্ পায়, এবং অনেকটা ক্ষীণ হইয়া যায়, অথচ তাহা আলোকই থাকে, তেমনই সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-সত্তার মধ্যেও কিছু কিছু ভাল থাকিয়া গেলেও তাহা অনেকাংশে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সেই 'বর্ণহীন লোক' (আলম্-ই-বি-রঙ্গী) হইতে বিচ্যুত হইলেই জগতের মধ্যে যত বিরোধ ও বিসম্বাদ উৎপন্ন হয়। রূমী তাঁহার মস্‌নবীতে বলিয়াছেন,—"বর্ণহীনতা যখন বর্ণের বন্দী হইল, তখনই এক মুসা অন্য এক মুসার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।" জামীও বলিয়াছেন—

"তুমি অদ্বিতীয় সত্তা ; আর সব ছায়াবাজী প্রায় ;
বিশ্বে তব যত বস্তু সবি এক তোমাতেই রয়।
তব বিশ্বজোড়া রূপ প্রকাশিতে স্বকীয় পূর্ণতা
অগণ্য মুকুরে দেয় দেখা, তবু রহে একই সত্তা।
যদিও সৌন্দর্য তব সব সুন্দরের পিছে ধায়,
অদ্বিতীয় অনুপম হৃদি-হারী সেই একই রয়।
জগতের যত দুঃখ-রোল উঠে তাঁরি লীলা হতে ;
জানা গেল, অশিবেরও মূল উৎস রয়েছে তাঁহাতে।"

আর এক দিক হইতে দেখিলে, জগতে বস্তু-সত্তার ক্রম বা বিভিন্ন স্তরকে সৃষ্টির সংজনন-প্রবাহের একটা নিম্নগামী ধারা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে ; সে ধারা যতই সেই অদ্বিতীয় সত্তার বর্ণহীন অকলঙ্ক আলোক হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ ক্ষীণ, অপ্রকৃত, বস্তুধর্মী ও অনুজ্জ্বল হইতে থাকে। ইহাই হইল 'অবতরণ-চক্র-রেখা'।

আর, 'আরোহণ-চক্র-রেখা'র দ্বারা বস্তু-সত্তার ক্রম-পরিণতির চরমতম ফল মানুষ তাহার আপন মূল আবাসে ফিরিয়া আসে, এবং ঈশ্বরে লীন (ফনা ফি'ল্লা) হইয়া একমাত্র সত্য বস্তু সেই ঐশ্বরিক সত্তার সহিত এক হইয়া যায়।—"সকলেই নিজ উৎপত্তি-স্থলে ফিরিয়া আসে।" এইখানে সুফীগণ যৌগিক নীতি-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, মন্দটা ভ্রম মাত্র। ইহা দূর করিতে হইলে, আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে সেই অজ্ঞান বা অজ্ঞতা হইতে, যে অজ্ঞানের বশে আমরা মিথ্যা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের ছায়া-বাজীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। পাপময়, অর্থাৎ ভ্রমপূর্ণ, ক্ষতিকর সমস্ত বাসনা, সকল দুঃখ ও বেদনা অহংবুদ্ধি হইতে প্রসূত হয় এবং এই অহংবুদ্ধি একটা মায়া। তাই, হিন্দু-ধর্ম্ম-পথের মতই, সুফী-পথের প্রথম সোপান হইতেছে অহংবুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া। এই পথে প্রেমই শ্রেষ্ঠ রসায়ন। প্রেমের দ্বারাই মানবত্বের খাদ ঐশ্বরিক খাঁটী সোনায় পরিণত হয়। এমন কি, পার্থিব ভালবাসার মধ্য দিয়া ঈশ্বর-লাভেচ্ছু ধর্মপথযাত্রী (সালিক্) অহংকে ভুলিতে শিখে, নিজেকে ভুলিয়া শুধু প্রেমাস্পদকেই দেখে, এবং এমনি করিয়া সে ক্রমশঃ উপলব্ধি করে যে, প্রেমাস্পদের মধ্যে যে বস্তুটিকে—যে গুণ-টুকুকে—অর্থাৎ যে সৌন্দর্যটুকুকে সে ভালবাসে, তাহা সেই অনন্ত-সৌন্দর্যের একটি অস্পষ্ট প্রতি-চ্ছায়া মাত্র, যে অনন্ত-সৌন্দর্য নিরন্তর "অগণিত আদর্শে প্রতিফলিত হইয়াও এক অদ্বিতীয় সত্তা-রূপে বিরাজ করিতেছে।" এইখানে জ্ঞান-মার্গের সহিত ভক্তি-মার্গের যোগ।

এইরূপে সুফীর ঈশ্বরসাধনার কয়েকটি সোপান আছে। প্রথমে ইহজগতের নশ্বরতা উপলব্ধি করা, উহাকে অস্বীকার (নাফী) করা ; —এ জগৎ আমার নিবাস-স্থান নয়, ইহা দুদিনের পান্থনিবাস মাত্র, আজ আছে কাল নাই,—এই জ্ঞান। এই জ্ঞান—মায়ার নাগপাশ হইতে এই মুক্তি হয় প্রেমের পথে ;—পার্থিব প্রেম (ইশ্ক্ মেজাজী) নয়, ঐশ্বরিক প্রেম (ইশ্ক্ হকীকী), —তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা। ইহার পর, এই প্রেম-সাধনার দ্বারা, ইহজগতের এই মরীচিকার পারে অবস্থিত ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য একাগ্র-চিত্ত হওয়া—এই বিশ্ব-প্রকৃতির সকল বস্তুর মধ্যেই সেই প্রিয়তমের প্রতিচ্ছবি দর্শন। এই অবস্থা হইলে সুফী তখন জগতকে সেই পরম প্রেমাস্পদের প্রমাণের সাক্ষিস্বরূপে স্বীকার (ইস্বাত্) করেন। এই সোপান-পরম্পরা হইতে অবশেষে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্তি—'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'। সেই চরম সোপান-শীর্ষে আরোহণ করিয়া সুফী ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় 'সোহহং' (অন'ল্ হক্) অবস্থা প্রাপ্ত হন।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমস্যা

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

প্রাচ্য হিন্দু-সমাজে গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থী আদি অধিকাংশ লোকেই পঞ্জিকানুবর্ত্তী হইয়া গৃহধর্ম্ম, ব্রত, পার্ব্বণ, উৎসব, যাত্রা ও স্ব স্ব আশ্রমোক্ত কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে, এমন কি এক বাঙ্গলা দেশেই পঞ্জিকা অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সকল পঞ্জিকায় প্রকাশিত তিথি নক্ষত্র, যোগ ও করণ-সমূহের আরম্ভ বা অন্ত-কাল এবং তদনুযায়ী স্মৃতি ব্যবস্থা ও শুভদিনের (বিবাহ, উপনয়নাদির) নির্ঘণ্টও এক রূপ দেখা যায় না। পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে

'পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকা'র উক্তি

"আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে বহু প্রকার সমালোচনা প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছে। অধুনা আবার নূতন উদ্যমে পঞ্জিকা-সংস্কার লইয়া বেশ একটা আন্দোলন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বহুবার বহু সভায় পঞ্জিকা-সংস্কার যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাদৃশ আগ্রহান্বিত না হওয়ায় এবং মাননীয় পণ্ডিত-সমাজ অদ্যাপি এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায়, আমরা প্রাচীন মতানুযায়ী গণনার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে ঐকমত্য হইলে শীঘ্রই আমরা নূতন রূপে সংস্কৃত পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে পারিব এইরূপ আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি···।"

—নিবেদক, শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা (বাক্‌চি)।

পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার "ভূমিকা"য় লিখিত হইয়াছে যে—"ধর্ম্ম-কার্য্যে সূক্ষ্ম তিথ্যাদির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া গণিত-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাঘবানন্দ-বিরচিত (যে রাঘবানন্দ-প্রণীত 'সিদ্ধান্ত-রহস্যা'নুসারে বঙ্গে প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে ঔদয়িক গ্রহ-স্ফুট, সঞ্চার, উদয়াস্ত, বক্র ও বক্র-ত্যাগ প্রভৃতি গণিত হয়, সেই রাঘবানন্দ-বিরচিত) 'দিন-চন্দ্রিকা' মতে তিথ্যাদি গণনা করাইতেছি। 'দিনকৌমুদী' মতে তিথ্যাদি সহজে সাধিত হইলেও সূক্ষ্ম নহে। কারণ 'দিন-কৌমুদী'কার রামচন্দ্র শর্ম্মা প্রাচীন গ্রন্থ 'দিন-চন্দ্রিকা'র ছায়া অবলম্বন করিয়া শ্রম-লাঘবার্থ স্থূলরূপে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব কষ্টসাধ্য হইলেও আমরা সূক্ষ্মতর 'দিন-চন্দ্রিকা' অবলম্বনে তিথ্যাদি সাধন করিতেছি।"

বলা বাহুল্য নিম্নোক্ত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার "ভূমিকা"-অংশ পাঠে জানা যাইবে যে গুপ্তপ্রেস 'দিন-কৌমুদী'-মতে তিথ্যাদি গণনাপূর্ব্বক পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়া থাকেন। সুতরাং পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার এই 'ভূমিকা'-পাঠে এই সিদ্ধান্তই ইঙ্গিত করা হইল বলিয়া মনে হয় যে 'দিন-কৌমুদী'র প্রথানুসারে গণিত তিথি ও এবংবিধ তিথি-যুক্ত পঞ্জিকা অর্থাৎ গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা হেয় ও ধর্ম্মাচরণে অনুপযুক্ত।

সংস্কার-সম্বন্ধে 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা'র উক্তি

"পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আমরা এতদিন স্পষ্ট করিয়া কিছু বলি নাই। আমাদের মনোগত

অভিপ্রায় এই যে সন ১৩২২ সালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভাপ্রচারিত 'অসতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিরোধে দৃগ্‌গণিতৈক্য-সাধনমস্মাকং সম্মতম্‌" এই মূল প্রস্তাবের অনুযায়ী সুবিশুদ্ধ সারণী প্রকাশিত হইলে তদনুসারে পঞ্জিকা সুসংস্কৃত হইবে। যত দিন তাহা না হইতেছে তত দিন প্রাচীন নিয়মের অনুবর্ত্তন করাই যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্র-সম্মত ……।" —প্রকাশক।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁহাদের পঞ্জিকায় প্রাচীন মতে গণনার ফলে অনেক অশুদ্ধি রহিয়াছে। গুপ্তপ্রেস-পক্ষীয়গণের সহযোগী বিজ্ঞ ও পণ্ডিত-ধুরন্ধরগণের সংখ্যাও কম নহে, এবং বর্ত্তমান-কালোচিত গ্রহ ও 'গ্রহণ' আদি গণনার পণ্ডিতেরও তাঁহাদের অভাব নাই। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য ইহাই যে (১)—যদি প্রস্তাবিত 'সারণী' গ্রন্থ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রাচীন মতেই পঞ্জিকা-গণনা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তৎপূর্ব্বে 'গ্রহণ'-গণনার সংস্কার তাঁহারা কেন গ্রহণ করিলেন? যদি পঞ্জিকার অংশ-বিশেষ 'গ্রহণ'গণনার সংস্কার-গ্রহণ ও তদনুযায়ী পঞ্জিকার আংশিক সংশোধন করা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তবে তিথ্যাদি ও গ্রহগণের যথার্থ অবস্থিতি-জ্ঞাপক স্ফুট-গণনা-গ্রহণে তাঁহাদের আপত্তি কেন? (২)—পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ আদি প্রণীত 'করণ-বল্লভ' আদি যে দুই তিন খানি ইদানীন্তন 'সারণী'-গ্রন্থ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি পঞ্জিকা-গণনায় অপূর্ণ বা পাশ্চাত্যস্পৃষ্ট দোষ-যুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া হেয় বলা হয়, তবে গুপ্তপ্রেসের যে সকল মাননীয় পণ্ডিত-মহোদয় গ্রহণাদি-গণনার কাল-প্রাপ্ত অশুদ্ধির বর্ত্তমান-কালোচিত সংস্কার পূর্ব্বক যথাযথ গণনা-প্রকাশে নিপুণ তাঁহাদের নিকটই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা সূর্য-সিদ্ধান্তাদি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের সংজ্ঞানুকরণে বর্ত্তমান-কালোচিত সংস্কার পূর্ব্বক দৃগ্‌গণিতৈক্য গ্রহ-স্ফুট ও তিথ্যাদিযুক্ত পঞ্জিকা-প্রণয়নের সহায়ক একখানি উত্তম 'সারণী'-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিজেদের পঞ্জিকারও সংস্কার করুন এবং বাঙ্গলায় এক অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার 'ভূমিকা'য় লিখিত হইয়াছে—"প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহ 'দিন-কৌমুদী' ও দিন-চন্দ্রিকা' গ্রন্থানুসারে গণিত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা রামচন্দ্র শর্ম্মা এবং রাঘবানন্দ শর্ম্মা গ্রন্থ-রচনা-কালে অয়নাংশ, চর এবং সংস্কার ভুজান্তর পূর্ব্বক তিথ্যাদি নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে অয়নাংশের পরিবর্ত্তনে নূতন চরাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশও দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পঞ্জিকার গণকগণ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বর্ত্তমান সময়োপযোগী চরাদি-সংস্কার-দানে অসমর্থ হইয়া গ্রন্থ-সময়ানুযায়ী চরাদি-সংস্কারানুসারে গণনা করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করিতেছেন। আমাদের পঞ্জিকার সিদ্ধান্তশাস্ত্রকুশল লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গণক-মহোদয়গণ অয়নাংশাদির পরিবর্ত্তনানুসারে চরাদি-সংস্কার সূক্ষ্মরূপে সাধন করিয়া 'দিন-কৌমুদী' মতে তিথ্যাদি গণনাপূর্ব্বক পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং একমাত্র আমাদের পঞ্জিকাই যে বিশুদ্ধ ও ধর্ম-কর্ম্মোপযোগী তাহা নিজমুখে প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র।"

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভূমিকার এই অংশ পড়িয়া বুঝিতে হইবে যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ব্যতীত অন্য সকল পঞ্জিকার গণকগণ যেন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এবং তাঁহাদের পঞ্জিকার তিথিতে সময়োপযোগী চরাদি সংস্কার নাই। অধিকন্তু পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার উপর্যুক্ত ভূমিকাংশ-

পাঠে জানা যায় যে পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকা "দিন-চন্দ্রিকা" অবলম্বনে তিথ্যাদি সাধনপূর্ব্বক গণিত হয়; সুতরাং গুপ্তপ্রেসের ভূমিকার সিদ্ধান্তানুসারে পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার গণনা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ।

'দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী'

শ্রীরাঘবানন্দ শর্ম্মা নামক বঙ্গ-দেশীয় একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের সংজ্ঞানুসারে তিথি-গণনার 'সিদ্ধান্ত-রহস্য' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গণকগণের শ্রম-লাঘব ও সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত স্থূল ভাবে তিথি গণনার উপযোগী 'দিন-চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের করণাব্দ ১৫২১ এবং উহাতে ঐ সময়ের অয়নাংশ, ভুজফল, ভুজান্তর গৌড়ীয় চর ও তত্রত্য দেশান্তর আদির ব্যবহার করা হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা ১৫৬৬ শককে করণাব্দ করিয়া ঐ সময়ের অয়নাংশ, ভুজ-ফল, ভুজান্তর, গৌড়ীয় চর ও তত্রত্য দেশান্তর আদি ব্যবহার পূর্ব্বক 'দিন-কৌমুদী' নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। অয়নাংশ অবলম্বনে বিচার করিলে 'দিন-চন্দ্রিকা' হইতে 'দিন-কৌমুদী' কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর।

এই গ্রন্থ দুইখানি অবলম্বনে পি এম্ বাক্‌চির ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা গণিত হয়। উভয় পঞ্জিকার 'ভূমিকা'য় উপরি-উক্ত মন্তব্য পড়িলে জ্যোতিষিক গণনায় অজ্ঞ জন-সাধারণ বুঝিবেন যে এক পঞ্জিকা 'অয়নাংশাদির পরিবর্ত্তনানুসারে চরাদি সংস্কার সূক্ষ্মরূপে সাধন' করিতে 'কুশল' ও 'লব্ধ-প্রতিষ্ঠ' এবং অন্য 'পঞ্জিকা ধর্ম্ম-কার্য্য সূক্ষ্ম তিথ্যাদির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া' 'কষ্টসাধ্য হইলেও সূক্ষ্মতর······তিথ্যাদি সাধন' করিতে পরাঙ্‌মুখ নহেন। এবংবিধ পরস্পর বিবদমান ভূমিকা-পাঠে সাধারণ জন-সমাজের স্বতঃই সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন উঠে যে 'তাহা হইলে পি এম্ বাক্‌চি ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা-দ্বয়ের মধ্যে কোন্‌খানির গণনা ও তিথ্যাদি সূক্ষ্মতর ও শ্রেষ্ঠতর?' এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য যে কোনও ব্যক্তি যদি একই বৎসরে উক্ত দুইখানি পঞ্জিকার একই দিনের তিথ্যাদির দণ্ড-পলাদি বা ঘণ্টা-মিনিটাদি দ্বারা উল্লিখিত তিথ্যন্ত কালের তুলনা করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য; এবং গৃহীত অয়নাংশও উভয় পঞ্জিকাতেই প্রায়শঃ একই হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত 'দিন-কৌমুদী' ও 'দিন-চন্দ্রিকা'তে সময়োপযোগী নূতন চরাদি সংস্কারের কোনও উপদেশ লিখিত আছে কি না এবং এই গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে যে সকল তিথি গণনা করা হয় তাহাতেও বর্ত্তমান সময়োপযোগী চরাদি সংস্কার করা থাকে কি না, ইহা যে কোনও ব্যক্তি একবার এই গ্রন্থদ্বয় অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যেহেতু এবংবিধ কোনও চলিত কালোপযোগী সংস্কারের পন্থা ইহাতে উপদিষ্ট হয় নাই, এজন্য অয়নাংশ ও গ্রহ-পতির পরিবর্ত্তন জন্য যে সকল ভ্রম পুঞ্জীভূত হইতেছে; তাহা 'দিন-চন্দ্রিকা'দি[১] মতে গণনায়, ক্রমশঃ যত বর্ষ অতীত হইতেছে তত, অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িতেছে।

'দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী' মতে গণনায় গুপ্তপ্রেস ও পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার প্রকাশকগণ স্ব স্ব পঞ্জিকায় কালক্রম-প্রাপ্ত পুঞ্জীভূত অশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব পঞ্জিকার ভূমিকায় পঞ্জিকা-সংস্কার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু একজন[২] জন-সাধারণ

১ 'দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী' অবলম্বনে গণনা-ফলের বর্ত্তমান সময়ে অশুদ্ধির আধিক্য প্রদর্শন পাঠকগণের নিকট দুরূহ অঙ্ক-জালাত্মক প্রতীয়মান হইবে বলিয়া এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

২ পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকা। উপরি-উক্ত 'সংস্কার সম্বন্ধে পি এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকার উক্তি' দ্রষ্টব্য।

অশুদ্ধ পঞ্জিকা-ক্রয়ে বিরত হইতেছেন না বলিয়া, এবং অপরে[৩] সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করিবার মত স্বপক্ষীয় মাননীয় নিশ্চেষ্ট পণ্ডিত-ধুরন্ধরগণের সম্মুখে কেহ তাঁহাদের মনোমত প্রস্তুত 'সারণী'-মৃগ আনয়ন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, ইচ্ছা সত্ত্বেও স্ব স্ব পঞ্জিকার অশুদ্ধি-সমূহের সংস্কারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও প্রকাশন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এতদ্ব্যতীত পঞ্জিকা-সংস্কারের পরিপন্থী অপর এক কারণ ইহাই যে একদল রক্ষণশীল মাননীয় পণ্ডিতবর্গ স্বগৃহস্থ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ-নির্ম্মিত কূপোদকে পঙ্কোদ্ধরণে অসম্মতিবৎ প্রাচীন প্রণালী অবলম্বনে গণনায় কালক্রম-প্রাপ্ত পুঞ্জীভূত অশুদ্ধি-পঙ্কোদ্ধরণের জন্য 'পাতি'[৪] দিতেছেন না।

'দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী'র গণনা-ফল আলোচনায় ইহাই দেখা যায় যে এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; যাহা কিছু সারণী-পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য আছে বা গণনা-ফলে তজ্জন্য যৎসামান্য হয়, তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে; দুইখানি সারণী-গ্রন্থের সাহায্যে কৃত গণনা-ফলই স্থূলভাবে পাওয়া যায়; এবং এই দুইখানি গ্রন্থের গণনা ফলই কাল-ক্রমে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের গণনার স্খলন বশতঃ স্খলিত হইয়া আসিতেছে; এমন কি যত দিন অতীত হইতেছে, তত বেশী স্খলন বাড়িতেছে। ভারতে বহুশতাব্দী যাবৎ জ্যোতিষের মৌলিক গবেষণা হয় নাই। ব্রহ্মগুপ্তের পর হইতে পরাশর, মিহির, দুর্গসিংহ, এমন কি কেশব-দৈবজ্ঞ ও গণেশ-দৈবজ্ঞের সময় পর্য্যন্ত যুগে-যুগে হিন্দুজ্যোতিষের সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গবেষণার সহিত 'দিন-কৌমুদী' ও 'দিন-চন্দ্রিকা'র গণনা-ফল মিলাইয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের গণনা-ফলে অনেক অশুদ্ধি জমিয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থদ্বয়ের গণনা-ফল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ মান-মন্দিরের গণনা-ফলের সহিত মিলিতেছে না দেখিয়া, বাঙ্গলায় পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে। সেই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা"র উদ্ভব হইয়াছে। এই পঞ্জিকা স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সারণী অনুসারে এবং 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা'-নির্দ্দিষ্ট 'পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি'র সিদ্ধান্তানুযায়ী পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লব স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ প্রণীত 'করণ-বল্লভ' গ্রন্থের সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক গণিত। এই পঞ্জিকার গণনা-ফল পাশ্চাত্য দৃক্-সিদ্ধ পঞ্জিকা-সমূহের সহিত প্রায়শঃ সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-পক্ষীয়গণের বক্তব্য

"এই পঞ্জী[৫] সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থের সংজ্ঞানুসারে গণিত হয় এবং বর্ত্তমান কালোচিত নূতন সংস্কারাদি প্রয়োগদ্বারা দৃক্-সিদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যরক্ষা করে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ভ্রান্তি-মূলক গণনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের সহিত নবীনতম গবেষণা-মূলক সংস্কারাদির সাহায্যে দৃক্-শোধিত পঞ্জিকা প্রকাশিত করা। দৃষ্টির সহিত গণনার একতাই পঞ্জিকার বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে কোন গ্রন্থের সাহায্যে দৃক্-সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।"

—'পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর' আষাঢ়, ১৩৫১।

"বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ব্যতীত বঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সকল পঞ্জিকাই যে ভ্রান্ত, তাহা নিম্নোক্ত ......বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

৩ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। উপরি-উক্ত 'সংস্কার সম্বন্ধে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার উক্তি' দ্রষ্টব্য।

৪ ব্যবস্থা বা অনুমোদন।

৫ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা।

"চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ-কালের পার্থক্য দ্বারা পূর্ব্বে পঞ্জিকার শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ণয় করা যাইত; কিন্তু বর্ত্তমানে বাগচি পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা বিলাতী পঞ্জিকা হইতে গ্রহণ-গণনা লইয়া পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন, সেইজন্য গ্রহণের কাল বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের সহিত এক হয়, কিন্তু পূর্ণিমান্ত বা অমান্ত কালের কোন প্রকার ঐক্য হয় না। পূর্ণিমান্ত কাল ও চন্দ্র-গ্রহণের মধ্যকালের পার্থক্য অতি সামান্য, ৮।১০ মিনিটেরও কম। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উক্ত পার্থক্য চিরকালই সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু বাগচির পঞ্জিকায় ও গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় দেখা যাইবে যে উক্ত পার্থক্য অতি বিপুল, অনেক সময় ১ ঘণ্টারও অধিক।"—শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র লাহিড়ী, এম্-এ, গণিতাচার্য্য।

এ বৎসরে সংঘটিত দুইটী চন্দ্র-গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩; ৭ই জুন, ১৯৪৬, শুক্রবার, পূর্ণিমান্ত কাল—'দিন-চন্দ্রিকা' মতে রাত্রি ঘণ্টা ১১।৪৮।৩৬; 'দিন-কৌমুদী' মতে রাত্রি ঘণ্টা ১১।৪৪।৪২; 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' মতে রাত্রি ঘণ্টা ১২।৩৬ মিঃ; বঙ্গীয় সকল পঞ্জিকা-মতে গ্রহণ-মধ্য-কাল রাত্রি ঘণ্টা ১২।৩২ মিনিট। সুতরাং পূর্ণিমান্ত ও গ্রহণ-মধ্য-কালের অন্তর 'দিন-চন্দ্রিকা' মতে গণিত পঞ্জিকায় ৪৩ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, 'দিন-কৌমুদী' মতে গণিত পঞ্জিকায় ৪৭ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড এবং 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'য় কেবল ৪ মিনিট। বলা বাহুল্য পূর্ণিমান্ত কালেই গ্রহণ-মধ্য সময় হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ চন্দ্রের কিঞ্চিৎ শর থাকায় গ্রহণ-মধ্য ও পূর্ণিমান্ত কালের প্রভেদ ন্যূনাধিক ৮।১০ মিনিট মাত্র হইতে পারে। ইহার অধিক প্রভেদ যে মতে পাওয়া যাইবে তাহার তিথি গণনা অশুদ্ধ বলিতে হইবে।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩; ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬, রবিবার পূর্ণিমান্ত কাল—'দিন-চন্দ্রিকা' মতে রাত্রি ঘণ্টা ১২।১৭।২৯; 'দিন-কৌমুদী'-মতে রাত্রি ঘণ্টা ১২।১৩।২০; 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' মতে রাত্রি ঘণ্টা ১১।৪৫ মিঃ; এবং সকল পঞ্জিকা মতেই ঐ দিন গ্রহণ-মধ্য কাল রাত্রি ঘণ্টা ১১।৪১ মিঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই দিন পূর্ণিমান্ত ও গ্রহণ-মধ্য সময়ের ব্যবধান 'দিন-চন্দ্রিকা'-মতে গণিত পঞ্জিকা-সমূহে ৩৬ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড; 'দিন-কৌমুদী'-মতে গণিত পঞ্জিকা-সমূহে ৩২ মিনিট ২০ সেকেণ্ড; এবং 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত'-পঞ্জিকায় কেবল চারি মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ কৃত শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তের ৪।১৬ শ্লোকের বঙ্গানুবাদে আছে—"স্পষ্ট তিথির শেষে মধ্য-গ্রহণ হয়—তাহা হইতে সূক্ষ্ম স্থিত্যর্দ্ধ দণ্ড বিয়োগ করিলে স্পর্শ-কাল হয় এবং যোগ করিলে মোক্ষ কাল হয়।" উপরে বলা হইয়াছে যে পূর্ণিমান্ত সময়েই গ্রহণ-মধ্য হইবে—কিন্তু কার্য্যতঃ চন্দ্রের কিঞ্চিৎ শর থাকায় গ্রহণ-মধ্য ও পূর্ণিমান্ত সময়ের অনধিক ৮।১০ মিনিটের মাত্র প্রভেদ হইতে পারে। সুতরাং যে সকল 'সারণী-'গ্রন্থ অনুসারে গণিত পঞ্জিকায় পূর্ণিমান্ত সময় (চন্দ্রগ্রহণে) ও অমান্ত সময় (সূর্য্য গ্রহণে) চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণ মধ্য-কাল হইতে অধিক-হইতে-অধিক ১০।১২ মিনিটের উপর ব্যবধান হইবে সেই সকল পঞ্জিকার শুদ্ধতা* সম্বন্ধে

* উপরি-উক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে উভয় দিনেই 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-মতে পূর্ণিমান্ত ও গ্রহণ-মধ্য সময়ের পার্থক্য মাত্র চারি মিনিট এবং অন্যান্য সকল পঞ্জিকায় পার্থক্য ৩২, ৩৬, ৪৩ ও ৪৭ মিনিটেরও উপরে। সুতরাং কেবল বিদেশীয় মান-মন্দিরের গণিত প্রমাণানুযায়ীই নহে, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থেরও সংজ্ঞানুযায়ী এ বৎসরের গ্রহণ-দ্বয় হইতে দেখা যায় একমাত্র 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র তিথি গণনাই প্রাচীন ও আধুনিক

অত্যন্ত সন্দেহ আছে। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের আশ্রিত 'সিদ্ধান্ত-রহস্য', 'দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী' গ্রন্থ অবলম্বনে গণিত পূর্ণিমান্ত কালই বঙ্গের বিভিন্ন পঞ্জিকায় বিভিন্ন সময়-জ্ঞাপক হইতেছে। একই সূর্য্য-সিদ্ধান্তাশ্রিত এই গণনাকে ভিত্তি করিয়া বাগচি ও গুপ্তপ্রেস আদি পঞ্জিকার দুই রকম তিথিই কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে? এতদতিরিক্ত 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র তিথ্যন্ত-কাল' আবার তৃতীয় রকমের সময়-জ্ঞাপক। যে কোন গ্রন্থের পদ্ধতি অবলম্বনে অঙ্ক কষিয়া তদনুযায়ী উত্তরযুক্ত কোনও পঞ্জিকায় ভুল নাই, ইহা সত্য কথা; কিন্তু সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদি সমস্ত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের[৮] সংজ্ঞানুমোদিত, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি হইতে প্রাপ্ত, তিথির ব্যাপকতা[৯] ও তিথ্যন্ত সকল পঞ্জিকাতেই একরূপ হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র শুদ্ধ পঞ্জিকা সেই খানাকেই মানিতে হইবে যাহার গণনা মান-মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণ-যন্ত্রের দৃক্-সিদ্ধের সহিত মিলিয়া যাইবে। নিম্ন-প্রদত্ত ইংরাজী অভিমত খানি পাঠ করিলে বোঝা যাইবে যে 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র সকল গণনাই মান-মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণমূলক দৃক্-সিদ্ধ গণনা-ফলের সহিত হুবহু মিলিয়া থাকে।

সুতরাং ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ বিভিন্ন ফল-জ্ঞাপক পঞ্জিকা-সমূহের তিথ্যাদি গণনা-ফল ও ব্যবস্থাদি হিন্দু-সমাজের ধর্ম্ম-কার্য্যাদির উপযোগী কি না তাহা নিরপেক্ষ বিচক্ষণ সুধীগণের বিচার্য্য বিষয়।

'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা', ১৩৫৩-এর 'ভূমিকায়' লিখিত হইয়াছে যে—"সুখের বিষয়, বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই পঞ্জিকার প্রচার উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অচিরেই অন্যান্য পঞ্জিকাগুলির[১০] পক্ষেও ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্জিকার সংস্কার সাধন ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না।

সুতরাং এই ভূমিকাংশ ও উপর্য্যুক্ত 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত'পক্ষীয়গণের বক্তব্য পাঠে জন-সাধারণ ইহাই বুঝিতেছেন যে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে এক মাত্র বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাই দৃক্-সিদ্ধ ও বিশুদ্ধ গণনা-পরিশোভিত এবং তদতিরিক্ত বঙ্গীয় সকল পঞ্জিকাই সংস্কার-শূন্য, দৃক্-সিদ্ধ-রহিত এবং

জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ দৃক্সিদ্ধ; এবং এরূপ শুদ্ধতার জন্যই ইহা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, যাত্রাদি সকল কার্য্যেই নির্ভর ও গ্রহণ-যোগ্য। সুতরাং অন্যান্য প্রচলিত সকল পঞ্জিকারই তিথি-আদি গণনায় অনতি-বিলম্বে সংস্কার হওয়া আবশ্যক।

৭ একই বৎসরে একই দিনের কোনও তিথ্যন্ত কাল যদি তিনখানি পঞ্জিকায় তিনপ্রকারের হয়, তবে হয় তিনখানিরই তিথি-গণনা ভুল, অথবা একখানি শুদ্ধ হইলে অপর দুইখানিকে অবশ্য ভুল বলিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

৮ যেমন, 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত,' 'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত,' 'পিতামহ-সিদ্ধান্ত' (বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর) ও 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' আদি 'সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থ।

৯ সকল 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থই দৃক্-সিদ্ধ সূর্য্য ও দৃক্-সিদ্ধ চন্দ্রের স্ফুট-দ্বয়ের অন্তরের প্রতি দ্বাদশ অংশ পরিমিত -সংক্রমণের সময়কে 'তিথি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"চন্দ্রার্কয়োরন্তর-ভাগৈর্দ্বাদশভিরেকৈকা তিথির্ভবতি।"
—'সিদ্ধান্তশিরোমণি'।

"সূর্য্যান্নির্গতা যৎ প্রাচীং শশী যাতি দিনে দিনে।
লিপ্তাদি-সাম্যে সূর্য্যেন্দু তিথ্যন্তেঽর্কাংশকৈস্তিথিঃ॥"
—'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত'।

"অর্কাৎ বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্র-মানম্ অংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিঃ তিথিঃ॥"
—'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত'।

১০ বঙ্গীয় প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের মধ্যে অন্যতম

অশুদ্ধ। এইরূপ সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপন-যুক্ত ঘোষণা 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-পক্ষীয়গণের অতি সাহস মাত্র অথবা যথার্থ রূপে সত্যকথন, তাহা এক মাত্র সুধী জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণেরই বিচারণীয়।

'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-সম্বন্ধে অভিমত

Astronomical Observatory,
Presidency College, Calcutta.
23rd July, 1924.

I had occasion to go through the Panjika (Vishuddha Siddhanta) kindly supplied by you. I have been surprised to see that the results of your book have coincided to the nearest minute with our results which are entirely based on telescopic observation.

I have also consulted some other similar publications,[১১] but have been totally convinced of the superiority of your publication,[১২] over theirs in respect of calculations.

We shall thank you for the trouble you are taking in pushing up a Panjika solely based on observation. In these days of difference of opinion among the Pundits of our country, I think a Panjika like yours will do a great deal of benefit to Hindu Society.

I am,
Yours Sincerely
(Sd.) Surendra Nath Das

"বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রাচীন সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদির সংজ্ঞানুসারে কালোচিত নবীনতম গবেষণা-মূলক সংস্কারাদির সাহায্যে গণিত এবং সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দৃক্-সিদ্ধ। এই পঞ্জিকার তিথিতে কোনরূপ ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয় না।

"* * * কোন্ পঞ্জিকা গ্রহণীয় সে কথা আমাদের বিচার্য্য নহে। যথাযথ নিয়মে পঞ্জিকায় তিথি লিখিত না হইলে পঞ্জিকা-বিশেষ পরিহার্য্য কি না সে কথা পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট বিচার করিবার ভার।"—শ্রীষষ্ঠীচরণ সমাজদার।

Presidency College, Calcutta,
6th January, 1936.

"মান্যবর শ্রীযুক্ত······

"* * * আমরা ব্যক্তিগত ভাবে এই বৎসর দুর্গা-পূজায় তিথি-বিভ্রাট হওয়ায় দেবী-পক্ষের ও পিতৃপক্ষের সমস্ত তিথিগুলি পাশ্চাত্য মতে গণনা করিয়া বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের গণনার সহিত মিল পাইয়া যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি[১৩]। * * *"

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, এম্-এস্‌সি,
প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত ও জ্যোতিষের অধ্যাপক।

এইরূপ ১৯২৪ সালের মে মাসে 'Transit of Mercury' (বুধ-গ্রহের সঞ্চার) সম্বন্ধে মিঃ ললিতমোহন মুখার্জ্জী বি-এ, সি-এফ্, প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হায়দরাবাদ, 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' ও 'নিজামিয়া অবজার-

প্রধান পঞ্জিকা দুইখানির (গুপ্তপ্রেস ও পি এম্ বাক্‌চির) পূর্ব্বোদ্ধৃত ভূমিকা-পাঠে জানা যায় যে তাঁহারাও শীঘ্রই পঞ্জিকায় সংশোধন ও সংস্কার করিবেন; কিন্তু বঙ্গীয় পঞ্জিকা ক্রেতাগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ এ বৎসরেও তাহা করা তাঁহাদের সম্ভব হয় নাই।

১১ পি এম্ বাক্‌চি ও গুপ্তপ্রেস প্রভৃতির পঞ্জিকা।

১২ 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'।

১৩ অধ্যাপক দাসের বিস্তৃত অভিমত 'উদ্বোধন', আষাঢ়, ১৩৫৩ সংখ্যায় 'পঞ্জিকা সংস্কার' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ভেটরী,' বেগমপেট, হায়দরাবাদ, ডেকান,-এর মিষ্টার টি পি ভাস্করম্-এর দৃক্-সিদ্ধ গণনা-ফল[১৪] আনাইয়া উভয় গণনার মধ্যে হুবহু ঐক্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

"গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা, পি এম্ বাগচি ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, বটতলার পঞ্জিকা প্রভৃতিতে তিথ্যাদি ভুল থাকায় এই সকল পঞ্জিকা হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষার উপযোগী নহে। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মে বিশ্বাসী তাঁহাদের শুদ্ধ পঞ্জিকানুসারে ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। আমি স্বয়ং পিতৃশ্রাদ্ধ, ব্রতোপবাসাদি ধর্ম্ম-কার্য্যে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' ব্যবহার করি।"

—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ, কলিকাতা, সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতি-ষাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক।

"সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ গ্রহ-সংস্থাপন হইতে 'সূর্য্যাদি-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের সংজ্ঞানুসারে তাবৎ বিষয় গণিত হইয়া 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'য় সন্নিবেশিত হয়। একমাত্র 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'ই হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম-রক্ষায় সহায়ক।"

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম্-এ

এইরূপ কটক কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞান-ভূষণ, মহাশয়-লিখিত মন্তব্যের একাংশ ইহাই যে—

"......বিশুদ্ধ-পঞ্জিকা সম্বন্ধে আর কি বলিব! পঞ্জিকাই কালের চক্ষু-স্বরূপ। যে পঞ্জিকাদ্বারা সত্য দৃষ্ট হয়, সে পঞ্জিকাই স্থায়ী।"

এবংবিধ পি এম্ বাক্‌চি, গুপ্তপ্রেস ও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাদির পরস্পর বিবদমান মন্তব্য এবং পরস্পরে অসম্বদ্ধ ও অসমঞ্জস গণনা-ফলযুক্ত পঞ্জিকা-সমুদায়ের প্রকাশের ফলে বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবন্ধোদ্ধৃত পি এম্ বাক্‌চি ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভূমিকাংশ-পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁহারাও স্ব-স্ব পঞ্জিকার সংস্কার করিতে ইচ্ছুক কিন্তু তাহা এখনও তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা আশা করি অচিরেই পি এম্ বাক্‌চি ও গুপ্তপ্রেসাদি বঙ্গীয় সকল পঞ্জিকাই যথাযোগ্য সংস্কার-যুক্ত ও দৃক্-সিদ্ধ গণনা-ফলশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে; এবং ধর্ম্ম-প্রাণ সত্যান্বেষী বাঙ্গালার পঞ্জিকা ক্রেতাগণও বিচার-পূর্ব্বক সত্য-দৃষ্টি-সহায়ক দৃক্-শোধিত সংস্কার-যুক্ত পঞ্জিকা[১৬] গ্রহণে ও প্রচারে সহায়ক হইবেন।

১৪ মিঃ টি পি ভাস্করম্-এর ২৪শে আগষ্ট ১৯২৪ প্রিন্সিপ্যাল ললিতমোহন মুখার্জ্জী মহাশয়কে লিখিত পত্রে উদ্ধৃত ও 'Royal Astronomical Society-র 'Monthly Notices'-এ প্রকাশিত মিঃ ভাস্করম্-এর গবেষণা-ফলের সহিত 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র এই গণনা-ফল (Transit of Mercury) হুবহু একরূপ হইয়াছিল।

১৫ এইরূপ 'বুধাদিত্য' ও 'রবি-শুক্র' যুতিজ্ঞাপক (The conjunction of the Sun & Mercury and the Sun & Venus) 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র দৃক্-সিদ্ধ ঐক্যের বিবরণ 'উদ্বোধন' আষাঢ়, ১৩৫৩, সংখ্যায় (লেখকের 'পঞ্জিকা-সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

১৬ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র পক্ষে অভিমত সকল 'উদ্বোধন' আষাঢ়, ১৩৫৩, সংখ্যায় 'পঞ্জিকা-সংস্কার' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১৭ স্বকীয় বা পুত্র-কন্যাদিগের ঠিক-ঠিক কোষ্ঠী প্রণয়ন ও কোষ্ঠীর যথাসাময়িক ফল-কথনের জন্য দৃক্-শোধিত সংস্কার-যুক্ত বিশুদ্ধ পঞ্জিকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'উদ্বোধনে'র ভাদ্র ও আশ্বিন (১৩৫৩) সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত লেখকের 'কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহ ও ভাবস্ফুট' এবং কোষ্ঠী-বিচারে ভাবস্ফুট ও ভাব-সন্ধি এবং স্পষ্ট-গ্রহের 'দৃষ্টি-বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

অজানার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবির জীবনের ও প্রতিভার অবিরাম যাত্রা অজানার উদ্দেশে। অজানা কবিকে আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু কোন্ পুরস্কারের লোভে কবির এই অবিশ্রান্ত গতি? কবি ইহার উত্তর দিয়াছেন অনেক কবিতায়। পথের শেষে কি আছে তাহা তিনি জানেন না—তিনি পথ চলার মধ্যেই আনন্দ পান—নিত্যই হাতে হাতে পথে পথেই পুরস্কার পান—এই আনন্দই তাঁহার পাথেয়—এই আনন্দই তাঁহাকে অগ্রগমনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে। কবি বলিতেছেন অজানার সুরে চলিয়াছি দূর হতে দূরে মেতেছি পথের প্রেমে। পথই,—পথশেষ নয়,—পরিব্রাজক কবির পরম বন্ধু।

কবি একলা সেই অজানা পথের যাত্রী। চলার বশেই তিনি মাতিয়া চলিয়াছেন—

আমি পথিক পথই আমার সাথী।
যত আশা পথের আশা পথে যেতেই 'ভালবাসা'
পথে চলার নিত্যরসে দিনে দিনে
জীবন উঠে মাতি।

অজানার উদ্দেশে চলাই পদে পদে অজানাকে পাওয়া।

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে
পথে চলাই সেইত তোমার পাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে
রয়না পড়ে কোন লাভের আশে।
যাবার লাগি মন তারে উদাসে
যাওয়া সেত তোমার পানেই যাওয়া।

অজানার বাঁশীর টানেই কবির এই অবিশ্রান্ত চলা।

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের টানে।
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে।

কবি অজানার পথে চলিয়াছেন—চলার আনন্দেই বিভোর হইয়া পথে পথেই তিনি যাত্রার পুরস্কার পাইতেছেন। অজানার উদ্দেশে তাঁহার যাত্রা—পথের শেষে কি লাভ করিবেন তাহা ত জানা নাই। কোন লাভের ভরসা রাখিয়াই তিনি চলিতেছেন না। কিন্তু কোন আশাই কি তিনি পোষণ করেন না? করেন না বলিলে ভুল হইবে। পথের পুরস্কার যাহাই হউক পথের শেষে যে দীর্ঘপর্য্যটনের সুফল পাওয়া যাইবে—এ আশা তিনি পোষণ করেন।

গতি আমার এসে ঠেকবে সেথায় শেষে অশেষ যেথা খোলে আপন দ্বার। মরণ যে নবজীবনের সিংহদ্বার এ ধারণা তাঁহার মনে আছে।

উদয়াচলের সে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী।
জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি তারা শুনি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

এই যে অজানার পথে অবিরাম গতি। এই গতি বন্ধ্যা গতি নয়। কবি চলিতে চলিতে দুইধারে সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছেন। কবি কিন্তু এই সৃষ্টিকে উৎসবশেষের পানপাত্রের মত চরণে ঠেলিয়া চলিয়া যান।

কবি বলেন—নিজের সৃষ্টিই একটা বাঁধন। যতগুলি বাধা অবিরাম অগ্রগতির পথে যাত্রা ব্যাহত করে—তাহাদের মধ্যে আপন সৃষ্টির মায়াই অন্যতম। নিজের সৃষ্টির প্রতি বৈরাগ্য রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার প্রধান উপজীব্য। কবি নিজেকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাস নে ফিরে।

কবির জীবনে অজানার জন্য অসীম ব্যাকুলতা —"তাহার ফলে নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা"—তাহারই অভিব্যক্তি নিত্য নূতন এ তৃষ্ণা অসীম—তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য প্রার্থনার অন্ত নাই—প্রাপ্তিরও সীমা নাই। ইহাতে নব নব সৃষ্টির রূপ ধরিতেছে—এ সৃষ্টিতে মায়া থাকিলে আর অসীমের পথে ত আগানো যায় না। কবি তাই বলিয়াছেন—

পেলেই সে ত ফুরিয়ে ফেলি
আবার আমি দুহাত মেলি।
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই।

দান ও আদান যেখানে অফুরন্ত—সেখানে দেয় বস্তুতে মায়া থাকিবার কথা নয়। কবি বলিয়াছেন, এই অসীমের জন্য তৃষ্ণা—পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার মিলনাগ্রহ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাকে ইংরাজ কবিরা Yearning for the Infinite বলিয়াছেন। আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে (রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্) মাঝে মাঝে ইহাকে স্পষ্টভাবে ধরিতে পারি। অন্যসময় এই yearning বা আকূতি নানা আকর্ষণ, নানা ক্ষুধার মধ্যে জড়াইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—"যে ক্ষুধা উদ্দেশ্যহীন অজানার জন্য তাহার সঙ্গের ক্ষুধা অঙ্গের ক্ষুধা প্রাণের ক্ষুধা সব ক্ষুধার [illegible] জড়াইয়া নানা আকর্ষণ-বেগে আমাদের মনের আকৃতি গড়িয়া তোলে।

পূর্ণের পথের যাত্রী আত্মার অমরতা ও অসীমতায় বিশ্বাসী কবির অন্তরে যেমন অসীম তৃষ্ণা—তেমনি অসীম আশা। তিনি জানেন মানুষের কোন সাধনাই ব্যর্থ নয়—যাহা কিছু অসম্পূর্ণ সবই পূর্ণতা লাভ করিবে একদিন।

এ জন্মের যাহা কিছু সুন্দর
স্পর্শে যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে
কাছে মনে নহে দূর নহে বহুদূর।

আমরা এই পার্থিব চোখে কতটুকুই বা দেখি। নদী যেমন অসীমের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অসীমের মধ্যে আমাদের সকল সাধনাই পূর্ণতা লাভ করিবে। এই সীমার জগতেও আমরা দেখি—যাহার অবসান হইল মনে করি তাহা নব নবরূপে ফিরিয়া আসে। আমরা ক্রমোন্মেষের পথে চলিয়াছি—অনেক সময় তাহাকে চিনিতে পারি না।

ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।

কবি অপূর্ণকে পূর্ণের বিপরীত মনে করেন না—পূর্ণাভিমুখী বলেন।

জীবনের ধন কিছু যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হউক অবহেলা,
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।

কবি যে সত্যের উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বার বার আশ্বস্ত করিয়াছেন সেই সত্যের কথা প্রভুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

জীবনের যত পূজা হলো না সারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে পড়েছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানিগো জানি তাও হয়নি হারা।

জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে,
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা তারে বাজিছে তারা
জানিগো জানি তাও হয়নি হারা।

কবি মৃত্যুকেই বলিয়াছেন জীবন পথের শেষ। কিন্তু নব নব জীবনের মধ্য দিয়া নব নব লোকে যাত্রার সিংহদ্বার। এই সমস্তই সান্ত্বনার কথা। জীবদেহের অনিবার্য্য পরিণতি মরণকে নিজের মনের মাধুরী দিয়া বরণীয়রূপে পরিকল্পিত না করিয়া লইলে তিনি জীবনের গান এমন করিয়া গাহিতে পারিতেন না, মরণের বিভীষিকাই তাঁহার জীবনের রস শোষণ করিয়া লইত।

যৌবনে কবি একদিন গাহিয়াছিলেন—মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। ইহা মৃত্যুর বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়া নয়, মর্ত্ত্যভূমির অপূর্ব্ব মাধুরীর আকর্ষণে।

মৃত্যুর বিভীষিকা হরণ এবং তাহাকে মোহন মধুর রূপে অন্তরে বরণ Modern Romantic সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ। ইউরোপীয় সাহিত্যের এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। উপনিষদ্ ও বৌদ্ধ সাহিত্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুভয় জয় করিতে শিক্ষা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায় ভারতীয় তত্ত্বসাহিত্যের প্রভাবসম্পাত হইয়াছে। মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার সিদ্ধান্ত কবি সে সাহিত্য হইতে গ্রহণ করেন নাই বটে—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনতত্ত্ব তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার অজানা, পূর্ণ, অসীম, অনন্ত ইত্যাদি পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

যৌবনে মৃত্যু দূরবর্ত্তী তাই তাহাকে লইয়া কাব্যের মধ্য দিয়া লীলাবিলাস চলিয়াছে। বার্দ্ধক্যে মৃত্যু আসন্ন তখন তাহাকে লইয়া আর রসলীলা চলে নাই। মৃত্যুভয়কে একেবারে অস্বীকার তিনি করিতে পারেন নাই। মৃত্যুভয়কে জয় করিবার জন্য তিনি মৃত্যুর অনেক মঙ্গল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যে মনোভাব হইতে এইরূপ ব্যাখ্যাদানের প্রবৃত্তি জন্মে—নিম্নোদ্ধৃত কবিতা, তাহারই কথা বলিয়াছেন, গঙ্গার উদ্দেশে—

মানুষের মুখ্য ভয় মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে জয় নাহি জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হ'তে অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।
পুণ্যতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।
সে ডাকিছে মিথ্যা শঙ্কা নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি মুছাও মুছাও।
গম্ভীর ভীষণ মূর্ত্তি মরণের
তব কল ধ্বনি মাঝে গান ঢেলে দিক্ তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে।
শেষদণ্ড ভ'রে নিক্ তার কান।
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য অভিসার গান।

কবির হিন্দু দেশবাসী যে ভাবে মৃত্যুভয় তরণের সান্ত্বনা খুঁজিয়াছে কবিও সেইভাবেই অনন্ত পথযাত্রার পরিকল্পনায় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সাধনার সান্ত্বনাও সামান্য নয়। তিনি নিজে আপন সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা পড়েন নাই বটে কিন্তু তিনি ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতেন তাঁহার ভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও তিনি তাঁহার অমর সৃষ্টির মধ্যে চিরদিন তাঁহার মমতাময়ী মর্ত্ত্যভূমিতে অমর হইয়া থাকিবেন। জীবনের সাধনায় তিনি যে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে হাসিমুখে মরণকে বরণ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। এই পরিতৃপ্তি তাঁহার অনন্ত পথের পাথেয় হইয়াছে।

বর্ষাশেষ কবিতায় অপূর্ব্ব বাণী রূপ ধরিয়াছে। তাহার দুইটিমাত্র স্তবক উৎকলন করি—

যাত্রা হ'য়ে আসে সারা আয়ুর পশ্চিমপথ শেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি' দুই মুঠি।
বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা।
জীবনের হেরিনু মহিমা।
ধূলির আসনে বসি ভূমারে হেরিছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হ'তে অণীয়ান মহৎ হতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের যবনিকা,
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

কবি যে ধনলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে মৃত্যুভয়ের মত গুরু দুঃখেও বিচলিত হন নাই। তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাস্ত্রহীন মৃত্যু মহাসাগর সঙ্গমে।

কবির শেষ গান তাই—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

রস

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

মধুর পিয়াসা
মেটায় ভ্রমর
নানা ফুলে উড়ে
উড়ে,
নেশা ফিরে আসে
মধু বিনে ফুল
পড়ে যায় যবে
ঝরে।

ক্ষণিকের তরে
এ বিশ্বের সুখ
পরক্ষণে নাই
নাই,
ও রস-সাগরে
ভুলিলে এ বিশ্ব
একেবারে ভুলে
যাই।

পরমাণুদের যোগাযোগ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম-এস্‌সি

মৌলিক পরমাণুর রাসায়নিক যোগাযোগ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদের মধ্যে উক্ত বন্ধনের একটী সুষ্ঠু প্রণালী আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। একটি অক্সিজেন পরমাণু সাধারণতঃ দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে ভাব রক্ষা করে, এইভাবে অঙ্গার পরমাণু চারিটী, নেত্রজান তিনটী, ক্লোরিন্‌ একটি, হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঠিক একই ভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুকে অথবা ইহার সমকক্ষ কোন পরমাণুকে ইউনিট ধরিয়া অন্যান্য পরমাণুর যোগাযোগ ক্ষমতা অনুধাবন করিলে প্রত্যেকের একটি করিয়া অঙ্ক বা সংখ্যা পাওয়া যায়। এই সংখ্যাকে উক্ত মৌলিকের ভ্যালেন্সী (valency) বলা হয়। ভ্যালেন্সী প্রত্যেক্যের রাসায়নিক বন্ধনক্ষমতা নির্দ্ধারিত করে। এজন্য উহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারাও অভিহিত করা হয়। যাহার যতটা বন্ধনক্ষমতা তাহার যেন ততটা হাত আছে। অম্লজানের দুইটী, নেত্রজানের তিনটি, অঙ্গারের চারিটী, ক্লোরিনের একটি। বন্ধনের সময় উহারা হাত ধরাধরি করিয়া আবদ্ধ হয়। এই হাতের সংখ্যা কাহারও একাধিক দেখা যায়। যেমন নেত্রজানের হাত কখনও তিনটি, কখনও পাঁচটী।

পরমাণুদের যদি আমরা এক একটি পরাণু-মানুষ বলিয়া ধরি তবে বিষয়টি আমাদের নিকট আরও সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে। আমরা হঠাৎ এক রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছি যেখানে সকলেই পরাণুমানুষ। এই পরাণুমানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ আছে। অঙ্গারপরাণু-মানুষগুলি সব একাকৃতি, একধর্ম্মী—একটি হইতে অপরকে পৃথক করার উপায় নাই! অম্লজান পরাণুমানুষগুলি আবার অঙ্গারের মত নয়। ইহাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা আবার একাকৃতি একপ্রকৃতি একধর্ম্মী অভিন্নহৃদয়। এভাবে যতগুলি মৌলিক আছে প্রত্যেকের পরাণু-মানুষ স্ব স্ব মৌলিকত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়া সেখানে বসবাস করে। রাজ্যটি নিশ্চয়ই একটি চিড়িয়াখানা, কাহারও একটি হাত, কাহারও দুইটি, কাহারও তিনটি—৭টীর উপরে কাহারও হাত নাই। ঐ যে পরাণুমানুষগুলি উহাদের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা বা সখ্য যথেষ্ট আছে। এবং সখ্য-স্থাপনের মধ্যেও নিয়মকানুন আছে। কোন ব্যাপারেই এলোমেলো ভাবে তাহারা সমাধা করে না। উক্ত সখ্য বা বন্ধন খুবই স্থায়ী, সহসা বা কোন সহজ প্রণালীদ্বারা ছিন্ন হয় না। যখন হাত ধরাধরি করিয়া সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয় তখনই আমরা পাই যৌগিক পদার্থ। পরাণুমানুষ-গুলি একা একা থাকিতে পারে না—ইহা তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। মায়ার বন্ধনে তাহারা চিরদিন জড়িত। বন্ধনহীন পরাণুমানুষ খুব কমই পাওয়া যায়। যাহারা আছেন নিত্যমুক্ত সিদ্ধ পুরুষ। নেত্রজান পরাণুমানুষ তিন হাতে তিনটি হাইড্রোজেনকে ধরিলেন—আমরা পাইলাম এমোনিয়াকে। অঙ্গার চারিটী হাতদ্বারা চারিটি হাইড্রোজেনের সঙ্গে ভাব করিলেন অমনি মিথেন বা মারস্‌ গ্যাস উৎপত্তি হইল। সংঘবদ্ধ বা যুক্তপদার্থে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলের সমান নয়, আবার সকলের জন্য সকলের প্রীতি

জাগিয়া উঠে না। আমাদের মত উহাদেরও সমাজ আছে, জাতি আছে, অস্পৃশ্যতা আছে। অপর পরাণুমানুষ ছাড়াও নিজেদের মধ্যে হাত ধরাধরি করিয়া বসবাস করিবার রীতি উহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে আছে। পরাণুমানুষের দেশ আমাদের নিকট একটি কাল্পনিক ছবি। মানুষ অতিসূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ দ্বারাও আজ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই। কিন্তু উহাদের মধ্যে আদান-প্রদান, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ও তাহাদের নৃত্যভঙ্গি আমাদের মনুষ্যজাতির এক পরম লাভ। উহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটু স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইলে আমরা উহাদিগকে এই দৃশ্যমান জগতে পাইয়া থাকি। মাটি, চক, লবণ, চিনি, কেরোসিন তৈল, জল, বায়ু এমোনিয়া প্রভৃতি বাস্তবপদার্থ এই বন্ধনসূত্রের ফল।

মানুষের ওজনের কোন স্থিরতা নাই। উহা দিন দিন বদলায়; আবার দুইটী সম-ওজনের মানুষ পাওয়া কঠিন। পরমাণুর মধ্যে সেরূপ নয়। সমস্ত হাইড্রোজেন পরাণুমানুষ একই গুরুত্ব বহন করে, আবার সমস্ত অম্লজান পরাণুমানুষের গুরুত্ব এক কিন্তু হাইড্রোজেন হইতে বিভিন্ন। এরূপ ভাবে অঙ্গার, নেত্রজান, স্বর্ণ, লৌহ, ক্লোরিন ব্রোমিন প্রভৃতি পরাণুমানুষের প্রত্যেক শ্রেণীর নিজস্ব ওজন আছে, অথচ একের অন্যের সঙ্গে মিল নাই।

একই শ্রেণীর পরাণুমানুষের ওজনের মধ্যে যে তারতম্য নাই এ সত্যতা বর্ত্তমান গবেষকগণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা হাইড্রোজেন, সীসক, ক্লোরিন প্রভৃতি পরাণুমানুষের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ওজনের পরাণুমানুষ বাহির করিয়াছেন। ঐ গুলিকে তাঁহারা আইসোটোপ্স (Isotopes) নাম দিয়াছেন। আইসোটোপের আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা এসটন (Aston); তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

(৪)

বেদের অলৌকিক বিষয়ে প্রামাণ্য ইহা বিশ্বাস করিতে যদি কাহার রুচি না হয়, কিন্তু কেবল যুক্তি তর্ক ও অনুভবের দ্বারা জগৎকারণ নির্ণয়ের আগ্রহ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কি দ্বৈত, কি বিশিষ্টাদ্বৈত, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত অথবা কি অদ্বৈত কোন মতকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিতে ইচ্ছা হইবে না। কারণ তাঁহার বোধ হইবে,—সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, এবং সকলের মতেই কিছু না কিছু অম্বরস বা অসত্য আছে, আর এই জন্যই তাঁহারা পরস্পর-বিরোধী হইয়া থাকেন—ইত্যাদি। আর এই কারণে কেবল যুক্তিতর্ক আশ্রয় করিলে জগৎকারণকে অদ্বৈত বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারিলেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। একটু না একটু সন্দেহের হেতু থাকিয়া যায়। বেদবিশ্বাসী অদ্বৈতবাদীর কেবল এই সন্দেহের হেতুর অভাব হয়। কেবল যুক্তি-তর্কের দ্বারা ভ্রান্তি নিবারণ করিতে পারিলেও অনুভববিষয়ক সন্দেহনিবারণ বেদ অমান্যকারীর

পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ, কে জানে কবে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার নির্ণয়ে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবেন— এই আশঙ্কা তাহার দূর হয় না। কেবল যুক্তি-তর্কের এবং অনুভবের পথ অনুসরণ করিয়া, "সকল মতেই বিরোধ আছে" ইহা জানিয়া বৌদ্ধ পরমাচার্য্য মহামতি নাগার্জ্জুন অশ্বঘোষ প্রভৃতি "মাধ্যমিক কারিকা" প্রভৃতি গ্রন্থে "কিছুই নির্ণয় হয় না" ইহা বলিয়া "শূন্যই তত্ত্ব" এই প্রকার শূন্যবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। জগৎকারণকে "শূন্য" অর্থাৎ সত্তাশূন্য অসৎ বা নাই বলিয়াছেন। যদিও কথায় তাঁহারা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, সদসদ্‌ভিন্নও নহে এইরূপ চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তকে শূন্য বলেন, সত্তাশূন্য যে অসৎ তাহাকে শূন্য বলেন না, কারণ, সৎ বলিতে তাঁহারা অর্থক্রিয়াকারীই বুঝেন তথাপি বস্তুতঃ তাঁহারাও সত্তাশূন্য অসৎকেই শূন্য বলেন। কারণ শূন্যকে তাঁহারা নীরূপাখ্যও বলিয়াছেন। অর্থাৎ "কিছু নয়ই" বলিয়াছেন। আর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, পরমাচার্য্য গৌড়পাদ এবং মহামতি শ্রীহর্ষাচার্য্য প্রভৃতি জগৎকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়াছেন, এবং জগৎকারণকে সৎ বলিয়াছেন, এবং কখন কখন শূন্য নামে একমাত্র নির্ব্বিশেষ সৎ অদ্বৈত বস্তুকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন। শূন্যশব্দে যে ব্রহ্মকে বুঝায় তাহা মৈত্রায়ণী উপনিষৎ এবং নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে দেখা যায়। এজন্য বেদান্তীর শূন্য সৎ। আর এই জন্য বেদান্তী সৎকারণবাদী এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্তীর এ বিষয়ে যুক্তি এই যে জগৎকারণ যে শূন্য, তাহাকে যদি অসৎ বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক বলা হয়, তাহা হইলে জগতে সত্তার স্ফূর্ত্তির অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ "জগৎ আছে" বলিয়া বোধ হওয়া আর উচিত হয় না। এজন্য বেদান্তমতে সকলের মূলে এক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত সদ্‌বস্তু বর্ত্তমান ইহা বলাই যুক্তি সঙ্গত হয়। বেদান্তদর্শন যুক্তির সাহায্যেও ইহাই বলিয়াছেন। তবে বেদ অবলম্বন করিলে সন্দেহ সমূলে বিদূরিত হয়, ইহাও বলিয়াছেন। যুক্তি-তর্কের দ্বারা যে অদ্বৈত সদ্‌বস্তুই জগৎকারণ বলা যায় ইহা মাণ্ডুক্যকারিকা-ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই জন্যই বেদান্তদর্শনের এত আদর, আর এইজন্য বেদান্তদর্শনের এই বিশেষত্ব। কেবল যুক্তি-তর্কের দ্বারা সন্দেহ সমূলে দূর হয় না—ইহা বেদান্তদর্শনের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১) ইত্যাদি সূত্রে এবং "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদি ২।১।১ সূত্রে মহর্ষি বেদব্যাস স্পষ্ট ভাবেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহাদের অদ্বয়বাদ স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও সাক্ষিশূন্য শূন্যবস্তু সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই আক্রমণের হাত হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। বেদান্তীও এই যুক্তি শূন্যবাদী বৌদ্ধের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "এই জন্যই শূন্য সৎ" কিন্তু সত্তাশূন্য "অসৎ" নহে, এই মতবাদ অবলম্বনে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মধ্যেই একটি পৃথক সম্প্রদায় জন্মলাভ করিয়াছে। জাপানী বৌদ্ধগণ বহুলভাবে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীন বৌদ্ধমতে শূন্যকে সত্তাশূন্য অসৎ বলা হইত, এজন্য তাহাই বৈদিক দর্শনসমূহে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহ বুদ্ধ বা গৌতম প্রভৃতি নবীন বৌদ্ধমতে শূন্যকে, "সৎ নহে," "অসৎ নহে," "সদসৎ নহে," এবং "সদসদ্‌ভিন্নও নহে" —এইরূপে চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত বলা হয়, কিন্তু সত্তাশূন্য অসৎ বলা হয় না। অসৎ না বলিবার হেতু এই যে "সদসৎ নহে," সদসদ্‌ভিন্নও নহে," ইহা বলায়, সতের নিষেধের সঙ্গে অসতেরও নিষেধ করা হইয়াছে। পরন্তু ইহা কেবল বেদান্তীর মুখস্তম্ভন করিবার কৌশল

মাত্র। প্রাচীন বৌদ্ধমতে যাহাকে অসৎ বলা হইত, বেদান্তদর্শনে ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক তাহার খণ্ডন হইয়াছে দেখিয়া, গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি নবীন বৌদ্ধগণ সেই অসৎকেই অন্য শব্দদ্বারা বলিলেন মাত্র। নবীন বৌদ্ধগণ বলিলেন "শূন্যকে চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত বলায় ইহার অন্তর্গত যে সতের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অসতেরও নিষেধ করা হইয়াছে। যে সতের নিষেধ এস্থলে করা হইল, তাহা সত্তাবান্ সৎ নহে কিন্তু অর্থক্রিয়াকারী সৎ। অর্থক্রিয়াকারী সৎকে এবং তাহার বিপরীত অর্থক্রিয়াহীন অসৎকে নিষেধ করায় অস্তিত্ববান্ সৎকে এবং অস্তিত্বহীন অসৎকে নিষেধ করা হয় নাই। অতএব বেদান্তী বৌদ্ধমত না বুঝিয়া বৃথা খণ্ডনশ্রম করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু ইহা কেবল শব্দান্তর বা শব্দাড়ম্বর মাত্র। যাহাই অর্থক্রিয়াহীন অসৎ তাহাই অস্তিত্বহীন অসৎ। আর যাহাই অর্থক্রিয়াকারী সৎ তাহাই অস্তিত্ববান্ সৎ। ইহাদের মধ্যে বস্তুগত্যা কোন ভেদ নাই। অস্তিত্ববান্ যে সৎ তাহার কারণ—"সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিলে যখন কোন একটী অর্থকে অর্থাৎ বস্তুকে বুঝায়, তখন অর্থক্রিয়াকারী সৎ ও অস্তিত্ববান্ সতের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এইরূপ অর্থক্রিয়াশূন্য অসৎ এবং অস্তিত্বশূন্য অসতের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এই কারণে, যাহা চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্য বস্তু, তাহাই যথার্থ অসৎ শূন্য বস্তু। ইহা বলা নবীন বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক কেবল বেদান্তীর মুখস্তম্ভনের প্রয়াস মাত্র অথবা প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধবাক্যকে মানাইবার কৌশল মাত্র। বস্তুতঃ অর্থক্রিয়াকারী সৎ, আর অস্তিত্ববান্ সৎ—এই দুইটীকে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করায় প্রকারান্তরে শূন্যকে অস্তিত্ববান্ সৎ বস্তু বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইল। আর তজ্জন্য বৌদ্ধগণের প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্তমতেই প্রবেশ হইল। বস্তুতঃ এই সুযোগ লইয়া জাপানী বৌদ্ধগণের স্বীকৃত, সৎশূন্যবাদী একদল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই আবির্ভাব হইয়াছে। চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্যের অন্তর্গত অসৎকে সত্তাহীন অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ না করায়, কিন্তু অর্থক্রিয়াহীন অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাঁহাদের মতেও শূন্যকে অস্তিত্ববান্ সৎ বলিতে কোন বাধাই হইবে না। শূন্য সদ্বস্তু ইহাত বেদান্তেরই মত। সদ্ভিন্ন কিছুই থাকে না এজন্য তাহাকে বেদান্তে শূন্য বলা হয় এই মাত্র। এই দৃষ্টিতে বেদান্তীর সৎ-শূন্যবাদ ও বৌদ্ধের সৎশূন্যবাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিল না। জানি না ভগবদবতার ভগবান্ বুদ্ধদেবের ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায় কিনা। বেদান্ত দ্বারা বৌদ্ধমত ব্যাখ্যা করিলে তাহা অতি উপাদেয় মতই হয়। বৌদ্ধমতের প্রাচীন নবীন ভেদ বেদান্তদর্শনের "আকাশে চ বিশেষাৎ" সূত্রের ভাষ্য মধ্যে স্পষ্টভাবেই উপলব্ধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্র হইতেও এই ভেদ সমর্থিত হয়।

কিন্তু এই মতভেদের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্বীকৃত যে অদ্বৈত-জগৎকারণবাদ, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। সন্দেহের অবসর কিছু না কিছু থাকিয়াই যায়। কিন্তু বেদপ্রামাণ্যবাদী অদ্বৈত বেদান্তীর নিকট সে সন্দেহের অবসর থাকে না। এই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাসব্রহ্মসূত্রের মধ্যে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মধ্যে এবং গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্যকারিকা মধ্যে বেদ অবলম্বনে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অসৎশূন্যবাদী বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন। আর বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে সর্ব্বজ্ঞের আসন দিয়া তাঁহার বাক্যের প্রামাণ্য বৈদিকের নিকট বেদের প্রামাণ্যের ন্যায়, প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ একজন মানিয়া তাঁহার বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করা

মনুষ্যের একটী স্বভাব। আর এই জন্যই আজ অনাদি কাল হইতে অনাদি অপৌরুষেয় বেদ আমাদের পূজাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। বেদান্তদর্শন এই বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করায় সকল দর্শনশিরোমণির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাই বেদান্তদর্শনের চরম বিশেষত্ব।

বেদান্তদর্শনের এই জাতীয় বিশেষত্ব লাভের জন্য বৌদ্ধগণও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা বুদ্ধবাণীকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক উচ্চারিত বলিয়া বেদবৎ অপৌরুষেয় বলিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—বংশচ্ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে যেমন অনেক সময় মনুষ্যের উচ্চারিত শব্দ বলিয়া বোধ হয়, বুদ্ধবাণীও তদ্রূপ অবুদ্ধিপূর্ব্বক উচ্চারিত সুতরাং অপৌরুষেয়। কিন্তু একথায় অনেক দোষ ঘটে। বুদ্ধের বাণী তাহা হইলে শ্রোতার বুদ্ধি অনুসারে নানারূপই হইয়া যাইবে। এরূপ আত্মপক্ষসমর্থন জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় বলিতে হইবে।

কোন কোন শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায় নিজ নিজ বেদাতিরিক্ত মতবাদের জন্য শিব ও নারায়ণ প্রভৃতি ভগবন্মূর্ত্তির স্বাভাবিক অনাদি সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে পৌরুষেয়ত্ব দোষ আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু পুরাণাদিতেই দেখা যায়, সেই সকল ভগবন্মূর্ত্তিই বেদের প্রামাণ্য গ্রহণ করিতেছেন। এজন্য ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক স্মরণ করিলেই যথেষ্ট, যথা—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্
বেদবিদেব চাহম্॥"

এজন্য তন্ত্রাদি, বেদের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই।

পরিশেষে প্রতিপক্ষের একটী আপত্তির উত্তর প্রদান আবশ্যক। অনেকে বলেন—বেদমতের মধ্যে তবে এত মতভেদ কেন? বেদ অবলম্বনেই যেরূপ মতভেদের বাহুল্য দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মত কোন একটি মতবাদকে বেদমত বলা ব্যর্থ বা বিড়ম্বনাবিশেষ। কিন্তু একথার উত্তর এই যে—এই সমস্যার মীমাংসা মীমাংসাশাস্ত্রই করিয়াছেন। তাঁহারা বেদবাক্যের অর্থনির্ণয়ের যে লোকবেদসাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা অসম্ভব। তদনুসারে বেদার্থের একবাক্যতা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। অতএব এই আপত্তি ব্যর্থ। ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। শিষ্টাচার ইহার অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারস্ত্রিবিধো ধর্ম্মলক্ষণম্"

এই স্মৃতিবচনমধ্যে সদাচারই শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রতিসৃষ্টিতে দেবতা ও ঋষিগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শিষ্টাচার অনুসারে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি যাবতীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একথা ভগবদ্গীতার

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥"

ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। বেদবাক্যের অর্থনির্ণয় করিবার কালে এই শিষ্টাচারের অবিরোধে অর্থ করা হয়। এই কারণেই বেদবাক্য যে "অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি" অর্থাৎ অগ্নিহোত্রযাগ করিবে এবং যবাগু পাক করিবে, ইত্যাদি, তাহার অর্থ করিবার কালে অগ্রে অগ্নিহোত্রযাগ অনুষ্ঠান করিয়া পরে যবাগু পাক করিবে—এইরূপ শ্রৌতক্রম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে যবাগু পাক করিয়া তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রযাগ করিবে—এই আর্থক্রম অবলম্বন করা হইয়া থাকে। ইহা শিষ্টাচারের বলেই করা হয়। এইরূপে শিষ্টাচার অবলম্বনে মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে

কর্ম্মকাণ্ডের জন্য বেদার্থনির্ণয়ের যে কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা লোক ও বেদ-সাধারণ কৌশলই হয় এবং তাহাতে আর ভ্রম প্রমাদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শিষ্টাচারের দ্বারা তাহা পরীক্ষিত হইয়া সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি জৈমিনির এই নিয়মই ভগবান্ বাদরায়ণ উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থনির্ণয়ে গ্রহণ করিয়া বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের সম্পর্কিত যাবতীয় বাক্যেরও ব্যাখ্যার নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। এই কারণে বেদবাক্য অবলম্বনে একটা সর্ব্ববাদিসম্মত মতবাদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বেদবাক্য অবলম্বনে যে পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা সুতরাং বেদবাক্যব্যাখ্যা-কৌশলের অনভিজ্ঞতার ফল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বমতের পুষ্টির জন্য দুরাগ্রহের ফল। অতএব কোন একটি বেদমতকে বেদমত বলা ব্যর্থ, এই আপত্তি নিরর্থক। আর তাহা হইলে বেদান্তদর্শনের এই যে বিশেষত্ব তাহা অবিসম্বাদী সত্য।

এস্থলে স্বাধীন চিন্তাশীলতার অনুরাগী কেহ কেহ বলেন, বেদান্তদর্শনের এই যে বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ইহার মূলে বেদের অপৌরুষেয়তা, নিত্যতা, এবং অভ্রান্ততা ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ইহা কেন মানিব? দ্বিতীয় কথা—অদ্বৈত বেদান্ত-মতের আচার্য্যগণের মধ্যেই যখন বহু মতভেদ দেখা যায়, তখন সেই অদ্বৈত বেদান্তমতও সর্ব্ববাদিসম্মত মতবাদ হইতে পারে না, ইত্যাদি।

কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। প্রথম কথার উত্তর এই যে, আমাদের এই যে বর্ণাত্মক ভাষা, তাহা শিক্ষিত ভাষা। তাহা স্বতঃ বিকশিত বা অভিব্যক্ত ভাষা নহে। এই বর্ণাত্মক ভাষা না শিখাইলে কেহ নিজে নিজে আবিষ্কার করিতে পারে না। যে সব বালকবালিকা মনুষ্যের ভাষা শুনে নাই তাহাদের কোন বর্ণাত্মক ভাষাই বিকশিত হয় নাই। ইহার বহু নিদর্শন আছে। এজন্য আমাদের যে বর্ণাত্মক ভাষা তাহা শিক্ষিত ভাষা। তাহা স্বতঃ অভিব্যক্ত ভাষা নহে। এজন্য যিনি বর্ণাত্মক ভাষার প্রথম শিক্ষক তিনি অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। কারণ তাঁহাকে কেহ শিখাইলে তিনি আর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রথম শিক্ষকও একজন মানিতে হইবে। আর তিনি এই ভাষার নূতন সৃষ্টিও করিতে পারেন না। কারণ, তিনি সকলই জানেন। জানা বিষয়ের নূতন সৃষ্টি সম্ভব নহে। বেদ এই সর্ব্বজ্ঞের ভাষা, এজন্য বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় আর তজ্জন্য ইহা অভ্রান্ত এবং স্বতঃপ্রমাণ এবং ঈশ্বরবৎ নিত্য। ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। ইহা না মানিলে আমাদের কোনও ব্যবহারই উপপন্ন হয় না। সকল ব্যবহারই বর্ণাত্মক ভাষামূলক। অতএব বেদ অবশ্যই মান্য।

দ্বিতীয় কথা অদ্বৈত বেদান্তের আচার্য্যগণের যে মতভেদ তাহা অদ্বৈত তত্ত্ববিষয়ক মতভেদ নহে। তাহা অদ্বৈতের অনুকূলে যে সব যুক্তি প্রভৃতি, সেই সব যুক্তি প্রভৃতিতেই মতভেদ। ইহাকে উপপত্তিভেদ বলা হয়। অতএব স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির এইরূপ আশঙ্কা অমূলক। এই সকল কারণে মহর্ষি বেদব্যাস বেদ অবলম্বনে যে দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহাই সত্য, তাঁহার মতই অভ্রান্ত মতবাদ। ইহাই বেদান্তদর্শনের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

মানব-দেবতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

"মানুষই দেবতা" শিখাতে বিশ্বে আসিলে নামিয়া বিশ্বেশ্বর,
পবিত্র হইল পৃথিবীর মাটি, তীর্থ হইল "দক্ষিণেশ্বর"।
ধরমের কথা গুহার ভিতরে লুকানো ছিল যা সংগোপনে
তাহারি সাকার রূপ ধরি তুমি ধন্য করিলে তিন ভুবনে।
কাঠ পাথরের মূরতি গড়িয়া স্বার্থ-অন্বেষী মানব-মন
এতকাল ধরি কত উপচারে করিছে পূজার আয়োজন।
যজ্ঞ-ধূমে ছাইল বিশ্ব তৃপ্ত হইল বৈশ্বানর।
ঊর্দ্ধে উঠিল মন্ত্র তন্ত্র, তুচ্ছ হইল বিশ্বে নর।
আসিল বুদ্ধ খুলিতে রুদ্ধ মহামানবতা-প্রস্রবণ,
ধাইল বিশ্বজনগণ তরে করিতে আত্ম বিসর্জ্জন।
"ব্রহ্ম সত্য"—বাণী বেদান্তের শঙ্কর-কণ্ঠে উঠিল ধ্বনি,
জ্ঞান উপজিলে মায়া অপগমে মিলিবে মুক্তি বলিল জ্ঞানী।
সেই পুণ্য দর্শনের ধারা জ্ঞান-বালুচরে লুপ্তপ্রায়
প্রেমের বন্যা পুষ্ট হইয়া দেখা দিল তাই নদীয়ায়।
তাহাও পুনঃ বহিল উজান শুনিয়া শ্যামের বাঁশরি তান,
মানুষ রহিল তৃণাদপি নীচ হরিনাম গানে মুহ্যমান।
প্রতীচী পাগল হইল গড়িতে বাহ্য সুখের সোনার তাজ,
চাহিল হইতে ধনেতে কুবের বিজ্ঞানের বলে পৃথ্বী মাঝ।
ধনতন্ত্রের যজ্ঞবেদীতে মানবতার পড়িল বলি,
হিংসার অনল তৃপ্ত করিতে মানুষ দিল রক্ত ঢালি।
মনুষ্যত্বের অবমাননায় নরের দুর্গতি সহিতে নারি
আসিল বিভু দীন নর রূপে নব ভাব-ঘন মূরতি ধরি।
মাতৃপূজার জবা-বিল্বদল দিল আপনার শিরের 'পরে,
নর-নারায়ণ-পূজার ইঙ্গিত এভাবে জানালে ভাবের ঘোরে।
"জীবে দয়া" নয়; শিব জ্ঞানে তার সেবাই বটে পরম ধর্ম্ম,
প্রচারিতে বিশ্বে আগমন তব কর্ম্মজীবনে বেদান্ত মর্ম্ম।
নর নারায়ণ আত্মারূপে এই শাস্ত্রবাণী মিথ্যা নয়
তোমার জীবনে পাইল বিশ্ব এই সত্যের পরিচয়।
দেবতা-আসনে তোমার মূর্ত্তি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য পাতিছে আজি,
ধন্য মানুষ যথার্থই মানব-দেবতা-মূরতি পূজি।

ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

মহাশক্তিধর স্বদেশপ্রেমিক ঋষি, নবীন ভারতের জনক, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মূর্তবিগ্রহ, মহান্ কর্মযোগী ও মানবপ্রেমিক আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় যুবশক্তির উদ্বোধক। ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল সুগভীর। তিনি ছিলেন তাহাদের প্রকৃত সখা, হিতৈষী ও নায়ক। তাহাদের উপর স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অত্যুচ্চ আশা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন —এই যুবকদের উপরই ভারতের পুনর্জাগরণ, পুনরুজ্জীবন ও পুনরভ্যুত্থান নির্ভর করিতেছে। তিনি তেজোদীপ্ত দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী ও উদ্যমশীল যুবসম্প্রদায়কে ভগবানের পাদপদ্মে ও দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে উৎসৃষ্ট হইবার উপযোগী বিশুদ্ধ নবপ্রস্ফুটিত অনাঘ্রাত পুষ্পের মত মনে করিতেন। তিনি তাহাদিগকে বীরোচিত কার্যসমূহ সম্পন্ন করিবার জন্য চিহ্নিত বীরসন্তান-রূপে দেখিতেন। যুব-সম্প্রদায় স্বার্থ-কলুষিত বৈষয়িক ব্যাপারে, কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকে না, সুতরাং স্বামীজী তাহাদিগকে ত্যাগ ও সেবার সুমহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন।

শক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভীকতা

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ যুব-সম্প্রদায়ের মজ্জাগত শারীরিক দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও অসামর্থ্যের কথা সম্যক্‌রূপে জানিতেন। তাই তিনি এ সকল দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতার মহৌষধও নির্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা ভগবান্ ও দেশ-মাতৃকার সেবায় অনুপ্রাণিত হইবার জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। স্বামীজী বলিতেন, ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের সমধিক জাজ্বল্যমান মজ্জাগত দোষ তাহাদের শোচনীয় শারীরিক শৌর্য-বীর্য-হীনতা, মানসিক শক্তিহীনতা এবং আত্মবিশ্বাসরাহিত্য। ভারতীয়গণের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও—তাহাদের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য সত্ত্বেও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যুব-সম্প্রদায়ের দুঃখ-ক্লেশ-দৈন্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহাদের শোচনীয় শারীরিক শৌর্য-বীর্য-হীনতা ও অপটুতা। এজন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, প্রথমতঃ যুব-সম্প্রদায় দৈহিক শক্তিতে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হউক। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সুগঠিত বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ দেহ, লৌহের মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের ন্যায় সবল স্নায়ু এবং তৎসঙ্গে বজ্রসদৃশ দৃঢ় চরিত্রবল থাকিলেই যুব-সম্প্রদায় জীবন-সংগ্রামের সর্বপ্রকার কঠোর প্রতিকূল অবস্থা এবং দুঃখ-ক্লেশ-বিপর্যয়কে অতিক্রম করিয়া জয়ী হইতে পারিবে। যুব-সম্প্রদায়ের দৈহিক শৌর্য-বীর্য-হীনতা স্বামীজীর মনকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন: ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের ধমনীতে সবল রক্ত প্রবাহিত হইলেই তাহারা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা, অপরিসীম শৌর্য-বীর্য ও তেজোগর্ভ বাণী উপনিষদের ওজস্বী অভীঃ-মন্ত্র এবং আত্মার ভাস্বর মহিমা অধিকতর স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। শারীরিক শৌর্য-বীর্যের সহিত যুব-সম্প্রদায়কে আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে হইবে। তাহাদের সর্বদাই সচেতন

থাকিতে হইবে যে, তাহারা অমৃতের সন্তান, তাহারা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তাহাদের নিকট অসম্ভব ও অসাধ্য বলিয়া কোনো কিছু নাই; তাহারা মহৎকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য, সুমহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জীবনে একটা অক্ষয় দাগ রাখিয়া যাইবার জন্য তাহাদের জন্ম হইয়াছে। যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বামীজী তাহাদিগকে বলিয়াছেন, হে বীরহৃদয় যুবকগণ, লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু এবং বজ্রদৃঢ় উপাদানে গঠিত মন—এগুলিই আমি চাই। স্ত্রী-সুলভ কোমলতা আর চাই না। মহাশক্তি ও মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ চাই। আমি চাই লোহার মতো দৃঢ় ইচ্ছা এবং নির্ভীক হৃদয় যাহা বিপদকে, পর্বতপ্রমাণ বিপর্যয়কে গ্রাহ্য করে না, ভয়ে কম্পিত হয় না।

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা
না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক
তাহাতে শ্যামা॥"

অবিচলিত আজ্ঞাবহতা

আজ্ঞাবহতার অভাব আমাদের যুব-সম্প্রদায়ের আর একটি প্রকৃতিগত দোষ। স্বামী বিবেকানন্দ যুব-গণের চরিত্রে এই দোষ দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতের উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য প্রথার প্রচলন না থাকাতেই ইদানীং আমাদের সমাজ-দেহে এই আজ্ঞাবহতার নিদারুণ অভাব প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন গুরুকুল-প্রথা বিদ্যার্থিগণকে গুরুর আদেশ অবিচলিতভাবে শিরোধার্য করিতে শিক্ষা দিত। স্বামীজী তাই যুব-সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর, আদেশ আপনা-আপনিই আসিবে। সর্বদাই দাস (ভৃত্য) হইতে শিখ, তারপর প্রভু হইবার উপযোগী হইবে।" ঈশ্বর ও মানবজাতির দীন সেবক হইতে হইলে যুব-সম্প্রদায়কে তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ গুরু ও নেতৃ-গণের আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে গুরুজন ও নেতার আদেশ অকুণ্ঠে প্রতিপালন ও সংকল্প সাধন নতুবা মৃত্যুবরণ।

সংহতি শক্তি

ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি-শক্তির শোচনীয় অভাবও স্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে জানে না, পরস্পরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে না। তাহারা অতিশয় স্বার্থপর ও কলহপ্রিয়। সংহত হইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। যদি তাহারা সর্বদা অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হয় এবং ঈর্ষ্যাপরায়ণ না হয়, তবে জাতীয় চরিত্রের এই জঘন্য কলঙ্ক অচিরেই বিদূরিত হইবে। তাই বর্তমান ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ যুব-সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভবিষ্যৎ ভারতকে মহান্, উন্নতশির ও গৌরবোজ্জ্বল করিবার সমগ্র রহস্য নিহিত রহিয়াছে সংহতি ও শক্তির সমাবেশ এবং ইচ্ছার একীকরণের মধ্যে। সফলতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় ঐকমত্য।" মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ তাঁহাদের অদ্ভুত সংহতি-শক্তির প্রভাবে কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোটি কোটি ভারতবাসীর উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যষ্টি-শক্তির একীকরণ ব্যতীত কোন মহৎ কাজই সম্পন্ন হয় না।

আত্মোৎসর্গ ও সত্যনিষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় যুবসম্প্রদায়কে ত্যাগ, পবিত্রতা, তিতিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা, এবং সেবার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশমাতৃকা ও মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যুবসম্প্রদায়ের এক লক্ষ লোক পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ঈশ্বর ও আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাস দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া এবং দরিদ্র, পতিত, নিপীড়িত আর্ত ও তথা-কথিত অস্পৃশ্যগণের প্রতি যথার্থ প্রেম, সহানুভূতি ও সৌভ্রাত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নয়নের মহতী বার্তা প্রচার করিলে, তাহারা সমগ্র ভারতের জনগণের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। যখন দেশমাতৃকার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, অকপটহৃদয় সহস্র সহস্র যুবশক্তির আবির্ভাব হইবে, তখনই ভারত স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সর্ববিষয়ে বরেণ্য ও উন্নতশির হইবে।

স্বদেশ-প্রেম

ভারত ও জগতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের একটা নিজস্ব মৌলিক বিশিষ্ট ও সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা ছিল। তিনি স্বদেশবাসিগণকে ভারতের জাতীয় পতাকা—আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও সেবার পতাকা উড্ডীন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ। যদি ভারতীয় জাতির ধমনীতে আধ্যাত্মিকতার রক্ত সক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়, তবেই সকল বিষয় যথার্থরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে; রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ঐহিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হইবে, এমন কি দেশের সর্ববিধ্বংসী দারিদ্র্যও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। স্বদেশপ্রেমিক ঋষি চাহিয়াছিলেন যে, ভাবী স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয় কর্মী মাত্রই কতকগুলি অত্যাবশ্যক সদ্গুণে ভূষিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ, সংস্কারকগণ, তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাসনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে! তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই চিন্তা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে তোমরা স্বদেশপ্রেমের প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।" দ্বিতীয়তঃ এই অকৃত্রিম প্রেম ও সহানুভূতির ভাব তাহাদিগকে হতভাগ্য স্বদেশবাসিগণের দুঃখ-ক্লেশ দূরীকরণার্থ কতকগুলি কার্যকর প্রতিকারব্যবস্থা বাহির করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে। তৃতীয়তঃ, স্বদেশপ্রেমিকগণ অর্থ, নাম, যশ বা প্রতিষ্ঠার বশীভূত হইতে পারিবে না। অনেক স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয় কর্মী ও সংস্কারক অর্থ, নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠার মোহে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিকের নিকট যাহা কিছু প্রিয় সবই দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। মহৎ উদ্দেশ্য হইতে তাহাদিগকে কিছুই বিচলিত করিতে পারিবে না। স্বদেশপ্রেমিক যদি সফলতার সহিত এই সকল অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম

করিতে পারেন, তবেই তিনি জয়যুক্ত ও মহিমামণ্ডিত হইতে পারিবেন।

ভারতীয় চিন্তাধারার দিগ্বিজয়

ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশসমূহ অনির্বাণ ভোগতৃষ্ণা, অপরিমেয় সাম্রাজ্যলিপ্সা ও দুর্দমনীয় রাষ্ট্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদগ্র প্রেরণায় ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের কর্তব্য, এই সকল দেশে ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক বাণী বহন করা। প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, শুভেচ্ছা ও সৌভ্রাত্রের বার্তা প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীকে বিমল আনন্দ ও শান্তির অধিকারী করিয়া তুলিবার গুরু নৈতিক দায়িত্ব ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের উপর। স্বামীজী বলিয়াছেন—"পরিপূর্ণ সভ্যতার জন্য পৃথিবী ভারতীয় অমূল্য সংস্কৃতিসম্পদের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় জাতির অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবধারা পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা পৃথিবীজয়ের মধ্যেই আমরা প্রবুদ্ধ ও শক্তিশালী জাতীয় জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইব।"

স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বানে যুব-ভারত অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দিলেই ভারতমাতার যথার্থ মুক্তি হইবে।

রহমতের কবর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ

রহমতের কবর ঘুমায় গাছের ছায়ার নীচে
স্মৃতির চিতা জ্বালছে পথিক ঐ কবরের পিছে।
খেলার সাথী সেই রহমত মুন্সিবাড়ীর ছেলে,
সঙ্গী সাথী অনেক মেলে ব্যথিত নারে মেলে।
এই যে নূতন আমের চারা পুষ্ট যাহার গুড়ি,
পাবনা হতে এনেছিলাম আট টাকা তার কুড়ি।
সন্ধ্যা হ'ল ঝিটকা ছেড়ে উজানচরের বাঁয়ে।
দিয়াবাড়ির খালের মুখে পড়ল যখন নাও
পদ্মানদীর বুকের 'পরে উঠল ক্ষেপে বাও,
অন্ধকারে বন্ধ হয়ে গেলো চতুর দিশ—
ঝোড়ো রাতের যাত্রী ডাকে—
'দয়াল, পারে নিস।'
কখন ডুবি কখন তরি কখন মরি বাঁচি,
বিধির লিপি ললাটে পরে আজো বেঁচে আছি।
আমি আছি, রহমত রে তোর কবরের পরে
সেই যে আমের চারা আজি পাতার ছাতি ধরে।
চ'লছে কালের রথের চাকা বাজছে কালের ঘড়ি,
মহানটের নৃত্য চলে—দুলছে রাতের ঝড়ি।

আত্মোৎসর্গ ও সত্যনিষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় যুবসম্প্রদায়কে ত্যাগ, পবিত্রতা, তিতিক্ষা, সত্যনিষ্ঠা, এবং সেবার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশমাতৃকা ও মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যুব-সম্প্রদায়ের এক লক্ষ লোক পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ঈশ্বর ও আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাস দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া এবং দরিদ্র, পতিত, নিপীড়িত আর্ত ও তথা-কথিত অস্পৃশ্যগণের প্রতি যথার্থ প্রেম, সহানুভূতি ও সৌভ্রাত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নয়নের মহতী বার্তা প্রচার করিলে, তাহারা সমগ্র ভারতের জনগণের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। যখন দেশমাতৃকার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, অকপটহৃদয় সহস্র সহস্র যুবশক্তির আবির্ভাব হইবে, তখনই ভারত স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সর্ব-বিষয়ে বরেণ্য ও উন্নতশির হইবে।

স্বদেশ-প্রেম

ভারত ও জগতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের একটা নিজস্ব মৌলিক বিশিষ্ট ও সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা ছিল। তিনি স্বদেশবাসিগণকে ভারতের জাতীয় পতাকা—আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও সেবার পতাকা উড্ডীন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ। যদি ভারতীয় জাতির ধমনীতে আধ্যা-ত্মিকতার রক্ত সক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়, তবেই সকল বিষয় যথার্থরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে; রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ঐহিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হইবে, এমন কি দেশের সর্ববিধ্বংসী দারিদ্র্যও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। স্বদেশপ্রেমিক ঋষি চাহিয়াছিলেন যে, ভাবী স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয় কর্মী মাত্রই কতকগুলি অত্যাবশ্যক সদ্‌গুণে ভূষিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ, সংস্কারকগণ, তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাসনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে! তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ, এই ভাবনায় কি নিদ্রা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই চিন্তা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে তোমরা স্বদেশপ্রেমের প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।" দ্বিতীয়তঃ এই অকৃত্রিম প্রেম ও সহানুভূতির ভাব তাহাদিগকে হতভাগ্য স্বদেশ-বাসিগণের দুঃখ-ক্লেশ দূরীকরণার্থ কতকগুলি কার্যকর প্রতিকারব্যবস্থা বাহির করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে। তৃতীয়তঃ, স্বদেশপ্রেমিকগণ অর্থ, নাম, যশ বা প্রতিষ্ঠার বশীভূত হইতে পারিবে না। অনেক স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয় কর্মী ও সংস্কারক অর্থ, নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠার মোহে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট যাহা কিছু প্রিয় সবই দেশ-মাতৃকার মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। মহৎ উদ্দেশ্য হইতে তাহাদিগকে কিছুই বিচলিত করিতে পারিবে না। স্বদেশপ্রেমিক যদি সফলতার সহিত এই সকল অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম

করিতে পারেন, তবেই তিনি জয়যুক্ত ও মহিমামণ্ডিত হইতে পারিবেন।

ভারতীয় চিন্তাধারার দিগ্বিজয়

ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশসমূহ অনির্বাণ ভোগতৃষ্ণা, অপরিমেয় সাম্রাজ্যলিপ্সা ও দুর্দমনীয় রাষ্ট্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদগ্র প্রেরণায় ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছে। ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের কর্তব্য, এই সকল দেশে ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক বাণী বহন করা। প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, শুভেচ্ছা ও সৌভ্রাত্রের বার্তা প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীকে বিমল আনন্দ ও শান্তির অধিকারী করিয়া তুলিবার গুরু নৈতিক দায়িত্ব ভারতীয় যুব-সম্প্রদায়ের উপর। স্বামীজী বলিয়াছেন—"পরিপূর্ণ সভ্যতার জন্য পৃথিবী ভারতীয় অমূল্য সংস্কৃতিসম্পদের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় জাতির অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবধারা পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে। ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা পৃথিবীজয়ের মধ্যেই আমরা প্রবুদ্ধ ও শক্তিশালী জাতীয় জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইব।"

স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বানে যুব-ভারত অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দিলেই ভারতমাতার যথার্থ মুক্তি হইবে।

রহমতের কবর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ

রহমতের কবর ঘুমায় গাছের ছায়ার নীচে
স্মৃতির চিতা জ্বালছে পথিক ঐ কবরের পিছে।
খেলার সাথী সেই রহমত মুন্সিবাড়ীর ছেলে,
সঙ্গী সাথী অনেক মেলে ব্যথিত নারে মেলে।
এই যে নূতন আমের চারা পুষ্ট যাহার গুড়ি,
পাবনা হতে এনেছিলাম আট টাকা তার কুড়ি
সন্ধ্যা হ'ল ঝিটকা ছেড়ে উজানচরের বাঁয়ে।
দিয়াবাড়ির খালের মুখে পড়ল যখন নাও
পদ্মানদীর বুকের 'পরে উঠল ক্ষেপে বাও,
অন্ধকারে বন্ধ হয়ে গেলো চতুর দিশ—
ঝোড়ো রাতের যাত্রী ডাকে—
　　　　'দয়াল, পারে নিস।'
কখন ডুবি কখন তরি কখন মরি বাঁচি,
বিধির লিপি ললাটে পরে আজো বেঁচে আছি।
আমি আছি, রহমত রে তোর কবরের পরে
সেই যে আমের চারা আজি পাতার ছাতি ধরে।
চ'লছে কালের রথের চাকা বাজছে কালের ঘড়ি,
মহানটের নৃত্য চলে—দুলছে রাতের ঝড়ি।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

ব্রহ্মচারী শ্রীধরচৈতন্য

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অল্প কিছু দিন পরেই গোপালের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য জাগিয়া উঠে এবং তীর্থভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা বলবতী হয়। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন—"যতক্ষণ বোধ যে সেথা সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান, যখন হেথা হেথা ততক্ষণই জ্ঞান।" ঈশ্বর প্রত্যেকের অতি সন্নিকটে—ইহা না বুঝিয়া কেবল তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যেই ভ্রমণেচ্ছা চরিতার্থ করিলে বা ঐ সকল স্থানে ভগবৎপ্রকাশ উপলব্ধি করিতে না পারিলে তীর্থদর্শনে তেমন ফলোদয় হয় না। ইহা বুঝিয়াই ঠাকুর তাঁহাকে নিকটে লণ্ঠন থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি তামাক খাইবার জন্য প্রতিবেশীর নিকট আগুন চাহিবার গল্পটি বলিয়াছিলেন। তাহাতে গোপালের, তীর্থ ভ্রমণের স্পৃহা সাময়িক ভাবে প্রশমিত হইয়া ভজনানুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে পুনরায় তাঁহার সুপ্ত বাসনা জাগিয়া উঠে এবং তিনি তীর্থে যাইয়া সাধুদিগকে গৈরিক কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা বিতরণ করিবার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তীর্থে যাইবার পূর্ব্বে তিনি যথার্থ সাধুর অন্বেষণে কালীঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বহুবার ঘুরিয়া ব্যর্থকাম হন। কোন বিখ্যাত সাধুর নাম শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইলে, তাঁহার মাপকাঠিতে সাধুর চরিত্রে এমন কোন ত্রুটি ধরা পড়িত, যাহাতে তিনি তাঁহাকে যথার্থ সাধু বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। শেষে তিনি ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলে ঠাকুর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আকুমার ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য বিতরণ করিতে ইঙ্গিত করেন। তাঁহাদিগকে খাওয়াইলে এবং বস্ত্রাদি দান করিলে তাঁহার লক্ষ সাধুসেবার ফল হইবে। অগত্যা গোপাল কাপড় ও মালার পুঁটলীটি ঠাকুরকে প্রদান করিলেন।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার তীর্থভ্রমণ স্পৃহা মিটিয়াছিল। তিনি উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, হরিদ্বার, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। এমন কি সুদূর দাক্ষিণাত্যের রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী তীর্থ দর্শন করিতেও তিনি গিয়াছিলেন। বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যাক্ষেত্রেও তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

স্বরূপে লীন হইবার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহত্যাগী শিষ্যদিগকে একটি সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়া তাঁহাদিগকে মহান্ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সংঘ-জীবন যাপনের পথ নির্দ্দেশ করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর তাঁহাদিগকে ত্যাগের প্রতীক গৈরিক প্রদান করিয়া উহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দিলেন এবং 'মাধুকরী' ভিক্ষা করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ভিক্ষান্নে জীবন যাপনের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা তাঁহাদের এই প্রথম। অনভ্যস্ত তাঁহারা ভিক্ষা করিতে যাইয়া একদিকে যেমন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা পাইলেন তেমনই কোন কোন স্থানে আদরযত্নও পাইলেন। এই উভয় অবস্থার সহিত পরিচিত করাইবার জন্য ঠাকুরের চেষ্টা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফল

হইয়াছিল, যখন তাঁহারা সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহাদের তিনি সন্ন্যাস দিয়াছিলেন তাহা এইপ্রকারে উল্লিখিত আছে—

এবে শ্রাবণের মাস প্রায় শেষ হয়।
আট নয় দিন বাকী আর বেশী নয়॥
একদিন শ্রীযোগীনে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
পঁচিশ হইতে পাঠ কর পঞ্জিকার॥
দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র যেমন।
সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রভু করিলা শ্রবণ॥
পয়লা ভাদ্রের কথা আরম্ভে গোঁসাই।
কহিলেন থাক আর পাঠে কাজ নাই॥
আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশজনে॥
নরেন্দ্র, যোগীন, লাটু নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম, কালীচন্দ্র বণিকনন্দন॥
সুন্দর শরৎ, শশী, তারক ঘোষাল।
শেষজন যাঁর নাম মুরুব্বি গোপাল॥[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—

বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে, তাঁহারা পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের মাতার দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া আঁটপুরে তাঁহার পল্লীভবনে কাটাইয়া আসেন। সেখানে তাঁহারা ধ্যান-ধারণায় বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। নেতা নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে ও ভাবে সকলকে জীবন গঠন করিতে খুবই উৎসাহ দিতেন। জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রেমপূর্ণ শান্তির বাণী প্রচার করিবার কল্পনা সম্ভবতঃ এইস্থানেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে এবং প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে আজীবন সন্ন্যাস জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করেন।

৫ এই সময়ে তিনি একখানি কাপড় পৃথক করিয়া রাখিয়া দেন, পরে উহা ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে দিয়াছিলেন।

পরে তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। এইসঙ্গে অন্য চৌদ্দজন গুরুভাইদের সহিত গোপালও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে খ্যাত হন।[৬]

বরাহনগর মঠ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া ঐ স্থানে প্রায় ৫ বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উহা আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। বরাহনগর হইতেই তিনি কাশীধামে তপস্যার্থ যাত্রা করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বিশ্বনাথের দরবারে কাটাইয়া দিবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়া অদ্বৈতানন্দজী তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তাই আলমবাজার মঠে তিনি বাস করেন নাই।

কাশীতে তিনি বহুবৎসর কঠোর তপস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। যাঁহাদের তাঁহার সহিত ঐ সময়ে বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহার ঐকান্তিক তপোনিষ্ঠা ও ভগবৎপরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন, এমন কি কাশীর প্রচণ্ড শীতেও তাহা বন্ধ করিতেন না। স্নানান্তে অদ্বৈতানন্দজী স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে আসিয়া ধ্যানে বসিতেন। বহুক্ষণ আত্মচিন্তায় কাটাইয়া তিনি 'মাধুকরী' করিতে বাহির হইতেন। দিনের অবশিষ্ট অংশও

৬ অন্যান্য যাঁহারা এই সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম :—
(১) নরেন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ, (২) রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (৩) বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ, (৪) যোগীন—স্বামী যোগানন্দ, (৫) নিত্যনিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, (৬) তারক—স্বামী শিবানন্দ, (৭) শরৎ—স্বামী সারদানন্দ (৮) লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ, (৯) গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ, (১০) শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (১১) কালী—অভেদানন্দ (১২) হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ, (১৩) সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ, (১৪) সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

অনুরূপ সৎচিন্তায় ও সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার অতিবাহিত হইত। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কাশীতে সোনারপুরায় তিনি এক শিবমন্দিরের সন্নিকটে বংশীদত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাগানে এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। এই অল্পপরিসর স্থানে তাঁহার সামান্ত জিনিষপত্র এমন সুচারুরূপে বিন্যস্ত থাকিত যে লোকে তাঁহার সুমার্জ্জিত রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।*

আমেরিকায় বিজয় অভিযানের পর স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দেশবাসীদের মধ্যে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সমস্ত গুরুভাইদিগকে মঠে একত্রিত হইবার জন্ম আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাশীতে কাটাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াই কাশীবাস করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে তিনিও তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া সমবেত হইলেন। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী শিষ্যদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং মানবজাতির কল্যাণের গুরু দায়িত্ব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর দিয়াছিলেন। প্রতীচ্যে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জনকল্যাণকারী ভাবধারা একাই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের বহুকালব্যাপী অজ্ঞান ও জড়তা তাঁহাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। তাই তাঁহার সাদর আহবানে সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেলুড় মঠে স্বামী অদ্বৈতানন্দ

নীলাম্বর বাবুর বাগানে অবস্থিত মঠে থাকিবার সময়ে বর্ত্তমান বেলুড় মঠের জমি ক্রয় করা হয়। জমি কিনিবার অব্যবহিত পরেই নূতন বাড়ী তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ঐ স্থানে ষ্টীমার সারাইবার 'ডক্' ছিল। সেইজন্ম জমিতে নানা স্থানে গর্ত্ত ডোবা প্রভৃতি ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর উপরে মঠের জমি সমতল করিবার ভার পড়িল।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ 'স্বামী অদ্বৈতানন্দের স্মৃতি' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর নাগাদ আমি ৺বৃন্দাবন যাবার পথে ৺কাশীতে নেমেছিলুম। বাঙ্গালীটোলায় বংশীদত্তের বাড়ীতে পূজনীয় গোপালদাদার কাছে উঠলুম। তিনি তখন কাশীবাস করছেন, গোপালদাদা সব বিষয়ে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোছানো (methodical) ও পরিমিতব্যয়ী (economical) ছিলেন। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে বারোমাস গঙ্গাস্নান করে এসে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত জপধ্যান করে মাধুকরী ভিক্ষা করে আনতেন।………সময় সম্বন্ধেও সব বাঁধাধরা, to the minute—নাওয়া, খাওয়া, নিদ্রা, বৈকালে বেড়াতে যাওয়া, জপধ্যান প্রভৃতি সব বিষয়ে। কাপড় চোপড়, বিছানা, ঘর বারান্দা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কূয়া হইতে জল তোলা, কাপড় কাচা, ঝাঁট দেওয়া, তামাক সাজা—সকল কাজ নিজের হাতে করতেন। যেখানের জিনিষটি ঠিক সেইস্থানে রাখা চাই। যখন মঠে ছিলেন সাধু ব্রহ্মচারী যারা ওই সব বিষয়ে অমনোযোগী তাদের উপর চটা ছিলেন।……আমি তাঁর নির্দ্দেশমত সব কাজ করতুম বলে আমার উপর খুব খুসী ছিলেন।……বৈকালে বেড়াতে বেরিয়ে আমাকে ৺কাশীতে দর্শনীয় সমস্ত দেখাতেন। গোপালদাদার সঙ্গে আমিও মাধুকরী করে নিয়ে আসতুম। তাঁর সকল কাজ আমি করে দিতুম বলে তাঁর ভারী ইচ্ছা ছিল আমাকে তাঁর সেবার জন্ম তাঁর কাছে রেখে দিতে। কিন্তু তখন আমার ৺বৃন্দাবনে যাবার প্রবল বাসনা থাকায় আমি রাজী হই নাই।……গোপালদাদা ও বুড়োবাবার (স্বামী সচ্চিদানন্দ) সঙ্গে আমি পঞ্চকোশী প্রদক্ষিণ করতেও গিয়েছিলুম। মধ্যাহ্নে যেখানে পৌঁছতাম সেখানে রান্নাদি করে আহার করে বিশ্রাম করতুম। রাত্রে গাছের তলায় আসন করে শোয়া যেত।"

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও কাজে তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সকালে তিনি নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ী হইতে বেলুড় মঠের নূতন জমিতে চলিয়া আসিতেন, এবং সমস্ত দিন সাঁওতাল মজুরদের কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহারা মন দিয়া কাজকর্ম্ম না করিলে তিনি তাহাদের ধমকাইতেও ছাড়িতেন না। এমন কি স্বামীজীও সাঁওতালদের লইয়া একটু রঙ্গ পরিহাস করিতে চাহিলে তাহারা 'বুড়োবাবার' (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ভয়ে মন খুলিয়া আনন্দ করিতে পারিত না।

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যথারীতি কাজ করাইয়া তিনি গঙ্গায় স্নান করিতেন; তখন গঙ্গায় কোন ঘাট ছিল না। হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা ভাঙ্গিয়া তিনি অতিকষ্টে স্নান করিয়া আসিতেন এবং গাছতলায় বসিয়া নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীর মঠ হইতে প্রেরিত খাদ্যাদি খাইয়া অল্প বিশ্রামের পরেই আবার কাজে লাগিতেন।

তাঁহাকে মঠের প্রত্যেকটি কাজ অতি নিষ্ঠা ও পরিপাটীর সহিত করিতে দেখা যাইত। কোন জিনিষ যথাস্থানে দেখিতে না পাইলে বা কোথাও কোন কিছু পড়িয়া থাকিলে তিনি সকলকে ধমক দিতেন। মঠে তরিতরকারি ফলাইবার এবং বাগান করিবার চেষ্টা ও গোপালনের ব্যবস্থা প্রথম তাঁহার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃত কথা বলিলে বলিতে হয় মঠের জমির সৌষ্ঠব বিধান তিনিই করিয়া গিয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলেও অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া জপে বসিতেন। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া নিত্য কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাত রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাই চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রত্যহ তাঁহাকে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইত। ঘরে কয়েকটি 'ডন্' দিয়া পুনরায় ঠাকুরমন্দিরে যাইয়া ঐরূপ করিতে করিতে বলিতেন—"দেখ ঠাকুর, এই শরীরটার জন্য এই সব করতে হচ্ছে—আর পারি না।" সব কাজই ঠাকুরের সমর্থন অনুযায়ী করিতে হইবে—ছোট বড় সব ব্যাপারেই ঠাকুর যে তাঁহার পথনির্দ্দেশক!

স্বামী প্রেমানন্দ মঠে প্রত্যহ পূজা করিতেন। কাজের জন্য তিনি কখনও কলিকাতা গেলে অদ্বৈতানন্দজীকে পূজাও করিতে হইত। নিত্যকার সব কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া তিনি প্রতিদিন সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া মঠের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতেন। বাগান, গোশালা ও অন্যান্য স্থানে যাইয়া আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে কাজের নির্দ্দেশ দিতেন। তখনকার দিনে সব কাজকর্ম্ম মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদেরই করিতে হইত। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে খুবই কম, তাই অনেক সময়ে তাঁহাকে হাতে নাতে কাজ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইত।

ইহা ছাড়া সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। বাঁয়া তবলায় তাঁহার খুব মিষ্টি হাত ছিল। যখন তাঁহার কাজে অবসর থাকিত তিনি শাস্ত্রাদি নকল করিতেন। তাঁহার হাতের লেখা খুব ভাল ছিল। একখানি বাঁধান খাতায় তিনি সুন্দর ভাবে 'পঞ্চগীতা' নকল করিয়াছিলেন।

জমি কিনিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ কাজ শেষ হইলে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়সম্পত্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব প্রচারার্থ তাঁহার এগার জন গুরুভাইকে[৮] (১১ই জানুয়ারী, ১৯০১ খৃঃ) দানপত্র যোগে সমর্পণ করেন। তদনুসারে স্বামী

[৮] (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, (২) স্বামী প্রেমানন্দ, (৩) স্বামী শিবানন্দ, (৪) স্বামী সারদানন্দ, (৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ, (৬) স্বামী ত্রিগুণাতীত, (৭) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (৮) স্বামী সুবোধানন্দ, (৯) স্বামী অভেদানন্দ, (১০) স্বামী তুরীয়ানন্দ, (১১) স্বামী অদ্বৈতানন্দ।

অদ্বৈতানন্দও অন্যতম ট্রাষ্টী (অছী) নিযুক্ত হইলেন। তদবধি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি মঠেই কাটাইয়া গিয়াছেন।

মঠবাসী সকলেই তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে 'গোপালদা' বলিয়া ডাকিতেন। কখনও কখনও তাঁহার সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতেও ছাড়িতেন না।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি মঠ-মিশনের সেবা করিয়া ১৯০৯ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৪-১৫ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করেন।

মহাসমাধি লাভের পূর্ব্বে কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার জ্বর হইয়াছিল; জ্বর ভোগের অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। মঠের তদানীন্তন চিকিৎসক শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় ঘুসুড়ীতে থাকিতেন, তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, সকলে সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামোচ্চারণ করিতেছিলেন, পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তাঁহার মুখে চরণামৃত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত করা হয়।

শ্রীশ্রীমা গোপালদা ও লাটু মহারাজের সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যদের সহিত অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কথা বলিতেন। মাঝে মাঝে গোপালদা উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বসাইয়া খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন ও তাঁহার সহিত বহু সুখদুঃখের বিষয় আলোচনা করিতেন। গোপাল-দাদার জীবনের ইহা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন পুষ্পগুচ্ছে রচিত স্তবকের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ গন্ধে ও বর্ণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নানা ভাবসমষ্টির আকর শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে কোনপ্রকার 'একঘেয়ে' বা 'গোঁড়ামির' গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না। এই উদারতা তাঁহার প্রত্যেকটি শিষ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। তাই অদ্বৈতানন্দজীর চরিত্রেও নানা ভাবের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মসাধনা ও সেবার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য ও অনুকরণীয়। তাঁহার অতন্দ্র ভজনানুরাগ, ভগবৎপ্রেম, আদর্শ কর্ম্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি সংঘের প্রতি আনুগত্য আমাদিগকে আদর্শলাভে উদ্বুদ্ধ করুক। ওঁ শান্তি।
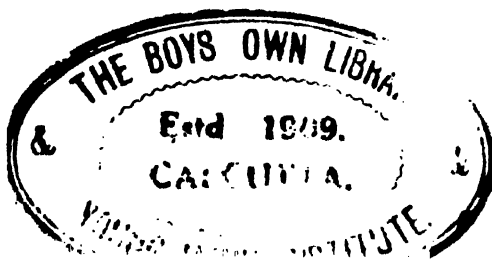
কোরানে মানব-জীবন-রহস্য

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্-এ

কোরানের মতে আদম্ হইতে আদ্মী বা মনুষ্যের সৃষ্টির সুচনা। আদমের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোরানে (২; ৩০-৩৯) বর্ণিত হইয়াছে—"আর (হে পয়গম্বর, লোকদিগকে সেই সময়ের কথা বলিয়া দাও যে) যখন তোমার প্রতিপালক (রব্ব্ কা অর্থাৎ আল্লা বা ভগবান) মলায়িক্ দিগকে (ফেরেস্তাহ বা স্বর্গীয় দুত) বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে (আমার) একজন প্রতিনিধির (খলীফহ্) সৃষ্টি করিব', তখন তাঁহারা বলিলেন, 'আপনি কি ইহাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) এমন একজন প্রেরণ করিবেন যাহাদ্বারা কলহবিস্তার ও রক্তপাত হইবে?—যদিও আমরা আপনার প্রশংসা করিতেছি ও পবিত্রতার গুণগান করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'বস্তুতঃ আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা জান না।' এবং তিনি আদমকে সকল জিনিষের নাম শিক্ষা দিলেন; তারপর ইহাদিগকে ফেরেস্তাহদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে ইহাদের নাম বর্ণনা কর।' তাঁহারা বলিলেন, 'আপনাকে শত প্রশংসা; আপনি যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আমরা আর কিছুই অবগত নহি। বস্তুতঃ আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও বিচারক।' তখন তিনি (আদমকে) বলিলেন, 'হে আদম্, তুমি তাহাদিগকে ইহাদের নাম (বা প্রকৃতিগত অবস্থা) বলিয়া দাও।' যখন (আদম্) তাহাদিগকে ইহাদের নাম বলিলেন, তখন (আল্লা বা ভগবান) বলিলেন, 'আমি কি (পূর্ব্বেই) বলি নাই যে পৃথিবী ও স্বর্গের যাবতীয় বিষয় এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, তাহাদের সকলই আমি অবগত আছি?' তারপর আমরা (ভগবান) স্বর্গীয় দুতদের আদেশ করিলাম, 'আদম্‌কে প্রণিপাত কর'; তখন ইবলীস (বা শয়তান্) ব্যতীত সকলেই তাঁহাকে প্রণিপাত করিল,—সে (প্রণিপাত করিতে) অস্বীকার করিল, (কারণ) সে অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীদের একজন ছিল। আমরা (ভগবান) আদেশ করিয়াছিলাম, 'হে আদম্, তুমি ও তোমার স্ত্রী জগতে (বা স্বর্গীয় মনোরম পুষ্পোদ্যানে) বাস করিতে থাক, এবং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী সুন্দর সুন্দর দ্রব্য আহার কর, কিন্তু এই (নির্দ্দিষ্ট) বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না; তাহা হইলে, তোমরা নিজেদের অনিষ্টকারী হইবে।' তারপর শয়তান্ তাহাদের উভয়কেই সেই (মনোরম উদ্যান) হইতে পদস্খালিত করিল এবং তাঁহারা যে (আনন্দময়) অবস্থার মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এবং আমরা আদেশ করিলাম, 'হে (মনুষ্যবর্গ) তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা নিবন্ধন (এখান হইতে) অপসারিত হও; পৃথিবীতে তোমাদের বাসস্থান হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তথায় জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে। তারপর আদম্ তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে সৎশিক্ষা লাভ করিলেন এবং (সেই শিক্ষালাভের ফলে) তাঁহার প্রভু (আবার) তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিলেন, কারণ ভগবান প্রকৃতই ন্যায়বিচারক ও দয়াশীল। আমরা আদেশ করিলাম, '(এখন) তোমরা সকলই এইস্থান হইতে অপসরণ কর, তবে যখন আমার নিকট হইতে কোন সুপথ প্রদর্শিত হইবে, যাহারা সেই পথ অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই,

অথবা তাহারা কোন দুঃখ পাইবে না। কিন্তু যাহারা (এই সুপথের প্রতি) অবিশ্বাসী হইবে এবং আমাদের আয়াৎ (বা সঙ্কেতসমূহ) মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে, তাহারা অগ্নিময় (নরকের) সাথী হইবে এবং তথায়ই বাস করিবে।"

এই কয়েকটি আয়াৎকে সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। ভগবান আদিতে ছিলেন এক এবং পরেও রহিলেন সেই এক ভগবানই। তবে তিনি ইচ্ছা করিলেন ভালমন্দ, দোষগুণ, আলো-আঁধার প্রভৃতি বিপরীত-গুণসম্পন্ন ভাবধারার মধ্য দিয়া প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হইবেন; তাই তাঁহার পৃথিবীসৃষ্টির প্রয়াস। পৃথিবী প্রকৃতই সকল বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন বিষয়ের একত্র সমাবেশ। হজরৎ মোহম্মদের প্রসিদ্ধ কিংবদন্তীতে (: হদীসে-কুদ্সী) উল্লিখিত হইয়াছে 'কুন্তু কন্জন্ মখ্ফিয়ন্ ফ-অঃহ্বব্তু অন্ উ'রফ ফ-খলক্তু-অল্-খল্ক লি-উ'রফ অর্থাৎ আমি (ভগবান) একটি লুক্কায়িত ধন ছিলাম এবং আমি ইচ্ছা করিলাম যে আমি প্রকাশিত হই, তাই (প্রকৃষ্টরূপে) প্রকাশিত হইবার জন্য এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিলাম।'

ভগবান তাঁহার প্রতিনিধিকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এই পৃথিবী বিপরীত গুণসম্পন্ন বিষয়ের একত্র সমাবেশ, এবং এখানে ঝগড়া ও কলহ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্যই স্বর্গীয় দূতদের তখনই মনে উদয় হইল যে তাহাতে কেবল কলহ ও রক্তপাতই বিস্তার লাভ করিবে। তবুও ভগবান পরম জ্ঞানী এবং তিনি এই মনুষ্যসৃষ্টির গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অবগত আছেন। যদিও স্বর্গীয় দূতগণ সকল সময়ই তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা ভগবানেরই প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু তাহাতে তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইতেছেন না। এই পূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করিবার জন্য ভগবান আদমকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে ভগবদ্গুণবিশিষ্ট করিয়া তুলিলেন। তাই যদিও আদম্ মাটি হইতে তৈয়ারী, কিন্তু ভগবদ্গুণসম্পন্ন হইয়া তিনি স্বর্গীয় দূতদের উপরে স্থান লাভ করিলেন। এখন প্রশ্ন এই, স্বর্গীয় দূতগণ কেন এই প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন না? কারণ স্বর্গীয় দূতগণ পবিত্রতার প্রতীক। কোন এক নির্দ্দিষ্ট গুণসম্পন্ন বস্তু বা ভাব অন্য একটি বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তু বা ভাবকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ভগবান আদমকে নিজে শিক্ষা দিয়া সকল বিষয়ের গূঢ় রহস্য অবগত করাইলেন এবং আদম ভগবৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভগবানের সমপর্য্যায় লাভ করিলেন। তৎপর ভগবানের আদেশ অনুযায়ী সকল স্বর্গীয় দূতগণ আদমকে ভগবদংশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন; কিন্তু এই আদেশ হইতে বিরত রহিল শয়তান্। শয়তানকে অবিশ্বাস ও অপবিত্রতার প্রতীক রূপে সৃজন করা হইয়াছে। ক্রোধ ও অবিশ্বাসজনিত শয়তান ভগবানের পূর্ণ অংশ আদমের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিল না; তাই সে অন্যান্য স্বর্গীয় দূতদের ন্যায় আদমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইল না।

ভগবদ্গুণে গুণান্বিত আদম্ তাঁহার স্ত্রীর সহিত স্বর্গীয় উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। এই আদমের মধ্যে সকল বিরুদ্ধগুণ-সমূহ ন্যস্ত হইল—ইহাই তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাসের উল্লেখ ও কোন নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী না হওয়ার নির্দ্দেশ। আদমের মধ্যেই বিপরীত গুণসমূহ লুপ্তভাবে বিরাজ করিতে লাগিল এবং অবিশ্বাস ও অপবিত্রতার প্রতীক শয়তানের আধিপত্যে সেই লুপ্ত গুণ (বা দোষ-সমূহ) তাঁহার মধ্যে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎসান্নিধ্য হইতে দূরে

সরিয়া গেল। আদমের এই পতিত অবস্থাকেই মানুষের জন্মরহস্য বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে অবতীর্ণ আদমের এই অধঃপতিত জীবনকেই মানবজন্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তেই মানুষের মনে সন্দেহ আসিল যে সে ভগবানের অংশীভূত নহে এবং ভগবানের কথায় আস্থাবান না হইয়া অসতের দিকে ধাবিত হইল, তখনই তাহার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ। পাপে জড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ভগবদ্-অনুগ্রহে ইহাও অনুভব করিতে পারিল যে সেই পরমসত্য ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই তাহার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। এবং ভগবদ্-অনুগ্রহে ইহাও জানিতে পারিল যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে ভুগিতেই হইবে। তবে যদি সে আবার এই পৃথিবীতে অবস্থিত থাকিয়াই সেই পরম সত্য বা তাহার প্রতীক কোন ভগবৎ-প্রেরিত পুরুষের আদেশানুযায়ী সৎপথে চালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কতক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই পৃথিবীতে থাকিয়াই অথবা পরজীবনে, আদমের অধঃপতিত জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার ন্যায়, সেই পরমসত্য ও পবিত্রতার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। সেই পরম সত্য প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই কোরানের আয়াৎ বা শ্লোকসমূহ ভগবানকর্ত্তৃক তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহম্মদের সাহায্যে এই পৃথিবীতে লোকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই সকল উপদেশ মানিয়া চলিবে, তাহারা সময়ে (অর্থাৎ যখন তাহারা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবার উপযুক্ত হইবে) আবার ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা এই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে কোন আস্থা রাখিবে না ও সেই পথে চালিত হইবে না, তাহারা তাহাদের এই অবিশ্বাসজনিত পাপের জন্য স্বর্গের পবিত্রতা হইতে দূরে থাকিবে ও অগ্নিময় নরকের পঙ্কিলতার মধ্যেই বাস করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ আদমের অধঃপতিত জীবনই মানুষসৃষ্টির কারণ, এবং যখনই মানুষ এই অধঃপতিত জীবন হইতে অব্যাহতি পাইবে, তখনই সে আবার ভগবানের সহিত মিলিত হইবে। এই সম্বন্ধে কোরানে (৬; ৭১-৭২) বর্ণিত হইয়াছে, "(হে পয়গম্বর,) বল যে আল্লা বা ভগবানের নির্দ্দেশিত পথই (একমাত্র) পথ, এবং আমরা নির্দ্দেশিত হইয়াছি যে পৃথিবীর সর্ব্বময় প্রভুর নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করি, এবং নিয়মিত স্বলাৎ (বা প্রার্থনা) করি ও তাঁহাকে মান্য করি; কারণ তিনিই একমাত্র প্রভু, যাঁহার নিকট আমাদের সকলকেই সমবেত হইতে হইবে।"

বস্তুতঃ মানুষ যে ভগবৎসম্ভূত তাহা জন্ম হইতেই সে অবগত আছে, কিন্তু পার্থিব আকর্ষণের তীব্রতাবশতঃ সে ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যায়। এই বিষয়ে কোরানে (৭; ১৭২-৭৬) বর্ণিত হইয়াছে "(হে পয়গম্বর, লোকদের বলিয়া দাও যে) যখন তোমার প্রভু আদমের বংশধরদের (অর্থাৎ মানুষগণকে) আদম হইতে সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি (অলস্তু বিরব্বিকুম্)।' তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা ইহা স্বীকার করিতেছি (বলি, শহিদ্না)।' (ইহা প্রতিজ্ঞা করাইবার উদ্দেশ্য এই যে) যদি তোমরা সেই শেষ বিচারের দিনে বল যে আমরা এই বিষয়ে সতর্কিত হই নাই, অথবা যদি তোমরা বল যে আমাদের পিতৃপুরুষগণ (ভগবানের) অংশিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আমরা তাহাদের বংশধর মাত্র। কাজেকাজেই যাঁহারা পূর্ব্বে ভুল করিয়া

গিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মের জন্য কি আমাদের বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে? এইরূপেই আমরা (ভগবান) সঙ্কেতসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া আসিয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিতে পারে। (হে পয়গম্বর) সেই ব্যক্তির কথা সকলকে বল, যাহার নিকট আমার সঙ্কেত প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সে ইহার প্রতি কোন খেয়াল করে নাই; কাজেকাজেই শয়তান্ তাহার অনুসরণ করিল এবং সে বিপথগামী হইল। যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে ইহা (বা এই সঙ্কেত-সমূহ) দ্বারা তাহার এই (মনের) অবস্থার উন্নতি করিতে পরিতাম; কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রহিল এবং তাহার লালসা উদ্দীপ্ত পথে চালিত হইল। এই লালসা ঠিক কুকুরের মত; যদি তুমি ইহাকে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে ইহা জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে; অথবা যদি তুমি ইহাকে (নিজের ইচ্ছামত) চলিতে দাও, তাহা হইলেও জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে। এই উপমা তাহাদের প্রতিই প্রযোজ্য যাহারা আমাদের সঙ্কেতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস ভাজন হইয়াছে।"

মানুষ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই সদসৎকে জানিয়া থাকে; কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় অসতের প্রতি ধাবিত হয়, এবং ক্রমশঃ ভগবদ্-উদ্ভূত গুণসমূহ হইতে দূরে সরিয়া যায়। যাহাদের আল্লা বা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাহাদেরই এইরূপ হইয়া থাকে—তাহারা নানা রকম কষ্ট পাইলেও ভগবদ্গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলিতে দিলেও তাহারা ভগবান হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এইরূপ লোকই শয়তান রূপ প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হইয়া যাবজ্জীবন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না সেই অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর, অবশেষে এই জীবনেরই এক নূতন অধ্যায়ে অথবা পরজীবনে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে এবং ক্রমশঃ ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়া সর্ব্বশেষে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলই যে সর্ব্বশেষে তাঁহার সহিতই মিলিত হইবে তাহার বর্ণনা কোরানে (৩; ৮৩) আছে—"বস্তুতঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল জীবই ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছায় (ত্বৌ'আন্ব্ ক্রহান্) তাঁহার নিকটই নিজকে উৎসর্গ করিয়াছে, এবং তাঁহার নিকট সকলকে (অবশেষে) ফিরিয়া যাইতে হইবে।" ভগবদ্-বিশ্বাসী আপনা হইতেই ভগবদ্গুণে আকৃষ্ট, এবং তাঁহার নিকট যত শীঘ্র সম্ভব, অর্থাৎ তাহার মনের অবশিষ্ট পঙ্কিলতা দূর হওয়া মাত্রই, ভগবদ্গুণে পূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং তাহার সহিতই আবার মিলিত হইবে। অবিশ্বাসীর প্রতিও ভগবান দয়াহীন নহেন, প্রবৃত্তির তাড়না বশতই ভগবৎসত্তায় অবিশ্বাসী এখন পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিতেছে না যে সে ভগবান হইতেই উদ্ভূত এবং আবার তাঁহার সহিতই মিলিত হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ দুঃখযাতনা ভোগ করার পরই হউক, অথবা প্রবৃত্তির তাড়নার বিষময় ফল উপভোগ করার পরই হউক, সে ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসী হইবে এবং তাঁহার সহিতই আবার মিলিত হইবে।

বস্তুতঃ মানব-জীবন-যাত্রা ভগবান হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অন্তিমে তাঁহার সহিত আবার সকলকে মিলিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না মানুষ সেই পরম সত্তাকে সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহাকে জীবনের পর জীবন অথবা একই জীবনে নানা অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, অবশেষে তাহার সেই পরমসত্তায় মিলিত

হইবার সুযোগ আসিবে। এবং কোরানে (৮৪ ; ১৯) বর্ণিত হইয়াছে "তোমাদের এক অবস্থার পর অন্য অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।"

মানব-জীবন একটি বৃহৎ পরীক্ষার স্থল। এখানে সেই ভগবানই যে তাহার একমাত্র প্রভু, ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কারণ অন্তিমে সকলকে তাঁহারই সহিত মিলিত হইতে হইবে। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে, এই পরম যাত্রাপথে সে ভগবান হইতে দূরেই রহিয়া যাইবে। তাই আদমের বংশ হইতে উদ্ভূত সকল জীবকেই সকল দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার জন্যই আগ্রহশীল হইতে হইবে। সেইজন্য কোরানে (২ ; ১৫৫) উদ্ধৃত হইয়াছে "হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য্য ও প্রার্থনার সাহায্যে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ কর ; কারণ ভগবান ধৈর্য্যশীলদের সহিতই অবস্থান করেন। যাহারা এই ভগবৎপথে (ফী সবীলে আল্লাহে) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মৃত্যু নাই, তাহারা (চির-) জীবিত, যদিও তোমরা তাহাদের (প্রকৃত তত্ত্ব) জ্ঞাত নহ। ইহা ঠিক যে আমি (ভগবান) যৎসামান্য ভয়, ক্ষুধা, ধনহানি, প্রাণনাশ ও উৎপন্ন ফসলের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিব, কিন্তু (হে পয়গম্বর,) তাহাদের নিকট এই শুভসংবাদ জানাইয়া দাও যে (তাহারা আমার সকল রকম অনুগ্রহ লাভ করিবে)। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিরা যখনই বিপদ্গ্রস্ত হয়, তখনই বলিয়া থাকে যে আমরা ভগবান হইতেই উদ্ভূত এবং তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইব (ইন্না লিল্লাহি ব ইন্না ইলাহি রাজি 'উন)।"

মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবানকে প্রকৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং একান্তভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। সেই পরম মিলনের একমাত্র পথ হইল সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকেই একমাত্র নিয়ন্তা মনে করা এবং তাঁহার নিকটই আত্মসমর্পণ করা। কোরানে (৫১ ; ৫৬-৫৯) সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে "আমি (ভগবান) জিন্ (প্রেতাত্মা) ও মানুষকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে তাহারা যেন আমাকে উপাসনা করিতে পারে। আমি তাহাদের নিকট হইতে কোন ভরণপোষণের প্রার্থী নহি, কারণ ভগবানই একমাত্র ভরণপোষণকারী ও শক্তিধর।" সেই পরম শক্তিমান ভগবানই একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পর্য্যন্ত না মানুষ সেই পরম শক্তিধরকে মনে প্রাণে ও প্রকৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাঁহারই উপাসনা করিতে হইবে ; এবং সেই পরম শুদ্ধ ও সত্য উপাসনা দ্বারা তাঁহার নিকটই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। যিনি এইরূপ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) এবং তিনিই কেবল ইস্‌লাম্ বা আত্মসমর্পণরূপ ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছেন।

সক্রেটিসের মহাপ্রয়াণ

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ

সক্রেটিসের দেহত্যাগের দিন তিনি অতি প্রত্যুষে শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে কারাগার-সন্নিধানে তাঁহার বিচার-স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে এগার জন বিচারকর্তা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তাঁহারা উপস্থিত হইয়া সক্রেটিসের লৌহশৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিলেন। সমস্ত দিনব্যাপী শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলীর সংগে তাঁহার নিম্নোক্ত উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলিতে লাগিল: শরীররূপ সংকীর্ণ আবদ্ধাগার হইতে মুক্তি ব্যতীত মৃত্যু অন্য কিছু কি? জ্ঞানী পার্থিব আমোদপ্রমোদের বিষয় চিন্তা করেন কি? জ্ঞানী কি যৌন আমোদে মাতিয়া উঠেন? শরীর কি প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিপন্থী নহে? আত্মা কি অবিনশ্বর নহে? মৃত্যুর পর জ্ঞানী পরলোকে দেবতা ও পুণ্যাত্মা বিদেহিগণের সংগে মিলিত হইয়া পরমসুখে কি অবস্থিতি করেন না?

এইসব মহৎতত্ত্ব আলোচনায় সূর্যাস্তের সময় আগত হইল। সক্রেটিস্ সমবেত ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার স্নানের সময় উপস্থিত। বিষপানের পূর্বে আমার নিজের শরীর আমাকেই পরিষ্কার করা উচিত; আমার মৃতদেহ ধৌত করার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে কষ্ট দেওয়া অবিধেয়।" প্রিয়তম শিষ্য ক্রীটো সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার প্রতি বা উপস্থিত জনগণের প্রতি সক্রেটিসের কোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ আছে কি?

সক্রেটিস উত্তর করিলেন, "তেমন কিছু নাই। কিন্তু তোমরা যদি আপনার স্বরূপ (আত্মানং বিদ্ধি—Know thy self: Nosce Teip sum) জানিতে যত্নশীল হও, তবে আমার সমক্ষে কোনরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইয়াও তোমরা আমার পক্ষে, আমার পরিবারের পক্ষে ও তোমাদের পক্ষেও গ্রহণীয় সকল কাজই সর্বদা করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তোমরা 'আপনার স্বরূপ' জানিতে অযত্নশীল হও এবং অদ্য পর্যন্ত সতত তোমাদের আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া আসিয়াছি সেইভাবে জীবন পরিচালিত করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে তোমরা আমার নিকট শত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেও কিছুই করিবে না।"

ক্রীটো উত্তর করিলেন, "আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমরা আচরণ করিব। আপনার দেহত্যাগের পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করিব?"

সক্রেটিস বলিলেন, "যদি আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারো, আর আমি পলাইতে না পারি, তবে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী করিবে।" পরে তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমি ক্রীটোকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। আমি এখনো সে সক্রেটিস্ আছি যে এই আলাপ আলোচনা করিতেছে; কিন্তু সে মনে করিতেছে যে আমি সেই সক্রেটিস্ যে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে আমার শেষকৃত্য কিভাবে করিবে। এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সংগে যে সব দীর্ঘালোচনা করিয়াছি এবং আমি প্রকাশ করিয়াছি—বিষপানের পর আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকিব না, পরন্তু বিদেহী সুধীজন-অধ্যুষিত এক সুখময় রাজ্যে চলিয়া যাইব—এইসব ক্রীটোকে বলা বৃথা হইয়াছে। তোমরা একত্রে

আমার হইয়া ক্রীটোকে সান্ত্বনা দাও। তোমরা বুঝিয়া লও যে—আমার মৃত্যু হইলে আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকিব না, সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যলোকে চলিয়া যাইব। ক্রীটো যেন আমার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে। আমার দেহকে দগ্ধীভূত বা ভূপ্রোথিত দেখিয়া তাহার যেন এরূপ ভ্রান্তি না হয় যে সক্রেটিসকে এরূপ করা হইয়াছে।"

অতঃপর সক্রেটিস্ পুনরায় তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ক্রীটের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রিয় ক্রীটো, আমরা ঠিকমত কথা বলিতে না পারিলে আমরা যে কেবল অন্যায় বলিলাম—তাহা নহে, তদ্দ্বারা আমাদের আত্মাকে কলুষিত করা হয়। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলিতেছি যে আমার দেহকে সমাহিত করিবে এবং তাহা এমন ভাবে করিবে যেন তাহা তোমাদের মনঃপূত ও প্রীতিপ্রদ হয়।"

সময় দ্রুত অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। সক্রেটিস্ স্নানের জন্য গৃহান্তরে গেলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার উপদেশাবলীর সমালোচনা করিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন শীঘ্রই তাঁহারা পিতৃহীন হইবেন। স্নানান্তে সক্রেটিসের স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাদিগকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। সূর্যদেব আস্তে আস্তে অস্তাচলে চলিয়া যাইতেছেন। মৃত্যুদণ্ড-বিধানকারী ঘাতক সক্রেটিসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যাহারা এখানে আসে তাহারা সকলেই আমার উপর ক্রোধের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু আমি যে অনুগত ভৃত্যমাত্র তাহা কেহ বুঝে না। আপনাকে কিন্তু তদ্রূপ দেখিতেছি না। আপনি সৌম্য শান্ত। এখন আমি বিদায়। আপনি বিষপান করিয়া ইহার প্রতিক্রিয়া সহ্য করুন।" এই বলিয়া ঘাতক অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সক্রেটিস্ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার শেষ বিদায় গ্রহণ কর।" তদনন্তর তাহার প্রশংসা করিয়া প্রিয়তম শিষ্য ক্রীটোকে বিষপাত্র আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। ক্রীটো বলিলেন, "সূর্যদেবকে পর্বতোপরি দেখা যাইতেছে, এখনো অস্তমিত হন নাই। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যাহারা মৃত্যুদণ্ডে আদিষ্ট হইয়াও গভীর রাত্রি পর্যন্ত পানভোজনে কাটাইয়া তৎপরে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ? সুতরাং ত্বরায় প্রয়োজন কি ?—সময় অনেক আছে।"

তদুত্তরে সক্রেটিস্ বলিলেন," ক্রীটো, ঐ সব ব্যক্তি তাহাদের বিবেচনানুযায়ী সংগত কাজ করিয়াছে কিন্তু আমার বিবেকানুযায়ী আমি আমার কর্তব্য করিব। আমার মনে হয় না বিলম্বে বিষপান করিলে আমার কিছু লাভ হইবে, পক্ষান্তরে হাস্যাস্পদই হইব। লোকে বলিবে, আমার ইহ জগতে আরো বাঁচিবার আশা রহিয়াছে। অতএব ক্রীটো, ত্বরা করো, বিষপাত্র নিয়া আস।"

কিয়ৎক্ষণ পরে একটি লোক বিষপাত্র লইয়া সক্রেটিস্-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সক্রেটিস্ তাহাকে বিষপানের প্রণালী জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলিল, "বিষপানের পর আপনি হাঁটিতে থাকিবেন এবং যখন দেখিবেন আর পা চলিতেছে না, তখন শুইয়া পড়িবেন।" তৎপরে সে বিষপাত্রটী সক্রেটিসের হস্তে অর্পণ করিল। সক্রেটিস্ আনন্দসহকারে অকম্পিত হস্তে বিষপাত্রটী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে বা অঙ্গ-প্রত্যংগে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হইল না। পক্ষান্তরে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী জানিতে ইচ্ছা করিলেন যে বিষপানের পূর্বে ইহা কোনো দেবতাকে উৎসর্গ

করা উচিত কি না। লোকটী এ বিষয়ে কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "যে পরিমাণ বিষ কার্যকরী হইতে পারে তৎপরিমাণই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি।"

সক্রেটিস্ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, দেবতাদের সমীপে এরূপ প্রার্থনা করা উচিত হইবে যেন আমার ইহলোক হইতে লোকান্তরের যাত্রাটি সুখপ্রদ হয়।" এই বলিয়াই সক্রেটিস্ অতি আগ্রহে বিষপান-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। এ যাবৎ ভক্তমণ্ডলী অশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন তাঁহাদের প্রিয় প্রভু হলাহল পান করিতেছেন, আর পাত্রটী নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে সক্রেটিস্ বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? এই মর্মান্তিক বিলাপ না হওয়ার জন্যই আমি স্ত্রীলোকদিগকে ইতঃপূর্বে বিদায় করিয়া দিয়াছি। কারণ, আমি জানি অনুকূল চিহ্নবিশিষ্ট অবস্থায় মৃত্যুই কাম্য। অতএব তোমরা শান্ত হও এবং ধৈর্য অবলম্বন কর।"

—শান্ত নিস্তব্ধ! পদযুগল আর চলিল না! সক্রেটিস্ আকাশপানে চাহিয়া শুইয়া পড়িলেন। ক্রমে শরীর শীতল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। হৃৎপিণ্ডে পর্যন্ত বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া সক্রেটিস্ শেষ বাণী উচ্চারণ করিলেন—

"ক্রীটো, এস্‌কিলপায়াস্ দেবতার নিকট আমার একটি মোরগ মানৎ আছে। তুমি আমার হইয়া এ মানৎটী দিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিও।"

ক্রীটো উত্তর দিলেন, "প্রভো, ইহা হইবেই, আর কোন নির্দেশ আছে কি?" ইহার কোন উত্তর আর পাওয়া গেলো না। দেহের আবরণটী অপসারিত করিলে দেখা গেলো চক্ষু স্থির!

"এসো দেব বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে"

শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর, বি-এ

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, পথভ্রান্ত রণক্লান্ত সব।
বিশ্বব্যাপী চলিয়াছে সর্বগ্রাসী মৃত্যুর তাণ্ডব।
অন্নবস্ত্র-অনটন অশান্তিতে নিপীড়িত প্রাণ
কেঁদে মরে জনগণ নাহি জানি পথের সন্ধান।
অহিংসার বাণী নিয়ে ক্লান্ত বিশ্বে শান্তি বিতরিতে
এসো দেব, এসো পুনঃ বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তি-স্থান—১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ৵১০ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকা খানিতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজামন্ত্র, ধ্যান, স্তব ও কথা সন্নিবেশিত আছে। ভক্তিপ্রবণ নরনারী ইহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। পুস্তিকাখানিকে আপাততঃ পাঁচালিপর্যায়ের বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ইহার ভাবোদ্দীপক কথামাধুর্যে মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—পণ্ডিত ৺রমানাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত। ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ২০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹।

বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চণ্ডী-পাঠের আবশ্যকতা, পাঠের বিবিধ রীতি, চণ্ডীর মন্ত্রসংখ্যানির্ণয় ও চণ্ডীর চরিত্রত্রয়ের সম্পদ্‌বিশ্লেষণ অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একটি কথা—শ্লোকগুলির অন্বয়যুক্ত বঙ্গানুবাদ থাকিলে ভাল হইত। অবশ্য অন্বয় না থাকিলে সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকদের অসুবিধা হয় না। পুস্তক খানিতে কয়েকখানি চিত্র স্থান পাইয়াছে। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব-সুবোধিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৪-এ সাহানগর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅজিতকুমার জ্যোতিঃশেখর কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৮, মূল্য ১৷৹।

আলোচ্য বইখানি লেখকের 'দীর্ঘকালার্জিত বহুসাধনলব্ধ অমৃতময় ফলের অন্যতম।' গ্রন্থকর্তার ব্যাখ্যানশৈলী নূতন নহে, ইহা 'সাধন-সমর' নামক গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার ব্যাখ্যা সরস ও বেদান্তসম্মত। সাধন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। ব্যাখ্যা আগাগোড়া আধ্যাত্মিক। সুরথ অর্থ জীব, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রই মেধস্, সমাধি মাতৃমিলনের দ্বার, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা চণ্ডীর ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করা কঠিন। গীতা, রামায়ণ, মহাভারতাদিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাস-বিরোধী হইলেও সাধকমাত্রেরই নিকট ইহার চমৎকারিত্ব রহিয়াছে। তত্ত্ব ও ইতিহাসের সীমা নির্ধারণ করিবে কে? 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' গ্রন্থখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইলাম।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম-এ

ভাগবতী কথা—শ্রীদিলীপকুমার রায় সম্পাদিত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি, শ্রীরঘুনন্দন দাস কর্তৃক প্রকাশিত। ২৬৪ পৃষ্ঠা, বোর্ডে বাঁধাই, মূল্য ৫৲ টাকা।

গ্রন্থকারের ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আছে। কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, জীবনী, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় সকল কলাবিদ্যায়ই গ্রন্থকারের বহুমুখী প্রতিভার দান আছে। তন্মধ্যে 'ভাগবতী কথা' ভক্তিমূলক একখানি উপাদেয় কাব্য। ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষ বিশেষ অংশের নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীতে কবিতায় অনুবাদ করিয়া ভক্তসমাজে ভক্তিরস পরিবেশন

করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভাগবত ভাবের এই চয়নগুলি ভক্তগণের বিশেষ আদরণীয় হইবে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমি চয়ন করেছি শুধু সেই সব ভাব ও কাহিনী যাতে আমার মন বেশী করে সাড়া দিয়েছে। আমার নিজের মনকে আমি শুধু আধুনিক শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু মনের প্রতিনিধি হিসেবেই ধরেছি। তাই ভরসা হয় যে ভাগবতী ভাব-সমুদ্রের যে-সব তরঙ্গ-দোলায় আমার মন দুলে উঠেছে তাতে সব না হোক অনেক শ্রদ্ধালু মনই উঠবে দুলে।" আমাদেরও বিশ্বাস বইখানা পাঠ করিয়া অনেক শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু মন দুলিয়া উঠিবে। আমরা রসিক ভক্তগণকে এই অনুপম গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উত্তম।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

সুতোর জন্মকথা—স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ প্রণীত। শ্রীশৈলেশকুমার বসু কর্তৃক বিবেকানন্দ শিল্পী সংঘ, ঝাঁটিপাহাড়ী (বাঁকুড়া) হতে প্রকাশিত। ৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

এই সুলিখিত বইখানিতে লেখক অতি সরল ভাষায় সুতোর জন্ম হতে এর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পশমী সুতো কাটার আদিম পদ্ধতি হ'তে উন্নত ধরনের চরকায় সুতো কাটার কৌশল এতে আলোচিত হয়েছে। সুতোর কাজকে ব্যাপক ভাবে কুটির শিল্পে পরিণত করা লেখকের আদর্শ। এই মহান্ আদর্শ কার্যে পরিণত হলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় অনেকে চরকায় সুতো কাটা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এতে পরিশ্রমের অনুপাতে আয় না হওয়ায় অধিকাংশ লোকই এ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন, "গ্রামের লোকেরা চরকার সাহায্যে কেবল সোয়েটার বোনবার সুতো তৈরী করে, দিনে এক টাকা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি তকলিতেও যে একজনে দিনে ছ আনা থেকে দশ আনা রোজগার করতে পারে, এ বৎসর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের সময় তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।" কুটিরশিল্পে গ্রন্থকার কেবল আদর্শবাদী নন, পরন্তু তিনি বহু বৎসর যাবৎ কার্যতঃ এই সাধনা করছেন। কাজেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের দেশের যে সব দরিদ্র গৃহস্থ কাজের অভাবে বসে থেকে তাদের দৈন্য-দুঃখ আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং যে সব ছেলে-মেয়ে অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, এই বই খানির সাহায্যে তাদের মধ্যে যদি পশমী সুতো কাটা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়, তা হলে তারা অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এজন্য আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। এর ছাপা ও কাগজ উত্তম। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অংকিত ছবি বইখানির প্রচ্ছদ-পটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

স্বামী মুক্তাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভ হওয়ায় তাঁহার স্থলে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২১শে ফাল্গুন আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ দীর্ঘকাল আমাশয় রোগে ভুগিয়া ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাদেবানন্দজী মতি মহারাজ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে পরিচিত। তিনি ১৯০৯ সনে গোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২০ সনে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।' মতি মহারাজ কয়েক বৎসর ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেবানন্দজীর কর্মশক্তি অসাধারণ ছিল। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

নয়াদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের সম্বর্ধনা—রামকৃষ্ণ মিশনের নয়াদিল্লী শাখা ও কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার-এর সম্মিলিত উদ্যোগে গত ১৭ই চৈত্র অপরাহ্ণে নয়া-দিল্লীস্থ মিশন-ভবনে এশিয়া মহাসম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দিল্লী মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গেশানন্দজী ওজস্বিনী ভাষায় সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া প্রতিনিধিগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আধ্যাত্মিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের তরফ হইতে ডাঃ কালিদাস নাগ ১৮৯৩ সালের চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে সমন্বয় প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন যে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই আন্দোলন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে ধর্ম ও জনসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সম্বর্ধনার উত্তরে বিখ্যাত দার্শনিক ও ইহুদী প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ হিউগো বার্জম্যান বলেন যে, রোমাঁ রোলাঁর রচনাবলীর মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কতকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীতে আসিয়াই সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, মিশনের বিশ্বজনসেবা কিরূপ গভীর ও ব্যাপক। রুশ একাডেমীর সদস্য ও রামায়ণ-অনুবাদক জর্জিয়ার অধ্যাপক জি এস আথুলেদিয়ানী ভারতকে সকল ধর্মের লীলাভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন যে সোভিয়েট রুশিয়া সকল ধর্মমতের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন করে।

নিগ্রো শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট নেলসন এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত অধ্যাপক এডওয়ার্ডস্ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিশনের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতের ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ইউনিটের নেতা অধ্যাপক হোরেস আলেকজাণ্ডার বলেন যে, চীন ও ভারতের আধ্যাত্মিক গুরুদের প্রভাব দৃষ্টে হিন্দুস্থানে অবস্থানকালে তিনি একজন হিন্দু এবং চীনে অবস্থানকালে একজন চীনা বলিয়া নিজকে মনে করেন।

আর্মেনিয়া, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও চীনের প্রতিনিধিগণও সম্বর্ধনার উত্তরে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণের গভীর আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব দেখা গিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—গত ১১ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্যন্ত আট দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে পূজাদি ও মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। দ্বিতীয় দিন বিকালে স্বামী হংসানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বহু নরনারীর আনন্দ বর্ধন করেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হয় ও রাত্রে শানবান্দা গ্রামে ছায়াচিত্র যোগে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিক্ষার সার্বজনীনতা ও উদারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। চতুর্থ দিন বিকালে মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন হয় ও সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র যোগে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর বর্তমান যুগোপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় রাজগ্রাম দুর্গামণ্ডপে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচিত হয়। ষষ্ঠ দিন বিকালে স্থানীয় নূতন বাজারে জেলা জজ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক ধর্ম-সভায় স্বামী হংসানন্দজী, প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত শিব চন্দ্র দত্ত ও শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মনোজ্ঞ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সপ্তম দিন যাত্রাভিনয় হয় ও অষ্টম দিন অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে স্বামী হংসানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন হইলে আনন্দোৎসব শেষ হয়।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে দুই দিন ধর্মসম্মেলনে খৃষ্টধর্ম, মুসলমানধর্ম, বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় লণ্ডন মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী খৃষ্টধর্ম, হাজী মৌলবী মৌলাবক্স ইসলামধর্ম, শ্রীযুক্ত নীলমণিদাস মোহান্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামী বোধাত্মানন্দজী, স্বামী সৌম্যানন্দজী ও সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভার পূর্বে স্বামী বোধাত্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

২রা চৈত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায়, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দজী, স্বামী সৌম্যানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী ও সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। চণ্ডীর গান, দ্বিতীয় দিন সারা-রাত্রি সেখ গুমানি দেওয়ানের কবিগান এবং তৃতীয় দিন ষোড়শোপচারে পূজাদি, খাগড়া কনসার্ট পার্টির যন্ত্র-সঙ্গীত, নহবত-বাদ্য প্রভৃতি সহযোগে সমস্ত দিন আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ১৬ই চৈত্র সারগাছি আশ্রমে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতি-পূজা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় এক হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

জামশেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটি— এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা চৈত্র হইতে এক সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে জন-সভা, ছাত্র ও মহিলাদের জন্য কয়েকটি সভা, স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীদের ভিতর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ এবং সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী, স্বামী অসঙ্গানন্দজী, স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শহর হইতে ১৬ মাইল দূরে হলুদপুকুর গ্রামে গত ৯ই চৈত্র উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে আহূত জনসভায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী, শ্রীযুক্ত বিমলা কান্ত মজুমদার, এম-এ, বি-টি এবং শ্রীযুক্ত অনন্তলাল পাত্র, বি-এ মহোদয়গণ মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে বহু নরনারী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এখানে মধ্যাহ্নে প্রায় ছয় শত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করিলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ১লা চৈত্র হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী সমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন স্থানীয় বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরে ডাঃ বিজয় কৃষ্ণ সরকার, এম-বি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্ম-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ভূতেশানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে পূজাদি হয় এবং জেলার বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী সমস্ত দিবস ব্যাপী মাইক্রোফোন যোগে সঙ্গীত, পাঠ, আবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন হাজার ভক্ত ও নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। সন্ধ্যায় স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্য ভূষণ সেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে উৎসব-মণ্ডপে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে স্বামী ভূতেশানন্দজী ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা দেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম— গত ২৯ শে ফাল্গুন হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব উপলক্ষে ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা, নানা প্রকার ক্রীড়াপ্রদর্শন, পুরস্কারবিতরণ, বিশিষ্ট গায়কদের যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীত, সভা, বেলুড় মঠাগত স্বামী অজয়ানন্দজী ও শ্রীযুক্ত মাধুর্যময় মিত্রের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। রবিবার তিন হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন এবং কাটিহার মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভবানন্দজী ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী অজয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উত্তর-বঙ্গের প্রচারক মৌলবী এজার আহাম্মদ পবিত্র কোরানের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইস্‌লাম ধর্মের মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম —গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয় দিন অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আশ্রমে একটি জনসভা হয়। ইহাতে নারায়ণগঞ্জ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র দে

ও সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়া মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। পরে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দজী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। স্বামী সুপর্ণানন্দজী তাঁহার সুললিত কণ্ঠে ভজন গান দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। তৃতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি অন্তে প্রায় দশ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ২৪শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব উপলক্ষে ভজন, পূজা, আবৃত্তি, ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রে বক্তৃতা ও ছেলেদের "যুগের যাত্রী" নাটক অভিনীত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে পরদিন পূর্বাহ্ণে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা এবং অপরাহ্ণে স্বামী শর্বানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বার্ণপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী ও আসানসোল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র বসু মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। পরে ছেলেরা নানারকম ব্যায়াম কৌশল দেখায়।

২৬শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাভঙ্গের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা দশম শ্রেণীর শ্রীমান কান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত "যুগবাণী" অভিনীত হয়।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন কীর্তনাদিসহ একটি শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে। পরদিন প্রাতে ভজন, পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগাদি হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান—গত ১১ই ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, একশত আট প্রকার রাজভোগ, গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ, প্রসাদবিতরণ, সারদেশ্বরী কালী-কীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে বৈদিক আবৃত্তি হয় এবং দ্বিপ্রহরে পূজার পর প্রায় পাঁচ শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে এক সভায় স্বামী মৈথিল্যানন্দজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচিত হয়।

এই উপলক্ষে গত ১৮ই ফাল্গুন মাননীয় বিচার-পতি চ মিন্ এর সভাপতিত্বে এক জনসভার অধি-বেশন হয়। ইহাতে উ বা উইন্, মিঃ সি এ সুর্মা, মিঃ এইচ্ সুব্রহ্মণ্যম্, রায় বাহাদুর পি কে বসু ও স্বামী মৈথিল্যানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সর্বধর্মসমন্বয় এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপসংহারে রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির সভাপতি স্যার মিয়া বু একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা-সমিতি—গত ১৫ই ফাল্গুন হইতে পাঁচ দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি মহিলা-সভা এবং পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হয়। ১৭ই ফাল্গুন একটি জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে স্বামী চণ্ডিকানন্দজী ও শ্রীযুক্ত গুণমণি রায় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরদিন পূজাদি অন্তে প্রায় আট হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। শেষ দিন পদ-কীর্তন হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১২ই চৈত্র হইতে পাঁচ দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী এখানে উপস্থিত থাকিয়া 'সনাতন ধর্ম ও তাহার বৈশিষ্ট্য', 'ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান', 'কর্মজীবনে বেদান্ত' এবং 'নবীন ভারত ও স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক ৪টি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

১৪ই চৈত্র সাধারণ সভায় আশ্রমের সম্পাদক মহাশয় আশ্রমের ১৯৪৬ সালের কার্য-বিবরণী এবং অনাথালয়ের হিসাব পাঠ করেন। অনাথালয়ে ৬০ জন অনাথ ও দুঃস্থ বালকের খাওয়া-পরা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বাংলা গভর্ণমেণ্ট বহন করিতেছেন।

১৫ই চৈত্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, লীলা-কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ হয়। প্রায় সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমের গত বৎসরের মোট আয় পূর্ববৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল ৩০০৩।৵০ সহ ৩৩৫৭১।৩ এবং মোট ব্যয় ২২৫০৩৸৬। অনাথালয়ে মোট জমা ৯০৮১১৸৩ এবং মোট ব্যয় ৪১০৩৪।৵৩। উদ্বৃত্ত টাকা ছেলেদের বাসগৃহ, চিকিৎসালয়, আসবাব ইত্যাদির জন্য সংরক্ষিত। গৃহনির্মাণ কার্যাদি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে।

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১১ই ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি-দিবসে বিশেষ পূজা, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভায় পণ্ডিত রামচন্দ্র পৌরাণিক প্রমুখ বক্তাগণ হিন্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। গত ১৮ই ফাল্গুন এই উপলক্ষে একটি বিরাট জনসভা আজমীর টাউন হলে আহূত হয়। সেটেলমেণ্ট অফিসার ঠাকুর লালসিংহ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী ব্যোমরূপানন্দজী, আমেদাবাদ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সৎস্বরূপানন্দজী, আজমীর রাজকুমার কলেজের অধ্যাপক জ্বালাদত্ত জোশী প্রভৃতি হিন্দী ও ইংরাজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বার্ণপুর (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বার্ণপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তীর বাসস্থানে বিশেষ পূজা হোম ও নারায়ণ-সেবা ও ভজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গত ২৭শে ও ২৮শে ফাল্গুন গণপরিষদের সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে দুইটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শর্বানন্দজী উভয় সভাতেই বাংলা ও হিন্দীতে মনোজ্ঞ বক্তৃতাপ্রদান করেন।

বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২রা চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজা ও হোমাদি এবং অপরাহ্নে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের

সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজী, স্থানীয় অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর অলৌকিক জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

বেলাড়ি (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১৬ই চৈত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় এক সহস্র ভক্তনরনারী ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সামন্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী অমৃতানন্দজী, শ্রীযুক্ত তারাপদ মাইতি, এম্-এ, বি-টি, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীযুক্ত বনমালী জানা প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নড়াইল (যশোহর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব—এই উপলক্ষে কাশীধাম হইতে আগত দুইজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী কৈবল্যানন্দজী সুবৃহৎ যজ্ঞশালায় স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, গ্রহযাগ, বাস্তুযাগ, রুদ্রযাগ, বিষ্ণুযাগ, সপ্তশতী হোমাদি সম্পন্ন করেন। গণেশপূজা, অধিবাস, তন্ত্রোক্ত গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগাদি অন্তে ১০ই চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠাদি হয়। এই উৎসবে প্রায় ছয় হাজার লোক জাতিধর্মনির্বিশেষে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনেক সংকীর্তন দল আসিয়া হরিনাম গুণগানে সুবৃহৎ আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তোলে। রাত্রিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হইলে উৎসব শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী এই উৎসব উপলক্ষে নড়াইল আশ্রমে, কলেজে ও মহকুমার অন্যান্য অনেক গ্রামে যাইয়া ছায়াচিত্রসহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনী ও উপদেশ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

নওপাড়ায় (ময়মনসিংহ) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র এই গ্রামে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পূজাদি অন্তে প্রায় ১৫০০ লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন বৈকালে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ময়মনসিংহ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দজী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্বামীজীর জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দুই দিনেই রাত্রে স্থানীয় অপেরা পার্টির উদ্যোগে শিক্ষামূলক যাত্রা অভিনীত হয়।

ভ্রম-সংশোধন—গত চৈত্র-সংখ্যা উদ্বোধনের ১৪৭ পৃষ্ঠায় ৩ নং পাদটিকায় মুদ্রিত "কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের" স্থলে "কাশী বিদ্যাপীঠের" হইবে।

গত পৌষ-সংখ্যার উদ্বোধনের ৬৫৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্রকে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য বলা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী (কৃষ্ণ নয়) মিত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য।

—উঃ সঃ
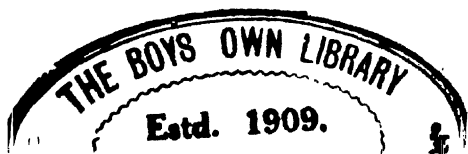
আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন

সম্পাদক

গত ২৩শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে'র অধিবেশন হইয়াছে। ইহাতে এশিয়া মহাদেশের ছোট বড় বাইশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপন এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বহু কাল যাবৎ পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রাচ্য দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদের অভিযান চালাইতেছে। এই বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে এশিয়ার সকল দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন এই সম্মেলনের লক্ষ্য। সকল ধর্মের প্রসূতি এবং ধন-জনে অত্যন্ত সম্পদশালিনী হইয়াও এশিয়া এত দিন তাহার আত্মশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। বহুকাল যাবৎ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার ভোগ করিয়া গত মহাযুদ্ধের অংকুশ-আঘাতে এশিয়ার সকল দেশই সচেতন হইয়া তাহাদের স্ব স্ব জন্মগত জাতীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে ভারত ব্রহ্ম চীন জাপান ইন্দোনেশিয়া ভিয়েৎনাম প্যালেষ্টাইন মিশর প্রভৃতি দেশে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে। পাশ্চাত্য শাসন ও শোষণে হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষ দীর্ঘকালের অক্লান্ত সাধনার ফলে এখন স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত। ভারতের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপর এশিয়ার সকল দেশের স্বাধীনতা এবং উহার সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন নির্ভর করে। এই জন্য ভারতের স্বাধীনতা এশিয়ার সকল দেশেরই একান্ত কাম্য। দিল্লীর 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে' বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি-গণের অভিভাষণের ভিতর দিয়া ইহার সত্যতা পরিস্ফুট। এই সকল কারণে এই সম্মেলন সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় সূচনা করিয়াছে এবং এশিয়ার সকল জাতির সম্মুখে এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছে। এরূপ সম্মেলন এশিয়ায় আর কখনও হয় নাই—এরূপ ভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ আর কখনও সম্মিলিত হন নাই। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে এই সম্মেলন যে বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়মূলে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সমন্বয়ের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যথার্থ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই সমন্বয় অপরিহার্য। স্বামীজী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মক্ষেত্রে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য এই

সমন্বয়ের মাহাত্ম্য যেমন উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন, উভয় জাতির গুণগুলির আদান-প্রদান মূলে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও তেমন উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ খ্যাতনামা জাপানী লেখক কাউন্ট ওকাকুরা তৎপ্রণীত "The Ideal of the East" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Asia is one."—'এশিয়া এক।' প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন এই মনীষীর জীবনের আদর্শ ছিল। চীনদেশে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন প্রাচ্য দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের উপায়রূপে তাহাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বর্তমান চীনের সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চিয়াঙ্গ-কাই-সেক এই উদ্দেশ্যে অক্লান্ত ভাবে কার্য করিতেছেন। নব্য তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতাতুর্ক দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা তাহাদের ঐক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এইজন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক ভিত্তিতে এশিয়ার দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম উপায়রূপে এশিয়ার সকল জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বারংবার বলিয়াছেন যে, এশিয়ার সকল জাতি স্বাধীনতা লাভ না করিলে পৃথিবীতে কখনও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাঁহার মতে প্রাচ্যের সকল জাতির মধ্যে ঐক্যস্থাপনই তাহাদের স্বাধীনতা অর্জনের উপায়। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাচ্যের ধর্মপ্রবর্তকগণের উপদিষ্ট অহিংসা সত্য ও প্রেমের বাণী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন। জন-নায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন' আহ্বান করিয়া এই সকল মনীষীর মহান্ ভাবরাশিকে একটি বাস্তব রূপ দিয়াছেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্মেলনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য এশিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধিগণের সমবায়ে 'আন্তঃ এশিয়া সংঘ' নামক একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। আগামী অধিবেশন চীনদেশে আহূত হইয়াছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত "ভারত-তীর্থ" কবিতায় নিরুপম ছন্দে লিখিয়াছেন:

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।

* * *

কেহ নাহি জানে—কা'র আহ্বানে কত
মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে, সমুদ্রে
হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক, হূনদল, পাঠান, মোগল—এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে—
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্বত যা'রা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,—
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিত তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যা'রা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই মহান্ অভিপ্রায় দিল্লীর ‘আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে’ যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ‘এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে’ বহু ধর্ম সংস্কৃতি ও জাতি সম্মিলিত হইয়াছে। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত বহু জাতি তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিয়া ইহার বিরাট অংকে স্থানলাভ করিয়াছে। এই জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষকে “Pivot of pan-Asian Unity-in-Diversity”—‘সমগ্র এশিয়ার বহুত্বে একত্বের আশ্রয়কেন্দ্র’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হিন্দুদর্শন বহুর অন্তরালে এককে এবং একের অন্তরালে বহুকে দেখিতে শিক্ষা দেয়। এই দর্শনমতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্বের অধিষ্ঠান-সত্তা। ছান্দোগ্যো-পনিষৎ ঘোষণা করে, “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”—‘সকলই ব্রহ্ম।’ হিন্দুদর্শনের শাখা বৌদ্ধদর্শনও অপ্রাকৃত আদিবুদ্ধ বা ধর্মকায়বুদ্ধকে চেতন ও অচেতন জগতের আশ্রয় বলিয়া প্রচার করে। খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে চৈনিক ঋষি তাও আবির্ভূত হইয়া এই একই সত্য ভিন্ন আকারে প্রচার করিয়াছেন। মুসলমানদের ‘হদীসে কুদসী’ নামক প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে, “আমি (ভগবান) একটি লুক্কায়িত ধন ছিলাম এবং আমি ইচ্ছা করিলাম যে আমি প্রকাশিত হই, তাই প্রকাশিত হইবার জন্য এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলাম।” ইহা উপনিষদের “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি”, ‘বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি বহু হইলেন’ এই বাক্যের হুবহু প্রতিধ্বনি। মুসলমান সুফীগণও এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের আশ্রয়রূপে বাক্যমনাতীত এক পরমসত্তার মহত্ত্ব কীর্তন করেন। খৃষ্টধর্মোক্ত স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জগতের সম্পর্ক একত্বে বহুত্বমূলক। এইরূপে এশিয়ার বিভিন্ন ধর্ম একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্বকে আশ্রয় করিয়া এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য সমন্বিত। ধর্মভূমি ভারতবর্ষ প্রকৃতই সকল ধর্ম-সমন্বয়ের পীঠস্থান। এশিয়ার মধ্যে আর কোন দেশে নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে এরূপ চমৎকার সমন্বয় দেখা যায় না। বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও ভারতবর্ষে যেমন ভাবে সমন্বিত হইয়াছে এরূপ আর পৃথিবীর কোন দেশে হয় নাই। চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মনীষী লিয়াং চি চাও বলিয়াছেন, “India taught us the oneness of all beings and thing
‘ভারতবর্ষ আমাদিগকে সকল জীব ও পদার্থের একত্ব শিক্ষা দিয়াছে।’ ভারতীয় ধর্মের সর্বতো-মুখী ঔদার্য [illegible] [illegible]কল ধর্মভাব গ্রহণ-সামর্থ্যের জন্য এইরূপ সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমন্বয়-ভাবের প্রেরণায় হিন্দুগণের [illegible] ও শিখধর্ম পৃথক হইয়াও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভু[illegible] চীন জাপান কোরিয়া মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া সুদূর প্রাচ্য (Far Eastern Areas) ইন্দোচীন তিব্বত শ্যাম ব্রহ্ম সিংহল প্রভৃতি দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলিয়া হিন্দুগণ ভাবে এবং বৌদ্ধধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধকে অবতাররূপে পূজা করে এবং প্রাচীন পারস্যের পারসিক ধর্ম, তিব্বতের বনধর্ম, চীনের তাও ও কংফুসে ধর্ম, জাপানের শিন্তোধর্ম, পেলেষ্টাইনের ইহুদী ধর্ম, নেজারথের খৃষ্টধর্ম এবং আরবের ইস্‌লামধর্মের প্রতি যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখায়। হিন্দুদের এইরূপ সকল ধর্মের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন পরধর্মসহিষ্ণুতার মনোরম আবরণে আবৃত নিষ্ক্রিয় ভাব মাত্র নয়। ইহা ‘যে যে ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে কৃপা করি’—এই গীতোক্ত ভগবানের বাণীর অনুসরণ।—ইহা

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী—'যত মত তত পথে'র অনুরূপ আচরণ। ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান এই সর্বধর্মসমন্বয়ের সহায়ক। ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রান্তে অবস্থিত। এই জন্য চারিদিকের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতে আসিয়া এখানে অতি সহজেই সমন্বিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বর্তমানে এশিয়ায় প্রধানতঃ পাঁচটি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য: ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি, পূর্বএশিয়া তিব্বত ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি (চীনের তাও ও কংফুসে ধর্ম এবং জাপানের শিন্তোধর্ম ও তিব্বতের বনধর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত), পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ মালয় ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতিতে ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতি, পেলেষ্টাইনে ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্টধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য চলিতেছে। এই পাঁচটি ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতে পাশাপাশি বিদ্যমান। এইজন্য ভারতবর্ষ সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মেলনক্ষেত্ররূপে সম্মানিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের নৈকট্য সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কুশানরাজগণের সময় হইতে বৌদ্ধ ভারতের সঙ্গে চীনের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চৈনিক পণ্ডিত লিয়াঙ্গ চি চাওর মতে ৬৭-৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩৭ জন ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে যান এবং ২৬৫-৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৭ জন চৈনিক বিদ্যার্থী ভারতে আগমন করেন। ৫২২ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্মপ্লাবিত পেশোয়ার হইতে জিনগুপ্ত ও কাথিয়াওয়ার হইতে ধর্মগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে চীনদেশে যান। এই ভাবে ভারতীয় ধর্ম প্রচারকদের অক্লান্ত চেষ্টায় কালক্রমে সমগ্র চীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে যাইয়া তথাকার প্রচলিত তাও ও কংফুসে ধর্মের সামঞ্জস্যে এক অভিনব বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়। চীনের তাও এবং কংফুসে দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সাদৃশ্য বিদ্যমান। চৈনিক সাধারণতন্ত্রের বর্তমান নায়ক চিয়াঙ্গ-কাইসেক বলেন, "Our two countries, so far as religion and philosophy are concerned, have a great deal in common."—'ধর্ম ও দর্শনে আমাদের দুই দেশে অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে।' চীন হইতে মাঞ্চুরিয়া মঙ্গোলিয়া কোরিয়া সুদূরপ্রাচ্য এবং জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম জাপানে যাইয়া তথাকার প্রচলিত শিন্তোধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক অভিনব বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়। মনীষী ওকাকুরা লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে শিন্তোদর্শন মিশিয়া গিয়াছে।" খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত-সম্রাট স্রোং-চন-গম্বো চীনের ও নেপালের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই বৌদ্ধ রাজকন্যাদ্বয়ের চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করিয়া তথাকার প্রচলিত বনধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনে এক অভিনব তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক তাঁহার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় সিংহলবাসী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। সম্রাট অশোকের প্রেরিত সোনা ও উত্তরা নামক দুই জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রচারের ফলে সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম মালয় শ্যাম জাভা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপে বিস্তার লাভ করে। সকল দেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মাত্রেরই নিকট ভারতবর্ষ শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের জন্মভূমি ও সাধনক্ষেত্র বলিয়া অতি পবিত্র তীর্থরূপে সম্মানিত। বৌদ্ধ-

ধর্মাবলম্বিগণ বুদ্ধগয়া সারনাথ রাজগীর লুম্বিনী কুশীনগর নালন্দা অজন্তা ইলোরা সাঁচি প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করেন। এই ভাবে এশিয়ার বৌদ্ধ দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবে সম্বন্ধান্বিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের সময় হইতে ভারতবর্ষের সহিত জাভা বা যবদ্বীপ (ইন্দোনেশিয়া), কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (আনাম বা ভিয়েৎনাম), শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), সুমাত্রা, বলী, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে সুবর্ণ দ্বীপের (ইন্দোনেশিয়ার) উল্লেখ আছে। এই সকল দেশ এক সময়ে হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল এবং ইহার ফলে এই দেশগুলিতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন, জাভা ও চম্পায় ভারতীয় অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ফলক পাওয়া গিয়াছে। উভয় স্থানের স্থাপত্যে ভারতের পল্লব ও অমরাবতী আর্টের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। মনীষী সিলভাঁ লেভি বলেন, সুমাত্রা দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বস্থিত পেলেমব্যাং শহরে একটি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অনেকের মতে এই পেলেমব্যাংকে রাজধানী করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এখানকার দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন। অদ্যাবধি এই দ্বীপগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের বহু নিদর্শন আছে। ঐতিহাসিকগণ সন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, জাভা বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দ্বীপগুলির বহু স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। জাভা ও বলী দ্বীপের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অনেক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই দ্বীপগুলির অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা ও পার্বণে মধ্যযুগের হিন্দুপ্রভাব দেদীপ্যমান। পরিব্রাজক স্বামী সত্যানন্দ শ্যামদেশে যাইয়া তথাকার ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি শ্যাম-গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তথাকার পুরাতত্ত্ব গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিজয়-নগরের হিন্দুরাজগণ শ্যামে হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শ্যামের ভাষায় শত করা সত্তরটি শব্দ সংস্কৃত ও পালি হইতে গৃহীত। জাভা সুমাত্রা বলী প্রভৃতি দ্বীপের ভাষায়ও অদ্যাবধি সংস্কৃত ও পালির প্রভাব বিদ্যমান। এই সকল বিষয়দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে ভারতের সহিত এই দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এশিয়ার পশ্চিমস্থিত আফগানিস্থান তুর্কমেনিয়া আজারবাইজান উজবেকীস্তান তাজিকিস্তান কাজাখস্তান কিরঘিজিয়া পারস্য আরব পেলেষ্টাইন তুরস্ক মিশর প্রভৃতির সহিত ভারতের সম্বন্ধ বিদ্যমান। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব-প্লাবনের যুগে আফগানিস্থান ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে আফগানিস্থান তুর্কমেনিয়া আজারবাইজান উজবেকীস্তান তাজিকিস্তান কাজাখস্তান কিরঘিজিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমানে আফগানিস্থান ভিন্ন অবশিষ্ট ছয়টি ছোট দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত এক একটি উন্নতিশীল সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুপ্রাচীন পারসিক ধর্মের উদ্ভবক্ষেত্র পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ বিদ্যমান। মোগল-যুগে এই সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। ধর্ম সাহিত্য স্থাপত্য ও চিত্রকলায় পারস্যের সহিত ভারতের সাদৃশ্যও আছে। বহু কাল যাবৎ অনেক পারসিক নানা কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া পুরুষানুক্রমে সদ্ভাবে বাস-

করিতেছে। পারসিক কবিদের কবিতাবলী ভারতের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত। ভারতে মুসলমান আমলে শত শত বৎসর যাবৎ পারসিক রাষ্ট্রভাষা ছিল। এই সময়ে পারস্য হইতে বহু কবি এবং স্থাপত্য ও চিত্র কলাবিদ্ ভারতে আগমন করেন। ভারতীয় মোগল আর্ট পারসিক ও হিন্দু আর্টের সংমিশ্রণ।

ইস্লামধর্মের অভ্যুদয়ক্ষেত্রে আরবের সঙ্গে ভারতবর্ষ নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। আরবের মুসলমানগণ প্রথমতঃ আক্রমণকারী রূপে ভারতে উপস্থিত হইলেও যখন হইতে মুসলমান বাদসাহগণ স্থায়ী ভাবে ভারতে বাস করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতে ভারতের সহিত তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ইস্লামধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বেদান্তধর্ম্মের উদার ভাব ইস্লামকে অনেক প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অন্যান্য দেশের মুসলমান হইতে ভারতের মুসলমান স্বতন্ত্র।" স্বামীজীর এই মতের প্রতিধ্বনিরূপে মিশরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডাঃ তাহা হোসেন কথাপ্রসঙ্গে ইস্লাম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখন লাল রায় চৌধুরীকে বলিয়াছেন, "The Indian Muslims, though proud of Islam, are far away from the Arabian Islam. That is no disparagement of Indian Muslims. But it is natural due to the change of environment and circumstances." 'ভারতীয় মুসলমানেরা ইস্লামের গর্ব করিলেও তাহারা আরবীয় ইস্লাম হইতে বহু দূরে। ইহা ভারতীয় মুসলমানদের নিন্দার বিষয় নয়। পরন্তু ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে স্বাভাবিক।' হিন্দু-ধর্মের প্রভাবেই যে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুফী দীন-ইলাহি ছেতরামী পীরপন্থী পটুয়া বাহাই সত্যপীর দরবেশ আমেদিয়া অইর সইবাবা খোজা হানাফী চিশতিয়া নকশীবন্দিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান ভারতে প্রচলিত ইস্লামধর্ম এই সকল সম্প্রদায়ের সমষ্টি। পক্ষান্তরে আধুনিক ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্মও ইস্লামধর্মদ্বারা সমভাবে প্রভাবান্বিত। মুসলমান-যুগে আবির্ভূত ধর্মাচার্য রামানুজ রামানন্দ কবীর রুহিদাস নানক দাদু সুরদাস গরীবদাস মধ্ব নিম্বার্ক চৈতন্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ-যুগের রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও আধুনিক বহু হিন্দুধর্ম-প্রবর্তকের মতবাদের উপর ইস্লাম-ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রচলিত হিন্দুধর্ম এই সকল ধর্মাচার্যের মতবাদের উপর স্থাপিত। কাজেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে ইস্লামধর্মের প্রভাব আছে। এই ভাবে বর্তমান ভারতের হিন্দু ও ইস্লাম উভয় ধর্মই যে পারস্পরিক আদান-প্রদানসম্ভূত এ সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ নাই। কেবল ধর্মের দিক দিয়া নয়, পরন্তু ভারতের সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সঙ্গীত প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমান গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত হইয়া একই সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে। ভারতের এই সকল সাংস্কৃতিক বিষয়ের কোন্‌টিতে হিন্দু বা মুসলমানের দান কি পরিমাণ, তাহা নির্ণয় করা গভীর গবেষণা-সাপেক্ষ। হিন্দু-মুসলমান উভয় 'কাল্‌চার্' ভারতের মাটির গুণে সমন্বিত হইয়া ভারতীয় 'কাল্‌চারে' পরিণত হইয়াছে। সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সম্মিলিত 'কাল্‌চারে'র মূর্তপ্রতীক। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও কেমন ভাবে একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে,

তিনি নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই আদর্শই ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলিতেছে, ইহার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই; ইহা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, ইসলামধর্মের উদ্ভব-ক্ষেত্র আরবের সঙ্গে ভারতের—বিশেষ করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের জন্মভূমি সাধনক্ষেত্র ও মহাসমাধিস্থান রূপে আরবের মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমানদের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভারতে বহু ইহুদী ও খৃষ্টান আছে। ইহুদীধর্ম-প্রবর্তক ঈশার জন্মভূমি এবং যিশুখৃষ্টের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পেলেষ্টাইনের বেথেলহাম ও জেরুজালেম প্রভৃতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুণ্যতীর্থ। ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলমান ইহুদী ও খৃষ্টানধর্ম এবং তাহাদের তীর্থক্ষেত্রসমূহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত। এইজন্য আরব ও পেলেষ্টাইনের সঙ্গে ভারতবর্ষ অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। এই সকল কারণে ভারতে 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন যথার্থই উপযোগী হইয়াছে।

এশিয়া সকল ধর্মের জন্মভূমি। ধর্ম ও সংস্কৃতি এই মহাদেশে যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এরূপ আর পৃথিবীর কোন মহাদেশে হয় নাই। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আবার ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষ কোন কালেও পৃথিবীর কোন দেশের উপকার ভিন্ন অপকার করে নাই। এই জন্য আন্তঃ এশিয়া ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সম্প্রসারণ করিয়া প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই সক্ষম। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অবদান এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতি এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিশ্বমানবের জীবনকে অনেক বিষয়ে সমৃদ্ধ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহা বহু বিষয়ে মানুষকে পশুস্তরে অবনমিত করিয়াছে। পাশ্চাত্যে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম এই অবনমনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ঠিক ভাবে পরিগৃহীত হয় নাই বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রাচ্যধর্ম ও সংস্কৃতিই এই অবনমনের গতিরোধ করিতে সমর্থ। বর্তমানে এশিয়ার সকল দেশই দীর্ঘকালের নিদ্রাত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। এখন প্রাচ্যের সকল জাতিই প্রাচ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান মূলে স্ব স্ব জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে বদ্ধপরিকর। 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে' সমবেত প্রতিনিধিদের অভিমতের ভিতর দিয়া ইহার সত্যতা পরিস্ফুট। এই সম্মেলনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জাতিপুঞ্জ-সম্মেলনের পার্থক্য সুস্পষ্ট। জাতিপুঞ্জ-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তিমান জাতিসমূহের স্ব স্ব জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার আবরণে কার্যতঃ সংঘবদ্ধ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে বিশ্বে অশান্তি আনয়ন। পক্ষান্তরে 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে'র একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা। উভয়টির কার্যপ্রণালীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়-রূপে 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে'র প্রতিনিধিগণকে প্রাচ্যের ধর্মপ্রবর্তকগণের বাণী বহন করিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই মহাপুরুষগণের বাণীর অনুসরণই যে বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতমাতার স্বাধীনতার বোধন আরম্ভ হইয়াছে। এই শুভ মুহূর্তে প্রাচ্যের ধর্মাচার্যগণের বাণী কার্যে পরিণত করিয়া 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনে'র মহান্ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমরা জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারীকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় আহ্বান করিতেছি—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান
এসো-ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার;
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে,
আজি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে।"

বিবেকানন্দ-স্মরণে

শ্রীচিত্ত দেব

জীবন এগিয়ে যায় লঙ্ঘি' শতাব্দীর সীমারেখা
মনের মুকুরে যবে তব সাথে হয় মোর দেখা।
যুবক সন্ন্যাসী ওগো যুগসমন্বয়কারী বীর
মানুষের ইতিহাসে তোমার আলেখ্য চিরস্থির

অতীতের সুখস্বপ্নে তন্দ্রাময় অচেতন দেশ
যুগজীর্ণ সংস্কারে জড়সত্তা—নাই গতিলেশ
'বর্তমান চলমান—এর বেশি কিবা প্রয়োজন
ভবিষ্যৎ অবাস্তব—কল্পনার ব্যর্থতা পোষণ'
এ নীতি মরমে যারা মহানন্দে দিয়েছিল ঠাঁই
তাদের জীবন বলে—আধমরা জাত বেঁচে নাই।

বেঁধেছিল সাহিত্যের দর্শনের শব্দ অলঙ্কার
নিপুণ হাতেতে কারো তবুওতো ওঠেনি ঝঙ্কার!
স্বগত প্রলাপে কভু হয় কি গো সত্যসম্ভাষণ
তাই ছিল প্রয়োজন—কর্মযোগী—তব আরাধন!

জন্ম লভি নরকুলে মানুষের মাঝে দ্বারে দ্বারে
ভালবাসা ভিক্ষা চেয়ে ফিরেছ ফিরেছ বারে বারে!
বৈদেশিক বৈজাতিক চিন্তা ভাবনার নানা সুর
জাতির যুবকপ্রাণে লাগালো চমক মোহ ঘোর
স্বর্ণ মরীচিকা লক্ষ্যি ছুটে তারা মিথ্যা আত্মভ্রম
অতীত ভবিষ্য আর বর্তমান সকলি নির্মম!
পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ মানুষে মানুষে পরিচয়
যুগসমুদ্রের কোলে তুলিল যে তরঙ্গনিচয়
কে প্রত্যক্ষ করে তাহা—ধরায় সে কোন্ অবতার
গুরু তব পথদ্রষ্টা, প্রাণশিষ্য তুমি ছিলে তাঁর!
হিমালয়শীর্ষ হতে প্রশান্তজলধি তলদেশ
দৃষ্টি তাঁর কোনখানে একেবারে হয়নিকো শেষ

কৌতূহলী সত্যদ্রষ্টা লক্ষ্যি সব উত্থান পতন
মৌনযুগসভামাঝে স্বপ্নে তোমা করেন বরণ।
তাই তুমি স্বপ্নাদিষ্ট, শক্তিপ্রাপ্ত, আত্মশক্তি হতে
প্রেরণার বাণী নিয়ে ঝাঁপ দিলে দুঃসাধ্য সে ব্রতে!

কাঙাল আপন দেশ করুণার পাত্র সবে ভাবে
ধর্ম কর্ম জ্ঞাতি গোত্র অবজ্ঞাত বিদেশীর ভাবে।
বিশ্বের মানবসত্তা উপেক্ষিত তোমার স্বদেশ
সে-সত্যবেদনা হতে জাগে তব বিবেকের রেশ!
তারুণ্যের রুদ্রমূর্তি মহাভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত হলে যবে সভ্যতাগর্বিত সেই দেশে
অন্তরের বাণী তব বাগিন্দ্রিয়ে হল মূর্তিমতী
অধ্যাত্ম প্রচার দ্বারা শুনালে প্রাচ্যের প্রাণারতি।

মানুষেরা বাস করে জন্ম দেয় মহামানবের
এ দেশ ভারতবর্ষে—রঙ্গশালা নহে দানবের।
পাশ্চাত্যের মতো—শক্তিদম্ভ সংস্কারগত
যুগ যুগ কেটে গেল—ধনলিপ্সা হল মজ্জাগত
শোণিত-আঘ্রাণ-সুখ মিটিল না আত্মীয় বিনাশে
বিশ্বসংগ্রামের রোল ওঠে তাই অগ্নির নিঃশ্বাসে!
তাইতো মানুষ আজি বার বার ডাকিছে তোমায়
মানুষের ধর্ম কী তা তব মুখে শুনিবারে চায়!

এসো আজি রুদ্ররূপে নির্ঘোষো আত্মার সত্যবাণী
মানুষেরে ভাই বন্ধু পিতা পুত্র সখা বলে জানি।
'বারেক পেয়েছে দুঃখ—দুঃখ তার এখানেই শেষ
হবে' এই জানি তুমি ভুলে ছিলে হিংসা ঈর্ষা দ্বেষ
ঈশা মুষা যীশু আর মহম্মদ সকলের কাছে
তোমার বাণীর সার নির্ভুল আছেই আছে আছে।

'সুখ অন্যে দিলে তবে সুখ তব মিলিবে হে ভাই
মানুষের এ জগতে দেবতার সেথা শুধু ঠাঁই
পেয়েছি সন্ধান আমি দিতে পারি ঠিকানাটি তাঁর
মুক্ত করো আজ হতে হৃদয়ের রুদ্ধ তব দ্বার !
দরিদ্রের পূজা করো ভগবান বলি তারে মানো
পায়ে ধরে পূজা নয়—আপন পাতেতে ডেকে আনো।
এক সাথে খেতে দাও এক অন্নে উদর পূরাও
তোমার ও তাহার দুই জঠরের যন্ত্রণা জুড়াও।
ভগবান আসিবেন—সত্য সত্য সত্য এই বাণী
তব সাথে বাণী তাঁর বিনিময় হবে হবে জানি।'

বিবেকের হৃদি হতে উঠেছিল এই বীরবাণী
কেঁপেছিল ধরাতল কেঁপেছিল পৃথ্বি অরণ্যানী।

সে কম্পনরেশটুকু বিন্দুমাত্র মানবের প্রাণে
তোমার জনমতিথি জাগাক্ এ উৎসবের গানে।

দিবসের শত কাজে জীবনের শত দ্বন্দ্ব মাঝে
হারিয়ে আপন সত্তা ডুবিয়ো না অস্তাচল সাঁঝে !
শাশ্বত ভাস্বর হয়ে স্মরণের পূর্বাকাশ ভরি
নিমেষবিহীন তুমি ভাসাও জীবন স্বর্ণতরী !
চিন্ময় আত্মার জ্ঞান চিন্তা ঘিরি থাক্ অনিবার
সাধনার ধ্যানমূর্তি—মানুষেরে যা আছে দিবার
অদৃশ্য লোকেতে থাকি দিতে থাকো সত্য সত্তাময়
ওঠাও সন্ন্যাসী গীতি—'উঠো, জাগো—
আর নাই ভয়!'

যে কথা জেনেছি আমি কেবলি জপিয়া তব নাম
অন্তরের মূকভাবে রচি তোমা জানাই প্রণাম।

বেদান্তদর্শনে আছে কি ?

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব আলোচিত হইয়াছে, এইবার বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহাই আলোচ্য; অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে কি বিষয় আছে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। কারণ, গ্রন্থমধ্যে কি আছে তাহা যদি অতিস্থূল ভাবেও জানিতে না পারা যায় তাহা হইলে সেই গ্রন্থপাঠে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই কথাটী জানিতে হইলে বেদান্তদর্শন-গ্রন্থের এবং তাহার রচনাপ্রণালীর কথা কিছু অগ্রে জানা আবশ্যক।

বেদান্তদর্শনগ্রন্থের পরিচয়

এই বেদান্তদর্শনে চারিটী অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। তজ্জন্য সমগ্র গ্রন্থে ১৬টী পাদ এবং প্রত্যেক পাদে কতকগুলি করিয়া অধিকরণ সন্নিবিষ্ট। এই অধিকরণ অর্থ বিচার। এইরূপ অধিকরণ বা বিচার এই গ্রন্থে সর্বশুদ্ধ ১৯১টী আছে। এই অধিকরণগুলি আবার সূত্রদ্বারা রচিত। সেই সূত্র যেমন "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। ইহার অর্থ—অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মবিচার কর্তব্য। ইহাই বেদান্ত-

দর্শনের প্রথম সূত্র। সূত্র অর্থ অতি সংক্ষিপ্ত সার কথায় পূর্ণ বাক্যবিশেষ। এইরূপে এই গ্রন্থে মোট ৫৫৫টী সূত্র আছে। তাহাদের দ্বারাই এই গ্রন্থের ১৯১টী অধিকরণ বা বিচার রচিত হইয়াছে। এজন্য কোথায় একটী সূত্রে একটী অধিকরণ হইয়াছে, আবার কোথায় একাধিক সূত্রে এক একটী অধিকরণ হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থের নাম বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র

বেদান্তদর্শন রচনার কৌশল

গ্রন্থের বিচারগুলি অতি অপূর্ব কৌশলে রচিত হইয়াছে। এই কৌশলটী আয়ত্ত করিতে পারিলে এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। ইহার ফলে এই গ্রন্থের কেহ স্বেচ্ছামত অর্থ করিতে পারিবেন না। এরূপ কৌশল অন্যগ্রন্থে প্রায় দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের এবং মীমাংসাশাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ইহারও ফলে ইহার অন্যথা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিবে না। ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্য লওয়ায় ইহাতে কোনরূপ দুষ্টযুক্তির স্থান হয় না, এবং মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্য লওয়ায় ইহাতে বেদার্থের মীমাংসা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আলোচিত হয় না। এই কারণেই ইহার নাম বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মমীমাংসাদর্শন হইয়াছে। অন্যান্য দর্শনে সত্যনির্ণয়ের জন্য অথবা জগৎকারণনির্ণয়ের জন্য স্বাধীনভাবে যুক্তিতর্ক ও অনুভবের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই বেদান্তদর্শনগ্রন্থে বেদের অধীন হইয়া অর্থাৎ বেদার্থের অনুসরণ করিয়া যুক্তি তর্ক ও অনুভবের শরণ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল কথা "বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব" প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অধিকরণের সাতটী অবয়ব

সেই কৌশলটী এই—প্রত্যেক অধিকরণের সাতটী করিয়া অঙ্গ বা অবয়ব থাকে। যথা—১। সঙ্গতি, ২। বিষয়, ৩। সংশয়, ৪। পূর্বপক্ষ, ৫। সিদ্ধান্তপক্ষ, ৬। পূর্বপক্ষে ফলভেদ এবং ৭। সিদ্ধান্তপক্ষে ফলভেদ।

এই সাতটী অবয়ব বিচারমধ্যে পরিস্ফুট না হইলে কোনও বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। অন্যান্য দর্শনের বিচারমধ্যে এই সাতটি অবয়ব থাকিলেও তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিয়া কোন গ্রন্থাদি রচিত হইতে দেখা যায় না, কেবল বেদান্ত-দর্শনেই এই জাতীয় গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখ যায়।

এইবার এই অবয়ব সাতটীর একে একে পরিচয় লওয়া যাউক। দেখা গিয়াছে অধিকরণের অবয়ব সাতটীর মধ্যে প্রথম অবয়বসঙ্গতি। অতএব তাহারই পরিচয় প্রথমে দেওয়া আবশ্যক।

অধিকরণের প্রথম অবয়বসঙ্গতির পরিচয়

সঙ্গতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। ইহা যে কোন দুইটী বা একাধিক বিষয়ের মধ্যেই থাকে। বেদান্ত-দর্শন মধ্যে এই সঙ্গতি বহু প্রকার। যথা—

১। উপনিষদ্‌বাক্যের সহিত এই গ্রন্থের সমুদায় সূত্রের, সমুদায় অধিকরণের, সমুদায় পাদের, এবং সমুদায় অধ্যায়ের সম্বন্ধ। সংক্ষেপে ইহার নাম শ্রুতিসঙ্গতি।

২। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত ইহার সমুদায় সূত্রের, সমুদায় অধিকরণের, সমুদায় পাদের এবং সমুদায় অধ্যায়ের সম্বন্ধ। সংক্ষেপে ইহার নাম শাস্ত্রসঙ্গতি।

৩। প্রত্যেক অধ্যায়ের সহিত তদন্তর্গত পাদ অধিকরণ ও সূত্রের সম্বন্ধ। ইহার নাম অধ্যায়সঙ্গতি।

৪। প্রত্যেক অধ্যায়ের সহিত পরবর্তী অধ্যায়ের সম্বন্ধ। ইহা অবান্তরসঙ্গতি।

৫। প্রত্যেক পাদের সহিত তদন্তর্গত অধিকরণ ও সূত্রের সম্বন্ধ। ইহার নাম পাদসঙ্গতি।

৬। প্রত্যেক পাদের সহিত পরবর্তী পাদের সম্বন্ধ। ইহাও অবান্তরসঙ্গতি।

৭। প্রত্যেক অধিকরণের সহিত তদন্তর্গত সূত্রের সম্বন্ধ। ইহা অবান্তরসঙ্গতি।

৮। প্রত্যেক অধিরণের সহিত পরবর্তী অধিকরণের সম্বন্ধ। ইহার নাম অধিকরণসঙ্গতি।

৯। প্রত্যেক সূত্রের সহিত পরবর্তী সূত্রের সম্বন্ধ। ইহাও অবান্তরসঙ্গতি।

বেদান্তদর্শনের অধিকরণ বিচারকালে সূত্র-ভাষ্যের টীকাকারগণ অনেক স্থলেই এই সকল সঙ্গতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অধিকরণমালা নামক গ্রন্থমধ্যে এই সকল সঙ্গতির ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে।

এইবার দেখা যাউক এই নয় প্রকার সঙ্গতির পরিচয় কিরূপ; ইহাদের মধ্যে প্রথম সঙ্গতির নাম সংক্ষেপে শ্রুতিসঙ্গতি বলা হয়। ইহার অর্থ—

১। শ্রুতিসঙ্গতি

উপনিষদ্‌বাক্যের সহিত এই গ্রন্থের সমুদায় সূত্রের, সমুদায় অধিকরণের, সমুদায় পাদের এবং সমুদায় অধ্যায়ের সম্বন্ধের নাম শ্রুতিসঙ্গতি। অর্থাৎ সমুদায় সূত্রে, অধিকরণে, পাদে এবং অধ্যায়ে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ নির্ণয় বা মীমাংসা থাকিবে। উপনিষদ্ বা তন্মূলক শাস্ত্রের অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থের বিচার থাকিবে না। এজন্য ভগবান্ বুদ্ধ বা মহাবীর প্রভৃতির বাক্যের অর্থের বিচার ইহাতে থাকিবে না। এই কৌশলটীর নাম শ্রুতিসঙ্গতি। এই কৌশলটী যিনি অগ্রাহ্য করিবেন, তাঁহার বেদান্ত-বিষয়ক কথা বা আলোচনা বেদান্তিগণের নিকট অগ্রাহ্য হইবে। এই কারণে এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে শ্রৌত মীমাংসাশাস্ত্র বা শ্রৌত দর্শন বা ঔপনিষদ দর্শন। অন্য কোনও দর্শনে উপনিষদের স্থান এত উচ্চে প্রদত্ত হয় নাই। এই জন্য এই মতে অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদি অন্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্ বলা হয়।

২। শাস্ত্রসঙ্গতি

সঙ্গতিগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টী শাস্ত্রসঙ্গতি। ইহার ফলে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত ইহার সমুদায় সূত্র, অধিকরণ, পাদ ও অধ্যায়ের সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ইহার সমুদায় সূত্র, সমুদায় অধিকরণ, সমুদায় পাদ এবং সমুদায় অধ্যায়ে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহারই নির্ণয় থাকিবে অথবা তদ্‌বিষয়ক সংশয়ের মীমাংসা থাকিবে। সুতরাং ইহাতে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বিষয় বা উক্ত ব্রহ্মসংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন কোন বিষয়ের বিচার থাকিবে না। এই কৌশলটীর নাম শাস্ত্রসঙ্গতি। এতদ্দ্বারা ইহাও বলা হইল যে, বেদান্তের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন মতের ব্রহ্মের কথা ইহাতে থাকিবে না। বেদান্তের ব্রহ্ম আর অন্য মতের ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু নহে। ন্যায়ের পরমাত্মাকে ব্রহ্ম বলিলে তাহা এক অদ্বিতীয় হয় বটে, কিন্তু তাহার "সামান্য" নামক গুণ থাকে বলা হয় বলিয়া ঐ ব্রহ্ম সগুণব্রহ্মই হয়। বেদান্তের ব্রহ্ম কিন্তু নির্গুণ। সাংখ্যের মুক্তপুরুষকে ব্রহ্ম বলিলে সেই ব্রহ্ম বহু হইয়া যান, বেদান্তের ব্রহ্ম কিন্তু এক অদ্বিতীয়। এইরূপে একমাত্র অদ্বৈতবেদান্ত মত ভিন্ন অন্য কোন মতের ব্রহ্মই বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয় না। অদ্বৈতবেদান্ত এই যথার্থ বেদান্ত-পদবাচ্য। দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতাদি মতের বেদান্ত যথার্থ 'বেদান্ত পদবাচ্যই হওয়া উচিত নহে। কারণ, তত্তন্মতে যুক্তিতর্ক, অনুমান, আপ্তবাক্য ও যোগশক্তির দ্বারা অলৌকিক অনুভব প্রভৃতি যত উপায়ে জগৎকারণ ব্রহ্ম নির্ণীত হইতে পারে, সেই সমুদায় ব্রহ্মই বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া যায়। এজন্য শূন্যবাদী বৌদ্ধের শূন্যকে বা বিজ্ঞান-

বাদী বৌদ্ধের শুদ্ধবিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিলে, অথবা নৈয়ায়িকের পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলিলে, অথবা সাংখ্যের অসঙ্গ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিলে, অথবা যোগের ক্লেশাদিরহিত পুরুষবিশেষকে ব্রহ্ম বলিলে, অথবা শৈব ও পাশুপতের শিব ও পশুপতিকে ব্রহ্ম বলিলে, অথবা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রের শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বা বাসুদেবকে ব্রহ্ম বলিলে সেই সব ব্রহ্মই বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তুই হইয়া যায়। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকারকারী শাক্তের শক্তিকে ব্রহ্ম বলিলেও সেই ব্রহ্ম বেদান্তের ব্রহ্ম হইবে না। যাহা কেবলই বেদান্তের দ্বারা "কেবল জ্ঞানস্বরূপ ও আছে মাত্র" বলিয়া জানা যায় তাহাই বেদান্তের ব্রহ্ম। বেদান্তের ব্রহ্ম, এক কথায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এজন্য এই শাস্ত্রসঙ্গতিরূপ কৌশলটীর দ্বারা অন্য কোন মতবাদের বেদান্তমত মধ্যে প্রবেশের কোনও সম্ভাবনা নাই। এইজন্য এই বেদান্ত-দর্শনের নাম ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র বা ব্রহ্মসূত্র অথবা ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্র।

এইরূপে এই প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গতির দ্বারা বেদান্তের স্থান অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল। অধিক কি অপরের সহিত বেদান্তের যে কোনও প্রকৃত বিরোধ নাই, তাহারও সূচনা করা হইল। কারণ এক বিষয়ে "হাঁ" ও "না" হইলেই বিরোধ হয়। এখানে বিষয়ভেদ হয় বলিয়া বিরোধ হয় না। ব্রহ্মই এস্থলে বিষয়, সেই ব্রহ্ম যখন অন্য মতে অন্যরূপ, তখন ব্রহ্ম বিষয়ে কি করিয়া বিরোধ সম্ভব?

তবে যদি বলা হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে পরমতের খণ্ডন কেন করা হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, অদ্বৈত মতের উপর তাহাদের আক্রমণের উত্তরপ্রদান মাত্র করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে যতটা খণ্ডন আবশ্যক ততটাই খণ্ডন করা হইয়াছে। এইজন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়কে অবিরোধ অধ্যায় বলা হয়। এতদ্দ্বারা প্রথম অধ্যায়ে উপনিষদ্বাক্যসমূহের মধ্যে যে সমন্বয় প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতেও কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইবে না। এতদুদ্দেশ্যে যে প্রধান অস্ত্র গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রথমটী পরমতের যুক্তি-দোষপ্রদর্শন, দ্বিতীয়টী পরমতের অবৈদিকত্ব-প্রদর্শন।

৩। অধ্যায়সঙ্গতি

তৃতীয় প্রকার সঙ্গতির নাম অধ্যায়সঙ্গতি। প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয় অধ্যায় বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম অবিরোধ অধ্যায় বলিয়া, তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সাধন অধ্যায় বলিয়া এবং চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ফল অধ্যায় বলিয়া বেদান্ত-দর্শনের চারিটী অধ্যায়ের এই চারিটী অধ্যায়সঙ্গতি নামে অভিহিত করা হয়। ইহার ফলে প্রথম অধ্যায়ে সর্বত্র সূত্রাদিতে উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয় প্রদর্শন করা হইবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বত্র সূত্রাদিতে অবিরোধ প্রদর্শন করা হইবে, তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বত্র সাধনের বিচার থাকিবে, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বত্র সূত্রাদিতে ব্রহ্মবিচারের ফলের বিচার থাকিবে।

তাহার পর এতদ্দ্বারা এক অধ্যায়ের বিষয়ের সহিত অন্য অধ্যায়ের বিষয়ের কোনরূপ সংমিশ্রণ ঘটিবে না। আর তজ্জন্য পুনরুক্তি দোষও হইবে না।

৪। অবান্তরসঙ্গতি প্রথম প্রকার

চতুর্থ প্রকার সঙ্গতির দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের সহিত পরবর্তী অধ্যায়ের সম্বন্ধদ্বারা আকাংক্ষানুরূপ বিষয় সন্নিবেশের সুবিধা হয়। যেমন প্রথম অধ্যায়ে স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর পক্ষ খণ্ডন করা হইয়াছে। বিচারের স্বাভাবিক নিয়মই এই যে, প্রথমে স্বমত বর্ণন করিয়া, পরে তাহার বিরুদ্ধে কি বলা যাইতে পারে, তাহার উত্তর দিতে হয়। কারণ, পরপক্ষ

খণ্ডন না করিলে স্বমতে সংশয় সমূলে দূর হয় না। এজন্য এই চতুর্থ প্রকার সঙ্গতি প্রদর্শন আবশ্যক। অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যায়ের সহিত পরবর্তী অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন প্রয়োজন।

৫। পাদসঙ্গতি

পঞ্চম প্রকার সঙ্গতির নাম পাদসঙ্গতি। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক পাদের সহিত তদন্তর্গত অধিকরণ ও সূত্রের সম্বন্ধ। সুতরাং কোনও পাদের কোনও অধিকরণ বা কোনও সূত্রে সেই পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে অতিরিক্ত বা অন্য বিষয় থাকিবে না। কেবল তাহাই নহে, অন্য পাদের আলোচিত বিষয় অন্য পাদের কোনও অধিকরণ বা সূত্রাদিতে থাকিবে না। থাকিলে তাহা দোষের হইবে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদটীতে পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। এজন্য তাহার নাম পরমতখণ্ডনপাদ। এজন্য এ পাদের সমুদায় অধিকরণে পরমতের খণ্ডনই থাকিবে। কিন্তু রামানুজ ভাষ্যে এই পাদের শেষ অধিকরণে স্বমত স্থাপন করা হইয়াছে। এজন্য অনেকেই ইহাকে দোষের মধ্যে গণ্য করেন। ঐরূপ শাঙ্করভাষ্যে ২য় অধ্যায় ২য় পাদের ১১শ সূত্রে প্রথম পাদের কথা আলোচিত হওয়ায় অনেকের মতে তাহাও দোষের হইয়াছে।

যাহা হউক, এই পাদসঙ্গতিটী এই গ্রন্থের ১৬টী পাদের ১৬ প্রকার প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইয়া থাকে। সেই ১৬টী বিষয় যথা—১ম অধ্যায় ১ম পাদে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক বাক্যের বিচার। ১ম অধ্যায় ২য় পাদে অস্পষ্টভাবে উক্ত উপাস্য ব্রহ্মবোধক বাক্যের বিচার। ১ম অধ্যায় ৩য় পাদে অস্পষ্টভাবে উক্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক বাক্যের বিচার। ১ম অধ্যায় ৪র্থ পাদে ব্রহ্মবোধক সন্দিগ্ধ পাদের যথা অব্যক্তাদি পাদের বিচার। ২য় অধ্যায় ১ম পাদে সাংখ্য ও বৈশেষিকের যুক্তির উত্তর দিয়া স্বপক্ষস্থাপন। ২য় অধ্যায় ২য় পাদে সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত ও পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডন। ২য় অধ্যায় ৩য় পাদে (ক) পঞ্চমহাভূত বিষয়ক বাক্যের বিচার। ২য় অধ্যায় ৩য় পাদে (খ) জীববিষয়ক বাক্যের বিচার। ২য় অধ্যায় ৪র্থ পাদে লিঙ্গ শরীরবিষয়ক বাক্যের বিচার। ৩য় অধ্যায় ১ম পাদে সংসার গতি প্রদর্শনদ্বারা বৈরাগ্য-উৎপাদক বাক্যের বিচার। ৩য় অধ্যায় ২য় পাদে তৎ ও ত্বং পদের অর্থের বিচার। ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদে ব্রহ্মোপাসনায় বিভিন্ন শাখার গুণের উপসংহার। ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদে (ক) বহিরঙ্গ-সাধন আশ্রম ধর্মবিচার। ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদে (খ) অন্তরঙ্গসাধন শমদমাদিবিচার। ৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদে জীবন্মুক্তিবিচার। ৪র্থ অধ্যায় ২য় পাদে উৎক্রান্তির প্রকারবিচার। ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পাদে দেবযানমার্গবিচার। ৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদে (ক) বিদেহকৈবল্যবিচার। ৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ পাদে (খ) ব্রহ্মলোকবিচার।

ইহাই হইল বেদান্ত-দর্শন গ্রন্থের ১৬টী পাদের প্রতিপাদ্য; সুতরাং ইহারাই হইল পাদসঙ্গতি। প্রত্যেক পাদের প্রত্যেক অধিকরণে ও সূত্রে এই সঙ্গতি যথাসম্ভব থাকিবে।

৬। অবান্তর-সঙ্গতি দ্বিতীয় প্রকার

উক্ত ষষ্ঠপ্রকার সঙ্গতির দ্বারা প্রত্যেক পাদের সহিত পরবর্তী পাদের সম্বন্ধ। ইহারও ফলে যথেচ্ছভাবে বিষয় সন্নিবেশ করা চলিবে না।

৭। অবান্তর-সঙ্গতি তৃতীয় প্রকার

অধিকরণসঙ্গতি নামক সপ্তম প্রকার সঙ্গতির ফলে প্রত্যেক অধিকরণের সহিত তদন্তর্গত সূত্রের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। এতদ্দ্বারা সূত্রের অর্থ অধিকরণের অর্থের অধীন হয়।

৮। অধিকরণসঙ্গতি

অধিকরণসঙ্গতি অর্থ প্রত্যেক অধিকরণের সহিত পরবর্তী অধিকরণের সম্বন্ধ। ইহার দ্বারাও

স্বেচ্ছামত বিষয়ের বিচার করা যাইবে না। ইহা আবার বহু প্রকার, তন্মধ্যে চারিটী প্রধান, যথা—(ক) আক্ষেপসঙ্গতি, (খ) উদাহরণসঙ্গতি, (গ) প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং (ঘ) প্রসঙ্গসঙ্গতি। কারণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এস্থলে অধিকরণের বিষয়গুলি আর সঙ্গতি হইল না। অধ্যায় ও পাদে কিন্তু তাহা হইয়াছিল।

(ক) আক্ষেপসঙ্গতি

তন্মধ্যে আক্ষেপসঙ্গতি বলিতে যখন একটি অধিকরণের সিদ্ধান্তের উপর আক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ প্রতিবাদ করিয়া পরবর্তী অধিকরণের পূর্বপক্ষ রক্ষিত হয়, তখন পরবর্তী অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি থাকে।

(খ) উদাহরণসঙ্গতি বা দৃষ্টান্তসঙ্গতি

তদ্রূপ যেখানে একটী অধিকরণের সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য পরবর্তী অধিকরণটী আরব্ধ হয় তখন পরবর্তী অধিকরণে উদাহরণ বা দৃষ্টান্তসঙ্গতি থাকে।

(গ) প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি বা দৃষ্টান্তসঙ্গতি

যেখানে একটী অধিকরণের সিদ্ধান্তের বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য পরবর্তী অধিকরণটী আরব্ধ হয় তখন পরবর্তী অধিকরণে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি থাকে।

(ঘ) প্রসঙ্গসঙ্গতি

কিন্তু যেখানে পূর্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিত আক্ষেপ, উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ রূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন দূরবর্তী সম্বন্ধে পরবর্তী অধিকরণ আরব্ধ হয়, যেমন, কর্মে মনুষ্যাধিকার বিচার করিয়া যদি পরবর্তী অধিকরণে—কর্মে দেবতার অধিকার আছে কিনা বিচার করা যায় তাহা হইলে দেবতার অধিকার-বিচারটী প্রসঙ্গক্রমে করা হইল বলিয়া তাহাতে প্রসঙ্গসঙ্গতি থাকে বলা হয়।

৯। অবান্তরসঙ্গতি চতুর্থ প্রকার

এই চতুর্থ প্রকার অবান্তরসঙ্গতি বলিতে একটী সূত্রের সহিত পরবর্তী সূত্রের সম্বন্ধ বুঝায়। এতদ্দ্বারা অসঙ্গত কথার অবতারণা নিবারিত হয়। ইহাও সুতরাং আক্ষেপাদি নানা প্রকার হইয়া থাকে।

ইহাই হইল বেদান্তদর্শনের অধিকরণের সঙ্গতি নামক প্রথম অবয়বের পরিচয়। ইহার জ্ঞান থাকিলে বেদান্তদর্শনে কোথায় কি উদ্দেশ্যে কোন্ কথা বলা হইতেছে, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। এইবার অধিকরণের বিষয় নামক দ্বিতীয় অবয়বের কথা আলোচ্য।

"আমাদের যতপ্রকার পূজার যন্ত্র-প্রতিমাদি আছে, সকলেই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে; কারণ, বেদান্তে এইগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ
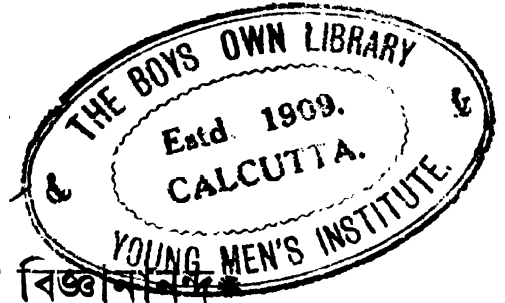
পূর্বাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুধর্মে যে নব জাগরণ আসিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব, সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর। বর্তমান মহাজাগরণের তুলনায় পূর্ব পূর্ব জাগরণ ক্ষুদ্র, নগণ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেই তাঁহার বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত ও কার্যকরী হইয়াছিল। তিনি স্থূলদেহে অবস্থানকালেই বিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও একবার ভাবাবেশে দর্শন করেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহার সকল শিষ্যের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি সকল শিষ্যের মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। শিষ্যগণ বুঝিতেন ও বলিতেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরই আছেন, তাঁহাদের আমিত্ব নাই। যিনি একজন শিষ্যকেও দর্শন করিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকেই দর্শন করিয়াছেন। যিনি একজন শিষ্যের কৃপা পাইয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাই পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অনন্তভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহার এক একটি ভাব তাঁহার এক এক শিষ্যে মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহারা যখন একত্রিত হইতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যগণ অভেদ। তাঁহার একজন শিষ্যকে চিন্তা করিলেই তাঁহাকে চিন্তা করা হয়। একজন শিষ্যকে আশ্রয় করিলে তাঁহাকেই আশ্রয় করা হয়। তাঁহার কোন শিষ্য যাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরই কৃপা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার শিষ্যগণের পদতলে বসিয়া সহস্র সহস্র সংসারতপ্ত নরনারী শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহাদের বাক্যে, দর্শনে বা স্পর্শে শত শত ব্যক্তির সংসারের জ্বালা দূরীভূত হইয়াছে। শিষ্যগণের প্রত্যেকেরই ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসীম আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিক জীবন ও দিব্য জ্ঞান। যিনি একজন শিষ্যেরও পূতসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন; ইহা অপরকে বুঝান অসম্ভব। কিন্তু হায়! তাঁহারা সকলেই স্বধামে প্রস্থিত! তাঁহাদের দেখিয়া বিশ্বাস করিবার সময় আর নাই। তবে তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ পাঠেও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের দিব্য-সঙ্গ লাভ হয়, আমাদের অশেষ কল্যাণ ও চিত্তশুদ্ধি হয়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অন্যতম। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট (অধ্যক্ষ) হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমহংস বলিয়া মনে হইত। তিনি এক দুর্ভেদ্য কঠোরতার আবরণে নিজেকে সদা আবৃত রাখিতেন। রুদ্র ভাবের মধ্যেও যে করুণা কোমলতা প্রকাশিত হয় তাহার দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। তিনি যেন ইহজগতের লোকই ছিলেন না। স্বামী মাধবানন্দজী

* লেখকের "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ চরিত" নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

সত্যই লিখিয়াছেন[১], "তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁহার মহান্ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুবাক্যকেই আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য। তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও দেব-জীবন আমাদের স্বর্গীয় সম্পদ। এক অপার্থিব ভাবে তিনি সদা অভিভূত থাকিতন; ঐহিক কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মহাপণ্ডিত হইয়াও তিনি মূর্খবৎ বিচরণ করিতেন। বজ্রবৎ কঠোর হইলেও শরণাগতের কল্যাণ কামনা তাঁহার চিত্তকে সদা অধিকার করিয়া থাকিত। সাংসারিকতা তাঁহার অলৌকিক জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রাশনাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগনা জেলার অন্তঃপাতী বেলঘরিয়ায়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর দিন[২] পিতার কর্মস্থল এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তারকনাথ কমিশারিয়াতে কাজ করিতেন। অনুমান ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারকনাথের দুই পুত্র হরিপ্রসন্ন ও হরিকমল। কনিষ্ঠ হরিকমল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ক্যানসার রোগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। হরিপ্রসন্ন পিতার সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁহার চারি ভগ্নী ছিলেন—গিরিবালা, রজনীবালা, ক্ষীরোদবালা ও সাবিত্রীবালা। ভগ্নীদের মধ্যে গিরিবালা দেবী পাটনায় থাকিতেন; এবং তাঁহার দুইপুত্র আজও বর্তমান।

শৈশবে কাশীধামের নিজবাটীতে (বাঙ্গালী টোলা, নাথুসার, ব্রহ্মপুরী) থাকিয়া নসীরাম সরকারের পাঠশালায় হরিপ্রসন্ন পড়িতেন। পরে বাঙ্গালী টোলা হাই স্কুলে প্রায় দুই বৎসর (১৮৭৭-৭৮) পড়িয়াছিলেন। সেই স্কুলে স্বামী নির্মলানন্দজী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ বরদাপ্রসন্ন দত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় পড়িবার জন্য বেলঘরিয়াস্থ আদি বাসস্থানে আসেন। তাঁহার বাল্যকাল বেলঘরিয়াতেই কাটিয়াছিল। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে ১৫ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং ইহাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি বেলঘরিয়া হইতে প্রত্যহ বি সি রেলওয়ের (বর্তমানে বি এ রেলওয়ে) গাড়ীতে কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ এ পাশ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। স্বামী সারদানন্দজী, কুমিল্লার বরদা পাল, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি উক্ত কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় কোয়েটাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা বেলঘরিয়া গ্রামে ১৯২০ সনে দেহত্যাগ করেন। হরিপ্রসন্নের এক জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল, যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি খুব বড় হঠযোগী ছিলেন এবং অনেক প্রকার আসন, প্রাণায়াম, নেতি ধৌতি অভ্যাস করিতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থাও বেশ উন্নত ছিল। তাঁহার কথা আলিগড়ের এক ভদ্রলোকের নিকট স্বামী বিরজানন্দজী শুনিয়াছিলেন। উক্ত

১ ১৯৩৮ সালের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জুন-সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার ইংরাজি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ কাশী সেবাশ্রমের পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া জন্ম তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভদ্রলোকের বাড়ীতে হরিপ্রসন্নের এই জ্যেষ্ঠতাত মাঝে মাঝে থাকিতেন। হরিপ্রসন্ন উক্ত জ্যেষ্ঠতাতকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। উল্লিখিত ভদ্র লোকের সঙ্গে হরিপ্রসন্নের খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও তিনি কখনও আলিগড় যাইয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিপ্রসন্ন সত্যানুরাগী ছিলেন। একবার তাঁহার জননী নকুলেশ্বরী দেবী কোন বিষয়ে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষারোপ করেন। হরিপ্রসন্ন পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও জননী পুত্রের কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তখন তিনি ক্ষোভে উত্তর দিলেন, "আমি যদি মিথ্যা কথা ব'লে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই।" ইহা বলিয়া তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলেন। মাতা উক্ত অশুভ কার্য্যে অত্যন্ত শঙ্কিতা ও দুঃখিতা হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি ভয়ানক অকল্যাণ করিলি?" দৈব দুর্বিপাকে তার পরদিনই তারযোগে কোয়েটা হইতে পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। শোকসন্তপ্তা জননী উক্ত দুঃসংবাদ শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "তোর অভিশাপেই এমনটি হলো।" তাঁহার বাল্যকালের নিম্নোক্ত ঘটনা তিনি নিজমুখে বলিয়াছিলেন: একদিন তিনি তাঁহার বাটীর বাঁশঝাড়ের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, একটী বানর বন্দুকের গুলি খাইয়া চিৎ হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে। উহার কাছে যাইয়া তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন বানরটী হাত যোড় করিয়া 'রামনাম' দুইবার উচ্চারণ পূর্বক প্রাণত্যাগ করিল।

বি-এ পড়িবার জন্য হরিপ্রসন্নকে তাঁহার ভগ্নীপতি নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে বাঁকিপুরে থাকিতে হয়। তথায় তিনি ভিন্ন বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন এবং পাটনা কলেজে পড়িতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। পরে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য পুনায় গমন করেন। পুনাতে পড়ার খরচের জন্য তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে মাসিক পঁচিশ টাকা পাঠাইতেন। তিনি ইহার মধ্য হইতেই পনর টাকা খাওয়া থাকার জন্য খরচ করিতেন। বাকী দশ টাকায় কলেজের বেতন কাপড় জামা পুস্তকাদির খরচ চালাইতেন। পুনাতে কম খরচে পড়া হইত বলিয়া বাঙ্গালী ছাত্রগণ শিবপুরে পূর্তবিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও পুনা যাইতেন। পুনা কলেজটির পুরা নাম ছিল পুনা কলেজ অব্ সায়েন্স। উহাতে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছিল। সেই বিভাগেই বাঙ্গালী ছাত্রগণ পড়িতেন। বাঙ্গালী ছাত্রগণ পুনাতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য বেঙ্গলী মেস খুলিয়াছিলেন। কলেজের কাছেই একটী বড় ভুতুড়ে বাড়ী করিয়া তাহাতেই মেস করিয়াছিলেন। ভুতুড়ে বাড়ী বলিয়া উহা মাসিক মাত্র সাত টাকা ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছিল; নচেৎ উহার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা হইত। পুনাতে হরিপ্রসন্নের সময় মাত্র সাত জন বাঙ্গালী ছাত্র ছিলেন। সহপাঠিগণের সম্মতিক্রমে তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, পূর্তবিভাগে পড়িবার জন্য যে সকল পুস্তক ও যন্ত্রপাতির আবশ্যক হইবে সেই সমুদয় প্রথমে যাঁহারা খরিদ করিবেন মেসের সকল ছাত্রই সে সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। পাঠান্তে উক্ত মেসেই সেইগুলি থাকিবে, কেহ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এইগুলি পরবর্তী বাঙ্গালী ছাত্রদের ব্যবহারে লাগিবে।

সেই সময় এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া পুনা যাইতে হইত। তখন বি এন রেলওয়ে লাইন খুলে নাই। এলাহাবাদের সরকারী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার খুব সদাশয় ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। বহু বাঙ্গালী তাঁহার গৃহে অতিথি হইত। হরিপ্রসন্নও পুনা যাইবার পথে একবার

মহেন্দ্র বাবুর বাসায় দুই দিন অতিথি ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। হরিপ্রসন্ন যখন পুনাতে ছিলেন তখন মহেন্দ্র বাবু কার্যোপলক্ষে তথায় গিয়া হোটেলে উঠেন। হরিপ্রসন্ন তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিজেদের বাঙ্গালী মেসে আনিয়া খুব আদর যত্ন করেন। মহেন্দ্র বাবুও বাজার হইতে উৎকৃষ্ট সবজি ও ফল মিষ্টান্নাদি আনিয়া বাঙ্গালী মেসের ছেলেদের খাওয়াইয়াছিলেন। পুনা কলেজের নিয়মানুসারে ছাত্রদিগকে চারি বৎসর পড়িতে ও দুইবার পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৮৮ সনে উক্ত কলেজে একটি নূতন বিভাগ খোলা হয়। উহাতে তিন বৎসর পড়িবার ও প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা দিবার নিয়ম হয়। হরিপ্রসন্ন নূতন বিভাগে ভর্তি হন। তাঁহার সহপাঠী রাধিকাপ্রসন্ন রায় নূতন বিভাগেই পড়িতে লাগিলেন। বাকী পাঁচজন বাঙ্গালী ছাত্র পুরাতন বিভাগেই রহিলেন। কলেজের পূর্ত-বিভাগের বেতন বাৎসরিক মাত্র ১০০৲ টাকা ছিল।

কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যে দুইজন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহারা যথাক্রমে বোম্বাই সরকার ও ভারত সরকারে চাকুরী পাইবেন। রাধিকা বাবু বেশ ভাল ছাত্র ছিলেন ; কিন্তু হরিপ্রসন্ন যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। জনৈক মারাঠী যুবক এম-এ পাশ করিয়া মহীশূর সরকারের বৃত্তি পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে পড়িতেন। তিনি সকল বিষয়ে ভাল ছাত্র ছিলেন। সকলের বিশ্বাস ছিল সেই মারাঠী যুবকই প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। রাধিকাপ্রসাদের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি কলেজ হইতে একটি বৃত্তি লইয়া পড়িতেন এবং সরকারী চাকুরী পাইবার চেষ্টায় ছিলেন। অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করিলে সরকারী চাকুরী পাইবার আশা কম—ইহা জানিয়া হরিপ্রসন্ন রাধিকাপ্রসাদকে বলিলেন, "ভাই, তোমার অবস্থা ভাল নহে। অতএব তুমি যদি পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইতে পার তবে একটি সরকারী চাকুরী পাইবে। সেইজন্য আমি এই বৎসর পরীক্ষা না দিয়া পরবৎসর দিব।" যদিও রাধিকাবাবু পরীক্ষায় প্রথমবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই তথাপি তিনি হরিপ্রসন্নের মহানুভবতা ও বন্ধুপ্রীতির কথা আজীবন স্মরণ করিতেন ও তাহার আলোচনায় পঞ্চমুখ হইতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হরিপ্রসন্নের শেষ পরীক্ষার বৎসর হইলেও তাঁহাকে পরবর্তী বৎসরে পরীক্ষা দিতে হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি এল্ সি ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পুনা কলেজের ক্যালেণ্ডার হইতে জানা যায়, সেই বৎসর ভাণ্ডারকর বিঠল সীতারাম নামক একজন মারাঠী যুবক প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং বোম্বাই সরকারে চাকুরী পান। পরীক্ষায় হরিপ্রসন্নের দ্বিতীয় হইবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের কলেজে জনৈক খৃষ্টান্ পাদ্রী ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন উক্ত অধ্যাপক যখন ক্লাশে পড়াইতেছিলেন তখন পার্শ্ববর্তী মাঠে একটি গরু চরিতেছিল। পাদ্রী অধ্যাপক পরিহাসচ্ছলে হিন্দুছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "Lo Lo, your grandfather is grazing" (দেখ, দেখ, তোমাদের পিতামহ চরিয়া বেড়াইতেছে)। হিন্দুগণ জন্মান্তর-বিশ্বাসী। কিন্তু খৃষ্টানগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। হিন্দুগণের এই বিশ্বাসকে পরিহাস করিবার জন্যই অধ্যাপক উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। হরিপ্রসন্ন অপর ছাত্রগণের ন্যায় স্বধর্মের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তর দিলেন, "Your Christ is a son of a virgin lady and you call him the

son of God. How do you explain it ?" অধ্যাপক জবাব না দিলেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং হরিপ্রসন্নের শেষ পরীক্ষার উত্তর পত্রাদি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত দেখেন। ভূ-তত্ত্বে একটু কম নম্বর পাওয়ায় হরিপ্রসন্ন প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মেসের সাতজন ছাত্রের মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন বৈদ্য এবং একমাত্র রাধিকাবাবু কায়স্থ ছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে হরিপ্রসন্ন ও আর একজন ছাত্র নিত্য যথাসময়ে নিষ্ঠার সহিত গায়ত্রী জপ করিতেন। প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদিগকে বোম্বাই যাইতে হইত। তাঁহাদের মেসে এক বৃদ্ধা মারাঠী ব্রাহ্মণী রান্নাদি করিত। সে মাছ-মাংস খাইত না। ছাত্রদের মাছ-মাংস খাইতে ইচ্ছা হইলে নিজেরা রান্না করিয়া খাইতেন। তাহাদের এক সহপাঠী (খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) বোম্বাইতে হৃদ্‌রোগে মারা যান। তাঁহার সৎকার করিবার জন্য হরিপ্রসন্ন ও তাঁহার সহপাঠিগণকে রানাডে নামক এক মারাঠী ভদ্রলোক যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সুদূরপ্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদের বিশেষ অসুবিধা হইত। রানাডের পরোপকারিতার প্রশংসা হরিপ্রসন্নের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যাইত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হরিপ্রসন্ন গাজীপুরে ডিষ্ট্রিক্‌ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম চাকুরী। গাজীপুর ইউ পি (U. P.) তে অবস্থিত। তখন U. P. Govt. নাম ছিল না; N. W. P. Govt.—এই নাম ছিল। গাজীপুর-বেনারস রোড হরিপ্রসন্নের কর্মকালে তাঁহার তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হয়। কর্মজীবনে গাজীপুরে অবস্থানকালে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবার দর্শনলাভ করেন, এবং স্বামী অভেদানন্দ একবার তাঁহার অতিথি হন। গাজীপুর ব্যতীত তিনি স্বীয় জন্মস্থান এটাওয়া, বুলন্দশহর, মীরাট এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থানে ভারত-সরকারের অধীনে কর্ম করেন। গাজীপুরে তিনি যখন কর্ম করিতেন তখন তথাকার মুন্সিফ শ্রীশ চন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। শ্রীশ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর মেজর বামনদাস বসু আই-এম-এস হরিপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উত্তরকালে এই দুই বন্ধুর পরিচালিত পাণিনি অফিস (এলাহাবাদ) হইতে হরিপ্রসন্ন কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত কয়েকখানি হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তখন তাঁহার বন্ধু বিপ্রদাস বিশ্বাসের এটাওয়াস্থ বাড়ীতে এবং গাজীপুরে থাকিতে শ্রীশ বাবুর বাড়ীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ আতিথ্য গ্রহণ করেন। উভয় স্থানেই স্বামীজির সহিত হরিপ্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। এই সময় হইতেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। হরিপ্রসন্ন ঘোড়ায় চড়িতে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার তিনটি ঘোড়া ছিল। তিনি সমস্তদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন। তিনি যখন কর্মত্যাগ করেন তখন উপরিস্থ কর্মচারী (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার) তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে গাজীপুরে প্রমোশন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার জেঠা মহাশয় বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। সেইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া কর্মে ইস্তফা দিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট শ্রীবৃন্দাবনধামে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিয়া স্বামী বিরজানন্দজী কঠোর সাধন-ভজনে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, সেই সময় বৃষ্টিতে ভেজা প্রভৃতি নানা কারণে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহার ব্রঙ্কাইটিস্ ও বুক্‌ধড়ফড়ানি ইত্যাদি (Bronchitis & palpitation of

heart) রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকেন। পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁহার জন্য বিশেষ পথ্যাদি ও দুধের বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও তাঁহার শরীর সারিতেছিল না। তখন প্রেমানন্দজী বলিলেন, "দেখ, এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন আছেন। তিনি ঐখানের সরকারী ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার ওখানে যাবে? তিনি ঐখানের সিভিল সার্জনকে দিয়া তোমাকে পরীক্ষা করাইয়া তোমার চিকিৎসা ও ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন এবং তাঁহার ওখানে গেলে বায়ু পরিবর্তনও হইবে। চল, সেখানে যাওয়া যাক্।" ইহাতে বিরজানন্দজী বলিলেন, "হরিপ্রসন্ন বাবু কে?" উত্তরে বাবুরাম মহারাজ বলেন, "তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন শিষ্য ও পরমভক্ত; ছেলে বয়সে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। পুনাতে পূর্তকার্য (Engineering) শিক্ষা করিয়া এখন তিনি সরকারী চাকুরী করিতেছেন। আলমবাজার মঠের যখন আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল তখন দৈবযোগে আমাদের কোন গুরুভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মঠের ও আমাদের সকলকার খবর পাইয়া আলমবাজার মঠে মাসিক ৬০৲ হিসাবে সাহায্য পাঠাইতে থাকেন। তিনি খুব ভদ্র ও ভক্ত লোক। তাঁহার ওখানে গেলে তিনি আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিবেন।" এই সকল শুনিয়া বিরজানন্দজী বলিলেন, "বেশ তো আপনার যখন মনে হইতেছে তথায় যাইলে ভাল হয়, ইহাতে আমার আর কি আপত্তি হইতে পারে?" অতঃপর পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ এটাওয়াতে পত্র লিখিয়া সকল বিষয় স্থির করেন ও তথায় বিরজানন্দজীকে লইয়া যান। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হরিপ্রসন্ন অতিশয় আনন্দিত হন এবং খুব যত্নের সহিত সিভিল সার্জন দ্বারা বিরজানন্দজীর চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার বিরজানন্দজীকে দেখিয়া সামান্য ঔষধের বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু বেশ পুষ্টিকর খাদ্য ও কিছু কিছু ব্যায়াম করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী হরিপ্রসন্ন সকল বন্দোবস্ত করেন।

তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, অর্থব্যয়ে হরিপ্রসন্নের হস্ত উন্মুক্ত। বামুন ও চাপ্রাসীদের সর্বদা হুকুম করিতেন, "ঘি লেয়াও, দুধ লেয়াও, আচ্ছা আচ্ছা চিজ লেয়াও।" সেই সময় হরিপ্রসন্নের একখানা টম্ টম্ গাড়ী ও একটী বড় ঘোড়া ছিল। তাহাতে তিনি আফিসে যাতায়াত ও সরকারী কার্যাদি তদারক করিতে যাইতেন। হরিপ্রসন্ন বিরজানন্দজীকে উক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া সকালে দুই চারি মাইল বেড়াইতে বলেন। উত্তরে পূজনীয় বিরজানন্দ মহারাজ বলেন যে, আমিতো কখন ঘোড়ায় চড়ি নাই। কেমন করিয়া উহা শেখা যায়? ইহাতে হরিপ্রসন্ন বলেন, সহিস সঙ্গে থাকিবে ও ঘোড়া বেশী জোরে না চালাইলেই চলিবে। প্রত্যহ প্রাতে চা খাওয়ার পর পূজনীয় বিরজানন্দ মহারাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সহিসের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন; এবং ২।১ মাইল বেড়াইয়া ফিরিতেন। ইহাতেই তাঁহার বেশ ব্যায়ামের কাজ হইত। পরে দুপুর বেলা সকলেরই একসঙ্গে স্নানাহার হইত। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মাছ-মাংস খাইতেন না। হরিপ্রসন্ন খাইতে বসিয়া জোর করিয়া পূজনীয় বিরজানন্দজীর পাতে ঘি মাছ তরকারি প্রভৃতি দেওয়াইতেন।

তখন বিকালে হরিপ্রসন্নের বাংলোতে অনেক ভদ্রলোক প্রায়ই আসিতেন। উঠানে চেয়ারের উপর সকলে বসিয়া গল্প ও কথাবার্তাদি বলিতেন। ঐ সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক জঙ্গী মিলিটারী বিভাগের ঠিকাদার (সম্ভবতঃ রসদের) আসিতেন। তিনি খুব আমোদ-প্রিয় লোক ছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে বিদ্রোহের গল্প শুনা যাইত—কি রূপে তাঁহারা ভয়ে দিন কাটাইতেন, কি রূপে ইংরাজ সরকার বিদ্রোহ দমন করেন, ইত্যাদি। ঐ সব ঘটনা ও গল্প শুনিতে সকলেরই বেশ আনন্দ হইত। হরিপ্রসন্ন খুব কম কথা কহিতেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। এই রকম আনন্দে হরিপ্রসন্নের নিকট তাঁহারা একমাস ছিলেন। তাঁহার যত্নে এবং আহার ও ব্যায়ামাদিতে বিরজানন্দজী নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দজীও বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইলে পুনরায় উভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিলেন। তাঁহাদের ফিরিবার দুইমাস পরেই হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করিয়া আলম বাজার মঠে যোগদান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅরবিন্দ বসু

সম্প্রতি একজন মার্কিন অধ্যাপক* আমার সহিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বিবেকানন্দের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবর্ষে বিবেকানন্দকে চিন্তাবীর, সমাজসেবক ও জাতীয়তাবাদী হিসাবে যত শ্রদ্ধা করা হয়, তাহার অপেক্ষা বীর সন্ন্যাসী হিসাবে অধিক শ্রদ্ধা করা হয় দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। উপনিষদের ঋষিদের মত স্বামীজী আত্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা, তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ভগবৎপ্রেমিক ছিলেন কিনা তাহাতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়? তিনি যে গম্ভীর উদাত্ত স্বরে দেশপ্রেমের ও জনসেবার অগ্নিময়ী বাণী প্রচার করিয়া মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাই কি তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নহে, তাঁহার স্মৃতিকে জাতির চেতনায় অমর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

আমাদের দেশেও এখন অনেকের এই মনোভাব দেখা যায়। আদর্শবাদ ও মানবিকতা আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ধর্ম্ম আমাদের দেশের ও জাতির অবনতির প্রধান কারণ, অতএব জাতীয় উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমাজ গঠনের পথে লাভ করা যাইবে, এরূপ কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে। যাঁহারা বিবেকানন্দের মহত্ত্ব স্বীকারও করেন, তাঁহারাও স্বামীজীর চিন্তাধারায় এই মতের সঙ্গে যেটুকু ও যেখানে সাদৃশ্য আছে সেটুকুই মূল্যবান বলিয়া মনে করেন। এই মতামতের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। মার্কিন অধ্যাপকের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মহত্ত্ব ও ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁহার দান সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে পাঠকগণের কাছে নিবেদন করিব।

বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে আমাদের এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়া তাঁহাকে বুঝিবার কোন উপায় নাই। অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক বিবেকানন্দের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না বা বুঝিতে পারেন না যে বিবেকানন্দ পরমহংস-দেবেরই শক্তি। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজের কথাই প্রামাণ্য। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দের উৎপত্তি হইতে পারে। সম্প্রতি স্বামীজীর 'My Life and Mission' নামে আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাতে তিনি বলিয়াছেন আমি আমার প্রভুর প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহাতে স্বামীজীর গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঈশ্বরের হাতে যন্ত্র হইবার উপদেশ দিয়াছেন—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। ভারতের কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন—'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'। অবতারপুরুষের আদর্শকে প্রাণবান কর্ম্মে পরিণত করিবার নিমিত্ত হইতে পারিয়া বিবেকানন্দ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। ভাব সত্যের ছায়া, কর্ম্ম ভাবের

* কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ই এ বার্ট।

প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক ভারতের সাধনার ভাবময় বিগ্রহ এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রভুর শিক্ষার ও আদর্শের কর্ম্মময় মূর্ত্তি।

ভারতীয় সাধনার মর্ম্মকথা কি? এক কথায় বলিতে পারা যায়—ভগবৎপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা—ধর্ম্মই ভারতের আত্মা, ভারতের প্রাণ, ভারতের অস্তিত্ব। ধর্ম্মই ভারতীয় মানবের মূলসূত্র। আধ্যাত্মিকতা ভারতের সহজাত। ধর্ম্ম ভারতবাসীর মস্তিষ্কে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে, দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে, তাহার অস্থি মজ্জাগত। ভারতবাসী চিরকালই বিশ্বাস করিয়াছে জগতের মূল রহস্য জগতের বাহিরে, জীবনের মূল সত্য জীবনের অতীত দেশে। অসীম যেমন সীমাকে ঘিরিয়া আছে, জীবন ও জগৎকে ঈশ্বরও তেমনি ধরিয়া আছেন। বৈদিক যুগের পরেও আমাদের দেশে যখন বুদ্ধির চর্চ্চা চরম হইয়াছে, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে ভারত যখন অজ্ঞানের তিমিরে ডুবিতে বসিয়াছে, তখনও এই সত্যের দৃষ্টি আমরা হারাই নাই। ভারতের আকাশে বাতাসে এই মহান সত্য ধ্বনিত হইয়াছে যে বাহির হইতে মানুষকে যাহা মনে হয় তাহা তাহার স্বরূপ নহে এবং সেই গভীরতর সত্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই নিহিত আছে। ভারত প্রথম হইতেই মানুষের উপরে অনন্ত দেবতা, দেবতাদিগের উপর এক ঈশ্বর—এক ঈশ্বরের উপরেও তাহার আপন সত্তার সর্ব্বাতীত অবর্ণনীয় ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়াছে। শুধু দেখে নাই, তাহার সাক্ষাৎকারও করিয়াছে। বিবেকানন্দ ভারতের এই সনাতন সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং যুগের উপযোগী অতি তেজস্বী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর সম্বন্ধে দুই প্রকার মত পাওয়া যায়। একদল বলিয়া থাকেন তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন—ঐহিক বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আর একদল স্বামীজীর ভারতের অগণিত নিপীড়িত জনগণের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের চেষ্টাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। উভয় মতই একদেশদর্শী, সম্পূর্ণ সত্য দেখিতে পায় না। যাঁহারা শুধুই তাঁহার সাধকরূপ দেখিয়াছেন, কর্ম্মিরূপ দেখেন নাই, তাঁহারা কি তাঁহার ভারতের দীনাতিদীন উৎপীড়িত জনসাধারণের জন্য সহানুভূতিসূচক অগ্নিময়ী বাণী পাঠ করেন নাই? তিনি কি বলেন নাই—প্রথমে খাদ্য, তাহার পর ধর্ম্ম; যতদিন আমার দেশে একটি কুকুরও অভুক্ত থাকিবে ততদিন উহাকে খাওয়ানোই আমার ধর্ম্ম; তুমি যদি ভগবানকে চাও জীবে প্রেম কর; সমস্ত আত্মার সমষ্টি আত্মারূপে যে ঈশ্বর আছেন,—একমাত্র যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি—তাঁহার পূজা করিবার জন্য, বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহা কি কোন ইহবিমুখ আত্মসুখসর্ব্বস্ব কর্ম্মত্যাগীর কথা? ইহা কি সকলের দুঃখে দুঃখিতচিত্ত মানবপ্রেমিকের হৃদয়াবেগের সহজ সরল প্রকাশ নহে? অন্যদিকে যাঁহারা স্বামীজীর ঈশ্বরপ্রেমিক যোগী রূপকে অবহেলা করিয়া শুধুই তাঁহার ব্যাপকভাবে জাতীয় শক্তির উদ্বোধনকারী দেশপ্রেমিক রূপকে মহিমা দিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন না যে স্বামীজী তাঁহার বিখ্যাত 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সামাজিক উন্নতিলাভ করিতেই হইবে এ কথার কোন যুক্তিসহ প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁহারা ভুলিয়া যান। তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গঠিত না হইলে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। তাঁহারা ভুলিয়া যান স্বামীজীর আদর্শ, তাঁহার নিজেরই ভাষায় ছিল, মানুষকে তাহার দিব্যস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করা এবং সেই

স্বরূপ জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেওয়া। তিনি জগদ্বাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, পরন্তু প্রকৃতিই আত্মার জন্য। এই সূত্রে মনে পড়িতেছে তাঁহার আর একটি বাণী: প্রথমে আমাদিগকে দেবত্ব লাভ করিতে হইবে, তাহার পর সকলকে দেবত্ব লাভ করিতে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহার এই সকল শিক্ষা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি কোন্ বস্তুকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন এবং ভারতের জীবন কোন্ ভিত্তির উপর বা কোন্ ধারায় গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। যে ভারতের সর্ব্বজনমান্য শাস্ত্র গীতা বলিয়াছেন—জীবনের মূল ঊর্দ্ধে, তাহার শাখা-প্রশাখা নিম্নের দিকে প্রসারিত, সেই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহার আলো ও বাতাসে পুষ্ট হইয়া, ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার অনুসরণে পুরুষার্থলাভ করিয়া বিবেকানন্দ আত্মাই সত্য, আত্মজ্ঞানই বল, ইহা যথার্থই বুঝিয়াছিলেন। স্বামীজী এই সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই ভারতের মৃতপ্রায় জীবনপ্রবাহে আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত বহাইতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় তাহা তিনি কখনই অস্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার দেশকে একটি অতি বিশাল ভগ্ন প্রাসাদের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। প্রথমে দেখিলে মনে হয় এই প্রাসাদের সংস্কারের কোন আশা নাই কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে প্রাসাদের জীর্ণতাই তাহার শেষ সত্য নহে—ভারতের বর্ত্তমান অবনতি তাহার পরিণতি নহে। প্রাসাদের ভিত্তি এখনও অনাহত আছে, তাহাতে ফাটল ধরে নাই, ভারতের জীবনের মূল উৎস তাহার শক্তির গঙ্গোত্রী—ধার্ম্মিকতা এখনও শুষ্ক হয় নাই। বিদেশ হইতে কত বিজেতা আসিল, ভারতবর্ষে রাজত্ব করিল, বিদেশী ধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু ভারতের আত্মিক দৃষ্টিকে ম্লান করিতে পারিল না পরন্তু ভারতই সকল বৈদেশিক প্রভাবকে আত্মসাৎ করিল। কোন্ শক্তির বলে ভারত আজও বাঁচিয়া আছে? সে শক্তি ভাগবতী শক্তি, সে বল আত্মার বল। মুসলমান রাজত্বকালে মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব, ইংরাজ রাজত্বে রামকৃষ্ণের প্রকাশ ভারতের মৃত্যুহীন আধ্যাত্মিকতার অনস্বীকার্য্য প্রমাণ। বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিবার সময় আমরা যেন এ কথা ভুলিয়া না যাই যে তিনি আত্মানুভবই প্রথমে চাহিয়াছিলেন এবং সেই অনুভবের সাহায্যে সকলের আত্মবল জাগাইতে চাহিয়াছিলেন।

তবে কি স্বামীজীর চিন্তা ও জীবনে বিরোধ ছিল বলিতে হইবে? আমরা উত্তরে বলি—না। যদি কোন বৃহত্তর আদর্শের জন্য সমাজের উন্নতি না চাই, সমাজকে যদি আত্মশক্তির বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে শুধু সমাজসেবার কোন সার্থকতা থাকে না। স্বামীজীর ইহাই বক্তব্য। অনেক ইউরোপীয় সমালোচক ভারতের জীবনের আদর্শে ও সাধনায় মানবিকতার অভাব আছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। বহু বিখ্যাত ভারতীয় মনীষী এই অভিযোগের উত্তর দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি উত্তরের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ ভারতীয় সাধনায় মানবিকতার অভাব না থাকিলেও সমাজ সংগঠন ও মানুষের উপকার করা আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে। আমরা যদি ইউরোপীয়দের মত ঐহিক ভোগ ও উন্নতিকেই চরম মূল্য না দিয়া থাকি, আমাদের পুরুষার্থের কল্পনাতেই প্রভেদ থাকিয়া থাকে তাহাতে লজ্জার কিছুই নাই। প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির এই স্থলে প্রভেদ। গ্রীকজাতি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের পূজারী ছিল বলিয়া শরীর চর্চ্চা করিত। দেহকে তাহারা দেহের অতীত কিছুর প্রকাশের যন্ত্র হিসাবে ধরিতে পারে নাই।

আমাদের দেশেও দেহকে সুন্দর, শুদ্ধ, পবিত্র করিবার আদর্শ ও অভ্যাস দুই-ই ছিল কিন্তু ভারতবাসী কখনও দেহকে দেহের জন্যই আদর করে নাই। শরীর দেবতার মন্দির বলিয়াই তাহাকে সুন্দর করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক বুদ্ধির চর্চ্চা করিত চিন্তাচাতুর্য্যের তৃপ্তির জন্য, আমাদের দেশেও বুদ্ধিচর্চ্চার চরম হইয়াছে। এমন কোন দর্শন জগতে রচনা করা হয় নাই যাহার মূলসূত্র উপনিষদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা এক বিরাট দাবী। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই স্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডের দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই মত সমর্থন করেন। যে তীক্ষ্ণ প্রতিভা ষড়দর্শনকে জন্ম দিয়াছিল সেই প্রতিভাকে ভারতবাসী আদর করিয়াছে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ বলিয়া, কারণ আত্মার আলোকেই সব কিছু আলোকিত। প্রাচীন রোমক জাতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। ভারতবর্ষেও সমাজসংগঠনের অপূর্ব্ব পরিকল্পনা ও ব্যবহার হইয়াছিল কিন্তু রোমক জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আমাদের দেশ সমাজকে সমবায়সূত্রে সমষ্টি আত্মার বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া সুচারুরূপে গঠন করিয়াছে। এই জন্যই বলিতেছি যে ভারতবাসী সমাজসেবা ও মানবিকতা অবহেলা না করিলেও তাহাকেই সর্ব্বস্ব মনে করে নাই। ভারতবাসী যদি কোন রূপ মানবিকতায় বিশ্বাস করে তাহা দিব্য মানবিকতা। অন্যদিকে যাঁহারা স্বামীজীর আত্মভোলা ঈশ্বরপ্রেমিক রূপ দেখিয়াছেন তাঁহাদের আমি স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—দুই চারিজন সাধুর আত্ম-উপলব্ধির জন্য সমাজকে বলি দেওয়া চলিবে না। একটি চিঠিতে তিনি বলিয়াছেন যে আশু বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন আমাদের আত্মবিদ্যা কিন্তু এই কথা বলিলেই জটাজুট দণ্ড-কমণ্ডলু গিরিগুহা মনে করিতে হইবে ইহা তাঁহার মন্তব্য নহে। তবে কি বুঝিতে হইবে? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাহাতে কি আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি বৈরাগ্য ত্যাগ এই সকল মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সত্যকে ধরিবার সকল পথই এই বিষয়ে এক মত যে জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হইতে উচ্চতম সিদ্ধ পুরুষ পর্যান্ত সকলের মধ্যে সেই আত্মা। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পাইলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। বিকাশ হোক বা না হোক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সেই শক্তিই প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান। অনেকেই বলিতে পারেন ইহা ত অতি পুরাতন কথা, অতি পরিচিত। কিন্তু স্বামীজী ইহা বলিবার পর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহাই জানা প্রয়োজন। তিনি এই চিঠিতেই বলিয়াছেন, এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। Practical Vedanta নামে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে আত্ম-উপলব্ধি কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও হইতে পারে। তপোবনই তাহার একমাত্র উপযুক্ত স্থান নহে। এমন কি সঞ্চিত শক্তিকে স্বচ্ছন্দ কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রধান মিলনসেতু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দকে এই কারণেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের জন্য

যে মহাত্মা আশ্চর্য্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই বিবেকানন্দ সকল কাজেই আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহৎ।

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-যোগী। কর্ম্মযোগ শুধু নৈতিক সাধনা নহে, কর্ম্মযোগ আধ্যাত্মিক সিদ্ধিও। সাধারণতঃ অনেকের একটি ধারণা আছে যে, যে ভাবে কর্ম্ম করিলে বাসনা হইতে উদ্ধার পাইয়া কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে তাহাই কর্ম্মযোগ। বস্তুতঃ ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার ফলে জগতে ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তরূপে আমাদের আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম হয় তাহাও কর্ম্মযোগ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়', হে ধনঞ্জয়, সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। বলা বাহুল্য আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারিলে আত্মবিজ্ঞান হয় না এবং আত্মজ্ঞান না হইলে যোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না কিন্তু তথাপি যোগের পরেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন না। কর্ত্তা বাস্তবিক একজন, তাঁহার যন্ত্র হইতে পারাই প্রকৃত লক্ষ্য। স্বামীজী তাঁহার এক শিষ্যকে পত্রে বলিয়াছিলেন, উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্, আপনি আপনার উদ্ধার কর। সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ—ইহাই যোগের আদর্শ কিন্তু স্বামীজী এইখানেই থামেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই বিষয়ে সহায়তা করা প্রয়োজন। ইহা যোগের পরে কর্ম্ম এবং সেইজন্যই প্রকৃত কর্ম্মযোগ।

অনেক মনীষী এই আদর্শকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সমন্বয়কে জগতের বর্ত্তমান ভীষণ অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়াছেন। মনীষীদের কথা যে যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে চাই যে বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলে ও জীবনে অভ্যাস করিলে সমন্বয়ের কথা বলিতে হয় না—কারণ আর্য্যধর্ম্মে জীবনের ও জগতের ও তাহার অতীত সকল প্রকার পুরুষার্থই সংহত ও উপলব্ধ। আমরা এই সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ এই পরিণাম কিন্তু বর্ত্তমান পরিণাম শেষ পরিণতি নহে। ধার্ম্মিকতার স্রোত এখনও ফল্গুর মত বহিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে কিন্তু জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মশক্তির প্রয়োগ নাই বলিয়া জগৎ-সভায় ভারতের সেই গৌরবের আসন নাই। কিন্তু আশার কথা ভারত শুধু কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে নাই, বিশ্বজয় করিবার জন্য বাঁচিয়া আছে। পরাধীন ভারত বিশ্ববিজয় করিবে শুনিলে অনেকে বিদ্রূপ করিতে পারেন। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন, এখন আমাদের মহামন্ত্র ইংলণ্ডবিজয়, ইউরোপবিজয়, আমেরিকাবিজয়। বিস্তার জীবনের চিহ্ন এবং আমাদিগকে সকল জগৎ ব্যাপিয়া সনাতন ধর্ম্মের আদর্শগুলি প্রচার করিতে হইবে ভারতীয় বিশ্ববিজয় অস্ত্রের ঝনৎকারের দ্বারা হয় না। শান্তিপ্রিয় ভারত শান্তি ও প্রেম দিয়াই চীন, জাপান ও তিব্বতকে জয় করিয়াছিল। যে দিন একজন নিরক্ষর কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিক ব্রাহ্মণ পূজারীর পদতলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গর্ব্বিত কলিকাতা ও বঙ্গদেশের সমাজের নেতারা প্রণতি জানাইলেন সেইদিন ভারতের বিশ্ববিজয় আরম্ভ হইল, সেই বিজয়ের পতাকা সাগর পারে বহিয়া লইয়া গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই পতাকা আজও উড়িতেছে ও শান্তিকামী অনেক লোক

সেই পতাকার নিয়ে সমবেত হইতেছে। আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সৈনিক এক নূতন মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষিত করিয়াছেন। দেশের গগন পবন মথিত করিয়া ধ্বনি উঠিয়াছে 'জয় হিন্দ' কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা শুধু দেশের মাটির উপর নিজের অধিকার-ভোগের ক্ষমতা নহে। স্বাধীনতা অর্থে—নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে জীবন গঠন করিবার সুযোগ। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করায়ই স্বাধীনতার সার্থকতা। আমরা যদি আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইউরোপের অনুকরণ করিতে সমস্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষিত করি, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের 'মহতী বিনষ্টিঃ'। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। 'হিন্দ' শব্দে আধ্যাত্মিকতাই সূচিত হয়। 'জয়' অর্থে বুঝিব জীবনের সর্ব্বকাজে আত্মশক্তির প্রয়োগ ও সেই উপায়ে সমস্ত জগতের সুপ্ত আত্মার জাগরণ ও বিশ্বকে ভগবৎপ্রেমে প্লাবিত করা। তাই ভারতবাসীর কাছে আমাদের নিবেদন—বৈদিক ভারতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিও না—তান্ত্রিক সমাজের আদর্শ ম্লান করিও না—গীতার শিক্ষাকে জীবনের সার করিতে ভুলিও না—শারীরিক ও মানসিক, সামাজিক ঐহিক পুরুষার্থগুলিকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহার অতীত জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকে ভুলিয়া গিয়া ইহ জীবনকে সত্যস্য সত্যম্ হিসাবে গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণের ভারতের মুখে কলঙ্ক দিও না, বিবেকানন্দের ভারতের মুখে কলঙ্ক দিও না, শ্রীঅরবিন্দের ভারতের মুখে কলঙ্ক দিও না।

মহালক্ষ্মী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, বিছায়ে মধুরিমা কে আলো হ'য়ে এলে আকাশে ?
মধু হেসে অতিথিসুরে বাজায়ে হৃদিপুরে অমল করুণার-আভাসে ?
প্রাণ সহজে থাকে ভুলে, তাই কি ঢেউ তুলে সম্ভাষণ করো নন্দিতা ?
নিতি বেসুরে সুরনদি-দানে যে করে ধনী—অমলা সে-ই চির বন্দিতা।

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া :
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া !

যেথা সাধ মা আছে যত তব চরণে নত যেমনি হয় ওগো নারায়ণী,
কণা- ভিক্ষা লভি' হয় মনে যে নাই ভয়—অভয়া যবে রাজে অমরণী।
বলো নহিলে অস্তের পটে কে অলখের কিরণ-ঋণ আনে ঝঙ্কারে ?
নিতি ছায়ার বুকে বসি' কাহার কায়া শশী সৃজিয়া নাশে নিশা-শঙ্কারে ?

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া।
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া !

মাগো বাসনা-মরীচিকা, ছলনা অহমিকা—জানি তো সবি—শুধু সাধনে
বুনে কে শত পরমাদ অতীত-মোহে সাধ মিটাতে চায় বরি' বাঁধনে ?
তুমি গ্রন্থি তবু খোলো, মনের বনে চলো কাঁটার কুসুম-রূপান্তরে,
তারি বিছায় মধুরিমা লক্ষ্মী-পূর্ণিমা ধূসরে উদ্ভাসি' সুন্দরে।

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া :
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া !

মন ও আমি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মনের সঙ্গে আর পারি না। কতকাল ধরিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতেছি—অনুনয় বিনয়, ভয় প্রদর্শন, নির্য্যাতন—কোন কিছু বাকী রাখি নাই—কিন্তু সকলই নিষ্ফল। ভবী ভুলিবার নয়—মন তাহার স্বভাব ছাড়ে না—আপনার ধারায় চলিয়া ফিরে। কুকুরের লেজ সোজা করার মত মনকে বশীভূত করিবার চেষ্টাও বুঝি বাতুলতা মাত্র। হতাশায় অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

মন কী চঞ্চল! এই মুহূর্ত্তে যদি একটি জিনিষ ভাবিতেছে তো পরমুহূর্ত্তে ঠিক তার উল্টাটির পিছনে দৌড়িল। যদি বলি এস ভগবানের চিন্তা করি—তো সে সন্তানের ভাবনা করিতে বসিবে। অনবরত নাচিতেছে—এই মানুষ, এই ঘোড়া; এই সাদা, এই কাল; এই ভাল, এই মন্দ;—এই সুখ, এই দুঃখ—একটা না একটা সঙ্কল্প ক্রমাগত আছেই—এতটুকু আমার বিশ্রাম নাই—ক্ষণমাত্র তাহার ভেল্কীর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। মনের সঙ্গে আর পারি না।

মনের বিশ্বাসঘাতকতার কথাও আর কি বলিব। ঋষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতে বসিলেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন বলিয়া—মন বলিল, হাঁ নিশ্চয়ই। ইন্দ্রের মায়ায় অপ্সরা আসিয়া হাজির—মন টলিয়া বলিল, বাঃ এতো দুর্লভ—তপস্যা বরং পরে হইবে। ঋষি মজিলেন। পরে যখন বিবেকদষ্ট হইয়া মনকে চোখ রাঙাইয়া ধমক দিলেন—মন মাথা চুলকাইয়া বলিল, তাইতো ঠিক হয় নাই। মনের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় আছে কি? যেই একটু অসতর্ক হইয়াছ, মন নিমকহারামী করিয়া তোমাকে বিপদে ফেলিয়া দিবে।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় মনের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই। একটা নিরেট পাথরের মত —যেদিকে ঠেলিয়া দিবে সেই দিকে গড়াইয়া যাইবে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য মূঢ় জড়পিণ্ড বিশেষ! সত্ত্বগুণের পরিবেষ্টনীতে রাখ, জপ ধ্যান পূজা পাঠ সাধুসঙ্গ তীর্থদর্শন প্রভৃতিতে নিয়োগ কর—মন সাধু বনিয়া যাইবে—আবার রজোগুণ, তমোগুণের সংস্পর্শে যদি আসিল চকিতে মনের সাধুগিরি উবিয়া যায়—সে তোমায় জাহান্নমে লইয়া যায়। এই মনের উপর ভরসা কি?

অথচ এই মন লইয়াই ঘর করিতে হয়—যতক্ষণ জাগিয়া থাকি। ঘুমাইয়াও ছাড়া পাই না। জাগরণের আলু-পটল গাড়ী-ঘোড়া স্বপ্নে আবার দেখিতে হয়। মনের নর্ত্তন তখনও থামে না। সেই সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-নিরাশা, ঘৃণা ভালবাসা—অজস্র জীবনসংগ্রাম। কেবল যখন স্বপ্নবিহীন নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তিতে থাকি সেই সময়টুকুর জন্য মনের উৎপাত হইতে নিস্কৃতি পাই। তখন চিন্তার বালাই নাই—জানাজানির পর্ব্ব নাই—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়া একটা জমাটবাঁধা নিরাকার অস্তিত্ব ও আরাম তখন উপভোগ করি। জাগরণে এবং স্বপ্নে মনের ছুটাছুটির দরুণ যে ক্লান্তি ও অবসাদ আমাকে ভোগ করিতে হয় সুষুপ্তির ঐ আরামটুকুতে উহা কাটিয়া যায়। ফলে জাগিয়া শরীর মনে একটু

তেজ ফিরিয়া পাই—আবার জীবনসংগ্রামে লাগিয়া যাই। মন হইতে একটুখানি বিযুক্ত হইয়া থাকিবার ফল অতএব কম নয়। অনেক সময়ে তাই লোভ হয় এইরূপ স্বপ্নবিহীন ঘুমের মধ্যে ডুবিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দি—মনের সঙ্গে লড়াই করিবার হাত হইতে তো বাঁচা যাইবে। কিন্তু অন্তর্নিহিত পৌরুষ বিদ্রোহ করে—ছিঃ ও তো কাপুরুষতা।

যাহা হউক সুষুপ্তির আশ্রয়ে পলায়ন করিয়া মনোনিগ্রহ চাই না—আর তাহা সম্ভবপরও নয়—কিন্তু সুষুপ্তি হইতে যে একটি মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা সযত্নে মনে রাখিব। তাহা এই যে, মনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চিরকালের সম্বন্ধ নয়। মন ছাড়াও আমি থাকিতে পারি। মন না থাকিলে অবশ্য জানাজানি সম্ভবপর নয়—কিন্তু জানাজানিটাই যে সর্ব্বদা আমার প্রয়োজন তাহা কে বলিল? কোন কিছু না জানিয়াও যে থাকা যায় সুষুপ্তি ছাড়া তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে—যোগশাস্ত্রোক্ত সমাধি। অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস দ্বারা চিত্তের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ করা যায়। এ বহুপ্রকাশমানা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ী বিচিত্র ধরণীর অসংখ্য সংবেদন দূরে পড়িয়া থাকে—শরীর মন প্রাণ সকলকে ভুলিয়া আমি এক নিস্পন্দ নিরাকার অবর্ণনীয় প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়া যাই। বিশ্বপ্রকৃতি হইতে আলাদা আমি আমার চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করি। জানাজানি নাই, কিন্তু আমি আছি। সুষুপ্তির জানাজানি-বিহীন অবস্থা আমরা বিনামূল্যে প্রত্যহ পাই—কিন্তু সমাধি-চিত্ত-নিরোধকে হাতে পাইতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়—জীবনভর সাধনা করিয়াও উহা লাভ করা অনেক ক্ষেত্রে দুর্লভ রহিয়া যায়। সুষুপ্তি ও সমাধির ফলেও বহু প্রভেদ। প্রথমটীর দ্বারা শরীর মনের একটা স্নিগ্ধ সতেজ ভাব ছাড়া আমার প্রবৃত্তি, আশা আকাঙ্ক্ষারাশির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখি না। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া, চরিত্রের দিক দিয়া আমি যাহা ছিলাম তাহাই থাকি। সমাধি হইতে নামিয়া কিন্তু আমার নিজ ব্যক্তিত্বের একটী আমূল বিপ্লব লক্ষিত হয়। অন্তরের কুটিল কামনারাশি শান্ত হইয়া গিয়াছে—জগৎসংসারের উপর সমস্ত টান যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে—আমি যেন এক নূতন আমি।

সুষুপ্তির "অচৈতন্য" অবস্থা এবং সমাধি-"চৈতন্য" অবস্থা হইতে মনসম্পর্কিত শিক্ষাটী কিন্তু এক—মন আমার চিরকালের সাথী নয়, আমি মন হইতে আলাদা, মন বিনাও আমার অস্তিত্বের লোপ হয় না। কিন্তু জাগ্রত জীবনে আমি মনের সঙ্গে এমন মিশিয়া যাই কি করিয়া? জাগরণে মন যখন সক্রিয় হয় তখন এমন রুদ্র রূপেই সে হাজির হয় যে আমি ভয়ে অস্থির হই, আমি ইচ্ছা করিলে তাহার তোয়াক্কা না রাখিয়াও চলিতে পারি—নিজের এই প্রচ্ছন্ন শক্তিটীর কথা একেবারেই যেন ভুলিয়া গিয়াছি। মনের সঙ্গে তখন আর আমি পারি না।

* * * *

সুষুপ্তি ও সমাধিতে আমি থাকি, কিন্তু কোথায় থাকি, কখন থাকি, কেমন থাকি তাহা সেই অবস্থায় জানি না। অর্থাৎ দেশ, কাল ও কার্য্য-কারণের জ্ঞান তখন নাই, কেন না যাহা দ্বারা দেশকালের জ্ঞান হইবে সেই মনই তখন রঙ্গভূমিতে নাই। অস্তিত্ব অস্তিত্বে মিশিয়া গিয়াছে—বোধের সহিত বোধ তখন একাকার—আমার যেন তখন কোন বাধা নাই, সীমা নাই—আমি তখন অনন্ত অখণ্ড জন্মহীন মৃত্যুহীন।

জাগিলে আমার এই বৃহৎ পরিচয়টী বিলুপ্ত হয় কেন? জাগ্রত জীবনের অসংখ্য ব্যাপৃতি,

অজস্র কোলাহলের মধ্যেও আমার উক্ত নির্ব্বাধ নিরাকার সত্তাকে ধরিতে পারা যায় না কেন? উপনিষদ্ বলেন তাহা আমারই মূর্খতার জন্য। আমার ঐ পরিচয় সর্ব্বদাই আমি ঘোষণা করিতে পারি—মুখের কথা নয়, সত্য কথা। আমার উক্ত বৃহৎ সত্তাটী কখনো হারাইয়া যায় না—উহাই আমার আসল আমি, মন আমার আসল আমি নয়—আমি মন নই। মনের সহিত যে আমার ঘরকন্না তাহা একান্তই পান্থশালায় দুদণ্ডের পরিচয় মাত্র। আমার যে আপন ঘর সে ঘরে মনের স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর—কাহারও সুদীর্ঘ জীবনে কোন একদিনকার একটা তুচ্ছ ঘটনা যতটুকু স্থান অধিকার করে ততটুকু।

মন নাচিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে—নাচুক, হাসুক, কাঁদুক। আমার কিছু আসিয়া যায় না। শত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ, চপলতা, জড়তা, মূঢ়তা—মনের এই সকল স্বভাব দেখিয়া আর আমি ব্যাকুল হইব না। মনকে নিগ্রহ করিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

ঘুমাইয়া মনের বিজৃম্ভন হইতে নিষ্কৃতি খুঁজিবার আর আবশ্যক কি? মনের সহিত বিযুক্ততার যে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি তাহা তো সর্ব্বদাই আমার করতলগত। আমি তো সর্ব্বকালেই মন হইতে বিযুক্ত। শুধু তথ্যটী ভুলিয়া না গেলেই হইল।

মহাসমুদ্রের বুকে অসংখ্য ঢেউ উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে—সমুদ্রের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সমুদ্র অকম্পিত, অক্ষোভ্য, প্রশান্ত। তাহার স্বভাব তরঙ্গের স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু একটী প্রশ্ন জাগে—তরঙ্গের উপাদান আর সমুদ্রের উপাদানে কোন তফাৎ আছে কি? উভয়ই তো জল। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইলে তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে আলাদা বলিতে পারি না। তরঙ্গ কিছু সমুদ্র ছাড়া থাকে না।

ঠিক এই ভাবেই মনের প্রকৃতি এবং কার্য্য আমার প্রকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া দেখিলেও মূলতঃ মন আমা হইতে ভিন্ন নয়। মনের মনত্ব আমারই নিকট হইতে পাওয়া। আমাতেই মনের জন্ম, স্থিতি এবং লয়। আমি জমাটবাঁধা অপরিমেয় জ্ঞান শান্তি এবং শক্তির আকর স্বরূপ। তাহারই এক কণা লইয়া মনের জানাজানি, আনন্দ এবং ছুটাছুটি।

মন ও আমার ইহাই সত্য পরিচয়। এই পরিচয় জানিলে মন হইতে আমার ভয় পাইবার, চঞ্চল হইবার কিছু থাকে না। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবারও প্রশ্ন উঠে না। বহুরূপীকে চিনিতে পারিলে সে আর ছদ্মবেশের খেলা দেখাইতে পারে না। মনের প্রত্যেকটী বৃত্তি, প্রত্যেকটী স্পন্দন সনাতন অব্যয় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রকাশিত এই রহস্যটী হৃদয়ঙ্গম হইলে মন আর আমাকে ভেল্কি দেখাইতে পারে না। আমার সহিত মনের সকল বিরোধ মিটিয়া যায়।

বাউল গান

শ্রীগোপীনাথ সেন

লোক-সঙ্গীতে যত প্রকার গান আছে তাহার মধ্যে বাউল গান হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়কে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। এই গানের ভিতর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সাধনার মূল উপাদান আছে। বাউল সাধনার অতীত ইতিহাস আমরা বৌদ্ধযুগ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভাঙ্গনের পরও বাংলায় অনেক বৌদ্ধ সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা নাথ অর্থাৎ যুগী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। বাউল-সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথ-সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে। তান্ত্রিক যুগে তাঁহাদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট, উভয়েই মায়াবাদ স্বীকৃত। মুসলমান সুফীগণও কতকটা এইমত পোষণ করেন। বাউলেরা সুফীদের মত ভ্রমণশীল। বৌদ্ধপ্রভাবিত বাউলগণ একটি বিশিষ্ট যোগসাধনার সুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের আলখাল্লা, লম্বা গেরুয়া রঙের পোষাক, লম্বা বাবরি চুল ও গোঁফ দাড়ি এবং সহজভাবে জীবনযাপন করিবার প্রণালী বাউল-সম্প্রদায়ের ভিতর দেখা যায়। বাংলার সহজিয়া মতের প্রভাবও বাউল সম্প্রদায়ে দেদীপ্যমান। বাউলরা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, হিন্দুদের ভক্তি ও সুফীদের প্রেম এই তিনটির সমন্বয় করিয়া নব ধর্ম্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শূন্যবাদ বাউলদের শূন্যতত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রচারিত।

বাউল সাধকেরা যে তন্ত্রোক্ত যোগও অভ্যাস করিতেন তাহা তাঁহাদের উপাসনায় দেখা যায়। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী উচ্চাঙ্গের। ষট্‌চক্র-ভেদপ্রণালীতে বাউল সাধকগণ শূন্যের উপাসনা করিতেন। পদ্মাসনে বসিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রাখিয়া অরূপের চিন্তা এই সম্প্রদায়ে প্রচলিত। তাঁহাদের এই সাধনা নির্ব্বাণ লাভের উপায়। তাঁহারা পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক কিছুই মানেন না। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর বস্তু মিথ্যা। কেবলমাত্র অরূপই সত্য। তাঁহারা এই অরূপের প্রেমে বিহ্বল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের শেষ চিহ্ন বাউল-সম্প্রদায় পরে হিন্দু ও মুসলমান মত গ্রহণ করিয়া নব ধর্ম্মের প্রচার করে। এই সম্প্রদায়-মতে মানুষ উচ্চস্তরে উঠিলে তাঁহার আর কোন সংসারের উপর মায়া থাকে না। তিনি সব সময়ই ভাবে বিহ্বল হইয়া সাধনা করেন। এইরূপ সাধক 'পাগল' বলিয়া অভিহিত। বাউলদের পরিচয় তাঁহাদের গানেই পাওয়া যায়। তাহাদের গানগুলি সকলের প্রাণ মন এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবে ভরপুর করিয়া তোলে। বাউলের গানের অন্তঃস্পর্শী মর্ম্ম যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাদের মনের আবদ্ধ বাতায়ন আপনি খুলিয়া যায়। এই জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার নাশ হয়। বাংলায় বাউল গান যে লোকের অন্তঃস্পর্শী ইহাই তাহার কারণ।

বাউল-সম্প্রদায় গুরুবাদী অর্থাৎ গুরু-উপাসক। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র গুরুকে খুব উচ্চ সম্মান দিয়াছে। যতদিন না জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে ততদিন গুরু ছাড়া সব সাধনাই বৃথা। ইহকাল ও পরকালের পথপ্রদর্শক ও সকল জ্ঞানমার্গের নির্দ্দেশক গুরু—তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সকল সাধনা পণ্ড। সাধনায় কাহার পক্ষে কোনটি সহজ পথ তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন গুরু। এই গুরু নির্ব্বাচন করা কঠিন সমস্যা। যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন এবং পরলোকের

খবর দিতে পারেন, তিনিই গুরু বলিয়া অভিহিত। নিম্নোক্ত বাউল গানটিতে গুরুর মহিমা প্রকট—

"গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না।
গুরু তুমি হে খোদারই দোস্ত, অপারের কাণ্ডারী,
তুমি দেখা দিয়ে ওহে রছুল ছেড়ে যেও না,
ছেড়ে যেও না
গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না।
গুরু আশা দিয়ে আনলে পথে, তুমি চল্লে গো
আসমানেতে
ওরে আসমানেতে আয়েন ভারী আছে সান্তানা
আছে সান্তানা
গুরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না

গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস থাকিলে সাধক ভবনদী পার হইয়া যান। যে কোন বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন গুরুর নাম স্মরণ করিলে সকলেই উহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বৈষ্ণব সাধনায়ও গুরুর স্থান খুবই উচ্চে। এইজন্য অনেকের ধারণা বাউলরা বৈষ্ণব। বাউলরা বৈষ্ণবদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ১৪শ শতাব্দীতে বাংলায় বাউলসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এই সময়ে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বাংলার জনসমাজকে প্রভাবিত করে। তখন বাউলেরা বৈষ্ণবদের মত কৃষ্ণ ও রাধাকে আশ্রয় করিয়া বহু গান রচনা করেন।

বহু বাউল গান রচিত হইয়াছিল জন্মে হিন্দু ও ধর্ম্মে মুসলমান বাউলদের দ্বারা। তাঁহারা খুব শিক্ষিত না হইলেও কিছু কিছু লেখাপড়া জানিতেন। বাউল গায়কদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লালন ফকির, সিরাজ সাঁই, পাঁচু ফকির ও অন্যান্য বাউল সাধকের কথা আমরা তাঁহাদের রচনা হইতে জানিতে পারি। এই সকল সাধকদের রচনা যেমন গভীর তেমনি মরমী। বাংলার লোকসাহিত্য পাঠে জানা যায় যে বাংলার সংস্কৃতি বাউল সাধকেরা ঘরে ঘরে বিস্তার করিয়াছিলেন।

বাউল গান কোন কোন স্থলে মারফতী গান নামে পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের মধ্যে আব্দুল্লা, আব্দুর রহিম, রশিদ, মনোমোহন প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত। বাউল গানের সহিত ভাটিয়ালী গানেরও মিল দেখা যায়। পশ্চিম-বঙ্গে বাউল গানগুলি বৈষ্ণব ভাবমূলক। উহা কীর্ত্তনরূপে আজিও গীত হইয়া থাকে। বাউলরা বলেন যে বাউলগানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর ভিতর হইতে সঙ্গীত নির্গত হয়। বাংলার লোক-সঙ্গীতে মুর্শিদ, ফকির ও দরবেশের গান বাউল গানের অনুরূপ। বাউলরা গানের তালে তালে নৃত্যও করেন। বাউল গানে বাংলার পল্লীসমাজ ও সাহিত্য অনেকটা প্রভাবান্বিত।

রবীন্দ্র-সংগীতেও বাউলের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বাউল বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি। সেগুলা স্পষ্টতর রবীন্দ্র বাউল রচনা।" তিনি বাউলের মুখে গান শুনিয়াছিলেন ও বাউলবেশে তাঁহাদের প্রণালী অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি অশিক্ষিত বাউলদের গানে উপনিষদের মর্ম্মবাণী শুনিয়া বাউলদের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তর-তর যদয়মাত্মা উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম তখন আমার মনে বিস্ময় লেগেছিল।"

বর্ত্তমানে বাউলসাধনা বাংলায় ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এখন গ্রাম্য অশিক্ষিত বাউলেরা বহু শতাব্দীর পূর্ব্বেকার সাধনার ধারা মাত্র বহন করিয়া চলিতেছেন। বাউল সাধকপরম্পরায় তাঁহাদের গানগুলি মৌখিক চলিয়া আসিতেছে। এইগুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। তবে কালক্রমে যে লুপ্ত হইবে ইহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণকে এই সম্পদ রক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞান

শ্রীঅনিলকুমার রায়

বর্ত্তমান সভ্যতারূপ সুদৃশ্য সৌধ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার-ভিত্তির উপর স্থাপিত। আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গর্ব্ব করে থাকি বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান জগতের নিত্য নূতন আবিষ্কার গুলোর দিকে লক্ষ্য করেই। দিনের পর দিন বিজ্ঞান তার আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার গুলোর মধ্য দিয়ে জগৎটাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এতে সভ্যতাও ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করছে। জন্মের আদি থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে চলেছে। প্রকৃতি নিয়তই মানুষের প্রগতিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। মানুষও তাই প্রকৃতিকেই মনে করে তার সব চেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু আজ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে মানুষ প্রকৃতির উপর ক্রমেই অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করছে। এখন পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষ দূরতম অপর প্রান্তের সংবাদ নিতে সমর্থ হ'চ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির গুণে। মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে অর্থনীতির যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে বিজ্ঞানের দৃষ্টি তা' এড়িয়ে যায় নি। অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে এই বিশেষ প্রকার সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান-জগতের প্রভুত্বের এই দিকটা অতি সহজেই ধরা দেবে। বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বৈদ্যুতিক আলো পাখা ব্যবহার করতে শিখেছি, বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে রাঁধতে শিখেছি। সত্যই অর্থ, শ্রম ও সময়ের লাঘব করে বিজ্ঞান আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিকে সহজ, সরল ও সুন্দর ক'রে দিয়েছে। এমনি ধারায় বিজ্ঞান একাধারে মানব-সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন ক'রে যেমন মহামানবের সেবা ক'রে চলেছে তেমনি অন্যদিকে স্বীয় একাধিপত্য ঘোষণা করছে জলে, স্থলে, শূন্যে। সক্রিয়ভাবে প্রকৃতির মহাপরাক্রমশীল উপাদান-গুলোর উপর তার প্রভাব বিস্তার করছে। তারাও আজ তাই মানবতার সেবাকার্য্যে একান্ত বাধ্য ও বশীভূত ভৃত্যের মতই ব্রতী রয়েছে। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে আজ করেছে পরম মিত্র। টেলিভিসন, গ্রামোফোন, এরোপ্লেন, রেডিও প্রভৃতি মানব-কল্যাণকর আবিষ্কারগুলোর দ্বারা বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বকে দিয়েছে তাক লাগিয়ে। এগুলি শুধু বিজ্ঞানের বাহ্যিক দিক। বিজ্ঞানের আভ্যন্তর দিকের উন্নতি আরও বিস্ময়কর। এই দিকটি মানব-মনের আনাচে কানাচে এমনিভাবে প্রবেশ করেছে যে সমগ্র চিন্তা-জগতে এক নূতন বিপ্লব এনে দিয়েছে। এতদিন মানুষ বিরাট, অসীম ও ভূমা ব'লে যার কল্পনা করত বিজ্ঞান তাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দিতে চাচ্ছে। বিজ্ঞান অনন্ত মহাসাগরের গভীরতম নিম্নপ্রদেশ থেকে বিশালকায় পর্ব্বতের অত্যুচ্চ তুহিন শিখরে আরোহণ করে অসীমের বাঁধন ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছে —আর ক্ষুদ্রকে বসাতে চেষ্টা করছে মহীয়ান করে বৃহতের কোলে। তার চেষ্টায় অসীম রহস্যময়ী প্রকৃতির অবগুণ্ঠন যেন ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে— আজ বিশ্ব তার রূপের আলোকে উদ্ভাসিত! বিজ্ঞান এমনি ভাবে তার মোহিনী শক্তিপ্রভাবে তার যাদুকর স্পর্শে বিশ্বের রূপ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। বিজ্ঞান অন্ধকে দিয়েছে দৃষ্টি, বধিরকে

দিয়েছে শ্রবণ-শক্তি, এমন কি মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ জুগিয়েছে—মৃতপ্রায়ের প্রাণ-সঞ্চারণে। শুধু তাই নয়—কৌশলী অস্ত্র-চিকিৎসায় আজ জীবযন্ত্রেরও মেরামতি চলেছে সাধারণ যন্ত্রের মেরামতির মতই। যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গুণকীর্ত্তন করছি তার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য জাতির এক বিশেষ অবদান। আজ সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য জাতির বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ফলেই। পাশ্চাত্য জাতি যে প্রতিভার উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে তা যদি সত্যই ব্যষ্টিস্বার্থের জন্য কূট রাজনৈতিক মনোবৃত্তি নিয়ে বিজ্ঞানের মোহিনীশক্তির অপব্যবহার না করত, তা হ'লে হয়ত মানুষ চির শান্তির আলয় ব'লে যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করে তার সন্ধান পেত এই মর্ত্ত্য জগতেই। পাশ্চাত্য জাতির এই ক্ষুদ্র ব্যষ্টিস্বার্থ বিসর্জ্জনের ফলে তার বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সমবায়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠত সেই সভ্যতাই হ'ত জগতের ভাবী সভ্যতা। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাদের শক্তির অপব্যবহার করছে বলেই পাশ্চাত্য সভ্যতা জগৎ-সভ্যতার অনুমোদন লাভ করতে পারছে না। এর প্রমাণ আমরা পেতে পারি পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানের সৃষ্টির দিকের কথা বাদ দিয়ে তার প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসাত্মক দিকের কথা চিন্তা করলেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই ধ্বংসাত্মক মূর্ত্তির নিষ্ঠুর প্রকাশ হচ্ছে আধুনিক মহাসমরে ব্যবহৃত আণবিক বোমা।

বিজ্ঞানের আধুনিকতম এই মারণাস্ত্রটির যে কি ভয়ঙ্কর রকমের ধ্বংসকরী ক্ষমতা তা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। এক কথায় জাপানের উপর আমেরিকার এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের ফলেই এবারকার বিশ্বসমরের অবসান ঘটেছে। বিজ্ঞানকে আমরা পরম বন্ধু ব'লে জানি, কিন্তু আণবিক বোমা তৈরি করে বিজ্ঞানকে করে তুলেছে মানুষের পরম শত্রু। সত্যই বিজ্ঞানের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! আজ যেখানে ধনধান্য তরুলতায় ধরণী নবীন বেশে সজ্জিতা, ব্যষ্টিস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যই কাল সেখানে আত্মপ্রকাশ করছে শুধু ধূধূ বালুকণা—মানব-হৃদয়ের নির্দ্দয়তম পরিচয়! আজ যেখানে বইছে সৌম্য-শান্তির পবিত্র আবহাওয়া, কাল সেখানে রণ-দামামার নির্ঘোষ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মহাপ্রলয়ের বিষাক্ত বাস্তবতা! আজ যেখানে কোটি কোটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির আবালবৃদ্ধবনিতার আনাগোনা, কাল সেখানে ছুটেছে হৃদয়ফাটানো রক্তের অফুরন্ত প্রবল বন্যা!

ব্যষ্টিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য জাতি যে বিজ্ঞানের বলে অনর্থ সৃষ্টি করছে সেই বিজ্ঞানই আধুনিক জগৎ-সভ্যতার মূল। কিন্তু এই সভ্যতার সহৃদয়তা, শিষ্টতা, উদারতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত মনোবৃত্তিনিচয়ের অভিব্যক্তির পরিচয় আমরা পাই না। পক্ষান্তরে কূট রাজনৈতিক মনোবৃত্তির বশে বর্ত্তমান জগৎ-সভ্যতার যবনিকার অন্তরালে দেখতে পাই মানব-মনের জঘন্যতম জটিলতা, নির্দ্দয়তা ও স্বার্থপরতা, সমষ্টির শান্তি ও সুখের বিনিময়ে নিছক ব্যষ্টিস্বার্থসিদ্ধি এবং হৃদয়হীন বর্ব্বরতার অভিব্যক্তি। মানুষ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে তখনই—যখন অপর ব্যক্তি তার সত্য, ন্যায় ও মর্য্যাদার উপর করবে হস্তক্ষেপ, অথবা এক জাতি অপর এক শান্তিকামী জাতিকে অযথা আক্রমণ করে তার জীবন ও সংস্কৃতির উপর হানবে আঘাত। নইলে স্রষ্টার সৃষ্টিমাহাত্ম্যের পরিচয়ই বা কোথায়? মহাভারতের যুগ প্রকৃত সভ্যতার অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে ছিল সে বিষয়ে আমাদের তর্কের প্রয়োজন নেই; তবে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের "সীদন্তি মম

গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি” উক্তির প্রত্যুত্তরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুকূলে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাতে সত্যই মনে হয় প্রকৃত সভ্যতার যুগ বুঝি চলে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধ ব'লে অভিহিত করা হয়। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব তার মানবতায়। জগতের সমুদয় সৃষ্ট জীব থেকে মানুষকে পৃথক করা যায় যে গুণে সে হচ্ছে তার বিচারশক্তি, তার বিবেকবুদ্ধি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কুকুর-বিড়ালের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একে অপরের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না; কিন্তু মানুষ যদি মানুষের বাসভূমি আক্রমণ করে, তার গ্রাস ছিনিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ না করে, তাহ'লে সে সভ্য বলে অভিহিত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

যে সভ্যতায় স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়ে যায় ধ্বংসের লীলায়, যে সভ্যতায় বিশ্বশান্তির পরিবর্ত্তে হানাহানি চলে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির, সাম্যের পরিবর্ত্তে চলে অসাম্যের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অন্যায় অত্যাচারকে মেনে নেওয়া হয় নিয়ন্তার অমোঘ বিধান বলে, যে সভ্যতায় “Survival of the fittest” শুধু যোগ্যতমেরাই বাঁচবার অধিকারী, বাকী সমুদয় প্রাণী শুধু মরবার জন্যই জন্মেছে ব'লে স্রষ্টার সৃষ্টির অহেতুকতা প্রমাণ করছে, সে সভ্যতা স্বার্থান্ধ, ভোগলিপ্সু, অর্থ ও রক্তপিপাসু পৈশাচিক সভ্যতার নামান্তর মাত্র। এমনতর সভ্যতা বিবেকী মানুষের কখনও অনুমোদন লাভ করতে পারে না।

মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে আজ মানব-প্রতিভার চরম উৎকর্ষের দিনে বিশ্বসভ্যতা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না কেন? কারণ, এর পিছনে রয়েছে মানব-মনোবৃত্তিনিচয়ের দু'টী বিভিন্ন ভাবের দ্বন্দ্ব। একটী হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা—আর একটী মানব-মনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। এই ভিন্ন মনোবৃত্তি দুটীর সমন্বয় ভিন্ন পূর্ণ সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। জনৈক মনীষী লিখেছেন:

“Religion uncontrolled by science may lead us to superstition and science unaided by religion would make us dogmatic.”

দুটি দিকের একটা দিকও যতদিন একগুঁয়ে রকমে পক্ষপাতিত্ব করে চল্‌বে ততদিন সভ্যতা কোনপ্রকারেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। দেখা যায়, বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেই মানুষ বর্ত্তমানে সভ্যতার এমন এক স্তরে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে তার বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অতিমানব (Superman) সৃষ্টির অনুসন্ধানও সে করছে। তবে এখানেও আমাদের দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে যাতে সভ্যতার অগ্রদূতগণ সামঞ্জস্যকে অতিক্রম করে জগৎসৃষ্টির Positive aspectএর দিক ভুলে Negativeএর দিকে ঝুঁকে না পড়েন। নতুবা শুধু কূট রাজনীতিমূলক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে তাতে জগতে নব বিধান সৃষ্টি অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিকের সুকুমার ধর্ম্মপ্রবণ মনোবৃত্তি নিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে—যে সভ্যতা মানুষের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিস্বার্থের বহু উর্দ্ধে শির উঁচু ক'রে বিশ্বের সামনে দাঁড়াবে, সেই সভ্যতাই হবে সত্যিকারের সভ্যতা, সেই সভ্যতাই সমর্থ হ'বে জগতের প্রকৃত নববিধান আনতে। দেশ, জাতি, মানবতার পক্ষ থেকে আমরা অদূর ভবিষ্যতের পানে পথ চেয়ে সেই সভ্যতার জন্যই অপেক্ষা করছি।
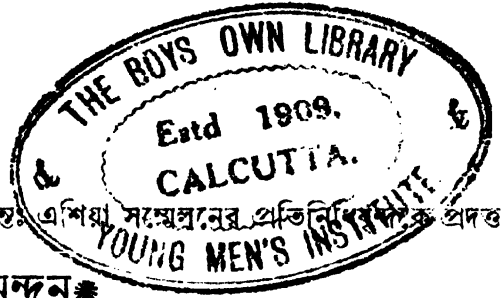
গত ৩১ শে মার্চ নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে প্রদত্ত

অভিনন্দন*

এশিয়ার ভ্রাতা-ভগিনীগণ,

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে আজ আপনাদিগকে অভিনন্দিত করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এশিয়াবাসী হিসাবে আপনাদিগকে ভালবাসা ও প্রীতি সহকারে অভিনন্দিত করবার এই সুযোগ দানের জন্য আমরা 'ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড্‌য়্যাফেয়ার্সে'র নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবুদ্ধ এশিয়ার আন্তরিক অনুপ্রেরণায় আপনারা ভ্রমণ-জনিত ক্লেশ ও অন্যান্য অনেক অসুবিধা উপেক্ষা করে এই মহাদেশের জনগণের জীবনের একটি সাধারণ ভিত্তি বের করবার জন্য এই বিশাল ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে সমবেত হয়েছেন। প্রধানতঃ ভৌগোলিক পরিস্থিতি অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য আমাদের পরস্পরকে জাতি সংস্কৃতি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিভিন্ন দেখাতে পারে, কিন্তু বর্তমান জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে আমাদের মাতৃভূমি এশিয়ার সহ-নাগরিক হিসাবে যদি আমরা বন্ধুভাবে শান্তি-সুখে বাস করতে চাই, তবে আমাদিগকে এমন একটি একত্ব গড়ে তুলতে হবে, যা কেবল আমাদের বিভেদের সামঞ্জস্য করবে না, পরন্তু আমাদের পরস্পরকে বুঝতে এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মহত্তর প্রগতি লাভ করার জন্য যা জগতের প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধতার জন্য এখনও অলভ্যই রয়েছে, তা লাভ করবার জন্য একযোগে কাজ করতে সহায়তা করবে।

আমরা নিশ্চিত যে বিশ্বশক্তি—আধ্যাত্মিক ভাষায় যাকে ভগবদিচ্ছা বলা হয়, তাই আপনাদিগকে এখানে মিলিত করেছে। আমরা এ বিষয়েও নিশ্চিত যে সেই বিশ্বশক্তিই 'ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড্‌য়্যাফেয়ার্স'কে তার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করেছে এবং উহাই আপনাদের পরিশ্রমকে সাফল্যমণ্ডিত এবং নব যুগের অভ্যুদয়ের অগ্রদূতরূপে আপনাদিগকে পরিচিত করবে।

আমরা রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ এই মহান্ ব্রতে আপনাদের সহকর্মী। আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থেকেও আমরা অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল এই মহান্ উদ্দেশ্যে বিশ্বমানবের সেবা এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে আসছি। আমরা দেখে অত্যন্ত সুখী এবং উৎসাহিত হয়েছি যে দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা যে কার্যে নিয়োজিত, আপনাদের অধিবেশনে আপনারাও সেই আন্তঃ এশিয়া সংস্কৃতিগত মিলন স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনুষ্য-জীবনের বহুত্বের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে যে একত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আদর্শ কার্যতঃ রামকৃষ্ণ মিশন উপলব্ধির চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবল একজন দার্শনিক অথবা সকল ধর্মের সারগ্রাহী স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না, পরন্তু তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন এবং তাঁর নিকট উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ যেমন

* ইংরেজী হইতে অনূদিত।

কিছু ছিল না, তেমন বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য মহৎ বা দিব্য কিছুই ছিল না। তিনি গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসহায়ে বুঝেছিলেন যে যতদিন মানুষকে দুঃখ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, ততদিন মানুষের উন্নতির আদর্শ ও লক্ষ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের পরিব্যক্তি হবে না। এই জন্য তিনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে কেবলমাত্র আত্মার মহত্ত্ব প্রচারের ভারই অর্পণ করেন নি পরন্তু অদম্য শক্তিতে মানুষের শারীরিক এবং পার্থিব দুঃখ দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী আমরা মানব-সেবায় কোন রকম ভৌগোলিক সীমা অথবা ব্যক্তিগত মতবাদ এবং সমাজগত, জাতিগত বা বর্ণগত কোন পার্থক্যের সীমা স্বীকার করি না। এই জন্য আমাদের অধিনায়কের ভাষায় একমাত্র যে ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁকে আমরা একমাত্র ভগবান বলে বিশ্বাস করি, সেই সকল জীবের সমষ্টিভূত আত্মার পূজার জন্য সহস্র সহস্র দুঃখ ভোগ করে বার বার জন্মগ্রহণ করাকে এবং সর্বোপরি আমাদের বিশেষ পূজ্য, আমাদের পাপী ভগবান, আমাদের দুঃস্থ ভগবান, আমাদের সমস্ত জাতির দরিদ্র ভগবানের সেবাকে আমরা আদর্শ বলে আমাদের সম্মুখে ধরেছি। মিশন ভারতবর্ষে এবং বাইরে আর্জেনটিনা, ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় ১৫০টি কেন্দ্র স্থাপন করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রেম ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজ চালাবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে যে রাজনীতিক, সামাজিক বা জাতিগত দ্বন্দ্ব চলছে, এ সবের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমরা এই আদর্শের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে সকল জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিপুষ্টির জন্য আমরা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় একটি সংস্কৃতি-সংসদ স্থাপন করেছি। সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইহার সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ এবং তাঁর সহকর্মী ডাঃ কালিদাস নাগ আপনাদিগকে অভিনন্দিত করবার জন্য আজ এখানে উপস্থিত।

মিশন যে সামান্য কৃতকার্যতা লাভ করেছে তার পশ্চাতে রয়েছে আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা এবং আদর্শের উপলব্ধি। ভবিষ্যতে আপনাদের নিকট আমরা অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতির আশা করি।

যাঁকে আমরা হিন্দুদের ব্রহ্ম, জরথুষ্ট্রানুগামীদের অহুর মজদা, বৌদ্ধদের বোধি, ইহুদীদের জিহোবা, কংফুসীয়দের জ্ঞান ও নিয়ম, খ্রীষ্টানদের স্বর্গস্থ পিতা এবং মুসলমানদের আল্লা বলি এবং যাঁকে আপনারা সৃষ্টি-বিবর্তের আভ্যন্তর মহাশক্তি বলতে পারেন, তিনি আপনাদের এই মহৎ কার্য-সাধনে আপনাদিগকে শক্তি দিন।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন,
নিউ দিল্লী।
৩১শে মার্চ, ১৯৪৭।

রবীন্দ্রনাথের ভজন-সঙ্গীতের একটি সুর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অহংবোধ, অভিমান বা আমিত্বই আমাদের জীবনের ভার ও জঞ্জাল। এই আমিত্বকে বর্জ্জন করিতে পারিলেই আত্মবিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সাধনা বাধামুক্ত হয়। এই কথা কবি বহু কবিতায় বলিয়াছেন। একথা ভারতীয় সাধনার মূল কথা। রাজা নাটকে কবি এই সত্যকেই রসরূপ দিয়াছেন। কবি তাঁহার অজানা অসীমের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

আপনার কাছ হ'তে বহুদূরে পালাবার লাগি,
হে সুন্দর হে অলক্ষ্য তোমার প্রসাদ আমি মাগি
তোমার আহ্বান বাণী।

এই আমিত্বকে তিনি ভারস্বরূপ মনে করেন—ইহাতেই তাঁহার আত্মার দৈন্য। তাই বলিয়াছেন—

আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হ'য়ে রইব না।

এই আমিত্ববোধ থাকিলে প্রভুর দ্বারে যাওয়া সম্ভব নয়।

একলা আমি বাহির হ'লাম তোমার অভিসারে
সাথে সাথে কে চলে মোর নীরব অন্ধকারে?
সে যে আমার আমি প্রভু লজ্জা তাহার নাই যে কভু
তারে নিয়ে কোন লাজে বা যাব তোমার দ্বারে।

কবি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন—

নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু,
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

আমিত্বের বোঝাই যদি দুই কাঁধ জুড়িয়া থাকে, তবে প্রভুর ভার বহিবার সুযোগ বা শক্তি কোথায়? তাই কবি বলেন—

আমার বোঝা এতই করি ভারী
তোমার ভার যে বইতে নাহি পারি।
আমারি নাম আমার গায়ে লিখা
হয়নি পরা তব নামের টীকা।
তাইত আমায় দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।
আমার ঘরে আমিই শুধু থাকি
তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি,
বাঁচিয়ে রাখি যা কিছু মোর আছে
তার ভাবনায় প্রাণ ত নাহি বাঁচে,
সব যেন মোর তোমার কাছে হারি।

কবি বলিয়াছেন—আত্মতন্ময়ত ভাবও একটা বন্ধন।

আপন মাঝে আপন জীবন দেখে যে মন কাঁদে,
নিমেষগুলি শিকল হ'য়ে আমায় তখন বাঁধে।

আত্মার জীর্ণ মলিন বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বাস পরিধান করার নাম নব জন্ম। মলিন অহংকারের বসন ত্যাগ করিতে পারিলে তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে নবজন্ম লাভ ঘটে। কবি বলিয়াছেন—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে হবেগো এইবার
আমার এই মলিন অহংকার।

এই আমিত্বের অহংকার বিনা সাধনায় দূর হয় না। কবি বলেন—আমার যে সাধনা নাই। তুমি কৃপা করিয়া নিষ্ঠুর আঘাতে আমার অহংকার চূর্ণ কর—আমাকে তোমার চরণের যোগ্য কর।

নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে
গলাও হে মন ভাসাও জীবন নয়নজলে।
একা আমি অহংকারের উচ্চ অচলে
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও ভাঙো সবলে।

* * *

মোর—যত কঠিন গর্ব্ব তারে হানো ততই বলে
তাহা—পড়ুক পায়ে লুটি।

পরম বৈষ্ণব ভক্তের চরম আকিঞ্চন যাহা কবি তাহাকে বাণীরূপ দিয়া বলিয়াছেন—

গর্ব্ব আমার নেই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়বে না কেউ কভু
নাই বসালে তোমার কোলের কাছে
পায়ের তলে সবারি ঠাঁই আছে।
ধূলার পরে পাতব আসনখানি।

* * *

আমি অধম অবিশ্বাসী
এ পাপমুখে সাজে না যে তোমায় আমি ভালবাসি।
গুণের অভিমানে মেতে আর চাহিনা আদর পেতে
কঠিন ধূলায় ব'সে এবার চরণসেবার অভিলাষী।

বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস, লোচন দাস, বলরাম দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের দৈন্য ও আকিঞ্চনই এই সকল বাণীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে।
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
যাচিহে তোমার পরম শান্তি পরাণে তোমার
পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।

এই গানটি দিয়া গীতাঞ্জলির সূত্রপাত হইয়াছে। গীতাঞ্জলির অধিকাংশ কবিতায় এই নিরভিমান দৈন্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে। আর একটি গানের অর্দ্ধাংশ—

অহংকারের মিথ্যা হ'তে বাঁচাও দয়া ক'রে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান।
আর সকলের দৃষ্টি হ'তে সরিয়ে নিয়ে মোরে
কর তোমার নত নয়ন দান।

আমার পূজা দয়া পাবার তরে
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে
নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধূলার প'রে বসে
নিত্য নূতন অপরাধের মাঝে।

তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব সাধকদের বাণীও ইহাই। আমিত্ব বর্জ্জনের সঙ্গে আত্মসমর্পণের সম্পর্ক। ভক্ত শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। ভক্তের এই আত্মনিবেদিত ভগবন্নির্ভর ভাব কোন কোন গানে পরিস্ফুট হইয়াছে। নিজের চিন্তাকুল সংশয়ী মনকে আহ্বান করিয়া অভয় দিয়া কবি বলিয়াছেন—

তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে সেই করিবে পার।

ভগবানের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

আমি হাল ছাড়লে পরে তুমি হাল ধরবে জানি
যা হবার আপনি হবে মিছে এই টানাটানি।

এইরূপ ভাগবত বিধানে নির্ভরকেই খ্রীষ্টধর্ম্ম বলে—Faith. এই Faith-ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল কথা। কবি পিয়ার্সন সাহেবের মধ্যে এইরূপ ভগবন্নির্ভর প্রকৃত খ্রীষ্টান ভক্তের ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে বলাকার উৎসর্গ কবিতায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

ভগবানে পরম নির্ভর ও আমিত্ববর্জ্জন একই বস্তু। কবি তাঁহার ঐ খ্রীষ্টান বন্ধুর মধ্যে দুইই একসঙ্গে অর্থাৎ প্রকৃত খ্রীষ্টানত্ব ও প্রকৃত বৈষ্ণবতার সমাবেশ দেখিয়াছিলেন—

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই
সবার পিছনে নিজেরে গোপন রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু রাখে না নিজের জন্য
তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

যে ভক্ত আমিত্ব বর্জ্জন করিয়াছে তাহার প্রতি কবির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ইহাতে সূচিত হইতেছে ধন-জন-মান ভক্তের সহিত ভগবানের ব্যবধান রচনা করে। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন —শ্রীমতী কণ্ঠে হার পরেন না—এমন কি চুয়া-চন্দনচীরও বক্ষে ধারণ করেন না—পাছে প্রিয়ের সঙ্গে ব্যবধান ঘটে। অহংকার যে মাঝে পড়ে মিলনেতে আড়াল করে। কবি জন-ধন-মানকে এই চুয়া চন্দন চীরের মত—মণিহারের মত বর্জ্জন করিতে বলেন।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে,
পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুরত নাহি সরে
ঐ দিকে যে মন পড়ে রয় মন লাগে না কাজে।
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।

কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো—
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর

কবি বলেন—ইহারা অর্থাৎ ধন-জন-মান প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য হরণ করে, দিনের বেলায় আসিয়া ইহারা বলে—তোমার পূজার সহায় হইব—পূজান্তে প্রসাদ পাইব। রাজসিক পূজায় ইহারা সত্য সত্যই সহায় হয়। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের পূজাত রাজসিক নয়,—সাত্ত্বিক। সে পূজায় ইহারা অপবিত্রতারই সৃষ্টি করে। তাই কবি বলেন—

রাতে দেখি প্রবল হ'য়ে পশে আমার দেবালয়ে
মলিন হাতে পূজার বলি হরণ করে।

ধন-জন-মানের ব্যবধানকে ততদিনই সহ্য করা যায় যতদিন তাঁহার প্রেম সহ্য করিবার শক্তি না জন্মে। সূর্য্যের সান্নিধ্য সহ্য করিবার শক্তি না থাকিলে আকাশের ব্যবধানই মঙ্গল। সূর্য্যের তীব্র দহন যদি সহ্য করিবার শক্তি জন্মে—তখন আকাশের ব্যবধানই হয় অসহ্য।

ধনজন মানের মত সুনাম বা যশকীর্ত্তিও একটা ব্যবধান। কবি বলিয়াছেন—

সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটাকে ঐ অকাশপানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।

আলঙ্কারিক বলেন 'যশসি ধবলতা,' কিন্তু ভক্তের পক্ষে 'যশসি কালিমা।' কারণ ইহা অন্ধকার—ইহাতে নিজের প্রকৃত সত্তাকে হারাইতে হয়। বৈষ্ণবরা বলেন 'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা।' কবি ইহাকে একটা অতিরিক্ত শৃঙ্খল বলিয়াছেন। তাই প্রার্থনা জানাইয়াছেন প্রকৃত ভক্তেরই মত—

আমার এ নাম যাক না চুকে
তোমারি নাম নেব মুখে
সবার সঙ্গে মিলব সেদিন বিনা নামের পরিচয়ে।

ভক্ত ধনসম্পদে মত্ত হইয়া আরামবিলাসে থাকিতে চাহে না—সে রঘুনাথ, নরোত্তম, রূপ, সনাতনের মত সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়া পথে বাহির হয়। সে ভগবানের 'বহ্নিশেলের' জন্ত অপেক্ষা করে না। ধনসম্পদের মধ্যে থাকিয়া পরম ধনের জন্ত আহার মন চঞ্চল হইয়াছে—অথচ দ্বিধার দোলাচলে কেবল আগে পিছে চাহিতেছে, তাহার যে প্রার্থনা কবি তাহাকেই বাণীরূপ দিয়া বলিয়াছেন—

সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে
তাহারে তুমি ছাড়া ফুটাতে কেবা জানে?
আঁসিয়া গড়ে তুলে আরামে থাকি ভুলে,
সুখের উপাসনা করিগো ফলে ফুলে
সে ধুলা খেলাঘরে রেখ না ঘৃণাভরে
জাগায়ো দয়া করে বহ্নিশেল হানে॥

কবি বারবারই অনুভব করিয়াছেন জীবনবীণা ঠিক সুরে বাজিতেছে না, কারণ ধন-জন-মানের

মোটা তারও ভগবৎপ্রেমের সরু তারে জড়াইয়া গিয়াছে।

ধন-জন-মানের আসক্তি সকলেরই বন্ধন। এ বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না।

কবির পক্ষে আর একটা নূতন বাঁধন তাঁহার নিজের সৃষ্টির বন্ধন—এ বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য তিনি শিশু ভোলানাথকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন—

দে রে চিত্তে মোর সকল ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে
তালে।

আপনাকে আহ্বান করিয়া কবি বলিয়াছেন—

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে—
তাকাস্‌নে ফিরে।

সমগ্র ভুবন গ্রহতারা ছয় ঋতু 'খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবার আনন্দে, লুটে যাবার, ছুটে যাবার, চলবারই আনন্দে, ফেলে যাবার, ছেড়ে যাবার, মরবারই আনন্দে' ছুটিয়া চলিয়াছে। আপন আপন সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। কবি বলিয়াছেন—

পারব না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে?

বেলুড় মঠ

শ্রীমেনকা ঘোষ

বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মাঝে
উন্নত মস্তকে রাজে,
সুবিশাল সৌধরাজি
শুচি দরশন,
সোনার কলসী মাথে,
প্রস্তর খচিত ছাতে,
গাত্রে আঁকা কারুকাজ
শিল্প-আভরণ।
মধ্যগৃহে অপরূপ,
ভুবনমোহন রূপ,
তিনি যে পরমহংস
পূত যাঁর নাম,
শুদ্ধা মাতা ভাগীরথী
জীবনের চিরসাথী,
মন্দিরের কোল বাহি
গাহে অবিরাম।
প্রশান্ত উদার মুখ
প্রাণে দেয় শান্তি-সুখ,
গৈরিক বসন পরি
মূর্ত্তি অনুপম।

নয়নে অনন্ত দৃষ্টি
ভাস্করের সুষ্ঠু সৃষ্টি,
রসঘন দিব্যকায়
ভাব মনোরম।
মুখে ভাসে মৃদুহাসি
সব দুঃখ শঙ্কা নাশি,
অভয় চরণ ছায়ে
ভক্তজনে রাখি,
মিটায় তাঁহার আশ
মনে উঠে যে পিয়াস,
শুদ্ধ করে দেহ মন
শান্ত প্রাণপাখি।
গোধূলি লগনে যবে
শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্যরবে
সবার হৃদয়ে আনে
শ্রদ্ধা অভিনব,
বন্দনার মন্ত্রধ্বনি
সুগম্ভীর তান শুনি
মুখর ধরণী যেন
বিস্ময়ে নীরব।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নব- [illegible]
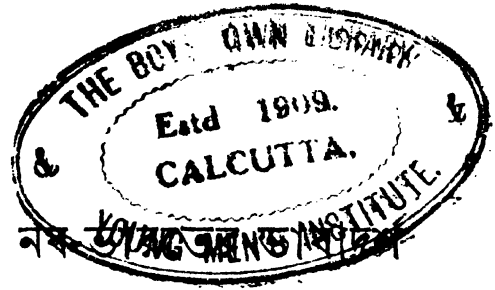
শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত

"If there were another Vivekananda he would have understood what Vivekananda has done. And yet—how many Vivekanadas will be born in time."

ভারতের নব জীবন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, নবীন কর্ম্মমন্ত্রের উদার উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দের উপরোক্ত ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যেই নব-ভারতের সমগ্র কর্ম্মপ্রয়াস, চিন্তা ও জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। স্বামীজীর চিন্তাধারা, স্বামীজীর ধ্যান, স্বামীজীর অনন্ত জীবনাদর্শই নবীন ভারত-সন্ততির সমগ্র কর্ম্মধারা ও বিশ্বকল্যাণব্রতকে এক দৈবী প্রেরণায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে; এই মহাপুরুষের সকল আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে তাঁহাদেরই কর্ম্মজীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া। স্বামীজীর এই সর্ব্বশেষ ভবিষ্যৎবাণীটিকে সার্থক করিয়া তুলিবার সুমহান্ দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে নব ভারতের নবীন ভক্তসন্ততিদের উপর। এই ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী তাঁহাদেরই হইতে হইবে সহস্র বিবেকানন্দের জাগ্রত আদর্শ। তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম, আদর্শ, চিন্তা, বাণী ও সাধনাকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী বিকাশ করিয়া মানব-সমাজের পুনর্গঠনে আজ নিয়োজিত করিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস করি স্বামীজী যে মহান্ কর্ম্মব্রতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও বাস্তবরূপে বিকসিত হইয়া উঠে নাই। "কর্ম্মযোগী" পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, "দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ সুরু হইয়াছিল তাহা শেষ হওয়া তো দূরের কথা লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা পাইয়াছিলেন, যাহা বিকসিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন সে জিনিস এখনও বাস্তবে মূর্ত্তি লয় নাই।" সেই বিবেকানন্দ-আদর্শই নব-ভারতের আদর্শ; বিবেকানন্দ-অভিযানই নব-ভারতের অভিযান। এই গৌরবোজ্জ্বল অভিযানের সূচনা হইয়াছিল বহু আগে যেদিন দক্ষিণেশ্বরের পাগল সাধক স্বামী বিবেকানন্দকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, এই পুরুষসিংহ জগৎটাকে দুই হাতে লইয়া আপন ইচ্ছামত খেলিয়া যাইবে। সেই মহাবিপ্লবকারিণী শক্তি শুধু কিছুদিনের জন্য প্রচ্ছন্ন ছিল মানব-চক্ষুর অন্তরালে; কালের নিঃশব্দ গতিতে সেই শক্তি আবার প্রকটিতা। এবার শুধু একজন বিবেকানন্দ নয়, সহস্র আধার স্বামী বিবেকানন্দের দৈব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অপ্রতিহত বেগে ধাইয়া চলিবে এক সুমহান্ অনিবার্য্য উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে। স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "হিমাচল হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে সহস্র বিবেকানন্দ avalanche এর মত ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" নব-ভারতের নবীন-সন্ততিদের ইহাই হইবে স্বরূপ ও আদর্শ। তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "ধর্ম্ম ও জাতীয়তা" পুস্তকে "নবজন্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটি নূতন জাতি পুরাতন তমঃ অভিভূত জাতির মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে। * ভারতজননীর নূতন সন্ততি * সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থত্যাগী * যুবকগণ মহাশক্তিসৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,—পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে উদ্যত। * এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন তাহা না করিয়া যাইবেন না। * নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের

একটি পূর্বলক্ষণ, ধর্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধ-বিকসিত যোগশক্তি।"

স্বামীজীও এইরূপ কর্ম্মী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও তপস্বী একদল যুবক চাহিয়াছিলেন। বার বার তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "Men, men, these are wanted,.........but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. And hundred such, the world becomes revolutionised." কিন্তু তৎকালীন যুবসমাজ তাঁহার আহ্বানে নিঃশেষে সাড়া দিতে পারে নাই। তিনি তাহাদের সম্মুখে বিশ্বাসের জলন্ত আদর্শ ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "Believe first in yourself, then in God." এই অদম্য আত্ম-বিশ্বাসই ছিল স্বামীজীর ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। এই আত্ম-বিশ্বাসের মন্ত্রেই তিনি ভারতীয় যুবকবৃন্দকে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের এই আত্ম-বিশ্বাসের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তাঁহার জলন্ত আত্ম-বিশ্বাসই আর সকলের অবসন্ন চিত্তে নষ্ট বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবে। এই দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের মন্ত্রই হইবে নব-ভারতের মন্ত্র! বিশ্বাস দ্বারাই জগতের সকল বিরাট কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। স্বামীজীর ভাষায়, "The history of the world is the history of few persons who had faith in themselves." অচল, অটল বিশ্বাস দ্বারাই নবীন ভারত-সন্ততি জগতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করিবে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "সমগ্র জগৎ যদি তরবারি হস্তে তোমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় তথাপি তুমি যাহা সত্য মনে করিয়াছ তাহা সাধন করিতে কিছুমাত্র ভীত হইবে না—মনের এই বল ও প্রাণের সেই প্রেম যদি থাকে, তবে তোমাদের যে কেহ অতিশয় অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারিবে।" স্বামীজীর সমগ্রহৃদয়োত্থিত সুগভীর আকাঙ্ক্ষাটিকে সার্থক করিয়া তুলিবে নব-ভারতের তরুণদল। উপরোক্ত বাণী এই অনাগত তরুণদের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হইয়াছিল।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ আমরা বহু মতবাদ ও আদর্শ নিয়া চরম গবেষণা (experiment) চালাইয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন মতবাদ বা আদর্শই আজ পর্য্যন্ত জগতের বুকে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ অপশাস্ত্র, অনুকরণমোহ এবং ভ্রান্ত পুরুষকারের ব্যর্থ উপাসনা করিয়া প্রচুর শক্তিক্ষয় করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজ আমাদের এই বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অর্থহীন আন্তর্জ্জাতিকতার আপাতমধুর ছলনায় ভুলিয়া আমরা স্বকীয় জাতীয় সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে জগতের বুকে একমাত্র বেদান্তধর্ম্মই বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। আজও একমাত্র বেদান্তধর্ম্মই পৃথিবীর বুকে চিরশান্তি ও আনন্দের মুক্ত প্রস্রবণ বহাইয়া দিতে সক্ষম। যে বেদান্তদর্শন ভারতীয় সভ্যতাকে এক বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছে তাহাতে অসাম্যবোধ এবং শোষণ নীতির কোন স্থান নাই। স্বামীজীর সমগ্র চিন্তা, বাণী ও কর্ম্মের মধ্যে এই বেদান্ত ধর্ম্ম এবং দর্শনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ যদি আমরা বর্ত্তমান জাতীয় দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইতে চাই তবে আমাদের বেদান্তধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকেই সর্ব্বাংশে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। স্বামীজীর জীবনাদর্শে শুষ্ক ভাবালুতা ও মিথ্যা আড়ম্বরের স্থান নাই। স্বামীজীর বাণী কর্ম্ম, বল ও বিশ্বাসের বাণী।

তাঁহার মহান্ জীবনে আমরা আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেমের যে মহাসমন্বয় দেখিতে পাই তাহাই হইবে নবভারতের লক্ষ্য ও সাধনা। প্রত্যেক জাতিরই একটি সনাতন, স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া জাতিকে উন্নত করা চলে না। ভারতের সনাতন এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম স্বামীজীর জীবন ও আদর্শের মধ্যেই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে যদি তাহার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে তাহাকে স্বামীজীর আদর্শের ভিত্তির উপরই দাঁড় করাইতে হইবে। নবভারতই হইবে বিবেকানন্দ-জীবনের জাগ্রত ভাষ্য। স্বামীজীও ভারতবর্ষকে বেদান্তধর্ম্মের উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার গুরু দায়িত্ব তৎকালীন মৃতকল্প ভারতের উপর অর্পণ করেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, "He felt that impatience was inexcusable. * The task was one that might take seventy years to accomplish." স্বামীজীর এই অসমাপ্ত কার্য্যকেই পরিপূর্ণতা দান করিবে নবভারতের তরুণ সন্ততি-বৃন্দ। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ভারতের নব জাগরণের এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে, এই নবজাগরণ আনয়ন করিবার সাধনাই হইবে নব-ভারতের সাধনা।

নবভারতের এই দ্যুতিমান অভ্যুদয় নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কোন মানবীয় শক্তি নিয়তির এই অমোঘ বিধান ব্যর্থ করিয়া দিতে অক্ষম। কারণ স্বামীজীর আদর্শই ভারতের জাতীয় সাধনার আদর্শ। স্বামীজীর বাণী ও চিন্তাধারার মধ্যেই ভারতের আত্মিক সাধনার সুমহান্ আদর্শ শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ক্রম-বিকাশের অভ্রান্ত ধারায় ভারতীয় সাধনার এই উদার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠা সাময়িক পতনের পশ্চাতে এক নব উত্থানের সাক্ষ্যই চিরকাল দিয়া আসিতেছে। ইহাই ইতিহাসের ধর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণণ বলিতেছেন, "Human history is not a series of secular happenings; it is a meaningful process, a significant development." নব ভারতের অত্যুজ্জ্বল ভাবাদর্শের যে স্বরূপ আমরা এ যাবৎ উল্লেখ করিয়া আসিতেছি তাহা যুক্তিহীন মনের ভাব-বিলাস নয়। ইহাই ক্রমবিবর্ত্তনের অব্যর্থ বিধান, ইতিহাসের অমোঘ নির্দ্দেশ। দারুণতম অবসাদের মধ্যেই ভবিষ্যতের বিরাটতম সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "The greater the destruction, the freer is the chance of creation." নিঃসীম দুর্গতি এবং বিনাশের মধ্য দিয়াই আমরা নব-সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছি। ভারতবর্ষে আজ চারিদিকে এক নবজাগরণের সূচনা দেখা যাইতেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই নবজাগরণ দ্বারাই ভারতের সনাতন স্বভাব ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিবে। ইহারই প্রভাবে গড়িয়া উঠিবে বর্ত্তমান বিশ্ববাসীর ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বামীজীর বাণী, আদর্শ ও কর্ম্মবহুল অতিমানবীয় জীবনের মধ্যেই ভারতের সনাতন আত্মিক সাধনা বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বিবেকানন্দের অভিযানই হইবে নবভারতের অভিযান। ভারতের এই নবজাগরণ বিবেকানন্দ-জীবনের অসমাপ্ত কার্য্যেরই পরিপূর্ণতা সূচনা করিবে। আমরা বর্ত্তমানে এক বিরাট সম্ভাবনার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এই সম্ভাবনাময় যুগের সর্ব্বশেষ পরিণতি, জগৎসমক্ষে ভারতীয় আত্মিক সাধনার এক অভূতপূর্ব্ব আত্মবিকাশ। ভারতীয় সাধনার এই উদার আত্ম-বিকাশই ভারতের নবযুগের সূচনা করিবে। আর ভারতের এই নবযুগ ভাবী কালের মানবসমাজের কাছে চিরকাল "বিবেকানন্দ-যুগ" হিসাবেই পরিচিত হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান জগৎ ও ঈশ্বর

শ্রীজ্যোতিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বি-এ

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম তাণ্ডব চলছে তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানাদিক থেকেই সমস্যাটির সামাধানের চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা ভাবছি বুঝি বা পাশ্চাত্য দেশের লোক খুব সুখে আছে; ও দেশের অসংখ্য পাগলা-গারদের ক্রমবর্দ্ধমান জনগণ চীৎকার করে বলছে, সুখ যদি কিছু থেকে থাকে তো প্রাচ্য দেশেই আছে। কবি লিখেছেন—

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস;
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
কহে যত কিছু সুখ সকলি ওপারে।"

নূতন এক একটী মত আত্মপ্রকাশ কচ্ছে এবং তাকে গায়ের জোরে জন-সমাজে চাপাতে গিয়ে অশান্তির মাত্রাও ক্রমোচ্চ গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ভাব হচ্ছে এই যে 'আমার মত ও নেতৃত্ব ভিন্ন জগতে শান্তির সম্ভাবনা নেই, যদি থাকে তো সে শান্তিতে আমার কাজ নেই।' অর্থাৎ সমস্ত অশান্তির মূলে রয়েছে ঐ দাম্ভিকতা। যদি আমার মত গ্রহণ কর তবেই তুমি বুদ্ধিমান ও সমাজে বাস করার যোগ্য, নতুবা তুমি একটী সমাজের পরগাছা ভিন্ন আর কিছুই নও। এরূপ হৃদয়হীন গোঁড়ামির ফলও বেশ হাতে হাতে ফলছে। তুমি ভেবে-চিন্তে একটি অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো দাঁড় করালে, সেটিকে চালু করতে গিয়ে সমাজের সকলের হাত-পা বুদ্ধিবৃত্তি কঠোর ভাবে বেঁধে দিলে, নতুবা তাদের স্বাধীন গবেষণাতে তোমারও কাঠামো দুদিনে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং অশান্তির আগুন চাপা পড়েই রইল, শুধু অগ্নিকাণ্ড বাধবার বিলম্ব মাত্র! অর্থাৎ সমস্যাটি যেমন ছিল তেমনই রইল! তবু যাহোক চুপ করে বসে না থেকে জগৎকে কিছু ঋণী রেখে যাওয়া গেল। অসুরপ্রকৃতি লোকদের চিরকাল এই এক ভাব যে জগতে একটা কিছু কীর্ত্তি রেখে যাব, এতে পৃথিবী থাক আর যাক। তোমার নিজের ভিতর কতটুকু শান্তি আছে যে তুমি জগৎকে তা দিতে যাচ্ছ? যার ভিতরে যা নেই অপরকে সে তা কখনই দিতে পারে না। যে জ্ঞানী সে জ্ঞান দিতে পারে, যে প্রেমিক সে প্রেম বিলাতে পারে, যে কৌশলী সে কৌশল শেখাতে পারে। যে নিজের অন্তরে শান্তি লাভ করেছে সেই শুধু অপরকে শান্তি দিতে পারে। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যষ্টি মানব যদি আত্মকেন্দ্রভ্রষ্ট হয়ে রিপুর উত্তেজনায় পরস্পরের উপর দাপাদাপি করতে থাকে তবে সমাজ ও রাষ্ট্র চিরকালই টলমল করবে। Thesis, Antithesis, Synthesis—অনন্তকাল ধরে দ্বন্দ্ব চলছে। জগৎকেন্দ্রে শান্তি স্থাপন করতে গেলে ব্যষ্টিকেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে হবে, নতুবা গাড়ীর অগ্রে ঘোড়ার মত হবে।

গল্পে আছে যে একটি দুষ্ট ছেলে বার বার কার্য্যব্যস্ত পিতাকে নানারূপভাবে বিরক্ত করায় তিনি

তাকে একটি কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখার বুদ্ধি করেন এবং দেয়াল থেকে একখানা গোলাকার ভূমণ্ডলের চিত্র টেনে নেন। পরে পৃথিবীর ঐ মানচিত্রটিকে টুকরো করে ছিঁড়ে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, পৃথিবীকে ফের জোড়া দিয়ে দাঁড় করাও দেখি। ছেলেটি বহু চেষ্টায়ও পারলে না। শেষে কোন প্রকারে সে ঐ মানচিত্রকে পুনরায় সঠিক ভাবে গঠন করে পিতাকে দেখালে। পিতা অবাক হয়ে বল্লেন, কি করে করলে? ছেলেটি বল্লে যে পৃথিবীর ও পিঠে একটা মানুষের ছবি ছিল, সেটাকে যে-ই না ধরে ধরে ঠিক মত দাঁড় করিয়েছি অমনি পৃথিবীটা নিজের থেকে দাঁড়িয়ে গেল।

পৃথিবীকে দাঁড় করাবার ঐ হচ্ছে ঠিক পদ্ধতি। মানুষগুলোকে দাঁড় করাও, সমাজ আপনা থেকে দাঁড়াবে। নতুবা বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তি লেগেই থাকবে। মানুষের অন্তর থেকে কুপ্রবৃত্তিগুলো তুলে সংস্কার করতে হবে। মানুষের আজ এ বীভৎস রূপ কেন? তার হৃদয়টা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। জগতে সাম্যবাদ স্থাপন করতে যাবার পূর্ব্বে তোমার ভেতরে যে অসাম্য বা বৈষম্য রয়ে গেছে তা দূর করতে হবে। মানুষের ভিতর দেহের ক্ষুধাও আছে, মনের ক্ষুধাও আছে। একটির তৃপ্তির জন্য জগৎ জুড়ে ভোগের নৈবেদ্য রচিত হচ্ছে, দ্বিতীয়টি অবহেলায় অনাহারে চাপে পড়ে শুকিয়ে মরে পচে যাচ্ছে। দেহের ও মনের এই অসাম্য প্রথমেই দূর করতে হবে। দেহের সুখের জন্য অশন বসন গাড়ী ঘোড়া রেডিও বায়োস্কোপ প্রভৃতির স্তূপ জমছে এবং ভোগতৃষ্ণা প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র শির উঁচু করে স্ফীত হয়ে উঠছে। প্রত্যেকেরই অবাধ ভোগতৃপ্তির পথে অন্য সবাই বিবাদী, তাই ধাক্কাধাক্কিরও শেষ নেই। মানুষের আভ্যন্তর ক্ষুধা কি? মানুষ কি চায়? প্রথমতঃ সে তার সত্তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে চায়, প্রত্যেকটি লোক অমর হতে চায়, দেহের প্রতি মুহূর্ত্তে যে পরিণাম ও ক্ষয় হচ্ছে সে তা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে চায়। উদ্দেশ্য ক্ষয় বা মৃত্যু যেন তাকে ত্রিকালেও স্পর্শ না করে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ তার জ্ঞান-প্রবাহকে স্থির অব্যাহত মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিকালস্থায়ী রাখতে চায়। তার পূর্ণ আত্মজ্ঞান সে কিছুতেই হারাতে রাজী নয়। তৃতীয়তঃ শুধু সজ্ঞানে বেঁচে থাকা মানুষের কাম্য নয়, সে পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকতে চায়। আনন্দ ভিন্ন মানুষ এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারে না। বস্তুতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা যে যাহাই করি, সবই আনন্দের জন্য করি। মানুষ চায় এই আনন্দকে চিরস্থায়ী অব্যাহত পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে। পৃথিবীতে কি করে তা হতে পারে? বাইরের কোন বস্তুর উপর যদি মানুষের আনন্দ নির্ভর করে তবে যে মুহূর্ত্তে ঐ বস্তুটি সে হারাবে অমনি তার আনন্দ ফুরিয়ে যাবে। অন্য বিষয়ের সংস্পর্শ থেকে যে আনন্দের জন্ম সে আনন্দ কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না।

দেখা গেল প্রত্যেক মানুষই চায়—অক্ষয় সত্তা (সৎ), অক্ষয় পূর্ণজ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দ যতক্ষণ অপ্রাপ্ত থাকবে ততক্ষণ কোন মানুষই পূর্ণরূপে সুখী হতে পারে না। এই সৎ-চিৎ-আনন্দই ভগবান বা তাঁর স্বরূপ। ইহা আত্মারও স্বরূপ। অন্ধের মত ভোগের নেশায় মানুষ আত্ম-দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে। এই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে হবে। ঐটি লাভ হলেই মানুষের সমস্ত দুঃখ দূর হবে, হৃদয়টি সরস, মধুর ও আনন্দময় হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ঐক্য স্থাপিত হবে।

নতুবা বাইরে থেকে জোড়া-তালি দিয়ে যে ঐক্য সে ঐক্য প্রতি মুহূর্তে ভেঙে যাবে; ভোগতৃষ্ণার উত্তেজনায় সে ঐক্য কিছুতেই টিকবে না। জগতে কখনই টিকে নাই। এই স্বরূপজ্ঞান লাভ করতে ধর্মই মানুষের একমাত্র উপায়।

কিন্তু সে জন্য কি করতে হবে? আমরা কি কেবল বসে বসে এই কথা ভাববো? দেশের রাষ্ট্রের সমাজের উন্নতির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা বন্ধ রাখব? লোকের খাওয়া-পরা সুখসুবিধার উপায়-সৃষ্টি ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? জ্ঞান-বিজ্ঞান খেলা-ধূলা স্বাস্থ্য-সম্পদ শিল্প-গবেষণা সব বিষয় উৎসাহের সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে। শুধু দেখতে হবে যেন তাদের পিছনে অহর্নিশ লেগে থেকে আত্ম-জ্ঞানটি হারিয়ে না ফেলি। আত্ম-জ্ঞানটি অব্যাহত রেখে সব কাজ করতে হবে। সব কিছুকে এই আত্মজ্ঞানের অনুকূল করে নিতে হবে, নতুবা আত্মজ্ঞানটি চাপা পড়ে যাবে। এই বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি বস্তু-ই মানুষের হৃদয়ে অসংখ্য কামনার তরঙ্গ তুলে দিচ্ছে। যত কামনা বাড়াবে ততই বাড়বে। এর শেষ নেই। এই কামনা-প্রবাহ আদিযুগ থেকে দুর্নিবার বেগে উৎসারিত হচ্ছে—থামাবার লক্ষণ নেই। ভাগীরথী গঙ্গা যখন ভীমবেগে পর্বতশীর্ষ হতে নেমে আসে তখন যদি তার গতিকে অবাধে চলতে দেওয়া হয় তবে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যে দেশের মধ্য দিয়ে যাবে তার-ই ধ্বংস সাধন করবে। দুই কূলের রেখা বন্ধনীর ভিতর দিয়ে তার গতিবেগকে সংযত করে যে জনপদের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করবে সে দেশের পক্ষেই সে পরম মঙ্গল ও আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। জীবনের এই দুর্বার বাসনার প্রবাহকেও ঐরূপে সংযমের বন্ধনীর ভিতর দিয়ে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হবে, তবেই পরম কল্যাণ। নতুবা উচ্ছৃঙ্খল বাসনার প্লাবন-পীড়নে জীবনের দুই কূলই ভেসে যাবে।

তাই সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কারও সঙ্গেই ধর্মের বিরোধ নেই। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিকে যদি এক একটা "end in itself" রূপে ধরা হয় তবে ই জীবনে অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। তাদের যদি "means to a great end" বা কোন উর্দ্ধতর লক্ষ্যের উপায় রূপে ধরা হয় তবেই সামঞ্জস্য, তবেই শান্তি।

আমাদের যত কর্ম-প্রবৃত্তি তার মূলে রয়েছে বাসনা বা ভোগস্পৃহা। অভাব-বোধ দূর করতে গিয়েই কর্মের উদ্ভব। এই কর্মের ভিতরকার দিক হচ্ছে চিন্তা; বহিরঙ্গ দিক হচ্ছে চিন্তাকে জড়-বস্তুর মধ্যে রূপায়িত করা। অর্থাৎ বুদ্ধিবলে জড়-সভ্যতার যে বাস্তব-রূপটা আমরা গড়ে তুলেছি উহাই বহিরঙ্গ কর্মের নিদর্শন। বাসনার উত্তাপে কর্মের সৃষ্টি, এবং বাসনার প্রসারে আমাদের বিনাশ। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, এই বিরোধ মেটাতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান ত্যাগ করে আমরা আজকাল কেবল কর্মকেই আশ্রয় করেছি। আত্মিক আদর্শভ্রষ্ট হয়ে কর্মের জন্য কর্ম কচ্ছি। কর্মের নাগর-দোলায় ভীষণ বেগে ঘুরে ঘুরে কর্মচক্রের ক্রীতদাস হয়েছি। জগৎ-জুড়ে তাই মার-মার ধ্বনি। বাসনায় বাসনায় সংঘর্ষ, মতে মতে হানাহানি, কর্মে কর্মে বিরোধের ঘূর্ণাবর্ত। উত্তাল-তরঙ্গে জীবন-তরী টলমল। এই অবস্থায় বাঁচতে হলে বাসনাকে যথাসাধ্য প্রশান্ত করে কর্মকে সচ্চিদানন্দ লাভের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তাহলেই কর্মের উচ্ছৃঙ্খলতা হৈ চৈ—দম্ভ দর্প বীভৎসতা কমে যাবে।

আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তার আনন্দের ছটা বহির্জগতে পড়ে এক আনন্দের মরীচিকা

সৃষ্টি করেছে। আমরা অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে বাইরে ঐ মরীচিকার পেছনে সুখের আশায় ঘুরছি। চারিদিকেই শুধু আনন্দের আভাস, কিন্তু আনন্দ নেই। কারণ আনন্দ আমাদের ভেতরে। আপনাকে সুখী করার জন্য আমরা বস্তুর স্তূপ জড়াচ্ছি—

'গলায়ে গলায়ে কামনার সোণা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।'

বাসনা ছেড়ে দিলেই আত্মার শান্তি। তখন সে তার নিজ-স্বরূপে প্রকাশ পাবে। উর্ণনাভের মত বাসনার তন্তুজাল সৃষ্টি করে করে যখন আমরা একেবারে আটকে পড়ি, আত্মা কেঁদে উঠে—অসহ্য লাগে—ম্যাকবেথের মত বলে উঠি—

Cans't thou minister to a mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuffed bosom of the perilous staff
That weighs upon the heart?

তখন—শুধু তখনই—বাইরের সব জঞ্জাল ছেড়ে দিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আত্মাকে আমরা ঠিক ঠিক খুঁজে বেড়াই। বহির্জগতের কোলাহল যেই থেমে যায়, অন্তর্জগৎ থেকে অমনি আত্মার সস্নেহ আহ্বান এসে শ্রুতিপথে প্রবেশ করে। তখন—

"শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে
শুধু ঐ নাম চিরদিন বাজে
স্নেহ-সুরে ডাকে অন্তর মাঝে
আয় রে বৎস আয়!
ছিঁড়ে ফেলে আয় যত বন্ধন,
দূরে ফেলে আয় হাসি ক্রন্দন
হেথা ছায়া আছে চির-নন্দন
চির বসন্ত বায়।"

সে আহ্বান যে শুনতে পায় সে মরীচিকায় মুগ্ধ হয় না। কবির ভাষায়—

"যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি,
ভাসায়ে দিয়েছে জীবন তরণী,
জানে না আপনা, জানে না ধরণী
সংসার কোলাহল।
সে জন পাগল, পরাণ বিকল,
ভব কূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
বাহির হয়েছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অচল কমল গন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ
অপূর্ব্ব গীত আলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।"

সমষ্টিগত ভাবে যে দেশে এই আত্মদৃষ্টি যে জাতির মধ্যে যত বেশী প্রকাশ পায় সেই জাতিই তত শান্তি ও আনন্দ ভোগ করে।
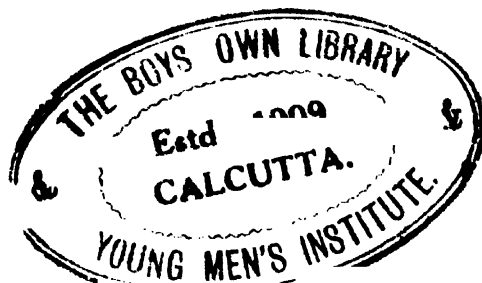
শূদ্রসাধু নামদেব

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

শূদ্রসাধু নামদেবের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা হিন্দুদিগের উচ্চ বর্ণেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। আমরা যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদিগের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া ঈশ্বরারাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ পূর্বক হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের কৃষ্ণানদীর উপনদী ভীমা বনাম চন্দ্রভাগার উপকূলে পন্দরপুর নগরে একটি বহু পুরাতন মন্দিরে শ্রীবিষ্ণু বিঠোবা মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি জাগ্রত দেবতা, একনিষ্ঠ ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু। ঐ মন্দিরে বিঠোবা দেবের আরাধনা করিয়া অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পন্দরপুরের ঐ দেবায়তন এবং তন্মধ্যস্থিত দেববিগ্রহ দক্ষিণ-ভারতীয় ধর্মীদিগণের নিকট পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পুণ্যশ্লোক তুকারাম এই স্থানেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় পন্দরপুরেও কোন জাতিবিচার নাই। এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় লিখিতেছি সেই নামদেবকে সাধু তুকারাম তাঁহার ধর্মগুরু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তুকারাম মহারাষ্ট্রকুলতিলক শিবাজীর সমসাময়িক ছিলেন।

নামদেব সূচীজীবী ছিলেন—জাতিতে শূদ্র। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ প্রথমতঃ সাতারা জেলায় বাস করিতেন। সাতারার বর্তমান নাম কোলেম—নরসিংহপুর। নামদেবের পিতামাতা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পন্দরপুরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনুমান ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে নামদেব ঐ পন্দরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দামশেঠ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সৌচিক ছিলেন এবং বস্ত্রাদিরও সামান্য ব্যবসায় তাঁহার ছিল। নামদেবের মাতার নাম ছিল গোনা বাঈ।

বাল্যকাল হইতেই নামদেব ধর্মগতপ্রাণ এবং ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। বালকসুলভ বুদ্ধিতে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষে মানুষে যেমন কথাবার্তা হয় দেবতা ও মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমনি হয়। নামদেবের ঐরূপ সরল বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ মনোহর গল্প আছে। নামদেবের পিতা প্রত্যহ বিঠোবা দেবের পূজার জন্য পুষ্প, ফল, তণ্ডুল এবং অন্যান্য উপচার লইয়া তাঁহার মন্দিরে যাইতেন। একদিন কোন কারণে তিনি বাটীতে অনুপস্থিত থাকায় নামদেবের মাতা পূজার ঐ সকল উপকরণ নামদেবের সহিত দেবমন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। নামদেব শুচিশুদ্ধ ভাবে মহা আনন্দে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া তথায় গেলেন এবং তৎসমুদয় দেবতার সম্মুখে রাখিয়া বালকোচিত বিশ্বাসে তাঁহাকে ঐ গুলি আহার করিতে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু বিঠোবাদেব ঐ গুলি স্পর্শও করিলেন না দেখিয়া নামদেব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের এই সরল বিশ্বাস এবং ভক্তিতে প্রীত হইয়া বিঠোবা ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন—তিনি নিবেদিত দ্রব্যগুলি সমস্ত আহার করিয়া ফেলিলেন। নামদেব পরমানন্দে বাটী ফিরিয়া যাইয়া মাতাকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন।

ক্রমে নামদেব যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতামাতা রাজাঈ নাম্নী এক স্বজাতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। নবদম্পতি পরম সুখে তাঁহাদের বিবাহিত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দুইটি সন্তান হইল—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। কিন্তু সংসারাশ্রমে

আবদ্ধ থাকা নামদেবের ভবিতব্যতা ছিল না। বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা হইলেও তিনি ক্রমেই বিষয়ভোগের প্রতি অনাসক্ত এবং উদাসীন হইতে লাগিলেন নামদেব বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন না, সর্বদা দেবদর্শন, মন্দিরে নামকীর্তন এবং অন্যান্য নানা প্রকার ধর্মকার্যে বাটীর বাহিরে সময়াতিপাত করিতেন। পিতামাতা তাঁহাকে এই ধর্মাতিশয্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সংসারের কর্তব্য কর্মে অবহিত হইবার জন্য অনেক প্রকারে বুঝাইতেন কিন্তু তাঁহাদের সাধ্যসাধনা, এমন কি বার্ধক্যজনিত তাঁহাদের অক্ষম ও অসহায় অবস্থা প্রভৃতি কোন বিষয়ই নামদেবের এই মতিগতি পরিবর্তিত করিতে পারিল না। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি এবং ভালবাসার কিছু মাত্র ন্যূনতা তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঐহিক কোন কিছুতে জড়িত হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পূর্ববৎ বিঠোবাদেবের মন্দিরে সর্বদা সাধনা করিতে লাগিলেন। সাংসারিক বিষয়ে নামদেবের এই উপেক্ষা তাঁহার গৃহে ক্রমে অর্থকষ্ট এবং অনৈক্য করিল।

একদিন গোনা বাঈ পুত্রের এই ব্যবহারে এবং তজ্জনিত সাংসারিক অনটন ও অব্যবস্থায় অধৈর্য হইয়া বিঠোবাদেবের মন্দিরে গেলেন এবং তথায় বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন: "আমি বড় কষ্টে আমার পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলাম; সে এখন তোমার ক্রীতদাস হইয়াছে। তোমার মন্দিরে সে এখন সর্বদাই থাকে, নিজ ব্যবসায়ের প্রতি তার কোন দৃষ্টি নাই; এইরূপে সে তাহার পিতামাতা, স্ত্রী এবং সন্তানের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। তুমিই তাহাকে বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজনগণ ত্যাগ করাইয়া এখানে প্রলোভিত করিয়া আনিয়াছ। আমার সংসার এখন ধ্বংসোন্মুখ। দেবতা, এই নাকি তোমার কৃপা? হে মিথ্যার দেবতা, তুমি তোমার ইষ্টকাসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারকে এইরূপে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া থাক।" ভক্তের এই করুণ ভর্ৎসনা বিঠোবাদেবের হৃদয় স্পর্শ করিল। গোনা বাঈ মন্দির হইতে ফিরিয়া বাটী পৌঁছাইবার পূর্বেই বিঠোবাদেব এক বণিকের বেশে নামদেবের বাটীতে যাইয়া কিছু অর্থ এবং অন্যান্য কিছু মূল্যবান দ্রব্য রাখিয়া আসিলেন। গোনা বাঈ ইহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। কিন্তু নামদেব ইত্যবসরে বাটী আসিয়া ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্য দেখিতে পাইলেন এবং উহা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

ভজন এবং কীর্তনানন্দই এই সময়ে নামদেবের সাধনার প্রধান অবলম্বন ছিল। কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া করতালহস্তে তিনি বিঠোবাদেবের মন্দিরের আঙ্গিনায় কীর্তনে এবং নর্তনে নিজে মাতিয়া অন্য সকলকে মাতাইয়া দিতেন। উৎসবাদির সময় যখন যাত্রীরা দেবদর্শনে দলে দলে সমবেত হইত তখন তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া তাহাদিগের সহিত সঙ্গীতে এবং নামকীর্তনে যোগ দিতেন। অনতিবিলম্বে তিনি নিজেই ভজনগীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎপ্রেমবিষয়ক কবিতায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিলেন।

নামদেব-সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক ঘটনা কথিত আছে। সেই ঘটনা তাঁহার ধর্মমত একেবারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। একদিন বহু ভক্তের এক সম্মেলনে তিনি বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে গোরা নামক একজন কুম্ভকার সাধু নামদেবের মস্তকে টোকা দিয়া বলিলেন যে এই ব্যক্তি এ যাবৎ কোন গুরুর নিকট কোন উপদেশ

না লওয়ায় এখনও "কাঁচা" আছেন। নামদেব ইহা শুনিয়া গুরু অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। তিনি মল্লিকার্জুন মন্দিরে অবস্থিত বিশোবা কেশর নামে জনৈক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এই সন্ন্যাসী একজন কঠোর বৈদান্তিক এবং মূর্তি-পূজার বিরোধী ছিলেন। নামদেব তাঁহার এক গীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই গুরুর পাদমূলে বসিয়া তিনি পরমসত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে তিনি মূর্তি, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরপূজার অসারতা বুঝিয়াছেন। বিশোবা শৈব ছিলেন।

যে অবস্থার সমাবেশে বিশোবা কেশরের সহিত নামদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাহা বড় বিস্ময়সূচক। উক্ত মল্লিকার্জুন মন্দিরে যাইয়া নামদেব দেখিলেন যে বিশোবা কেশর ধ্যাননিমীলিত নেত্রে মন্দিরস্থ শিবের গাত্রে পদস্পর্শ করিয়া শুইয়া আছেন। নামদেব এই দৃশ্য দেখিয়া পাপভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, "স্বামী, আপনি শিবের মূর্তির উপরে পা রাখিয়া শুইয়া আছেন কেন?" ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ধ্যানোত্থিত হইয়া বলিলেন, "ক্লান্তি এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা আমাকে শায়িত করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞাতসারে আমার পদদ্বয় দেবমূর্তি স্পর্শ করিয়াছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার পা-দুখানি এমন স্থানে সরাইয়া রাখ যেখানে ঐ মূর্তি নাই।" নামদেব তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর পদদ্বয় উত্তোলিত করিয়া অন্য দিকে স্থাপিত করিলেন কিন্তু তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া দেখিলেন যে যেখানে বিশোবার পদদ্বয় স্থাপিত করিলেন তাহার ঠিক নিম্নে একটা শিবমূর্তি উদ্গত হইল। তৎপর পদদ্বয় পুনরায় উত্তোলিত করিয়া স্থানান্তরে রাখিলেন, সেখানেও এক শিবমূর্তি প্রকাশিত হইল। এইরূপে তিনি যেখানেই বিশোবার পদদ্বয় রাখেন সেইখানেই এক শিবমূর্তির আবির্ভাব হইতে দেখিলেন। নামদেব এইরূপে বিশোবা কেশরের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বে মোহিত হইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন এবং ধর্মের সার সত্য শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার নিকট সকাতরে বিনয় করিলেন। বিশোবা কেশরের নিকট নামদেব এই মহান্ সত্য লাভ করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান, এবং মূর্তিপূজা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে অঙ্কিত করিয়া "কাঁচা" নামদেব "পাকা" হইয়া পন্দরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে নামদেব উত্তর ভারতের হস্তিনাপুর, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তাঁহার সহতীর্থযাত্রিগণ সহ শিবরাত্রি দিবসে অভিন্ন নাগনাথ নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা সকলে স্নানান্তে মন্দিরস্থ শিবের পূজা সমাধা করিয়া মন্দিরের সম্মুখ দিকের প্রাঙ্গণে ভজনগান করিলে বহু লোক সেখানে সমবেত হইয়া তাঁহাদের গীত শ্রবণে মোহিত হইল। এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ভস্মভূষিত অঙ্গে স্রকচন্দনে শোভিত হইয়া ফুল জল প্রভৃতি পূজার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নামদেবের ভজনের সময় শ্রোতাগণ মন্দিরের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছে বলিয়া ঐ সকল নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কুপিত স্বরে তাহাদিগকে বলিলেন, "পথ ছাড়িয়া দাও, আমাদিগকে স্পর্শ করিও না।" সমবেত ভক্তগণ বলিলেন "এখানে আবার অপবিত্র হইবার কি আছে? আপনারা যান না কেন?" কিন্তু উদ্ধত ব্রাহ্মণগণ ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া নামদেবের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পামর, তুমি এখান হইতে দূর হও! তোমার ভজন ধর্মের মূলতত্ত্বসকল ধ্বংস করিতেছে। মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে যাইয়া তোমাদের উন্মত্ত ভজন নর্তনাদি কর।" এই

কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ উত্তেজিত এবং নামদেবও যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। যাই হউক, নামদেব ব্রাহ্মণদিগের আদেশ মত মন্দিরের পশ্চাদ্দিকের চত্বরে যাইয়া ভজন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে নামদেব ঐ চত্বরে যাইয়া ভজন আরম্ভ করা মাত্র দেববিগ্রহসহ দেবমন্দির দিক্ পরিবর্তন করিয়া নামদেবের ভজন-নর্তনের অভিমুখী হইয়া অবস্থিত হইল। ইহাতে নামদেব এবং সেই ব্রাহ্মণগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন নামদেবের যশ ঐ স্থানে সর্বজনবিদিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আজ পর্যন্ত মন্দির নাগনাথ দেব তাঁহার মন্দির সহ সেই পরিবর্তিত দিগভিমুখী হইয়াই অবস্থিত আছেন। নামদেব ঐ স্থান হইতে পন্দরপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

হিন্দুগণ তীর্থ ভ্রমণান্তর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের তীর্থদর্শন ক্রিয়া উদ্যাপন করিয়া থাকেন। নামদেবও তীর্থভ্রমণ করিয়া পন্দরপুরে ফিরিয়া আসিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার সহায়-সম্বল কিছু ছিল না। ভক্তবৎসল বিঠোবাদেব নামদেবের এই সাধু সংকল্প পুরণের জন্য ব্রাহ্মণ-ভোজনের যাবতীয় উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজের পরিচয় গোপন করিয়া স্বয়ং নামদেবের পক্ষে তাঁহার অতিথি-সেবকের কার্যে রত থাকিয়া উহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া নামদেব এবং তাঁহার অতিথিসেবকের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে নামদেব শূদ্রবর্ণজাত তখন তাঁহারা এক গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া বলিলেন যে, শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া শূদ্রের আহার গ্রহণের পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তখন অতিথি-সেবক বিঠোবাদেব তাঁহাদিগকে নিজ পরিচয় দিয়া সদ্ধর্মের যাথাতথ্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, যাহারা প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া তাঁহার আরাধনা করে তাহাদের মধ্যে জাতি বা জন্মগত কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ শান্ত হইলেন।

নামদেবের ইতিবৃত্তলেখক তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। বিদর নামক স্থানের একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বগ্রামে বিঠোবাদেবের কোন পর্বানুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি নামদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া তাঁহার পরিষদগণসহ কীর্তন করিতে করিতে উক্ত ব্রাহ্মণের অনুগমন করিতেছিলেন। তদবস্থায় তাঁহারা স্থানীয় মুসলমান রাজার রাজধানীতে প্রবেশ করিলে রাজার ভৃত্যগণ আসিয়া নামদেবের গতি রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নামদেব বলিলেন যে তাঁহারা ধর্মার্থী পর্যটক মাত্র,—ভগবদ্ভক্তি এবং শান্তি প্রচার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ভৃত্যগণ নামদেবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নামদেবকে সদলবলে বন্দীর মত ঘেরাও করিয়া শাসনকর্তার প্রাসাদে লইয়া গেল। তিনি পর্যটকদিগকে কাফের এবং জাল ধর্মপ্রচারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগের সমক্ষে একটি গোহত্যা করিয়া নামদেবকে—ঐ গরুটি পুনর্জীবিত করিতে আদেশ করিলেন। নামদেব মর্মাহত হইয়া গদ্গদশ্রুলোচনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে বিঠোবাদেব গরুটির প্রাণ দান করিয়া তাঁহার ভক্তদিগের ভগবদ্ভক্তি এবং ধর্মবিশ্বাস প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

নামদেব তাঁহার গুরু বিশোবা কেশরের নিকট অদ্বৈততত্ত্বের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভক্তিযোগে সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেন। তিনি

ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ প্রায় ৪০০০ গীত এবং কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নামদেবের সমসাময়িক কয়েকজন সাধকের নাম এবং পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, 'জানি'। সপ্তমবর্ষ বয়সে জানি তাঁহার নিঃস্ব পিতামাতার সহিত পন্দরপুরে বিঠোবাদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেখানে দেবদর্শন করিয়া ভক্তি ও প্রেমে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি আর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন না। কিছুদিন ঐ তীর্থে গৃহহীন অবস্থায় অবস্থান করিবার পর নামদেব তাঁহাকে নিজ মাতার নিকট আনিয়া তাঁহার লালন পালনের ভার দিলেন। তদবধি 'জানি' নামদেবের বাটিতে থাকিয়া তাঁহার গৃহকার্যের সহায়তা এবং সাধন-ভজন করিতেন। একদিন নামদেবের মাতা জানিকে তাঁতার কাজ করিতে আদেশ করেন। তাহাতে জানির বোধ হয় খুব কষ্ট হইতেছিল। সেই সময় বিঠোবাদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে-ছিলেন। তদ্দর্শনে গোনা বাঈ মনে করিলেন যে জানি তাঁহার কার্যে বাহিরের লোকের সাহায্য লইতেছেন। তিনি তজ্জন্য জানিকে তিরস্কার করিতেছিলেন; এমন সময় তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ সাহায্যকারী ব্যক্তি স্বয়ং বিঠোবাদেব। জানিও অনেক কবিতা ও গান রচনা করিয়া-ছিলেন। ঐ গুলি আজও ঘাটে মাঠে সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পইথানের এক হস্তপদহীন সাধু। ইঁহার নাম জানা যায় না। ইনি 'খঞ্জ সাধু' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনিও অতি দরিদ্র বংশ জাত। সুতরাং চলচ্ছক্তি না থাকায় প্রতিবেশিগণ দয়া করিয়া তাঁহাকে আহার দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতেন। খঞ্জ সাধু প্রতিদিন দলে দলে ভক্তগণকে পন্দর-পুরে বিঠোবাদেবকে দর্শনের জন্য যাইতে দেখিতেন। তাহাতে তাঁহারও মন দেবদর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তীর্থযাত্রিগণকে তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু কেহই স্বীকার করিল না। অবশেষে তিনি নিজেই ভূমিতে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়া দেব-দর্শন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি বাটী হইতে গড়াইতে আরম্ভ করিয়া কত জনপদ, প্রান্তর, গিরিসংকট উত্তীর্ণ হইয়া যেদিন অর্ধেক মাত্র পথে অবস্থিত লাহুল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন তাহার পর দিবসই পুণ্য একাদশী তিথি,—এখনও অর্ধেক রাস্তা অবশিষ্ট আছে। সুতরাং ঐ পুণ্য তিথিতে বিঠোবাদেবকে দর্শনে নিরাশ হইয়া তিনি দেবতার নিকট করুণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিঠোবাদেব তখন তাঁহার এই একনিষ্ঠ ভক্তের আকিঞ্চনে তুষ্ট হইয়া নিজেই ঐ লাহুল গ্রামে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

এই সাধুদের কাহিনী শ্রবণ করিলে হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকতার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার কৃপালাভের পথ সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। একমনে একপ্রাণে ডাকিলে ভক্তের আকিঞ্চন তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, তিনি ভক্তাধীন।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীভোলানন্দ-চরিতামৃত—স্বামী ধ্রুবানন্দগিরি-প্রণীত। হরিদ্বার লালতারাবাগ, শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম হইতে প্রকাশিত। ৪৫০ পৃষ্ঠা; মূল্য কাগজে বাঁধাই ২॥০, কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সন্ন্যাসি-সংঘে সুপরিচিত। এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশ মনোজ্ঞভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শিষ্যরূপে গিরি মহারাজের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহার তপস্যা-পূত আধ্যাত্মিক জীবনের চিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পুস্তকে বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সচ্চিৎ গিরি, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী রামতীর্থ, রামদাস কাঠিয়া বাবা, পরশুরামজী, হনুমানজী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহাপুরুষগণের সহিত স্বামী ভোলানন্দজীর সাক্ষাৎকারের কাহিনী অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গিরি মহারাজ বলিয়াছেন, "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি পূর্ব জন্মেই জ্ঞানী ছিলেন। এই জন্মে শুধু লোকহিতার্থে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করেছিলেন।"

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতি গিরি মহারাজের উপদেশসমূহ তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ ও কার্যকর। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিয়াছেন, "অলোকসামান্য মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের তিরোধানে বঙ্গদেশের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীস্বামীজীকেই (স্বামী ভোলানন্দ) তাহাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া মনে করিলেন।" এই অভিমত গুরুভক্তির নিদর্শন হইলেও সত্য নহে। কারণ, বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের প্রভাব বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে যে সামান্য নহে ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, সরস ও সুখপাঠ্য। মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীরমণী কুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল

আমাদের আত্মবোধ ও আত্মবিস্মৃতি—শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ দাসগুপ্ত প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক গোধূলিয়া, বেনারস হইতে প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে লেখক ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিকতা আছে। বইখানির ভাষা, ভাব ও ছাপা ভাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৪শে চৈত্র হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে পূজাদি ও উপনিষৎ পাঠ হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রায় আড়াই হাজার নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় জেলা জজ শ্রীযুক্ত ত্রিদিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জন-সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসুর বক্তৃতাও খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। সর্বশেষে সভাপতি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের প্রশংসা করিয়া সভা সমাপ্ত করেন।

২৫শে চৈত্র মিশন-প্রাঙ্গণে আহূত মহিলা-সভায় উক্ত স্বামীজী ঠাকুর ও মায়ের জীবনাদর্শ অতি চমৎকার ভাবে মহিলাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। পরে কালী-কীর্তন হয়। পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সূর্যদাসের মাথুর পালা-কীর্তন সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে।

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২২শে চৈত্রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় অ্যাডিসনাল্ জজ্ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী, স্থানীয় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী, রংপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা দেন। সভার পর কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত একটি সুন্দর কীর্তন গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পর দিন মহোৎসবে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। ২৪শে চৈত্র আশ্রম-প্রাঙ্গণে আর একটি সভার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে স্বামী অজয়ানন্দজী সময়োপযোগী একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গিরিজানাথ স্কুলে স্বামী অজয়ানন্দজী ও স্বামী গদাধরানন্দজী, একাডেমি স্কুলে বেলুড় মঠ কলেজের অধ্যাপক-স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী ও স্বামী অজয়ানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী বালিকা-বিদ্যালয়ে স্বামী অজয়ানন্দজী ও স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব বক্তৃতা দেন।

রহড়া (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৪শে ফাল্গুন হইতে দিবসত্রয় এই প্রতিষ্ঠানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন প্রাতে নগর-কীর্তন ও শোভাযাত্রার পর বালকগণের ক্রীড়াকৌতুক হয়। অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের ছাত্রবৃন্দ অদ্ভুত ব্যায়ামকৌশল ও যৌগিক আসন প্রদর্শন করেন। পরদিন সকালে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভজনান্তে মধ্যাহ্নে প্রায় সাতশত সাধু ও ভক্তকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। অপরাহ্ণে মিঃ জে এন্ তালুকদার, আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ বালকাশ্রমের ছাত্রগণকে পারিতোষিক দান করেন। এই উপলক্ষে ছাত্রগণের আবৃত্তি ও কৌতুক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আনন্দ প্রদান করে। সন্ধ্যায় ছাত্রগণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্র নাটক অভিনীত হয়। দর্শকবৃন্দ সকলেই ছেলেদের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৃতীয় দিন প্রাতে বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজীর সভাপতিত্বে ছাত্রদের এক সভা হয়। ইহাতে কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ করে এবং বক্তৃতা দেয়। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন শত দরিদ্র-নারায়ণকে ভোজন করান হয়। অপরাহ্ণে অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী পবিত্রানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত এক ধর্মসভায় স্বামী পূর্ণানন্দজী বক্তৃতা দেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০০ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর বক্তৃতার পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চবিংশ বার্ষিক মহোৎসব—গত ৯ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্র জন্মভূমিতে এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবিংশ বার্ষিক মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা ও ভোগাদি হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। বৈকালে মন্দির-প্রাঙ্গণে আহূত এক সভায় স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী ঋতাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। স্বামী রামানন্দজী কর্তৃক ভজন-কীর্তনের পর রাত্রিতে পুনরায় প্রসাদ বিতরণান্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে উৎসব সমাপ্ত হয়। পরে ১১ই বৈশাখ রাত্রিতে মুকুন্দপুর (কামারপুকুর) অপেরা পার্টি "পাতাল-পুরী" যাত্রাভিনয় করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গয়া—১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী—আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রম কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি ছাত্রা-বাস পরিচালিত হইয়াছে। হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে এ বৎসর ২০৮০৩ জন রোগী ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন। তেলবিঘা মেথরপল্লী এবং গয়াওয়ালবিঘা ডোমটোলী নৈশ বিদ্যালয়ে মোট ৫৯জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। এ বৎসর আশ্রম পাঠাগারে ৮০৮ খানি পুস্তক, দুইখানি দৈনিক ও আটখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। ১১৭ জন পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। আশ্রম-ছাত্রাবাসে দুইজন গরীব ছাত্র রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন এবং চারিজন গরীব ছাত্রকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রভৃতির জন্মতিথি পূজা ও বার্ষিক সাধারণ উৎসব, প্রতিমায় কালীপূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশু-খ্রীষ্ট ও অন্যান্য অবতারপুরুষদিগের জন্মদিবস যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমের কর্মিগণ পিতৃপক্ষ মেলার সময় পৃথক ডাক্তারখানা খুলিয়া পীড়িত তীর্থযাত্রিগণের সেবা এবং দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে প্রায় পাঁচশত ধুতি ও শাড়ী দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রমের মোট আয় ৩৫৯৩৷৶০ এবং মোট ব্যয় ২৫১৭৶১৫।

পাণিহাটি মহিলা-সমিতি—গত ২য় বৈশাখ নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী পুণ্যানন্দজী ইহাতে পৌরোহিত্য করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, ভজন প্রভৃতি এই সভার অঙ্গ ছিল। স্থানীয় চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় স্বামীজীর কর্মময় জীবনের পরিচয় দেন। তৎপরে সমিতির পক্ষ হইতে কুমারী শান্তি গুপ্তা সভাপতিকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। ইহার উত্তরে স্বামীজী একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ বক্তৃতায় বলেন, "আজ ভারতের আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই কৃষ্ণমেঘ ভেদ করে উজ্জ্বল সূর্যরূপে ভারতের স্বাধীনতা আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে একটা মহা বিপ্লব অনিবার্য কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ হতে জন্মগ্রহণ করবে একটি শ্রেষ্ঠ বীর জাতি। পাঞ্জাবের শিখ-সম্প্রদায় আজ যে বীর বলে পরিচয় দেয় তার মূলে ছিল অত্যাচার। তাই আজ আপনাদের কাছে অনুরোধ—ভারতীয়

নারীর আদর্শ জীবনে ধারণ করে আপনারা অগ্রগামিনী হউন, নোয়াখালি কলকাতার দৃশ্য আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আত্মরক্ষায় ও আত্মসম্মানে নিজেকে সকল প্রকারে তৈরী করতে হবে।"

ডিগবয় (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৯শে চৈত্র হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী সৌম্যানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজীর উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজাদি এবং বিভিন্ন স্থানে জনসভার অধিবেশন হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ", (২) "ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান", (৩) "বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য", (৪) "নবীন ভারতের জন্মদাতা স্বামী বিবেকানন্দ"। স্বামী সৌম্যানন্দজীও উপরোক্ত বিষয়ে বক্তৃতা ও ভজন-সঙ্গীতাদি এবং স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

রায়গঞ্জে (দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৬শে চৈত্র স্থানীয় বিবেক-সঙ্ঘের সভাবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজাদি হইলে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে একটি জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী ও দিনাজপুর আশ্রমের স্বামী গদাধরানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

খুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৩শে ও ২৪শে চৈত্র খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হয়। সন্ধ্যার পর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী, দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সেন গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইটাচুনা (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র ইটাচুনা গ্রামে প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথম দিন সংঘকর্তৃক ভজন; 'কেনোপনিষৎ' পাঠ, প্রদর্শনীর উদ্বোধন, আবৃত্তি ও রচনা-প্রতিযোগিতা ও শ্রমিকসভার অনুষ্ঠান হয়। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হইলে মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। পূর্বসপ্তাহে পার্শ্ববর্তী ছোটসরশ গ্রামেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং পাঁচশতাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৬ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন প্রাতে কীর্তন সহ শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, কথামৃত, চণ্ডী ও উপনিষৎ পাঠ ও ভোগ হয় এবং সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় মুন্সিফ্ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ধীরেন্দ্রলাল দাস ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

কুমিল্লা—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন—গত ১১ই বৈশাখ বঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাকা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি সভায় উক্ত স্বামীজী 'কর্মযোগ' এবং পরদিন 'জন্মান্তরবাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

শূদ্র-জাগরণ

সম্পাদক

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।" অন্যত্র—"এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্ম্ম-কর্ম্ম সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজ্‌ম্‌, এনার্কিজ্‌ম্‌ নাইহিলিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" স্বামীজীর জীবিতাবস্থায় কমিউনিজ্‌ম্‌ মস্তকোত্তোলন করে নাই। এই জন্য তিনি ইহার নাম উল্লেখ করেন নাই।

অধুনা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগ সম্পূর্ণ অতীত হইয়াছে। বৈশ্য-প্রতিপত্তির যুগও সকলের চক্ষের সম্মুখে দ্রুত বেগে চলিয়া যাইতেছে এবং শূদ্র-প্রভুত্বের যুগ নবোদ্যমে উহার স্থান অধিকার করিতেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে ভারতের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা লাভের বিরাট আন্দোলন, সকল বিষয়ে সমানাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে অধিকার-নিরাকৃত তফসিলভুক্ত জাতিসমূহের ব্যাপক আন্দোলন, ট্রেড্‌ ইউনিয়ন এবং কৃষক ও শ্রমিক সংঘসমূহের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন এবং বুর্জুয়া-প্রাধান্য নষ্ট করিয়া প্রলিটেরিয়ট-প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য কমিউনিষ্টদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ভিতর দিয়া বর্তমান ভারতে শূদ্র-জাগরণ প্রকট।

ভারতের ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও বিদ্যা ধর্ম ত্যাগ সংযম তপস্যা পরার্থপরতা প্রভৃতি বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য বর্ণ—এমন কি প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজশক্তির উপরও অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রধানতঃ তাঁহাদেরই অবদান। এই সকল অসাধারণ গুণরাশিতে বিভূষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ-দের অভ্যুদয় হয় এবং কালচক্রের আবর্তে এই-গুলির অভাবে তাঁহাদের অধঃপতন ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্ব্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে

বা আধিপত্য-বিস্তারে নিয়োজিত হয়। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত।" কালক্রমে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বিদ্যা ধর্ম ত্যাগ ও সংযমহীন হইয়া স্বার্থবশে 'যেন তেন প্রকারেণ' পৈতৃক প্রভুত্ব ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আড়ম্বরপূর্ণ বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান ও মন্ত্রবহুল অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের এই সকল কার্যে ক্ষত্রিয়গণ ক্রমেই অধিকতর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলে উভয় বর্ণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রভুত্ব-বিস্তার করিবার চেষ্টার ফলেই যে পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম আবির্ভূত হয়, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণেরা সংখ্যাল্প হইয়াও তাঁহাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সংখ্যাবহুল শূদ্রাদিবর্ণের উপর ক্রমেই অধিকতর বিধি-নিষেধের বোঝা চাপাইতে থাকেন। তাঁহারা শূদ্রগণকে ধর্মসাধনে বেদপাঠে ওঁকার-উচ্চারণে বিদ্যার্জনে —এমন কি সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করেন। ওঁকার-উচ্চারণ ও বিদ্যার্জনের জন্য শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ' ও 'শরীরভেদ' প্রভৃতি অমানুষিক দণ্ডদানের ব্যবস্থা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদের দুরপনেয় কলংক! মুসলমান-প্রভাব-প্লাবনের যুগপর্যন্তও ব্রাহ্মণ-স্মৃতিকারগণ শূদ্রদের উপর নূতন নূতন বিধি-নিষেধের বোঝা চাপান। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে শূদ্রগণ হিন্দুধর্ম হিন্দুজাতি হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুস্থানকে আপনার বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পান নাই। এই জন্য তাঁহারা বৈদেশিকদের আক্রমণ হইতে এই সকল অমূল্য সম্পদ রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বী স্বদেশবাসীর নির্মম অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিহিংসাবশে বৈদেশিকদের প্রভুত্ব বরণ করিয়া লইয়াছেন। যদি এই বিরাট শূদ্রজনসংঘ বাধা দিতেন তাহা হইলে মুষ্টিমেয় বৈদেশিকের পক্ষে ভারত আক্রমণ একেবারেই সম্ভব হইত না।

স্মরণাতীত কাল হইতে শূদ্রগণকে ধর্ম বিদ্যা সংস্কৃতি এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্বাহ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার ফলে তাঁহারা অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ নিম্নশ্রেণী নামে অভিহিত সংখ্যা-বহুল শূদ্রজনসাধারণকে লইয়াই দেশ ও জাতি। তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি—জাতির উন্নতি এবং তাঁহাদের অবনতিতেই দেশের অবনতি—জাতির অবনতি। এখন আমরা সবিস্ময়ে দেখিতেছি যে, ভারতে উচ্চশ্রেণী নামে আখ্যাত ব্রাহ্মণাদি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ধর্ম দর্শন বিদ্যা সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পৃথিবীর সকল জাতিকে অতিক্রম করা সত্ত্বেও এই সকল অমূল্য সম্পদে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র-জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখায় সমগ্র দেশ ও জাতি উন্নত হইতে পারে নাই। ইংরাজের আমলে উচ্চনীচনির্বিশেষে সকল জাতির সমান অধিকার স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু নিদারুণ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের জন্য নিম্নবর্ণের শূদ্রগণ শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমষ্টিভাবে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। পরন্তু বিদেশী বণিকদের প্রবল প্রতিযোগিতা এবং স্বদেশী ধনিকদের নির্মম শোষণে তাঁহাদের জীবিকার্জনের সামান্য বৃত্তিগুলিও ক্রমেই বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের দারিদ্র্য আরও উৎকটাকার ধারণ করিতেছে। ওদিকে উচ্চবর্ণ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়া ক্রমেই নানা বিষয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের ভেদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতে সমস্ত দুঃখের মূল নিম্নশ্রেণী

ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ সৃষ্টি হওয়া। এই ভেদ নাশ না হইলে কোন কল্যাণের আশা নাই।"

উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর পার্থক্য দূর করিতে হইলে নিম্নশ্রেণীকে ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতিতে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ করিয়া তোলা আবশ্যক। এজন্য সর্বাগ্রে নিম্নশ্রেণীর সকল নর-নারীর সকল বিষয়ে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা দরকার। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সকল বিষয়ে দেশবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। কারণ, যাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা নাই, যাহারা পরাধীন, তাহাদের পক্ষে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। ইহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াই স্বদেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দ দেশের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণকে যে সকল অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যে সকল অধিকার দেওয়া উচ্চশ্রেণীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, সেই সকল অধিকার তাহাদিগকে অবিলম্বে অবশ্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। উচ্চ-শ্রেণী যে স্বাধীনতা বিদেশীর নিকট দাবী করিতেছেন, সে স্বাধীনতা তাঁহাদের স্বদেশবাসী নিম্নশ্রেণীকে অতি শীঘ্র দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়তঃ বাধ্যতামূলক। বৈদেশিক শাসকগণ, পৃথিবীর সকল অ-হিন্দু জাতি, কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা এবং অন্যান্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানও নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের সকল বিষয়ে সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে শিক্ষায় রাজকার্যে যান-বাহনে অফিসে কারখানায় বিচারালয়ে বিদেশে তাঁহাদের সমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে এই গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগেও সমাজক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণকে বহু অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও পল্লিগ্রাম-সমূহের হিন্দু-সমাজে নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দুজাতি উচ্চশ্রেণীর নিকট অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া নানা ভাবে অপমানিত ও অসম্মানিত হইতেছেন। এ যুগেও বহু মন্দিরে ও ধর্মস্থানে নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের প্রবেশাধিকার নাই, উচ্চশ্রেণীর ক্ষৌরকারগণ তাহাদিগকে খেউরি করে না, ধোপারা তাহাদের কাপড় কাচে না, মাঝি ও জেলেরা তাহাদিগকে নৌকা ভাড়া দেয় না, অনেক স্থানে কোন কোন অস্পৃশ্য জাতি হাটে বাজারে দুধ তরকারি প্রভৃতি আনিলে উচ্চশ্রেণীর অনেক হিন্দু উহা ক্রয় করেন না, ইত্যাদি। এই সকল কারণে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের অসন্তোষ ক্রমেই বিদ্রোহে পরিণত হইতেছে। তপসিলভুক্তশ্রেণীর ব্যাপক আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। ইহা প্রতিরোধ করিতে হইলে নিম্নশ্রেণী-সমূহকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, অধিকার-নিরাকৃত জাতিসকল তাহাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্বার চাহিতেছে। তাহাদিগকে তাহাদের জন্মগত অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া অপরিহার্য। কেবল শূদ্র নয় পরন্তু অনার্য জাতিসমূহকে আর্য অধিকার দিলে, আর্য জাতির ধর্মগ্রন্থে ও সাধনে আহ্বান করিলে উচ্চবর্ণ এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনেক শাস্ত্রকার ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষে শূদ্রগণকে সমান অধিকার দানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। মন্বাদি স্মৃতিকারগণ বেদপাঠে শূদ্রদের অধিকার দেন নাই, কিন্তু যজুর্বেদে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'আমি সকল মনুষ্যের

(জনেভ্যঃ) জন্য এই কল্যাণকারিণী (ইমাং কল্যাণীম্) উপদেশ দিতেছি। তোমরা অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও এই সকল উপদেশ দিবে।' (২৬।২)। পদ্মপুরাণে আছে, 'ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। ভগবানের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র।' বরাহপুরাণেও এইরূপ কথা আছে। মনু শালগ্রাম পূজায় শূদ্রদের অধিকার দেন নাই, কিন্তু স্কন্দপুরাণকার লিখিয়াছেন, 'শূদ্রগণও শালগ্রাম পূজা করিলে মুক্তিলাভ করে।' ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রিয়ব্রত-উপাখ্যানে শালগ্রাম পূজা করিয়া ধর্মব্যাধ মুক্তিলাভ করিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, 'অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব দীক্ষা লাভ করিয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় হইয়া থাকেন।' শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, 'শূদ্র কিম্বা অন্ত্যজ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণান্তর বৈষ্ণব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।' গৌতমসংহিতায় আছে, 'চণ্ডালও ভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন।' শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'অসৎ কুলজাত স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' মনু শূদ্রগণকে ওঁকার উচ্চারণে অধিকার দেন নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন, 'যে কোন বর্ণের লোক ওঁকার উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে লাভ করেন।' শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তরাজ রায় রামানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে বলেন। কিন্তু তিনি শূদ্র বলিয়া ইহাতে সংকোচ প্রকাশ করায় শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে—

"যেই জন বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থকার বলেন, 'হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ।'

এইরূপে আরও অসংখ্য শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, বহু শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদ স্বীকার করেন নাই। গুণ এবং কর্মই ছিল তাঁহাদের উচ্চনীচ জাতিনির্ণয়ের মানদণ্ড।

প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্মে উৎকর্ষ লাভ করিয়া অনেক শূদ্র উচ্চবর্ণে উন্নীত হইয়াছিলেন। মহাভারত মনুসংহিতা যমসংহিতা পরাশরসংহিতা আপস্তম্বসংহিতা প্রভৃতিতে এইরূপ উন্নয়নের স্পষ্ট সমর্থন আছে। রামায়ণ-প্রণেতা ঋষি বাল্মীকি প্রথমজীবনে রত্নাকর দস্যু, বেদ-বিভাগকারক ও মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ধীবরকন্যাজাত এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ বার-বনিতা উর্বশীর গর্ভসম্ভূত ছিলেন। মাংসবিক্রেতা তুলাধর জাজলি ঋষি এবং পিতৃ-পরিচয়হীন জাবাল ব্রাহ্মণরূপে সম্মানিত হন। ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য কৃপ দ্রোণ ও কর্ণ তাঁহাদের মাতার বিবাহের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র এবং শূদ্র নাভাগ ব্রাহ্মণবর্ণে উন্নীত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-পুরাণে আছে যে, পূর্বে কেরল-রাজ্যে কেবল শূদ্র ধীবর ছিল। পরশুরাম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে উন্নীত করেন। এইরূপে গুণ ও কর্মানুসারে নিম্ন-বর্ণের উচ্চবর্ণে উন্নয়নের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। গুণ-কর্মানুসারে উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণে অবনমনের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মন্বাদি স্মৃতিকারগণও এইরূপ অবনমন সমর্থন করিয়াছেন। বাহুল্য-আশংকায় এ স্থলে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল না। সম্ভবতঃ মুসলমান-যুগ হইতে বর্ণমাত্রই জন্মগত হওয়ায় এই প্রকার উন্নয়ন ও অবনমন বন্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—মেডিয়ান ইরানীয়ান ব্যাকট্রিয়ান পার্থিয়ান সাইথিয়ান কুশান তুর্ক গ্রীক শক হুন

মুসলমান প্রমুখ বহু অ-হিন্দু জাতি যে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই।

মুসলমান-যুগে রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক রামানন্দ কবীর নানক চৈতন্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-যুগে রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ কোন ধর্মাচার্যই ধর্ম-সাধনে জন্মগত ব্রাহ্মণ-শূদ্রভেদ স্বীকার করেন নাই। বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম এই সকল মহাপুরুষের প্রবর্তিত ধর্মমতের সমষ্টি। এইজন্য বলা যায় যে, প্রচলিত হিন্দুধর্মে জন্মগত ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদের স্থান নাই। ধর্মাচার্য রামানন্দ সমাজচ্যুত হইয়া বিশাল রামায়েৎ সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রুহিদাস (চামার), কবীরদাস (জোলা), এবং রুহিদাসের শিষ্য মীরাবাঈ ও সুরদাস, কবীরের শিষ্য কামাল (মুসলমান) ও তৎশিষ্য দাদূ (মুসলমান) এবং তাঁহার শিষ্য গরীবদাস প্রভৃতি কর্তৃক এক একটি বিরাট হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন অস্পৃশ্য ধর্মাচার্য তিরুপ্পন-আলোয়ার নন্দ চোকামেলা নম্পোদোয়ান তিরুভালুভা ছোকা সধ্ন চরণদাস মুলুকদাস বলরামহাড়ি কেশাপাগলা প্রভৃতি এক একটি হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। উচ্চবর্ণের বহু হিন্দু নিম্নবর্ণের এই মহাপুরুষদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মাচার্যদের অশ্রুতপূর্ব ধর্মভাব, অপূর্ব কৃচ্ছ্রসাধন এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমানে ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দুগণ ধর্মক্ষেত্রে এই সকল আচার্যদের চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীমূলক মতানুসরণ করিলেও সমাজ-ক্ষেত্রে ভেদ-বিরোধ-বর্ধক দেশাচার লোকাচার ও স্ত্রী-আচার অনুসরণ করিতেছে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজে এই বৈপরীত্য-ভাবই হিন্দুজাতির অধঃপতনের মূলকারণ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার্যগণ এবং গীতা উপনিষদাদি প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতেই হইবে। অনেকে মনে করেন যে, প্রচলিত হিন্দুধর্মই হিন্দুসমাজের অধঃপতনের মূলকারণ। কিন্তু ইহা একেবারেই সত্য নহে। বরং প্রচলিত হিন্দুধর্মের নির্দেশে হিন্দুসমাজ পরিচালিত না হওয়াতেই যে ইহার অধঃপতন ঘটিয়াছে ইহাই সত্য। ধর্ম ও সমাজ উভয় বিষয়েই মানুষের উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে স্বাধীনতা আবশ্যক। কারণ, স্বাধীনতাই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের মুখ্য সোপান। হিন্দুধর্ম বহু মত ও বহু পথের সমষ্টি এবং ইহাদের যে কোন একটির অনুসরণে হিন্দু-মাত্রেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এইজন্য হিন্দুগণ ধর্মবিষয়ে স্বাধীন এবং সাধারণতঃ পরমতসহিষ্ণু ও উদার। পৃথিবীর অহিন্দু ধর্মমাত্রই মূলতঃ একটি ধর্মমত ও একটি পথের উপর স্থাপিত। এইজন্য ধর্ম-বিষয়ে তাহাদের একেবারেই স্বাধীনতা নাই এবং তাহারা সাধারণতঃ পরধর্ম-অসহিষ্ণু ও অনুদার। পক্ষান্তরে অহিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এই জন্য তাহারা সমাজ-ক্ষেত্রে সহিষ্ণু উদার এবং তাহাদের সমাজ উন্নত ও সাম্য-মৈত্রীর অনেকটা নিকটবর্তী। কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক বিষয়ে কোন স্বাধীনতা নাই। এই জন্য তাহারা সমাজক্ষেত্রে অসহিষ্ণু অনুদার এবং তাহাদের সমাজ অনুন্নত ও অনৈক্য-বিরোধ-বিদ্বেষের লীলাস্থল। অহিন্দুদের সামাজিক ঔদার্যের জন্য তাহারা যে কোন বিধর্মীকে তাহাদের সমাজে স্থান দিতে পারে এবং তাহাদের সমাজে উচ্চনীচ শ্রেণী-ভেদ তত মারাত্মক নয় বলিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী। এই কারণে তাহাদের সংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক অনৌদার্যের জন্য তাহারা কোন অহিন্দুকে তাহাদের সমাজে

স্থান দিতে অক্ষম এবং তাহাদের সমাজে উচ্চনীচ শ্রেণী-ভেদ অত্যন্ত আত্মঘাতী বলিয়া তাহারা সংঘশক্তিহীন ও দুর্বল। এই কারণে তাহাদের সংখ্যাও দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই আত্মঘাতী সমাজ-ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির গৃহবিবাদ এবং তৎপ্রসূত বহুবিধ দুঃখ-দুর্দশার মূলকারণ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ধর্মের ন্যায় সমাজেও সকল হিন্দুকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, ঔদার্য অবলম্বন করিয়া সাম্য-মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে এবং অহিন্দুদের মধ্যে যাহারা হিন্দু হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সম্মানজনক স্থান দিতে হইবে। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সমূহের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ থাকাপর্যন্ত হিন্দুজাতির গৃহবিবাদ কখনও দূর হইবে না। এই জন্য হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের সকল নরনারীর সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের দ্বার উন্মুক্ত করা আবশ্যক। যাহাতে নিম্ন অবনত ও অনুন্নত শ্রেণীর শূদ্রগণ উত্তম শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস এবং রোগে ভাল চিকিৎসা পায় উহার ব্যবস্থা করা দরকার। এইরূপ ভাবে সংস্কার করিলে কেবল শূদ্রজনসাধারণই উন্নত হইবেন না, পরন্তু উচ্চবর্ণ আরও উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, যে ধর্ম ও যে সমাজ সকল নরনারীর উন্নতি লাভের এবং সকলের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সহায়ক না হইয়া প্রতিবন্ধক হইবে, সে ধর্ম ও সে সমাজের বিনাশ বর্তমান যুগে অবশ্যম্ভাবী।

এতকালে ব্রাহ্মণাদি মুষ্টিমেয় জাতি নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেও সংখ্যাবহুল শূদ্র-জনগণ সকল বিষয়ে নিম্নে পড়িয়া থাকায় হিন্দুরা জাতিহিসাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই এবং সমগ্র দেশও উন্নত হয় নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দেশের সমষ্টির উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া ব্যষ্টির উন্নতিতে সমগ্র জাতি বা দেশ উন্নত হয় না। বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এতকাল এই পরম সত্য জানিয়াও জানেন নাই এবং বুঝিয়াও বুঝেন নাই। বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিতেছেন যে, দেশের সমষ্টি শূদ্রশক্তি জনসাধারণের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ব্যষ্টিশক্তি ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা—এমন কি আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, নিম্নশ্রেণী-নামধেয় শূদ্রজনসাধারণকে লইয়াই দেশ, তাঁহারাই দেশের মেরুদণ্ড, জাতির প্রাণশক্তি, তাঁহাদের অভ্যুদয়েই দেশের অভ্যুদয়—জাতির উত্থান। এই জন্যই তিনি তাঁহাদের জন্মগত সকল অধিকার তাঁহা-দিগকে অতিশীঘ্র ফিরাইয়া দিবার জন্য উচ্চ-শ্রেণীকে সম্বোধন করিয়া মর্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়া-ছেন, "এত দিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজ-রাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে তাতে পেয়েচে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, সনাতন দুঃখভোগ করেচে, তাতে পেয়েচে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা

রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহবিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন-পেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও—হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও; কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।"

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের এই উদ্দীপনা-পূর্ণ বাণী ভবিষ্য ভারতের শূদ্র-জাগরণের একটি চমৎকার আলেখ্য। বর্তমানে দেশ-বিদেশে সর্বত্রই শূদ্রগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় জাগ্রত হইতে-ছেন। এখন সকল দেশেই ব্যাপক ভাবে শূদ্র-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে শূদ্রশক্তি দ্বারাই যে সকল দেশের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি পরিচালিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে সময় থাকিতে যদি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ তাঁহাদের অমূল্য সম্পদ ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি ও বিদ্যা প্রভৃতি শূদ্রগণকে দান করেন তাহা হইলে শূদ্রগণ এই সকল গুণান্বিত হইয়া অভ্যুত্থিত হইবার সুযোগ পাইবেন। ইহার ফলে ভারতের এই সম্পদরাশিও রক্ষা পাইবে। পক্ষান্তরে ভারতের শূদ্রগণ যদি এই সকল সম্পদে ভূষিত হইবার সুযোগ না পাইয়া শূদ্রধর্ম শূদ্রকর্ম ও শূদ্রমনোবৃত্তি লইয়া অভ্যুত্থিত হন, তাহা হইলে এই সম্পদনিচয় বিনষ্ট হইবে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। এই জন্য আমরা শূদ্রজনসাধারণকে অতিশীঘ্র সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান করিয়া উন্নতি লাভে তাঁহাদিগকে সর্ব প্রযত্নে সাহায্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি।

"আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর যতই কেন "ডম্‌ডম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেচেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা!"

স্বামী বিবেকানন্দ

আমরা দেখেছি

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

আজি দিগন্তে মন্থর পদে
আসিছে অলস সন্ধ্যা
ভ্রূণে ঘূর্ণিত শত সন্তান
বাজে মর্ম্মরন্ধ্রে ধ্বংসের গান
তাইতো আজিকে চঞ্চলি উঠে
নিষ্ফলা ধরা বন্ধ্যা।
প্রলয়কেতন ঝড়ের নেশায়
উত্তর-মেরু আজিকে উড়ায়,
কে আছিস্ তোরা আজি কে কোথায়
আয় চলে আজ আয় চলে আয়,
স্রোতের টানে
ঝঞ্ঝা বাদল বাজায় মাদল
মত্ত প্রেমের গানে।
দিকে দিকে আজ বিপুল প্লাবন,
তোদের নয়নে কেনরে শ্রাবণ,
নেচে যারে আজ রক্ত মহোৎসবে।
মনের পাগল মানে না বাঁধন
দূর ক'রে দাও প্রিয়ার কাঁদন
অভিসারের লগ্নে আজিকে
বেরোও মাভৈঃ রবে।
নয়তো আজিকে হিসাবের দিন
স্মৃতির আলোক হয়ে যাক ক্ষীণ,
ভবিষ্যতের গর্ভে কাঁদুক
শতেক সফল আশা,
ভাঙন ধরেছে নদী তটে তটে
মৃত্যু ঘনায় ঘন-বট-জটে
তাহার তীরেতে কেন বৃথা আজ
গড়িবে সুখের বাসা।

বহু দিন ধরে অনেক হয়েছে চলা,
নানা সুরে সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে
হয়েছে অনেক বলা,
চৈত্রপবনে শিহরিছ ঢের
দেখেছ বিরহ বাদলে
প্রিয়ার মূরতি হেরেছ অনেক
কল্পিত নিজ আদলে।
ভীরু প্রেমিকের স্বপ্নকুঞ্জে
এসেছ গিয়েছ কতবার,
প্রভাত অরুণে ধরণীর রূপ
দেখেছো তো তুমি শতবার।
গগনে গগনে এবার নেমেছে
সন্ধ্যার-ঘন ছায়া,
ছিন্ন করিতে কেন দ্বিধা-ভয়
পুরানো পৃথিবী-মায়া।
অন্ধ নিশীথে দুর্গমপথে
দুর্জয় নব গানে,
কাছে এসো মোর হাতে হাত দাও
আমরা দুজনে
নেব সেই পথ চিনে।
থাকুক সকলে এখনো স্বপ্নে
প্রিয়ার বক্ষতলে,
আমরা দেখেছি বহুদূরে সেথা
লক্ষ মাণিক জ্বলে ;
আমরা দেখেছি বিদ্রূপতার
নেইকো সেথায় ক্ষমা,
জীবন-সূর্য সাংগ করেছে
মানব-পরিক্রমা।
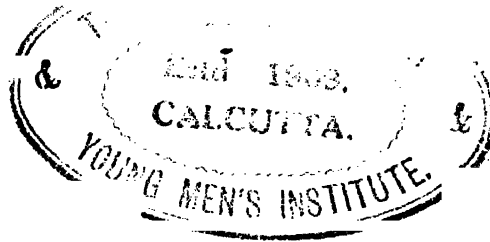
হিন্দু-ধর্ম্ম, ধর্ম্মান্তরিতকরণ ও পুনর্গ্রহণ*

ডক্টর এ এস্ অল্টেকর, এম্-এ, এল্-এল্ বি, ডি-লিট্

পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুগণের ভয়ঙ্কর বিপত্তিই আজ হিন্দু-সমাজে বাস্তবতা-বোধ আনিয়াছে ও হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তব্য নিরূপণে সহায়ক হইয়াছে। আজ আমরা যে বিচার বা মতবাদ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা যদি আজ হইতে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে করিতাম তবে আমাদের মধ্যে এই সঙ্কটের প্রশ্নই উঠিত না এবং ভারতীয় মুসলমানগণের সংখ্যা আজ এক কোটীর উপরে কোনও প্রকারেই হইতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্য-যুগের হিন্দু-সমাজ অহিন্দুর হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্ম-ত্যাগী হিন্দুর হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ বিষয়ে অযৌক্তিক ও অন্যায় ভাবই পোষণ করিয়াছে। প্রতারণা বা বলপূর্ব্বক যে ব্যক্তি একবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে, সে অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহাকে কখনই হিন্দু-সমাজে স্থান দেওয়া হইত না। যাহারা হিন্দুর ঘরে জন্ম-গ্রহণ করে নাই, তাহাদের হিন্দু-ধর্ম্মে বা সমাজে আজও স্থান নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'বার্ণিয়ার' (Bernier) নামক একজন ফরাসী পর্য্যটক কাশীর পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আপনারা মনে করেন আপনাদের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে আপনারা আমাকেও আপনাদের ধর্ম্ম-গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করুন না?" কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন, "আমরা কখনও ইহা প্রতিপাদন করি না যে আমাদের ধর্ম্ম সকলেরই জন্য উৎকৃষ্ট। এই ধর্ম্ম কেবল আমাদের জন্যই—হিন্দুদিগের জন্যই ভগবানের অভিপ্রেত এবং হিন্দুদিগের পক্ষেই ইহা উৎকৃষ্ট ও অনুবর্ত্তনীয়; অন্যান্য ধর্ম্ম অপরের পক্ষে উত্তম হইতে পারে, তাঁহারা তাহারই অনুসরণ করুন। আমরা আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মে অপর কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না।"

আজ পূর্ব্ব-বঙ্গের হৃদয়বিদারক ঘটনার ফলে হিন্দু-সমাজের সম্মুখে যে নিদারুণ প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য প্রাচীন ভারতে হিন্দু-সমাজে অন্য ধর্ম্মীর হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ ও হিন্দু-ধর্ম্ম-ত্যাগীর হিন্দু-ধর্ম্মে পুনরন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে কি বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা বিশেষ সহায়ক হইবে। এজন্য তদ্বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৈদিক যুগে বিধর্ম্মীর সনাতন ধর্ম্ম-গ্রহণ

বৈদিক যুগের হিন্দুগণ সমগ্র বিশ্বকেই আর্য্য-ধর্ম্মী রূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের ধ্যেয় ছিল—"কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্"—

* ডক্টর এ এস্ অল্টেকর, এম্-এ, এল্-এল্ বি, ডি-লিট্ কাশী হিন্দুবিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতেতিহাস ও প্রাচ্যসংস্কৃতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। পূর্ব্ব-বঙ্গের বিধ্বংস-লীলার মাসাধিক কাল পরে তিনি "Hinduism, Conversion and Reconversion" শীর্ষক কয়েকটি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বাঙ্গালায় প্রচারার্থ এই প্রবন্ধটী স্বামী চিন্ময়ানন্দজী কর্ত্তৃক অনূদিত।

'আমরা সকল জগদ্বাসীকেই আর্য্য (হিন্দু)-ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী করিব।' ঐ যুগে ভারতবর্ষে আর্য্যেতর আরও কয়েকটী ধর্ম্ম-মত, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি বর্ত্তমান ছিল। এইগুলি ক্রমে তদানীন্তন হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অবশেষে আর্য্যকরণ বা বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বিগণের হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ এরূপ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল যে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন মতবাদ-সংমিশ্রিত নবীন স্বরূপপ্রাপ্ত পরবর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রাচীনকালের আর্য্যেতর ধর্ম্ম, মতবাদ বা সংস্কৃতির কোনও রূপ বিরোধের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। এইরূপ আর্য্যকরণ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ও সর্ব্ব-মত-সহনশীলতার মধ্য দিয়াই সম্ভব হইয়াছিল। বহু-সংখ্যক আর্য্যেতর ধর্ম্মের দেবতাকে আর্য্য বিশ্ব-দেব-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল; এমন কি অনার্য্যসমাজের সহিত আর্য্যধর্ম্মিগণের বিবাহাদিরও প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগেও দেখা যায় যে অর্জ্জুন ও ভীমের মত আদর্শচরিত্র মহাবীর, উড়ুপী ও হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই উড়ুপী ও হিড়িম্বা উভয়েই যে অনার্য্যজাতীয়া ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রীকদিগের হিন্দু-ধর্ম্মগ্রহণ

মহাভারতীয় যুগের পরেও আমরা দেখিতে পাই যে বিধর্ম্মী বা বিদেশিগণেরও হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষা কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক্-বাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ঐ সময় হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পাঞ্জাবে গ্রীক্গণ রাজত্ব করেন। গ্রীক্গণের মধ্যে অনেকে এই দেশেই বসবাস করিতে থাকেন। যে সকল গ্রীক্ এ দেশে রহিয়া গেলেন তাঁহারা সকলেই ক্রমে হিন্দু বা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজভুক্ত হন। গ্রীসদেশীয় রাজা 'মিনেন্দর' (Menander) ও 'হারমেলোস' (Hermalos) গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের দেশবাসী অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্মাদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতীয় নানা গিরি-কন্দরে ও বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ও গ্রীসদেশীয় প্রাচীন কলার সংমিশ্রণে যে সকল অপূর্ব্ব শিল্প-কলা ও ভাস্কর্য্য-বিস্তার নিদর্শন দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই, তাহা হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত গ্রীক্ভাস্করগণের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল।

এরূপ অনুমান করা নিতান্ত ভুল হইবে যে ঐ সময়ে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মই বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আশ্রয় দিত; ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে হিন্দু-ধর্ম্মও এইরূপ বিদেশী বা বিধর্ম্মিগণকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিত। যে সকল গ্রীক্ এদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের অনেকেই হিন্দুর ধর্ম্ম-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে হেলিওদোরাস (Heliodorus) নামক একজন গ্রীক্ রাজনীতিজ্ঞ তক্ষশীলার রাজা অন্তিয়ল্কীদাস (Antialkidas) দ্বারা তদীয় দূতরূপে প্রেরিত হইয়া মধ্য-ভারতের বিদিশা-নগরে আসিয়াছিলেন। মালব-রাজধানী বিদিশাতে তিনি অল্পকাল অবস্থান করেন। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইনি পরম ভাগবত ছিলেন এবং বিদিশা-নগরে তাঁহার অবস্থিতির স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ মালব-রাজধানীর বিষ্ণুর প্রধানতম মন্দিরের সম্মুখে একটী গরুড়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা মোটেই অতিরঞ্জিত গল্প নহে। যাঁহার ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে, তিনি এখনও জি-আই-পি রেলওয়ের ভেলসা (Bhelsa) নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ব্যাস-নগরে (Besnagar) প্রাচীন বিদিশায় উপস্থিত হইয়া এই গরুড়-স্তম্ভ স্বয়ং

দেখিয়া সন্দেহ-নিবৃত্তি করিতে পারেন। এই গরুড়-স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া তদুপরি উৎকীর্ণ শিলা-লিপি হিন্দুধর্ম্ম যে এককালে বিদেশী বিধর্ম্মী গ্রীকৃগণকেও স্বধর্ম্মে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই ঘোষণা করিতেছে।

শক ও পার্থগণের হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রহণ

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০ বৎসর হইতে ৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা জাতীয় বৈদেশিক বিজেতারূপে ভারত-বর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থিয়ান, শক এবং কুশানগণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিজেতাগণ ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই বিজিত হিন্দু-জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নিকট মস্তক অবনত করিলেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দুই পুরুষের অল্প সময় মধ্যেই শকগণ সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল প্রথম দুই পুরুষের মধ্যেই তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির বৈদেশিক নাম রাখা হইয়াছিল, যেমন চস্ত্‌তানা (Chasthtana), ঘ্‌সমোতিকা (Ghsamotika), ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহাদের তৃতীয়পুরুষ হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু নাম, যেমন রুদ্রদমন, জয়দমন প্রভৃতি গ্রহণ করেন। পশ্চিম প্রান্তীয় ক্ষত্রপ বংশের তৃতীয় রাজা তো একজন গোঁড়া হিন্দু এবং হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তাঁহার সরকারী কাগজ-পত্রে তিনি গর্ব্বের সহিত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে তিনি একজন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দু এবং হিন্দুদিগের জাতীয় পবিত্র ভাষা সংস্কৃতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ঐ সময়ের একটী উল্লেখযোগ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, যখন রুদ্রদমনের সম-সাময়িক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সাতবাহন নৃপতিবৃন্দ নিজেদের সরকারী কাগজ-পত্রে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিতেন, ঐ সময়েই রুদ্রদমন (উত্তর-ভারতে) স্বীয় রাজকীয় কাগজ-পত্রে সংস্কৃত ভাষারই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

উত্তর-ভারতের কুশান-বংশীয় দ্বিতীয় নৃপতির উইমা কদ্‌ফীসেস (Wima Kadphises) এই বিদেশীয় নাম ছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং অত্যন্ত গোঁড়া শৈব ছিলেন। তাঁহার মুদ্রাসমূহের উপর একমাত্র শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল এবং তিনি নিজেকে একজন পরম-মাহেশ্বর—গোঁড়া শিব-ভক্ত রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উইমার বংশধর কণিষ্ক বৌদ্ধরূপে সুপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূনগণ এই দেশ আক্রমণ করেন এবং উত্তর-ভারতের অনেক অংশ নিজেদের শাসনাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন। 'হূন-বংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি মিহিরকুল একজন নিষ্ঠাবান্ শৈব ছিলেন। শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে শিব-ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে তিনি কখনও মস্তক অবনত করিতেন না। ইঁহার শাসন-কালে মুদ্রার উপর শিবের বৃষ-মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং 'জয় শিব' মুদ্রিত ছিল।

বিদেশীয়গণের স্বদেশে হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রহণ

ইহা কখনই সত্য নহে যে হিন্দুগণ ঐ সময়ে কেবলমাত্র সেই সকল বৈদেশিকগণকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এদেশে বিজেতা বা ব্যবসায়ী রূপে আসিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্ম্ম-প্রচারার্থ সমুদ্রপারেও গমন করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রপারবর্ত্তী দেশ-সমূহে তত্তৎ দেশবাসী হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকেও হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক পুরোহিত ব্রাহ্মণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপসমূহে স্বধর্ম্ম প্রচারকল্পে গমন

করিয়াছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণগণেরও সমুদ্র-পারবর্ত্তী দেশ-সমূহে যাতায়াতের অভ্যাস ও প্রথা তৎকালে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ছিল না। যখন চীন-দেশীয় পর্য্যটক ফা হিয়েন ৪১৫ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন তখন তিনি সেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয় ও প্রচার দেখিতে পাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বোর্ণিও দ্বীপ-সমূহের বহু নৃপতি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিবিধ বৈদিক যজ্ঞ-সম্পাদনের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত বহু শিলা-স্তম্ভ এই সকল অতি দূরবর্ত্তী দ্বীপ-সমূহেও পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে পরবর্ত্তী কালে এই সকল দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতিই বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মধ্য-প্রাচ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম

ভারতীয় হিন্দুগণ মধ্য-প্রাচ্য দেশ-সমূহে গমন করিয়াও তত্তৎ দেশবাসীদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত এশিয়া মাইনরেও কতকগুলি হিন্দু-মন্দির ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাকে ভান (Kake Van)-এর পশ্চিমে ট্যারণ-এর (Taran) একটী প্রদেশে দুইটী প্রসিদ্ধ হিন্দু-মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির-দ্বয়ে ১২ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ দেব-মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তি-পূজাবিরোধী সেণ্ট গ্রেগরী ৩০৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল মন্দির ও মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ককেসাস্ প্রদেশে বাকু নামক স্থানে হিন্দুর অগ্নি-মন্দির খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

মুসলমানগণকে হিন্দু-ধর্ম্মে গ্রহণ না করিবার কারণ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে যখন মুসলমানগণ দ্বারা ভারত আক্রান্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হিন্দুগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল ও অদূরদর্শী হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতাক্রমণকারী অপর জাতীয় বিজেতাগণকে হিন্দু-ধর্ম্ম যেরূপ গ্রহণ করিয়াছিল, ঐরূপ মুসলমান আক্রমণকারিগণকে হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করিল না। জাতি ও বর্ণ-বিভাগ ঐ সময়ে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে) অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য হিন্দু-ধর্ম্মে নবদীক্ষিত বর্ণ-হীন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিবাহাদির ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণকারিগণ হইতে মুসলমানগণের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁহাদের একটি নিশ্চিত ধর্ম্মমত ছিল। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণকারিগণ হইতে মুসলমানগণের অন্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাঁহারা জাতি, বর্ণ ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন। অষ্টম শতাব্দীর হিন্দু-ধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজার দিকে ঝোঁক অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিন্দুরা ঐ সময় অত্যন্ত খাদ্যা-খাদ্যের বিচার করিতে আরম্ভ করেন এবং নিরামিষ ভোজনই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে অসংখ্য উপজাতি বা বর্ণ-বিভাগ হইল এবং বিভিন্ন বর্ণীয়গণের সকলের অন্ন-গ্রহণ তো দূরের কথা, 'জল-চল' কতিপয় বর্ণের জল ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হইত না। সুতরাং এই সকল কারণে মুসলমানগণকে হিন্দু-ধর্ম্মে গ্রহণ করা একে-বারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী ছিলেন বলিয়া দেব-মূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। মুসলমানগণ মাংসাহারী ও জাতি-বর্ণ-বিহীন সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তির হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা

ইহা নিঃসন্দেহ যে হিন্দুগণ মুসলমানগণকে স্বধর্ম্মে অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা কখনও করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, যে সকল দুর্ভাগা হিন্দুকে প্রতারণা বা বল-পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত তাঁহারা যদি পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্মে অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেন তবে তাঁহাদিগকে হিন্দু-সমাজে পুনর্গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই কথার যাথার্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের স্বধর্ম্মে পুনর্গ্রহণের প্রশ্ন সর্ব্ব-প্রথম সিন্ধু-প্রদেশে ৭২০ খৃষ্টাব্দে অতি প্রবলভাবে উঠে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে প্রাচীন সিন্ধী-সমাজ-নেতৃবৃন্দ হিন্দু-ধর্ম্মের এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহারা বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের দ্বারা দেবল-স্মৃতি নামক একখানা স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করান। এই গ্রন্থে নূতন স্মার্ত্ত নিয়মাবলীর সংযোগ করিয়া ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের হিন্দু-সমাজে পুনর্গ্রহণের প্রশ্নের সুমীমাংসা করা হইয়াছে। দেবল-স্মৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতি-গ্রন্থ-সমূহের সময়ে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর পুনঃ স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও প্রশ্নই উঠে নাই; তাই তাহাতে ঐরূপ কোন বিধি-নিয়মও দেখা যায় না। প্রাচীন কালে হিন্দুগণ অনার্য্যগণকে আর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, কিন্তু কোনও আর্য্য বা হিন্দুকে অন্য কোনও অনার্য্য বা অহিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দিতেন না এবং তাহার প্রথাও ছিল না। দেবল-স্মৃতিকার এই ব্যবস্থা দিলেন যে, যে সকল হিন্দুকে প্রতারণা বা বল-পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে, তাঁহারা যদি ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের দিবস হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে পুনঃ হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা শাস্ত্র-সম্মত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ছলে বলে বা কৌশলে ধর্ম্মান্তরিত হইয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মে প্রত্যাগমনের সুযোগ পাইয়াও হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরন্তর্ভুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি আর হিন্দু-ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক নহে।

স্ত্রী-জাতিকেও হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইত

ধর্ম্মান্তরিত পুরুষগণকেই যে কেবল হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইত তাহা নহে, ধর্ম্মান্তরিত স্ত্রী-জাতিকেও গ্রহণ করা হইত। কেবল ধর্ম্মান্তর গ্রহণই নহে, ঐ সকল স্ত্রীলোক যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ বল-পূর্ব্বক বিধর্ম্মী দ্বারা বিবাহিত বা ধর্ষিতাও হইতেন, তবুও তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে, স্বসমাজে ও স্ব-পরিবারে গ্রহণ করা হইত। এমন কি ঐ বিবাহ বা বলাৎকারের ফলে সন্তান-সম্ভবা হইলেও নিঃসংকোচে ঐ স্ত্রীকে স্বধর্ম্মে ও স্বপরিবারে গ্রহণ করা হইত। দেবল-স্মৃতিকার বলেন যে ঐ স্ত্রী যে কোনও জাতি-ভুক্ত হউন না কেন তৎসাময়িক অবস্থা-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্বধর্ম্মে ও স্বপরিবারে পুনর্গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর হিন্দু-ধর্ম্মে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত

এখানে এই প্রশ্নের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে দেবল-স্মৃতিকারের নির্দ্দেশ হিন্দু-সমাজ কখনও গ্রহণ করিয়াছিল কি না? এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখান যাইতে পারে যে দেবল-স্মৃতির নির্দ্দেশগুলি আমাদের সমাজে খৃষ্টীয়

একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। আল বিলাদুরী (Al Biladuri) প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষাংশে সিন্ধুদেশে কেবল রাজনৈতিক শক্তির নহে, মুসলমান ধর্ম্মেরও অবনতি হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ঐ সময়ে পুনরায় মূর্ত্তি-পূজক হইয়াছিলেন।

অধিকন্তু বঙ্গদেশ ও মহারাষ্ট্র বহু কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিতে থাকেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ বিশ্বাস করিতেন যে কোনও প্রকার অবস্থা-বিপর্যায়েও হিন্দুর হিন্দু-প্রাণতার ধ্বংস হইতে পারে না। তাই তাঁহারা মনে করিতেন যে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ সম্ভব এবং উহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৎকালে মুসলমান ধর্ম্মান্তরিত একজন হিন্দু রাজাকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপে হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজগণ্ডীর মধ্যে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ইহার পরবর্ত্তী কালে দেখা যায়—বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণের প্রথা ত্যাগ করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুকে হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনুমোদিত ছিল। নিম্বালকর সর্দ্দারগণের এক জন সর্দ্দারকে মুসলমান করা হইয়াছিল; শিবাজী তাঁহাকে কেবল হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণে আপনার উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ স্বীয় কন্যাকে ঐ সর্দ্দারের সহিত বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। শিবাজীর অন্যতম সেনাপতি পালকরকে মুসলমান করা হইয়াছিল ও তাঁহার সহিত একটী পাঠানবংশীয়া মহিলার বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিতে সক্ষম হন তখন শিবাজী তাঁহার সমগ্র পরিবারকেই হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করিলেন। মানুচী (Manuchi) লিখিয়া গিয়াছেন—তাঞ্জোরের মারাঠা নৃপতিগণ কিছু কাল পর্য্যন্ত কি ভাবে রাজাজ্ঞা বলে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন। পানিপথের যুদ্ধে নরহরি নরালকর নামক একজন পৈঠান ব্রাহ্মণ বন্দী হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক মুসলমান করা হইয়াছিল। তিনি বন্দী রূপে বিধর্ম্মিসমাজে ধর্ম্মান্তরিত হইয়া দীর্ঘ বার বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। বার বৎসর পরে কোনও রূপে তিনি স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। পৈঠান ঐ সময়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে ব্রাহ্মণসমাজও তাঁহাকে স্বসমাজে পুনর্গ্রহণের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে পুনা-নিবাসী রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ পেশোয়াকে এবংবিধ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পেশোয়ার শিবাজীর মত দূরদর্শিতা ছিল না। শিবাজী ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণের অনুমোদন মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রত্যুত পরধর্ম্মত্যাগী হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত স্থাপন করেন।

হিন্দু-ধর্ম্মান্তরিত-করণ কখন ও কিরূপে অপ্রচলিত হইল

উপর্য্যুক্ত ঘটনাবলী হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেবল স্মৃতিকারের বিধানানুযায়ী

ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের হিন্দু-ধর্ম্মে পুনরন্তর্ভুক্তি কার্য্য পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত বিরাট ভাবে অবাধে চলিয়া আসিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু-সমাজে জাতি ও বর্ণ বিভাগ অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়ে। হিন্দু-ধর্ম্মে পুনঃপ্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে কোনও বর্ণ-বিশেষে স্থান দেওয়া সম্ভব হইল না; সম্ভবতঃ এই কারণেই ক্রমে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের হিন্দু-ধর্ম্মে পুনরন্তর্ভুক্তি অপ্রচলিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, এইরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণকার্য্য সাধারণভাবে পরবর্ত্তী কালেও কোনও কোনও প্রদেশে চলিতে থাকিল মধ্য-যুগের কতিপয় হিন্দু নৃপতি শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণের মতই এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদার বিচার-সম্পন্ন ছিলেন, এবং যে সকল হিন্দু বিধর্ম্মী দ্বারা ছলে, বলে, কৌশলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে প্রত্যাগমনের একটা সুযোগ দেওয়া হিন্দুসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ ক্রমে এ বিষয়ে নিরুৎসাহ ও উদাসীন হইয়া পড়িল এবং বর্ণবিভাগের কঠোর নিষ্পেষণে দেবল স্মৃতিকারের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ বিধানের অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। এ কথা সম্ভব হইতে পারে যে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত করা তৎকালীন মুসলমান শাসকাধীন রাজ্যসমূহে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমাদিগের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ঐ সময়ে স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বতন্ত্র হিন্দু রাজ্যও বহু ছিল; তাহারা ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণের হিন্দুধর্ম্মে পুনরন্তর্ভুক্তির জন্য কার্য্যকরী দৃঢ় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে হিন্দু-সমাজের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহারা উহা করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মে রক্ষণশীলতার উদ্ভবই এজন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি দেবল যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কালে হিন্দুসমাজ যথাযোগ্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। ইহার ফলে ঋষি দেবলের মত তাঁহাদের মস্তিষ্কে এই বিচার স্থান পাইল না যে দূষিত অঙ্গকে কাটিয়া বাদ দেওয়া অপেক্ষা চিকিৎসা দ্বারা উহাকে নিরাময় করাই যুক্তি-যুক্ত ও বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিধর্ম্মী দ্বারা বল-প্রয়োগ ও কৌশল বা প্রতারণা পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণকে হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণে অস্বীকার করা, হিন্দু-ধর্ম্মজ্ঞ বহুসংখ্যক বিজ্ঞ ঋষিগণের অনুমোদিত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধ ইহাতে সন্দেহ নাই

অতএব দেবলাদি স্মৃতি ও প্রাচীন প্রথার গবেষণা পূর্ব্বক ইহাই জানা যাইতেছে যে ছলে, বলে, কৌশলে কিংবা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণ যদি স্বধর্ম্মে ও স্ব-সমাজে প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ ও পূর্ব্ববৎ স্ব-সমাজে স্থানদান যথার্থ হিন্দু-নীতি ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।
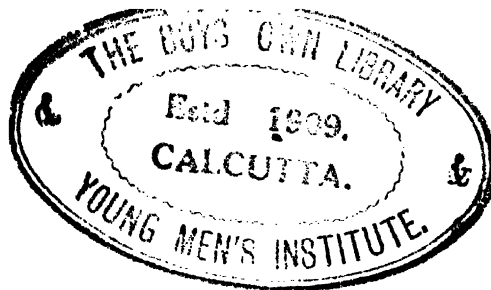
বেদান্তদর্শনে আছে কি?

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

এইবার বেদান্তদর্শন গ্রন্থের অধিকরণের অর্থাৎ বিচারের দ্বিতীয় অবয়ব যে বিষয়, তাহার কথা আলোচ্য। অধিকরণের "বিষয়টী" প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন (১) শ্রুতিবাক্যই হয়, অতি অল্পস্থলেই ইহা কোন না কোন (২) শ্রুতিবাক্যসংক্রান্ত মতবাদ বা সিদ্ধান্তবিশেষ হইতে দেখা যায়। যেমন দ্বিতীয় অধিকরণে অর্থাৎ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ১।১।২ সূত্রের দ্বারা যে দ্বিতীয় জন্মাদ্যধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার বিষয়বাক্য তৈত্তিরীয় শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই হইয়া থাকে। আবার ২ অঃ ২ পাদের রচনানুপপত্ত্যধিকরণে সাংখ্যসিদ্ধান্তকেই "বিষয়" বলা হইয়াছে। ইহা শ্রুতিবাক্যসংক্রান্ত মতবাদ বা সিদ্ধান্তবিশেষ। কারণ সাংখ্যগণ 'অজামেকাম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া এই জাতীয় বাক্যকে সাংখ্যসিদ্ধান্তের মূল বা. সাংখ্যমতের শ্রৌত-প্রমাণ বলেন। এই রূপে দেখা যাইবে এই বেদান্তদর্শন-গ্রন্থে যতগুলি অধিকরণ আছে তাহাদের "বিষয়" নামক দ্বিতীয় অবয়বটী হয় কোন শ্রুতিবাক্য, অথবা কোন শ্রুতিবাক্য-সংক্রান্ত মতবাদ বা সিদ্ধান্তবিশেষ। এই প্রবন্ধের শেষে আমরা বেদান্ত দর্শনের ১৯১টী অধিকরণের "বিষয়", "সংশয়" ও "সিদ্ধান্ত"—নামক অবয়ব-গুলি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস করিব। ৪টী অধ্যায়ের এবং ১৬টী পাদের পৃথক্ পৃথক্ "বিষয়" কি তাহা "সঙ্গতি" নামক অবয়ব-আলোচনা কালে করা হইয়াছে। এস্থলে আর পুনরুক্তি করা হইল না

অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব সংশয়

এইবার অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব সংশয়ের কথা আলোচ্য। সংশয় বলিতে এক ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান। যেমন অল্প অন্ধকারে একটি শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ দেখিয়া লোকে মনে করে ইহা স্থাণু কি পুরুষ? এস্থলে একটী ধর্মী যে শাখাপল্লবহীন বস্তুটী, তাহাতে স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব নামক দুইটী বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হইতেছে, কোনটীই নিশ্চয় হইতেছে না। এজন্য এই রূপ-জ্ঞানকে সংশয় জ্ঞান বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের অধিকরণগুলির বিষয়বাক্য হইতে এই রূপ সংশয় সর্বত্রই দেখাইয়া একটা পূর্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করা হয়। যেমন জন্মাদ্যধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের বিষয়বাক্য হইল "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়াছে—ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির বাক্য। ইহা হইতে সংশয় বাক্য যাহা রচনা করা হইল, তাহাতে ব্রহ্মের লক্ষণ আছে কিনা? এস্থলে সংশয়ের দুইটি কোটি বা পক্ষ মাত্র প্রদর্শন করা হইল। যথা—একটী কোটি "লক্ষণ আছে" এবং দ্বিতীয় কোটি "লক্ষণ নাই"। ইহাদের মধ্যে একটী অভীষ্ট কোটি, অন্যটী অনভীষ্ট কোটি। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনটী বা চারিটী কোটী পর্য্যন্ত দেখান হয়, যেমন প্রথম অধ্যায় ১ম পাদে ১১শ প্রতর্দ্দনাধিকরণ নামক অধিকরণে "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" অর্থাৎ "আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা" এই ইন্দ্রের বাক্য হইতে যে সংশয় বাক্য রচনা

করা হইয়াছে, তাহা—"এই প্রাণ কি বায়ু, কি ইন্দ্র, কি জীব, অথবা পরব্রহ্ম ?" এইরূপ এখানে এই সংশয় বাক্যে ৪টী কোটি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম · এই চতুর্থ অভীষ্ট কোটি, অন্য তিনটী অনভীষ্ট কোটি। এইরূপ এই গ্রন্থের ১৯১টি অধিকরণে এইরূপ সংশয় বাক্য সর্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। আর তাহার ফলে কোন্ বিষয়টী অধিকরণের বক্তব্য তাহা বেশ বুঝা যায়।

এতদ্দ্বারা প্রত্যেক অধিকরণে কোন্ বিষয় বিচার করা হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা দর্শনশাস্ত্র মাত্রেরই যে সব বিষয় আলোচ্য তাহা এই বেদান্তদর্শনে স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে আমরা ১৯১টী অধিকরণের "বিষয়", "সংশয়" ও "সিদ্ধান্ত" এই তিনটী মাত্র অবয়ব সংক্ষেপের অনুরোধে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। অন্য অবয়বগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি অধিকরণ-মালা নামক গ্রন্থে সকল অবয়বগুলি প্রদর্শিত হয়। এই বার দেখা যাউক অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব যে পূর্বপক্ষ তাহার পরিচয় কিরূপ ?

অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব পূর্বপক্ষ

সংশয়ের অনভীষ্ট পক্ষটী—সর্বত্রই পূর্বপক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে অভীষ্ট-কোটির অর্থাৎ অভীষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে কতরূপ হেতু বা যুক্তি হইতে পারে তাহা দেখান হয়। এজন্য বিচারস্থলে ন্যায়শাস্ত্রের যে পাঁচটী বা তিনটী অবয়বের কথা কথিত হইয়াছে যথা—১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু, ৩। উদাহরণ, ৪। উপনয়, ৫। নিগমন, সেই সব অবয়ব-গুলিই থাকে। ইহাদের অর্থ সেই ন্যায়শাস্ত্র মধ্য হইতে অবগত হওয়া ভাল। তথাপি স্থূল ভাবে তাহাদের অর্থ এই—যেমন যখন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা হয়, তখন প্রথমে বলা হয়—"পর্বতটী বহ্নিমান্"। ইহাকে "প্রতিজ্ঞা বাক্য" বলা হয়। ইহা প্রথম অবয়ব। পরে বলা হয়—"যেহেতু ধূম রহিয়াছে।" ইহাকে বলা হয় "হেতু বাক্য"। ইহা দ্বিতীয় অবয়ব। তৎপরে বলা হয়—"যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা বহ্নিমান্" যেমন রন্ধনশালা। ইহার নাম উদাহরণ বাক্য। ইহাকে তৃতীয় অবয়ব বলা হয়। তৎপরে বলা হয়—"ইহাও সেইরূপ"। অর্থাৎ এই পর্বতেও সেইরূপ ধূম রহিয়াছে। ইহার নাম উপনয় বাক্য। ইহাকে চতুর্থ অবয়ব বলা হয়। পরিশেষে বলা হয়—"অতএব পর্বতটী বহ্নিমান্"। ইহার নাম নিগমন বাক্য। ইহাকে পঞ্চম অবয়ব বলা হয়।

প্রত্যেক অনুমানে এইরূপ পাঁচটী অবয়ব থাকে। সংক্ষেপের অনুরোধে প্রথম তিনটীই প্রদর্শিত হয়। কিন্তু মীমাংসা ও বেদান্ত মতে অনুমানে তিনটী অবয়বই আবশ্যক হয়। সেই তিনটী অবয়ব বলিতে প্রথম তিনটী অবয়ব অথবা শেষ তিনটী অবয়ব বলা হয়।

এইরূপ প্রত্যেক অধিকরণের পূর্বপক্ষে এই-রূপ তিনটী অবয়ব প্রদর্শন করা হয়। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক অধিকরণের যাহা বক্তব্য তাহার বিরুদ্ধে যত কথা বলা যাইতে পারে সবই বলা হইয়া যায়। বিচারে বিরুদ্ধ পক্ষের কথা না শুনিলে বিচার দৃঢ় হয় না। যেমন জন্মাদ্যধিকরণে পূর্ব-পক্ষ—"ব্রহ্মের লক্ষণ নাই," ইহা প্রতিজ্ঞা বাক্য। যেহেতু তটস্থ লক্ষণ যে জন্মাদি সেই জন্মাদি অন্যনিষ্ঠ, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন ঘটপটাদি জগদাদিতে থাকে। কারণ, ব্রহ্মের জন্ম নাই কিন্তু ঘট-পটাদি জগতেরই আছে। আর বেদমধ্যে ব্রহ্মের যে স্বরূপ লক্ষণ আছে, যথা "ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ" ইত্যাদি তাহাও ব্রহ্মে সম্ভব নহে। কারণ, কেবল সৎ বা কেবল চিৎ

বলিয়া বা কেবল আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নাই, অর্থাৎ দেখা যায় না। সুতরাং সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম ইহা বলিতে পারা গেল না। ইহা হইল এই বিচারে "হেতু এবং উদাহরণ বাক্য"। সুতরাং বলা যাইতে পারে "ব্রহ্মের লক্ষণ নাই"। ইহাই হইল এই ব্রহ্মলক্ষণবিচারে নিগমন বাক্য অর্থাৎ পূর্বপক্ষ। এই বার দেখা যাউক অধিকরণের পঞ্চম অবয়বটী কিরূপ।

অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব সিদ্ধান্ত পক্ষ

ইহাতে সংশয়ের অভীষ্ট পক্ষটী থাকে এবং পূর্বপক্ষের ন্যায় ইহাতেও প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণের প্রয়োগ থাকে। তৎপরে পূর্বপক্ষের যুক্তির দোষও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এজন্য ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভাস এবং নিগ্রহস্থানের সাহায্য লওয়া হয়। কিন্তু যেখানে শ্রুতিবাক্যের বল-বিচার অথবা উপক্রমোপসংহারাদি বিচার দ্বারা পূর্বপক্ষের খণ্ডন করা হয় সেখানে মীমাংসা শাস্ত্রের (১) শ্রুতি (২) লিঙ্গ (৩) বাক্য (৪) প্রকরণ (৫) স্থান ও (৬) সমাখ্যা নামক ছয় প্রকার কৌশলের প্রয়োগ করা হয়। উপক্রমোপসং-হারাদিকে তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গ বলে। উহাও ছয় প্রকার, যথা (১) উপক্রমোপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, এবং (৬) উপপত্তি। ইহাদের পরিচয়ের জন্য বেদান্তসার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রের হেত্বাভাসাদির কথা এবং মীমাংসা শাস্ত্রের (প্রথম) শ্রুত্যর্থনির্ণয়ের উপক্রমোপসংহারাদির কথা এবং (দ্বিতীয়) শ্রুতিলিঙ্গাদির কথা এত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত যে, তজ্জন্য উক্ত শাস্ত্রদ্বয় অধ্যয়ন না করিলে চলে না। এজন্য এস্থলে তাহাদের কথা আলোচিত আর হইল না। বস্তুতঃ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্র না পড়িয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয় না; অনেকস্থলেই অন্ধকার থাকিয়া যায়। আর এইরূপে বেদান্তের জ্ঞান অর্জিত হইলে এবং সাধন করিলে শীঘ্র ও সহজে বেদান্তের তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। অবশ্য অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা পৃথক্, তাঁহাদের কথা এস্থলে বলা হইল না, এসব কথা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইল।

যাহা হউক, অধিকরণে পঞ্চম অবয়ব যে সিদ্ধান্ত পক্ষ, তাহা প্রায়ই অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব পূর্বপক্ষেরই অনুরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাতেও প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণ সবই পূর্বপক্ষেরই ন্যায় থাকে। এজন্য তাহার আর পুনরুক্তি করা হইল না। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন উক্ত জন্মাদ্যধিকরণে পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছিল—"ব্রহ্মের লক্ষণ নাই" এক্ষণে সিদ্ধান্ত পক্ষে বলা হইল "ব্রহ্মের লক্ষণ আছে"—এই মাত্র। এইবার দেখা যাউক অধিকরণের ষষ্ঠ অবয়ব যে "পূর্বপক্ষে ফলভেদ"—তাহাই আলোচ্য।

অধিকরণের ষষ্ঠ অবয়ব পূর্বপক্ষে ফলভেদ

ফলভেদ বলিতে বিচারের দূরবর্তী ফল বুঝায়। বিচারের সাক্ষাৎ ফল, অধিকরণের পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষ মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু ফলভেদ মধ্যে তদতিরিক্ত বা দূরবর্তী কথা জানিতে পাওয়া যায়। এজন্য পূর্বপক্ষের ফল-ভেদ মধ্যে বিচারের দূরবর্তী পূর্বপক্ষসম্মত ফল লাভ হয়—বলা হয়। যেমন উক্ত "জন্মাদ্য-ধিকরণে" বিচার্য ছিল—ব্রহ্মের লক্ষণ আছে কি না। তাহাতে পূর্বপক্ষ বলিল যে, ব্রহ্মের লক্ষণ নাই, কিন্তু ফলভেদের পূর্বপক্ষ বলিল—

যে, "মুক্তি অসিদ্ধ।" "ব্রহ্মের লক্ষণ নাই" ইহা বিচারের পূর্বপক্ষের সাক্ষাৎ ফল, কিন্তু "মুক্তি নাই"—ইহা বিচারের পূর্বপক্ষের দূরবর্তী ফল। এইরূপ সমুদয় অধিকরণে দ্বিবিধ ফল দৃষ্ট হইবে।

অধিকরণের সপ্তম অবয়ব সিদ্ধান্তে ফলভেদ

অধিকরণের সপ্তম অবয়ব সিদ্ধান্তে ফলভেদ, ঠিক্ পূর্বপক্ষের ফলভেদের ন্যায়। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধান্তের দূরবর্তী ফল কি তাহা বলিয়া দেয়। যেমন উক্ত "জন্মাদ্যধিকরণে" বিচার্য ছিল—"ব্রহ্মের লক্ষণ আছে কি না" তাহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে "ব্রহ্মের লক্ষণ আছে।" কিন্তু ফলভেদের সিদ্ধান্ত পক্ষ হইতে জানা গেল যে "মুক্তি সিদ্ধ হয়"। অর্থাৎ ফলভেদের পূর্বপক্ষে বলা হইয়াছিল "মুক্তি অসিদ্ধ" কিন্তু ফলভেদের সিদ্ধান্ত পক্ষ হইতে জানা গেল—"মুক্তি সিদ্ধ হয়"। এইরূপ প্রত্যেক অধিকরণ হইতে সিদ্ধান্তের ফলভেদ হইতে সিদ্ধান্তের দূরবর্তী ফল কি তাহা জানা যায়। এইরূপ সমস্ত অধিকরণে ফলভেদের উপযোগিতা বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক এতক্ষণে অধিকরণের অর্থাৎ বেদান্ত বিচারের সাতটী অবয়বের বা অঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান শেষ হইল। সেই অবয়ব সাতটী, যথা—(১) সঙ্গতি, (২) বিষয় (৩) সংশয় (৪) পূর্বপক্ষ, (৫) সিদ্ধান্ত পক্ষ, (৬) পূর্বপক্ষের ফলভেদ, এবং (৭) সিদ্ধান্তে ফলভেদ। ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

অধিকরণের এই সাতটী অবয়ব, অধিকরণের মধ্যে যেখানে যতগুলি সূত্র থাকে তাহার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। সূত্রগুলির অর্থ বুঝিবার পর কোন্ সূত্রে অধিকরণের কোন্ অবয়বটী থাকিল তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। এইভাবে গ্রন্থখানি পড়িতে পারিলে বেদান্তসূত্রের মর্মার্থ কতকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সঙ্গে যদি গুরূপদিষ্ট মার্গে সাধনা থাকে তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অনিবার্য। কিন্তু সাধনা না থাকিলে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইহাই হইল অধিকরণের পরিচয়। এইরূপ ১৯১টী অধিকরণের দ্বারা এই বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই যে ১৯১টি অধিকরণ সংখ্যা ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসারে। অন্যান্য আচার্যগণের মতে এই সংখ্যা অন্যরূপ। এই আচার্য বলিতে ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

কেবল তাহাই নহে, অধিকরণের বিষয় নামক শ্রুতিবাক্য, অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ নামক অবয়ব সকলই অন্যান্য আচার্যগণের মতে অন্যরূপ। এইরূপ মতভেদ দেখিলে মনে হইবে, মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসদেবের মত যে কি তাহা বুঝি আর নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কারণ সকলেই ধুরন্ধর পণ্ডিত, সকলেই সাধক ও সকলেই মহাশক্তিশালী সিদ্ধ পুরুষ। সকলকেই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ভগবানের অবতার বলিয়া জ্ঞান করেন, এবং সকলেরই অবতারত্বে শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করেন। তাঁহারাই যখন অন্য আচার মত খণ্ডন করিয়া কোন একটা মতকে ব্যাসের মত বলিতেছেন, তখন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ মতটী ব্যাসের মত, তাহা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু বাস্তবিক ঠিক্ তাহাই নহে, বেদান্তের বিচারসাগরে অবগাহন করিলে একটা পথ পাওয়া যায়। এই সব কথা আলোচনা করিয়া "ব্যাসসম্মত ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য 'নির্ণয়" নামক

একখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থই প্রকাশিত করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা অবলোকন করিতে পারেন। তবে বিষয়টী যে অতীব দুরূহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক পক্ষে সূত্রকার ভগবান্ যদি গ্রন্থ-মধ্যে গ্রন্থসমাপ্তি এবং অধ্যায় সমাপ্তির যেমন ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, যেমন যেখানে সমগ্র সূত্রটী দুইবার পঠিত হইয়াছে সেখানে গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে, যেমন "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এইভাবে দুইবার সূত্রটী—পঠিত হওয়ায় গ্রন্থসমাপ্তি বুঝায়, তদ্রূপ সূত্রের শেষ শব্দটী যেখানে দুইবার পঠিত হইয়াছে সেখানে অধ্যায়সমাপ্তি বুঝায়, যেমন "এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ" এই সূত্রের শেষ "ব্যাখ্যাতাঃ" পদের দুইবার পাঠদ্বারা অধ্যায়-সমাপ্তি বুঝায়, তদ্রূপ কোথায় পাদসমাপ্তি এবং কোথায় অধিকরণসমাপ্তির যদি ইঙ্গিত করিতেন, তাহা হইলে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদের এত সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু ব্যাসদেব তাহা করেন নাই, তিনি উহা গুরুমুখে সম্প্রদায়ক্রমে লাভ করিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন, অথবা তিনি সে ইঙ্গিতও করিয়াছেন, কাল-ক্রমে লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ কোথায় অধিকরণ আরম্ভ কোথায় শেষ কোন্‌টী পূর্বপক্ষসূত্র কোন্‌টী সিদ্ধান্ত সূত্র এসকলের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিলে আচার্যগণের বেদান্তব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ সম্ভবতঃ একেবারেই ঘটিত না। এসব কথার আলোচনা উক্ত ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্ণয় নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে। এখানে তাহার আলোচনা অসম্ভব।

যাহা হউক পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা ১৯১টী অধিকরণের "বিষয়", "সংশয়" ও "সিদ্ধান্ত" নামক অবয়ব তিনটী প্রদর্শন করিয়া একটী তালিকা নির্মাণ করিব, এতদ্দ্বারা "বেদান্ত দর্শন গ্রন্থে আছে কি" তাহার একটা ধারণা স্থূলভাবে করিতে পারা যাইবে।

ব্যর্থ-সাধন

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মিল রেখে রেখে ছন্দের বাঁধে কবিতা লিখেছি বটে,
মনে মনে জানি সে কবিতা মোর কবিতা কখনো নয়,
আগামী যুগের মহামানবের হৃদয় সিন্ধুতটে,
কবিতা আমার ঠাঁই লভিবে না জানি এ তো নিশ্চয়।
আমি তো গাহি নি এই পৃথিবীর মানুষের জয়গান,
আমি তো চাহি নি কঠিন মাটির পরশ কঠিনতম,
নিমীল নয়নে আকাশে চাহিয়া নীলিমা করেছি পান,
পূর্ণশশীর স্বপ্নে বিভোল এ দুটি নয়ন মম।
ধরণীরে ছাড়ি পাখা মেলিয়াছি উর্ধ্বে গগন পানে,
ভেবেছিনু সেথা চিরদিন তরে লভিতে পারিব ঠাঁই,
আকাশ অসীম—তাইতো সদাই অসীম শূন্য হানে,
মাটি যার নাই, আকাশ তাহার নাইরে কখনো নাই।

পূর্ণচন্দ্র

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(১)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও যোগানন্দ মহারাজের নিকট জনৈক গম্ভীর সৌম্যদর্শন যুবক স্বামী বিবেকানন্দের ভারতাগমন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু ও কমনীয় আকৃতি দেখিলে স্বভাবতঃ লোকে আকর্ষণ বোধ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? দেখিলাম, মহারাজদ্বয় অতি স্নেহে ও পরম আদরে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। যুবকটী চলিয়া গেলে আমি পূজ্যপাদ যোগানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ইনি কে?" তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এঁকে চিনিস নি? এঁর নাম পূর্ণ, ঠাকুর এঁকে দেখে বলেছিলেন, 'এতদিনে খুঁট মিললো—পূর্ণতেই পূর্ণ হল।' ঠাকুর এঁর ঘর খুব উঁচু বলতেন।" পূর্ণবাবুর পরিচয় পাইয়া এবং পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া বহুদিন তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ ও অকপট স্নেহলাভ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। আজ তাঁহার অপূর্ব জীবন-কথা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম।

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে শ্যামবাজার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আনুমানিক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। এই পরিবার কলিকাতা সিমুলিয়ার সুবিখ্যাত কাশী ঘোষের বংশসম্ভূত। পূর্ণবাবুর পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ সেকালের কলিকাতা সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ণবাবুর মাতার নাম ছিল কৃষ্ণ-মানিনী। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলরাম বসু মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর বংশে কৃষ্ণ-মানিনীর জন্ম হয়। ইঁহারা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিবার।

পূর্ণবাবু বালকবয়সেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজার শাখায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উক্ত বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। মিষ্টভাষী পূর্ণচন্দ্রের সুন্দর মাধুর্যপূর্ণ স্বভাব, দীপ্ত চক্ষু, সুগঠিত দেহ, গৌরবর্ণাভ উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি দেখিয়া তিনি আকৃষ্ট হন। তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া মহেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ইনি বালক বয়সেই ধর্মপিপাসু ভগবদ্ভক্ত। তিনি পূর্ণকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে বলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই উপদেশগুলির সারাংশ ছিল ভক্তিসাধনের উপায় ও সাধনভজনের নির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে মহেন্দ্রনাথ 'মাষ্টার মশায়' নামেই পরিচিত ছিলেন। অতঃপর এই নামেই তাঁহার উল্লেখ করিব। মাষ্টার মশায় একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "চৈতন্যদেবের মত একজনকে যদি দেখতে চাও তবে আমার সঙ্গে চল।" বলিবামাত্র পূর্ণচন্দ্র

প্রবল উৎসাহে স্বীকৃত হইলেন। মাষ্টার মশায় এই বালকের ব্যাকুলতা ও উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যেতে হবে?" মাষ্টার মশায় বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে।" পূর্ণচন্দ্র চিন্তান্বিত হইলেন। কারণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে বহু বিলম্ব হইবে এবং বাড়ীতে জানিতে পারিলে অনেক বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। অথচ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মন প্রাণ ব্যাকুল হইল। মাষ্টার মশায় পূর্ণকে চিন্তাকুল দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে আনুপূর্বিক সব খুলিয়া বলিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের মনে পড়িল, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় বাস করেন। মানুষ যাহা একান্তভাবে চায়, যতই দুঃসাধ্য হউক তাহা পায়। পূর্ণচন্দ্রেরও একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল ফাল্গুন মাসে একদিন মাষ্টার মশায়ের সহিত গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন। যে শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন, অন্তরের হৃদয় পটে যে প্রেমের অপূর্ব ছবি অতি যত্নে ভক্তিভাবে তিনি আঁকিয়াছেন ঠিক্ তাঁহারই মত আর এক জন অলৌকিক দিব্যপুরুষকে দর্শন করিতে পারিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গাড়ী আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের ফটকে দাঁড়াইল।

সুবৃহৎ দেবালয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই বালক পূর্ণচন্দ্র এক অপূর্বভাবে বিহ্বল হইলেন। মাষ্টার মশায়ের অনুগমন করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বালক পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের দেখাইয়াছিলেন, এ যে তাঁহাদেরই একজন। ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দিব্য দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল—এই বালকই যে অন্তরঙ্গ ভক্ত সংখ্যা পূর্ণ করিবে। পরে তিনি অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, ঐখানে খুঁটি মিললো, পূর্ণতেই পূর্ণ হল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার মশায় পূর্ণের পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুর সস্নেহে আদর করিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন—তাঁহাকে ফল মিষ্টি খাইতে দিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্র অবাক হইয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন সৌম্য মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমময় পুরুষ তো ইতিপূর্বে তিনি কখনও দেখেন নাই। এমন স্নেহ ও আদর তো ইতিপূর্বে আর কোথাও পান নাই, এমন মধুর সস্নেহ সম্ভাষণ কোথাও তিনি শুনেন নাই। নির্বাক নিস্পন্দভাবে পূর্ণ তাঁহার নিকট চিত্রপুত্তলিকার মত বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে সহসা পূর্ণচন্দ্র এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলেন—তিনি দেখিতে পাইলেন ঠাকুরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, নিবিড় অন্তরতম ঘনিষ্ঠ প্রীতি। অতীত দৃশ্য যেন স্মৃতিপথে অকস্মাৎ উদিত হইল। অপার্থিব আনন্দে দুনয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে তাঁহার ভাব সম্বরণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মাষ্টার মশায় এই অপূর্ব ছবি, ভগবান ও ভক্তের ভাগবতলীলা, এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন।

মাষ্টার মশায় ফিরিয়া যাইবার কথা পূর্ণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অভিভাবকদের কথা মনে পড়িতেই পূর্ণচন্দ্র প্রত্যাগমনের জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। পরম যত্নে ও সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "তোর যখন

সুবিধা হবে এখানে চলে আসবি—গাড়ী ভাড়া এখান থেকে লিবি।"

ধীরে ধীরে পূর্ণ ও মাষ্টার মশায় ফটকের দিকে চলিলেন। দেহ যাইতেছে কিন্তু মন যেন শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া বিদ্যালয়ের দিকে চলিলেন। ছুটি হইবার পূর্বেই তাঁহারা তথায় পৌছিয়াছিলেন। অন্যদিনের মতই পূর্ণ যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা অভিভাবকেরা কেহ জানিতে পারেন নাই। একমাত্র পূর্ণচন্দ্র হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই পুণ্যদর্শন ও মহাপুরুষের স্মৃতি গোপনে রক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের নিকট পূর্ণচন্দ্রের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বিষ্ণুর অংশে পূর্ণের জন্ম। অংশ শুধু নয়—কলা। মানসে বেলপাতা দিয়ে পূজো করলুম—তা হল না, তুলসী চন্দন দিলাম—তখন হলো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় একদিন কি দেখিয়াছিলেন তাহা ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিয়া বলিতেছিলেন, "এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? তিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার মেঠো রাস্তা, সেই মাঠে—আমি একলা! সেই যে পনর ষোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম—আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম। চারদিকে আনন্দের কুয়াশা! তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটী ছেলে উঠলো, মুখটী দেখা যাচ্চে। পূর্ণের রূপ! দুইজনেই দিগম্বর! তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেলা। দৌড়াবার পর পূর্ণর জল পিপাসা পেলে সে একটী গ্লাসে করে জল পান করলে। পরে আমাকে দিতে এলো! আমি বল্লাম, ভাই তোর এঁটো খেতে পারবো না। তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।"

ঠাকুর অন্যদিন প্রসঙ্গ ক্রমে ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন, "তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে তুমি শরীর ধারণ করেছ এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাকো। পূর্ণ উঁচু সাকারের ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কি অনুরাগ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। ভক্তদের অনুরোধে যখন যে ভক্তের বাড়ীতে তিনি যাইতেন, তখন তথায় একটী ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন হইত। তাঁহার আনন্দময় সঙ্গলাভ করিতে, তাঁহার শ্রীমুখের কথা-মৃত আস্বাদনের আশায় আর তাঁহার অপূর্ব ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততা ও মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন অবস্থা দর্শন করিবার ব্যাকুলতায় ও আগ্রহে এবং ত্রিতাপদগ্ধ মানব হৃদয়জ্বালা জুড়াইতে দলে দলে তথায় আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। যাঁহাদের দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় বা সুযোগ হইত না এইরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষীরাও আসিতেন। অনেক সময় ঠাকুর বলরাম মন্দিরে আসিয়া দুই একদিন থাকিতেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলরাম বাবুকে তাঁহার আগমন সংবাদ পাঠাইতে বলিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তিনি মাষ্টার মশায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণকে কেন আনলে না?" মাষ্টার মশায় উত্তরে জানাইলেন যে বেশী লোকজনের মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে পূর্ণের ভয় হয় পাছে সকলের সাক্ষাতে ঠাকুর তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া ফেলেন এবং বাড়ীর লোকজনেরা লোকমুখে জানিতে পারে যে তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করেন। বলরামবাবুর বাড়ী হইতে পূর্ণচন্দ্রের বাড়ী বেশী দূর নয়—নিকটে।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে

বলিলেন, "হাঁ তা বটে, যদি বলে ফেলি ত আর বলবো না।" পরে তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে তাকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছ—সে তো বেশ।" মাষ্টার মশায় তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে নিবেদন করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইতে আছে যে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ভালবাসবে। একথা শেখালে কর্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যায় ?

এই সব আলাপ আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় পূর্ণচন্দ্রের পিতা বালক বয়সে তাঁহার পুত্র বাহিরের কোন দলে মিশিবে বা কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে তাহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। বিশেষ সেই সময়ে কলিকাতায় ধর্মান্দোলন চলিতেছিল। একদিকে ব্রাহ্ম সমাজ, অপর দিকে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণির হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান। অনেক কিশোর ও যুবক ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করে এবং অনেক সময়ে তাহারা প্রচারক-মণ্ডলীর ছোটবড় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়—কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সারে। দীননাথবাবু এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন এবং পুত্রকে কঠোর শাসনবাক্যে সাবধান করিয়া দিতেন যেন বাহিরের কোন লোক বা দলের সঙ্গে সে না মিশে।

মাষ্টার মশায়কে শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছো ? ভাব টাব কি হয় ?" তিনি উত্তরে জানাইলেন, বাহিরে তাঁহার সে রকম কোন অবস্থা তিনি দেখেন নাই। ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে বলিলেন, "বাইরে তার ভাব ত হবে না। তার আকার আলাদা। আর আর সব লক্ষণ ভাল। কি বল ?" মাষ্টার মশায় বলিলেন, "চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল—যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল হলে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোখ আলাদা।" এই বলিয়া তিনি মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সহিত পূর্ণর প্রথম সাক্ষাতের পর কোন রকম কিছু হইয়াছে কিনা। মাষ্টার মশায় বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—কথা হয়েছিল। সে চার পাঁচ দিন ধরে বলেছে ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে, রোমাঞ্চ এই সব হয়।"

তবে আর কি!—এই বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মশায় ঠাকুরকে বলিলেন, "সে দাঁড়িয়ে আছে।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" মাষ্টার মশায় বলিলেন, "পূর্ণ। তার বাড়ীর দরজার কাছে সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ গেলে সে দৌড়ে আসে; এসে আমাদের নমস্কার করে।" ঠাকুর ভাবে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "আহা !"

কিশোর পূর্ণচন্দ্র এই বয়সেই ভাব দমন করিতে পারিতেন। এইজন্য উত্তরকালেও তিনি গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিত।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে বলরাম-মন্দির হইতে নিমু গোস্বামী গলিতে পরম ভক্ত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে ছিলেন মাষ্টার মশায়, ছোট নরেন ও অপর দুই একজন ভক্ত। ঠাকুর পূর্ণের প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং বোধ হইল যেন তিনি পূর্ণর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া পূর্ণ সম্বন্ধে বলিলেন, "খুব আধার! তা না হলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ও তো এসব কথা জানে না।" ঠাকুর পূর্ণচন্দ্রের জন্য বীজমন্ত্র জপ করিয়াছেন শুনিয়া সকলে অবাক হইলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন। পথে মাষ্টার মশায়কে বলিলেন

"এখন এই কটী ছোকরার উপর মন টানছে,—ছোট নরেন, পূর্ণ আর তোমার সম্বন্ধী!"

একদিন রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র বাড়ীতে তাঁহার পাঠগৃহে বসিয়া একাকী পড়িতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন তাঁহার ঘরের জানালার সম্মুখে মাষ্টার মশায় দাঁড়াইয়া আছেন। পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে রাস্তায় আসিয়া মাষ্টার মশায়ের নিকটে দাঁড়াইলেন। মাষ্টার মশায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, সঙ্গে এস।" পূর্ণচন্দ্র ব্যাকুলভাবে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দে বিহ্বলভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরম স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা।" এই বলিয়া তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন। কিশোর পূর্ণচন্দ্র ঠাকুরের এই অলৌকিক ভালবাসা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন; তাঁহার বক্ষ অশ্রুপ্লাবিত হইল। পরে তাঁহারা তিনজন উক্ত পল্লীর মধ্যে মাষ্টার মশায়ের গৃহে গমন করিলেন—সেখানে ঠাকুর পূর্ণচন্দ্রকে সাধন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর লেখকের সহিত পূর্ণচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের প্রেমভক্তির কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "কাল রাত্রে গিরিশবাবু এক অদ্ভুত কথা বলিলেন।" পূর্ণবাবু উৎসুক নয়নে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশবাবু কি বলিলেন?" আমি উত্তরে বলিলাম, "গিরিশবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে ঠাকুরকে কে চিনতে পারে? আমার গুরু ভাইরাই কে কি তাঁকে বুঝেছে? তবে তাঁর প্রেম মাধুর্যের একবিন্দু আস্বাদন করে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছে যে এই অনাবিল অপার্থিব প্রেম এই সংসারে নেই, বাপ মার ভিতরেও নেই। ভগবান সব লুকুতে পারেন, শুধু প্রেমস্বরূপটী গোপন করতে পারেন না। ভক্ত ও পার্ষদেরা এইটুকু প্রেমের আস্বাদনেই তর হয়ে থাকে। তা না হলে কার সাধ্যি যে যত বড়ই হোক্ না, সে অনন্ত মহাশক্তির স্বরূপ সব বুঝতে পারবে।" গিরিশ বাবুর এই উক্তিটি বলা মাত্রই পূর্ণবাবু আমার হাত ধরিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত এবং চক্ষু দুটি সজল। আমাকে তাঁহার ঘর হইতে রাস্তায় টানিয়া শ্যামপুকুর ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এইখানে—এইখানে।" আমি পূর্ণবাবুর এইরূপ আবেগ এবং ভাবাবেশ ইতঃপূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি বাহিরে ধীর-গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। কখনও কোন চাঞ্চল্য তাঁহাতে লক্ষিত হইত না। সন্ধ্যার পর গ্যাসালোকে তাঁহার দীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলাম—আমি নিরুত্তরে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি ভাবাবেগে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক কথা—গিরিশবাবু ঠিকই বলেছেন, কে তাঁকে চিন্‌তে পারে? তাঁর নিষ্কাম অহেতুকী ভালবাসার কে ইয়ত্তা কর্‌তে পারে? আমি বালক—কি জানতাম—কি বুঝতাম? শুধু তাঁর অলৌকিক প্রেম দেখেই বোধ হল যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। নইলে এত অহেতুকী প্রেম কে দিতে পারেন?" যাঁহারা পূর্ণবাবুর সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি নিজের প্রসঙ্গ কদাচিৎ তুলিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকিতেন। সেই রাত্রিতে ভাবাবেগে তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনা শুনিয়াছিলাম। একদিন ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসু মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, সংসার মিছে এরূপ জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হলো?" ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, "ওদের কেমন জান্‌? আগে ফল তারপর ফুল। আগে দর্শন তারপর গুণমহিমাশ্রবণ, তারপর মিলন।"

বলরাম বলিলেন, "আচ্ছা, মাষ্টার মশায়ের

কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক শুনেছে।" ঠাকুর অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আগেকার কথা। (শ্রীমহেন্দ্র নাথকে দেখাইয়া) ইনি জানেন, আমি জানি না।" বলরাম বলিলেন, "পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। তবে এঁরা?" ঠাকুর বলরামকে উত্তর দিলেন, "এরা হেতু মাত্র।"

পূর্ণচন্দ্র কখনও মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে অথবা কখনও একাকী মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন, পূর্ণচন্দ্রও সেইরূপ ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। ভগবান ও ভক্তের অদ্ভুত আকর্ষণ! একদিন ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন, "পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে। কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, 'আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য'।"

এই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, "ঠাকুরকে দেখবার জন্য প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত। হঠাৎ এমন আকর্ষণ বোধ করতাম যে সে সময়ে বাড়ীর শাসন বা বকুনি কিছু মনে হত না। কেবল কখন তাঁর কাছে যাব এই রকম একটা প্রবল ঝোঁক হত। ছেলেবেলায় আর কোন বিষয়ে খেয়াল ছিল না। কেবল ভগবানের নাম নির্জনে করতে ভাল লাগতো। বিশেষ কোন সমবয়স্ক সহপাঠীর সঙ্গেও মিশতাম না! ঠাকুরের কি অহেতুকী কৃপা!" একদিন নানা কথাবার্তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ঠাকুরকে দেখিয়া প্রথম তাঁহার কেমন বোধ হইয়াছিল? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত একজন মহাপুরুষ—সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছিল ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান।"

বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কষ্টে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। পূর্ণ বলরাম-মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা! পূর্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর সাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া, এখানে এস বলিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যা বলে দিয়েছিলাম —সে সব করছ তো?" পূর্ণ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" ঠাকুর অতি গোপনে আস্তে আস্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপনে কিছু দেখো? আগুন-শিখা, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশান মশান? এসব দেখা বড় ভাল।" পূর্ণ উত্তর করিলেন, "আপনাকে দেখেছি; বসে আছেন—কি বলছেন।" ঠাকুর বলিলেন, "কি উপদেশ, কই একটা বল দেখি?" পূর্ণচন্দ্র অমনি উত্তর দিলেন, "মনে নেই।" ঠাকুর অভয় দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তা হোক, ও খুব ভাল! তোমার উন্নতি হবে, আমার উপর তো টান আছে।" উভয়ে নীরব রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পূর্ণকে বলিলেন, "কই সেখানে যাবে না?" সেখানে অর্থ দক্ষিণেশ্বরে! পূর্ণ বলিলেন "তা বলতে পারি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কেন? তুমি তো বলেছিলে সেখানে তোমার কোন আত্মীয় আছে।" পূর্ণ—"আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে না।"

স্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্

(১)

যুগাচার্য্য, ধর্ম্ম-প্রচারক, ব্রহ্মজ্ঞ, সমদর্শী বিবেকানন্দের চিত্র দেখিয়া আমরা ভুলিয়া যাই তিনি একজন অতুলনীয়, আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার মহান্ চরিত্রের এই দিকটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের মূল প্রেরণা কি তাহাই আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে,—তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের আলেখ্যটি আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ থাকিবে,—তাঁহার আন্তর জীবনের প্রকৃত সমাচার হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না, যে ব্যক্তি নিজের গর্ভধারিণী মাতাকে ভালবাসে না, তাহার পক্ষে জন্মভূমিকে ভালবাসা যেমন অসম্ভব, তেমনি যে ব্যক্তি তাহার জন্মভূমিকে ভালবাসে না, তাহার পক্ষে বিশ্বমানব-প্রেমিক কিম্বা ভগবৎ-প্রেমিক হওয়া অসম্ভব। তাই স্বামীজীর হৃদয়-নিঃসৃত বাক্যাবলী এবং কার্য্যসমূহের সহায়তায় তাঁহার চরিত্রের এই দিকটার সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব।

"শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ত্তাবাহক বিবেকানন্দ" এবং "ভারতে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধাবলীতে স্বামীজীর স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক কতক উক্তি ও ঘটনা উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরগুলি যতটা সম্ভব আমরা সংগ্রহ করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ পর্য্যটন কালে এদেশের দরিদ্র, পতিত জনসাধারণের দারুণ দুঃখে মুহ্যমান হইয়া কিরূপে তাহার প্রতি-বিধান করিবার চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের বহু ঘটনায় ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল ঘটনার কতকগুলি মাত্র দৈবাৎ তাঁহার দু'একজন গুরুভ্রাতার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই যে লোকসমাজে অজ্ঞাত রহিয়াছে,—তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, নিজেকে প্রচার করা, নাম-যশ অর্জ্জন করিবার বাসনা বিবেকানন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই প্রকার একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিলেই স্বামীজীর হৃদয় কত মহৎ ছিল, এদেশের দীন-দরিদ্রদিগকে তিনি কত ভালবাসিতেন তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বের নিকটবর্ত্তী আবু রোড ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়। তখন স্বামীজী তাঁহার গুরু ভ্রাতাদিগকে অপরিসীম দুঃখে বলিয়াছিলেন—"এখন আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, * * কিন্তু হায়, এদেশের জন-সাধারণের ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমি কিরূপ ব্যথিত, মর্ম্মাহত হইয়াছি কি বলিব! চক্ষুর অশ্রুধারা রুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করা বৃথা প্রয়াস মাত্র। এই কারণেই,—ভারতের দীন-দরিদ্র জন-সাধারণের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকা যাইতেছি।"—এই ঘটনার বহু বৎসর পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ সমুদয় ঘটনাটি স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ প্রভৃতির নিকট বর্ণনা করেন এবং

জ্ঞানেশ্বরানন্দজী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ১৯২৬ ইংরেজী, ৩১শে জানুয়ারী তারিখে The Morning Star পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকার ইংরেজী বিবরণীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—স্বামীজী তাঁহাদিগকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের পরিকল্পনা, ঐ বিষয়ে তাঁহার নানারূপ সংশয় প্রভৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার কার্য্যের সফলতার উপায়-স্বরূপে জগদীশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই ধর্ম্মমহাসভার ব্যবস্থা হইয়াছে,—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বামীজীর প্রত্যেকটি শব্দ এবং কণ্ঠের স্বরটি পর্য্যন্ত তুরীয়ানন্দজীর স্মরণ ছিল। স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হরি ভাই, আমি তোমাদের তথা-কথিত ধর্ম্মের অর্থ বুঝি না······।" এই কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল শোণিতপ্রবাহে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কি এক গভীর বিষাদ ও ব্যথা যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি কম্পিত হস্ত বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমার হৃদয় অনেক প্রসারিত হইয়াছে, আমি পরের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে শিখিয়াছি। বিশ্বাস কর, দারুণ দুঃখে আমি পরের দুঃখ অনুভব করি।" —এই কথা বলিবার পর তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি নীরব হইয়া রহিলেন; অশ্রুপ্রবাহ তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া ঝরিতে লাগিল!—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামী তুরীয়ানন্দও দুঃখে অভিভূত হইলেন; তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা অনুমান করিতে পার, স্বামীজীর এই সকল মর্ম্মভেদী বাক্য শুনিয়া, তাঁহার সুমহান্ বিষাদ-কালিমা দেখিয়া আমার হৃদয়-মনের কি অবস্থা হইয়াছিল।" আমি ভাবিতে লাগিলাম—"এই সকল বাক্য ও অনুভূতি কি বুদ্ধদেবেরই বাক্য ও অনুভূতি নহে?"—তখন আমার স্মরণ হইল, বহুকাল পূর্ব্বে যখন স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় বোধি-দ্রুম-মূলে ধ্যান করিতেছিলেন তখন তিনি শ্রীবুদ্ধের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে বুদ্ধদেব স্বামীজীর দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।····· আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমগ্র মানবজাতির সমুদয় দুঃখ কষ্ট শেলের ন্যায় তাঁহার স্পন্দিত হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়াছে। আগ্নেয়গিরির গর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় যে দুঃখাগ্নি তাঁহার হৃদয়-গুহায় বিদ্যমান ছিল তাহার একটু ভগ্নাংশও যিনি দেখেন নাই তিনি বিবেকানন্দকে চিনিতে পারেন নাই।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠিক এইরূপ আর একটি দৃশ্যের কথা বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবার পর সম্ভবতঃ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে এই দৃশ্য তুরীয়ানন্দজী দেখিতে পান। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছেন—"আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখিলাম তিনি বারাণ্ডায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পায়চারি করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এবং আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি মীরাবাঈ-এর একটি প্রসিদ্ধ গান অস্ফুট কণ্ঠে গাহিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু-প্রবাহ নিঃসৃত হইল। তিনি দাঁড়াইয়া দুই করতল দিয়া মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইল; তিনি বারংবার গাহিতে লাগিলেন—

'ওগো কেবা বোঝে মোর মরম-বেদনা!
ব্যথিত যে জন সেই জানে দুঃখীর বেদনা।'

তাঁহার কণ্ঠস্বর শরের ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার এই দারুণ ব্যথার কারণ কি আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু হঠাৎ বুঝিলাম, তাঁহার সুতীব্র সমবেদনাই এত দুঃখের হেতু,—এই সর্ব্বানুভূতিই তাঁহার হৃদয়ের শোণিতপ্রবাহকে বারংবার তপ্ত অশ্রুতে পরিণত করিয়াছে। আর জগদ্বাসী এই সংবাদ কখনও প্রাপ্ত হইত না।"

তুরীয়ানন্দজী তাঁহার শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা কি মনে করিতেছ, স্বামীজীর এই শোণিতাশ্রুবর্ষণ বৃথা হইবে? কখনো

নয়! তাঁহার স্বদেশের জন্য যত অশ্রুবিন্দু বর্ষণ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটি হইতে, তাঁহার বিশাল হৃদয়ের প্রত্যেকটি অর্দ্ধস্ফুট কিন্তু প্রজ্জ্বলন্ত বাণী হইতে সহস্র সহস্র বীর জন্মগ্রহণ করিবে, যাহারা তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা সমগ্র জগৎকে কম্পিত করিয়া তুলিবে।"

এখন আর একটি অলৌকিক কিন্তু মর্ম্মভেদী চিত্র পাঠকের নেত্রসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিব যাহার পটভূমিকা ভারতবর্ষ নহে,—সুদূর আমেরিকার চিকাগো মহানগরী।

এই অজ্ঞাতকুলশীল গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিত নবীন সন্ন্যাসী একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্বারা ক্ষণেকের মধ্যে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রচারক ও সুধীমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গৌরব-মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিলেন! কিন্তু মানী ও জ্ঞানিগণ হইতে এত মান-সম্ভ্রম লাভেও কোনরূপ আত্মাভিমান এই সর্ব্বত্যাগী পুরুষের চিত্তকে স্পর্শ করিল না, স্বদেশের হিতসাধনরূপ যে ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন তাহা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। ধর্ম্ম-মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনের পর হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে চিকাগোর পথঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল, সুপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী নাগরিকগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেই দিবস রাত্রে চিকাগোর একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি স্বামীজীকে নিজের রাজপ্রাসাদসদৃশ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া অনুগত শিষ্যের ন্যায় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও পরিতোষ সাধন করেন। স্বামীজীর শয়নের জন্য বিবিধ বিলাসোপকরণে সজ্জিত একটি প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শয়ন করিতে গেলেন বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রার আরাম উপভোগ করা ঘটিয়া উঠিল না। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিলাসসামগ্রী, দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা দর্শন করিয়া তাঁহার অনশনক্লিষ্ট মাতৃ-ভূমির স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। ভারতের দুঃখ-দৈন্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, উপাধান অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইলেন এবং অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে দারুণ দুঃখে তাঁহার সংজ্ঞা হারাইবার উপক্রম হইল। রুদ্ধশ্বাসে তিনি গৃহতলে পড়িয়া গেলেন,—যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, আমি নাম যশ দ্বারা কি করিব যখন আমার জন্ম-ভূমিকে অসীম দারিদ্র্যের অতলে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি! ওহো, আমরা দরিদ্র ভারতবাসীরা কি দারুণ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এক মুষ্টি অন্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে! কে ভারতের ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের মুখে অন্ন জোগাইবে, কে তাহাদিগকে এই দীন অবস্থা হইতে উত্থিত করিবে? মাতঃ, কি প্রকারে আমি তাহা-দিগকে সাহায্য করিতে পারি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।"—এইরূপে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী, বিশ্ব-বিজয়ী বিবেকানন্দ সেই নিশা যাপন করিলেন, আর সেই সময়েই আমেরিকার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহ তাঁহার যশোগীতিতে পূর্ণ হইতে লাগিল! সভ্যজগতের ইতিহাসে এরূপ জীবন্ত তীব্র স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় একটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না জানি না! শ্রীবুদ্ধের পর এরূপ আর্ত্তের জন্য সমবেদনা, দীন-দরিদ্রের সঙ্গে একাত্মতাবোধ আর কোথাও দৃষ্ট হইয়াছে কি না জানি না! তাই নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই অপূর্ব্ব চরিত্র-মাহাত্ম্য লক্ষ্য করিয়া আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন:—"His

patriotism is perfervid. The manner in which he speaks of 'My Country' is most touching. That one phrase reveals him not only as a monk, but as a man of his people."—অর্থাৎ, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলন্ত, অতি তীব্র। যে ভাবে তিনি 'আমার দেশ' এই কথাটি উচ্চারণ করেন তাহা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। এই একটি কথায় ব্যক্ত করিয়া দেয়, তিনি শুধু সন্ন্যাসী নহেন, তিনি ভারত-সন্তান, ভারতবাসী জনসাধারণের সহোদর ভ্রাতা।

আমেরিকায় থাকা কালে স্বামীজী ভারতের যুবকবৃন্দকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অনেক উত্তেজনাপূর্ণ চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়া সমগ্র দেশে ভ্রমণ করিবার সময় বহু বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় তিনি শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে দেশের দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার প্রেরণা সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সকল পত্র ও বক্তৃতা হইতে কোন কোন অংশ "ভারতে বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মহান্ ভাব, এই তীব্র অনুভূতি তাঁহার "সখার প্রতি" নামক কবিতায় ছন্দোময়ী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ কবিতার শেষ চারিটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজী তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজের বন্ধুগণকে তাঁহার বিদেশ-যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"The time has come for the propaganda of the Faith. The time has come for the Hindusim of the Rishis to become dynamic. Shall we stand by, whilst alien hands attempt to destroy the fortress of the Ancient Faith? * * Shall we remain passive, or, shall we become aggressive, as in the days of old, preaching unto the nations the glory of the Dharma? Shall we remain enclosed within the narrow confines of our own social groups and provincial consciousness, or, shall we branch out into the thought worlds of other peoples, seeking to influence these for the benefit of Bharatavarsha? In order to rise again India must be strong and united, and must focus all its living forces. To bring this about is the meaning of my Sannyasa!"—অর্থাৎ 'আমাদের সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে,—ভারতীয় ঋষিগণের ধর্ম্মকে শক্তিমান, সক্রিয় করিবার সময় হইয়াছে। বিদেশী প্রচারকগণ আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের দুর্গটি বিচূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াও কি আমরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিব? আমরা কি আমাদের প্রাচীনদের মত বীরগর্ব্বে পৃথিবীর সমুদয় জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিব না? আমরা কি সঙ্কীর্ণ সামাজিক গণ্ডির ভিতর ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকিব অথবা ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য জগতের নানা জাতির চিন্তাধারাকে আমাদের ধর্ম্মবিস্তার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিব? নিজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতবর্ষকে প্রবল হইতে হইবে, ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, তাহার সমস্ত জীবন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।'

আমেরিকায় একটি স্ত্রীলোকের কারাগার দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জনৈক ভারতবাসী শিষ্যের নিকট একখানা সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রে নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ব্যবহার বিষয়ে আমেরিকা এবং ভারত-বর্ষের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী তাঁহার অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে এদেশে কারাগার (Prison) বলা হয় না, কিন্তু সংশোধনাগার (Reformatory) বলা হয়। আমেরিকায় আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে এইটি মহত্তম। কত সুহৃদয়তার সঙ্গে কারা-বাসিনীগণের প্রতি ব্যবহার করা হয়। তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া সমাজের হিতকারী সভ্যরূপে তাহাদিগকে কারামুক্ত করা হয়। ইহা কেমন অপূর্ব্ব, কত সুন্দর তাহা তোমরা না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না! আর ভারবর্ষে দীন-হীন নিম্নশ্রেণীর লোককে আমরা কি চক্ষে দেখিয়া থাকি তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দারুণ ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই অবনত অবস্থা হইতে উঠিবার, এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধারের কোন সুযোগ, কোন উপায় তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। * * দিন দিন তাহারা দুর্গতির অতলে ডুবিতেছে। নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদের উপর যে মুষ্টির আঘাত বর্ষণ করিতেছে তাহা তাহারা অনুভব করিতেছে, অথচ জানে না কোথা হইতে তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। ইহার পরিণামই দাসত্ব। ওহো, উৎপীড়ক দুরাত্মাগণ, তোমরা জান না যে উৎপীড়ন এবং দাসত্ব একই জিনিষের এ-পিঠ এবং ও-পিঠ,—দাসত্বই উৎপীড়কের ভাগ্যলিপি! * * লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার উদ্যম-উৎসাহে অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া, অটল ভগবদ্বিশ্বাসের বর্ম্মে সুরক্ষিত হইয়া, দীন-হীন-পতিত-পদদলিতদের জন্য সমবেদনা-সঞ্জাত সিংহ-বিক্রমে পূর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিচরণ করুক এবং মুক্তি, সেবা ও সাম্যের বেদবাণী দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক। * * * হে বৎসগণ, তোমরা মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও। প্রভু আমাকে এইজন্য আহ্বান করিয়াছেন। এজীবনে কত যন্ত্রণা, কত পীড়ন সহ্য করিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে, প্রাণাধিক প্রিয়তমের অনশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে হইয়াছে। লোকে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে এবং যাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতির জন্য আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। একমাত্র আশা তোমাদের উপর যাহারা নিরহঙ্কার, নম্রস্বভাব, নীচ, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাসী। * * তোমরা দীন দুঃখীর দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব কর এবং সাহায্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—তবেই তোমরা সাহায্য পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুঃখের বোঝা হৃদয়ে বহন করিয়া, এই চিন্তা মস্তকে লইয়া বহু বৎসর দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, তথা-কথিত ধনবান্ ও মহাজনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। এখন ব্যথাদীর্ণ, রক্তাক্ত হৃদয়ে অর্দ্ধভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া সাহায্যের জন্য এই বিভুঁই-বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু দয়াময়, সুমহান। আমি জানি তিনি আমার সহায় হইবেন। আমি শীতে অথবা অনাহারে মরিতে পারি; কিন্তু, হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, মূর্খ, পীড়িত-দের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম দায়স্বরূপ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইব। * * হাঁ, প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর; তোমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ কর, আত্মবলিদান কর এই ত্রিশ কোটি লোকের মুক্তির জন্য যাহারা প্রতিদিন ডুবিতেছে। * * প্রভু ধন্য, আমরা জয়ী হইবই। এই সংগ্রামে শত শত যোদ্ধা মরিবে, শত শত আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবে। চাই বিশ্বাস, চাই সমবেদনা,—অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত সহানুভূতি; নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, শীত, অনশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের সেনাপতি,—প্রভুর জয়।
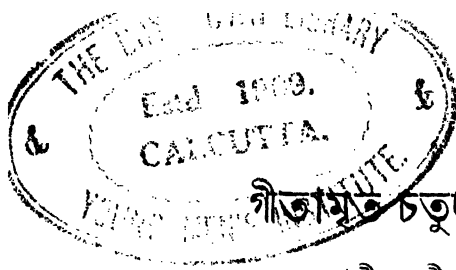
গীতামৃত চতুর্দশ বিন্দু

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতার চতুর্দশ অধ্যায় ২৭টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে প্রকৃতিজ গুণত্রয়ের বিভাগ-যোগ ব্যাখ্যাত এবং গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণিত। শ্রীভগবান পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে বিশ্বব্যাপার সঞ্জাত। তথায় তিনি নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সংযোগের ঈশ্বরাধীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর মতে গুণের সঙ্গহেতু পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা এবং সাংসারিক ব্যাপারের বিচিত্রতা বর্তমান অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে কথিত। বলদেবের মতে গুণসমূহই বন্ধনের হেতুভূত, ফল দ্বারাই গুণত্রয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ভগবদ্ভক্তগণ ত্রিগুণের অতীত এই সকল তত্ত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে কীর্তিত। বিশ্বনাথের মতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই গুণত্রয়ই বন্ধনের হেতু এবং তাহারা ফল দ্বারা অনুমেয়। সেই গুণত্রয়ের বিনাশেই মুক্তি এবং ভক্তিই তাহার হেতু ইহাই চতুর্দশে বর্ণিত। যামুনমুনির মতে বন্ধনের হেতুভূত বলিয়াই ত্রিগুণের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে গতিত্রয়সহ স্বকীয় মূলেরও নিবৃত্তি হয়—ইহাই চতুর্দশে ব্যাখ্যাত।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন, 'চতুর্দশে যে তত্ত্বজ্ঞান বলা হইবে তাহা সকল জ্ঞানের উত্তম; ইহা জানিলে দেহান্তে মুনিগণ পরাসিদ্ধি লাভ করেন। এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে টীকাকার বলদেব বলেন, নবনীত যেমন দুগ্ধের সারস্বরূপ এবং তাহা দুগ্ধেরই অন্তর্নিহিত; তদ্রূপ যে জ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষণে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিতেছেন তাহা সকল জ্ঞানের সারস্বরূপ, অথচ সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত।'

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিলেন, 'এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুনিগণ আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হন। তাঁহারা আর সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়-কালেও প্রকৃতিলীন হন না।' এখানে সাধর্ম্য শব্দের অর্থ সমানধর্মতা নহে, স্বরূপতা। কারণ, গীতাতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরপরতন্ত্র এবং এইরূপেই তাহারা জগৎকারণ। ঈশ্বর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপ প্রকৃতিদ্বয়যুক্ত শক্তিমান। অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম অনুবিধায়ী ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবকে) ক্ষেত্রের (দেহের) সহিত তিনি সংযোজিত করেন। শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই সর্বভূতের কারণ। দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ও পশ্বাদি যোনিতে যে সকল দেহ উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত প্রকৃতিও তাহাদের জননী এবং ঈশ্বর তাহাদের গর্ভাধানকর্তা পিতা। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে জগতের উৎপত্তি প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মই অবিদ্যাহেতু জীবভাব প্রাপ্ত হন ইহাই বলা হইল। প্রকৃতিস্থ এবং গুণাসক্ত হওয়াই পুরুষের সংসৃতির কারণ—ইহা ত্রয়োদশে বলা হইয়াছে। এখানে গুণ কি কি, গুণাসক্তি কি প্রকার, তাহারা পুরুষকে কি ভাবে আবদ্ধ করে ইত্যাদি বলা হইতেছে।

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। প্রকৃতিজ গুণত্রয় যেন অব্যয় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে। গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে। পরব্রহ্মের চিৎশক্তি প্রকৃতিতে অবভাসিত হইলে গুণত্রয় সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর বৈষম্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয়। রূপাদিবৎ গুণত্রয় দ্রব্যাশ্রিত নহে;

গুণ ও গুণীর ভিন্নতা বলাও এখানে অভিপ্রেত নহে। গুণ যেরূপ গুণীর অধীন, গুণত্রয় সেরূপ অবিদ্যাত্মক, অচেতন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্যের নিত্য-পরতন্ত্র। সত্ত্বগুণ স্ফটিক মণির ন্যায় নির্মল বলিয়া প্রকাশক ও নিরাময়। নির্মল শব্দের অর্থ শ্রীধরমতে স্বচ্ছ এবং মধুসূদনমতে চিদ্বিম্বগ্রহণ-যোগ্য। প্রকাশক শব্দের অর্থ আনন্দগিরিমতে চৈতন্যাভিব্যঞ্জক, রামানুজমতে বস্তুযাথাত্ম্যাব-বোধক, শ্রীধরমতে ভাস্বর, বলদেবমতে জ্ঞানব্যঞ্জক, মধুসূদনমতে চৈতন্যের তমোগুণকৃত আবরণতিরোধায়ক এবং নীলকণ্ঠমতে আলোকবৎ সর্বার্থাবদ্যোতক। রাঘবেন্দ্র যতি বলেন, 'শ্রী, ভূ ও দুর্গা—এই তিন দেবী যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাভিমানিনী। এই তিন দেবী জীবলোকে বন্ধনের হেতুভূতা। তন্মধ্যে শ্রী দেবী দেবলোকের বন্ধনের কারণ, ভূ দেবী মনুষ্যলোকের এবং দুর্গা দেবী দানবাদির বন্ধনের মূল। শঙ্কর, আনন্দগিরি ও মধুসূদনমতে দেহে দেহীর গুণজ বন্ধন পারমার্থিক নহে, মায়িক মাত্র। সত্ত্বগুণ অনাময়, নিরুপদ্রব, স্বরূপসুখের অভিব্যঞ্জক। ইহা 'আমি সুখী' এইরূপ সুখাসক্তি দ্বারা এবং 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ জ্ঞানাসক্তি দ্বারা দেহীকে যেন দেহে আবদ্ধ করে। সত্ত্ববৃত্তিতে আনন্দ-প্রতিবিম্বরূপ বিষয়সুখে তাদাত্ম্য-অভিমানই সুখাসক্তি। বিষয়সুখ দেহের ধর্ম, দেহীর নহে। সুখের ন্যায় জ্ঞানটী বৃত্তিরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম, দেহীর ধর্ম নহে। অনাত্মার ধর্ম আত্মার হইতে পারে না। 'আমি জ্ঞানী' এই অভিমানও একটী বন্ধন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, সত্ত্বগুণের উদয় হইলে মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করে।

রজোগুণ রাগাত্মক। ইহা অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং প্রাপ্তবিষয়ে মনের প্রীতি-উৎপাদক। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত কর্মে আসক্তি দ্বারা ইহা আত্মাকে যেন দেহে বন্ধন করে, অর্থাৎ যেন 'আমি করি' এই অভিমান দ্বারা কার্যে প্রবর্তিত করে। রঞ্জনই রজোগুণের স্বভাব। যেমন গৈরিকাদি দ্রব্য যাহাতে সংলগ্ন হয় তাহাকে রঙাইয়া থাকে সেইরূপ রজোগুণও শঙ্করমতে পুরুষকে রঙাইয়া থাকে। রজোগুণ বিষয়তৃষ্ণা এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমান বর্ধক। কোন কোন টীকাকার 'রাগ' শব্দের স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা, সুতরাং সঙ্গ ও স্পৃহা এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রজোগুণ স্ত্রী, বিষয় প্রভৃতি ভোগের নিমিত্ত তৃষ্ণা উৎপাদন করে এবং তজ্জন্যই কর্মবন্ধন ঘটে।

তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন এবং দেহধারিগণের হিতাহিত-বিবেকের প্রতিবন্ধক। ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে দেহে যেন আবদ্ধ করে। সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদে দেহীকে সংযুক্ত করে। গুণপ্রভাবেই দেহের সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এবং গুণের তারতম্যানুসারে দেহাধিষ্ঠিত দেহীর কার্যাকার্যের বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়; রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। যখন এই ভোগায়তন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে শব্দাদি-বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় তখন জানিবে যে, সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে। প্রসাদ, লঘুতা প্রভৃতিও সত্ত্বগুণবৃদ্ধির চিহ্ন। লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি ও উদ্যম, হর্ষ ও অনুরাগাদির অনুপরম এবং বিষয় ভোগের স্পৃহা—এই সকল রজোগুণ বর্ধিত হইলে উৎপন্ন হয়। কর্তব্যা-কর্তব্য-বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা এবং মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে জন্মে। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ

ব্রহ্মেই পর্যবসিত। উক্ত শ্লোকোপলক্ষে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত ধর্মধ্বজের আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, সূর্য তেজোময় ও তেজোরূপ হইলেও যেমন তাহাকে তেজের আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। বিশ্বনাথের উপসংহারবাক্য এই 'ত্রিগুণাধীনতাই অনর্থের হেতু এবং নিস্ত্রৈগুণ্য ভাবই কৃতার্থতা লাভের উপায়। ভগবদ্‌ভক্তেরই সেই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাই এই অধ্যায়ের সারার্থ।' শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকার উপসংহারে বলেন, 'গুণের আসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অধীন, ভগবদ্‌ভক্তগণ এই ভবসিন্ধু কৃষ্ণকৃপায় অনায়াসে অতিক্রম করেন এই তত্ত্ব চতুর্দশে বিবৃত।' বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার-বাক্য এই 'গুণ-সংযোগেই সংসার-বন্ধন ঘটে, গুণের অবসান হইলেই মোক্ষলাভ করা যায় এবং কেবল হরিভক্তি-প্রভাবেই সেই সিদ্ধি প্রাপ্য।'

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণের কার্য সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকাটি বলিতেন তাহা অতিশয় শিক্ষা-প্রদ। এক পথিক কোন অরণ্যে তিনটি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন। প্রথম দস্যু পথিকটির প্রাণনাশে উদ্যত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দস্যু তাঁহাকে প্রাণে মারিতে না দিয়া বাঁধিয়া রাখে। আবার তৃতীয় দস্যুটি তাঁহার বন্ধন খুলিয়া তাঁহাকে অরণ্যের বাহিরে লইয়া যাইয়া রাজপথে ছাড়িয়া আসে। কিন্তু সে পুলিশের ভয়ে পথিককে তাঁহার গৃহ পর্যন্ত পথপ্রদর্শন করিতে সাহস করে না। প্রথম দস্যুটি তমোগুণের, দ্বিতীয়টি রজোগুণের এবং তৃতীয়টি সত্ত্বগুণের উদাহরণ। সত্ত্বগুণও সাধককে ঈশ্বরপর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে না। ত্রিগুণের রাজ্যে যতদিন থাকা যায় ততদিন ভগবদ্দর্শন হয় না; ত্রিগুণাতীত হইলে ভগবদ্দর্শন হয়। ভক্তিসাধনের দ্বারাও গুণবন্ধন কর্তিত হয় এবং ঈশ্বরলাভ হয়। আত্মা ত্রিগুণাতীত। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে গুণাতীত হওয়া যায় না। নিস্ত্রৈগুণ্য আত্মজ্ঞানীর অবস্থা। এই অবস্থা লাভ হইলে মানুষ মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হয়।

আজ যেন তাহা ভুলে গেছি

শ্রীমতী উষা দেবী

আমার জীবন-পাত্র হতে
কিছু সুধা দানিব তোমায়
এই মোর আশা।

যত গান গেয়েছি জীবনে
যত বাকী আছে মোর গাওয়া
আর ভালোবাসা।

সব দিব তোমায় আজিকে
দিতে চাই নিবে কি তা তুমি,
পূরাবে কি আশা?

বর্ষশেষ জীবনের সুরু
কেঁপে ওঠে বুক দুরু দুরু
চেয়েছিনু—মৃত্যুরে যে কবে
আজ যেন তাহা ভুলে গেছি।

আমার জীবন-পাত্র হতে
কিছু সুধা দিব বলে বিভু
আজ যেন সব ভুলে গেছি।

কদলী-রাজ্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

কদলীরাজ্য বা নারীরাজ্যের নাম সমগ্র নাথ-সম্প্রদায় এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাকারী দেশবিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। মহাভারতে ও তিব্বতীয় ভাষার পাগখাম জোনবজান গ্রন্থে কদলীক্ষেত্রের উল্লেখ আছে (J. R. A. S. Bengal, 1898, Part I, p 20)। শিখগুরু নানক রচিত 'প্রাণসংগলী' গ্রন্থের ৩১শ অধ্যায়ে কজরী বনের কথা আছে। নানক যোগতন্ত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহাতে নাথগুরুদের বন্দনা করিয়াছেন। জৈমিনি মহাভারতে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ আছে। বিশ্বকোষ ও সন্তলীলামৃতে নারীরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' কোদালি শহরের বিবরণ আছে। বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে এসব কদলীরাজ্যের নামান্তর। এই কদলীরাজ্যে—

"শ্রী[1] রাজা শ্রীপ্রজা শ্রীরাজ্যের দেওান।
নারি বিনে নাহি রার্জ্জ্যে পুরুষের ত্রাণ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ)

সে কদলীরাজ্যে পুরুষের অভাবে—

"রিতুস্তান[2] করে নারি জায়া কামরূপ॥
কামরূপ নগরে আছে পুরুশের বসতি।
তথা জাএ নারি যে জন হএ রিতবতি॥
কামরূপ জায়া নারি ভূঞ্জে'ন শ্রীঙ্গার।"[3]

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ)

এমন কি—

"গর্ব্ভেত্যের[3] ভিতরে যার শ্রীজন হয় বেটা[4]।
রামচক্রবানে পুত্রের মুণ্ড জাএ কাটা॥
*   *   *   *   *
শ্রীয়া পাটনে নাহি পুরুষের পরিত্রাণ॥
তকারণে নাহি রাজ্যে পুরুশের নেশ[5]।

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

এই কদলীরাজ্যের রাজধানী কদলী নগর। অধিবাসীরাও কদলী নামে খ্যাত। ইহার সিংহাসনাধিকারিণী হইলেন কমলা ও মঙ্গলা নাম্নী দুই বোন। ষোলশত নারী দ্বারা ইহার মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত। এরাজ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক ছিল, সে তুলনায় পুরুষ ছিল না বলা যায়। প্রতি পুরুষের ঘরে "দুই চারি মাই" (স্ত্রী) ছিল। এই রাজ্য সুজলা, সুফলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছিল এবং এখানে সাধারণতঃ নাথ-সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। এখানকার পুরুষদিগকে 'রাউল' বলা হইত।

নাথসিদ্ধা মীন নাথ এই কদলীরাজ্যের নারীদের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-প্রকাশিত 'গোরক্ষবিজয়ে' আছে—

"ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপ কদলীতে জাএ।
এক দিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ॥

(৫১ পৃঃ)।

*   *   *   *   *

ষোল স কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারিপাশে মীনে করি মাঝ॥"

(১৫৬ পৃঃ)

এই কদলীরাজ্যের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু গবেষণা করিয়াও অকাট্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুমান স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ

১ স্ত্রী, রমণী ২ ঋতুস্নান ৩ গর্ভের ৪ পুত্র

৫ লেশ

কামরূপ, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশই কদলীরাজ্য (ময়নামতীর গান, ১২২ পৃঃ)। ডাঃ শহীদুল্লাহ অনুমান করেন কাছাড় জেলাই কদলী-রাজ্য (Leschan tes mystiques, p 27*)। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বলেন, এরাজ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোথাও হইবে বলিয়া অনুমিত হয় (Social Life in Ancient India, Pp. 59-60)। বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রীয়ার্সন বলেন, ডেরাদুন হইতে আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম এবং ইহার উত্তরে হিমালয়প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তই কদলীবন (প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৮—অধ্যাপক অমূল্যবিদ্যাভূষণের নাথপন্থ প্রবন্ধ)। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আচার্য বলেন—"মৎস্যেন্দ্র নাথ যোগমার্গ ভ্রষ্ট হইয়া নারীরাজ্যের অধীশ্বরী রাণী প্রমীলার প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন" (মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ, ১৩২৯)। একটী নারীরাজ্য তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশ-বর্তী একটি জনপদ। গরবাল ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া যে পাঁচটী গিরিপথ ভোটরাজ্যা-ভিমুখে গিয়াছে নারীরাজ্য তাহার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে এখানে পূর্বে নারীরাই রাজত্ব করিত (বিশ্বকোষ—১০ম ভাগ, ৫৫ পৃঃ, নারী শব্দ)। আসাম পূর্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ অনেক যুক্তি-প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছেন যে আসাম উপত্যকার নওগাঁ জেলার কদলীই উক্ত কদলীরাজ্য (সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭)। গুরুমুখী পাঞ্জাবী ভাষার 'গোরক্ষ অবদেশে' আছে গোরক্ষ নাথ কামাখ্যা গিয়া অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র-গীতে আছে কদলীবন কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। কদলী-প্রেমে আবদ্ধ মীন নাথকে (মৎস্যেন্দ্রনাথ) উদ্ধার করার জন্য গোরক্ষ নাথ তথায় গিয়াছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে কদলীরাজ্যের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক পণ্ডিতদের কথিত কদলীরাজ্যগুলির একটি তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশে আর অন্যান্যগুলি ভারতে অবস্থিত। নেপালরাজ স্বীয় দেশের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ৫২২ খৃঃ অব্দে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া মীন নাথকে নেপালে নিয়াছিলেন এবং মীন নাথ তথায় গিয়া এসব নিবারণ করিয়াছিলেন। যদি ইতঃপূর্বে ভারতীয় কোনও নারীরাজ্যে বা কদলীরাজ্যে মীন নাথ যোগভ্রষ্ট হইতেন তবে কি যোগভ্রষ্ট মীন নাথ নেপালে গিয়া প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর করিতে পারিতেন? গ্রীয়ার্সন তাঁহার বক্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন তাঁহার কথিত কদলীরাজ্যে সিদ্ধা ব্যতীত অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। তাহা হইলে সে বনের সকলেই সিদ্ধা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ষোল শত সিদ্ধা নারী, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কামজাল বিস্তার করিয়া মীন নাথকে যোগভ্রষ্ট করিবেন ইহা সহজ জ্ঞানে বিশ্বাস করা যায় না। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন, নেপালীদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে মীন নাথ শেষ বয়সে নেপালে গিয়াছিলেন (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১—মীন নাথ ও কানুপা)। আরও দেখা যায়—

"তোমার গুরু মিন্নাথ আছে কোদালি সহরে।
রাত্রি দিবা থাকে নাথ নটিনির বাশোরে॥
নটি নইয়া মিন্নাথ হইয়াছে বিভোর।
দাঁড়ি চুল পাকিল অখন জাবে জম ঘর॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ)।

মীন নাথ যে, শেষ বয়সে নেপাল গিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে সিদ্ধি হারাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে

সন্দেহ করা উচিত হইবে না। এসব বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, মীন নাথ ভারতীয় কোন নারী-রাজ্য বা কদলীরাজ্যে সিদ্ধি হারান নাই। তিনি নেপালে গিয়া (নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দে) তথায় স্বীয় প্রভাব পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার পর সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দের শেষভাগে তিব্বতের নিকটবর্তী নারীরাজ্যের নারীদের প্রেমাসক্ত হইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ বলেন—"মৎস্যেন্দ্র নাথ ভোগবিলাসে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য গোরক্ষ নাথের আদেশে নেপালাধিপতিকে আজ এক একটী ব্রাহ্মণকন্যা মৎস্যেন্দ্র নাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে হয়। ঐ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সমস্ত বিবাহিতা কন্যা মঠে সতীরূপে থাকিয়া সেবাকার্যে জীবনাতিপাত করে। ইহারা নাথিনী" (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৮ নাথপন্থ)। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ নেপালে গিয়াছিলেন। গোরক্ষ নাথ মীন নাথকে নারীরাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি নেপাল যাওয়ার পূর্বে যদি মীন নাথ ভারতীয় নারীরাজ্য বা কদলীরাজ্যে সিদ্ধি হারাইতেন তাহা হইলে যোগভ্রষ্ট নারীপ্রেমে উন্মত্ত মীন নাথকে নেপালরাজ স্বীয় দেশে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া নিতেন না। আর যদি গোরক্ষ নাথ তিব্বতের নারীরাজ্য বা কদলীরাজ্য হইতে মীন নাথকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় ভারতে আসিতেন তাহা হইলে নাথ-সাহিত্যের প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। এসব বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় নেপাল বা তিব্বতের কোথাও মীন নাথ দেহ রক্ষা করেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী (কাহারও কাহারও মতে লালদাস বাবাজী) হিন্দী ভাষার ভক্তমাল গ্রন্থ ও তাহার টীকার আভাস অবলম্বনে বাঙ্গালা 'ভক্তমাল গ্রন্থ' সম্পাদন করেন। ইহাতেও মীন নাথের রাজত্ব লাভের বিবরণ আছে। তাহাতে দেখা যায় মীন নাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষ নাথ ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও অবৈষ্ণব রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজার "দাম্ভিক বিষয়ী মত্ত হিংসাব্যবহার" দেখিয়া মীন নাথের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি এখানে থাকিয়া রাজাকে সৎপথে আনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গোরক্ষ নাথ এই অবৈষ্ণব রাজার রাজ্যে থাকিতে চাহিলেন না। মীন নাথ—

"রাজার সহিত রাজ বিষয়ী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তারে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা।
ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেলা॥
* * * *
কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্তি হইল।
মীন নাথ রাজ সিংহাসনেতে বসিল।
রাজ্য মত্ত হৈলা এক পুত্র জনমিল॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

মীন নাথ কোন রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিলেন উক্ত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। স্বীয় গুরু মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ আবার এখানে আসিলেন। গোরক্ষ নাথের উপদেশে মীন নাথের সুমতি জন্মিল। তিনি—

"আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুখেতে আনল জ্বালি দিনু॥
ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

"গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ।"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

গোরক্ষ নাথের প্রস্তাবে মীন নাথ সম্মত হইলেন এবং গোরক্ষ নাথের আপত্তি সত্ত্বেও কিছু ধনরত্ন সঙ্গে লইলেন। অনাবশ্যক বোধে গোরক্ষ নাথ

পথিমধ্যে গুরুর অজ্ঞাতসারে এ সব ধন ফেলিতে ফেলিতে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ মীন নাথ—

"হারে গোর্খা কি করিলে এহেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

তখন—

"গোর্খনাথ কহে প্রভু এ কোন পদার্থ।
আমি বুঝি এতো মাত্র কেবল অনর্থ॥
অতি তুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব করিতে।
ইহা হইতে উত্তম নিকশে কত মতে॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

তদুত্তরে ক্রোধান্বিত স্বরে—

"মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)।

এসব বাগাড়ম্বর নহে—

"গোর্খনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥
মণি মুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক দিল॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

এসব দেখিয়া মীন নাথ নিজের শোচনীয় অধঃপাতের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়া—

"আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবত কার্য্য যে কৈলি॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়ের বিবরণে আছে মহামায়াকে দেখিয়া মীন নাথের মনে কুভাবের উদয় হওয়ায় দেবী শাপ দিলেন—

"এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোলশত নারী লয়ে তুমি কর কেলী।
কদলীর রাজা হইয়া ঝাটে যাও চলি।"

(গোরক্ষ বিজয়)

দেবীর শাপে মীন নাথ কদলীতে গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার করা, কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সিদ্ধি হারাইলেন। জপতপ দূরে গেল, মীন নাথ ভোগ-সুখে মাতিয়া উঠিলেন। মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ সে রাজ্যে গেলেন। সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। গোরক্ষ নাথ নর্তকীর বেশে তথায় গিয়া—

"নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটীতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরীর রোলে।
কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলী হেন বোলে॥
হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চারে॥"

(গোরক্ষ বিজয়)

মীন নাথ নাচ-গানে একেবারে মোহিত হইলেন কিন্তু—

"মাদলের তাল শুনে ভোলে মীন রায়ে।
মাদলের রায়ে কেনে গুরু মোরে কহে॥
নাটকরে নাটুয়া তাল বহে ছলে।
তোহ্মার মর্দিলে কোন গুরু গুরু বোলে॥
এক শিষ্য আছে মোর যতি গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই॥
দুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভাল।
তুহ্মি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে॥"

(গোরক্ষ বিজয়)

গুরু গোরক্ষ নাথ কদলীপ্রেমাসক্ত মীন নাথকে উদ্ধার করিয়া কদলীরাজ্য ত্যাগ কালে শাপ দিলেন—

"সুখে খাও সুখে বর্ছ সুখে জাও সঙ্গ।
গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ॥

বিক্ষে'র ফল মূল বসি কর পান।
এহি শাপ দিলো তোরে করি সমাধান ॥
এ বলিয়া জতি নাথ হাতে দিল তুড়ি।
বাদুড় হইয়া সব কদলী গেল উড়ি ॥"

(গোরক্ষবিজয়, ১৯৭ পৃঃ)

আসামের পূর্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথের মতে নওগাঁ জেলার কন্দলীই উক্ত কদলীরাজ্য। তিনি বলেন, কন্দলী চা বাগানের তিন মাইল ঈশান কোণে পাহাড়ের উপর বাদুলী কুরুং নামে একটি গুহা আছে। এই গুহায় এখনও লক্ষ লক্ষ বাদুড়ের বাস। মানুষের আগমনের শব্দ পাইলে ইহারা এত হৈ চৈ আরম্ভ করে যে মনে হয় ভূমিকম্পে পাহাড় কম্পিত হইতেছে। স্থানীয় লোকেরা বাদুড়গুলিকে কমলা মঙ্গলার আশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করে (কদলীরাজ্য, ৩৬পৃঃ)। সায়ণাচার্যকৃত শঙ্করবিজয়ম্ গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করাচার্য (৮ম খৃঃ অব্দ) কোনও মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ কালে তাঁহার শিষ্য সনন্দন তাঁহাকে একটী প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছিলেন—

পূর্বকালে মৎস্যেন্দ্র নাথ নামক এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গোরক্ষকে আজ্ঞা করিয়া কোন এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ঐ যোগিবর রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল হইতে লাগিল। সুবিজ্ঞ সচিবমণ্ডলী নৃপশরীরে কোনও এক স্বর্গীয় পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বশীভূত করার নিমিত্ত নৃপতির কমললোচনা কামিনীদিগকে আদেশ করেন। যে কামিনীদিগকে আদেশ করা হয় তাঁহাদিগের সুললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদিতে সংলগ্নচিত্ত থাকিয়া ঐ মুনিবর সমাধি বিস্মরণ পূর্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মত অবস্থা সকল প্রকাশ করিলেন।

"মীন নাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ নাম।
দোঁহেই সাধন সিদ্ধি দোঁহেই নিষ্কাম ॥"

(শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ)

রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটি একটি করিয়া জয় করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্য ও প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাঁহার চরিত্র কতবার কষিত হইল, কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল তাহা খাঁটি সোনা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন ছার! অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন; মীন নাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষ নাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চশির হেঁট হইল। গোরক্ষ নাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলীপত্তনে তাঁহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 'কায়াসাধ' উপদেশ বারংবার মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলীপত্তনের রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন—

"হে গুরু গোরক্ষ নাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপসজীবনে
মহাজ্ঞান হতে তাই ঢের বড়। বিরূপা শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।

*　　*　　*　　*

মনে জাগে সেই চিত্র, যত্ন ভরে ধরি দুটী হাতে
পঙ্কিল পল্বল হতে উদ্ধারিছ গুরু মীন নাথে।
গুরু হতে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার মনে,
জগতের জ্ঞানালোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তনে,

শিষ্য পরম্পরা ক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়,
শিষ্য ধারা মগ্ন প্রায় ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হয়ে গুরু যদি ব্রত ভঙ্গে সুখশয্যা গত,
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত অসমাপ্ত ব্রত।"

(ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৫০)

মহাদেব এক বরকামা তপস্বিনী কন্যাকে গোরক্ষ নাথ তোমার স্বামী হউক এই বর দিয়াছিলেন। শিবের আজ্ঞায় গোরক্ষ নাথ ঐ কন্যার স্বামিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমজালে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে শিশু হইয়া গোরক্ষ নাথ ঐ কন্যার কোলে অবস্থান করিতেছিলেন—

"স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে।
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায়ে॥"

(মীন চেতন, ৮পৃঃ)

মানুষে প্রেম

শ্রীমতী স্বামিশিষ্যা দেবী, বি-এস্‌সি

জানিনাকো কোন মূর্তির পূজা
জানিনাকো দেবালয়,
রুদ্ধ দুয়ারে চক্ষু মুদিয়া
মোর আরাধনা নয়।

মোর যে দেবতা নহে সে পাষাণ
রহে না সে ভাবস্বর্গে,
রক্ত মাংসে লভিয়া জীবন
মূর্ত দেহের দুর্গে।

আমার দেবতা মানুষেরা ওই
আঁধারে অপথে অন্ধ,
উচ্চ মহৎ প্রকাশ-দুয়ার
চারিদিকে যার বন্ধ।

যেই মানুষেরা পথে পথে নীচ
অতি হীন হ'য়ে রয়,
লাঞ্ছিত আর দলিত যাহারা
পশুর উচ্চ নয়,—

আলোবঞ্চিত ভীত ওই যারা
ধনীর পীড়নে কাঁপে,
শিক্ষাবিহীন ভুলের আঁধারে
নীচে নামে ধাপে ধাপে।—

আত্মার মান লভেনি যাহারা
রোগে দুর্ভোগে দুখে,
সমাজের হাতে পদে পদে যারা
পেয়েছে বেদনা বুকে,—

সেই সব দীন মানুষেরা যত
হৃদি-মন্দিরে মম
প্রিয় প্রিয়তম, কেড়ে নিল প্রেম
গরীয় দেবতা সম।

উহারা আমার দেবের দেবতা
ঘৃণিত ও অভাজন
ওদের বক্ষে বক্ষ মিশায়ে
মোর পূজা আরাধন।

বিগ্রহ নহে নিকট আমার
ওরাই পরম দেবতা,
ছদ্মবেশে যে আসি ভগবান
মাগেন সেবা ও মমতা।

আমি বুঝি শুধু ভালোবাসা প্রেম
দেয় যাহা মানুষেরে
ইহাই পরম চরম ধর্ম
মোদের ধরণী পরে।

সাধক বিপ্রনারায়ণ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় তামিলরা শ্রম-শিল্পনিপুণ এক সুসভ্য জাতি। খৃষ্টপূর্ব শতকের প্রথমে তাঁহারা ধর্ম স্থাপত্য ভাস্কর্য ললিতকলা এবং বাণিজ্য বিষয়ে উন্নত ছিলেন। মিশর ইতালী চীন প্রভৃতি বহির্জগতের সহিত তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন। দেখা যায় এই সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম পাশাপাশি ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চক অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই উভয় ধর্মমত তামিল জাতির মধ্যে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় শৈব এবং বৈষ্ণবধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ অনুমানের প্রতিক্রিয়া-রূপে পুনরায় হিন্দুধর্মের জাগরণ দেখা দেয়। হিন্দু-ভারতে অপূর্ব কারুকার্যখচিত মঠ মন্দির প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে থাকে। গুপ্তরাজগণের সময় অধিকাংশ মহাকাব্য এবং পুরাণের সংস্করণ হয়। বৈদিক চিন্তাধারা—যোগ সাংখ্য মীমাংসা প্রভৃতির মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে থাকে। অষ্টম শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময় 'পূর্ব-মীমাংসা'র টীকাকার ভট্টপাদ কুমারিল এবং পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র বিরাজ করেন। তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিতে থাকেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি নড়িয়া উঠে। অবশেষে বেদান্তকেশরী আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের উপর যবনিকাপাত ঘটে। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্মেতিহাসে দুইটী সম্প্রদায় দেখা যায়—একটি আলোয়ার এবং অপরটি আচার্য। আলোয়ার অথবা মিষ্টিক বৈষ্ণবগণ পল্লব এবং চোলরাজগণের প্রাধান্য এবং শক্তিলাভের পূর্বে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে তিরুমঙ্গই আলোয়ার পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গম্ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথ (বিষ্ণু) প্রতিষ্ঠিত। পল্লবরাজত্বের অবসানে খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে দাক্ষিণাত্যে চোল-রাজগণের প্রভাব প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম চোলরাজগণ শৈব ছিলেন। সুতরাং আলোয়ার-গণের উপর অত্যাচার ও অবিচারের অভিযান সুরু হয়। কিন্তু পরবর্তী চোলরাজগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য মন্দির রাজা রাজেন্দ্র চোলের কীর্তি। পয়গাই মাধুর কবি, কুলশেখর আন্দল, বিপ্রনারায়ণ, তিরুমঙ্গই প্রমুখ দ্বাদশজন আলোয়ারের নাম তামিল গুরুপরম্পরায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোয়ারগণের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা মুশকিল। সাধারণতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইঁহারা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব-দর্শন প্রচার করেন। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থানুসারে মহাবিষ্ণু উক্ত দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূর্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই আলোয়ারগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রত্যেকে অগণন নরনারী কর্তৃক সমভাবে পূজিত। সাধারণতঃ তামিল আলোয়ারগণ নির্জনে ভগবানের ধ্যান এবং উপাসনা করিয়া দিন কাটাইতেন। কিন্তু আচার্যগণ বৈষ্ণব ধর্ম সর্বসাধারণ্যে প্রচার করা জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নেতার আসনে বসাইয়া

ধর্মগ্রহণেচ্ছু নরনারীকে দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতেন। দীক্ষিত ব্যক্তি শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যিনি দীক্ষা ও শিক্ষা দিতেন তিনি গুরু এবং আচার্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। 'দিব্যপ্রবন্ধম্' নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ এই সমস্ত সাধকদের শ্রীমুখ নিঃসৃত মধুর বাণীতে পরিপূর্ণ। চারি সহস্র ভক্তি রসাত্মক থেবারম্ (তামিল স্তব) ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই সমস্ত থেবারম্ গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক অব্যক্ত মোহন ভাবের অনুভূতি আনিয়া দেয়। এই ধর্মাচার্যগণের জীবনীর মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের শুভাশীষ অগণন নরনারীর উপর বর্ষিত হইয়া তাহাদের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিতেছে। এই সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"These Incarnations are always conscious of their own divinity ; they know it from their birth. They are like the actors whose play is over, but who, after their work is done, return to please others. These great ones are untouched by aught of earth, they assume our form and our limitations for a time in order to teach us, but in reality they are never limited ; they are ever free."—Inspired Talks.

আলোয়ার বিপ্রনারায়ণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুল্লম্ পুতনকুদি নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বেদবিশারদ উচ্চ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। বিপ্রনারায়ণের বাল্যজীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যথাসময়ে তিনি সমস্ত বেদে বিশেষ পারদর্শী হন। তিনি আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়া স্বীয় উপাস্য দেবতা অচ্যুতের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। 'প্রবন্ধম্' নামক বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে দুইটী পদ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। কয়েকটি শ্লোকে ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহাতে তাঁহার জীবনীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—

'আমার নিজস্ব কোন বাসস্থান নাই ; আমার কোন আত্মীয় স্বজন বলিতে এ সংসারে কেহ নাই। হে পরমপিতা, তোমার চরণ সেবা করাই আমার একমাত্র সম্বল! তোমার করুণা-কণা লাভের জন্য আকুতি জানাইতেছি। হে কৃষ্ণ, হে নয়নাভিরাম, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! আমি কাঁদিয়া তোমাকে আমার হৃদয় বেদনা জানাইতেছি ; বিপদে আমাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই। হে শ্রীরঙ্গমের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা, তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার আর কেহ নাই।'

ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ তীর্থভ্রমণ এবং মঠ, মন্দিরাদি পরিদর্শন করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিপ্রনারায়ণ পরিব্রাজকবেশে বাহির হন। আচার্য রামানুজের ধর্মপ্রচার এবং সাধনক্ষেত্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গমে তিনি উপনীত হইলেন। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথ অধিষ্ঠিত। বিগ্রহের অপূর্ব সুষমামণ্ডিত শ্রী এবং মন্দিরের পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য তাঁহাকে মোহিত করিল। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের নাম জপ করিয়া তথায় বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি সেখানে একটি মনোরম উদ্যান নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিনি আরাধ্য দেবতার স্মরণ-মনন করিতেন এবং উদ্যান হইতে পুষ্প তুলসীপত্র ইত্যাদি চয়ন করিয়া মন্দিরে দিয়া

আসিতেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে দিনপাত করিতে লাগিলেন। পার্থিব সমস্ত কিছু তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

সচরাচর মহাপুরুষদের সাধন-ভজনপথে নানা প্রলোভন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবদেবী নামক রাজনর্তকীর মোহজালে তিনি পতিত হইলেন। এই সময় চোলরাজবংশের রাজত্বকাল। দেবদেবীর করুণাকণা লাভের জন্য মহারাজাধিরাজ হইতে সাম্রাজ্যের অধিবাসী লালায়িত! এই দেবদেবী একদিন রাজদরবার হইতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে বিপ্রনারায়ণের উদ্যান-বাটিকার সৌন্দর্যে মোহিত হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, সাধু বিপ্রনারায়ণ গুন গুন স্বরে ভগবানের নাম এবং তুলসীমূলে বারি সিঞ্চন করিতেছেন। দেবদেবীর উপস্থিতি তিনি মোটেই লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার এই নির্লিপ্ত ভাব নর্তকীকুলেশ্বরী দেবদেবীর প্রাণে আঘাত করিল। রূপজীবিনী চিরকাল পুরুষকে তাঁহার রূপের অনলে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের মধ্যেও কেহ যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে তাহা তাঁহার স্বপ্নের অতীত। বিপ্রনারায়ণের ব্যবহার নর্তকীকে উত্তেজিত ও ক্রোধক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি প্রতিহিংসা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজনর্তকী চিরকাল মহার্ঘ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বাহ্য সৌন্দর্যে, ভোগৈশ্বর্যে বীতরাগ সাধকের চিত্ত জয় করা সহজসাধ্য নহে। তাই তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। সন্ন্যাসিনীর বেশে রাজনর্তকী বিপ্রনারায়ণের সকাশে উপনীত হইলেন। বিপ্রনারায়ণ উদ্যানের কার্যে এরূপ নিবিষ্ট ছিলেন যে, প্রথমতঃ সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলেন না। দিবসের কার্যশেষে তিনি সৌন্দর্যময়ী সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেবদেবী অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নিবেদন করিলেন—

'প্রভো, আমি বারবনিতা; কিন্তু আজ আমি আমার পাপের জন্য অনুতপ্তা। আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটু আশ্রয় দিন। উদ্যানের কার্যে আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করিব এবং শ্রীরঙ্গনাথের সেবা-পূজার ফুল তুলসী ইত্যাদি চয়ন করিয়া দিব। আপনার প্রসাদ খাইয়া দিন কাটাইব এবং গাছতলায় শয়ন করিব। ইহাতে হয় তো বা আমার পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।'

বিপ্রনারায়ণ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কারণ তিনি নর্তকীর চাতুর্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। উদ্যান-বাটিকার কিছুদূরে তিনি সন্ন্যাসিনীর বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। দেবদেবীর সাহচর্যে উদ্যান-শ্রী শতগুণে বর্ধিত হইল। প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করিয়া দেবদেবী স্বহস্তে মনোরম মালা শ্রীরঙ্গনাথের জন্য তৈরী করিয়া দিতেন। তাঁহার কার্যে এবং অমায়িকতায় বিপ্রনারায়ণ অতীব প্রীতি লাভ করিলেন।

ছয়মাস পরে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রবল বারিপাত হইতেছে। চারিদিকে শুধু বৃষ্টিপাতের এবং বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাইতেছে। দেবদেবী একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন। বিপ্রনারায়ণ নিজের পর্ণকুটীর হইতে তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। সেই উদ্যানে অতিরিক্ত বাসগৃহ না থাকায় তিনি দেবদেবীকে স্বীয় পর্ণ-কুটীরে আশ্রয় নিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া দেহের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে। তিনি স্বীয় একখানা শুষ্ক গেরুয়া দেবদেবীকে পরিধান করিতে দিলেন।

কিছুকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে বলিলেন, 'প্রভো, আপনার পদসেবা করিবার একটু অধিকার দিয়া আমার জন্ম সার্থক করিবেন কি? সারাদিনের পরিশ্রমে আপনি ক্লান্ত; তার উপর দুর্যোগের আবহাওয়ার মধ্যে আপনাকে বড়ই ম্রিয়মাণ দেখাইতেছে।'

দেবদেবীর একান্ত অনুরোধ এবং সেবা করিবার ব্যাকুলতা দেখিয়া বিপ্রনারায়ণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যেমন চিন্তামণির নশ্বর সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হন, বিপ্রনারায়ণ তেমনি দেবদেবীর মধ্যে আপন সত্তা হারাইলেন—স্বীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীরঙ্গনাথকে বিস্মৃত হইলেন। একমাত্র দেবদেবীর নাম তাঁহার জপমালা হইল। তিনি যথাসর্বস্ব নর্তকীর চরণে বিকাইয়া দিয়া সর্বস্বান্ত হইলেন। কিন্তু ভগবান কি তাঁহার ভক্তকে এমনিভাবে পরম সত্য-ভ্রষ্ট হইতে দিতে পারেন! জীবনের শ্রেয়কে লাভ দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, তাহাকে লাভ করিতে হয় দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। তাই তো কবিরা বলিয়াছেন—দুর্গং পথস্তৎ। বিপ্রনারায়ণ রাজনর্তকীকে ভালবাসিয়াছিলেন ভালবাসার জন্যই। কোন প্রকার স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া নহে। কিন্তু নর্তকী তো তাঁহাকে সত্য সত্যই হৃদয় দান করেন নাই। বিপ্রনারায়ণের সর্বনাশ সাধন করাই তাঁহার কামনা ছিল। বিপ্রনারায়ণ নর্তকীর সহিত দেখা করিতে গিয়া সাধ্যমত কিছু উপহার প্রতিবারেই দিতেন। রিক্তহস্তে একদিন নর্তকী-সন্দর্শনে গমন করিয়া তিনি নির্মমভাবে তৎ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলা যায় না। নর্তকীর দেহ-বেদীর উপর প্রবল বাসনা-কামনার যে হোমানল জ্বলিতেছিল সাধক বিপ্রনারায়ণের মন পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীরঙ্গনাথ ভক্তের হৃদয়বেদনাভার লাঘব করিয়া তাঁহাকে অমৃতের আস্বাদলাভে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মিথ্যার যে যবনিকা তাঁহার নয়নে অপরূপ চিত্রে চিত্রিত হইয়া দেখা দিয়াছিল, শীঘ্রই সে যবনিকা অপসারিত হইতে চলিল। শ্রীরঙ্গনাথ সামান্য ভৃত্যের বেশে মন্দিরের স্বর্ণথালা নিয়া দেবদেবীকে দিলেন। উহা বিপ্রনারায়ণ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন এবং নিজেকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তথা হইতে তিনি ভক্তের নিকট গমন করিলেন। বিপ্রনারায়ণ নর্তকীর ব্যর্থ-প্রেমে উন্মত্ত অধীর হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, দেবদেবী তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিপ্রনারায়ণ তড়িৎগতিতে নর্তকীসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবদেবী তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আদর যত্ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রজনী অবসানে দেব-মন্দিরের পুরোহিতগণ স্বর্ণ-থালা যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা রাজদরবারে জানাইলেন। অনেক খোঁজের পর উহা দেবদেবীর গৃহে পাওয়া গেল। উহা বিপ্রনারায়ণ তাঁহাকে দিয়াছেন বলিয়া দেবদেবী রাজপুরুষদের নিকট প্রকাশ করিলেন। বিপ্রনারায়ণ ধৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে প্রেরিত হইলেন। দেবদেবী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বিপ্রনারায়ণ তাঁহার প্রতি আরোপিত দোষ অস্বীকার করিলেন। রহস্য সমাধানের কোনপ্রকার সূত্র না পাইয়া আপাততঃ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিতে রাজা আদেশ করিলেন। মহারাজাধিরাজ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। শ্রীরঙ্গনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া বিপ্রনারায়ণ বিশেষ পরিচিত। ভক্ত কি কখনও তাঁহার আরাধ্য দেবতার দ্রব্য অপহরণ করিতে পারেন!—রাজাধি-

রাজের বিবেক কিছুতেই সায় দিতে চাহে না। কঠোর পরীক্ষা আজ তাঁহার সম্মুখে! কথিত আছে—রাত্রিতে রাজা যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ স্বপ্নচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন—'হে রাজন্, বিপ্রনারায়ণের প্রতি তোমাদের আরোপিত দোষ সত্য নহে। আমিই স্বর্ণ-থালা দেবদেবীকে প্রদান করিয়াছিলাম। আমার ভক্তকে রমণীর মোহ হইতে রক্ষা করিবার ইহা একটি কৌশল মাত্র। বিপ্রনারায়ণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। অবিলম্বে তাহাকে মুক্তিদান কর।' অপ্রত্যাশিতভাবে এই গুরু সমস্যার সমাধানের উপায় দেখিতে পাইয়া রাজাধিরাজ পরম পুলকিত হইলেন। পরদিন তিনি বিপ্রনারায়ণকে সসম্মানে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে এই সাধকপ্রবরের প্রতি সকলের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল।

বিপ্রনারায়ণের চক্ষের উপর হইতে মোহাবরণ অপসৃত হইল। তিনি কঠোর সাধনাপথে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পরম সত্য—দিব্যদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। জীবন-যাত্রাপথে এই যে ব্যর্থতা এ সম্বন্ধে একজন মনীষী বলিয়াছেন, "The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot, by its own nature manifest itself here on earth without disaster; but in disaster it can." এই ঘটনার পর বিপ্রনারায়ণ পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ জীবনে তিনি রমণীগণের ছায়া মাড়াইবেন না—এরূপ শপথ গ্রহণ করেন। পুনরায় তিনি পুষ্পোদ্যানের কার্যে এবং শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নিজেকে শুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ সাধুগণের পাদোদক ভক্তিভরে পান করিতেন। তদবধি বিপ্রনারায়ণ নিজেকে 'ভক্ত-পদরেণু' বলিয়া পরিচয় দিতেন। যে সমস্ত পরিব্রাজক শ্রীরঙ্গমে আগমন করিতেন, তাঁহাদের সেবা-যত্নের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি সর্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণ এবং জপ করিতেন; প্রত্যুষে মন্দিরে গিয়া প্রতিদিন শ্রীরঙ্গনাথের উদ্দেশ্যে প্রভাতী গান গাহিতেন। তিনি একমাত্র শ্রীরঙ্গনাথকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে ভগবানের পবিত্রনাম প্রতিদিন উচ্চারণ করিলে নরকের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। বিপ্রনারায়ণ বলেন, 'শ্রেষ্ঠত্বের নির্ধারণ জন্মের দ্বারা নহে, কর্মের দ্বারা।' বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ 'দিব্য-প্রবন্ধম্'-এ তাঁহার রচিত ভক্তিরসাত্মক দুইটি থেবারম্ (তামিল স্তব) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম 'থেবারম্'টি 'তিরুমালাই' নামে অভিহিত এবং ইহাতে পঁয়তাল্লিশটি পদ্য স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়টি 'তিরুপল্লি-এজুছুচি' (Tirupalli-ezhuchi) নামে অভিহিত এবং ইহাতে অপরূপ দশটি পদ্য রহিয়াছে। ভগবানের নিদ্রা হইতে জাগরণের স্তব দ্বিতীয় থেবারমের প্রতিপাদ্য বিষয়। আজও বৈষ্ণবগণ কর্তৃক এই থেবারম্‌টি বিগ্রহ পূজার সময় ভক্তিভরে নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সংস্পর্শে বার-বিলাসিনী চিন্তামণি বৃন্দাবনধামের গোপীগণোচিত মধুরিমা এবং ভগবানের কৃপালাভে ধন্য হন। মদগর্বে স্ফীত হইয়া রূপ-জীবিনী নর্তকী সত্যের পূজাকে অবহেলা করেন সত্য; কিন্তু তাঁহার লালসা-কামনার পরশ জ্বালা ধ্বংসের যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল পরিণামে তাহা পরম-সত্যের কল্যাণময় পথ নির্দেশ করিয়া দিল। অসত্যের রূপরস পান করিয়াই সত্যের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় লাভ ঘটে। দেবদেবীর চির তৃষিত অন্তরে যে হোমানল জ্বলিতেছিল তাহা বিপ্র-নারায়ণের কামনাহুতি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ হইল। অবশিষ্ট যাহা রহিল সেই তো দেব-দেবীর প্রকৃত রূপ! রাজ-নর্তকীর অন্তরে স্বর্গীয়

প্রেমের পূত-মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সকল পঙ্কিল আবিলতা ধৌত করিয়া আবার তাঁহাকে নবরূপে সৃজন করিল! চিরবিলাসিনী নর্তকী পরমপুরুষের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া—তাঁহার পদে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া—'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি' লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। দেবদেবী আপনার সমুদয় বিত্ত শ্রীরঙ্গনাথকে দান করিয়া দিয়া নিজে সামান্য পরিচারিকার ন্যায় দেবতার সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

বিপ্রনারায়ণ একশত পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন—এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত। জগতের রূপরসের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পরমপিতার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

স্বামীজীর জীবনালোকে গান্ধীজীর কর্ম্মযোগ

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এস্‌সি

বর্ত্তমানে ভারত জাতীয় জীবনের এক মহাযুগ-সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। রাষ্ট্রবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এক ভীষণ সঙ্কটের ভিতর দিয়া আমাদিগকে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইতেছে। আশার কথা এই যে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দ্দেশিত পথটি জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীজীর মনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া জাতীয় জীবনে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়া চলিয়াছে। মহামানবের ইঙ্গিত মহামানবই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ, রাজনৈতিক দলাদলি এবং সামাজিক দুর্নীতি-প্রসূত যে সকল হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ হানাহানি চলিয়াছে তাহা দ্বারা সাধারণ সমাজ-জীবন আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজী প্রার্থনা-সভার ভিতর দিয়া বহু নির্দ্দেশ জাতির সম্মুখে দিয়া আসিতেছেন। আমরা লক্ষ্য করিতেছি আত্মদ্রষ্টা ঋষি বিবেকানন্দজীর বাণীই তিনি জাতির নিকট প্রচার করিয়া প্রাণপাত করিতেছেন। কিন্তু বহুবৎসরের পরাধীনতাবশতঃ অধঃপতিত জাতির কর্ণকুহরে যেন সেই অমোঘ বাণী প্রবেশ করিয়াও করিতেছে না। মহাত্মাজীর নির্দ্দেশমত ভারতীয় নেতৃবর্গও জাতিকে তাহার সনাতন আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহাসঙ্কটের পথে অতি সাবধানে পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বহুবৎসর পর্যন্ত বৈদেশিক শোষণের ফলে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জাতির মনে যে রাজনৈতিক চেতনার উদয় হইয়াছে উহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য মতবাদের একটা ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য মনোবৃত্তিসুলভ বহু রাজনৈতিক মতবাদ আমাদের যুবকগণের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কারণ বিদেশী ছাঁচে ঢালাই আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষিত যুবকগণের মনে ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান বড় একটা দেয় না। পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ জাতির দৃষ্টি প্রসারিত করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, "যে নদীটা ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে ত ইদিক উদিক ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। * * * যদি দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত

নয়।" আবার বলিয়াছেন, "দেশে দেশে আগে যাও এবং অন্য দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখ্‌তে পাবে যে জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্ ধক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম।"

আবার পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "পার্লামেণ্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটী সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা! শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে? ধর্ম্মবীর। তাঁহারা আমাদের সমাজকে চালান, তাঁহারাই সমাজের রীতিনীতি বদলাবার দরকার হইলে বদলাইয়া দেন। আমরা চুপ্ করিয়া শুনি, আর করি। তাই আমরা দেখিতে পাই মহাত্মা গান্ধীর মত সত্যান্বেষী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে এই মহাভারতের সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করিয়া বিরাট জনসমাজের মনের উপর নেতৃত্ব করা। জওহরলালজীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সেই দিন নোয়াখালী হইতে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার পথে বলিয়াছিলেন, "এই মহাপুরুষের নিকট পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকিলেও ছয় মাসের কর্ম্মশক্তি অর্জ্জন করা যায়, তাই সেখানে গিয়াছিলাম।" এই উক্তির পিছনে একটা সত্য-উপলব্ধি নিশ্চয়ই আছে। ইহাই ভারতের শক্তি, ভারতের এই আত্মিক শক্তিই পৃথিবী জয় করিবে। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর অপরাপর জাতি সকলকে নূতন পথের সন্ধান দেখাইয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তাহার গতিশক্তির দ্বারা দেশ ও কালকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নৈকট্য ঘটাইয়া উভয়ের কল্যাণ সাধনের পথ সুগম করিয়াছে। পাশ্চাত্যের এই শ্রেষ্ঠ অবদান অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বিশ্বজাতি গঠন বিষয়ে দান করিবার মত কোন মৌলিক উপাদান তাহার ভাণ্ডারে নাই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী বার্নার্ড শ বলিয়াছেন, "There are no democracies in the west, they are all rank plutocracies, all of them now fascist to the finger tips." ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক H. G. Wells তাঁহার The New World Order গ্রন্থে বলিয়াছেন, "Our present electoral methods are a mere caricature of representative Government. It has produced upon both sides of the Atlantic, big stupid and corrupt party machines." এই সকল মনীষিবৃন্দ সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তাঁহাদের রাষ্ট্র ও সমাজের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন বটে কিন্তু সকল জটিলতার কোন চরম সমাধানের পথ দেখাইতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

পাশ্চাত্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও হাবুডুবু খাইতেছে সেই সকল উপায়কে আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে নূতনভাবে পরীক্ষা করিবার বিপদ স্কন্ধে নেওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি? ভোগবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের এই মত যে অর্থনৈতিক অবস্থায়ই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অতএব উহা লাভ করিবার

অনুকূলেই সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করিতে হইবে। ধনতন্ত্রের দ্বারা নিষ্পেষিত ইউরোপের নির্য্যাতিত জাতিসকলের প্রতি মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া মহাপ্রাণ কার্ল মার্কস্ তাঁর "দি ক্যাপিট্যাল" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন, নির্য্যাতিত রুশ জাতিই সর্বপ্রথম সেই নূতন সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তন করিয়া অতি অল্প কালের ভিতর একটা বিরাট উন্নতি সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। এই ঘটনা অপরাপর নিপীড়িত জাতি সকলের প্রাণেও একটা উজ্জ্বল আশার সঞ্চার করিয়াছিল বটে, কিন্তু যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি রাশিয়ার বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখিয়াছেন তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে রাশিয়াকে আর জগতের আশা-ভরসার স্থল কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। ভারতে আমরা এখনও অহরহ এই চিত্র দেখিতে পাই যে অতি সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনে তৃপ্ত হইয়া, পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কত লোক মনের আনন্দে জীবন যাপন করিতেছে। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে ঝল-সান মন লইয়া আমরা সেই আনন্দের উৎস খুঁজিয়া পাই না। তাই কেন্দ্রচ্যুতপ্রায় জাতিকে দৃঢ়ভাবে নিজ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী যে নূতন সমাজতন্ত্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে গান্ধীজির এই নবপরিকল্পনার পার্থক্য সম্পূর্ণ মৌলিক, যদিও ইহা ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন নয়—প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এইরূপই ছিল। শোষক-শোষিতের সম্পর্ককে বিলোপ করিয়া দীর্ঘ কালের জন্য, মানুষের সমাজে আর্থিক দুর্গতিকে রোধ করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত নীতিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা কার্ল মার্কসও স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র এই সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়াই ভারতকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহার মেশনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ ও গান্ধীবাদ নামে গান্ধীজী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে নূতন রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছেন, উহাদের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে নিম্নে অতি সাধারণ ভাবে আলোচনা করা গেল :

পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ

১। ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধির আয়ত্তাধীন প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপকেই পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। বস্তুতন্ত্রই সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি।

৩। ভোগের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ।

৪। জটিলতাময় জীবন যাপন, সঙ্গে সঙ্গে নীতিবিরোধী চিন্তায় আত্মবলিদান।

৫। বৃহৎ যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদনের ফলে বেকার-সমস্যা।

৬। ভরণ-পোষণের ভার রাষ্ট্র বহন করিলেও বৃহৎ যন্ত্রাদি পরিচালনায় কর্ম্মসঙ্কোচের ফলে অত্যধিক উদ্বৃত্ত সময় সাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটাইতে বাধ্য। বিশেষ করিয়া জীবনের অতি সীমাবদ্ধ আদর্শের মধ্যে মনের উদ্বৃত্ত সময় লইয়া হাঁপাইয়া উঠিবারই কথা।

৭। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শক্তিদ্বারা জনগণের শ্রম শোষণ।

৮। সমস্ত উৎপাদন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া সমবণ্টন নীতির প্রবর্ত্তন করিলেও ভোগাদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রনায়কদের মনে যে কোন সময় স্বার্থান্ধতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

৯। রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকার দরুন সমস্ত দেশ ঐ কেন্দ্রীভূত শক্তির নিকট পরাধীন।

১০। বহিঃশত্রুর আক্রমণে কেন্দ্রীয় শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের পরাজয় স্বীকার।

১১। রাজনৈতিক শক্তির নিকট অর্থনৈতিক শক্তির আত্মসমর্পণ।

১২। মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা কেন্দ্রে রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ-সাধন।

১৩। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে মানুষ তার কোমলবৃত্তি বিকাশের সহায়ক গার্হস্থ্য জীবনবিবর্জ্জিত হইয়া সেখানে একটা কুরুচিসম্পন্ন ভোগসর্ব্বস্ব আবহাওয়ায় মনকে কলুষিত করিয়া জীবনের উদ্দেশ্যচিন্তা-বিবর্জ্জিত হইয়া মূলতঃ পশুজীবনের পরিণতি প্রাপ্ত হইতে বাধ্য।

১৪। প্রতিযোগিতার সুযোগ রহিয়াছে, ফলে শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

১৫। আইনের বলে দেশকে সুপরিচালিত করিবার প্রয়াস আছে সুতরাং বিক্ষোভের ও আভ্যন্তরিক অশান্তির কারণ থাকিবে।

১৬। অর্থনৈতিক সাম্যবাদে বিশ্বাস।

১৭। সমস্ত কর্ম্মই ভোগকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত বলিয়া শত অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের পর্দ্দা টানিলেও ভোগের টানাটানিতে অসামঞ্জস্য থাকিয়াই যাইবে।

১৮। ভোগবাদ, স্বার্থপরতা, পররাষ্ট্রভীতি এবং সহিংস নীতির দ্বারা পরিচালিত বলিয়া বিশ্বশান্তি স্থাপন-বিমুখতা।

গান্ধীবাদ

১। ভগবানরূপ অনন্ত চৈতন্য শক্তিই পথ-প্রদর্শক।

২। আত্মিক শক্তিই গান্ধীবাদের ভিত্তি।

৩। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করা গান্ধীবাদের আদর্শ।

৪। সরল জীবন যাপন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে বিচরণ করা।

৫। হস্তপরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা কুটীর-শিল্পের প্রচলন দ্বারা বেকারসমস্যার সমাধান।

৬। যথোপযুক্ত দৈহিক শ্রমে ক্লান্ত মন প্রতিক্রিয়াবিহীন অধ্যাত্ম আনন্দ রস পানেই সদা উদ্‌গ্রীব থাকিতে বাধ্য।

৭। অপরের শ্রমকে শোষণ না করিয়া নিজের শ্রমের উপরই নির্ভরশীল হইতে হইবে।

৮। উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। প্রত্যেকটী গ্রাম উৎপাদনের দ্বারা স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকিবে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি গ্রামের এই অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতাকে সাহায্য ও রক্ষা করিবে মাত্র।

৯। রাজনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রত্যেকটী গ্রাম্য পঞ্চায়েত এক একটী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হইয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থাপন।

১০। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইলে প্রত্যেকটী স্বাধীন কেন্দ্র হইতে যে বিপুল বাধা পড়িবে সমগ্র ভাবে তাহার পরিমাণ এত বেশী হইবে যে বহিঃ-শত্রুর পরাভব স্বীকার না করিয়া আর উপায় থাকিবে না।

১১। রাজনৈতিক শক্তির নিকট হইতে অর্থ-নৈতিক শক্তির মুক্তি।

১২। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশের সাধারণ লোকের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালন। ইহাই ব্যক্তিস্বাধীনতা-পরিচালিত প্রকৃত গণতন্ত্র।

১৩। সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত কুটির শিল্প ও কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত জনগণের গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর আবহাওয়ায় সংযত জীবন যাপনের ভিতর দিয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার সমস্ত সুযোগ রহিয়াছে।

১৪। প্রতিযোগিতার সুযোগ নাই, সুতরাং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রাম ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা নাই।

১৫। আদর্শ শিক্ষার বলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসম্ভব সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হইবে।

১৬। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতির অসাম্যই জড় জগতের সৃষ্টির কারণ। সুতরাং জড় জগতের সাম্যবাদ অর্থহীন। একমাত্র খাঁটী সন্ন্যাসী যিনি নিজ আত্মার সঙ্গে বিশ্বের সকল আত্মার অভিন্নরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম তিনিই কেবল সাম্যবাদী হইতে পারেন।

১৭। সমস্ত কর্ম্মই অজ্ঞেয় অনন্ত শক্তিস্বরূপ ভগবানে সমর্পণ করাই উদ্দেশ্য। অতএব ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেকটি কর্ম্মই মহাযজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সংযতরূপ নিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

১৮। ত্যাগবাদ, নিঃস্বার্থপরতা, পররাষ্ট্র-নির্ভীকতা এবং অহিংসনীতির সাহায্যে বিশ্বশান্তি স্থাপন করিয়া মানব ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার আশা পোষণ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ দারিদ্র্য ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" স্বামীজীর প্রত্যেকটি কথা বিশেষ অর্থপূর্ণ। তিনি বেদমন্ত্রের আকারে যে বাণী আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহাই মনোজগতের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বলিষ্ঠ মনকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই দেখি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভার ভিতর দিয়া যে সুর গাহিয়া গিয়াছেন, ঋষি অরবিন্দ তাঁহার যোগসাধনার ভিতর দিয়া যে অনাগত পুরুষের স্বপ্ন দেখিতেছেন, এবং মহাত্মা গান্ধী দরিদ্র ভারতের দারিদ্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের তথা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সমস্ত কিছুর পিছনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকের প্রভাবই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় যে একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্য্যন্ত আমরাই অর্থাৎ ভারতীয়েরাই পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি।" বিবেকানন্দজীর রাজযোগ পাঠ করিয়া ঋষি টলষ্টয় লিখিয়াছিলেন, "So far humanity has frequently gone backwards from the true and lofty and clear conception of the principle of life, but never surpassed it." ফ্রান্সের মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন: "টলষ্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল বিরুকফ ও আরো অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন।" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন রোলাঁকে, "ভারতকে যদি চিনিতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানিতে চেষ্টা কর।" মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ইউরোপীয় জাতি সকলকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকের আদর্শ তাহাদের নিকট স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; সময়ে উপকার হইবে এই আশা তিনি অন্তরে পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রবিঘোষিত বাণীতে যে নূতন ভারত ও নূতন জগতের ছবি দেখিতে পাইয়াছেন ভারতীয় যুবকগণের দৃষ্টি অতি সত্বর সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কারণ তাঁহাদেরই নূতন ভারত গড়িয়া তুলিয়া জগতে শান্তির বাণী প্রচার করিতে হইবে। ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের নির্দ্দেশিত কাজ আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত। সুতরাং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। যে জনস্রোত আজ আসুরিক বৃত্তিদ্বারা তাড়িত হইয়া অতি জঘন্য, কুৎসিত হানাহানির সুর তুলিয়া অতি বিভীষিকাময় অন্ধকারের মরণদ্বারে চলিয়াছে, ইহার ভিতর হইতেই একদল সেই অতিমানবের ডাকে সাড়া দিয়া পরম বিক্রমে জাতিকে মরণের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া এক গৌরবোজ্জ্বল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এই আশা আমরা পোষণ করি।

সমালোচনা

Duduma—By Sri L. N. Sahu, M.A., M.L.A., Published by Servants of India Society, Cuttack. Price as.12. Pages 37.

আলোচ্য পুস্তিকাতে লেখক ডুডুমা জলপ্রপাত হইতে সঞ্জাত বৈদ্যুতিক শক্তিকে উড়িষ্যা সরকার ও মান্দ্রাজ সরকারের মধ্যে কিরূপ অন্যায়ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। এই বণ্টনব্যবস্থার পশ্চাতে রহিয়াছে উভয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিপত্র। লেখকের মতে এই চুক্তিপত্রে উড়িষ্যার জনমতের কোন অনুমোদন নাই। ডুডুমা জলপ্রপাতের নিকট উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশের সীমা নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহার সমগ্র বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে উড়িষ্যাপ্রদেশ আজ বঞ্চিত। ডুডুমা সর্বতোভাবে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই সীমা নির্দেশের জন্য যে কমিশন গঠিত হয় তাহার সুপারিশ ভারত-সরকার সর্বাংশে মানিয়া নিয়াছেন। ফলে প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যাস্থিত ডুডুমা আজ উড়িষ্যা-মান্দ্রাজের সীমারূপে সরকারীভাবে গৃহীত। উড়িষ্যা অপেক্ষাকৃত নূতন প্রদেশ; বর্তমানে ইহার কৃতী সন্তানগণ প্রদেশটিকে শিক্ষায় দীক্ষায় শিল্পে বাণিজ্যে উন্নীত করিতে বদ্ধপরিকর। জাতীয় পুনর্গঠন কার্যে বৈদ্যুতিক শক্তি অপরিহার্য। সুতরাং ডুডুমা-সঞ্জাত আপনাদের প্রাপ্য বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইয়া উড়িষ্যাবাসীরা অত্যন্ত মর্মাহত। লেখক মনে করেন মান্দ্রাজ সরকার ও অন্যান্য রাজকর্মচারী দ্বারাই এই অন্যায় ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে।

বিষয়টি বিতর্কমূলক; লেখক স্বয়ং উড়িষ্যাবাসী। সুতরাং তিনি কতটুকু অপক্ষপাত বিচার করিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। অবশ্য লেখক যে উড়িষ্যার একজন যথার্থ কল্যাণকামী তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

Brahmananda Keshab Chandra Sen—By P. N. Roy, Shanti Ashram; Buxi Bazar, Cuttack. Pages 9. Price not mentioned.

আলোচ্য পুস্তিকার লেখক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাই বর্তমান পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা আলোচিত হইয়াছে। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার উদার ধর্মপ্রাণতার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এসব বিষয় লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

বিশ্ব-সমস্যা ও নিম্বার্ক বেদান্ত—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার প্রণীত। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। ৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

বিশ্ব-সমস্যা ও নিম্বার্ক বেদান্ত পড়িয়া পূর্বে যাহা কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল তাহা সহজ হইয়া গেল। ভারতবর্ষ আজ যুগান্তরের তোরণদ্বারে উপস্থিত। তাহার জাতিগঠনের সাধনা সিদ্ধির পথে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। আজ যখন নানাপ্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঘাতে সেই সাধনা বিঘ্নবহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখনই প্রয়োজন জাতির আত্মাকে নির্মলবুদ্ধির শুভ্র আলোকে ভালো করিয়া জানা। বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণীর মধ্যে জাতির অমর আত্মার পরিচয় এবং এই বাণীর মর্ম হইল ঐক্য। একই ব্রহ্ম চরাচর সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, একই সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য-সাগরে জগতের সব-কিছুই তরঙ্গের মত দুলিতেছে। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার বেদান্তের খনি হইতে অনেক মূল্যবান শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই ঐক্যের

প্রয়োজনীয়তাই আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করাইয়াছেন। এই ঐক্যের আদর্শ জাতির হৃদয়ে যত বদ্ধমূল হইবে জাতিগঠনের সাধনা সিদ্ধির পথে তত বেশী আগাইয়া যাইবে। জাতি মৃত্তিকায় নহে, পর্ব্বতে, অরণ্যে নদনদীতেও নহে, উহার প্রাণ সহস্র সহস্র দেশবাসীর আদর্শগত ঐক্যের জীবন্ত অনুভূতিতে। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

শক্তিবীণা—শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সন্তোষকুটীর, উত্তর আমতলী (ঢাকা)। ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ||৵০ আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে উদার ধর্মভাব-মূলক কতকগুলি কবিতা আছে। কবিতা-সমূহের ছন্দ ও যতি স্থানে স্থানে ঠিক না থাকিলেও লেখিকার ভাব প্রশংসনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা—বম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী গত ২৬শে বৈশাখ সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-প্রাঙ্গণে "বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্থান কোথায়?" বিষয়ে প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমক্ষে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গত ২৭শে বৈশাখ নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী গ্রামে শ্রীশ্রীলোকনাথ আশ্রম-প্রাঙ্গণে "বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব উপলব্ধি", পরদিন আড়াই হাজার গ্রামে "আমাদের জন্মগত ধর্ম" ও আড়াই হাজার স্কুলে "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য", ২৯শে বৈশাখ পাঁচদোনা হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ", ৩০শে বৈশাখ ভাটপাড়া স্কুল-প্রাঙ্গণে "সনাতন ধর্মের মূল নীতি", পরদিন সুলতানসাহাদি গ্রামে "সনাতন ধর্মে স্ত্রীজাতির অধিকার" এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ পানাম গ্রামে "শ্রীরামকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন?" শীর্ষক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

মায়াবতী (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রম—আমরা এই আশ্রমের ১৯৩৯-১৯৪৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী এবং এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত দাতব্য হাসপাতালের ১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই আশ্রমটি হিমালয়ের এক নির্জন স্থানে অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত। ব্যক্তিগত সাধন-ভজন, সাধনার্থিগণকে শিক্ষাদান এবং বেদান্ত প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজী ভারতবর্ষ ও সিংহলের অনেক স্থানে এবং স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দজী, স্বামী বামদেবানন্দজী, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে নানা ভাবে প্রচার-কার্য পরিচালন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রচার-বিভাগ (৪ নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা) হইতে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরেজী মাসিক পত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।

মায়াবতী আশ্রমের চতুর্দিকস্থ দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য একটি দাতব্য হাসপাতাল ও ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। ৫০।৬০ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতেও অনেক দুঃস্থ ব্যক্তি চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে ইনডোর বিভাগে ৩৪৮ জন রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ৩০৭ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ২৩ জন প্রাথমিক চিকিৎসার পর চলিয়া গিয়াছেন, ৯ জন চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং

৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আউট ডোর বিভাগে মোট ৭৮৪৭ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৬৮০২ জন নূতন ও অবশিষ্ট পুরাতন রোগী ছিলেন। আলোচ্য বৎসরে দাতব্য হাসপাতালের ইনডোর ও আউট ডোর বিভাগের মোট আয় ২৫,৭০৪৷৷/৫ পাই (গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত) এবং মোট ব্যয় ১৩,৭৮০৷৬ পাই।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে ১১ই বৈশাখ হইতে পাঁচদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন বৈদিকমন্ত্র পাঠ, কথামৃত পাঠ ও সঙ্গীতাদি এবং দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও অপরাহ্ণে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। তৃতীয় দিন প্রাতে কীর্তনসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে এবং মধ্যাহ্নে বার শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন অপরাহ্ণে মহকুমা-হাকিম শ্রীযুক্ত যশোদাকান্ত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ সেন "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দ "গীতার শিক্ষা ও শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরে তিনি আরও দুইটী বক্তৃতা দান করেন। গত ১৫ই বৈশাখ কাঁথির সন্নিকটবর্তী লাউদা গ্রামে কাঁথি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত একটি ধর্মসভার অধিবেশনে কাঁথি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী ও স্বামী অজয়ানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষ দিন "কর্ণ" নাটিকা অভিনীত হইলে উৎসব-কার্য সমাপ্ত হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ছয় দিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও দ্বিতীয় দিন নগর-কীর্তন হয়। তৃতীয় দিন পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও ভোগাদি হইলে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আহূত এক সভায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নাগ, এম্‌-এ, বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আশ্রম পরিচালিত অবৈতনিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরে আশ্রমের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন অধিকারী গত বৎসরের কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ধর্মানন্দজী ও স্বামী সুন্দরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৪ঠা হইতে ৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত তিন দিন অপরাহ্ণে যথাক্রমে শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভা এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, বি-এ, বি-টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুইটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে কতিপয় ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র মহোদয় এবং উক্ত স্বামীজীদ্বয় বক্তৃতা করেন।

বিবিধ সংবাদ

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—গত ২৭শে বৈশাখ এই সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ছয় শতাধিক ভক্ত নরনারী ও দরিদ্র-নারায়ণ পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে কাটিহার আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভবানন্দজীর পৌরোহিত্যে সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে বাৎসরিক অধিবেশন হয়। আশ্রমের কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী বাণী ও বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি মহারাজের অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ

যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৯শে ও ২০শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি এবং বৈকালে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিমল কান্ত সর্বজ্ঞ, এম্-এ, বি-টি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরদিন প্রাতে একটি শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে চারি হাজার নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সৈয়দপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২০শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ হইলে অপরাহ্ণে এক জনসভায় স্বামী গদাধরানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী বশিষ্ঠানন্দজী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বাড়ীখাল (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই আশ্রমে স্বামী সত্যকামানন্দজীর নেতৃত্বে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিকশততম জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন রাত্রে এক সভায় উক্ত স্বামীজী ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে সাধু মহেন্দ্রচন্দ্র ধুপীর পরিচালনায় ভজন-কীর্তন হয়। পরদিন প্রাতে কীর্তন ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে এক শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। পরে বিশেষ পূজাদি হইলে সহস্রাধিক ভক্তগণের নিকট সত্যকামানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং প্রায় দেড় সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সকালে উপস্থিত ভক্তগণের নিকট স্বামীজী চণ্ডী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বৈকালে শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এস্‌সি মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক জনসভা আহূত হয়। ইহাতে আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে আশ্রম-পরিচালিত স্থার জে সি বসু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করে। পরে রায় সাহেব দেবেন্দ্র চন্দ্র দে, মৌঃ মহম্মদ ঢালী ও স্বামী সত্যকামানন্দজী বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত আরও তিন দিন স্বামীজী চারিটি স্থানে চারিটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

আদরা (মানভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি—গত ৬ই বৈশাখ এই সমিতির উদ্যোগে ও স্বামী রাঘবানন্দজীর পরিচালনায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঁকুড়া ও দেওঘর হইতে কতিপয় সাধু ও ভক্ত যোগদান করেন। পূর্বাহ্ণে পূজাদি হইলে প্রায় এক হাজার দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন এবং একশত দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট সভায় স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দজী, পূর্ণাত্মানন্দজী, ত্র্যম্বকানন্দজী ও পুরুলিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের এক এক দিক আলোচনা করিয়া মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিলাসীপাড়া (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি—গত ২০শে বৈশাখ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে পূজাদি হইলে মধ্যাহ্নে প্রায় এক হাজার নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। অপরাহ্ণে জনসভার অধিবেশন হয় এবং সায়াহ্নে ধুবড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী নির্বাণচৈতন্যজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করেন।

ভ্রম-সংশোধন—উদ্বোধনের গত সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লিখিত "তাও" স্থলে "তাও-ধর্মপ্রবর্তক লাওৎসে" হইবে।

বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়*

সম্পাদক

বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই একবাক্যে ভক্তিযোগে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাসনার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভক্তি পঞ্চমপুরুষার্থ। এই মহাপুরুষগণের দার্শনিক বিচারে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের প্রবর্তিত ভক্তিমূলক উপাসনা-পদ্ধতি প্রায় একইপ্রকার। বিশেষ এই যে, কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ বাৎসল্য এবং কেহ মধুর-ভাবে ভগবানের উপাসনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আচার্য মধ্ব-প্রচারিত দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতবাদ স্বতন্ত্রসত্তাবাদ সদ্বৈষ্ণববাদ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন নামে অভিহিত এবং তাঁহার স্থাপিত সম্প্রদায় ব্রহ্মসম্প্রদায় চতুর্মুখসম্প্রদায় বা মাধ্ব-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মধ্ব দ্বৈতবাদের প্রথম প্রচারক না হইলেও এই মতবাদ তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীচৈতন্য বল্লভ নিম্বার্ক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের উপর এই আচার্যের মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মধ্বাচার্য জগতের মূলসত্তাকে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্বতন্ত্র-সত্তা এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, সকল বিষয়ে পূর্ণ, অপরিবর্তনীয়, স্বয়ম্ভু ও নিত্য। তিনি বিষ্ণুরূপে উপাসিত। আর অস্বতন্ত্র-সত্তাটি দেব ঋষি নর প্রমুখ জীব ও ভৌতিক পদার্থ। তাঁহারা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহেন, পরন্তু সত্য। চেতন ও অচেতন সর্ববিধ অস্বতন্ত্র-সংজ্ঞিত জীব ও পদার্থ মাত্রই সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র বিষ্ণুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অস্বতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বতন্ত্র-তত্ত্ব কি প্রকারে সর্বব্যাপী হইতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মধ্ব বলেন, স্বতন্ত্র বিষ্ণু অস্বতন্ত্র জীব ও পদার্থসমূহের কারণ হইয়াও দেশ-কাল-পাত্রাতীত। এ জন্য তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ। কিন্তু কারণ-বস্তু দেশ-কালাতীত হইলে তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হয় তাহা বুঝা কঠিন।

মধ্বাচার্যের মতে এই দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অনিত্য হইলেও সত্য। ইহা ভ্রমকল্পিত বা মিথ্যা নয়। কারণ, সত্যসংকল্প ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। মায়াধীশ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জীব অল্পশক্তিমান অল্পজ্ঞ ও জন্মমৃত্যুপাশাবদ্ধ এবং সর্বপ্রকারে তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন। কিন্তু সৃষ্ট বস্তু কি ভাবে নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে তাহা বুঝা শক্ত। সত্য বস্তুই নিত্য হয়, অনিত্য বস্তু সত্য কিরূপে হয় তাহাও বুঝা কঠিন। যাহা হ'ক, মধ্ব-সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রভু, জীব তাঁহার

* লেখকের "যোগচতুষ্টয়" নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে।

দাস। তাঁহার মতে জগতে পঞ্চবিধ ভেদ বিদ্যমান যথা: (১) ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ, (২) ঈশ্বরে ও জড়বস্তুতে ভেদ, (৩) জীবে জীবে ভেদ, (৪) জীব ও জড়বস্তুতে বা চেতন ও অচেতনে ভেদ, (৫) এক জড়বস্তু হইতে অপর জড়বস্তু এবং ইহাদের বিভাগ-সমূহে ভেদ। তিনি বলেন, এই পঞ্চবিধ ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ইহাদের অভেদ বা একত্ব সম্ভব নয়।

মধ্বের মতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সান্নিধ্যে নিত্যকাল বাস অথবা বিষ্ণুর সালোক্যলাভই মুক্তি। তিনি দাস্যভক্তিযোগে শ্রীবিষ্ণুর পূজা বন্দনা সেবা অংকন (তিলক ধারণ) শ্রবণ মনন নাম-জপ স্বাধ্যায় ধ্যান ও ভজনাদিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের ব্যাখ্যাত দার্শনিক মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক হইলেও প্রবর্তক নহেন। কারণ, মহাভারত ব্রহ্মসূত্র বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে এই মতবাদ দৃষ্ট হয়। রামানুজের মতে চিৎ—জীব, অচিৎ—দৃশ্যমান জড়জগৎ, ঈশ্বর—পরমাত্মা এই তিনই অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান স্বপ্রকাশ বিশ্বপতি পুরুষোত্তম বাসুদেবের রূপ। বাসুদেবই বেদান্তবেদ্য পরমব্রহ্ম। তিনি নিজেই নিজের সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ। নিজরূপে নিমিত্তকারণ ও অংশরূপে উপাদানকারণ। জীব ও জগৎ তাঁহার শরীর; এ জন্য তিনি জীবজগৎবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের সহিত তাঁহার ভেদ অভেদ ভেদাভেদ এই তিন সম্বন্ধই বিদ্যমান।

রামানুজ-সিদ্ধান্তে পরমব্রহ্ম বহুকল্যাণগুণযুক্ত। এই গুণরূপ বিশেষণগুলি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়; গুণ ও গুণী যেমন অভেদ তদ্রূপ। সগুণ ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। তিনি বলেন, নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের অর্থ—ব্রহ্ম হইতে সকল গুণ বা বিশেষণ নির্গত হইয়াছে। কিন্তু গুণ বা বিশেষণ ভেদে ব্রহ্মের ভেদ হয় না। তাঁহার স্বরূপ সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয়। তিনি অনন্ত শক্তির আধার, তাঁহার শক্তির ক্ষয় বা বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই হয় না। রামানুজের মতে ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ স্বীকার না করিলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়, ফলে বেদ ধর্ম-কর্ম ভাল-মন্দ সকলই মিথ্যা হয়। জড়েরও পৃথক সত্তা নাই। জড়ত্ব ব্রহ্মের একটি বিশেষণ। ভোগ্য ভোক্তা ও পরিচালক রূপে সর্বান্তর আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান। জড় বা অচিৎ—ভোগ্য বস্তু, চিৎজীব—ভোক্তা এবং ঈশ্বর—সকলের নিয়ন্তা বা পরিচালক। তিনি জগৎকর্তা অন্তর্যামী জ্ঞানময় ও ঐশ্বর্যযুক্ত

রামানুজের সিদ্ধান্তে জীব অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ। ভক্তবৎসল ঈশ্বর কৃপাবশে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তকে দর্শন দান করিলে তাঁহার অবিদ্যা নষ্ট হয় এবং তিনি মুক্ত হন। তাঁহার মতে ভক্তিই মুক্তির উপায় এবং প্রকৃত ভক্তিই প্রকৃত জ্ঞান। অভিগমন (গুরু-সান্নিধ্য) উপাদান (সাধন-উপকরণ) ইজ্যা (যজ্ঞাদি) স্বাধ্যায় ও যোগ এই পঞ্চবিধ উপাসনা এবং বিষয়-বাসনা ত্যাগ, আহার-বিহারে সংযম, নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যদ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে এই ভক্তি বা জ্ঞানলাভ হয়।

বৈষ্ণবাচার্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ নামক দার্শনিক মতের প্রচারক এবং তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় বা নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তিনি জগৎকারণ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ ভাবই শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া জীব ও জগতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধও স্বতঃ প্রতিপাদিত। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি গুণী এবং জগৎ গুণাত্মক। গুণী

হইতে গুণ পৃথক নয় এবং এইজন্য তিনি সগুণ। ব্রহ্মের শক্তি তাঁহার অঙ্গীভূত এবং সৃষ্টির পূর্বে ও পরে তাঁহার সত্তায় বিদ্যমান। আবার তিনি সকল গুণের অতীতও বটেন এবং এইজন্য তিনি নির্গুণ। এই দুইটি কারণে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ উভয় সম্বন্ধই সত্য।

নিম্বার্ক-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম সর্বরূপী হইয়াও সর্বরূপাতীত। তিনি সর্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ এবং জীব অল্প শক্তিমান অপূর্ণ ও তাঁহার অংশ। জীব মুক্তি লাভ করিলেও ব্রহ্মের অংশই থাকেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জগৎ মায়িক বা মিথ্যা নয়। জগৎ ও আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করাই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। নিম্বার্ক বলে[illegible] ভক্তিই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট [illegible] এই সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে উপাসিত এবং তাঁহার কৃপালাভই মুক্তি। ধ্যান জপ ধ্রুবাস্মৃতি [illegible]ধ্যায় ভজন প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে পরাভ[illegible] উদয় হয়। এই ভক্তিই জ্ঞান। এই পরাভক্তি বা পরজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত দার্শনিক মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই তাঁহার মতবাদের সর্বোত্তম গ্রন্থজ্ঞানে অপর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত 'ষট্সন্দর্ভে' অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদমতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্য বলদেবের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বলদেব-ভাষ্য বা গোবিন্দ-ভাষ্য নামে পরিচিত।

শ্রীবলদেবও শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীচৈতন্য অনুমোদিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অদ্বিতীয় তত্ত্ব পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই মুক্তি লাভের উপায়। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মই বেদ-প্রতিপাদ্য কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে নির্গুণ শব্দের অর্থ—গুণাতীত, গুণবর্জিত নয়। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়াও সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, আবার তিনি সকলের অন্তর্নিহিত সত্তাও বটেন। তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ এবং সকল মাঙ্গলিক গুণযুক্ত।

গোবিন্দ-ভাষ্যে ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম এই পাঁচটি তত্ত্ব স্বীকৃত। ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) প্রথম তত্ত্ব, তিনি অসীম সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ এবং জীব নামক দ্বিতীয় তত্ত্বটি সসীম অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিবিশিষ্ট; উভয়ে[illegible] শাশ্বত ও [illegible]ব। ঈশ্বরের আশ্রয়ে জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম এই তত্ত্বচতুষ্টয় সক্রিয় [illegible] হইতেছে। [illegible] জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইঁহার অন্তর্নিহিত [illegible] ইঁহাকে পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা হয়।

শ্রীবলদেব-সিদ্ধান্তে জগৎ ও জীব সত্য। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা-বিলাস। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ নিত্য। কারণ, জীব ক্ষুদ্র এবং ঈশ্বর বৃহৎ। তবে জীব ঈশ্বরের চৈতন্যাংশ বলিয়া ভক্তগণ উভয়ের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ কল্পনা করেন। জীব ও ঈশ্বরে চৈতন্যাংশে সমতা থাকিলেও জীবগণের কর্মফল-বিষয়ে আসক্তি এবং সাধনাদির তারতম্যের জন্য তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ঈশ্বর অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার বহু রূপ ও ভাব আছে। তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তের প্রতি কৃপাবশে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন।

শ্রীবলদেব-মতে অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরাভক্তিই মোক্ষের হেতু। শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভই মোক্ষ। তাঁহার নাম ও গুণ শ্রবণ মনন কীর্তন অর্চনা বন্দনা পাদসেবা গুরুসেবা সাধুসঙ্গ জপ ধ্যান স্বাধ্যায় তীর্থ-

বাস প্রভৃতি এই পরজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভের উপায়।

বৈষ্ণবাচার্য বিষ্ণুস্বামী বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের প্রবর্তক এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপরম্পরাক্রমে আচার্য বল্লভ শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রবর্তন করিয়া বল্লভ-সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

তাঁহার সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও বিশেষ, নিরাকার ও সাকার এবং সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। তিনি বলেন, মায়াধীশ ব্রহ্ম স্বজাতি-বিজাতি-স্বগত-ভেদশূন্য এবং দেশ-কাল-বস্তু-স্বরূপ-ভেদ-বর্জিত। তাঁহার মতে জগৎ সত্য। জীব অণুতুল্য চিৎ পরিচ্ছিন্ন ও আনন্দ-স্বরূপ। অজ্ঞানজন্য জীব তাঁহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসার-মোহে নিপতিত। দ্বৈতবাদী বল্লভ জীবাত্মা ও পরমাত্মার শুদ্ধস্বরূপ স্বীকার করেন।

বল্লভাচার্যের সিদ্ধান্তে গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। তিনি বলেন, গোপীদের ন্যায় ভক্তি-রসে সিক্ত হইয়া ফলরূপা ও সাধনরূপা সেবা-সহায়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভই মোক্ষ। এই সম্প্রদায়ে বাৎসল্যরসে বালগোপালের পূজা ও উপাসনা প্রচলিত। বল্লভের মতে কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদনই প্রকৃত ভক্তি।

সকল ধর্মমতের সমন্বয়

সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষানুভূতি ও উপদেশে সকল বৈষ্ণব শৈব শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম-মতের সমন্বয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তিনি কার্যতঃ সাধনাদ্বারা সকল ধর্মে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত বাক্যে সকল ধর্মের সমন্বয় অভূতপূর্ব রূপে সংসাধিত :

"তিনি (ঈশ্বর) এক, কেবল নামেনামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'গড'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম', কেউ কালী; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"[১]

"তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন, এও সত্য; নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার, নিরাকার দুইই বলছে,—সগুণও বলছে, নির্গুণও বলছে।"[২]

"আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে।"[৩]

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী—যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি,—সেই ইট, চুন, সুরকিতে সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।"[৪]

"সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়, রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া ও মার কাছে সর্ব্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন, তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে ও উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধনা করা হইয়াছিল।"[৫]

"অদ্বৈত ভাব শেষ কথা রে, শেষ কথা; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"[৬]

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, প্রথম ভাগ, ৪৯ পৃঃ

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ২৩ পৃঃ

৩ " " ২২ পৃঃ

৪ " তৃতীয় ভাগ, ১১ পৃঃ

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ সাধক ভাব, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭২।২৭৩ পৃঃ

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ " ২৯৮ পৃঃ

শিক্ষকের অন্নসমস্যা ও শিক্ষাসঙ্কট*

অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এম-এ, পিএইচ-ডি

বন্ধুগণ,

অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে আপনাদের পাদবন্দনা করবার গৌরবোজ্জ্বল অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, শুধু কতগুলো মনগড়া কথার মালা গাঁথবার জন্যে নয়। বাক্যের দ্বারা আপনাদের অন্তর জয় করবার দুরাশা রাখি না। আর সে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা, কারণ বাক্যের প্রভাব ক্ষণিক, অন্তরের প্রভাব শাশ্বত ও অমোঘ।

মান-অভিমানের ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে বুঝতে সুরু করেছি যে ছোট বড়র পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষের ভিতর কত বড় হতে পারা যায় তার চেষ্টা না করে কত ছোট হতে পারা যায় তার চেষ্টা করাতেই ব্যক্তির ও সমাজের অশেষ কল্যাণ। তাই সম্মেলনের শুভানুষ্ঠানে সুধীবৃন্দের সেবায় স্বাভাবিক অহমিকাকে বলি দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জেলা শিক্ষক-সম্মেলনে শিক্ষক-জীবনের নিদারুণ সমস্যা ও শিক্ষাসঙ্কট সম্বন্ধে একেবারে কিছু না বল্লে হয়ত অভ্যর্থনাই অর্দ্ধসমাপ্ত থেকে যাবে। সত্যই অবস্থাভেদে অভ্যর্থনাও রূপ বদলায়। নিমন্ত্রণের বাড়ীতে অশেষ মৌখিক সৌজন্য সত্ত্বেও যদি পাতা ফেলার সুযোগ না ঘটে, তবে সে অভ্যর্থনায় যেন অনেকেরই মন ভিজতে চায় না, মনে হয় যেন তাতে একটা বিশেষ কিছু বাদ পড়ে গেছে। অনেকটা সেইরকমই শিক্ষক-সম্মেলনে শিক্ষকবৃন্দের অভাব, অভিযোগ, বা শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে কিছু না বলে আন্তরিক অভিনন্দনেই অভ্যর্থনার পালা শেষ করে দিলে অভ্যর্থনাও যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বস্তুতঃ স্থান-কাল-পাত্রভেদে অভ্যর্থনার পদ্ধতি না জানার দরুনই শরশয্যায় শয়ান কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে উপাধান, দ্বারা অভ্যর্থনা করতে গিয়ে দুর্য্যোধন হয়েছিলেন তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত আর অবস্থাতত্ত্ববিৎ ধনঞ্জয় বাণের দ্বারা তাঁর মস্তক বিদ্ধ করে পেয়েছিলেন সফল অভ্যর্থনার পুরস্কার। সুতরাং অবস্থা বিবেচনায় অভ্যর্থনার আচমন ও স্বস্তিবাচন সংক্ষেপে সেরে মূল পূজায় প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা সমস্ত জেলার শিক্ষকরা যে আজ এখানে সমবেত হয়েছি সেটা অবসর-বিনোদন কিংবা কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে নয় অথবা শুধু জ্ঞানময় কোষের বৃদ্ধির জন্যেও নয়—যে অন্নময় কোষের সঙ্গে জ্ঞানময় কোষ অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত তারই পরিতৃপ্তির ব্যবস্থার জন্য। শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা সজাগ হতে চাই, স্বার্থত্যাগ ও সেবা অভ্যাসের দ্বারা আমরা শিক্ষক নামের যোগ্য হতেও ইচ্ছুক, আমাদের দোষ, আমাদের ত্রুটি, আমরা যতটা জানি অন্যে বোধ হয় ততটা জানেন না। কিন্তু তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন শিক্ষার বিনিময়ে অনেক ক্ষেত্রে তার নগণ্য অংশও আমাদের করতলগত হয় না—সুতরাং শুধু উচ্চতর আদর্শবাদের প্রচারের দ্বারা শিক্ষকসমাজের তথা

* দিনাজপুর জেলা শিক্ষক-সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

শিক্ষাসমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। যে কোন উপায়েই হোক শিক্ষকদের সহজ সরল বিলাসবিহীন জীবন-যাপনের ব্যবস্থা সমাজকে করে দিতে হবে, নতুবা শিক্ষকদের, তাঁদের দেওয়া শিক্ষার ও তার বাহক ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা বলাই বাহুল্য। 'শুধু সুরের খাদ্যে মিটে না নরের ক্ষুধা'। বলা নিষ্প্রয়োজন শিক্ষক-বর্গের ক্ষুধার্ত্ত উদরকে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশের দ্বারা জর্জ্জরিত করাই শিক্ষা-সমস্যার সমাধান নয়, সে পদ্ধতি জগতের অন্যত্র অন্যক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে। আমাদের দেশে তার প্রয়োগ ব্যর্থ-প্রয়াস মাত্র।

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিবিধানের আশানুরূপ চেষ্টা ত আমরা করিই না, তার উপর শিক্ষাদানকে আমরা একটি ব্যবসা বলে অনেক সময় উপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে মুনাফা ছাড়া ব্যবসা হয় না, কদাচিৎ লোকের চোখে ভেল্কী লাগানোর জন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর মত তার আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের ব্যবসায় শ্যাম-বাজারের মোটালাভের ব্যবস্থা নাই বা থাকুক, সাদাবাজারের তিলোত্তমান্যায়ে তিলে তিলে বৃদ্ধি থাকা চাই-ই। আর আমাদের শিক্ষাব্যবসায়ের ফল তিলে তিলে হ্রাস এবং কোনও প্রকারে পিতৃপুরুষাগত প্রাণের সংরক্ষণ অথবা অকালে অকারণে তার সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় অসহযোগ। নেহাৎ বোকা না হলে আজকাল সচরাচর কেউ আর এই দেউলিয়া হওয়ার ব্যবসায় হাত দেয় না। সত্য বটে আমাদের হতভাগ্য দেশে নির্য্যাতনের নিষ্ঠুর পদাঘাত সর্ব্বত্র। তথাপি আশা করা যায় যে শিক্ষাকে অবলম্বন করেই আমাদের ওঠার কথা তার দিকেই আমাদের নজর পড়বে আগে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজার পুকুরে দুধ ঢালার চেষ্টার ন্যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি একরকম নেই বল্লেই হয়। সুতরাং মুখ্যতঃ আত্মরক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র নির্ম্মাণের জন্যই প্রাদেশিক শিক্ষকসংঘের সৃষ্টি এবং তারই জেলা শাখার ষষ্ঠ সম্মেলনে আজ আপনারা সমবেত হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শিক্ষকের এই সংঘশক্তি প্রধানতঃ শিক্ষাসংস্কারে ও সামঞ্জস্যকর আন্দোলনে যদিও ব্যয়িত হবে তথাপি এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার সমাজ এবং শাসকবর্গ যদি পূরণ না করেন তবে তাঁদের নিজের এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য শিক্ষকবর্গ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হবেন। এই নবীন অস্ত্রের ব্যবহারের পূর্ব্বে শিক্ষকরা নিশ্চয়ই সমাজের ও শাসকবর্গের অন্তর বিগলিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। তথাগত বুদ্ধ মনুষ্যকল্যাণে সংঘশক্তির মাহাত্ম্য প্রাচীনযুগে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন আর সেই সংঘশক্তি আধুনিক যুগে জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের দৈন্যের অবসানের জন্য। শিক্ষক-সম্মেলনেরও উদ্দেশ্য শিক্ষকসংঘের শক্তির উদ্বোধনের দ্বারা শিক্ষার প্রাণ-বীজের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার উপযোগী করে তোলা ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টিতে অবস্থা বিবেচনায় সমাজকে সাহায্য বা প্রয়োজন হলে প্রতিকূল সমাজকে অনুকূল ব্যবস্থার সৃষ্টিতে বাধ্য করা।

নিশ্চয়ই এইজন্য চাই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন। ক্ষুধার লজিকের চেয়ে বড় লজিক আর কিছু নেই। সমাজের ও শাসনতন্ত্রের ভাবী রূপ নিয়ে চিন্তাশীল মনীষীদের ভিতর সূক্ষ্ম মতভেদ যতই থাক না কেন তাদের সকলের কথার ভিতর এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে নির্য্যাতিত ও অবজ্ঞাতকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াই আদর্শ সমাজের কাজ। দেশে যদি ক্ষুধার্ত্ত লোক না থাকে, অকালমৃত্যু যদি আকস্মিক ঘটনায় পরিণত হয়, মানুষের যদি আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়, স্বাধীন

চিন্তার ব্যাঘাত না ঘটে ও সর্ব্বোপরি পরস্পরের ভিতর হৃদয়ের অনাবিল যোগসূত্র থাকে তবেই বলা যায়—আমাদের সমাজ আদর্শ সমাজ। নতুবা সে সমাজ স্বাধীনই হোক আর পরাধীনই হোক, আর তার নাম যাই হোক তার দ্বারা আমাদের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে না। এই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না হলে শিক্ষার ও শিক্ষকদের সম্পূর্ণ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। তাই সেই নূতন সমাজ-ব্যবস্থার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। এই নবীন দেবতা যিনি নবীন হয়েও শাশ্বত কারণ মানবমন্ত্র দেশে কালে বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়—তাকেই বসাতে হবে আমাদের অন্তরের গভীর দেশে, দার্শনিক ভাষায় দহরাকাশে। সেই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য চাই বৃহতের স্বার্থত্যাগ ও বৈজ্ঞানিক চেষ্টার দ্বারা ধরিত্রীর কামধেনুতে পরিণতি যাতে অন্যদেশে মরুভূমি হয়েছে শস্যসমৃদ্ধ ও শীতার্ত্ত জনপদে হয়েছে চিরবসন্তের আবির্ভাব। ধন-সম্ভারের জন্য আজ আর রাজা রঘুর ন্যায় অলৌকিক শক্তি বলে কুবেরের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই, লৌকিক শক্তিতে ধরিত্রী শোষণই যথেষ্ট। জননী বসুন্ধরা আজ তার সকল সন্তানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। অতএব ডারউইনের কল্পিত আহার্য্যের জন্য অনবরত নিষ্ঠুর সংগ্রাম—যা আজও চলেছে এবং যার বিশুদ্ধ নাম সভ্যতা সেটা যে শুধু অনাধ্যাত্মিক দৃষ্টিরই ফল তা নয়, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কুসংস্কারেরও ফল।

তথাপি মনে রাখা উচিত যে এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষকদের পেটে কাপড় বেঁধে দধীচিব্রত অবলম্বন করতে বলা যায় না। শোনা যায়, ক্ষুৎপীড়িতা জননীর কাতর আবেদনে মর্ম্মাহত হয়ে বিচক্ষণ ছেলে লটারীর টিকেটে প্রচুর অর্থাগম হ'লে মায়ের অশেষ দুঃখ লাঘব করবে এই আশ্বাস দিয়ে মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিল। জানিনা পুত্রের ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল চিত্র সেই হতভাগ্য জননীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অন্নাভাবে ও সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য পাথেয়ের অভাবে আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন তাতে শুধু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া বিশেষ শক্ত, বোধ হয় সঙ্গতও নয়। নিজে শিক্ষক হয়ে বেশী বলা ভাল নয় ভেবে ইসারায় ও ইঙ্গিতে একটু বলেই নিরস্ত হলাম। নতুবা বোধ হয় কঠিন ভাষা প্রয়োগ অসমীচীন হত না।

রাজনৈতিক অনুকূল আবহাওয়া ও ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজের দোঁহাই যতই আমরা দেইনা কেন আদর্শ শিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা সামাজিক অবস্থার ও জন-মনের পরিবর্ত্তন সাধন করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ কখনও সমুজ্জ্বল হ'তে পারে না। অতএব প্রাচীনকালের দার্শনিকরা যেমন বলেছেন বীজ আগে না অঙ্কুর আগে এ নিয়ে তর্ক নিরর্থক, কারণ একদৃষ্টিতে বীজ থেকেই অঙ্কুর আর আর একদৃষ্টিতে অঙ্কুর থেকেই বীজ; ঠিক সেই ভাবেই বলা যায়, শিক্ষা এবং আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা পরস্পর নির্ভরশীল—কোনটি আগে, কোনটি পরে তা বলা যায় না। অতএব উভয়ের ব্যবস্থা আমাদের একসঙ্গে করতে হবে। সুতরাং শিক্ষকদের সাময়িক প্রয়োজনকে ভবিষ্যতের অতল-গর্ভে নিক্ষেপ করা চাতুরীর পরিচয় হতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে তা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। অতএব বর্ত্তমানের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মেনে নিয়েই এখন থেকে শিক্ষকের অবস্থার উন্নয়নের দ্বারা আদর্শ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে হবে।

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু না বলাই ভাল। বৃহদারণ্যকে আছে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর

ব্রহ্মবিত্তম হওয়ার দাবী করে সম্রাটের প্রদত্ত সহস্র গাভী শিষ্যকে নিয়ে যেতে যখন বললেন তখন পণ্ডিতরা কোলাহল সৃষ্টি করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি ব্রহ্মবিৎদের শ্রেষ্ঠ এ প্রমাণ না দিয়েই গরু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেছিলেন—

"গোকামোঽহম্"

"পণ্ডিতগণ, আমি ব্রহ্মবিৎ কিনা সেকথা পরে হবে—আমার গরুর দরকার, তাই আগে গরু নিয়ে যাচ্ছি।" আমরা শিক্ষকরা অনেকটা সেভাবে বলতে পারি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের তাগিদে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন—আগে তাই হোক তারপর আদর্শবাদের কথা হবে। পেটে খেলে পিঠে সয়। তবে আমরা শিক্ষকেরা আত্মসমর্থনের জন্য এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের এই অবস্থার জন্য সমাজই দায়ী। যে সমাজ শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে অগ্রগণ্য তার পক্ষে তার শিক্ষকদের কাছ থেকে আদর্শবাদের দাবী করা যেমন অযৌক্তিক তেমনই উপহাসাস্পদ। তবে আত্মানুসন্ধানতৎপর শিক্ষক বলতে পারেন যে সমাজের দোষ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চাইলে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করাই হবে, অতএব শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ থেকে আমাদের শিক্ষকদের জনসাধারণকে শিক্ষার মূল্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষার এই আদর্শ হবে জ্ঞান ও প্রীতি। মৈত্রী ব্যতীত মনুষ্য-সমাজ চলে না। আর মৈত্রী ব্যতীত ব্যক্তির জীবনেও শান্তি ও তৃপ্তি হয় না। তাই আমাদের দৃষ্টি যতই দূরপ্রসারী হোক না কেন সর্ব্বাবস্থায় প্রেমই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। জগতের সর্ব্ববিধ স্তরের মনীষিবৃন্দই প্রেমের ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার মাহাত্ম্য স্বীকারে একমত। অতি আধুনিক চিন্তায় প্রেমের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা থাকলেও গভীর বিশ্লেষণে তাকে প্রেমের প্রচ্ছন্ন প্রশস্তি বা ব্যাজস্তুতি বলা চলে। কিন্তু অজ্ঞলোকের প্রেম বহুদূর যায় না। টাইফয়েড রোগগ্রস্ত রোগীর প্রেমিকা জননীর সেবার ন্যায়, বিজ্ঞচিকিৎসকের সাহায্যেরও প্রয়োজন। তিনিই হবেন আদর্শ জননী যিনি তাঁর স্বভাবসুলভ প্রেমের সঙ্গে জ্ঞানের অপরিহার্য্য সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। চিকিৎসক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তাই মনে হয় কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষা হতে পারে না, জীবন-সম্বন্ধীয় যে দার্শনিক দৃষ্টি প্রেমের আকর, তাকেই স্থান দিতে হবে শিক্ষার পুরোভাগে। এই দার্শনিক দৃষ্টির অভাব হেতুই হয়েছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এই উভয়েরই অধোগতি যার বিশদ বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষাকে দর্শনবর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার আধুনিক চেষ্টা পরিত্যাগ করাই বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শিক্ষা দেওয়া হবে জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য ও তার নিজের যা বৈশিষ্ট্য তাকে বের করবার জন্য —যার নাম দিয়েছেন শিক্ষানবীশেরা—Development through self-activity. কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে তাকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন সকলের, সমস্ত মানুষের—এমন কি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করার জন্য—যার ইঙ্গিত পেয়ে ঋষি কণ্ব তাঁর সযত্নপালিতা কন্যা শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে প্রেরণের কালে তপোবন-তরুগণের অনুমতির প্রার্থী হয়েছিলেন—

"সেয়ং যাতি শকুন্তলা
পতিগৃহম্,
সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।"

আমরা আশা করি নতুন শাসনতন্ত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের পুণ্যভূমি ঋষিমুনিগণের পদরজপূতা ভারতভূমি এই নবীন শিক্ষার আদর্শপ্রবর্ত্তনে বিশ্বাসীর কাছে এক নবীন রূপ নিয়ে আবার

আবির্ভূতা হবেন সেই আশা ও বিশ্বাস নিয়েই আমরা ক্ষুৎপীড়িত শিক্ষককুল শতবৈষম্য ও আত্মকলহে জর্জ্জরিত বর্ত্তমান সমাজের নির্য্যাতন ও দৈন্যকে অবজ্ঞা করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটিও আমাদের স্মরণীয় যে শিক্ষার আসরে আজ দিনাজপুরের স্থান নেহাৎ নগণ্য হলেও প্রাচীনকালে এই দিনাজপুর শিক্ষা-সমৃদ্ধিতে মহীয়ান্ ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণায় দিনাজপুর অতীতকালে বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান ছিল এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় দিনাজপুর নতুন রূপ নিয়ে তার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করুক, অথবা অধিকতর গৌরবশালী হোক, এই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের সকলের, বিশেষতঃ শিক্ষক-বর্গের চেষ্টা যেন এই কার্য্যে বহুলভাবে ব্যয়িত হয়।

সর্ব্বশেষ এই বলে আমি বিদায় নিচ্ছি যে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দোষগুণে পূর্ব্বপক্ষ বা কুশলীর বিচারে পরিত্যক্ত হওয়ার উপযোগী সিদ্ধান্তমাত্র। আমার পরম সৌভাগ্য দোষদুষ্ট পূর্ব্বপক্ষময় এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমি আমাদের অদ্যকার সভার সুযোগ্য পুরোহিত অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পদতলে ভক্তি সহকারে সমর্পণ করতে সক্ষম হলাম। যৌবনে তাঁর পদতলে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি আর আজ আমাদের শুভানুষ্ঠানে তাঁকে পুরোহিতরূপে বরণ করে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যা, বিনয় ও শক্তিতে সমৃদ্ধ এই মনীষী পুরুষের সমাগমে আমাদের অদ্যকার আয়োজন সার্থক হবে।

মহাকবি মধুসূদন-প্রশস্তি

শ্রীচিত্ত দেব

কতটুকু জানি মোরা বিপুলা এ পৃথিবীর কথা
বিশাল মানব-মন প্রচার করে কি এ বারতা ?
মনের ফসল যত ফলায় নিঃস্বার্থ কবি মন
সত্যে স্বপ্নে মাখামাখি অপূর্ব সে আত্মদরশন।
যুগ যুগ কেটে যায় কবি রয় কাব্যে চিরঞ্জীব
অতীতের সে ফসলে বর্তমান ভবিষ্য সজীব।
মনের প্রকাশটুকু কোনোদিন হয় না মলিন
কবির কবিতা তাই বেঁচে থাকে বিশ্বে চিরদিন
মানুষ ভুলে না যদি পায় সত্য কবি-পরিচয়
কবি তাই সকলের অন্তরেতে অনুভূতিময়।
কল্পনার বিস্তারেতে বাস্তবের মাধুরী প্রকাশ
সুন্দরের আখ্যায়িকা কবিত্বের স্বচ্ছ ইতিহাস।

ভাবনায় পাই যাঁরে এক্ষণে হৃদয়তল খুঁজি'
নয়নে ও মনে তিনি মূর্তিমান—সে কবিরে পূজি।

মহানিদ্রা ভাঙিব না—শুধু তোমা করিব স্মরণ
তবু মনে পাব,বলে মহাকবি হে মধুসূদন !
বহু আগে এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগকবি বলে
লব্ধ তব সম্মানের হীরক শুভ্রতা আজো জ্বলে।
অমিত্রাক্ষর স্রষ্টা এ বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে
সম্বর্ধনা সম্ভাষণ তব তরে আজো কানে বাজে।
কাব্যের গভীর রস অতুলন ভাবের মাধুরী
শৃংখলবিমুক্ত ছন্দে হে মধু দিয়েছ মধু পুরি'।

অনূদিত 'রত্নাবলী' করে তব কৃতিত্ব প্রচার
'নীলদর্পণে'তে তব পূত হস্ত কী-যে চমৎকার!
পাশ্চাত্য ভাষার খনি খুঁড়েছিলে বিজয়ী খনক
যথার্থ কৃতার্থ তুমি প্রমাণিলে লাগালে চমক।
'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র কবি
'মেঘনাদবধে' তুমি ফুটিয়ে তুলিলে আত্মছবি।
'বীরাঙ্গনা' 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে কত কীর্তির কাহিনী
কবিত্বের সিংহাসন রক্ষিবারে সশস্ত্রবাহিনী।
সমুদ্রের পরপারে সুদূর ভার্সেল্‌জ্‌ নগরীতে
'চতুর্দশপদী' তব বেগবান চিত্তের নদীতে;
যে-জোয়ার এনে দিলে অহেতুক ভালবাসা প্রেমে
স্বদেশের তৃণপুষ্প মৃত্তিকায় এলে তুমি নেমে।
বিশাল দূরত্ব লঙ্ঘি' বঙ্গভাষা বন্দী হয়ে শেষে
পৌঁছিলে তোমার প্রিয় মাতৃভূমি দীন-বঙ্গদেশে।
কত খুশি হলে তুমি অন্তরেতে পেলে যে সন্তোষ
মানবপ্রীতির বশে কেটে গেল পূর্ব-কর্মদোষ।
ধর্মত্যাগ করেছিলে—ত্যজিতে পারনি বাঙ্গালীরে
আর বঙ্গজননীরে—তাই আজো বঙ্গভাষা ঘিরে
তোমার অমর মূর্তি মূর্ত এ সাহিত্য-সিংহাসনে
'শ্রীমধুসূদন'রূপে ভাবি—অগ্রে আছো প্রতিক্ষণে।
জন্মোৎসব হবে তব জীবনের সাধনাকে স্মরি'
যুগ যুগান্তর ধরে—অনাগত ভবিষ্যৎ ভরি'।
মানব-চিত্তের মাঝে জীবনে তোমার শিক্ষা যত
প্রজ্ঞার আলোকে হোক অন্ধকার চির অপগত।

প্রাচুর্যের মধ্যে স্বীয় দৈন্য নিয়ে হোক্ সচেতন
'স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ'—উড়ুক এ বাণীর কেতন।
ক্ষণিকের সজ্জাসুখ মোহবশে আত্মসমর্পণ
পরিণাম কিবা তার নর-চিত্তে এ-দূরদর্শন
তোমার জীবনে লভি' আত্মবশ হোক্ ভক্তদল
তোমায় পূজিতে যাঁরা এনেছে শ্রদ্ধার অশ্রুজল।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যোগ সেধেছিলে ছন্দ-প্রবর্তক
অমিত্রাক্ষরে বাঁধি—সাহিত্যের পথপ্রদর্শক!
মিলনের মন্ত্র তাই আজি তব স্মরণ সভায়
জাতিধর্মনির্বিশেষে—ভাই সবে গলায় গলায়;
বিশ্বের ভ্রাতৃত্ববোধ নব ভাবে জাগুক হৃদয়ে
এ উৎসবে মন্ত্র হোক্ 'সম্মেলন' সাহিত্য বিষয়ে।
অনন্ত মরুৎ-সনে অরূপে মানব-মনে মিশি
মৈত্রীর সাধনবাণী প্রচারো বিশ্বের দিশি দিশি।
সার্থক তবেই হবে কবি-প্রতি প্রশস্তি কবির
শ্রীমধুসূদন নাম মধুক্ষরা—রবে এই স্থির।
বারোশো তিরিশ সাল বারো মাঘ শুভ শনিবার
প্রতি যুগে প্রতিক্ষণে স্মৃতিতে জাগিবে অনিবার।

অনাগত শুভদিনে তব পুণ্য জন্মমহোৎসব
ধরণীতে খ্যাত হবে বহি' তব কাব্যের গৌরব।*

* মহাকবি মধুসূদনের জন্মোৎসব উপলক্ষে যশোহর সাহিত্য-সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় উপস্থাপিত।
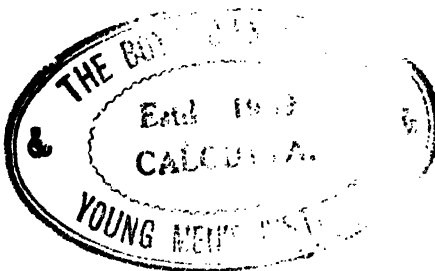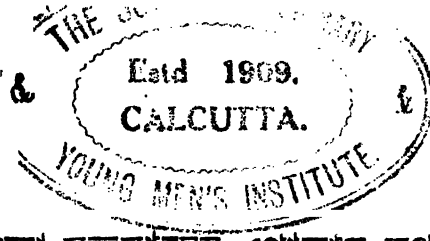
আপেক্ষিকতা মতবাদের গোড়ার কথা*

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত (রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

আপেক্ষিকতা

আপেক্ষিক মতবাদ অন্যান্য মতবাদের মত নূতন নয়। ইহাকে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলে সমস্ত তর্কমূলক ও প্রয়োগ-মূলক বিজ্ঞানের কাছেই ইহার প্রয়োজন আছে।

আপেক্ষিকতা স্বীকার করে যে বিশ্বে নিরপেক্ষ কিছুই নাই এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, তাহাই আপেক্ষিক। শক্তি, গতি, দৈর্ঘ্য, স্থান ও কাল—স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের কাহারও কোন মূল্য নাই। অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের সাধারণ ধারণাতে নিরপেক্ষতা বুঝা যায় না; কারণ আমাদের ধারণাগুলি সীমাবদ্ধ মনের সৃষ্টি। আমাদের অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছায় তাহাদের ভিতরকার সম্বন্ধ দেখাই আমাদের মনের কাজ। ইন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্ন প্রকারের ধারণা জন্মাইয়া দেয়। স্পন্দন হিসাবে শব্দ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। অপরিবর্ত্তনীয় ও অচঞ্চল এমন কোনও নিরপেক্ষ আদর্শ নাই যাহা দ্বারা আমরা কাজ আরম্ভ করিতে পারি। সুতরাং দেশ-কালাতীত ভাবে দেখিতে গেলে অভিবেগ, বস্তু, শক্তি, সময় ইত্যাদির কোনও অর্থ হয় না।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুইয়ের দ্বারা তৈরী দ্বৈতাত্মক জগৎ সম্বন্ধেই মন ধারণা করিতে পারে। প্রত্যেক দ্রষ্টাই স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যে মুহূর্ত্তে 'কণা'র কথা মনে হয়, তখনই তাহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া হইয়া যায়—অর্থাৎ তাহার সৃষ্টি হয় এবং তাহাকে অন্যান্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা হয়।

জগতে সবই যদি আপেক্ষিক এবং প্রত্যেক দ্রষ্টাই যদি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়া থাকে, তবে প্রশ্ন উঠিবে, কাহার দৃষ্টিভঙ্গি সত্য?

ইহার উত্তর দুইভাবে দেওয়া যায়; যেহেতু প্রত্যেকের বিবেচনা সসীম সুতরাং প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি স্ব স্ব দিক হইতে ঠিক অথবা প্রত্যেকেই ভুল। অধিকন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং পরস্পর বিভিন্ন। আমাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির অবস্থান, আকার ও গতি হিসাবে সীমাবদ্ধ এবং এই সবও দ্রষ্টার অবস্থান ও অভিবেগের (velocity) উপর নির্ভর করে। সুতরাং একজন দ্রষ্টা বড় জোর ক্ষণস্থায়ী মূর্ত্তি পাইতে পারেন কিন্তু উহা কখনই নিরপেক্ষ নহে। এই জন্যই আপেক্ষিকতা ব্যক্তিবিশেষের ধারণাকে বাদ দিয়াছে। যাহার দৃষ্টি বিশ্বের প্রত্যেক আনাচে কানাচে পৌঁছায়, যে দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত সময়ে ও সকল স্থানের দৃষ্টিভঙ্গির মিলনক্ষেত্র, এইরূপ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাহিরে সার্ব্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গিতেই আপেক্ষিকতা সব কিছু দেখিয়া থাকে।

চতুর্থ পরিমাণ

(Fourth Dimension)

স্থান ও কালের ধারণা করিলেই বিভিন্ন প্রকারের পরিমাণ অর্থাৎ আমাদের বহির্জ্জগতের

* Relativity And Reality পুস্তক হইতে।

পদার্থগুলির মধ্যে কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধের ধারণা করা হয়। কোনও জিনিষ আমাদের ডাইনে কি বামে, পিছনে কি সামনে, উপরে কি নীচে, পূর্ব্বে কি পরে—ইহাই আমরা চিন্তা করি। পূর্ব্ববর্ণিত সংজ্ঞাগুলি আপেক্ষিক এবং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে দ্রষ্টার স্থান পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞাগুলিও স্থান বিনিময় করিতে পারে।

কোনও কিছুর অবস্থান জানিতে হইলে প্রামাণিক কাঠামো অর্থাৎ কতকগুলি লম্বরেখা স্বীকার করিয়া লওয়াই গণিত-বিজ্ঞান-সম্মত সাধারণ পদ্ধতি। সেগুলি অবলম্বন করিয়া পরিমাপ করা হয়। দুই পরিমাণ যুক্ত (Two Dimensional) স্থানে বস্তুর অবস্থান জানিতে হইলে দুইটি রেখার প্রয়োজন। তিন পরিমাণযুক্ত (Three Dimensional) স্থানে বস্তুর জন্য তিনটি রেখার প্রয়োজন। আপেক্ষিক-তত্ত্ববিদ্‌গণ সকল অবস্থায়, সকলদিকে ও সকল অভিবেগের জন্য প্রযোজ্য প্রামাণিক কাঠামো ব্যবহার করেন। অর্থাৎ সার্ব্বভৌম (universal) দ্রষ্টার দিক্ হইতে সকল প্রকার অভিবেগে প্রযোজ্য সচল কাঠামো তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই 'কালে'র সূচনা এবং সেই কাল হইতেই চতুর্থ পরিমাণের পরিচয়।

কালকে চতুর্থ পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে ইহা কোনও মৌলিক পদার্থ হিসাবে তৃতীয় পরিমাণযুক্ত (Third Dimensional) বিশ্বে স্থান লাভ করিল। 'কাল' অভিবেগের মৌলিক উপাদান ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার পরিমাণেই ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। অতএব এই উক্তির একমাত্র অর্থ এই যে তিন-পরিমাণযুক্ত দেশ হইতে কাল অবিচ্ছেদ্য। এই কাল উক্ত দেশের সহিত মিশিয়া দেশ-কালের একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই চতুর্থ পরিমাণের জগৎ। কাজেই আপেক্ষিক-তত্ত্ব চতুর্থ পরিমাণ জগতের গণিত নিয়া আলোচনা করে এবং প্রথম তিন পরিমাণের জগৎও ইহারই অন্তর্গত।

সন্ধান

শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর, বি-এ

কিযে চাই আমি পারিনা বলিতে, তবু শুধু কেন চাই ?
পেয়েছি বলিয়া ধরিনু যাহারে খুঁজে দেখি সে যে নাই।
বুঝি ভ্রম, মরি লজ্জায়—ছুটে চলি পথপানে,
কোথা নাহি জানি, শুধু এই জানি—'অজানার সন্ধানে'।
দীর্ঘ কালের যাত্রী আমি, খুঁজে বেড়াই পরশ-পাথর ;
মুগ্ধ আমি, লুব্ধ আমি, ভ্রান্ত আমি—শ্রান্তি-কাতর।
চারিদিকে মোর যত পরিবেশ সবি ভাবি তাঁর ছায়া।
কে বলিতে পারে কোথা গেলে পা'ব ধরিতে তাঁহার কায়া ?

স্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ

শ্রীউপেন্দ্র কুমার কর, বি-এল্

(২)

মান্দ্রাজ নগরে এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "লোকে patriotism অর্থাৎ দেশানুরাগের কথা বলে। আমিও 'পেট্রিওটিজমে' বিশ্বাসী। আমারও দেশানুরাগের আদর্শ আছে। মহৎ কার্য্যের জন্য তিনটি জিনিষের আবশ্যক। প্রথমটি হইতেছে হৃদয়বত্তা। আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তি (reason) কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া থামিয়া যায়, কিন্তু হৃদয় হইতেই প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যে প্রবেশ করিবার দ্বার। অতএব, হে স্বদেশভক্ত সংস্কারকবৃন্দ, ভালবাস, অনুভব করিতে শিক্ষা কর। তোমরা কি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছ যে, দেব ও ঋষিগণের কোটি কোটি বংশধর প্রায় পশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি নরনারী বহুযুগ ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, অজ্ঞতার কাল মেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় কি তোমরা বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতেছ? * * এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের এই দুর্দ্দশার, বিনাশের কথাই কি তোমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়, ধ্যানের বিষয় হইয়াছে? এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া তোমরা কি তোমাদের মান, যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? যদি এইরূপ করিয়া থাক তবে তোমরা প্রথম সোপানে,—স্বদেশানুরাগের প্রথম সোপানে পঁহুছিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান যে, আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভার জন্য আমি যাই নাই। দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচনের চিন্তা ভূতের মত আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্য করিবার কোন উপায় ও সুবিধা পাইলাম না। এ জন্যই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল। ধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশন হউক বা না হউক, তাতে আমার কি যায় আসে? এখানে, আমার স্বদেশে, আমার রক্তমাংস স্বরূপ জন-সাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে,—তাহাদের কথা কে ভাবে?

"স্বীকার করিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার বিষয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ। কিন্তু তার প্রতীকারের কোনও উপায় স্থির করিয়াছ কি? বৃথা বাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর মীমাংসায় উপনীত হইয়াছ কি? দেশবাসীকে এই জীবন্মৃত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কোনও সহায়তা করিয়াছ কি, দুটি মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে একটু সান্ত্বনা দিয়াছ কি? কিন্তু ইহাই প্রচুর নয়। তোমাদের কি সেই প্রবল ইচ্ছা-শক্তি, অটল সঙ্কল্প আছে যাহা দ্বারা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পার? যদি সমগ্র জগৎ তোমাদের বিরুদ্ধে তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হয় তবুও যাহা ন্যায়, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছ তাহা করিতে সাহসী হইবে কি? যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তোমাদের ধন মান সমস্ত লুপ্ত হয় তবুও তোমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়বদ্ধ থাকিতে পারিবে কি? অবিচলিত

ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে কি? * * তোমাদের এরূপ দৃঢ়তা আছে কি? যদি তোমাদের এই তিনটি জিনিষ থাকে তবে তোমরা প্রত্যেকে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। * *" (মূল ইংরেজী বক্তৃতাংশের অনুবাদ)।

The Future of India (ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ) বিষয়ক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ, স্বজাতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হউন। * * অন্যান্য দেবতা নিদ্রিতা, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমাদের স্বদেশীয় জন-সাধারণ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন্ নিষ্ফলা দেবতার সন্ধানে তোমরা ধাবিত হইবে, আর তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পার না? এই দেবতার পূজা সম্পন্ন হইলে পর তোমরা অপর দেবতার পূজা করিতে সক্ষম হইবে। * * তোমরা প্রত্যেকেই যোগী হইতে চাহিতেছ, প্রত্যেকেই ধ্যান করিতে চাহিতেছ! ইহা যে অসম্ভব। সমস্ত দিবস সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া অর্থের সন্ধানে উন্মত্তবৎ ছুটিবে আর সন্ধ্যাবেলায় অল্পক্ষণের জন্য বসিয়া নাক টিপিলেই ধ্যানী যোগী হইয়া যাইবে? ইহা এতই সহজ? * * আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা। চিত্তশুদ্ধি কি করিয়া হইবে? সর্ব্বপ্রথমে বিরাটের পূজা দ্বারা—যাঁহারা তোমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান তাঁহাদের পূজা দ্বারা। * * ইঁহারাই, তোমাদের স্বদেশবাসিগণই এখন তোমাদের উপাস্য দেবতা হউন। হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্বের পরিবর্ত্তে তোমাদের স্বদেশবাসিগণের পূজা কর। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষরূপ মহাপাপের ফলে তোমরা দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবুও কি তোমাদের চক্ষু খুলিবে না? * *।"—(মূল ইংরেজী বক্তৃতাংশের অনুবাদ)

বলা বাহুল্য স্বামীজী ভারতের যুবকবৃন্দকে উপরি উদ্ধৃত দুইটি বক্তৃতায় যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা শুধু মুখের কথা নহে,—সে সকল তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া, স্বদেশবাসী নর-নারীর দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য তাঁহার সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য, দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া স্বদেশপ্রেমিকের মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন!

জন্মভূমিকে স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীর বিরাট্ রূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উপরি উদ্ধৃত বক্তৃতাংশ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। আমার ত মনে হয়, প্রকৃত স্বদেশভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবানেও ভক্তিপরায়ণ তাঁহাদের সকলের চিত্তেই অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ উপলব্ধি জাগিয়া থাকে। আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশ এবং জগদীশ্বরের মধ্যে অভিন্নতা অনুভব করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত "আনন্দমঠ" উপন্যাসের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরও ১৬।১৭ বৎসর পরে বিবেকানন্দের বক্তৃতায় ঐরূপ একাত্মতাবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আরও প্রায় ৮ বৎসর পরে ১৩১০ বাংলায় রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব্ব কবিতায় অনুরূপ উপলব্ধির পরিচয় পাই। এই কবিতাটি ইদানীং "উৎসর্গ" নামক কাব্যে ১৬শ সংখ্যক কবিতা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের এবং রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি পাঠকগণ ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া মহতী শিক্ষার সঙ্গে বিমলানন্দ উপভোগ করিবেন।

(১)

বন্দে মাতরম্,
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
মাতরম্।

* * *

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বং।

* * *

(২)

হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল,
নীরব আশিস্-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ 'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছে ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

সন্দিগ্ধ-চিত্ত আমাদের মনে এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ উদিত হয়,—স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই অনেক প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে ত তাঁহার দৃষ্টিতে স্বদেশ বিদেশের মধ্যে কোনও প্রকার বিভেদ জ্ঞান থাকা সঙ্গত নয়, সকল দেশ, সকল জাতিকেই তাঁহার সমভাবে ভালবাসা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি, তিনি তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে যেমন ভাবে ভালবাসিয়াছেন তেমন ভাবে অন্য কোন দেশকে ভালবাসেন নাই। এই নানাত্ব-বোধ কি তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈত-তত্ত্বের বিরোধী নহে?—একটু ভাবিয়া স্বামীজীর চরিত্র এবং কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, তাঁহার মনে বস্তুতঃ কোনও ভেদ-বুদ্ধি নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, মানুষ বস্তুতঃ ভালবাসে স্ত্রীকেও নহে, পুত্রকেও নহে, বিত্তকেও নহে, কিন্তু সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মকে। অতএব যাহাতে ব্রহ্মের প্রকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট ব্রহ্মজ্ঞগণের অন্তরের প্রীতি তাহাতেই বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রথম লাভ করেন এবং এখনও, বর্ত্তমান অবনত অবস্থায়ও তাহা এদেশেই অটুটভাবে বিদ্যমান আছে। আর মানবজাতিকে আসন্নপ্রায় বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেদান্তের অমৃতের বাণী জগতের সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করা অত্যাবশ্যক। এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করাও অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান ভারতের অন্য অভাব নাই, তাহার শুধু অর্থাভাব, অন্নাভাব, অর্থকরী বিদ্যার অভাব। এই কারণেই ভারতের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, অনশন-অর্দ্ধাশনে

কঙ্কালসার জনসাধারণের দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীজী সারা জীবন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের উন্নয়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মের জননী-রূপিণী ভারতমাতাকে বিবেকানন্দ কি পরিমাণে এবং কি কারণে ভালবাসিতেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাঁহার দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিব যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের কথা হৃদয়ের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি, স্বদেশ-ভক্ত, ভগবদ্‌ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ভারতবর্ষের স্বরূপটি অনুভব করিয়াছেন ;—"অয়ি ভুবনমনমোহিনি" এই প্রসিদ্ধ গানের নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি ছত্র পাঠ করিলেই কবির মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে —

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথমে প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন ;
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ স্তন্য বাহিনী !

কবি দ্বিজেন্দ্রলালও গাহিয়াছেন—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি !

প্রায় চারি বৎসর পাশ্চাত্যদেশে বেদান্তের সঞ্জীবনী বাণী প্রচার করিয়া ভারতের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র স্বামীজী তাঁহার চিত্তপটে সনাতন ভারতের যে সুমহান জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত ছিল তাহা স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করেন। The Future of India (ভারতের ভবিষ্যৎ) বিষয়ক মান্দ্রাজে প্রদত্ত মূল বক্তৃতার প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

"This is the ancient land where wisdom made its home before it went into any other country, the same India whose influx of spirituality is represented, as it were, on the material plane, by rolling rivers like oceans where the eternal Himalayas, rising tier above tier with their snow-caps, look as it were, into the very mysteries of heaven. Here is the same India whose soil has been trodden by the feet of the greatest sages that ever lived. Here first sprang up inquiries into the nature of man, and into the internal world. Here first arose doctrines of the immortality of the soul, the existence of a supervising God, an immanent God in Nature and in man, and here the highest ideals of religion and philosophy have attained their culminating points. This is the land from whence, like the tidal waves, spirituality and philosophy have again and again rushed out and deluged the world, and this is the land from whence once more such tides must proceed in order to bring life and vigour into the decaying races of mankind. It is the same India which has withstood the shocks of centuries, of hundreds of foreign invasions, of hundreds of upheavals of manners and customs. It

is the same land which stands firmer than any rock in the world, with its undying vigour, and indestructible life. Its life is of the same nature as the Soul, without beginning and without end, immortal, and we are the children of such a country.

Children of India, I am here t speak to you to-day about some practical things, and my object in reminding you about the glories of the past is simply this. Many times have I been told that looking into the past only degenerates and leads to nothing, and that we should look to the future. This is true. But out of the past is built the future. Look back, therefore, as far as you can, drink deep of the eternal fountains that are behind, and after that, look forward, march forward, and make India brighter, greater, much higher than she ever was. Our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins; we must have faith in that blood, and what it did in the past; and out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she had been."

উপরি উদ্ধৃত ইংরেজী বক্তৃতাংশের ভাবানুবাদ:—

"এই সে প্রাচীন দেশ, ভারতবর্ষ, যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কোন দেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে স্বীয় বাস-ভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এদেশের আধ্যাত্মিকতার মন্দাকিনী জড়জগতে, একদিকে, বিশাল নদনদীরূপে সবেগে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরের সহিত মিলিত, একীভূত হইয়াছে; এবং অপর দিকে, তুষার-কিরীটী, অনাদি-অনন্ত হিমালয়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক যেন সুরলোকের রহস্যসমূহের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে! এই ভারতের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম মানব-প্রকৃতি এবং অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছিল। এদেশেই সর্ব্বপ্রথম মানবাত্মার অমরত্ব, ব্রহ্মের অস্তিত্ব, ঈশত্ব এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিত্ব-বিষয়ক মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। এদেশেই ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতেই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী বারংবার প্লাবিত করিয়াছে। আর, ধ্বংসাভিমুখী জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবার জন্য এই ভারত হইতেই পুনরায় সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইবে। এই ভারতেই শত শত শতাব্দীর আঘাত, বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত রীতি-নীতি বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; নিজের অবিনশ্বর বীর্য্য ও জীবন লইয়া পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এদেশের জীবন আত্মারই মত অনাদি-অনন্ত, অমর। আর, আমরা এমনি দেশের সন্তান। হে ভারত-সন্তানগণ, তোমাদিগকে কতকগুলি কাজের কথা বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এ দেশের অতীত গৌরবের কথা তোমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাহা এই। লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে,—অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বৃথা, বরং তাহাতে

অবনতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে।—একথা সত্য। কিন্তু অতীতের গর্ভ হইতেই ভবিষ্যতের জন্ম হয়। অতএব অতীতের দিকে যত দূর পার দৃষ্টিপাত কর,—পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত তাহা হইতে জ্ঞান-বারি আকণ্ঠ পান কর; তারপর সম্মুখ দিকে তাকাও, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হও; ভারতবর্ষ অতীত কালে যত মহান্, যত গৌরবান্বিত, যত মহিমান্বিত ছিল তাহাকে তদপেক্ষা গরীয়ান্, তদপেক্ষা মহীয়ান্, অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে। আমরা কি উপাদানে গঠিত, আমাদের ধমনীর শোণিতের উপকরণ কি, আমাদিগকে জানিতে হইবে। আমাদের শোণিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা অতীত যুগে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে;—তারপর সেই বিশ্বাস এবং অতীত মহত্ত্বানুভবের বলে অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

স্বামীজীর স্বদেশ-প্রীতি পরিপূর্ণ ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহার "India's Message to the World" শীর্ষক অসম্পূর্ণ গ্রন্থের ভূমিকায় (The Complete Works of the Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, Part IV Pp. 881-85)। উক্ত ভূমিকার কতকাংশের ভাবানুবাদ পাঠক-পাঠিকা-গণকে উপহার প্রদান করিয়া আমাদের আলোচনার উপসংহার করিব—"* * * পাশ্চাত্য দেশের অনেক বন্ধু তাঁহাদের স্বার্থলেশহীন পবিত্র হৃদয়ের প্রীতি দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এইজন্য সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার সমগ্রজীবনের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা—কৃতজ্ঞতা আমার এই মাতৃ-ভূমির প্রাপ্য। যদি আমার জীবন সহস্র মানবজীবনের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে ঐ সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার স্বদেশবাসী নর-নারীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতাম। কারণ, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে,—এই জড়দেহ, মনন-শক্তি, এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ্, এই সমস্তের জন্যই আমি আমার জননী জন্মভূমির নিকট ঋণী। যদি আমি জীবনে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি তবে তার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ও গৌরব আমার স্বদেশবাসিগণের প্রাপ্য; আর আমার যত কিছু দুর্ব্বলতা, যতকিছু অকৃতকার্য্যতা তাহার জন্য আমি নিজেই দায়ী; আমার অক্ষমতাই এই সকল দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতার কারণ। এ দেশবাসী জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে মহতী শিক্ষালাভ করিয়া জীবনকে মহৎ ও কৃতার্থ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমি ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া আমার মধ্যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে।

"আমার জন্মভূমির মত দেশ আর কোথায় আছে? যে কোন ব্যক্তি, তিনি ভারতবাসীই হউন, অথবা বিদেশী হউন—যদি তাহার আত্মা পশুত্বে পরিণত না হইয়া থাকে,—এই পুণ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হন—তিনিই নিজেকে জীবন-প্রদ চিন্তা-রাশিদ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভব করেন,—যে সকল চিন্তা মানবেতিহাসের অজ্ঞাত সহস্র সহস্র শতাব্দী যাবৎ নরকুলশ্রেষ্ঠ, পুণ্যাত্মা ভারতীয় মহাপুরুষগণ মনুষ্যজাতিকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিবার জন্য উদ্ভাবিত করিতেছেন। এদেশের পবন আধ্যাত্মিকার স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। এদেশ দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উদ্ভাবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পাশব জীবনের অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিবার জন্য, এবং যে শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার পশুত্বের বাহ্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া

অজ, অমর, অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মারূপে প্রকাশিত হয় সেই শিক্ষা দিবার জন্য এই ভারতই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এ দেশই মানবজীবনের যাহা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া, আবার, এ জীবনের দুঃখ-তাপ পূর্ণতররূপে সহ্য করিয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল যে এই সুখদুঃখময় মানবজীবন অলীক, মায়ামাত্র। এই ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম ভোগ-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, সামাজিক গৌরব-গরিমার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অশেষ প্রতাপের অধীশ্বর নব যৌবনের প্রারম্ভে সকল মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন! সুখ-দুঃখ, অশ্রু-হাস্য, ঐশ্বর্য্য-দারিদ্র্য, শক্তি-দৌর্ব্বল্য, জন্ম-মৃত্যুর ভীষণ সংঘর্ষের মধ্যে আবর্ত্তিত অসংখ্য মানবের বাসভূমি এই ভারতেই অনন্ত শান্তি ও অটল স্থৈর্য্যের আশ্রয় ত্যাগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আমাদের এই মাতৃভূমিতেই জীবন-মৃত্যুর সমস্যা, সর্ব্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্র দাহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্যা সর্ব্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল; এবং তাহা এরূপভাবে মীমাংসিত হইয়াছিল যে জগতের অপর কোন দেশ সেরূপ মীমাংসায় এ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। শুধু এদেশই আবিষ্কার করিয়াছেন,—এই ঐহিক জীবন এক পরম সত্যের ছায়ামাত্র, অতএব অমঙ্গলের আকর। আমার এই মাতৃভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নর-নারী জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দুর্জ্জয় সাহসে সমাধিগর্ভে মগ্ন হইয়াছে, যখন অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজ নিজ বাসনা পূরণের আশায় উন্মত্তের মত ধাবিত হইয়াছে। কেবল এদেশেই মানব-হৃদয় এতদূর প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহা শুধু মানুষ নহে, সমস্ত পশু-পক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে। * * কেবল এ দেশেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বের একত্ব, অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে।

"ভারতবর্ষের অবনতির কথা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি। এক সময়ে আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রের ভিতরকার প্রকৃতরূপ অবগত হইয়া এখন আমার নেত্র হইতে ভ্রান্ত সংস্কারের তিমিরাবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন আমি অহঙ্কারমুক্ত অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার দেশকে আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অয়ি পুণ্য আর্য্যভূমি! তুমি কখনও, কোন কালে পতিত, অবনত হও নাই। * * * আমি ভয়বিস্ময়-মিশ্রিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি, অপূর্ব্বজ্যোতির্ম্মণ্ডিত যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিশ্রান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে,—এই দীর্ঘায়তন কাল-শৃঙ্খলের কোথাও একটু মলিনতা দৃষ্ট হইলে আবার দেখিতে পাইতেছি, পরবর্ত্তী কালে তাহাই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিতেছি, ভারতভূমি, আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য,—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। ভূ-লোকে কিংবা সুরলোকে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা ভারতের এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে। * * * সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন-ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, তাহার জীবনের মেরুদণ্ড ও ভিত্তি, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। এই মহান্‌ব্রত পালনের

পথ হইতে ভারত কখনও এক চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হয় নাই,—মোগলই দেশ শাসন করুক, অথবা পাঠান অথবা ইংরেজ শাসন করুক্। * * * আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি, প্রত্যেক সভ্যদেশের কোটি কোটি নর-নারী ভারতবর্ষ হইতে সেই অমৃত বাণী লাভ করিবার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে যাহা, ধন-দেবতার অর্চ্চনার অনিবার্য্য পরিণাম স্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ঐ সকল দেশে নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকে ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শই তাঁহাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইবে।"

বিদ্রোহী

নিকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

হে বিদ্রোহী কবি,
শৃঙ্খলিতা জননীর আঁকিয়াছ
কী কারণ ছবি !
বণিকের শুভ্র হস্তে রাজদণ্ড নিল যবে বরি,
কিবা ঘন ঘটাচ্ছন্ন গ্লানিময় ছিল যে শর্ব্বরী।
বাংলার সে শ্মশানে—
কলঙ্কের মসীলিপ্ত ক্ষণে
ডুবে গেল শেষ সূর্য্য পলাশীর ছলনার রণে।
তারপর নামে সন্ধ্যা
রক্তময় অস্তাচল ঘিরে,
পরাধীনতার রাত্রি গ্রাসিবারে এল ধীরে ধীরে।
কতরূপে এল সে যে
মানুষেরে অমানুষ করি,
জীবনের শূন্য ভাণ্ড রিক্ততায় নিত্য উঠে ভরি।
জাতির জীবন মাঝে ব্যথা মাথা শুধু অশ্রুজল,
শ্রাবণের ধারাসম ছল ছল বহে অবিরল।
ভেবেছিনু হায় বুঝি
পোহাবে না কাল বিভাবরী,
দানবের রক্তচক্ষু কারা প্রাচীরের মাঝে করি
বাঁধিয়া রাখিবে কোটি
মানবের স্বাধীন পরাণ,
কে জানিত ভেসে যাবে,—কোটি হৃদয়ের রক্তবাণ
গড়িবে নূতন বজ্র,
দধীচির বক্ষ অস্থি দিয়া
নাগিনীর ক্রুদ্ধ ফণা পদাঘাতে হেলায় চূর্ণিয়া।
পরাধীনতার জ্বালা
বুঝেছিলে হে বিদ্রোহী বীর,
তাই তুমি ডেকেছিলে দাঁড়াইতে করি উচ্চ শির।
বন্ধনের ব্যথা জান—নিজ হাতে পরিয়া শৃঙ্খল
মুক্তির আলোকে লভি হৃদয়েতে শত হস্তিবল
বাঁধন ছেঁড়ার গান
গেয়েছিলে মুক্তির সন্ধানী,
উদয় অচল ঘেরি কী সঙ্গীত জানি মোরা জানি।
বজ্র শঙ্খ ফুকারিয়া হে চারণ
তুমি দিলে ডাক্,
জাগিয়া উঠিল যেন ঝঞ্ঝাবায়ে প্রলয় বৈশাখ।
কোটি কোটি জীবনের দীপ্তিময় অশান্ত পরাণ
পেল তারা পথের সন্ধান।
হাতে পায়ে দুর্নিবার নাগপাশ শৃঙ্খল বঞ্চনা
মুক্তি প্রভাতেরে তারা করিল বন্দনা।
মুক্তিকামী ভারতের পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কবি
হের তব স্বপনের ছবি।
পূরব গগন ঘেরি নেমে আসে আলোকের রথ
দেখাইয়া মুক্তিময় পথ।
তোমারে নন্দিত করি হে বিদ্রোহী বীর,
হিমাচল অভ্রভেদী উচ্চ হ'তে হ'ক উচ্চ শির
দেশ জননীর।

রৌপ্য

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্‌-এস্‌সি

রৌপ্য আদিকালের রাসায়নিক ধাতু। রসায়নীদের বাদ দিলেও ছোট বড় সকলেই ইহার সঙ্গে পরিচিত। একদিন স্বর্ণের পর রৌপ্যের স্থান ছিল। নানাবিধ অপরূপ ধাতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মর্য্যাদা হ্রাস পাইয়াছে। অলঙ্কারাদির জন্য ইহার চাহিদাও বর্ত্তমানে কম। সম্ভবতঃ একমাত্র মুদ্রা হিসাবে ইহার ব্যবহারিক সত্তা কিছু আছে। অনেকেই জানেন যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকাতে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা হইয়াছিল। ঠাট্টাচ্ছলে কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতির খনি হইতে ইহাদের আহরণ করিয়া আমেরিকাবাসী আবার এক কৃত্রিম খনিতে ইহাকে রাখিয়া দিয়াছেন। ভাণ্ডারেই যদি রৌপ্যের জীবন কাটিয়া যায় তবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে থাকাতে কি দোষ ছিল? গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রৌপ্য যক্ষের ধন রূপে অবস্থান করিত। ১,০০০,০০০,০০০ ডলারের উপযুক্ত রৌপ্য সেদিনও যুক্তরাষ্ট্রের কুবেরভাণ্ডারে নিরর্থক গচ্ছিত ছিল।

গত যুদ্ধ-রাক্ষস কুবেরভাণ্ডারে আঘাত করিয়াছে। যে ধন একমাত্র ধনভাণ্ডারের শোভা-বর্দ্ধন করিত তাহা আমেরিকাবাসীর যুদ্ধজয়ের একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষের এলুমিনিয়াম লইয়া একটি প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। আমেরিকাবাসী সে সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বক্‌সাইট্‌ নামক এলুমিনিয়াম খনিজকে ভাঙ্গিয়া এলুমিনিয়াম উদ্ধার করিতে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন, এবং এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের বাহক হিসাবে প্রচুর তাম্রসূত্রেরও দরকার। আমেরিকাতে প্রচুর বক্‌সাইট্‌ ও জমান বিদ্যুৎশক্তি আছে সত্য কিন্তু তাম্রসূত্রের ঘাটতি পড়ায় তাহাদের কার্য্যকরী করা কঠিন হইতেছিল। যুদ্ধের অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় মালমসল্লা তৈয়ার করিতে তাম্রের এত চাহিদা হইল যে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত তাম্রখনি দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন মিটান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অথচ এলুমিনিয়াম যুদ্ধের একটি প্রাণ, ইহাকে অফুরন্ত রাখিতেই হইবে, সেজন্য বিদ্যুৎবাহকও দরকার। হঠাৎ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি রৌপ্যের উপর পতিত হইল। বিদ্যুৎবাহক হিসাবে ইহার সমকক্ষ অন্য কিছু নাই। এতদিনে কুবেরভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারে ভারে রৌপ্য যথাযোগ্য স্থানে ছুটিয়া চলিল। জমান রাজকোষ আজ তরল হইল, সঙ্গে সঙ্গে এলুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির প্রাণে আবার বিপুল সাড়া দেখা দিল।

কেহ কেহ বলেন যুদ্ধাবসানে তাম্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিলে রৌপ্য কুবেরভাণ্ডারে ফিরিয়া যাইবে। একথার মূল্য কতটুকু আছে জানি না। বিদ্যুৎবাহক হিসাবে একবার যে বিপুল সফলতার আস্বাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৈজ্ঞানিক ইহাকে আবার রুদ্ধকক্ষে রাখিবেন কিনা সন্দেহ। আজ পর্য্যন্ত কোষাগার হইতে ১৯,০০০ টনের উপর রৌপ্য মুক্ত করা হইয়াছে। যাহার একদিন প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ব্যবহারিক সত্তা ছিল না তাহার বহুবিধ ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। নানারূপে যুদ্ধোপকরণের সর্ব্বত্র ইহা বিরাজমান। এরোপ্লেন, কামান, ট্যাঙ্ক, পেরাসুট্, জাহাজ, টর্পেডো, বোমা ইত্যাদি সর্ব্বত্র ইহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহার বিদ্যুৎবাহক

গুণ ও অন্যান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহাকে আবার যথাস্থানে প্রেরণ করা তাহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইবে।

রৌপ্যের আরও গুণ এই যে ইহা ওজনানুপাতে অত্যন্ত মজবুত, ইহাতে মরিচা পড়ে না, এবং ঘর্ষণ সহ্য করিতে পারে ইহা সবচেয়ে বেশী। উড়োজাহাজের বেয়ারিং (bearing) এ রৌপ্য থাকায় গতিবেগ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক নিজেরাই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার মিশ্রধাতুরূপে বহু ব্যবহার চলিতেছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার কৃতিত্ব অত্যন্ত উপভোগ্য। পেরাসুটের মধ্যে একটি বিশেষ অংশে রৌপ্য নিযুক্ত হওয়ায় পাইলটের প্রাণে নাকি দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। জাহাজের শরীরের প্রতি প্রয়োজনীয় অংশে ইহার নিয়ত ব্যবহার চলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে নরম ঝালাই মসল্লার মধ্যে ৪০ ভাগ টীন ও ৬০ ভাগ সীসা থাকিত, বর্তমানে ইহাতে ২½ ভাগ রৌপ্য মিশাইয়া টীনকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। টীন অভাবের দিনে ইহা যে কতবড় একটি দান হইয়াছিল তাহা উঁহারাই জানেন।

রৌপ্য কোন কোন ব্যাপারে এলুমিনিয়ামের স্থান দখল করিয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তার আলোর সার্চ্চ লাইটে এলুমিনিয়াম প্লেট থাকিত—সেখানে এখন রৌপ্য বিরাজ করিতেছে। এভাবে একজন ব্যবসায়ী অর্দ্ধ মিলিয়ান এলুমিনিয়াম রক্ষা করিয়াছেন। রৌপ্যচূর্ণ গ্রাফাইটএর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জেনারেটার ব্রাশ (Generator Brush) তৈয়ার হয় এবং টাঙ্গষ্টেন, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সারকিট ব্রেকার (Circuit Breaker) প্রস্তুত হয়। ইহার আর একটি গুণ এই যে তাম্রের সঙ্গে সামান্য মিশ্রিত হইলেই তাম্রের অনেক গুণ বৃদ্ধি করে; তখন তাম্র দ্বিগুণ উষ্ণতাধারক ও বিদ্যুৎবাহক হইয়া উঠে।

এতগুলি ব্যবহারিক তাৎপর্য্য বৃদ্ধি পাওয়ায় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ইহার চাহিদা ৫০০ হইতে ৬০০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন চাহিদা ছিল মাত্র সিলভার প্লেটেড বাসনপত্র মুদ্রা ও অলঙ্কারাদির জন্য, এখন অগণিত ইহার চাহিদা।

রৌপ্যযৌগিক পদার্থ অনেক প্রকার আছে। যখন রৌপ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই তখনও উহাদের কাহারও কাহারও যথেষ্ট চাহিদা ছিল। সিলভার নাইট্রেট্ উহাদের মধ্যে একটি। কষ্টিক লোসন হিসাবে ডাক্তারগণ উহাকে প্রচুর ব্যবহার করেন। লুনার কষ্টিক উহার অপর নাম। ইহার দ্বারা ধোপারা কাপড়ে দাগ দিয়া থাকে। সিলভার ব্রোমাইড ফটোতে ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

রৌপ্য এতদিন ব্যবহারিক জগতে গাঢাকা দিয়া ছিল। যুদ্ধের কৃপায় ইহাকেও আসরে নামিতে হইয়াছে। ক্রমশঃ রৌপ্যযুগ আরম্ভ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

পূর্ণচন্দ্র
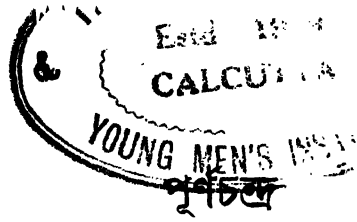
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(২)

পূর্ণবাবু সুবিধা পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে তথায় আহার করিতে বলিলেন। তিনি লেখককে যেদিন শ্যামপুকুরের মোড়ে ঠাকুরের প্রতীক্ষার কথা আবেগকম্পিত-স্বরে সজল নয়নে বলিয়াছিলেন, সেইদিন ভাববিহ্বল চিত্তে এই কথাও বলিয়াছিলেন, "একদিন আমাকে ঠাকুর ওখানে খেতে বল্লেন। আমাকে নহবতখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বল্লেন, 'এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম।' স্ত্রীলোকটি আমাকে ঠিক মায়ের মত স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। নানারকম তরকারী ব্যঞ্জন আর অন্ন। ঠিক নেমন্তন্ন খাওয়া! ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওগো ঐ তরকারীটা বেশী করে দিও।' আবার যান—আবার আসেন—দাঁড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন! কি অদ্ভুত স্নেহদৃষ্টিতে সহাস্যমুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন! স্ত্রীলোকটিও ঠিক মায়ের মত যত্ন করে বলছেন, 'বাবা—এটা খাও—ওটা খাও।' আবার ঠাকুরের আদেশমত তিনি আমাকে বেশী বেশী রকম রকম তরকারী দিতে লাগলেন। আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে হাতে মুখ ধোবার জল ঢেলে দিতে বল্লেন। ঠাকুরের আদেশমত তিনি ঠিক কলের পুতুলের মত করতে লাগলেন। পরে তাঁকে ঠাকুর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ওগো ষোল আনা দিও। স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে দিতে এলেন। আমি নিতে রাজি হলুম না। ঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে জোরে বল্লেন—'না না নিতে হয়, নিতে হয়।' আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আনন্দে হাসিতে ঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি তখন ভেবেছিলাম স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠাকুরের কোন মেয়ে ভক্ত। পরে যখন মাঠাকরুণকে প্রণাম করতে যাই—তখন দেখি—সেই তিনি—আমাদের মা! মাকেই কি চেনা যায়—যদি তিনি দয়া করে না চিনিয়ে দেন!"

পূর্ণবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। আমাকে শান্তি-নিকেতন হইতে লিখিয়াছেন,—"আমার মন্ত্র দীক্ষার দিন—দীক্ষার পরে মাঠাকরুণ বললেন—পূর্ণকে একদিন মালা পরিয়ে বসিয়ে খাইয়েছিলুম। দেখে ঠাকুর, 'তুমি ধন্য হয়েছ। ওর নারায়ণের অংশে জন্ম,' বলে কাঁদতে লাগলেন।"

মাষ্টার মশায়কে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণের দৈবস্বভাব, দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ-ধুনার গন্ধ দেওয়া যায়—তা হলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বোধ হয়ে যায়—অন্তরে নারায়ণ আছেন। নারায়ণ দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি।'

পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন—ইহা ক্রমশঃ তাঁহার অভিভাবকেরা শুনিতে পাইলেন। পিতা তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। এই সংবাদ ঠাকুর শুনিয়া একদিন চিন্তিতভাবে মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে

তাতে তোমার কি কোন ক্ষতি হবে?" মাষ্টার-মশায় উত্তরে বলিলেন, "যদি বিদ্যাসাগর মশায় বলেন যে তোমার জন্যে পূর্ণকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তবে আমারও উত্তর আছে। সাধুসঙ্গেই ঈশ্বর চিন্তা হয়—এতো মন্দ কাজ নয়! বিদ্যাসাগর মশায় স্বয়ং যে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক সংকলন করেছেন তাতেই লেখা আছে—

With all thy soul love God above
And as thy self thy neighbour love.

অর্থাৎ ঈশ্বরকে সমগ্র প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে—এতো তাঁর বইতে আছে!" ঠাকুর নীরব রহিলেন!

একদিন বলরামমন্দিরে ঠাকুর ব্যাকুলভাবে পূর্ণের কথা মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আচ্ছা, সে কোন্ পথ দিয়ে এসে দেখা করবে? পূর্ণের কেমন অনুরাগ দেখেছ?"

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ। ট্রামে করে আমি যাচ্ছি দেখে সে ছাদ থেকে রাস্তার দিকে দৌড়ে এল—আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে! শ্রীরামকৃষ্ণ সজল নয়নে বলিয়া উঠিলেন,—আহা! আহা! কি না ইনি আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হলে এরকম হয় না।

"এ তিন জনের পুরুষ সত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহ নাশ হবে—বা কিছুদিনের মধ্যে ভেড়ে ফুড়ে বেরুবে!

"কলা ব'লে বোধ হয়! কি আশ্চর্য্য! অংশ শুধু নয়—কলা।"

পূর্ণচন্দ্র বালক বয়সেই ঠাকুরের উপদেশ মত সাধন-ভজন করিতেন খুব গোপনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে গোপনে যাইতেন, ঠাকুর কলিকাতায় আসিলে প্রায় সংবাদ পাঠাইতেন এবং পূর্ণচন্দ্রও তাঁহাকে দর্শন করিতে ব্যগ্র হইতেন বাড়ীর কঠোর শাসন ও তিরস্কার সত্ত্বেও। অথচ তিনি পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হইলে তিনি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও উদাসীনের মত থাকিতেন। কখনও কখনও তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের নিকট চলিয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা পুত্রের ধর্মপ্রাণতা ও সর্ববিষয়ে উদাসীন ভাব দেখিয়া ভীত হইলেন—পাছে পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পড়েন। তিনি পুত্রকে এই বালক বয়সেই পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া সংসারী করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কান্তিবাবু লিখিয়াছেন, "ঠাকুরের দেহত্যাগের দুবৎসর পরে ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতামাতা একরকম জোর করেই তাঁর বিবাহ দেন, ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে যায় সেই ভয়ে।"—কিন্তু বিবাহের পরও তাঁহারা পূর্ণকে পূর্ণ সংসারী করিতে পারিলেন না।—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ও তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গদের প্রতি আকর্ষণের বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইল না। সুতরাং পিতা দীননাথবাবু ভারত-সরকারে পুত্রের চাকুরীর ব্যবস্থা করিলেন।

পূর্ণচন্দ্র বাহিরে পুরা সংসারী; অর্থোপার্জনের জন্য চাকুরী উপলক্ষে অধিকাংশ সময়ে দিল্লী ও সিমলা পাহাড়ে থাকিতেন—মাঝে মাঝে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিতেন। আবার কখনও সরকারী কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে কিছুদিন কলিকাতায় কাটাইতে হইত। তাঁহার পুত্র কন্যাদের লালনপালন, শিক্ষা-দান এবং কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ প্রভৃতি কোন কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে তিনি ত্রুটি করিতেন না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে যথোচিত সম্বর্ধনা ও আপ্যায়িত করিতেও তাঁহার ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য ছিল না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের স্নেহ এবং গুরুজনে ভক্তি তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। পুরাপুরি সংসারীর ন্যায় থাকিয়াও তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। কান্তিবাবু আমাকে লিখিয়াছেন, "তিনি সংসারে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ছিলেন। কোন কিছুর সঙ্গে বিশেষতঃ টাকা কড়ির ব্যাপারে

একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাংসারিক উন্নতি অবনতি বিষয়ে বীতরাগ।" বাস্তবিক তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া দেখিয়াছি তিনি সংসারের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। চাকরি করিতে হয় করিতেছেন—সংসারে অর্থ প্রয়োজন অর্থ জোগাইতেছেন, কিন্তু যাহাকে বলে সাংসারিক টান—তাহা তাঁহার চরিত্রে বড় লক্ষিত হইত না। সাধারণতঃ লোকে বাড়ীতে আসিয়া চাকরির কথা, আফিসের কথা প্রভৃতি বৈষয়িক আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে কিন্তু কি প্রাতঃকালে কি সন্ধ্যাকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। আবার অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার মত থাকিতেন—মাঝে মাঝে দুই একটী কথা বলিয়া প্রসঙ্গের মাধুর্য বৃদ্ধি করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে পূর্ণবাবু প্রতি রবিবারে বেলুড়মঠে যাইতেন। প্রায়ই একাকী বসিয়া হাসিমুখে চুরুট টানিতেন—মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই একটী বাক্যালাপ করিতেন—তাও ভাসাভাসা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত যেন অন্তর্মুখী ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার বাড়ীতে অধিকাংশ যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত। শ্রীযুক্ত মাষ্টার মশায় অনেক যুবক ছাত্রভক্তকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং পূর্ণবাবু তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বিশেষ যে সব যুবকেরা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে সন্ন্যাসী হইবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতেন—তাঁহাদের দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। কতদিন নির্জনে তিনি লেখককে বলিয়াছেন, "এরাই তো ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাই তাঁর কাজের জন্য তিনি টেনে নিচ্ছেন। শুদ্ধ আধার পবিত্র চরিত্র উচ্চ লক্ষ্য—জন্ম থেকে, বালক বয়সেই পেয়েছে—এদেরই জীবন ধন্য।" তাঁহার কথা শুনিলে মনে হইত—তাঁহার অন্তরে যে বৈরাগ্যমূর্তি বাস করিতেছে, তাঁহার কথার ভিতর দিয়া সেই মূর্তিই প্রকাশ পাইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তাঁহার ভিতর হইতে একটা আনন্দের দীপ্তি ভাসিয়া উঠিত। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"স্বামীজীকে প্রণাম করে যেই তাঁর পায়ে হাত দিয়েছি অমনি একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শের মত shock অনুভব করলাম—আবার মহারাজ বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে তাঁকে স্পর্শ করেও ঠিক তেমনি একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শ অনুভব করেছিলাম। ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে যখন শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় তখন ঐরূপ শক্তির স্ফুরণ হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তানেরা এবং তাঁহার গৃহী ভক্তেরা পূর্ণবাবুকে বিশেষ মর্যাদা দান করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহ করিতেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রথম ভারতে প্রত্যাগমন করিতেছেন এই সংবাদ যখন কলিকাতায় পৌঁছিল, তখন ঠাকুরের ভক্তেরা প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে বলরাম-মন্দিরে সমবেত হইতেন। দেখিয়াছি, পূর্ণবাবু আফিস হইতে প্রতিদিন বলরাম-মন্দিরে সংবাদপত্রগুলির সংবাদ, স্বামীজীর বক্তৃতা ও নানাস্থানে অভ্যর্থনার কথাগুলি শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীযোগেন মহারাজের নিকট বলিতেন, তাঁহারা একাগ্রমনে শুনিতেন। স্বামীজীর কোন চিঠি-পত্র আসিয়া থাকিলে তাহার মর্মার্থ পূর্ণবাবুকে তাঁহারা শুনাইতেন। দেখিয়াছি, এই সব কথাবার্তার সময়ে যদি কেহ ঐ সম্বন্ধে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহারা থামাইয়া দিতেন। তাঁহারা কখনও স্পষ্টভাবে বলিতেন, "পূর্ণ যখন কথা বলবে তোমরা চুপ করে শুনবে, কোন কথা বলবার চেষ্টা করো না।" গিরীশবাবুকে অনুরূপ ব্যবহার করিতে এবং ঠাকুরের পূর্ণবাবু সম্বন্ধে উক্ত কথা বলিতে শুনিয়াছি। গিরীশবাবুর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনিয়া একদিন

রাত্রে পূর্ণবাবু তাঁহাকে দেখিতে যান। তাঁহার ব্যাধিযাতনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে পূর্ণবাবুকে দেখিয়া আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। নানাপ্রসঙ্গের পর যখন পূর্ণচন্দ্র বিদায় লইতে উঠিলেন তখন গিরীশ-চন্দ্র করযোড়ে বলিলেন, "ভাই, আশীর্বাদ কর যেন প্রতিমুহূর্তে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে পারি। জয় রামকৃষ্ণ।" পূর্ণবাবু কোমলস্বরে বলিলেন, ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন। পরদিন কথাপ্রসঙ্গে পূর্ণবাবু আমাকে বলিলেন, গিরিশবাবুর যে দৈন্য ও আর্তি দেখলাম তাতে বুঝছি তিনি আর বেশী দিন মানবদেহে থাকবেন না—ঠাকুর তাঁর কাছে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রথম প্রত্যাবর্তন কালে বিরাট জনমণ্ডলী বিপুলভাবে তাঁহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। শীতকালে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ণবাবু জনতার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। স্বামীজীকে একটী বৃহৎ ফিটনে বসাইয়া যুবকবৃন্দ হ্যারিসন রোড এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদোপম ভবনে লইয়া যান। অভ্যর্থনা সমিতি রিপন কলেজে তাঁহার সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামীজী কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সমবেত বিপুল জনতার স্থান সংকুলান হওয়া তথায় অসম্ভব বলিয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল, তাই গতিক দেখিয়া স্বামীজী "আপনাদের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি" এইমাত্র বলিয়া কলেজগৃহের বাহিরে আসিয়া ফিটনে উঠিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি সকলকে অভিবাদন করিলেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে একটী ত্রিতলগৃহে অবস্থান করিতেন, সেই বারাণ্ডা হইতে যুক্তকরে স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন; স্বামীজীও করযোড়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রণাম জানাইলেন। সেখান হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া তাঁহার গাড়ী উত্তরাঞ্চলের দিকে টানা হইতে লাগিল। পূর্ণবাবু শ্যামবাজার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার পৈতৃক ভবনে বাস করিতেছিলেন। পূর্ণবাবুর বাড়ীর সম্মুখে স্বামীজী গাড়ী থামাইতে বলিয়া পূর্ণবাবুকে ডাকিয়া আনিতে পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বলিলেন। পূর্ণবাবু তখন আফিসে যাইবার জন্য স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজী প্রতীক্ষা করিতেছেন শুনিয়া স্নান অসমাপ্ত রাখিয়াই আর্দ্র গাত্রে সিক্ত বসনে আসিয়া স্বামীজীর চরণে প্রণত হইলেন। স্বামীজী স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ণ ভাই—কেমন আছিস্?" পূর্ণবাবু উত্তরে বলিলেন, "আজ্ঞে, ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছি। আমি শিয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে আপনাকে দর্শন করে ফিরে এসে সবে মাত্র স্নান করছিলাম—আবার আফিস যেতে হবে।" স্বামীজী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তবে যা—আর দেরী করিস্‌নে। ভিজে কাপড়ে রয়েছিস্। মঠে গিয়ে দেখা করিস।" পূর্ণবাবু আবার প্রণত হইয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিলেন, "যে আজ্ঞা।" স্বামীজীর ফিটনটানা আরম্ভ হইল দেখিয়া পূর্ণবাবু গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী যত দিন কলিকাতায় ছিলেন—পূর্ণবাবু প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন এবং নীরবে এক পাশে বসিয়া থাকিতেন। মান্দ্রাজ হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় কয়েকটী ইংরাজী প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল।

বিবেকানন্দ সমিতির সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির

সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। যখনই তিনি কলিকাতায় আসিতেন সময় পাইলে সন্ধ্যা বেলায় কোন কোন দিন শঙ্কর ঘোষের লেনে সমিতিগৃহে উপস্থিত হইতেন। ঠাকুর-ঘরে তিনি ধ্যানে বসিতেন এবং সদস্যগণকেও ধ্যানজপে উৎসাহিত করিতেন। তিনি সমিতির গৃহে আসিলেই সকলের অন্তরে একটা উৎসাহ ও প্রেরণা আসিত, কিন্তু তিনি নিজে কোন কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের ভাব দেখাইতেন না। বন্ধু যেমন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনিও সেইরূপ করিতেন। মাদাম কালভে কলিকাতায় আসিলে পূর্ণবাবুকে অগ্রণী করিয়া সমিতির সভ্যেরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং তিনি সমিতির পক্ষ হইতে ঠাকুরের ও স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের ফটোগুলি তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। চাকরি উপলক্ষে পূর্ণবাবুকে সিমলা ও দিল্লীতে থাকিতে হইত; তাই এক বৎসরের পর আর তিনি সম্পাদক পদে থাকিলেন না।

একবার সমিতির বুদ্ধোৎসবের অনুষ্ঠানে পূর্ণবাবু প্রস্তাব করিলেন পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামীজীকে সভাপতিরূপে বরণ করিতে এবং তদুদ্দেশ্যে আমাকে উদ্বোধন মঠে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্রই তিনি বলিলেন, "তোমরা এখন বড় হয়েছ, এই সব তোমরা এখন করবে, আমাকে কেন টানটানি কর। আমার বহু কাজ এবং শরীরও ভাল নয়, সুতরাং আমি বুদ্ধ-উৎসবে সভাপতিত্ব করতে পারব না।" তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আর অনুরোধ করিতে সাহসে কুলাইল না—পূর্ণবাবুকে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"না না, তিনি না হলে কেমন করে হবে? আপনি আবার গিয়ে অনুরোধ করুন।" আমি বলিলাম, "তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার সাহস হইতেছে না।" তিনি পরদিন প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া সারদানন্দ মহারাজের সমীপে গেলেন। নানা কথার পর যখন পূর্ণবাবু সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করিলেন তখন সারদানন্দ মহারাজ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুই বুঝি পূর্ণকে ডেকে এনেছিস—ভেবেছিস পূর্ণ বল্লে আর আমি এড়াতে পারবো না।" আমি উত্তরে বলিলাম, "ইহা পূর্ণবাবুরই প্রস্তাব। তাঁহার উপদেশমত আমি আসিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন শুনিয়া তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।" তখন পূর্ণবাবু স্বামীজীকে বলিলেন, "না না, কুমুদের কোন দোষ নেই—আমিই বলেছি এবং আপনি অস্বীকার করেছেন শুনে ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" সারদানন্দ স্বামীজীর উত্তেজিত ভাব চলিয়া গেল। তিনি গম্ভীর ভাবে হাতযোড় করিয়া অনুনয়ের স্বরে পূর্ণবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পূর্ণ ভাই, আমার শরীর ভাল নয়, তাই তোমার কথা রাখতে পারছি না, তুমি ক্ষমা করো।" মহারাজের এই কাতর মিনতি দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র সলজ্জভাবে বলিলেন, "না না মহারাজ, কিছু মনে করবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের অপেক্ষা সভা-সমিতি বড় নয়। অপর ব্যবস্থাই করা হবে।" সারদানন্দ স্বামীজী প্রসন্ন হইলেন। আমি দুইজনের পরস্পরের নিবিড় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া অবাক হইলাম।

পূর্ণবাবুর সিমলা আবাসে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা কখনও কখনও তাঁহার সাদর আহ্বানে উঠিতেন এবং কয়েক দিন তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দিত হইতেন। পূর্ণবাবু আফিসের ছুটীর পর প্রায় সিমলা পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে ধ্যানে সমাহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তাই

কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর বেশ রাত্রি হইলে ঘরে ফিরিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা অনেকেই কলিকাতা থাকিলে পূর্ণবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একবার পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুভ্রাতাদের এবং মঠের কতিপয় সাধুব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণবাবুর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে আসেন! সেই সংবাদ পাইয়া ভক্তেরা অনেকে দলে দলে আসিতে লাগিলেন, ইহাতে বেশ ছোটখাট উৎসবের মত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ সমস্ত দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রে বলরাম-মন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেদিন পূর্ণবাবুর যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়াছি তাহা চিরদিন স্মরণ থাকিবে। গম্ভীর-প্রকৃতি সায়রদীঘিও আনন্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল।

পূর্ণবাবু ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের সাধ্যমত সেবা করিতেন। এমন কি মার্কিণে তাঁহাদের কাহারও নিকটে চাল ডাল প্রভৃতি অন্যান্য আহার্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে পূজার বাসন কোসনও পাঠাইয়াছিলেন

পূর্ণবাবু অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কাহারও প্রতি কোন অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। দুই একবার সিমলা পাহাড়ে এইরূপ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া গোরাদের সঙ্গে তাঁহার হাতাহাতিও হয়। শারীরিক বলও তাঁহার যথেষ্ট ছিল এবং বহুদিন তাঁহার চর্চাও রাখিয়াছিলেন। এদিকে অবসর পাইলে তিনি পড়াশুনা করিতেন। পাঠাভ্যাসটি তাঁহার আজীবন ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন। পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পত্রালাপ হইত। দুঃখের বিষয় সেই সকল মূল্যবান পত্র যত্ন করিয়া না রাখাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দেশসেবা, স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম তাঁহার চরিত্রে অন্তর্নিহিত ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের জন্য যারা হাসিমুখে জেলে যাচ্ছে বা প্রাণত্যাগ করছে—তারা কত বড় ত্যাগী! আমি এদের মহৎ বলে মনে করি। এরা নিঃস্বার্থতার মূর্তি—প্রকৃত সন্ন্যাসী। ঠাকুর এসেছিলেন বলেই এই সব মহাপ্রাণ ত্যাগী পুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব হচ্চে। পূর্বে দুই একজন কচিৎ জন্মাতেন কিন্তু এরূপ দলে দলে স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাব বাংলাদেশে কেন ভারতবর্ষের ইতিহাসেও নূতন। দেশের সমস্ত চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে দিয়ে গিয়েছেন স্বামীজী। দেশের চোখ তিনি খুলে দিয়েছেন, নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিয়ে গিয়েছেন—তাই নূতন নূতন ভাবের, ঠিক স্বামীজী যা চাইতেন—সেই ভাবের লোক জন্মাচ্ছে। একটু সন্ধান করলে দেখতে পাবেন—স্বামীজীর বক্তৃতা, রচনা এবং তাঁর অদ্ভুত জীবন এদের অনুপ্রাণিত করছে।" ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সে পূর্ণবাবুর সাংঘাতিক পীড়া হয়; ডাক্তারেরা জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই মুমূর্ষু অবস্থায় পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামীজী তাঁহাকে দেখিতে আসেন। পূর্ণবাবুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তিনি এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। অলৌকিক প্রভাবে পূর্ণচন্দ্রের রোগের গতি পরিবর্তিত হইল। ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্র আরোগ্যের পথে চলিলেন। পরে প্রেমানন্দ মহারাজ কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, "ছেলে মেয়েরা খুব কম বয়সী বলে ঠাকুর ওঁর আরও সাত বৎসর পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "মশায়, আপনার নিকট কত বছর যাতায়াত করছি, আপনি ঠিক বন্ধুর মত ব্যবহার করছেন

—তাতেই ভুলে আছি। যখন মাষ্টার মশায়ের মত মহাপুরুষ আপনাকে দর্শন করবার জন্য এত লোককে পাঠাচ্ছেন, তখন ভাবি হীরের দোকানে জিরে কিনে নিয়ে গেলাম।" তিনি মৃদু হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না না, আপনি ভুল বুঝছেন। মাষ্টার মশায় ছেলেবেলা থেকেই আমাকে স্নেহ করে আসছেন, তাঁরই কৃপায় আমি ঠাকুরকে দর্শন করেছি। পাছে আমি ঠাকুরকে ভুলে সংসার-মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়ি তাই তিনি এই সব ভক্ত ও ত্যাগীদের পাঠাচ্ছেন যাতে ঠাকুরের স্মরণ মনন থাকে। আপনি আসেন—কত ঠাকুরের স্বামীজীর প্রসঙ্গ হয়। আমি মনে করি একটা কিছু উপলক্ষ্য করে ঠাকুর আপনাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। লোকে ছুটে ছুটে এই সব সঙ্গ লাভ করতে যায়—আর ঠাকুরের কি দয়া, তিনি এইসব দুর্লভ সঙ্গ আমাকে ঘরে বসিয়েই জুটিয়ে দিচ্ছেন! ঠাকুর দয়ার আর ভালবাসার অনন্ত মহাসাগর!" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম ও চক্ষু সজল হইল।

শ্রীযুক্ত শ্যাম বসু মহাশয় বলরামবাবুদের নিকট-জ্ঞাতি এবং পরমাত্মীয়। শ্যামবাবু ধনী জমিদার এবং সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পূর্ণবাবুর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি পূর্ণবাবুকে "গুরুজী" বলিয়া ডাকিতেন এবং পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে আনন্দিত হইতেন। পূর্ণবাবু কলিকাতায় থাকিলে শ্যামবাবু প্রায় প্রত্যহ—কোনদিন একবার কোনদিন দুইবার পূর্ণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। পূর্ণবাবুও কখনও কখনও তাঁহার নিকট যাইতেন। শ্যামবাবু বাহ্যিকভাবে কোন ধর্মানুরাগ দেখাইতেন না। বৈষ্ণব-বংশে জন্ম বলিয়া গলায় তুলসীর মালা ছিল। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন, কিন্তু ধনী বড়লোকদের মত তাঁহার একটি চরিত্রগত দুর্বলতাও ছিল। একবার কথা-প্রসঙ্গে কেহ দুঃখ করিয়া পূর্ণবাবুকে বলিলেন, "শ্যামবাবু এদিকে সুন্দর ভদ্রলোক, আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু, অথচ দোষ ও দুর্বলতা ত্যাগ করতে পারেন না—এটাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।" পূর্ণবাবু স্থির ভাবে শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "শ্যামবাবুর সাধারণ মানুষের মত দোষ আছে বটে কিন্তু যা সে করে, একাই করে, দল নিয়ে করে না। কিন্তু তার যা গুণ আছে তা খুব কম লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা সত্যানুরাগ—সত্যের মর্যাদা রাখা। সে যদি কোন বিষয়ে কোন কথা দেয়, তা সে রাখবে—হিমালয়ের মত অচল অটল। এতে তাকে অনেক সময় অনেক কষ্ট, অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু তা সে গ্রাহ্য বা ভ্রূক্ষেপ করে নি। এই রকম সত্যনিষ্ঠা, সত্যের মর্যাদা রাখা সংসারে দুর্লভ। শ্যামবাবুর এই গুণটি দেখলে অবাক হতে হয়। আর তাঁর একটা গুণ সে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, বরং কেউ বিপদে পড়লে বা কারুর কষ্ট দেখলে সহানুভূতি ও সাহায্য করে। কাউকে অবজ্ঞা করে না।" বাস্তবিকই দেখিয়াছি, শ্যামবাবু পূর্ণবাবুর প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহাদের নাম-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি রীতিমত কিছু কিছু সাহায্য দান করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি বেলুড় মঠে যাইতেন।

পূর্ণবাবু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওকে যদি সংসারে আবদ্ধ করা হয়, ওর বেশীদিন দেহ থাকবে না।" তাই প্রায় ৪২।৪৩ বৎসর বয়সেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাঁহার ক্রমাগত জ্বর হইতে থাকে, ডাক্তারেরা কেহ ঠিক রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রোগে দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন, অথচ সেবার জন্য কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না। একদিন তিনি একাকী শৌচে গিয়াছিলেন, দুর্বলতাবশতঃ মূর্ছিত

হইয়া পড়েন। বাড়ীর কেহ টের পায় নাই। এই ঘটনার কিছু পরে কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির কথা উল্লেখ করিলে রুগ্ন পূর্ণচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে বলে ঠাকুর অদর্শন হয়েছেন? ঠাকুর এখনও জ্যান্ত রয়েছেন—তাঁকে জ্বল্ জ্বল্ ভাবে দেখছি। আমি প্রস্রাব করতে গিয়ে একা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। তিনি কোলে করে আমাকে বিছানায় শুইয়ে গেলেন। তিনি রয়েছেন, যেমন আগে ছিলেন ঠিক তেমনি রয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি।"

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পূর্ণচন্দ্র ঠাকুরের কোলে চলিয়া গেলেন। তিনি আজীবন প্রায়ই ধ্যানে একান্তে সমাহিত থাকিতেন। দেহত্যাগেও তেমনি ভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কান্তিবাবু শান্তিনিকেতন হইতে আমাকে লিখিয়াছেন, "মৃত্যুমুহূর্ত আমরা কেউ জানতে পারি নি। মৃত্যুদিন একেবারে শান্ত সমাহিত ভাব। ডাক্তার এসে যখন বললেন ড় তিন ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছে, তখন আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তখনও ব্রহ্মতালু গরম ছিল, ঘরের প্রশান্তভাব যেন মন্দিরের মত—এটা খুব striking বলে মনে আছে। আর একটা striking যখন তাঁর শবদেহ বাইরের উঠানে আনা হয়। তখন খুব বড় বড় বৃষ্টির ধারা তাঁর খাটের উপর পড়ল—আশে পাশে কোথাও না! অথচ রাত্রি ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল।"

ঠাকুরের অন্তরঙ্গেরা কেউ ছিলেন সন্ন্যাসী, আবার কেউ গৃহী। কিন্তু সকলেই ছিলেন এক দিব্যভাবের এক একটি আদর্শ। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন নির্লিপ্ত মহাযোগী। ভগবদ্ভাব ছিল তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। সংসারে বাস করিয়াও যে নির্লিপ্তভাবে ভগবদ্-ধ্যানে সমাহিত চিত্তে থাকা যায়—পূর্ণচন্দ্র ছিলেন ইহার উজ্জ্বল আদর্শ।

তোমা-হারা

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী

বিপদ যখন, দাওহে যারে
সম্পদ সে যে পায়,
সে ডাকতে যদি পারে তোমায়
সব বিপদ যায়।
যাওয়ার মাঝে আসার কথা
শুনছি চির কাল,
(জানি) অলক্ষিতে থেকে তুমি
বুনছ ব'সে জাল।

তোমার জালেই জড়িয়ে থাকি
বন্ধনে দিই ধরা,
তোমার সত্তা অস্বীকারে,
জীবন্তে হই মরা।
তাই সে জীবন মৃত্যু সমান
পাইনা মনে সুখ,
তোমায় ভুলে, সকল হারাই
তাইত এত দুখ।
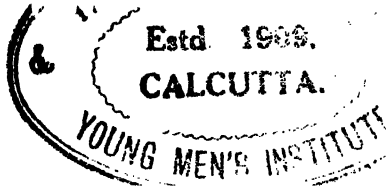
প্লেটোর চিন্তাধারা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

আগামী কালের স্বপ্নে বিভোর মানুষের চিন্তাধারা এগিয়ে চলে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে। পৃথিবীর ক্রমবিকাশের সাথে সাথে আগুয়ান মানুষের ক্রমবিকশিত মনেও জেগেছে সহস্র জিজ্ঞাসা। মানুষের অভিযান, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পিছনের ফেলে-আসা দিনগুলির সোনালি আলোতে স্বপ্নাতুর মানুষের ইতিহাস যে স্মৃতিবিজড়িত জীবনের পরিচয় নিয়ে আসে সে জীবনের বিগত, আগত, এবং অনাগত গতি প্রাচীন গ্রীসের চিন্তাজগতে এনেছিল এক প্রবল আলোড়ন। সুরু হল জগতের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা। ছাড়া পেল মানুষের আবির্ভাব নিয়ে কল্পনার রশ্মি, দেখা গেল জগৎ ও মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ। বিশ্লেষণ করা হল যুক্তির রঞ্জনরশ্মিতে মানুষের জীবন-দর্শন।

প্লেটো অনুভব করলেন জগৎ ও মানুষের মাঝে এক বিরাট সত্য বিরাজ কচ্ছে, এবং জানতে চাইলেন এই সত্য মানুষের জীবনকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত কচ্ছে, মানুষ এবং বাইরের জগতের মাঝে কি ভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, এবং জীবনের ক্রমবিকাশ ও জাগতিক বিবর্তনের মাঝে কিভাবে মিলনের সেতু তৈরী কচ্ছে। প্লেটোর এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গ্রীকদর্শনে গড়ে উঠল এমন এক মতবাদ যার ফলে মানুষ ও জগতের মাঝে বিরাজমান সত্যের রূপ এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে রূপায়িত হল এক নূতন দর্শন।

সক্রেটিসের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন জ্ঞানের অরুণালোকে মিলিয়ে যায় অজ্ঞানের গাঢ় কুয়াসা। মানুষের জানবার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। বুকভরা আশা নিয়ে মানুষ ছুটে অজানার পিছনে। জ্ঞানের পিপাসা মানুষের মনে আনে অসংখ্য প্রশ্ন। জ্ঞানের উদ্দেশ্য, পরিধি, বিষয়বস্তু এবং চরম পরিণতি সম্বন্ধে বহুবিধ জিজ্ঞাসা মানুষের জিজ্ঞাসু মনে দিয়ে যায় প্রচণ্ড দোলা।

প্লেটো বলেন, সাধারণ মানুষ যাকে জ্ঞান বলে, সেটা হল একটা অভিমত বা অস্থায়ী ধারণা। এই জ্ঞানের মাঝে কোন সত্যতা নেই, কারণ এটা শাশ্বত এবং সর্বপ্রসারী নয়। পরিবর্তনশীলতা হল এর একটি বৈশিষ্ট্য। আজ যেটাকে সাধারণ মানুষ সত্য বলে মেনে নিল, কিছুদিন পরে সেটা আবার অসত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং সাধারণ লোকের অভিমত বা ধারণা কোন ধ্রুবত্ব দাবী করতে পারে না।

সে জ্ঞানই হল মানুষের কাম্য যে জ্ঞান অখণ্ড, সর্বগত এবং বিশ্বজনীন। সে জ্ঞানের রাঙা আলোতে ফুটে উঠে মনুষ্যত্বের শ্বেতপদ্ম, প্রাণে আসে আনন্দের বাঁধন-হারা জোয়ার এবং জীবন হয়ে উঠে মধুময়। সক্রেটিসের মত প্লেটোও বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেকটি জিনিষের এমন একটি রূপ আছে যাকে বলা হয় সর্ব-ব্যাপকতা। প্লেটোর মতে এই সর্ব-ব্যাপক রূপটি সত্য এবং অবিকার্য।

আমাদের চারদিকে রয়েছে পরিবর্তনশীল পৃথিবী। এর পরিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের ভাঙাগড়া। প্লেটো বলেন, সবচেয়ে বেশী সত্য হল সেই জগৎ, যেখানে বিরাজ করে অব্যক্ত সৎ (Ideas)। মানুষের পরিচিত

পৃথিবীর কোন সত্তা তিনি স্বীকার করলেন না। তিনি যাকে মূলাদর্শ বা অব্যক্ত সৎ বলেছেন, সেটা একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আছে। প্রত্যেকটি মূলাদর্শ হল একক, নিখুঁত এবং পূর্ণ। যদি কোথাও পূর্ণতার অভাব ঘটে, তবে সে অভাবের জন্য দায়ী মূলাদর্শের অনুকার, কারণ অনুকার কখনও পূর্ণতা দাবী করতে পারে না। এই পরিবর্তন-সহ পৃথিবীতে একমাত্র মূলাদর্শের সাহায্যে শাশ্বত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। বিশেষতঃ সমস্ত মূলাদর্শগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হল 'মঙ্গল' বা "শিব"। প্লেটোর সমালোচকগণ বলেন প্লেটো শিবকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে ঈশ্বর থেকে তাঁকে পৃথক করে দেখা কষ্টকর, যদিও প্লেটো সরাসরি কোথাও বলেন নি "শিব"ই হল ঈশ্বর।

সিদ্ধিলাভ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত

পঞ্চবটীমূলে বসি যোগাসনে পূজারী ব্রাহ্মণ,
কমনীয় তনু হ'তে দিব্য জ্যোতি করিছে স্ফুরণ।
নিম্নভাগে জাহ্নবীর পূত বারি কল কল রবে,
গাহিছে স্বর্গের গীতি—অমরতা আনিয়াছে ভবে।
শুভ্র উত্তরীয় গলে সদাশিব প্রফুল্ল অন্তর
বসেছেন যোগাসনে ধ্যানমগ্ন যথা মহেশ্বর,
অধরে মধুর হাসি বরষিছে অমৃতের কণা,
ভালে জ্বলে ব্রহ্মতেজ, দিব্য দৃষ্টি করিছে সূচনা
উদার মানব তাঁরে, ধ্যান ভঙ্গে চারি ভিতে চায়,
ব্যাকুল উদ্বেগ চিত্তে কার ছায়া খুঁজিয়া বেড়ায়।
ছুটে যায় মন্দিরেতে—সেথা বুঝি মিলিবে রতন,
আবেগ রোধিতে নারি উচ্চ স্বরে বলিলা তখন—
মাতা, মাতা দেখা দাও—দেখা দাও অধম সন্তানে,
কত দিবা কত নিশি যাপিলাম চাহি তব পানে,
তোমার অস্তিত্বে মাতঃ চিরদিন করিনু বিশ্বাস,
ব্যর্থতায় যাবে দিন, সার হবে শুধু উপহাস?
তরঙ্গিত জাহ্নবীর বক্ষে উঠে ছল ছল ধ্বনি,
বুঝিবা আসেন মাতা ঐ বুঝি গায় আগমনী।
উন্মত্ত ব্রাহ্মণ তায় ছুটে যায় ভাগীরথী তীরে,
কোথা মাতা, কোথা তিনি?
হতাশায় পুনঃ আসে ফিরে,
আষাঢ়ের ঘনঘটা, মেঘমন্দ্রে কাঁপিছে বিমান,
চমকে বিজুলী হানে ঘোর রবে কেঁপে উঠে প্রাণ;
অন্ধকারে ঢাকে ধরা, সাধক ভাবিছে মনে মনে,
ভয়ঙ্করী-রূপা মাতা আসিবেন তুষিতে সন্তানে।
শুকাল শ্রাবণধারা বরষার হইল বিরাম—
ধরণী লুটায়ে কাঁদে জপিতেছে শুধু মাতৃনাম।
মৃদু মন্দ সমীরণে বৃক্ষ-পত্র কাঁপে শির শির,
ঐ বুঝি আসে মাতা বাজে তাঁর চরণমঞ্জীর।
মাতা, মাতা সন্তানে কি এতদিনে পড়িয়াছে মনে?
জনম সার্থক হবে তোমার বাঞ্ছিত দরশনে।
অশক্ত সন্তান সম বাহু মেলি যায় ধরিবারে
কিন্তু দেখে নাহি মাতা বঞ্চনা করিল শুধু তাঁরে
জগন্মাতা—দিন যায়, বর্ষ যায়, চলে যায় যুগ,
জীবন সায়াহ্ন কালে তবুও রহিবে পরাঙ্মুখ?
হে নিষ্ঠুরা, নাহি আর প্রয়োজন তুচ্ছ এ জীবনে,
দিব বিসর্জ্জন আজ দিব অর্ঘ্য তোমার চরণে।
সাধক ধাইলা বেগে, উন্মত্ত ঝটিকা সম—
ছিন্ন করিবারে শির মাতৃমূর্ত্তি যেথা অনুপম,
কৃপাণ ধরিলা হস্তে মন্দিরেতে করিয়া গমন,
সহসা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি অট্টহাস্যে ভরি ত্রিভুবন—
ধরিলা সাধকহস্ত, কহিলা আশ্বাসি পুনঃ তাঁরে,
এইতো এসেছি আমি, নিশিদিন আছি তব দ্বারে
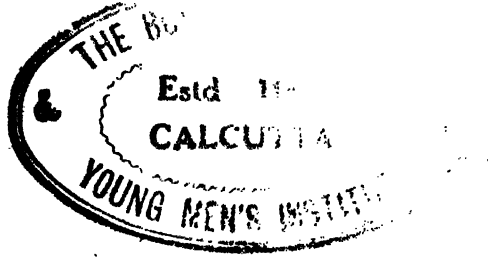
বেদান্তদর্শনে আছে কি?

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তদর্শন গ্রন্থের অধ্যায় চারিটিতে এবং ষোলটি পাদে কি আছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। তৎপরে অধিকরণের লক্ষণ ও তাহার রচনাপ্রণালী প্রভৃতিও তাহার পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ১৯১টি অধিকরণে কি আছে, তাহাই আলোচ্য। আর তাহা হইলেই বেদান্তদর্শনে কি আছে তাহা মোটামুটি ভাবে কতকটা জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু এই বিষয়টি এবং অধিকরণান্তর্গত ৫৫৫টি সূত্রে কি আছে এই বিষয় দুইটী সংক্ষেপে গ্রন্থের সূচীপত্রে এবং বিস্তৃতভাবে গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে। বেদান্তদর্শনের পরিচয় প্রদানকালে তাহাদের প্রদর্শন করা পুনরুক্তি মাত্র হইবে।

এজন্য আমরা এস্থলে সর্বপ্রধান বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে অন্যতম আচার্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে (১২২৫) আবির্ভূত মহামহোপাধ্যায় চিৎসুখাচার্যবিরচিত অধিকরণনামাবলী নামক গ্রন্থের ৫০টী শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ১৯১টী অধিকরণে কি আছে প্রথমতঃ তাহার পরিচয় প্রদান করিব। এই শ্লোকগুলিতে অধিকরণের নামকরণ এমন ভাবে করা হইয়াছে যে যিনি একবার মূলগ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহার পাঠমাত্রই অর্থাবগতি হয়। সংস্কৃত ভাষাও অতি সরল। শুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় কেবল বিভক্তি মাত্র যোগ করা হইয়াছে, মনে হইবে।

মহামহোপাধ্যায় চিৎসুখাচার্যের এই অধিকরণনামাবলী অল্পদিন অগ্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং প্রথমে মান্দ্রাজ ও পরে পুণাতে প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই বোধ হয় প্রথম প্রচার হইল। চিৎসুখাচার্যের পরিচয় অন্য স্থানে প্রদত্ত হইবে। এক কথায় নব্যন্যায়ের সাহায্যে শাঙ্কর ভাষ্যের তাৎপর্য প্রকাশ এই আচার্যই প্রথম বোধ হয় করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকপ্রধান মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় বেদান্তসিদ্ধান্তকে আক্রমণ করিলে এই চিৎসুখাচার্যই— চিৎসুখী বা প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই কারণে ইহাকে সর্বপ্রধান বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মান্য করা হয়। যাহা হউক, অধিকরণনামাবলীর সেই শ্লোকগুলি এই—

অধিকরণনামাবলী

অঃ ১, পাঃ ১

(১) অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (২) ব্রহ্মণো লক্ষণং ততঃ। (৩) তত্র প্রমাণং শাস্ত্রং স্যাৎ (৪) তত্র শাস্ত্রসমন্বয়ঃ॥ ১ (৫) প্রধানং ন জগদ্ধেতুঃ (৬) আনন্দময় ঈশ্বরঃ। (৭) অক্ষ্যাদিত্যান্তরঃস্থ আত্মা (৮) স এবাকাশশব্দভাক্॥ ২ (৯) ছান্দোগ্যস্থপ্রাণশব্দো (১০) জ্যোতিঃশব্দশ্চ তাদৃশঃ। (১১) কৌষীতকিগতপ্রাণশব্দস্তদ্বদ্রসারসা॥ ৩

অঃ ১, পাঃ ২

(১) স এব সর্বত্রোপাস্যঃ (২) স এবাত্তা কঠশ্রুতৌ। (৩) গুহাং প্রবিষ্টৌ জীবেশা- (৪) বীশ এবান্তরোক্ষণি॥ ৪ (৫) অন্তর্যামীশ্বরো জ্ঞেয়ো (৬) ভূতযোনিরপীশ্বরঃ। (৭) বৈশ্বানরোঽপি তাদৃক্ স্যাচ্ছান্দোগ্য ইতি সপ্তকম্॥ ৫

অঃ ১, পাঃ ৩

(১) স্বর্গাদ্যাপদ্ম ঈশঃ স্যাৎ (২) অথ ভূমা পরেশ্বরঃ। (৩) অক্ষরং স্যাৎ পরং ব্রহ্ম (৪) তদেব ধ্যেয়মুচ্যতে ॥ ৬ (৫) ঈশ্বরো দহরাকাশো (৬) রূপাবির্ভাববান্ পরঃ। (৭) প্রকাশকঃ স সূর্যাদেঃ (৮) স এবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥ ৭ (৯) বিদ্যাধিকারিণো দেবাঃ (১০) শূদ্রস্যাধিকৃতির্ন চ। (১১) সর্বং প্রকম্পয়ন্নীশো (১২) জ্যোতিস্ত্রিব চৈব কথ্যতে ॥ ৮ (১৩) স এবাকাশ শব্দার্থো (১৪) বাজ্ঞাত্মা পরো বৃষা।

অঃ ১, পাঃ ৪

(১) অব্যক্তং তু শরীরং স্যাৎ (২) অজা ভূতত্রয়াত্মিকা ॥ ৯ (৩) প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা (৪) জগৎকারণমীশ্বরঃ। (৫) কৌষীতকিস্তেয় ঈশ (৬) আত্মা বাজ্যদিতঃ পরঃ ॥ ১০ (৭) স এব বিশ্বোপাদানং (৮) সর্বং ব্যাখ্যাতমষ্টকম্।

অঃ ২, পাঃ ১

(১) ন দোষঃ স্মৃতিবৈয়র্থ্যং (২) যোগোঽপ্যেতেন নিঃসৃতঃ ॥ ১১ (৩) অপ্যচিচ্চিত উৎপন্নং (৪) শিষ্টাস্বীকৃতমীদৃশম্। (৫) ভোক্ত্রাপত্তির্ন ভোগ্যস্য (৬) নান্যৎ কার্যম্ স্বকারণাৎ ॥ ১২ (৭) আধিক্যান্ন হিতাকৃত্বং (৮) শক্তো নান্যদপেক্ষতে (৯) নিষ্কলোঽপ্যধিকঃ সৃষ্টেঃ (১০) সর্বশক্তিযুতঃ প্রভুঃ ॥ ১৩ (১১) তস্য প্রবৃত্তির্লীলৈব (১২) বৈষম্যং কর্মমূলকম্। (১৩) সর্বধর্মোপপত্তিঃ স্যাৎ পরমেশে ত্রয়োদশ ॥ ১৪

অঃ ২, পাঃ ২

(১) স্যাতন্ত্র্যং ন প্রধানস্য (২) মহদ্বদচিতো জনিঃ। (৩) নাণুভ্যো জগদুৎপত্তিঃ (৪) ক্ষণিকত্বং ন বস্তুনঃ ॥ ১৫ (৫) জ্ঞানাত্মতা ন জগতো (৬) ন যুক্তং জৈনদর্শনম্। (৭) ন কেবলনিমিত্তোঽসৌ (৮) ন ভাগবতমষ্টকম্ ॥১৬

অঃ ২, পাঃ ৩

(১) উৎপত্তির্বিয়তোঽস্ত্যেব (২) তথা বায়োরপি স্মৃতা। (৩) আত্মনস্তু জনির্নৈব (৪) বায়োরগ্নেঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ১৭ (৫) অগ্নেরাপঃ প্রজায়ন্তে (৬) ভূমিরেবান্নমুচ্যতে। (৭) তত্তদ্রূপো হেতুরাত্মা- (৮) বাপীতিঃ স্যাদ্বিপর্যয়াৎ ॥ ১৮ (৯) ইন্দ্রিয়াণ্যা ভৌতিকাঃ স্যু- (১০) র্ন জীবো জনিমৃত্যুভাক্। (১১) ন কদাপি জনিস্তস্য (১২) নিত্যজ্ঞানস্বরূপতা ॥ ১৯ (১৩) নাণুর্জীবো বিভুরসৌ (১৪) কর্তা স্যাৎ পুণ্যপাপয়োঃ (১৫) ঔপাধিকং তৎকর্তৃত্বং (১৬) পরাধীনং চ নান্যথা ॥ ২০ (১৭) ঈশাংশ ইব জীবোঽসৌ বিজ্ঞেয়ো দশ সপ্ত চ।

অঃ ২, পাঃ ৪

(১) উৎপত্তিরিন্দ্রিয়াণাং স্যাৎ (২) তান্যেকাদশ সন্তি হি ॥ ২১ (৩) তানি সূক্ষ্মতরাণ্যাহুঃ (৪) প্রাণস্যাপি জনিঃ স্মৃতা। (৫) প্রাণো বায়ুবিশেষঃ স্যাৎ (৬) সোঽপি সূক্ষ্মতরঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ (৭) ইন্দ্রিয়প্রেরকা দেবাঃ (৮) প্রাণান্যানীন্দ্রিয়াণি তু। (১০) নামরূপকৃদীশানস্ত্রিবৃৎকর্তা স্মৃতো নব ॥ ২৩

অঃ ৩, পাঃ ১

(১) ভূতসূক্ষ্মযুতো জীবো গচ্ছেৎ (২) সানুশয়ঃ পতেৎ। (৩) পাপিনাং চন্দ্রলোকো ন (৪) পতন্ খাদিনিভঃ কৃতী ॥ ২৪ (৫) খাদিসাম্যং নাতিচিরং (৬) ব্রীহিস্থঃ সুকৃতী ন ষট্।

অঃ ৩, পাঃ ২

(১) মায়ৈব কেবলং স্বপ্নঃ (২) সুপ্তঃ স্যাল্লীন আত্মনি ॥ ২৫ (৩) স এব স্যাৎ পুনর্বুদ্ধো- (৪) ঽর্ধসুপ্তো মূর্ছিতো ভবেৎ। (৫) পরেশো নির্গুণঃ প্রোক্তো (৬) নিষেধ্যস্তু শ্রুতৌ ন সঃ ॥ ২৬ (৭) নেশাৎ পরং তত্ত্বমন্যৎ (৮) স এব ফলদোঽষ্টকম্।

অঃ ৩, পাঃ ৩

(১) সর্বত্র ধীরেকরূপা (২) বিষ্ট্যৈক্যে গুণসংগ্রহঃ ॥ ২৭ (৩) উদ্গীথবিদ্যা ভিন্না স্যা- (৪)

ত্বঙ্গীথেত্যোস্বিশেষণম্। (৫) এবৈব প্রাণবিদ্যা (৬) সর্বত্রানন্দাদয়ো মতাঃ ॥ ২৮ (৭) পরোঽখিলাম্নতঃ শ্রুত্যা- (৮) মাত্মশব্দস্তদর্থকঃ। (৯) আচাম্যেঽনগ্নতা প্রাণে (১০) বিষৈকা শাণ্ডিলী মতা ॥ ২৯ (১১) একৈকয়োর্নাম সত্যে (১২) ভিন্না ছন্দোগশাণ্ডিলী। (১৩) ভিন্না পুরুষবিদ্যা স্যাদ্- (১৪) বহির্মন্ত্রা ন সংবিদি ॥ ৩০ (১৫) কর্মান্তত্র জ্ঞানিমুক্তং (১৬) কর্মত্যাগস্তমুক্ষয়ে। (১৭) দেবযানেন সগুণা এব (১৮) তে চাখিলাস্তথা ॥ ৩১ (১৯) অপি জ্ঞান্যধিকারী স্যা-(২০) ন্নিষেধাঃ সর্বধীষু হি (২১) ইয়দুক্তে-রেকবিদ্যা (২২) তথোষস্তকহোলয়োঃ ॥ ৩২ (২৩) জীবেশয়োর্মিথো বুদ্ধিঃ (২৪) সত্যবিদ্যা ন বৈ পৃথক্। (২৫) কামাদিসংগ্রহো ভূতৌ (২৬) ক্রতুস্থা-বেবাগ্নিহোত্রধীঃ ॥ ৩৩ (২৭) কর্মাঙ্গোপাস্তয়ঃ কামে (২৮) প্রাণবায়োঃ পৃথগ্ধিয়ৌ (২৯) ক্রতুস্থাগ্নয়ো ন যজ্ঞাঙ্গা (৩০) আত্মা ভিন্নঃ শরীরতঃ ॥ ৩৪ (৩১) সর্বশাখাস্বেকগাঽ- (৩২) পি ব্যষ্টিবৈশ্বানরে ন ধীঃ। (৩৩) শব্দাদিভেদাদ্ভিন্না ধীঃ (৩৪) সাক্ষাৎকৃত্যৈ ন ধীদ্বয়ম্ ॥ ৩৫ (৩৫) বিদ্যা যথেষ্টং কাম্যাস্তু (৩৬) কর্মাঙ্গা অপি ষট্‌ত্রয়ঃ।

অঃ ৩, পাঃ ৪

(১) জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং (২) সর্বাশ্রমপরিগ্রহঃ ॥ ৩৬ (৩) শ্রুতাবুপাস্তিবিধয় (৪) আখ্যানাত্তু প্ররোচনম্। (৫) ন বিদ্যা কর্মসাপেক্ষা (৬) বিদ্যোৎপত্তিস্তু কর্মণা ॥ ৩৭ (৭) প্রাণাত্যয়ে সর্বমন্নং (৮) কর্ম্যকামোঽপি মোচনে। (৯) বিধুরাদ্যা অধিকৃতা (১০) উৎসৃষ্টো নাশ্রমঃ পুনঃ ॥ ৩৮ (১১) প্রায়শ্চিত্ত্যবকীর্ণী স্যাৎ (১২) তথাপ্যব্যবহার্যতা। (১৩) ঋত্বিক্‌কর্মোপাসনাস্তু (১৪) জ্ঞানাধিক্যবিধিঃ শ্রুতৌ ॥ ৩৯ (১৫) মুমুক্ষুর্দম্ভরহিতঃ (১৬) ফলং নাত্রৈব জন্মনি। (১৭) মুক্তিরেকবিধৈব স্যান্নান্যথা দশ সপ্ত চ ॥ ৪০

অঃ ৪, পাঃ ১

(১) আবৃত্তিরাফলপ্রাপ্তে- (২) রহমাস্মেতি ভাবনা। (৩) প্রতীকে নাত্মবুদ্ধিঃ স্যা- (৪) দ্ব্রহ্মধী-র্বর্মাদিষু ॥ ৪১ (৫) সূর্যাদিদৃষ্টিঃ কর্মাঙ্গে- (৬) দ্বাসীনো ধ্যানমাচরেৎ। (৭) একাগ্রতা সাধনীয়া (৮) মরণান্তমুপাসনা ॥ ৪২ (৯) ব্রহ্মবিদ্যা পাতকানি (১০) পুণ্যানি চ বিনাশয়েৎ। (১১) প্রারব্ধানাং ন নাশঃ স্যা- (১২) ন্নিত্যানাং কর্মণাং তথা ॥ ৪৩ (১৩) ফলাধিক্যং জ্ঞানযুতাৎ (১৪) প্রারব্ধান্তে তু মোচনম্।

অঃ ৪, পাঃ ২

(১) লীনা মনসি বাগ্‌বৃত্তি- (২) স্তথা প্রাণে তু মানসী ॥ ৪৪ (৩) জীবাত্মনি প্রাণবৃত্তি- (৪) র্জ্ঞানিনোঽপীদৃশী গতিঃ। (৫) আমোক্ষং সূক্ষ্মভূতানি (৬) জ্ঞানিদেহাত্তু নোৎক্রমঃ ॥ ৪৫ (৭) হানীন্দ্রিয়াণ্যাত্মলীনা- (৮) ন্যবশেষো ন কশ্চন (৯) জ্ঞানিজীবো মধ্যনাড্যা (১০) রাত্রাবপ্যর্কমাবিশেৎ ॥ ৪৬ (১১) অয়নে দক্ষিণেঽপ্যেবং মুক্তিরেকাধিকা দশ।

অঃ ৪, পাঃ ৩

(১) অর্চিরাদির্মার্গ এক (২) ঊর্ধ্বমব্দাৎ সমীরণঃ ॥ ৪৭ (৩) বরুণস্তড়িতঃ পশ্চাদ্ (৪) দেবতা আতিবাহিকাঃ। (৫) মার্গো হিরণ্যগর্ভান্ত- (৬) শ্চিদ্বোপাস্ত্যাবয়ং ন ষট্ ॥ ৪৮

অঃ ৪, পাঃ ৪

(১) মুক্তৌ স্বরূপাবির্ভাবঃ (২) স্থিতির্ব্রহ্মাবিভাগতঃ। (৩) উপাধিধর্মাশ্চিদ্রূপে (৪) সংকল্পাৎ স্বেষ্টকৃদ্বিদন্ ॥ ৪৯ (৫) দেহাদি স্যান্ন বা কামা- (৬) দনেকত্রাপি চাবিশেৎ। (৭) জগদ্ব্যাপাররহিতা শক্তির্মুক্তস্য সপ্তকম্ ॥ ৫০ ইতি অধিকরণ নামাবলী। পুণা হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত অভ্যঙ্করের টীকা সহিত সর্বদর্শনসংগ্রহ ৩৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হালিশহর তীর্থে

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

নবদ্বীপ, হালিশহর ও দক্ষিণেশ্বর বাংলার পুণ্যতীর্থ। চৈতন্য, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের সাধনার এই তিনটী স্থান তীর্থে পরিণত। নবদ্বীপ একাধিক বার দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর বহুবার। হালিশহর দর্শনের সুযোগ এতদিন হয় নাই। রবিবার, ২২শে জুন ১৯৪৭, বেলুড়মঠ হইতে সকালে বাহির হইয়া পড়িলাম হালিশহর তীর্থ-যাত্রায়। বাসে হাওড়া পুল পর্যন্ত এবং সেখান হইতে ট্রামে শিয়ালদহ গেলাম। পূর্ব ব্যবস্থামত কয়েক জন যুবক বন্ধু আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। ৮-১০ এ রাণাঘাট লোক্যাল ট্রেনে উঠিয়া বসিলাম। সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ৯।।০ টার সময় ট্রেন হালিশহর ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা পদব্রজে রামপ্রসাদের জন্মস্থানের অভিমুখে রওনা হইলাম। পুরাণ পাকা রাস্তা। রাস্তার দুইধারে হরিৎ ক্ষেত্র এবং কোথাও কোথাও পাকা বাড়ী। হালিশহর গ্রাম ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল। আমরা ১০।।০ টায় গ্রামে পৌঁছিলাম।

হালিশহর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী থানার অধীন এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখন গ্রামটী প্রায় জনশূন্য। ভগ্ন দেবমন্দির এবং জীর্ণ সৌধাবলী দেখিয়া উহার অতীত সমৃদ্ধি বুঝিতে হয়। ১১০৭ সালে ম্যালেরিয়া মহামারীতে উহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। গ্রামটী কুমারহট্ট নামেও প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের ন্যায় হালিশহরও একদা সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত ছিল। তখন উহা নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র এখানে একটী বায়ুসেবনালয় ও একটী ধর্মাধিকরণ স্থাপন করেন। তিনি নিজেও এই গ্রামে মাঝে মাঝে বাস ও ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। প্রবাদ আছে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণাদি শুভ যোগ উপলক্ষে যশোহরের রাজবংশীয়গণ এই গ্রামে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। যশোহর হইতে হালিশহর পর্যন্ত জাঙ্গাল নামক প্রশস্ত রাজপথ ছিল। অদ্যাপিও উহার ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য বহু যাত্রী সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহার আগমনের জন্য হালিশহরে একটী হাট বসিত। হাটটী স্থায়ী ও বড় হওয়ায় গ্রামের অন্য নাম হয় কুমারহট্ট। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' হালিশহরের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,—লক্ষ লক্ষ নরনারী উহার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেন; যাত্রীদের রব বহুদূর পর্যন্ত শোনা যাইত এবং স্নানান্তে অনেকে কাপড়, সোনা, তেল ও গাভী দান করিতেন।

হালিশহর চৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। মহাপ্রভু গুরুর জন্মভূমি দর্শনে একবার তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে ইহা উল্লেখপূর্বক লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেব তথায় গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানের মৃত্তিকা তুলিয়া স্বীয় বহির্বাসে বাঁধিয়া আনেন। মহাপ্রভুকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সেই স্থান হইতে মাটি তুলিয়া নেন। এইরূপে একটী খাদ হয়। সেই খাদটী এখনও আছে। তাহাকে 'চৈতন্য-ডোবা' বলে।

ডোবাটী ছোট হইলেও উহার জল কখনও একেবারে শুকায় না—এইরূপ প্রবাদ। আমরা চৈতন্য-ডোবার পূত সলিল স্পর্শ ও পান করিলাম। ঈশ্বরপুরীর ভিটাতে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ এবং গৌর-নিতাইর মূর্তি বিরাজিত। আমরা মন্দিরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের স্তোত্রপাঠ, কৃষ্ণসঙ্গীত গান এবং ঈশ্বরচিন্তায় খানিকক্ষণ অতিবাহিত করিলাম। বড় রাস্তার পাশে গঙ্গার ধারে চৈতন্য-ডোবা অবস্থিত। হালিশহর শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের তীর্থস্থান।

আমরা প্রথমে রামপ্রসাদের বাস্তুভিটায় উপস্থিত হইলাম। তথায় একটী স্মৃতিগৃহ নির্মিত হইয়াছে। ইহার নাম শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ মন্দির। গৃহমধ্যে একটী বেদী আছে। বেদীতে প্রত্যেক বৎসর ৺কালীপূজা হয়। তখন কালীকীর্তন, মেলা ও প্রসাদ বিতরণাদি হয়। দেওয়ালের গাত্রে দশমহাবিদ্যার ছবি টাঙ্গান আছে। রামপ্রসাদের বংশাবলীর এই তালিকাটীও ঝুলান আছে—রাজা শ্রীহর্ষসেন—বিমল সেন—বিনায়ক সেন—রোষ সেন—নারায়ণ সেন—শাড়ু সেন—সরণি সেন—কীর্তিবাস সেন—রত্নাকর সেন—জগন্নাথ সেন—যদুনন্দন সেন—রঞ্জন সেন—রাজীব সেন—জয়কৃষ্ণ সেন—রামশরণ রামরাম সেন—রামপ্রসাদ সেন। এই সেনবংশ পুরুষানুক্রমে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। উক্ত বৈদ্যবংশে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯ সালে) রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কীর্তিবাস সেন হইতে বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়। দানশীল রামেশ্বর অকালে দেহত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' নামক কাব্যগ্রন্থে রামেশ্বর ও রামরামের গুণকীর্তন করিয়াছেন। রামরাম কালীসাধক ও মহাকবি ছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে নিধিরাম এবং দ্বিতীয়া পত্নী সিদ্ধেশ্বরীর গর্ভে অম্বিকা ও ভবানী ভগ্নীদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীর সহিত কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বিবাহ হয়। ভবানীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারাম রামপ্রসাদের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে রামপ্রসাদ সর্বাণীর সহিত বিবাহিত হন এবং তাঁহার পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা এবং রামদুলাল নামক এক পুত্র ছিলেন। রামপ্রসাদ ১৭৭৫ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। শুনা যায়, রামমোহন নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন এবং তাঁহারই জন্ম উপলক্ষে তিনি 'এ সংসার ধোঁকার টাটী' এই গান রচনা করেন।

রামপ্রসাদ বিবাহের পরে সস্ত্রীক কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু কুলগুরু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি তান্ত্রিকশিরোমণি আগমবাগীশের নিকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। আগমবাগীশ একবার হালিশহরে আগমন করেন। সেই সময় রামপ্রসাদ তাঁহার আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হন। পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া গরাণহাটায় নবরঙ্গ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হন। কিন্তু সাধকভাব বর্ধিত হওয়ায় তিনি বেশী দিন চাকরি করিতে পারেন নাই। মনিব তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহাকে ৩০৲ টাকা মাসহারা দিয়া চাকরি হইতে অবসর দেন। রামপ্রসাদ সংসারচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গৃহে ফিরিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বাটীর পার্শ্বে যে বাগান ছিল তাহাতে তিনি বট, অশ্বত্থ, অশোক, আমলকী ও বেল রোপণপূর্বক পঞ্চবটী রচনা করেন। পঞ্চবটীতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া প্রসাদ সাধনসগরে ডুব দেন। এই আসনে তিনি জগন্মাতার দর্শন লাভ করেন। পঞ্চবটী অদ্যাপি

বর্তমান। উহার এক দিক বাঁধান হইয়াছে; তাহাতে লেখা আছে—"মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের সাধনপীঠ, পঞ্চমুণ্ডাসন, পঞ্চবটী।" আমরা পঞ্চবটীতে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া, রামপ্রসাদী গান গাহিয়া এবং স্তোত্রাদি পড়িয়া মায়ের চিন্তা করিলাম। স্থানটী এত ভগবদ্‌ভাবোদ্দীপক যে অল্লায়াসে মন অন্তর্মুখীন হয়। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতেও এই দিব্য ভাব অনুভব করিয়াছি। রামপ্রসাদ স্বয়ং এই স্থানকে সিদ্ধপীঠ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মহানিশায় দেবী তাঁহাকে তথায় দর্শন দেন এবং জগদম্বা তত্র সদা জাগ্রত। সত্যই হালিশহরের পঞ্চবটী বাংলার একটী সিদ্ধপীঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথায় আজও একটী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং উক্ত সিদ্ধপীঠের সদ্ব্যবহার বা সংরক্ষণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নাই! আমরা হালিশহরকে ভুলিতে বসিয়াছি। এই হালিশহর হইতে যে শক্তি-সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আজ প্রায় দুইশত বৎসর বাংলাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। রামপ্রসাদী গান বাংলার সুদূর পল্লীতেও শোনা যায়।

রামপ্রসাদ একটী কালীমূর্তি নির্মাণ করিয়া জগদম্বার পূজা ও ধ্যানে তন্ময় হইতেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি বিশেষ দিনে তিনি সারা দিনরাত জপধ্যানে কাটাইতেন। মায়ের দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইতেন। এই সময় এক নীরব নিশীথে তিনি মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তাঁহার বাস্তুর পশ্চিমকোণে যে ডোবা আছে উহার পূর্বদিকের বাগানে প্রসাদ মায়ের প্রথম দর্শন পান। উক্ত দর্শনের পর তাঁহার দেহে অপূর্বকান্তি এবং মুখে দিব্যজ্যোতি বিকশিত হইয়াছিল। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিগণ তাহা দেখিয়া অবাক হইতেন। তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক অনুভূতিও উপস্থিত হয়। তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। অর্থাভাবে ঘর-বাড়ী-বেড়া প্রভৃতি মেরামত করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাস্তুর বেড়াটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি কন্যা জগদীশ্বরীকে লইয়া নিজেই বেড়া বাঁধিতে লাগিলেন। বেড়ার অপরদিকে থাকিয়া জগদীশ্বরী দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল। কোনও কাজের জন্য সে গৃহে চলিয়া যায়। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া সে দেখিল, বেড়া-বাঁধা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশ্চর্যান্বিত হইয়া সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তাহার পরিবর্তে এতক্ষণ দড়ি ফিরাইতেছিল। প্রসাদ যখন জানিলেন যে, তাঁহার কন্যা এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিল, তিনি স্তম্ভিত হইয়া বুঝিলেন জগদম্বাই কন্যারূপে এই কার্য করিতেছিলেন। তিনি আনন্দে আপ্লুত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুতে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইল।

একবার লাল পদ্মফুল দিয়া মায়ের পূজা করিবার জন্য প্রসাদের আন্তরিক ইচ্ছা হইল। তিনি পদ্মের অন্বেষণে স্বগ্রামে ও গ্রামান্তরে ঘুরিলেন কিন্তু কোথাও পদ্ম পাইলেন না। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, গৃহের পাশে একটী গাব গাছে কয়েকটি লাল পদ্ম ফুটিয়া আছে। মহানন্দে ঐ পদ্ম দিয়া মায়ের পূজা করিলেন।

একদিন একটি সুন্দরী যুবতী প্রসাদের গান শুনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে বসিতে বলিয়া গঙ্গাস্নানে যান। স্নানান্তে আসিয়া দেখেন, নারী অন্তর্হিতা। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে তাকাইয়া দেখেন, লেখা আছে—"আমি অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিলাম; তুমি ৺কাশী গিয়া আমাকে গান শুনাইবে।" জগদম্বা তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন জানিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইলেন। রামপ্রসাদ অনতিবিলম্বে কাশী যাত্রা করিলেন। পথে ত্রিবেণীতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "এইখানেই গান শোনাও; কাশী আসিতে হইবে না।" প্রসাদ আনন্দে

আত্মহারা হইয়া ত্রিবেণীতেই অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইলেন। প্রসাদের গানে মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি গানেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। শোনা যায়, দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদী সংগীত গাহিয়া জগদম্বাকে শুনাইতেন। রামপ্রসাদের ন্যায় রাম-কৃষ্ণও গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে এমন ডুবিয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের গান শুনিবার জন্য তাঁহার কুটীরে মাঝে মাঝে আগমন করিতেন। রামপ্রসাদও নূতন নূতন গান রচনা করিয়া ও গাহিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। তিনি ভগবদ্‌ভাবের নেশায় সদা অভিভূত থাকিতেন। রামপ্রসাদ যখন গঙ্গায় স্নান করিতেন, তখনও তাঁহার মাতৃসংগীত চলিত। গঙ্গাবক্ষে নৌকাযাত্রিগণ নৌকা থামাইয়া তাঁহার গান শুনিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকারোহণকালে প্রসাদের গান শুনিয়া এইরূপে মুগ্ধ হন। স্নানান্তে প্রসাদ তীরে উঠিলে কৃষ্ণচন্দ্রও নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন এবং আলাপে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ যাইতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নসভায় রামপ্রসাদের গুরু আগমবাগীশ ছিলেন প্রধান রত্ন। মহারাজ তাঁহাকে রাজসভায় চাকরি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রসাদ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, মহারাজ তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য দান করেন, এবং তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুদিন পরে, রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নৌকারোহণে হালিশহরের পাশ দিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। একদিন হালিশহরের ঘাটের পাশ দিয়া গঙ্গাবক্ষে যাইবার সময় নবাব প্রসাদের সুমধুর সংগীত শ্রবণে আকৃষ্ট হন। তিনি গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান প্রসাদের নিকটে নৌকা আনিলেন এবং তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসাদ নবাবের অনুরোধে নৌকায় উঠিলেন। নবাব তাঁহাকে আর একটী সংগীত গাহিতে বলিলেন। নবাবের বোধগম্য হইবে ভাবিয়া প্রসাদ হিন্দীগান ধরিলেন। কিন্তু নবাবের হিন্দীগান পছন্দ হইল না। তিনি প্রসাদকে স্বরচিত সংগীত গাইতে বলিলেন। প্রসাদ তদনুযায়ী একটি সংগীত বিভোর হইয়া গাহিলেন। প্রসাদের সংগীতশ্রবণে নবাব এত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। প্রসাদ অবসরমত মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাবের অনুরোধ রক্ষা করেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যুর পরে এক অমাবস্যা রাত্রিতে গ্রামের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে শবসাধনা করেন, এবং অমানিশায় দেবীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। ইহার উত্তরসাধক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। জীবনের শেষ বৎসরে রামপ্রসাদ কালীপূজার পরদিবস প্রতিমা বিসর্জনের সময় একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া চারিটি শ্যামাসংগীত রচনা করিয়া গান করেন। চতুর্থ গানের শেষ অংশ 'দক্ষিণা হয়েছে' গাহিবার সময়ই তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যায় এবং তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়।

আমরা প্রায় তিনঘণ্টা রামপ্রসাদের পঞ্চবটীতে বসিয়া তাঁহার অলৌকিক জীবন অনুধ্যান করিলাম। সিদ্ধপীঠের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে মাতৃভক্তি জাগ্রত হইল। রামপ্রসাদের কৃপাবারি আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে ভক্তিসিক্ত করিল। আমরা রামপ্রসাদের সাধনা ও সংগীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। রামপ্রসাদ বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার সংগীতাবলী বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ। হালিশহরে গঙ্গাঘাটে আসিয়া দেখিলাম তথায় সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির

আছে। বড় রাস্তা ধরিয়া চৈতন্যডোবার দিকে যাইবার পথে "রামপ্রসাদ লাইব্রেরী" দেখিলাম। উহা ১৯১৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত। এই সামান্য স্মৃতি ব্যতীত অন্য কোন স্মৃতিমন্দির রামপ্রসাদের নামে বাংলায় কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর নিকট রামপ্রসাদ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁহার রচনাবলীর সংগ্রহ বা বিস্তৃত জীবনী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যে মহাপুরুষের সাধনপ্রভাবে বাংলা শক্তিপীঠে পরিণত তাঁহাকে আমরা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছি কি? রামপ্রসাদের স্মৃতিবার্ষিকী কোথাও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয় না। বাংলার ভক্তিগঙ্গা পুষ্ট হইল প্রধানতঃ চৈতন্যের বৈষ্ণবভক্তি এবং রামপ্রসাদের শাক্ত ভক্তি দ্বারা। এই ভক্তিধারাযুগ্মের সমন্বয় হইয়াছে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের জীবনে। রামপ্রসাদের বাটীর পার্শ্বে বৈষ্ণব আজু গোঁসাই বাস করিতেন। আজু গোস্বামীর সঙ্গে রামপ্রসাদের বাদানুবাদ হইত। পরে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। হালিশহরে যাহার প্রারম্ভ, দক্ষিণেশ্বরে তাহার পরিসমাপ্তি। বাংলার ধর্মকে বুঝিতে হইলে চৈতন্য; রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

আমরা হাঁটিয়া হালিশহর ষ্টেশনে আসিলাম এবং কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল ট্রেনে শিয়ালদহ ফিরিলাম। হালিশহর গ্রাম হইতে কাঁচড়াপাড়া বা নৈহাটী যাইয়াও ট্রেন ধরা যায়। হালিশহর হইতে নৈহাটী পর্যন্ত রাজপথ আছে। কলিকাতা হইতে মোটরে এই পথে হালিশহর আসা যায়। নৌকা-যোগেও কলিকাতা হইতে হালিশহর যাওয়া যায়।

সংশয় ও শান্তি

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র

ক্রোধ, মোহ, লোভ আদি পাপরিপুচয়,
সতত অন্তরে মোর জাগায় সংশয়।
সংসারের শত জ্বালা সহস্র বন্ধন,
রঙ্গময় জীবনের উত্থান পতন।
বাত্যাহত তরী সম ঠেলে দেয় মোরে,
উত্তাল তরঙ্গ-ভরা চিন্তার পাথারে।
ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, বিবেক, বিচার
ব্যাকুল করিয়া তোলে হিয়ারে আমার।
তোমার চরণ হ'তে ছিনাইয়া মোরে,
নিক্ষেপ করিতে চাহে গভীর তিমিরে।
কিন্তু যবে স্মরি তব চরণ কমল,
শান্তিরসে ভরে উঠে চিত্ত পরিমল।

কোরানে জিহাদ্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্-এ

মুসলমানদের ধর্ম্মের নাম ইসলাম্। ইসলামের শব্দগত অর্থ 'আত্মোৎসর্গ'। যিনি আল্লা বা ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিজকে ভগবানের নিকট বিসর্জ্জন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত 'মুসলিম'। মুসল্মান (বা মুস্‌লিমান) মুসলিম্ শব্দেরই ফারসী ভাষায় বহুবচন মাত্র। 'জিহাদ্', 'জহদ' (চেষ্টা করা) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং ইহার শব্দগত অর্থ উদ্যম বা চেষ্টা। এই ইসলাম (বা আত্মোৎসর্গরূপ) ধর্ম্মের নানাবিধ উপায় বা পন্থাকে কঠোরভাবে পালন করার ইচ্ছাকেই 'জিহাদ্' বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ যিনি তাঁহার সকল উদ্যম বা চেষ্টা দ্বারা ভগবানকে পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট, তিনিই মহৎ। কোরানে (৯, ২০) বর্ণিত হইয়াছে "যাহারা (ভগবৎ) বিশ্বাসী ও (ধর্ম্মের জন্য) দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধন ও প্রাণের বিনিময়েও ধর্ম্মপথে সচেষ্ট (জাহদুব), তাহারা ভগবানের নিকট হইতে অশেষ সম্মান লাভ করিবে এবং তাহারাই কেবল পরমানন্দ লাভ করিবে।"

জিহাদ্ ভগবান উপলব্ধির অদম্য চেষ্টারই নামান্তর মাত্র। যিনি এই জিহাদ্ পথে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার কেবল আল্লা বা ভগবানই যে সকল বিষয়ের একমাত্র নিয়ন্তা, তাহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং যাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তিনিই কেবল তাঁহার নিজের সকল পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জন্য আনন্দের সহিত তাঁহার ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সকল সময় প্রস্তুত আছেন। পরম সত্যের জন্য এই যে আত্মোৎসর্গ, ইহা বস্তুতই মহান। ইহার ফলও নিশ্চিত—ভগবান লাভ তাঁহার করায়ত্ত। ইহা কখনও হীন বিদ্বেষ বা হিংসাজনিত কাহারও প্রতি ঝগড়া বা লড়াই হইতে পারে না। যিনি ভগবৎ-সত্তায় পরম বিশ্বাসী, তাঁহার মরণ নাই—তিনি ত সকল সময়ের জন্য ভগবানের সহিতই মিশিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আবার জীবন বা মরণ কি? যদিও এই পার্থিব মরণ সাধারণ মানুষের নিকট জীবনের বিনাশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিনাশ নহে, অবস্থার রূপান্তর মাত্র। প্রসিদ্ধ আরব দার্শনিক ইব্‌নুল্ 'অরবী তাঁহার ফুস্‌স্-অল্-হিকাম্ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "লয়সা বি-ই-'দামিন্ ব ইন্নামা হুব তফ্‌রীকুন্—মৃত্যু কোন বিনাশ নহে, ইহা (অবস্থার) রূপান্তর মাত্র।" কাজে কাজেই এইরূপ আত্মভোলা, ভগবৎপ্রেমিক, যিনি ভগবানের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মরিয়াও চিরকাল অমর হইয়াই থাকেন। এইরূপ মহান আত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই কোরানে (২ ; ১৫৩-৫৬) বর্ণিত হইয়াছে, "হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য্য ও প্রার্থনার সাহায্যে ভগবৎ-আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ, ভগবান ধৈর্য্যশীলদের সহিতই অবস্থান করেন ; এবং যাহারা ধর্ম্মপথে (ফী সবীলি আল্লাহি) প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মৃত্যু নাই, তাহারা (চির) জীবিত, যদিও তোমরা তাহাদের (প্রকৃত তত্ত্ব) অবগত নও। ইহা ঠিক যে আমি (ভগবান) যৎসামান্য ভয়, ক্ষুধা, ধনহানি, প্রাণনাশ ও উৎপন্ন ফসলের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিব, কিন্তু (হে পয়গম্বর), তাহাদের নিকট এই শুভ সংবাদ জানাইয়া দাও যে (তাহারা আমার সকল রকম

অনুগ্রহ লাভ করিবে, কারণ, তাহারা) ধৈর্য্যশীল ও যখনই বিপদগ্রস্ত হয়, তখনই বলিয়া থাকে যে আমরা ভগবান হইতেই উদ্ভূত এবং আবার তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইব (ইন্না লিল্লাহি ব ইন্না ইলাহি রাজি 'উন)।"

'জিহাদ' দুই রকম বলা যাইতে পারে—জিহাদি-অল্-অশ্‌ঘর্ (ক্ষুদ্রতর বা সাধারণ উদ্যম) ও জিহাদি-অল্-অক্‌বর্ (বৃহত্তর বা মহান উদ্যম)। কথিত আছে যে হজরৎ মোহম্মদ একবার কোন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনুচরদের বলিয়াছিলেন, "রজ'না মিন্ জিহাদি-অল্-অশ্‌ঘরি ইলা জিহাদি-অল্-অক্‌বরি—আমরা এই ক্ষুদ্রতর বা সাধারণ যুদ্ধ বা প্রচেষ্টা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে বৃহত্তর বা মহান ধর্ম্মযুদ্ধ বা প্রচেষ্টা।" এই মহান ধর্ম্মযুদ্ধ বলিতে তিনি 'রিপুর' সহিত যুদ্ধ (মুজাহদতুল্-নফ্‌স্)-কে লক্ষ্য করিয়াই এই :হদীস্- (বা হজরৎ মোহম্মদের কিংবদন্তী)র উত্থাপন প্রকৃতপক্ষে করিয়াছিলেন। এই :হদীস হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ভগবৎ-উপলব্ধির পথে দুই রকম শত্রু আমাদের অন্তরায় হইতে পারে,—এক বাহ্যিক শত্রু; দ্বিতীয়, অন্তরের শত্রু এবং ইহাদের মধ্যে অন্তরের শত্রু বা রিপুদমনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযুদ্ধ। এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযুদ্ধের পথে অগ্রসর হইতে হয়ত অনেক সময় অবিশ্বাসীদের (অর্থাৎ যাহারা আল্লা বা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না) নিকট হইতে নানারূপ বাধা বা বিপত্তি আসিতে পারে; সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিবার জন্যই কেবল কোরানে সশস্ত্র ধর্ম্মযুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে যে এই ধর্ম্মযুদ্ধ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার বিরুদ্ধে নহে, কেবল যাহারা ভগবৎ-অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তাহাদেরই বিরুদ্ধে। কোরানে (৪২ ; ১৫) বর্ণিত হইয়াছে, "ভগবান আমাদের এবং তোমাদের উভয়েরই প্রতিপালক; আমাদের জন্য আমাদের কার্য্যাবলী এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যাবলী, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিভেদের কারণ নাই (আল্লাহু রব্ব্‌না ব রব্ব্‌কুম্; লনা অ'মালুনা ব লকুম্ অ'মালুকুম্। লা :হুজ্জতন্ বয়ননা ব বয়নকুম)।"

ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসী কোন ধর্ম্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে ঝগড়া করার নির্দ্দেশ কোরানে নাই, তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বীর নিকট নিজের বিশেষ ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে; এবং ইহা ধর্ম্মের জন্য কোন ঝগড়া বা মারামারি করিয়া নহে, কেবল মহৎ চরিত্রের আদর্শ দেখাইয়া এবং তাহার নিজের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় আস্থা প্রদর্শন করিয়া। কোরানের এই ধর্ম্মযুদ্ধ সেই অবিশ্বাসীরই বিরুদ্ধে যাহার ভগবৎ-সত্তায় কোন বিশ্বাস নাই। ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ জনিত নহে। যখনই কোন শত্রু ভগবৎ-সত্তায় আস্থাবান হইবে, তখন আর তাহার প্রতি কোন শত্রুতা বা বিভেদ থাকিতে পারে না। কোরানে (৯ ; ১২৩) বর্ণিত হইয়াছে, "হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পার্শ্ববর্ত্তী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর, এবং তাহাদের তোমাদের দৃঢ়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে দাও, কিন্তু কাহারও প্রতি অযথা অতিরিক্ত করিও না, এবং জানিও যে যাঁহারা অতিরিক্ত করেন না, ভগবান তাঁহাদেরই সহিত রহিয়াছেন।"

কোরানের শিক্ষা ন্যায়কে আশ্রয় করিতে বলিয়াছে এবং ইহা কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নাই। যাহারা ন্যায় বা সত্যের আশ্রিত, তাহারা কখনও স্বার্থান্বেষী হইতে পারে না; যাহারা অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই কেবল স্বার্থপর ও নীচপ্রবৃত্তি হয়। তাহাদের

মনের শক্তি আপনা হইতেই দুর্ব্বল, এবং সবল মন ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিবেই। কোরানে (৪ ; ৭৫-৭৬) বর্ণিত হইয়াছে, "তারপর (হে মুসলমানগণ) তোমাদের কি হইয়াছে যে নিপীড়িত স্ত্রী, পুরুষ ও বালকগণের সাহায্যার্থে ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইতেছ না?—যাহারা অপারগ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এই অত্যাচারী লোকদের বাসস্থান হইতে আমাদের উদ্ধার কর, এবং আপনার হইতে এমন লোকের প্রকাশ কর, যাহারা আমাদের রক্ষা করিবে ও সাহায্য করিবে।' (বস্তুতঃ) যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা ভগবৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধ করে, এবং যাহারা (ভগবৎসত্তায়) অবিশ্বাসী, তাহারা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। বস্তুতঃ শয়তানের সকল চতুরতাই দুর্ব্বল।"

কোরানে এইরূপ আরো অনেক আয়াৎ রহিয়াছে, যাহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু ইহা কখনও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধ করিতে বলে নাই এবং অন্যায়ের গতি ব্যাহত হইলেই যুদ্ধবিরতি করিতে উপদেশ দিয়াছে। যাহারা কেবল ভগবানে স্থির-বিশ্বাসী, তাহারাই এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরানের ২য় অধ্যায়ের ১৯৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "...বিবাদ ও অত্যাচার বিরতি না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধে রত থাক, কারণ ভগবদ্-ধর্ম্মের জয় নিশ্চিত। কিন্তু যখন তাহারা (শত্রুতা হইতে) বিরত হইবে, তখন আর তাহাদের প্রতি কোন শত্রুতা নাই, কেবল যাহারা অত্যাচারী (তাহাদের প্রতিই তোমার বিরোধ)

যদিও কোরান অত্যাচারী ও ভগবৎ-অবিশ্বাসী-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছে, কিন্তু ইহা কখনই তাহাদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের নির্দ্দেশ দেয় নাই—কেবল অবিশ্বাসীদের ভগবদ্-ধর্ম্মে আস্থা আনিবার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ্ বা ধর্ম্মযুদ্ধের নির্দ্দেশ দিয়াছে। বরং বলা যাইতে পারে যে কোরানে ভগবদ্‌বিশ্বাসীগণকে অবিশ্বাসী ও অত্যাচারীদের ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অবিশ্বাসীদের প্রতি ভগবদ্-বিশ্বাসীদের কোন শত্রুতা নাই, ধর্ম্মের জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা—ইহা কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহে। যাহারা ভগবদ্-ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, তাহারা প্রকৃতই অজ্ঞান; তাহাদের জ্ঞানের বিকাশের জন্য সততই চেষ্টা করা দরকার। এই চেষ্টার মধ্যে কোন শত্রুতা থাকিতে পারে না। কোরানে (৯ ; ৬) নির্দ্দেশিত হইয়াছে, "যদি কোন মুশ্‌রিক্ (অর্থাৎ ভগবানই যে একমাত্র প্রভু ইহা যে বিশ্বাস করে না, এবং ইহার সহিত আরো শক্তিমান দেবতার সম্বন্ধ নিয়োগ করে) তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দান করিবে, যাহাতে সে ভগবৎকথা শুনিবার সুযোগ পায়। তৎপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। এইজন্যই ইহা করিবে যে তাহারা (নিতান্তই) অজ্ঞান।"

ভগবানের জন্য নিজেকে বিসর্জ্জন দেওয়াই ইসলামের মূল আদর্শ; এবং সেই মূল আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টাকেই বলা যাইতে পারে জিহাদ্-উল-অক্‌বর্ (বা শ্রেষ্ঠ বা মহান উদ্যম)। যে ব্যক্তি সেই শ্রেষ্ঠ উদ্যম বা প্রকৃত ধর্ম্মযুদ্ধ নিয়া ব্যাপৃত, সেই বাস্তবিক মহান। ইসলাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোরানে (৬; ১৬২-১৬৩) বর্ণিত হইয়াছে, "(হে পয়গম্বর্) বল যে, বস্তুতঃ আমার প্রার্থনা ও সমুদয় ভক্তি-শ্রদ্ধা, ও জীবন-মরণ সকলই ভগবানের জন্যই, যিনি বিশ্ব-জগতের পালনকর্ত্তা—তাঁহার কোন অংশীদার

নাই। আমি এইরূপই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। (কাজে কাজেই) আমিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নিকট উৎসর্গীকৃত (ব অনাঅব্বলু অল্ মুস্লিমীন)।” অন্য আর দুইটি আয়াতে (৩৯ ; ১১-১২) বর্ণিত হইয়াছে, “(হে পয়গম্বর), বল যে, আমি তাঁহাকে (ভগবানকে) সম্পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং তাঁহার নিকট নিজকে উৎসর্গ করিতে সর্ব্বপ্রথম আদিষ্ট হইয়াছি।”

কোরানের নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা কেবল মুখে আবৃত্তি করিয়া যাওয়ার জন্য নহে, ইহার গূঢ় রহস্য মনে প্রাণে অনুধাবন করিতে হইবে এবং সেই মতে কাজ করিতে হইবে। কোরানের নামাজ বা প্রার্থনার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে বিখ্যাত মসন্বী-প্রণেতা মৌলানা রূমী তাঁহার কাব্যগ্রন্থে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। (মসন্বী একটি ফারসী কাব্যগ্রন্থ এবং ইহাকে অনেক সময় ফারসী ভাষার কোরান বলিয়া অভিহিত করা হয়)। কবিবর গাহিয়াছেন—

চুন্‌কি বা তক্‌বীর্‌হা মক্‌রূন্ শুদন্দ্ ;
হম্‌চু কুর্‌বান্ অজ্‌জহান্ বীরূন্ শুদন্দ্।
ম'নী-ই-তক্‌বীর ইনস্ত্ অয় ইমাম্ ;
কায় খুদা পীশ্-ই-তু মা কুর্‌বান্ শুদীম্।
বক্ত্-ই-জবহ্ আল্লা আকবর্ মী কুনী ;
হম্‌চুনীন্ দর্ জবহ্-ই-নফ্‌স্ কুশ্‌তনী।
তন্ চু ইস্‌মা'ইল্ ব জান্ হম্‌চুন্ খলীল্ ;
করদ্ জান্ তক্‌বীর্ বর্ জিস্‌ম্-ই-নবীল্।
গুশ্‌ৎ কুশ্‌ত তন্ জ শহ্‌বৎ হা ব আজ্ ;
শুদ্ ব-বিস্‌মিল্লা বিসমিল্ দর্ নমাজ্।

—যখন তাঁহারা (অর্থাৎ প্রকৃত ভক্ত বা মুসলিম) তক্‌বীর্ সকলের সহিত যুক্ত হইলেন (নামাজ বা প্রার্থনায় ব্রতী হইলেন) ; তাঁহারা উৎসর্গের ন্যায় এই পৃথিবী হইতে (অর্থাৎ এই পৃথিবীর পার্থিব সংস্রব হইতে) পৃথক হইয়া গেলেন। হে ইমাম (ভগবদ্-বিশ্বাসী), তক্‌বীর্ (=নমাজে বার বার 'আল্লা আকবর্' বা ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, এই মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম তক্‌বীর) এর প্রকৃত অর্থ এই যে, হে ভগবান, আমরা তোমার নিকট উৎসর্গীকৃত হইয়াছি। কোন (প্রাণী) জবাহ্ বা উৎসর্গের সময়, তুমি যেরূপ, আল্লা অক্‌বর্ (ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার প্রবৃত্তিও উৎসর্গ করা উচিত। (বস্তুতঃ) এই দেহ ইসমাইলের ন্যায় এবং আত্মা খলীল্ (বা ভগবদ্বন্ধু ইব্রাহীম্) স্বরূপ ; এই আত্মা পবিত্র দেহের উপর তক্‌বীর উচ্চারণ করিয়াছে (অর্থাৎ দেহকে বা দৈহিক প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন করিয়াছে)। কাম ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, (এখন) নমাজের সময় বিসমিল্লা (অর্থাৎ ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই মন্ত্রে মুসলমানদের সকল প্রার্থনা বা যে কোন কাজ আরম্ভ করা হয়), মন্ত্র উচ্চারণে ইহা (দেহ) উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।”

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ইসলামের গূঢ় রহস্য হইল সকল পার্থিব সংস্রব এবং দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তিসমূহ ভগবানের সম্মুখে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। উল্লিখিত খলীল্-ই-আল্লা (ভগবদ্বন্ধু) ইব্রাহীমের কাহিনী কোরানে (৩৭ সূরা বা অধ্যায়ে) বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—কথিত আছে যে ভগবানের নিকট হইতে একজন সৎ ও ধৈর্য্যশীল পুত্র প্রার্থনা করায়, ইব্রাহীম তাঁহার নিকট হইতে ইসমাইল নামক সর্ব্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র লাভ করেন। ইসমাইল যৌবনে উপনীত হইবার পর একরাত্রে ইব্রাহীম স্বপ্নে ভগবৎ-উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রিয় পুত্রকে বলি দিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। পিতা পুত্রকে স্বপ্নাদিষ্ট এই বিষয়ের কথা বলিলেন, এবং তাঁহার একান্ত বাধ্য পুত্র সাগ্রহে বলিপ্রদত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন। “সুতরাং তাঁহারা উভয়েই

যখন আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত হইলেন, এবং তিনি যখন তাঁহার পুত্রের মস্তক (বলিপ্রদানের জন্য) অবনত করাইলেন, আমরা (ভগবান) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্রাহীম্, তুমি বহু পূর্ব্বেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ,'—আমরা এই রূপেই যাহারা সত্যান্বেষী তাহাদের পুরস্কৃত করিয়া থাকি।" এই কাহিনী সত্যই আদর্শ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ। বাস্তবিক কখনও ভগবান কাহারো নিকট প্রাণবধ ও রক্তের দাবী করিতে পারেন না। ইব্রাহীমের ন্যায় যে আত্মা, তাঁহার পুত্রতুল্য দেহ ও দৈহিক প্রবৃত্তিকে ভগবানের নিকট বিলাইয়া দিতে পারেন, তিনিই আদর্শ মুস্লিম্।

এই ইসলাম বা আত্মোৎসর্গরূপ ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র পন্থা, ইহা ছাড়া আর কোন ধর্ম্মই থাকিতে পারে না। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র শক্তিকে সেই পরমশক্তিশালী আল্লা বা ভগবানের নিকট বিলাইয়া দিবার যে অদম্য চেষ্টা, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই ধর্ম্মের প্রতি আস্থা প্রকাশ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে, ইহা এক পরম সনাতন ধর্ম্ম। কোরানে (৪৯ ; ১৭) বর্ণিত হইয়াছে, "(হে পয়ঘম্বর্), সাধারণ মানব মনে করিয়া থাকে যে ইসলাম বা আত্মোৎসর্গরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে ; তুমি তাহাদিগকে বল যে তোমাদের আত্মোৎসর্গ (বাস্তবিক) আমার (পয়ঘম্বরের) উপর কোন অনুগ্রহ নহে। (ইহা নিজেদেরই আত্মার উৎকর্ষ সাধন জনিত)। তোমরা যদি প্রকৃতই সৎ ও অকপট হও, তাহা হইলে ভগবান তোমাদের এই (ভগবদ্-)বিশ্বাসের পথ দেখাইয়া মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বস্তুতঃ ভগবান পৃথিবী ও স্বর্গের সকল গূঢ় রহস্য অবগত আছেন ; এবং তোমাদের সকল কার্য্যকলাপই তিনি দেখিতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীভ্রামরী রায়, বি-এ

অন্ধকার রাত্রিশেষে জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের মতো
এলে তুমি এ ধরার মোহমুগ্ধ নরগণে দিতে
যে অমৃতলোকের সন্ধান, ভুলেছিল তার কথা
বহুদিন অজ্ঞান মানব। আনো নাই সঙ্গে তব
ঐশ্বর্য্যের বিপুল সম্ভার ; রাজরাজেশ্বর এলে
দরিদ্রের ধূলিভরা কুটীর প্রাঙ্গণে, ওষ্ঠে নিয়ে
মৃদু হাসি, কণ্ঠে শুধু করুণার সুধামাখা বাণী।
করিলে কঠোর তপ জাহ্নবীর তীরে দীর্ঘদিন,
দেখালে জগতে দেব, যেথা ধর্ম্ম লয়ে সদাচলে
হানাহানি, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—স্বপ্নের অতীত।
শুচিতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ যে তুমি, হে বৈরাগী,
সমভাবে হেরেছিলে ধরণীর কাঞ্চন-মৃত্তিকা,
ভেদাভেদ মানে নাই তব প্রেমস্রোত, তাই বুঝি
হে সাধক, জগন্মাতা স্নেহডোরে বাঁধা তব পাশে।
তব পাদপীঠতলে আসে দেশ দেশান্তর হতে
কত নরনারী, গাঁথি লয়ে ভক্তিপুষ্পমালা ; সেই
মাল্য সাথে লহ প্রভু, অক্ষমার ক্ষুদ্র এ প্রণতি।
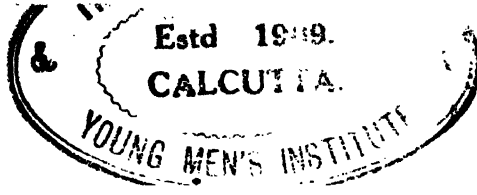
সিদ্ধা জালন্দর নাথ ও রাজা গোপীচাঁদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

নাথযোগী জালন্দর নাথের নামান্তর হাড়িফা নাথ। ইনি বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের দীক্ষাগুরু। তাঁহার সময় ১১শ-১২শ খৃঃ অব্দ। ঢাকা মিউজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনেক প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লার নিকটে যে ময়নামতী লালমাই পাহাড় এখনও দণ্ডায়মান আছে, সেখানেই রাজা গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল। আলোচনাপ্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় বলেন—"নাথসাহিত্যের হাড়িপার শিষ্য ষোলবঙ্গ বা ষোলদণ্ড বা মেহারকুলের রাজা সর্ব্বভারতগীতকীর্ত্তি গোপীচাঁদ এবং বঙ্গাল রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ থাকা উচিত নহে। * * * গোপীচাঁদের রাজ্য যে মূলতঃ মেহারকুল পাটিকারায় ছিল এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকা উচিত নহে। কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়, তাহার উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর টীলা। * * * ময়নামতীর পশ্চিম দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকারা, সমস্ত পূর্ব্বদিক জুড়িয়া মেহারকুল পরগণা। খৃষ্টাব্দের ৯ম-১২শ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে পাটিকারা বিখ্যাত নগর ছিল। * * * ময়নামতীর টীলাটি মেহারকুল পরগণায় অবস্থিত। * * * ময়নামতীর টীলার উপর ত্রিপুরার মহারাজার বাংলা। উহার কিছু নীচেই একটি গুহার মুখের মত দরজা দেখা যাইত। ১৩৩০ সনে এই স্থান ত্রিপুরার মহারাজার আদেশে খনিত হয়। ফলে মাটীর নীচ হইতে একটি পাকা গোফা বাহির হয়। উহাতে এক এক জন বসিয়া ধ্যান করিবার উপযুক্ত পাঁচটি ছোট ছোট কুঠরী ছিল। হাড়িফার গোফার কথা স্মরণীয়" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৭০ পৃঃ)। এখানে বসিয়া হাড়িফানাথ যোগ সাধন করিতেন। জলপানের ইচ্ছা হইলে হাড়িফা মন্ত্র আওড়াইতেন, ফলে গাছের কচি নারিকেল গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত।[১] কেহ কেহ বলেন হাড়িফা সিন্ধুদেশের লোক। তিনি যোগবলে অদ্ভুত বিভূতি দেখাইয়া লোকজনকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলিতেন। একবার অবন্তীদেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক হাজার ছাগকে হাড়িফা মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত করিয়াছিলেন।[২] গোপীচাঁদের মাতার নাম ময়নামতী। তাঁহার নামানুসারে পাহাড়ের নাম ময়নামতী হইয়াছে। যে সময়ের কথা সে সময় পরমার্থের জন্য রাজ্য ধন সম্পদ ছাড়িয়া বনাশ্রমে যাইবার এক মহাধুম পড়িয়া গিয়াছিল। অবিশ্বাসীর দল ইহাকে জাতীয় জীবনের অবসাদ বলিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থের জন্য বিষয় বিসর্জন দেওয়া এই ভারতের মাটীতে অভিনব কিছু নহে। ময়নামতী পুত্রের সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্রের বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। রাজ্যসুখ রাজসম্মান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে যাইবার জন্য তিনি নিজ পুত্র গোপীচাঁদকে উপদেশ দিতেছেন—

১ J. R. A. S. B., pt. I. 1898, Page 20
২ Do

"শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যুগে কর মন।
বরাহ্মণ গ্যান সাদ যুগী হইবার॥
বরাহ্মণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ।
জিয়া থাক গোবিচাঁদ নাথে দেউক বর॥"
(ময়নামতীর গান—ভবানী দাস)[৩]

"মায়াজাল বিশম জাল জম রাজার থানা।
গ্রিহেতে থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা॥
* * *
ছাড় বাছা রাজ্যপাট মুখে মাখ ছাই।
মা'এ পুতে যুগি হৈয়া চাইর যুগ্য বেড়াই॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১ পৃঃ)

পরমার্থের জন্য বিষয় বিসর্জন দেওয়ার উপদেশ শুনিয়া রাজা গোপীচাঁদ মাতা ময়নামতীকে বলিতেছেন—

"আরের মা'এ বাটা চাহে রাখিবারে ঘর।
তুমি মা'এ কহ মোরে যুগী হইবার॥
আর মা'এ পুত দেখি দুগ্ধ ভাত খাওাএ।
নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোয়াএ॥
তুহ্মি মা'এ হিয়াখানি পাতারে বান্দিয়া
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হই[illegible]
নিত্য প্রতি কহ মোরে যুগী হইবার
কোন জুগীর সহিতে মা'ও কহ যাইবার
হেন গ্যান পাইলে আহ্মি যুগী হইয়া যাই
(ময়নামতীর গান—ভবানী দাস)।"

"এতেক যুনিঞা রাজা কহে মা'এর ঠাঞি।
নিশ্চয় এ হইব যুগি মোনে কিছু নাঞি॥
চারি রানির আগে আমি বিদাএ হৈয়া আশি।
কালিকা বেহানে আমি হইব শন্ন্যাসি॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১পৃঃ)

রাজা সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এ সংবাদ পাইয়া—

"যুনিয়া খেতুর কথা চারি রানি কান্দে।
বশএ না শন্তরে রানি কেঁশ নাহি বান্ধে॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩২পৃঃ)

রাজাকে সংকল্পচ্যুত করার জন্য চারি রাণী সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সুফল কিছুই ফলিল না। মাতার আদেশে রাজা গোপীচাঁদ নাথযোগী হাড়িফা বা জালন্দরের নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাণীদিগকে বলিতেছেন—

"মায়া দুর কর রানি না বৈশ মোর কাছে।
নিশ্চএ হইব যুগী যাইব শন্যাশে॥
এ যুক শম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ।
চিত্যবান্ধা আছে মোর হাড়িফার পাএ॥
হাড়িফার চরণে আমার মোন আছে বান্ধা।
রাজ্য পাট নারি পুরি শব মিথ্যা ধান্ধা॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪২পৃঃ)

রাজাকে কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত করার উপায় নাই দেখিয়া—

"কান্দে কান্দে চারি রানি বিরহে আনলে।
বসন ভিতিল রানির নয়ানের জলে॥
কান্দে কান্দে চারি রানি হইয়া কাপর।
যুক্তি বিচারিল রানি মোনের ভিতর॥
চারি রানি বোলে আমরা কান্দি অকারন।
হাড়িফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে রাজন॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪২পৃঃ)

অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর রাণীরা স্থির করিলেন—

"হাড়িফাক মারিব বিশ করায়া ভোজন।"

তৎপর—

"এতেক ভাবিয়া রানি মহলে ত গেলা।
খেতু খেতু করি রানি ডাকিতে লাগিলা॥

৩ ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের পাঠ্য ছিল।

রানি বোলে খেতু বাছা শতো মুদ্রা নেও।
একশতো তক্কার বিশ আনিঞা দিতে চাও॥"

রাণীদের আদেশ পাইয়া—

"শতো মুদ্রা নৈঞা খেতু করিল গমন।
বাজার দক্ষিণে গেল বিশের কারণ॥

*   *   *

দুই ঘড়া বিশ খেতু নৈল দুই হাতে।
বিশ আনি দিল খেতু রানির সাক্ষাতে॥"

তৎপর—

"রানি বোলে খেতু বাছা শিগ্রি করি জাও।
হাড়িফার তরে জায়া আমন্ত্র্য দেও॥
এতেক সুণিয়া খেতু করিল গমন।
হাড়িফার নিকটে জায়া দিল দরশন॥
গলে বশন দিয়া খেতু প্রণাম করিল।
হস্তজোড় করি খেতু শাক্ষাতে রহিল॥
হাড়িফা বোলেন খেতু রাজার নফর।
কি কার্য্যে আইলে বাছা কহত খবর॥
খেতু বোলে গোশাঞি কি বলিব আমি।
যে কার্য্যে পাঠাইল রানি সকল জান তুমি।
হাড়িফা বোলেন খেতু আমি দিলাম বর।
ম্রিকুল শহরে তুমি হইবে ঈশ্বর॥
চারি রানিকে কহ গিয়া করিতে রন্ধন।
শতো তক্কার বিশ আমি করিব ভোজন॥
দ্বাদশ বছ্যহর আমি নাই খাই ভাত।
ভোজন করিতে আমার মোনে আছে শাদ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৩পৃঃ)

এদিকে রাজরাণীরা বিষ মিশ্রিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করিলেন এবং ভাবিলেন এসব খাইলে যোগেশ্বর হাড়িফা নিশ্চয়ই মারা যাইবেন। ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইয়াছেন, এমন সময়—

"শেইক্ষণে আইল হাড়ি করিতে ভোজন।"

রাণীরা আহারের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—

"অন্ন বেঞ্জন দিল রানি ভরি শোণার থাল।
একবারে মুখে দিল না ভরিল গাল॥

*   *   *

অন্ন দিতে নারে রানি হইল ফাপোর॥"

আহারাদির পর—

"মিথ্যা মরনে হাড়ি ঢলিয়া পড়িল॥

*   *   *

দেখিয়া আনন্দ হইল রানি চারিজনে॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৪ পৃঃ)

তৎপর সিদ্ধা হাড়িফা নাথের মৃতদেহ গঙ্গায় নিয়া দাহ করার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু অগ্নিতে যোগেশ্বরের দেহ ভস্ম হইল না দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে দেহ গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল—

"ঠেলা দিয়া হাড়িফাক গঙ্গাতে ফেলিল।

*   *   *

এহিরূপে ভাশে হাড়ি জলের উপর।
এহি সে কারনে হাড়ির নাম জলন্ধর॥[৪]

*   *   *

হাড়িফার মরণ দেখি চারি রানি হাশে।
মরা শরিরে হাড়ি জলের উপর ভাশে॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

তারপর—

"শিদ্ধিজল খায়া হাড়ির আনন্দ হইল।

৪ পাঞ্জাবের জালন্ধর জিলা এবং জালন্ধর শহর প্রসিদ্ধ। যোগী জালন্ধরের নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথবা ঐ স্থানে তাঁহার আসন ছিল বা তিনি জলন্ধর মুদ্রা করিতেন বলিয়া তাঁহার অন্য নাম জালন্ধর হইয়া থাকিবে। এখানে দেখিতেছি মৃত শরীরে জলে ভাসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম জালন্ধর হইয়াছে। জলন্ধর শব্দের অন্য অর্থ মেঘ, সমুদ্র। কণ্ঠ সংকোচ করিয়া প্রাণবায়ুর গতিরোধ করাকে জালন্ধর মুদ্রা কহে।

ফুলবাড়ীতে জায়া হাড়ি ধ্যানেত বশিল ॥
জোগ আশোনে নাথ বসিল গোফাতে।"

এমন সময়—

"ফুল তুলিতে গেলো রানি ফুল তলাতে।
দেখে হাড়ি বশি আছে আপোন গোফাতে ॥

*   *   *

"বিশপান করি হাড়ির না হল মরণ।
না জানি মনশ্ব রূপে আছে কুন জন ॥"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৪-৪৫ পৃঃ)

রাজরাণীদের সকল গোপন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এদিকে রাজমাতা ময়নামতী—

"পুত্র যুগি করিবেন মএনামত্তি রাই ॥
নাপিত আনিঞা রাজার মস্তক মুড়িল।
গলে কেথা দিয়া মুখে ভূশজ চড়াইল ॥
বগলে বগলি[৫] দিল শিঙ্গনাদ গলে।
রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরাইল কপালে ॥
চকমকি পাথর দিল বটুয়া[৬] আর্দ্ধারি[৭]।
ঘোর মেখিলি[৮] আর বোজশের খাপুরী[৯] ॥
গলাএ পরাইতে দিল উদ্রাক্ষের[১০] মালা।
কটিতে পরাইতে দিল জোগবস্ত্র ছালা[১১] ॥
কম্বুচ বিপ্র শন দিল দ্বাদশ দিল হাতে।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃঃ)

হাজার হাজার লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা রাজা গোপীচাঁদকে এভাবে যোগী রূপে সাজাইয়া রাজমাতা ময়নামতী বেশ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। যোগী-রূপে রাজা গোপীচাঁদ—

"গুরু শেবিতে জাএ রাজা মাও মুনির[১২] শাথে ॥
আগে জাএ মএনামত্তি পাছে জাএ রাজা।
দেখিয়া হাহাক্যার করে ত্রিকুলের প্রজা ॥"

এ ভাবে—

"জেথানে হাড়িফা সির্দ্ধা আছিল বশিয়া।
শেহিখানে গেলো মুনি পুত্র শঙ্গে নৈঞা ॥
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলে বশন দিয়া নাথের শাক্ষাতে রহিল ॥
হাড়িফা দেখিল জদি রাজার বদন।
যুগিরূপে দেখি বোলে না হবে মরণ ॥
মুনি বোলে শুন গুরু হাড়িফা জলন্ধর।
আজ হৈতে পুত্র হইল তোমার কিঙ্কর ॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি।
এতেক বলিয়া হশতে শম্পিল মাও মুনি ॥
হাড়িফা বোলেন মুনি থাক বার মাস[১৩]।
গুপিচন্দ্রক নৈঞা আমি করিগা শন্ন্যাশ ॥
এতেক বলিয়া শির্দ্ধা আশোন তুলিল।
শিঙ্গনাদ পুরিয়া হাড়ি জাত্রা করিল ॥
মা'এর চরণে রাজা হইয়া বিদাএ।
শন্ন্যাশ হইতে রাজা গুরুর শঙ্গে জাএ ॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা জাএ বোন পথে।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃঃ)

যে বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র, শত শত দাসদাসী যাঁহার পরিচর্যা করিত, এইরূপ নানাবিধ সুখ সম্পদের যিনি অধিকারী ছিলেন, সেই রাজা গোপীচাঁদ প্রজাসাধারণ ও আত্মীয়-স্বজনগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বীয় গুরু নাথ-যোগী হাড়িফা বা জলন্দর নাথের সহিত ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া যোগাভ্যাস করার জন্য স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করত বন গমন করেন এবং অকথিত ক্লেশ সহ্য করিয়া গুরুকৃপায়—

"জোগ আসোন করি রাজা মোহাজন হৈল ॥

৫ কাপড়ের ছোট থলি। ৬ ঝুলি বা থলি। ৭ পাত্র-বিশেষ। ৮ কালবর্ণের কটিসূত্র। ৯ লাউএর খোলের ভিক্ষাপাত্র। ১০ রুদ্রাক্ষের। ১১ চর্ম। ১২ গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে ময়নামতীর অন্য নাম মুনি। মাও মুনির—মাতা ময়নামতীর।

১৩ বার মাস পর গোপীচন্দ্র আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

যোগান্ত বেদান্ত ভেদ সরির বিচার।
মুষুমুলা[১৪] ভেদিয়া রাজা কায়া কৈল সার॥
সপ্ত চক্র ভেদে আর সপ্ত চক্র * * *।
চৌর্দ্ধভুবন[১৫] ভেটে আর খিড়কি দুয়ার॥
চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অথ[১৬] তুড়ে বন্দ।
তিনি তিহড়ি[১৭] ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ॥
আপ্ত উস্তি দিয়া বন্দ দশমিত[১৮] দিল তালি।
গগন মন্দিরে ঘুয়া[১৯] করে গাভুরালি॥
ভোমর কোঠা[২০] ভেটিয়া তথা
শ্রীকলার হাট[২১]।
পূর্ব্ব পশ্চিম[২২] ভেটিয়া তথা নাগাইল কপাট॥
উত্যর দক্ষিণ ভেটে হেমন্ত বশন্ত।
বারো কালা[২৩] ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ॥
শোলাকাল ভেটিল আর কায়া শরবর।
তিনকালা ভেটিয়া মোন কৈল একাশ্তর॥

১৪ সুষুম্না ১৫ দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন। ১৬ অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত ষট্চক্রের কমলগুলির দলসমূহ। ১৭ ত্রিপুরী। ১৮ দেহ-নবদ্বার। ১৯ কুণ্ডলিনী শক্তি। ২০ ব্রহ্মপুর। ২১ মীন-চেতনে শ্রীগোল্লার হাট বলা হইয়াছে। ২২ দেহের মধ্যে পূর্বাদি দিক এবং ষড় ঋতু আছে। ২৩ কলা।

আপ্ত নাম ভেটিয়া তিথের্থ্য কৈল থানা।
একে একে ভেদিল রাজা অঙ্গের পঞ্চ জনা[২৪]॥
পিতার মেদ রসবিন্দু জননির শঙ্গ।
ভেদিল সকল তৎপ্রিথিবির রঙ্গ॥
উজানি বাহিয়া জাএ কামারশালা ঠামে[২৫]।
ভঙ্গ দিল জরা ম্রির্ত্ত দুষ্টকাল জমে॥
নিজনাম শাধিল রাজা গুরুর শাক্ষাতে।
অঘোর[২৬] পড়িল রাজার মরণের পথে॥
নিকটে আছিল জতো মরণের ভএ।
ম্রির্ত্ত পথ দুরে গেলো রিপু হৈল খ্যএ॥"
—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৫-৫৬ পৃঃ)[২৭]

২৪ পঞ্চতত্ত্ব। ২৫ সহস্রার। ২৬ আগড়, অর্গল। ২৭ ১৩২০, ২৫শে মাঘ তারিখে দিনাজপুর জেলার বালুর ঘাট মহকুমার ফকগুা গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ী হইতে অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী কর্তৃক গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সংগৃহীত হইয়াছে। তৎপর তাঁহার সম্পাদকতায় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্যয়ে ১৩৩২ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলীর ৯ নম্বর পুস্তক। আবদুল সুকুর মহম্মদ কর্তৃক ইহা রচিত। ইহা চারি পাঁচশত বৎসর পূর্বের লেখা বলিয়া মনে হয়।

আচার্যদেব-স্মরণে

(আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের বার্তা পাইবার অব্যবহিত পরে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্তদর্শন ক্লাশের শিক্ষার্থিগণ এই ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বামীজীর গুরু-ভ্রাতৃগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।)

অনুবাদক শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

আমাদের পরমপূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ এই মাত্র শ্রবণ করিয়া আমরা গভীর শোকাচ্ছন্ন ও মর্মাহত হইয়াছি। আচার্যদেব গত ৪ঠা জুলাই (১৯০২ খৃঃ) জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। আমাদের আচার্যদেব তদীয় মহান্ গুরু ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদানুসরণ করিয়াছেন। প্রেমাস্পদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ সুমধুর কথা লিখিয়াছেন, এরূপ আর কেহ কখনও লিখেন নাই। তিনি তাঁহার গুরুদেবকে যেরূপ ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, আমরাও আমাদের আচার্যদেবকে তদ্রূপ ভক্তি করিব ও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিব।

যুগে যুগে যে সকল লোকোত্তর মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় ছিলেন। তিনি বর্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উপযোগী হইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তিনি অভিন্নাত্মা ছিলেন। তাঁহাকে প্রাচীন ও আধুনিক সকল ধর্ম ও দর্শনের প্রতিনিধি বলা যায়। আচার্য বিবেকানন্দের উচ্চ ভাবধারা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত ও স্পন্দিত করিয়াছে—উহা অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। সকল জীব ও সকল ধর্মমতকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার চরিত্রে খৃষ্টের তিতিক্ষা এবং দীপ্তিমান সূর্য ও বায়ুর বদান্যতা বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সহিত বালক, ভিক্ষুক, রাজপুত্র, ক্রীতদাস, চণ্ডাল সকলেই সমভাবে বাক্যালাপ করিতে পারিত। তিনি বলিতেন, "ইঁহারা সকলেই একপরিবারভুক্ত, ইঁহাদের সকলের মধ্যে আমি আছি এবং ইঁহারাও আমার মধ্যে আছেন, আমি দেখিতে পাই। সমগ্র জগৎ এক পরিবারভুক্ত এবং ব্রহ্ম ইহার আদি কারণ।"

প্রকৃতিদেবী আচার্যদেবের দেহখানিকে সৌন্দর্য-দেবতা এপলোর অঙ্গকান্তির ন্যায় সুদর্শন করিয়া নির্মাণ করিলেও ভিতরের বিপুল ইচ্ছা-শক্তির বেগ ও বাহিরের অত্যাবশ্যক কর্তব্যের আহ্বান-জনিত অপক্ষয় প্রতিরোধ করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করেন নাই। কারণ জগৎ তাঁহার শুভাবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং তিনি জগতের সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই সুদূর বিদেশ আমেরিকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবে আগমন করিয়া বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুগভীর আধ্যাত্মিকতা, ধর্মজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব বাগ্মিতা দ্বারা শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিলেন—এই সকল দুরূহ কার্যসম্পাদন তাঁহার ন্যায় একজন যুবকের পক্ষে বড়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত আর কেহই কখনও জয়যুক্ত হইতে পারেন নাই। অপর কোনও ধর্মমত এরূপ গৌরব ও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; আর কেহই এরূপ মহতী বার্তা প্রচার করেন নাই। আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। যখন তিনি সগৌরবে ডিট্রয়েটের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দের বিদ্যাবুদ্ধির তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বালকসদৃশ।" এই মহান্ হিন্দু সন্ন্যাসী প্রবল বাত্যার ন্যায় (Great Hindoo Cyclone) পৃথিবী তোলপাড় করিয়াছেন। কোনও ভাষা, জাতি ও দেশ তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল সমগ্র জগৎ। তাঁহার কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তিনি এখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তিনি যখন লোককল্যাণ সাধনের জন্য পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, তখন যেন তাঁহার পরিচিত আমরা সেই সময়ে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামীজীকে দর্শন করিবার ও জানিবার পরম সৌভাগ্য ও সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মহাপ্রস্থানের শোকসংবাদ আমাদিগকে গভীরভাবে মুহ্যমান করিয়াছে। অনেক খৃষ্টান ভক্তের নিকট প্রভু যীশু যেরূপ প্রিয় ও পূজ্য, স্বামীজীও আমাদের নিকট তদ্রূপ প্রিয় ও পূজ্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ব্যাধির করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি যদিও এখন আর

আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে বর্তমান নাই, তথাপি তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠতরভাবে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমরা মনে করি, জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এবং তাঁহার দিব্য সঙ্গের মধুময় প্রভাব অনুভব করিতে পারিয়া আমরা অতীব ধন্য হইয়াছি। হে আমাদের প্রিয়তম স্বামীজী, তোমার অনন্ত ও শাশ্বত সুখই আমাদের মন্ত্র হউক।

যাঁহার আনন্দপূর্ণ হাস্য, সুমধুর বাক্য এবং সবিনয় সম্ভাষণ তাঁহার উপস্থিতিকে সদা মধুময় করিয়া তুলিত সেই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে আমাদের আরব্ধ কার্য একজন মহত্তম ও প্রিয়তম নায়কের অভাব বোধ করিতেছে। দেব ও মানবের সদ্‌গুণ-বিমণ্ডিত অনুপম ব্যক্তিত্ব লইয়া যিনি জগদ্ধিতায় নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম, চরিত্র ও স্মৃতি তাঁহার অনুগামিগণের নিকট প্রেরণা ও আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে।

হে আচার্যদেব,—শান্তি বিদায়!

প্রাগুক্ত বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে (১) আমাদের মহান্ নেতা ও আচার্য আমাদের মধ্য হইতে কেন এত অকস্মাৎ অপ্রকট হইলেন উহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে না পারিলেও আমরা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভক্তি-বিনম্র চিত্তে মানিয়া লইতেছি, কারণ তাঁহার বিধান অভ্রান্ত এবং করুণা অপরিসীম। (২) আমাদের পূজনীয় আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণরহস্য প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে অসমর্থ হইলেও পরমাত্মার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিচলিত আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণ এই আকস্মিক বিপৎপাতে শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রয়োজনানুরূপ ও যথোপযুক্ত সান্ত্বনা ও স্থৈর্য লাভ করিবেন। (৩) আচার্যদেবের প্রতি আমাদের এই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি বেদান্তদর্শন ক্লাশের অনুষ্ঠান-পত্রে লিপিবদ্ধ হউক এবং ইহার কতিপয় অনুলিপি বেলুড়মঠে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতৃগণের নিকট প্রেরিত হউক।

ভক্তিবিনম্রাবনত—
এন্ এইচ্ লোগেন—প্রেসিডেন্ট,
সি এফ্ পিটারসন্—ভাইস্-প্রেসিডেন্ট,
এ এস্ উলবার্গ—সেক্রেটারী,
সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো বেদান্তদর্শন ক্লাশ (ইউ এস্ এ)

সমালোচনা

চৈনিক ঋষি লাউৎজে (জীবনী ও উপদেশ)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা হইতে শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র ; পৃষ্ঠা ১২৯।

গ্রন্থকার ঋষি লাউৎজে সম্বন্ধে এই তথ্যবহুল বইখানি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চীন ও ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা মানবজাতিকে নিবৃত্তির পথ, শাশ্বত শান্তির পথ, অনাবিল আনন্দের পথ দেখাইয়াছে। লাউৎজে চৈনিক আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক। তাঁহার জীবনী ও বাণী অনুধাবন করিলে ভারতের অদ্বৈতসাধনার কথা মনে পড়ে। লাউৎজে-কৃত তাও-তে-কিং নামক গ্রন্থ জগদ্‌বিখ্যাত। এই বইখানি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাতে লাউৎজে তাও সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাও-তে-কিং তাওধর্মিগণের বেদ এবং চীনের প্রাচীনতম গ্রন্থ।

লাউৎজে-দর্শনের প্রধান তত্ত্ব তাও শব্দে নিহিত। ব্রহ্ম শব্দের ন্যায় তাও শব্দটিও ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করেন তাও-তে-কিং গ্রন্থে বৈদিক প্রভাব রহিয়াছে। ঋষি চোয়াং-জু তাও-তে-কিং-এর ভাষ্যকার তিনি বলেন, "যাঁহার সহিত যুক্ত হইলে আর সংসারে আগমন করিতে হয় না, তাহাই তাও। তাও-জ্ঞানী জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখকে দেহের পরিবর্তনরূপে জানিয়া তুচ্ছ করেন।" মোটের উপর ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও চৈনিক তাও-জ্ঞান সমপর্যায়।

ঋষি লাউৎজের অনেকগুলি অমূল্য উপদেশ বইখানিকে অত্যন্ত উপাদেয় করিয়াছে। গ্রন্থকার তাও-তে-কিং-এর শঙ্করপ্রতিম ভাষ্যকার ঋষি চোয়াং-জুর জীবনীও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চোয়াং-জুর প্রভাব চৈনিক সাহিত্যে পরিস্ফুট। লাউৎজের মত চোয়াং-জুও একজন সাধক ছিলেন; তাঁহাকে Tao-intoxicated বলা হয়।

পরিশিষ্টে গ্রন্থকার জেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে যাহা যোগ, বৌদ্ধধর্মে তাহাই জেন। তাই জেন 'বুদ্ধ-হৃদয়' নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোধিধর্ম নামে জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু এই জেন চীনদেশে প্রচার করেন।

বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকারের ভাষা যেমন সরল তেমি স্বচ্ছ ও সাবলীল। বইখানি একসঙ্গে উপন্যাসের মত পড়িয়া ফেলিতে হয়। কয়েকখানি ছবি ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রশংসা যেমন করিয়াছি তেমি একটু দোষদর্শন করিতেও বাধ্য হইলাম। বইখানিতে মুদ্রণপ্রমাদ অসংখ্য। তবে "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" বঙ্গভাষায় এই অভিনব পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইলে বঙ্গবাসী নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-কৌমুদী—ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র, এল্‌-এম্‌-এস্‌ প্রণীত। হাওড়া তিব্বতীবাবা বেদান্তাশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র; ১২২ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য বইখানিতে গ্রন্থকার শব্দব্রহ্ম, লক্ষ্মী, ভাগীরথী গঙ্গা, শক্তিতত্ত্ব, দুর্গাপূজা, রাসলীলা, দোললীলা প্রভৃতির তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। রামায়ণের সীতা, সুগ্রীব, হনুমান, ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সঙ্গে ইহাদের ঐতিহাসিকত্বের কতটুকু সামঞ্জস্য থাকিবে তাহা নির্ধারণ করিতে 'হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ'। বইখানির পাতায় পাতায় গ্রন্থকারের গভীর ধর্মভাব, অশ্রান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য—শ্রীঅরবিন্দ রচিত The Yoga and Its Objects গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। শ্রীঅনিল বরণ রায় কর্তৃক অনূদিত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা সমগ্র ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম স্বীকার করেন না। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন—"আমরা যে যোগসাধনা করি, ইহা শুধু আমাদের জন্যই নহে, ইহা বিশ্বমানবের জন্য। ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুক্তি নহে, যদিও মুক্তি যোগের একটী আবশ্যকীয় বিধান; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানবজাতির মুক্তি।"

আপনার মুক্তির জন্য ব্যাকুল না হয়ে বিশ্ব-মানবের শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করবার নির্দেশ নরেন্দ্রনাথকেও দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাই বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন মানবের উপযোগী করে উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। অধিকারী ভেদে পন্থাও

বিভিন্ন। এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের যোগের প্রক্রিয়া— "(১) আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প। (২) আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে আধার হইতে পৃথক করা। (৩) সর্বত্র সকল বস্তুতে এবং সকল ঘটনায় ভগবদ্-দর্শন, কর্মের ফল এবং কর্মটিকেও ভগবানে অর্পণ করিয়া দেওয়া এবং এইভাবে অজ্ঞান হইতে, অন্ধকার হইতে, দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া, যেন তুমি হও তোমার সত্তায় শুদ্ধ, মুক্ত, সিদ্ধ, আনন্দময়।" পদ্ধতি মহান্। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপমাটি মনে পড়ে—মা কোন ছেলের জন্ম রান্না করেন মাছের ঝোল, কারু জন্যে ঝাল, কারু জন্যে ভাজা, কারু জন্যে বা অম্বল। যার পেটে যা সয়।

"ভগবান যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই আমরা মুক্ত হইতে পারি।" তবে বিশ্বমানবের মুক্তিও তাঁর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। সমগ্র পুস্তকখানিতে এই বিশ্বাসের সুর রণিত। তবু কেন শ্রীঅরবিন্দের এই সাধনা? কারণ—'এখন সেই আদেশ আসিয়াছে।' বিশ্বমানবে 'খেলার পদ্ধতি' পরিবর্তন করবার আদেশ এসে পৌঁছেচে। এ নিয়ে বহু তর্ক চলতে পারে। বহু প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। বর্তমানের জন্ম শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট—এ শুধু শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত অনুভব।

শ্রীঅরবিন্দের মত ও পথ সম্বন্ধে আমাদের যতই মতের বিভিন্নতা থাক্, তাঁর সার্বজনীন উদার দৃষ্টি ও সুগভীর মানবপ্রেম আজকের যুগের আলোক-শিখার মতো মানবমনের আঁধার দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলবে। "মানবজাতির পবিত্রতা ও পূর্ণতা সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের শিক্ষা…ভগবানের নিকট পূর্ণ বশ্যতা, সমর্পণ ও সেবকত্ব সম্বন্ধে মহম্মদের শিক্ষা…পূর্ণ ভগবৎপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে চৈতন্যের শিক্ষা এবং সকল ধর্মের ঐক্য ও মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের শিক্ষা" আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বাইরের জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন অর্থনৈতিক বনিয়াদ্ স্থাপন প্রয়োজন সাম্যের ভিত্তিতে, অন্তরের জগতেও এই যুগদিশারীদের মন্ত্রে মানবাত্মাকে দীক্ষিত করতে হ'বে সাম্য ও সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে। তবেই মানবতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব।

অনুবাদক শ্রীঅনিলবরণ রায়ের অপরূপ অনুবাদ-নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য' মননশীল মানবকে গভীরভাবে সাড়া দেবে—এই আমাদের আশা।

শ্রী—

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেদান্ত সমিতি, উত্তর ক্যালিফর্নিয়া, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো—এই সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত মে মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন:

(১) "ভগবান বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ," (২) "আধ্যাত্মিক উন্নতির চারিটি প্রধান বিষয়," (৩) "ভগবান কি মানুষ অথবা মানুষ কি ভগবান হন?" (৪) "অনুভূতির অর্থ," (৫) "কেন তোমরা জন্মিয়াছ?" (৬) "দীক্ষা ও ধর্মসাধনা," (৭) "আমি চিরকাল ভগবানের আবাসে বাস করিব," (৮) "আমেরিকা কোন্ পথে?"

এতদ্ভিন্ন স্বামীজী প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সম্বন্ধে ক্লাস করিয়াছেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শ্যামলাতাল (আলমোড়া)—১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী —১৯১৪ সনে এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত। ইহা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১১ মাইল দূরে ৪৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রম-পরিচালিত হাসপাতালের ইন্‌ডোর বিভাগে ২১১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৬৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ২৫ জন অংশতঃ নিরাময় হইয়াছেন, ২০ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন

এবং ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আউটডোর বিভাগ হইতে ৮০০৮ জন রোগী ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৩৪১ জন নূতন রোগী ছিলেন।

পশু-চিকিৎসালয়ের ইনডোর বিভাগে ১৪টি পশু এবং আউটডোর বিভাগে ৪০৪৫টি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ৩,৭৮৩।৵৯½ পাই এবং মোট ব্যয় ১,৫৯৩।৬ পাই। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১,৩০৯৲ টাকা মূল্যের ঔষধাদি পাওয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল, হরিদ্বার—১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী—আলোচ্য বর্ষে এই সেবাশ্রমের ৪৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত হাসপাতালের ইন্‌ডোর বিভাগে ১০৬৪ জন রোগীর মধ্যে ৯৫০ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ৬৮ জন আংশিক চিকিৎসিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, ২৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং বর্ষশেষে ২২ জন চিকিৎসাধীন ছিলেন। আউটডোর বিভাগে ২৪,৩৫১ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে ১২,৪৮৯ জন নূতন রোগী ছিলেন।

সেবাশ্রম-পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে অনুন্নত শ্রেণীর ৪১ জন বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে।

সেবাশ্রমের পাঠাগারে ২৮৩২ খানা পুস্তক ও কয়েকখানা মাসিক ও দৈনিকপত্র, এবং রোগীদের পাঠাগারে ৮৫৪ খানা পুস্তক আছে। আলোচ্য বর্ষে ৩০৫৮ খানা পুস্তক পঠিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সেবাশ্রমে ১৩০০ জন দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হয়।

গত বৎসরের উদ্বৃত্তসহ এই বৎসরের মোট আয় ৫৯,৬০৯।৪ পাই এবং মোট ব্যয় ৩৬,৩৬৬।৮ পাই।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রথযাত্রা—গত ৫ই আষাঢ় রথযাত্রা দিবসে ভক্ত মনোমোহন মিত্র প্রবর্তিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রথযাত্রা কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এইদিন নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা হইতে একটি রথ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া সংকীর্তন ও বাদ্য সহকারে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান-মঠে নীত হয়। এই উপলক্ষে যোগোদ্যান মঠে ভজন কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। ১৩ই আষাঢ় পুনর্যাত্রা দিবসে রথখানা যোগোদ্যান হইতে শোভা-যাত্রা সহকারে পুনরায় ষষ্ঠীতলায় নেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সাধু-সম্মেলন—অক্ষয় তৃতীয়া রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত ১৯শে বৈশাখ হইতে দিবসত্রয় প্রবর্তক সংঘে সাধু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে পুরী গোবর্ধন মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য স্বামী শ্রীভারতী কৃষ্ণতীর্থ, শ্রীমৎ দক্ষিণা-মূর্তি স্বামী, স্বামী কৃষ্ণদেব আচার্য, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর গোস্বামী, শ্রীমৎ রাঘবদাস বাবাজী, স্বামী অনন্তাচার্য, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী, ব্রহ্মচারী শিশির কুমার, বেলুড় মঠের স্বামী অভয়ানন্দজী প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রবর্তক সংঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দুজাতির উন্নতি বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কুচবিহারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—স্থানীয় ধর্মসভার উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় হস্তিপৃষ্ঠে পরমহংসদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি এবং চারি প্রহর ব্যাপী নামকীর্তন ও রামনাম কীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ছয় হাজার নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৪ঠা ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় কুচবিহারাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে দুইটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে মহারাজ বাহাদুর ও বেলুড় মঠের স্বামী অভয়ানন্দজী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শেষ দিনের সভায় মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী এবং রংপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ও মনোজ্ঞ

বক্তৃতা দান করেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ একটি সভায় স্বামী অজয়ানন্দজী একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী এবং স্বামী অভীষ্টানন্দজী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কাশীধামের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত তারাপদ কুণ্ডু পাঁচদিন পালা-কীর্তন গাহিয়া শ্রোতাগণকে আপ্যায়িত করেন। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় হৃদয়গ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন হয়। এই উৎসবে বহুলোক যোগদান করিয়াছিলেন।

আমতা (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব— গত ১০ ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ৭ই জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "সমন্বয়ধর্ম ও সমাজ" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরদিন অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ও পতাকাদিসহ একটি শোভাযাত্রা গ্রামটি পরিভ্রমণ করে এবং রাত্রে অধিবাস কীর্তন ও পরবর্তী দিন অষ্টপ্রহর নামকীর্তন হয়। ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পূজার্চনা ও ভোগাদি হইলে প্রায় ছয় শত দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হলদিয়া (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব —গত ১৯শে বৈশাখ হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্বদিন বম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী, নোয়াখালিতে রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ কার্যের ভারপ্রাপ্ত স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী, স্বামী মনীষানন্দজী প্রভৃতির শুভাগমনে গ্রামবাসিদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। উৎসব দিবসে স্বামী সুপর্ণানন্দজী পূজা ও উচ্চাঙ্গের ভজন গান করেন। বৈকালে হলদিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লালমোহন সাহা মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও শ্রীমান্ নন্দ দুলাল দত্ত বণিক শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দেন। ২০শে বৈশাখ বৈকালে প্রায় দেড় হাজার দরিদ্র-নারায়ণ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন প্রাতে স্বামী মনীষানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী, বৈকালে মহিলা সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দান এবং রাত্রে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভগবান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অতি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজের দেহত্যাগ—কাপিল মঠের শ্রীসত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন যে, গত ৫ই বৈশাখ রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিটের সময় মধুপুর কাপিল মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ ৭৯ বৎসর বয়সে মধুপুর কাপিল-গুহায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গয়া জেলায় পর্বতগুহায় আট বৎসর কাল এবং উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘকাল সাধন করেন। ১৩৩৩ সনের ৩১শে বৈশাখ তারিখে মধুপুরে কাপিল গুহায় প্রবেশান্তর উহার একমাত্র প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া গত ২১ বৎসর যাবৎ তথায় আবদ্ধ থাকেন। স্বামীজী আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধ ও আর্য দর্শনশাস্ত্রে যেমন তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রেও তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামীজীর রচিত "কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন", যোগভাষ্যের "ভাস্বতী" নাম্নী টীকা, "যোগকারিকা", "সাংখ্য-তত্ত্বালোক" প্রভৃতি তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত যোগদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র— পাশিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ও ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক, নারকেলডাঙা ৮নং গৌরীশঙ্কর ঘোষাল লেনস্থ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। রমেশ বাবু পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। তিনি নারিকেলডাঙা জর্জ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।
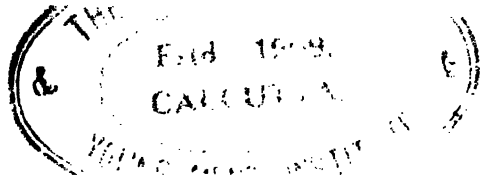
অহিংসা ও স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদক

কায়মনোবাক্যে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন বা কাহাকেও কোন ভাবে হিংসা না করাই অহিংসা। ইহা মানুষের অত্যুন্নত মানসিক বৃত্তি এবং সকল ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। পৃথিবীর সকল ধর্ম-প্রবর্তক ও নীতি-প্রচারক মহাপুরুষই এই মহৎ গুণটির মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিংসারূপ পশুভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া অহিংসারূপ দেবভাবে অধিষ্ঠিত হওয়াই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

এই মহান আদর্শে উপনীত হইতে হইলে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি গুণের অনুশীলন করা আবশ্যক। সকল ভূতের প্রতি বৈরিতা একেবারে ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি আন্তরিক মৈত্রীভাব পোষণ করা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান উপায়। যিনি সকল ভূতকে আপনারই আত্মার বহুরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখেন এবং অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম বা নারায়ণের অবস্থিতি সন্দর্শন করেন, তিনি—কেবলমাত্র সেই মহাত্মাই এই দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। অদ্বৈত বা অভেদ ভাবমূলে সর্বভূতে সমদর্শন না হইলে যথার্থ মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। মনে দ্বৈতবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞানসঞ্জাত অসম ভাবের লেশমাত্র থাকা পর্যন্ত মৈত্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

মৈত্রীর অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে মানুষের অন্তর করুণায় আপনা আপনি ভরপুর হইয়া থাকে। কেহ জগতের সকল নর-নারীকে যথার্থই মিত্র মনে করিলে তাঁহার পক্ষে তাহাদের সুখ-দুঃখকে আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক নহে কি? সুতরাং করুণার আবির্ভাব না হইলে নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, মৈত্রী আবির্ভূত হয় নাই। যাঁহার মনে যথার্থ করুণার উদয় হয়, তিনি সকল মানুষের প্রতি—এমন কি তাঁহার অনিষ্টকারীর প্রতিও করুণা প্রকাশ করেন। এই জন্য মৈত্রীভাব-জাত করুণা অহিংসার অমৃতপ্রসূ ফল।

মুদিতা অর্থাৎ সকল সৎকর্মে একই প্রকার আনন্দবোধ মৈত্রীভাবের আর একটি লক্ষণ। দেখা যায়—একই সৎকর্ম স্বকৃত হইলে মানুষের যে আনন্দবোধ হয়, আত্মীয়-স্বজনকৃত হইলে তাহার তত আনন্দবোধ হয় না। এইরূপে সৎকর্মকারীর সহিত মানুষের সম্পর্ক যতই দূরবর্তী হয়, তাহার আনন্দের মাত্রাও ততই কমিতে থাকে, শেষে দূরবর্তী স্থানে সম্পর্কহীন অপরিচিত ব্যক্তিদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে সাধারণতঃ মানুষ কোন আনন্দই বোধ করে না। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবের অভাবে এবং মনে হিংসা লুক্কায়িত থাকে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। নিজকৃত এবং পরিচিত

ও অপরিচিত ব্যক্তিদের কৃত একই সৎকর্মে যাঁহার একই প্রকার আনন্দ বোধ হয়, তিনিই প্রকৃত অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত।

অসৎকর্ম ও উহার অনুষ্ঠানকারীর প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন মৈত্রীভাব-সাধনার অপর একটি উপায়। দেখা যায়—অসৎকর্ম ও উহার অনুষ্ঠাতার বিরুদ্ধে সাধারণ সৎ মানুষের মনও বিদ্রোহী হইয়া থাকে এবং ইহার প্রতিকার-প্রবৃত্তি তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করে। তিনি যদি মনে করেন—যে অবস্থার তাড়নায় অসৎ-কর্মটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ঐ অবস্থায় পড়িলে উহা অপেক্ষা অধিকতর অসৎকর্ম করিতেন, তাহা হইলে অসৎকর্ম ও অসৎকর্মকারীর প্রতি ঘৃণা এবং উহার প্রতিকার-চিন্তা-জনিত অশান্তি হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন। বিশ্লেষণ করিলে বেশ বোঝা যায় যে, অন্তর্নিহিত হিংসাই এই অশান্তির কারণ। যিনি অহিংসায় অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহার জানা উচিত যে, এই সদসদ্মিশ্রিত জগতে সৎ ও অসৎ উভয়ই চিরকাল বিদ্যমান থাকিবেই। কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সকলের কৃত অসৎকর্ম হইতে জগৎকে কোন কালেও মুক্ত করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় কেহ নিয়ত অসৎকর্মের প্রতিকারের উপায় লইয়া মাথা ঘামাইলে তাহার মনে অশান্তি বাড়িতেই থাকিবে। কাজেই অসৎকর্মের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনই চিত্তের স্থৈর্য রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। যিনি চিত্তবৃত্তিগুলিকে শান্ত করিয়া অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষী, সেই মহাত্মার পক্ষে অসৎকর্মের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যোগিগণ বলেন, আমাদের মনের অসৎ কার্যের প্রতি ঘৃণা অথবা উহার প্রতিকার প্রবৃত্তিরূপ প্রতিক্রিয়া শক্তির অপক্ষয় মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "কোন অশুভ চিন্তা অথবা ঘৃণাপ্রসূত কার্য্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। এইরূপ সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা নহে, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের শুভ শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে।" যিনি এই সকল ভাব জীবনে কার্যে পরিণত করেন তিনিই অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নিকট অপরে তাহার স্বাভাবিক বৈরিতা ত্যাগ করে।[১] স্বামী বিবেকানন্দ এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে, যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃই হিংস্র, তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অহিংসা-ব্রত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

অহিংসার এই লক্ষণসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কেবলমাত্র নিবৃত্তিপন্থী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ সম্পূর্ণ ভাবে অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ। রজঃ ও তমো-গুণী প্রবৃত্তিপন্থীর পক্ষে অহিংসার অনুশীলন কেবল অহিংসার কতকগুলি নৈতিক নিয়ম পালনের নামান্তর মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' অর্থ—"যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামী, পরলোকেরও তাই।" এই বিষয়টি

[১] অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।
—পাতঞ্জল যোগসূত্র, সাধন পাদ, ৩৫

পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে সে দাসত্ব -লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে ব'লে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই * * এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন [illegible]র, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষধর্ম্ম প্রধান হল।"

অন্যত্র আছে, "মোক্ষমার্গ প্রথম বেদই উপদেশ করছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকে ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? 'ঘষে-মেজে রূপ,' আর ধরে-বেঁধে পিরিত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্বর্গসাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামখা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক, যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি, ব্যক্তি, প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে?"

স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'ধর্ম্ম' অর্থ—"যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়।" তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়া-মূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।" তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই ধর্মভাব পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে খুব প্রবল। এই জন্য তাঁহারা অত্যন্ত রজোগুণী। বর্ত্তমানেও ভারতের অধিকাংশ হিন্দু নরনারী মহাতমে আকণ্ঠ মজ্জমান। তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের প্রবল ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু রজোগুণের অভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে তাহারা একেবারে অসমর্থ হইয়া সত্ত্ব-গুণের ভান করিয়া লোক-দেখানো মোক্ষ চাহিতেছে। বৌদ্ধপ্রভাব বশতঃ অধিকারী ও অনধিকারী বিচার না করিয়া মোক্ষের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়ার জন্যই যে এরূপ হইতেছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াশুদ্ধ মুক্তি নেবে চল,'—বলি তা কখনও হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথার বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর,' এ কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে, কাযের কথা? দুটো মানুষের মুখে

অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কায কর্ত্তে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ !! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐ খানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি ? অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা ; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং'[২] ইত্যাদি, হত্যা করতে এসেছে—এমন ব্রহ্ম-বধেও পাপ নাই, মনু বলছেন ! এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা —বীর্য্য প্রকাশ কর ; সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে, চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য সত্য, পরমসত্য,—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু ! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও পাপ, গৃহস্থের পক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে হবে।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্মকামী ইহলোকে ও পরলোকে সুখ চায় এবং মোক্ষকামী উভয় লোকের সুখ-দুঃখকে বন্ধন মনে করিয়া উহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও অধিকারভেদে উভয়টিই ভাল। স্বামীজী লিখিয়াছেন, " 'মুক্তিকামের ভাল' একরূপ, 'ধর্ম্মকামের ভাল' আর এক প্রকার। এই গীতা-প্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন ; এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—গীতা ১২।১৩, ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—গীতা—২।৩, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'—গীতা ১১।৩৩—ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায় ভগবান দেখিয়েছেন। অবশ্য কর্ম্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা ; উপোষের চেয়ে আধপেটা ভাল নয় ? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্রিত কর্ম্ম করা ভাল নয় ? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষ দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্যে অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল-মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় হয়। * * সেই (সত্ত্বগুণপ্রধান) মহাপুরুষই 'অদ্বেষ্টা সর্ব্ব-ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ', ইত্যাদি। আর ঐ মিনমিনে পিনপিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায় ? প্রথমে ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—শেষে 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।' ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরাও ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—তা ভগবান ! এখন উপায়

২ গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥
—মনুসংহিতা, ৮।৩৫০

হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।"

অন্যত্র আছে—" 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্ব্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত ইতর সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে এই হয়েছে যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে—আর টাকার জন্য ভাইয়ের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে!—এমন 'বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ' এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্য পক্ষে দেখ—বৈদিক ও মনুক্ত ধর্ম্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারী বিশেষে হিংসা ও অধিকারী বিশেষে অহিংসাধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থা আছে।"

স্বামীজীর উদ্ধৃত অভিমত হইতে স্পষ্ট যে, তিনি অতি উচ্চকণ্ঠে অহিংসার প্রশংসা করিয়াও উহাকে অধিকারিভেদে অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখে বীতস্পৃহ নিবৃত্তিপন্থী সত্ত্বগুণী সমদর্শী মোক্ষকামিগণের সাধন-সম্পদ্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আর ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগার্থী প্রবৃত্তি-পন্থী রজোগুণী ভেদদর্শী ধর্মকামী গৃহস্থদিগকে অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া স্বধর্ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই উভয় শ্রেণীর পক্ষে স্বাভাবিক। হিন্দুশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ সংহিতাদিতেও ইহার স্পষ্ট সমর্থন দেখা যায়। মহাভারতে আছে—অশ্বত্থামা প্রতারণা করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে। ইহাতে অর্জুন ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়া তাহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জানিয়া অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'আততায়ী যাহারাই হ'ক না কেন, তাহাদিগকে হত্যা করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। অশ্বত্থামা নির্দোষ শিশুগণকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে অতি জঘন্য ব্যক্তি, তাহাকে হত্যা করাই উচিত।' এইরূপ বহু শাস্ত্রপ্রমাণমূলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্বামীজীর এই উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত।

প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ইহলৌকিক ভোগ-সুখই জগতের অধিকাংশ নরনারীর একমাত্র জীবনাদর্শ। তাহারা আবশ্যক মত হিংসা অধর্ম অসত্য ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' এই আদর্শ লাভ করিতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান যুগে তাহাদের এই প্রচেষ্টা পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা ক্রমেই অধিকতর উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। ভোগ-সুখ চরিতার্থের জন্য তাহারা জিঘাংসা ও জিহীর্ষায় ক্রমেই বনের হিংস্র জন্তুরও অধম হইয়া পড়িতেছে। সকল হিংস্র প্রাণীর হিংস্রভাব চেষ্টা করিয়াও দূর করা যেমন সম্ভব নয়, সংসারে ভোগ-সুখার্থী সকল নরনারীর ভোগ-সুখের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত করাও তেমন অসম্ভব। অন্ততঃ পৃথিবীর একশ্রেণীর নরনারী তাহাদের ভোগ-সুখ-পথের বিঘ্নগুলি প্রয়োজনের প্রেরণায় নানাভাবে হিংসাসহায়েও দূর করিতে চেষ্টা করিবেই। তাহাদের এই দুষ্কার্য প্রতিরোধের জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে আইন বিচারালয় পুলিশ সৈন্য জেলখানা প্রভৃতি বিদ্যমান। এইগুলির আবশ্যকতা কোন কালেই দূর হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও দূরীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও ইদানীং ভারতবর্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভাবে অহিংসা-নীতির প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহার সত্যতা অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, কোন স্থানের জনসাধারণ

কোন মহাত্মার উপদেশে অকস্মাৎ ঠিক ঠিক অহিংস হওয়ার ফলেই যে উহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাধারণ মানুষের ন্যায়ই তখনও তাহাদের মধ্যে হিংসা ছিল এবং এখনও আছে; তবে তাহারা অবস্থার চাপে যে উহা প্রয়োগ করে নাই, ইহাই সত্য। মনে হিংসা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের প্রেরণায় বা অক্ষমতার জন্য বাহিরে উহার প্রয়োগ না করাই অহিংসা নহে। পক্ষান্তরে কোন বিশেষ এক বা একাধিক বিষয়ে সমষ্টিগত ভাবে অহিংসা-নীতির প্রয়োগ সফল হইলেই যে চারিদিকে হিংসার একচ্ছত্র রাজত্বের মধ্যে মানব-জীবনের সকল বিভাগেই উহার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এরূপ আশা করা অযৌক্তিক। অবশ্য যথার্থ অহিংসা দ্বারা যে হিংসাকে জয় করা যায় ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত ভাবে মুষ্টিমেয় মহাপুরুষ প্রকৃত অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া হিংসাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন এবং এই দেবমানবগণ মানব-জাতির আদর্শ। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে পৃথিবীর সকল দেশেরই অধিকাংশ নরনারী এখনও অহিংসার এলাকা হইতে বহু দূরে আছে। আবহমান কাল হইতে তাহারা ভোগ-সুখের প্রেরণায় হিংসা বিরোধ ও বিদ্বেষে মত্ত। অহিংসার অত্যুন্নত আদর্শ গ্রহণে তাহারা একেবারেই অসমর্থ। বিশ্বময় প্রদীপ্ত হিংসার নিকট অহিংসা আজও নিষ্প্রভ। এ অবস্থায় যদি কোন স্থানের মুষ্টিমেয় নরনারী ঠিক ঠিক অহিংসায় অধিষ্ঠিত না হইয়াও সাময়িক উত্তেজনাবশে উহার কাল্পনিক উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ আক্রমণাত্মক অত্যুগ্র হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক হিংসার প্রয়োগও না করে, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য বাস্তববাদমূলক হিন্দুশাস্ত্র-সমূহ ভোগ-সুখার্থী গৃহস্থদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে অত্যুগ্র হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার প্রয়োগ সমর্থন করেন নাই। পক্ষান্তরে গৃহস্থ সর্বসাধারণের পক্ষে রাতারাতি অহিংসার অতি উচ্চ আদর্শে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ, ইহা দীর্ঘকালের কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। তথাপি এই হিংসা-বিরোধ-বিদ্বেষপূর্ণ জগতের সকল নরনারীর সমক্ষে সর্বদা অহিংসার পতাকা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা আছে। কেননা, ইহাই মানুষমাত্রেরই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সকল মানুষকে এই আদর্শ লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দও অহিংসার মাহাত্ম্য ঘোষণায় পঞ্চমুখ ছিলেন। পৃথিবীর সকল নরনারী সর্বধর্ম-সমর্থিত এই মহৎ গুণটিতে বিভূষিত হ'ক্ এবং এই সর্বোচ্চ নীতির নির্দেশে তাহাদের ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র ও দৈনন্দিন জীবন পরিচালন করুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কাম্য। তাঁহার গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাসমূহে এই ভাবই বিশেষরূপে পরিস্ফুট তিনি ছিলেন যথার্থই সর্বভূতে সমদর্শী সন্ন্যাসী। নরমাত্রকে নারায়ণ এবং জীবমাত্রকেই শিবরূপে সন্দর্শন তাঁহার প্রধান সাধনা ছিল। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বামীজী ঠিক ঠিক অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি বাস্তব জগতের অবাঞ্ছিত সত্যকে উপেক্ষা করেন নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র অহিংসার মহত্ত্ব প্রচারিত হইলেও অতি মুষ্টিমেয় মহাত্মা এই অত্যুচ্চ আদর্শ কার্যতঃ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশ্বমানব-সভ্যতা এখনও এই অত্যুন্নত আদর্শ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। বর্তমানেও পৃথিবীর প্রায় সকল নরনারীই তাহাদের ভোগ-সুখের তাড়নায় অল্পাধিক হিংসা-বিদ্বেষে প্রমত্ত। তাহারা হিংসাসহায়ে সকল নরনারীকে উৎসন্নের পথে পাঠাইয়াও আপনাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়-গত ভোগ-স্বার্থ চরিতার্থ করিতে সতত উদ্‌গ্রীব।

এ অবস্থায় কোন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অহিংসা-রূপ উচ্চ নীতি অবলম্বনে অগণন হিংস্র নরনারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বময় মানুষের এই শোচনীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। বাস্তববাদী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিক্ত অভিজ্ঞতামূলে এই অপ্রিয় কঠোর সত্য স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতিধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল গৃহস্থকে আবশ্যক হইলে হিংসার আশ্রয় গ্রহণের বিধান দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। এই আদর্শের অনুসরণে বাস্তববাদী স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে অহিংসার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াও ধর্ম-জাতি-নির্বিশেষে ইহলোক ও পরলোকে ভোগ-সুখার্থী সকল গৃহস্থকে আক্রমণাত্মক অত্যুগ্র হিংসার সহিত সংগ্রামে আত্মরক্ষা ও ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ সুখকেই বন্ধন বলিয়া যথার্থই মনে করেন, সেই নিবৃত্তিপন্থী মোক্ষ-কামিগণকে সর্বাবস্থায় অহিংসার উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

পরশ

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

এত দিন পরে কেন যে ছোঁয়ালে
　　তোমার পরশ খানি,
আমার যন্ত্রে দিল কে আজিকে
　　তোমার মন্ত্র আনি ?
　কর্ম-মুখর জগৎ-চক্রতলে
　তোমারে ছিলেম ভুলে,
আজি কেন এই সাঁঝের গোধূলি
　আভাসে জানায়ে
　　গেল যে তোমার বাণী ?
আলো আঁধারের মাঝে
বিশ্ব-ভুবনে নবসুর আজি বাজে,
বিস্মৃত মোর জীবন-কক্ষে
　　আবার জ্বালিলে আলো,
নতুন করিয়া মানুষে বাসিনু ভালো।

আমারো জীবনে স্বপ্ন এসেছে
　　হৃদয়ে জেগেছে মায়া,
অকরুণা এই ধরণীর বুকে
　　চেয়েছিনু শুধু ছায়া।
পশ্চিম আর পূর্ব গগনে
　　রক্তের গাঢ় আলো,
আমার জীবন আমার স্বপ্ন
　　ক'রে দিয়েছিল কালো।
স্বার্থ-মুখর জীবনের তলে তলে
তাই তো আমি আমারে ছিলেম ভুলে ;
আমিতো জানিনে গোধূলিতে আজ
　　তোমার পরশ খানি
　　হঠাৎ দিবে যে আনি
　　নবজীবনের গান
হিংসাপ্লুত মানুষের যেথা—
　　নেই কোন অভিযান।

জাতীয় জীবনে যুগধর্মের প্রভাব*

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, এম্‌-এ, বি-এল্‌

সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যে কাঁথি তার অসাধারণ ত্যাগ ও অলৌকিক দুঃখবরণ দ্বারা এক অপূর্ব অধ্যায় রচনা করেছে, সেখানে এসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করছি। কাঁথিতে এসেছি তীর্থযাত্রীর মন ও নিষ্ঠা নিয়ে—জনগণের প্রাণের নেতা বীরেন্দ্রনাথের কাঁথি আমাদের কাছে "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, যাঁকে আমরা যুগাবতার বলি, যিনি তাঁর সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনের অপূর্ব সাধনা দিয়ে মানুষের ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবাহন করে প্রাণের আসনে বসাতে পারেন কাঁথির অধিবাসী আপনারাই, দুঃখের কষ্টিপাথর বার বার যাচাই করে যাঁদের খাঁটি সোনা বলে প্রতিপন্ন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপনাদের সাথী, মানুষের দেওয়া দুঃখ ও নিগ্রহ আপনাদের অঙ্গের আভরণ। অমানুষিক পীড়ন আপনাদের টলাতে পারেনি; চরিত্র আপনাদের গড়ে উঠেছে পাথরের মত শক্ত হয়ে। আপনারাই তো সত্যিকারের মানুষ—আড়ম্বর নেই, আছে দার্ঢ্য; কৃত্রিমতা নেই, আছে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন; মতবাদের দলাদলি নেই, আছে একতা ও সহনশীলতা। এই তো যোগ্য পরিবেশ সেই ঋষিকে আবাহন করার—যাঁর প্রবর্তিত যুগধর্মের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে আপনাদের সহজ সরল জীবনের বলিষ্ঠ আদর্শ।

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। আপনারা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো রাজনৈতিক নেতা নন; রাজনীতির একটি কথাও তিনি বলেন নি। ধর্মজীবনের অপূর্ব সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁকে ভক্তের চোখ দিয়ে দেখে অবতার বলে স্বীকার করতে পারি; কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর স্থান কোথায়? আর তথাকথিত ধর্মের প্রভাবে গড়েওঠা রাজনীতি যে কী ভীতিপ্রদ ব্যাপার, তা আমরা বর্তমানে সাংঘাতিক হিন্দু-মুস্লিম দাঙ্গা দেখেই বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা যে ধর্ম ধর্ম করেই এ দেশটা রসাতলে গেছে। প্রাক্‌-মুসলমান যুগের ভারতবর্ষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যে কত দুর্গতিই না ভোগ করেছে—আমাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হারাবার মূলেও নাকি ওই ধর্ম! সুতরাং থাক্‌ ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে, যদি একে রাখতেই হয়। আর আমাদের রাজনীতি গড়ে উঠুক ধর্মকে বাদ দিয়ে, যেমন পশ্চিমে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু আমাদের এ প্রাচীন দেশের ধর্ম তো কখনও সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা মতবাদের গোঁড়ামি নয়। লৌকিক ধর্মকে ছাপিয়ে উঠে এর আধ্যাত্মিক দিকটা—যেখানে মতবাদের ঝগড়া স্থান পায় না। এ ধর্ম উদার ও অসাম্প্রদায়িক—সমগ্র মানব-সমাজকে ধরে আছে এ ধর্ম। আমাদের রাজনীতিকে এ ধর্ম কখনও কলুষিত কিম্বা দুর্বল করেনি, করেছে

* কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আহুত জনসভায় প্রদত্ত অভিভাষণ।

এ ধর্ম শেখায় না অপরকে ঘৃণা করতে, এ ধর্মের প্রাণ যে প্রেম। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে ভালবাসতে শেখায় এ ধর্ম। হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলির সম্যক্ প্রকাশ হয় এ ধর্মেরই অনুশীলনে। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে এ ধর্ম। প্রাচীন কালের আদর্শ নরপতিরা এ ধর্মকেই রাজনীতিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ ধর্মকে ঘিরেই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আমাদের দর্শন, উপনিষদ্ ও গীতা। মুসলমান-যুগে ধর্মের এ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—ধর্মের নামে এসেছিল সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি, যার ফলে এ দেশের মানুষের ঘটেছিল অশেষ দুর্গতি। ধর্মের জন্য নয়, ধর্মের বিকৃতি বা অভাব যখন ঘটেছে, তখনই হয়েছে ভারতের পতন। ভারতের ইতিহাস যুগে যুগে এ কথাটাই প্রমাণ করেছে।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত কিন্তু ধর্মের লৌকিক দিকটাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। রোমের পোপ ছিলেন সম্রাটের উপরে সম্রাট, রাজার উপরে রাজা। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে এলো একটানা ভয়াবহ দ্বন্দ্ব দুইদল খৃষ্টানের মধ্যে—যা সমগ্র মধ্য-ইউরোপকে বিধ্বস্ত করেছিল। এ দ্বন্দ্ববিরতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে ছেঁটে ফেলতে লাগলো ইউরোপের রাজনীতি। জড়সভ্যতার কাঠামোতে ম্যাকিয়াভেলির কূটনীতিতে গড়ে উঠেছে ইউরোপের বর্তমান রাজনীতি। এর অপূর্ব সাফল্য দেখে আমাদের চোখ ঝলসে যায় সত্য, কিন্তু এর বিষময় ফলও থেকে থেকে আমরা ভুগি কম নয়।

পূর্বদেশের ঐতিহ্য কিন্তু আলাদা। ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়, ধর্মকে কুসংস্কার ও অনুদারতার হাত থেকে মুক্ত করে জীবনের সকল কাজের সাথে রাখা এবং রাজনীতিকে সুষ্ঠু পরিমার্জিত উদার প্রেমধর্মের উপর স্থাপন করা—এই এদেশের আদর্শ। আমাদের সংস্কৃতির সংকট ধর্মেরও সংকট। আমাদের অবতার শুধু ধর্মের চোখে অবতার নন, রাজনীতির চোখেও তিনি অবতার বা মুক্তির দূত। গীতোক্ত ধর্মের গ্লানি বা অধর্মের অভ্যুত্থান যখন কোন দেশে ঘটে, তখনই সে জাতির পতন সূচিত হয়। কুসংস্কারে মগ্ন থাকা, কূপমণ্ডুকতায় আত্মপ্রসাদ, আত্মসর্বস্বনীতি, প্রাণকে ভুলে গিয়ে লোকাচারের খোসা বা কাঠামোটাকে নিয়ে দলাদলি ও বিবাদ—এদেরই মাঝে অধর্ম করে আত্মপ্রকাশ। রাজনৈতিক অধীনতা বা পতন সামাজিক দুর্গতির স্বাভাবিক পরিণতি—এ কথা গীবন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "The Decline and Fall of the Roman Empire"-এ চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন। এই দুর্গত জাতির মাঝেই আবির্ভূত হন অবতার—হাতে তাঁর জাগাবার সোনার কাঠিটি। জাতির ভুলে যাওয়া আদর্শকে ও ঐতিহ্যকে জানাতে তিনিই এসে ডাক দেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

যুগে যুগে পূর্বদেশের ইতিহাস রচনা করেছেন এই অবতারকল্প সাধকগণ। বুদ্ধ মহম্মদ শংকরাচার্য রামানন্দ কবীর নানক চৈতন্য প্রমুখ ভারতের মধ্যযুগীয় সাধকসম্প্রদায়, শিবাজীর গুরু রামদাস—এঁরা কি শুধু ধর্মজগতেরই লোক? স্ব স্ব দেশের রাজনীতিতে এঁদের প্রভাব পশ্চিমের রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবের চাইতে কোন অংশে কম নয়। ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বপ্রেমিক সম্রাট ভিক্ষু অশোক তো সর্ব-যুগের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। মোগলশ্রেষ্ঠ আকবর এই ধর্মের ভিত্তির উপরই মহাভারত গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন—সার্থকতাও লাভ করেছিলেন অভূতপূর্ব। আর গোঁড়া আওরঙ্গজেবের হাতে ধর্মের বিকৃতি ঘটেছিল বলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল।

তাই একথা বলতে কোন দ্বিধাই নেই, যে গণজাগরণের চাঞ্চল্য আজ আসমুদ্র হিমাচল

হিন্দুস্থানকে প্রকম্পিত করে তুলেছে, যার কাছে নতিস্বীকার করেছে আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত শাসকসম্প্রদায়, সে জাগরণের পশ্চাতে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষদের সাধনাপূত জীবন—আর এঁদেরই পুরোভাগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—"Renaissance precedes revolution"—বিপ্লবের আগে আসে সংস্কৃতির পুনর্জন্ম। এদেশেও কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে রেনেশাঁস ঘটিয়েছেন ঐ মহাপুরুষরা। পশ্চিমের রেনেশাঁস আর আমাদের দেশের রেনেশাঁস ঠিক এক জিনিস নয়। পশ্চিম ধর্মকে বাদ দিয়ে চলে বলে তার সকল কাজ মস্তিষ্কের ও হাতের; আর পূর্বদেশে এদের সঙ্গে প্রধান অঙ্গ হয়ে থাকে হৃদয়, কারণ ধর্মকে বাদ দিয়ে সে চলতে পারে না! রেনেশাঁসের সঙ্গে তাই পূর্বদেশে মেশানো থাকে রিফরমেশন বা ধর্মবিপ্লব। পূর্বদেশের রাজনৈতিক নেতারা ধর্মকে বাদ দিয়ে আন্দোলন করেন না। ভারতের নেতা হিসাবে যুগে যুগে দেখেছি সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীদের—এ যুগের জাগরণের প্রথম ও প্রধান নেতা তাই ধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর যুগধর্মের মাঝেই আছে আমাদের জাতি হিসাবে চলার পথের সন্ধান, আমাদের মুক্তির মন্ত্র, আমাদের বাঁচবার রসদ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার কথা বা ধর্মজীবনের দার্শনিক দিকটা আমি আলোচনা করব না—কারণ এ আমার অধিকারের বাইরে। যাঁকে বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজির মত মহাপুরুষ বলেছেন তিনি হয়তো শিব গড়তে বানর গড়ে ফেলবেন, তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবে আমার মত সাধারণ লোক কোন সাহসে? সুতরাং ওটা থাক। যাঁর স্থান এ পুণ্যভূমিতে যুগে যুগে আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ সাধকদের সাথে, তিনি এ যুগের সাধারণ মানুষের জন্য কি করেছেন, তাই শুধু একটু দেখতে চেষ্টা করবো—তাও তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ভাষ্যের মধ্যদিয়ে। ভারতের সেদিন সত্যই এক পরম শুভ মুহূর্ত, যেদিন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিচারপ্রবণ অনুসন্ধিৎসু নরেন্দ্র এসে দাঁড়ালেন শাশ্বত সনাতন ভারতের মূর্ত প্রতীক্ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। সহস্ররশ্মি ঠাকুরের প্রাণের একটি রশ্মি দিয়ে উদ্ভাসিত করে নিলেন বিবেকানন্দ তাঁর প্রাণের প্রদীপখানি, যার আলোতে আজ আমরা নিজেদের আবিষ্কার করবার প্রয়াস পাচ্ছি।

ঠাকুরের যুগধর্মকে তাই আমাদের বুঝতে হবে স্বামীজির জীবনের সোপান বেয়ে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপ্রচারের মাধ্যম করেছেন অর্জুনকে, এ যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধর্মের মাধ্যম করেছেন স্বামী বিবেকানন্দকে। এ ধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটি আমার মত অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ আবৃত, এ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব আমার অজানা। সাধারণ লোকের সুখদুঃখ স্বার্থ-কোলাহলে মগ্ন থেকেও যখন মাঝে মাঝে একটা বড় আদর্শকে আঁকড়ে ধরবার জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে থাকে, তখন ঠাকুরের সৃষ্ট যুগধর্ম স্বামীজির মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়ে সামনে এসে হাজির হয়। ব্যবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকেই একটু আলোচনা করতে চাই।

এ ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমিকা গড়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির শংকট, যা উপস্থিত হয়েছিল আমাদের দেশে ইংরেজ-শাসনে পশ্চিমের সভ্যতার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে। তখন আমরা সব হারিয়ে বসে আছি, পশ্চিম এসে তাই আমাদের গ্রাস করলো। এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য রীতিনীতি সব কিছু ভেসে যেতে বসেছিল বানের জলে কুটোর মত। পশ্চিমের জড়সভ্যতা ও নিরীশ্বরবাদ আমাদের হল আদর্শ—জীবনকে ঢেলে সাজতে চাইলাম পশ্চিমের জড়বাদের কাঠামোর মাঝে। একটা কথা মনে রাখতে হবে। পশ্চিমের যা কিছু ভাল তা কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি; ঐ সভ্যতার বাইরের চাকচিক্য ও আনুষঙ্গিক

ব্যভিচার ও বিলাসব্যসন আমাদের পূর্বপুরুষদের মুগ্ধ করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাবার সঙ্গে এ সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আমাদের দুঃখ ও দুর্গতিকে পরিপূর্ণ করলো। অবশ্য এ ইংগ-ভারতীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে; আমাদের সুপ্রাচীন সনাতন ধর্ম আবদ্ধ রইলো অজ্ঞজনগণের কুসংস্কারে, অর্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোঁড়া বিধানের মাঝে, আর পাঁজির সহস্র বাধানিষেধের গণ্ডীতে। ধর্ম ঢুকলো রান্না ঘরের হাঁড়িতে; জাতিগত বৈষম্য, ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার, মানুষের প্রতি অবিচার ও ঘৃণা, তন্ত্রের নামে ব্যভিচার—এসব একটানা চললো এদেশের বুকে। এ চরম দুর্দিনে আলোকবর্তিকা হাতে যে ক'জন মহাপুরুষ আমাদের পথ দেখাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন বয়োজ্যেষ্ঠ। ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের মত তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন পথ তৈরী করলেন যুগাবতারের আগমনের। অখ্যাত পল্লীতে দীনের কুটিরে এলেন সেই মহাপুরুষ; নিয়তি তাঁকে টেনে আনলো কলিকাতার উপকণ্ঠে—কলিকাতা, যা ছিল তখনকার কৃত্রিম বিদেশী সভ্যতার প্রধান পীঠস্থান। তারপর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর অশিক্ষিত পুরোহিত গদাধর ভারতের চিরপুরাতন সুরে আবার ভগবানের কথা শোনালেন। নবপরিপ্রেক্ষিতে নূতন ভাষায় তিনি আবার ঘোষণা করলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

আড়ম্বরশূন্য সরল গ্রাম্য পুরোহিতের কথার মাঝে একি সুর! শাস্ত্রের কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলি ঘরোয়া আলাপের মাঝে ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে একি অপূর্ব প্রয়াস! শিক্ষিতসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো, সিদ্ধান্ত করলো এ নিশ্চয়ই পাগল। অনেকে এলেন ঠাট্টা করতে, কিন্তু রয়ে গেলেন তাঁর কাছে চুম্বকে যেমন লোহা লেগে থাকে। তারপর নরেন্দ্র এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি ভগবানকে দেখেছেন?" ঐ অনাড়ম্বর ঋষির মুখে সরল উত্তর, "হ্যাঁ! তোমাকেও দেখাতে পারি।" জড়বাদের নিরীশ্বর সভ্যতার কাছে এ সনাতন ভারতের এক চ্যালেঞ্জ। এযুগে আমাদের জাগরণের ইতিহাসের সুরু এইখানে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে এ সংসার-রঙ্গমঞ্চে বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণ এ যুগধর্ম নাটকের যে অভিনয় করেছিলেন, তারই জের টেনে চলেছে বর্তমান ভারত বিশেষ করে এ বাংলা দেশ।

যুগধর্ম কি—এবার তা খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মন দিয়ে নয়, আমাদের মত সাধারণ লোকের মন দিয়ে। ধর্ম শুধু বিশ্বাতীত দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে কিম্বা ভক্তের একনিষ্ঠ মন নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা নয়। শাস্ত্রোক্ত বিশেষ কোন উপায়ে বিশেষ কোন দেবতার আরাধনা করাতেও ধর্ম পর্যবসিত নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল দেনা-পাওনা মেটাতে যে কর্ম আমরা করি তাও ধর্মের অন্তর্গত। ধর্ম ব্যক্তিগত, ধর্ম জাতিগত। আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত চরিত্র যখন উঁচু সুরে বাঁধা থাকে, সকল কর্মের মাঝে যখন থাকে নিষ্ঠা আদর্শপ্রিয়তা নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও প্রেম যখন নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের জীবন—তখনই আমরা ধার্মিক। ঈশ্বরের নিয়মিত উপাসনা ছাড়াও এসব গুণগুলি আমাদের মাঝে প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের এসব লক্ষণ আমাদের মাঝে ফোটে না যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপরে একটা

মহান লক্ষ্যকে আমরা কেন্দ্র করে চলতে না শিখি। বিশ্বাতীত এক মহান শক্তি লীলাচ্ছলে এ জগতের সৃষ্টি করেছেন, তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—এ বোধই সত্যিকারের ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাই ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে আছে। এ বিশ্বাস বলেই জীবন সহজ সুন্দর সুস্থ ও মহান হয়ে গড়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্ম মানুষের এই ব্যাপক-ধর্ম। মতবাদ কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার কোন গোঁড়ামিই এতে নেই। সনাতন ভারতের চিরন্তন সত্য ও ঔদার্যে এ প্রাণবন্ত। ঈশ্বর উপাসনার স্থান এ ধর্মের মাঝে বিশেষ ভাবেই আছে; কিন্তু সকল নরনারীকে সংসার ছেড়ে সাধনমার্গে বিচরণ করার নির্দেশ এ ধর্ম দেয় না—অন্তত আমাদের মত সাধারণ মানুষদের—যাদের নিয়ে এ জাতি, যাদের উত্থান পতনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে ভারতের উত্থান পতন। এ যুগ বিচারের যুগ—পশ্চিম বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সভ্যতাকে যে পর্যায়ে তুলেছে, তাকে অস্বীকার করলে আমরা নিঃসন্দেহে পিছিয়ে পড়বো। পিছিয়ে যেতে আমরা তো কখনও চাই না। যুগধর্ম তাই বর্তমান সভ্যতার পটভূমিতে সংশোধিত ভারতের সনাতন ধর্ম পূর্বপশ্চিম-সমন্বয়ের মাঝে এর মূল সূত্র গাঁথা রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি প্রাচীন ভারতের অন্যান্য সাধকদের মত সংসার ত্যাগ করে পর্বত-গুহায় বসে ঈশ্বরের উপলব্ধিতে জীবন কাটাতেন তবে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বলে হয়তো দূর থেকে প্রণাম করতাম, এত কাছের আপন জনের মত তা হলে তাঁকে নিশ্চয়ই ভালবাসতাম না।

মানুষের জীবনের রহস্য যে কি তা যুগে যুগে সাধকদের ও চিন্তানায়কদের ভাবিয়েছে—সমাধান আজিও হয়েছে কিনা জানি না। আমাদের জৈবিক প্রবৃত্তি, আমাদের পারিবারিক গণ্ডীতে ছোটখাটো সুখদুঃখ, বিরহমিলন, সমাজের ভালমন্দ, স্বার্থকোলাহল—এতো আছে, থাকবেও। এদের মাঝে আমরা কি একেবারে হারিয়ে গেছি? উচ্চজীবন কি সংসারীদের অপ্রাপ্যই থেকে যাবে? ভোগ কি শুধু আমাদের নরকের মুখেই ঠেলে দেয়? এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা যুগধর্মে পাই। যুগধর্মের প্রবর্তক নিজে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কিন্তু কলিকাতার সমাজে চলাফেরা করতেন; বিলাস ও ব্যভিচার তাঁকে ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিত। বিবাহ তিনি করেছেন নিজের পছন্দ করা সারদামণি দেবীকে। অপূর্ব প্রেম গড়ে উঠেছে এ অভিনব দম্পতিকে ঘিরে, কিন্তু 'এ প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'—পূত পবিত্র তাঁদের সম্বন্ধ। সরল স্বাভাবিক সংসারী জীবনের মাঝেও কি করে মহৎ জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে উদাহরণ স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন। সংসারজীবনের এ আদর্শকে সামনে রাখলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ না হতে পারি, কিন্তু খানিকটা উন্নত নিশ্চয়ই হবো। আর এ সান্ত্বনাও আমাদের থাকবে যে আমরা কারুর চাইতে ছোট নই, আমাদের পারিবারিক জীবনের পরিবেশের মাঝে ধর্মের খুব বড় স্থান আছে; মহৎ জীবনে আমাদেরই অধিকার। সাংসারিক জীবনের দেনাপাওনাকে অস্বীকার করে ধর্ম নয়, আমাদের সকল কাজই তাঁর উপাসনা। সংসারের ধূলাবালির পথে হাঁটলে, ধূলাবালিতো গায়ে লাগবেই। তা বলে কি আমাদের সব গেল? সমাজের নৈতিক চোখে গিরীশ ঘোষ তো নিন্দনীয় ছিলেন, কিন্তু প্রাণ ও প্রেমের

প্রাচুর্যে তিনিই তো ঠাকুরের ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন। আমাদের স্বাভাবিক জীবনের জয়গান তাই এ যুগধর্মে করা হয়েছে। মানুষের মাঝে মানুষের মত বেঁচে থাকার মন্ত্র এ যুগধর্মে লুকিয়ে আছে। জড়সভ্যতার দানের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ বা সামঞ্জস্য স্থাপন এ ধর্মের প্রাণস্বরূপ। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পরস্পরবিরোধী নীতিগুলির মিলনের সূত্র রয়েছে এ ধর্মের মাঝে। এখানেই জন্ম হয়েছে স্বামীজির নববেদান্তের। নিজেদের মহান্ ঐতিহ্য ভুলে তলিয়ে গিয়েছিলাম আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘূর্ণিপাকে। উপনিষদের ধর্ম, বেদের তত্ত্ব, পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের লোক-শিক্ষা ও মাহাত্ম্য হারিয়ে গিয়েছিল আমাদের তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের অবজ্ঞায় ও অজ্ঞতায়—যুগধর্ম সেই হারানো সূত্রটিকেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। খুঁজে পেলাম আমাদের; পশ্চিম থেকে শিক্ষণীয় যা কিছু এবার ভারত থেকেই শিখতে আর আমাদের কোন অসুবিধাই রইলো না। এটাই হল যুগধর্মের সাংস্কৃতিক দিক।

কিন্তু এর ব্যবহারিক দিকটাও কম বড় নয়। অশিক্ষা কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ দেশের অগণিত জনসাধারণকে আপনার বলে ভালবাসতে ও তাদের উন্নতিতে জীবন পণ করতে শেখায় এ ধর্ম। নরেন্দ্রনাথ গুরুর কাছে অনুমতি চাইলেন, নিভৃতে তপস্যা করে আধ্যাত্মিকতার গভীর মাঝে জীবন যাপন করবার জন্য। ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবনের এই তো ধারা। গুরু তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন স্বার্থপর বলে। শুধু আত্মোন্নতির কথা ভাবা তাঁর পক্ষে যে অপরাধ! ওই যে কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারায়ণ পথে ঘাটে তাঁরই কাছে, হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ফেলে তিনি চলে যাবেন লোকালয়ের অন্তরালে তপস্যা করতে! এখানেই সুরু হল স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন। আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে বিভূষিত হয়েও স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। জনসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই সাধকপ্রবর এদেশের রাষ্ট্রীয় চেতনার জনক, নবযুগের প্রবর্তক। পরিব্রাজকের বেশে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি পরম বেদনার সঙ্গে অবনত লুণ্ঠিত দরিদ্র মাতৃভূমির সাথে পরিচিত হলেন। এ বিরাট দেশের বিরাট দুঃখকে তিনি তাঁর সবল বুকের মাঝে পুরে নিলেন। নরনারায়ণ সেবা হল তাঁর ঈশ্বরোপাসনা, মন্ত্র প্রচার করলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষকে ভালবাসা তাই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ-ধর্মের প্রধান কথা। স্বামীজি নিষ্ঠুর হাতে আঘাত দিয়েছেন পচা নোংরা সামাজিক সংস্কারে, জাতিভেদের কংকালের গায়ে, খুঁজে পেয়েছেন মহামানবকে সকল মানুষের মাঝে জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায়। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—বৈষ্ণব কবির এ উক্তিকে রূপায়িত করেছেন স্বামীজি তাঁর কর্মধারার মাঝে, আর একেই অবলম্বন করে সাধন পথে চলেছেন তাঁরই সৃষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু ও কর্মিগণ। আর কোন দেশে মানুষকে এত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না। আর কোন ধর্ম সকল মানুষকে এমন আপন করে ডাক দিয়েছে কিনা তাও জানি না। পশ্চিমে তো মানুষ যন্ত্রস্বরূপ; যে কলে সে কাজ করে, তারই এক অংশ বা অঙ্গ মাত্র সে। যন্ত্র-সভ্যতায় ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়, শ্রেণী গড়ে উঠে ধনিক আর শ্রমিকের। বর্তমান যুগের শ্রমিক বিগত কালের ক্রীতদাসের অভিনব এক

সংস্করণ মাত্র। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আজ এসেছে পশ্চিমের রাজনীতিতে কার্লমার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের অপরিসীম প্রভাব ও সম্ভাবনা। শ্রমিকের মান ও মূল্য বেড়ে গেছে—আজ তারই দিন। কিন্তু ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদ, এমন কি রাশিয়ার কম্যুনিজ্‌মের প্রসারও ওই জড়বাদেরই কাঠামোর মাঝে। পদদলিত নিঃস্ব সর্বহারাদের মানুষ হিসাবে অধিকার ঠাকুর-স্বামীজি-সৃষ্ট যুগধর্মে যে ভাবে স্বীকার করা হয়েছে শ্রমিকের দেশ বস্তুতান্ত্রিক রাশিয়াও এত বড় স্থান তাদের দিতে পারে নি। যুগধর্ম কম্যুনিজ্‌মের ভারতীয় সংস্করণ ; হিন্দুস্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের পশ্চিমের দিকে তাকানোর দরকার কি? এদেশের মাটিতে মহান্ জীবন দিয়ে গড়া আদর্শের অভাব নেই, অভাব শুধু একে কাজে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টার। স্বামীজির বাণী স্বামীজির কাজ—এদেরই মাঝে লুকিয়ে আছে ভারতীয় কম্যুনিজ্‌ম্—যা সকল মানুষকে সমান ভাবে থাকার অধিকার তো দেবেই, তা ছাড়া আরোও শেখাবে মানুষকে নারায়ণরূপে দেখতে, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মময় বলিষ্ঠ রাজনৈতিক জীবনে এ কম্যুনিজ্‌মকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মধ্যে না আছে গান্ধীবাদের আতিশয্য না মার্কস্‌বাদের। এ দু'য়ের সমন্বয় সুভাষচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। এখানেই তিনি তাঁর আদর্শরূপে বরণ করেছেন স্বামীজিকে। দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ সুভাষচন্দ্র হিন্দুস্থানের মানসলোকে তাই একচ্ছত্র সম্রাটরূপে চিরপূজিত। পূর্বেই বলেছি যুগধর্ম শুধু বিশ্বাতীত একটি দার্শনিক তত্ত্ব এবং নির্গুণ ঈশ্বরোপাসনা নয়। মাটির পৃথিবীর মানুষের থাকা, খাওয়াপরা, সুস্থ দেহ, সুস্থ জীবন লাভ করা—এ সব ব্যাপার মোটেই উপেক্ষিত হয় নি এধর্মে। স্বামীজি বলতেন—খালি পেটে ধর্ম হয় না ; উৎসাহ দিতেন ছেলেদের 'বম্ বম্' করে কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে দেবদেবীর পূজা না করে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলে শরীরের মাংসপেশী সবল করে তুলতে। ভারতীয় নারীদের জন্যও অনেক ভেবেছেন তিনি। "নারী নরকের দ্বার"—এ ধারণাকে ঘৃণা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দীক্ষা নিয়েছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে—স্ত্রীকে পাশে রেখে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি পুরুষের জীবনে নারীর যোগ্য স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন। স্বামীজিও তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় প্রাচীন ভারতের মহীয়সী বেদবাদিনী নারীদের আদর্শে বর্তমান যুগের নারীদের জীবন গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে গেছেন। নারীকে বঞ্চিত করে কিম্বা বাদ দিয়ে যে জাতি গঠন হয় না—নরের সঙ্গে নারীরও যে সুশিক্ষার প্রয়োজন—যুগধর্ম এ কথাই বলে।

যুগধর্মের আর এক বিশেষত্ব তার উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। এ বিষয়েও প্রাচীন ভারতের সুস্থ ঐতিহ্যটিকে বর্তমান যুগের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের সাম্‌নে স্থাপন করেছেন। তিনি বলতেন—'যত মত তত পথ'। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং সকল মতে সম শ্রদ্ধা যুগধর্মের প্রাণ। ঠাকুর নিজের জীবনে হিন্দুধর্ম ছাড়া খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামধর্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন। হিন্দু হিসাবে তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান হিসাবে খাঁটি পাদ্রী, আর মুসলমান হিসাবে গোঁড়া মোল্লা। সকল ধর্মই যে মানুষকে একই লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়, এটি তিনি নিজের জীবনে সাধনা করে প্রমাণ করেছেন। থাক্‌না পথের বিভিন্নতা! তার জন্য কেন থাকবে ঝগড়া বা মনান্তর? 'যত মত তত পথ'—কী সরল অতলস্পর্শী এই বাণী! এ নূতন কথা নয় আমাদের দেশে, কিন্তু একে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ঠাকুর আবার এ সত্যের

সূত্রটুকু আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। যদি একে নিয়ে আমরা জীবনপথে চল্‌তে পারতাম, তবে হয়তো আসতো না এ বিভীষিকাময় সর্বনাশা হিন্দুমুস্লিম দ্বন্দ্ব—যা ভারতের ধন প্রাণ শুধু ধ্বংস কর্‌ছে না, সমগ্র জাতীয় ঐতিহ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ধারা বিংশ শতাব্দীতে আজ প্রবাহিত হচ্ছে, তার উৎপত্তি ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁসের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ যুগধর্মে—যার জনক শ্রীরামকৃষ্ণদেব। দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকার জন্য যে সব যেতে বসেছে, নকল বিদেশী সভ্যতার মোহ যে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধের মত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্মের নামে জাতির নামে লোকাচার ও বজ্জাতি যে ধর্মের প্রাণকে গলা টিপে মারছে, এ প্রাচীন দেশের মহান্ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যে উদ্ধার কর্‌তে হবে, অবলম্বন কর্‌তে হবে আর দাঁড়াতে হবে জড়বাদের মুখোমুখি—যাতে সমান দাবীতে তার কাছ থেকে নিতে পারি, তাকে দিতে পারি—এ সকল বোধ একে একে আমাদের মনে উদয় হতে লাগ্‌লো। জাতি হিসাবে জেগে উঠে আমরা দেখ্‌লাম রাজনৈতিক স্বাধিকার হারিয়েই আমাদের সব গেছে। এখান থেকে সুরু হ'ল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস।

আর বাংলাদেশ থেকেই এর আরম্ভ, কারণ যে রেনেশাঁসের কথা উল্লেখ করেছি তার জন্ম ও প্রচার তো এ বাংলাদেশেই। বাংলা যে প্রথম আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এ ঐতিহাসিক অনুবর্ত্তনের পরিণতি। স্বামীজির জীবন ও বাণী প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিয়েছে জাগ্রত এই আন্দোলনকে। ইহা ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, আর আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যে ধর্মকে বাদ দিয়ে চলে না, চলতে পারে না, তা তো আমরা কংগ্রেসের প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর জীবন দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। তিলক, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, চিত্তরঞ্জন, সর্বোপরি গান্ধীজি—এঁদের সবার রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে স্বামীজির প্রচারিত ধর্মের উদার অসাম্প্রদায়িক দার্শনিক দিকটি। গান্ধীজির জীবন তো একটানা সত্যের সন্ধানে রত জীবন। সত্যই তিনি "a saint among statesmen, a statesman among saints."

শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজির কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওযুগের অন্যান্য মহাপুরুষদের কথাও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবতে হবে। দয়ানন্দ সরস্বতী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সত্যদ্রষ্টাগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঐ একই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন—এঁরাই ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁসকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, হিন্দুমেলা, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতির দান ওই রেনেশাঁসকে সমৃদ্ধ করতে কম নয়।

ভারতের এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু এদেশকে নয় পশ্চিমের চিন্তাধারাকেও কম প্রভাবান্বিত করে নি। এর জন্যও মূলতঃ দায়ী স্বামীজি যিনি ভারতের সংস্কৃতি দিয়ে বিশ্ববিজয় করেছিলেন। নিরীশ্বর জড়বাদের আবর্তে পশ্চিম আজ দিশেহারা—হৃদয়কে বাদ দিয়ে তারা যে গগনস্পর্শী সৌধ গড়ে তুলেছে, তার তলায় যেন বিরাট ফাঁকি। এ যেন চোরাবালির ভিত্তির উপর স্থাপিত—যা মাঝে মাঝে ধ্বসে পড়ে। জড়বাদী রাক্ষসের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—থেকে থেকে সে ডাক দেয় "ম্যায় ভুখা হুঁ"। হিংসায় উন্মত্ত হয় পৃথ্বী—বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়—সমগ্র মানব-সভ্যতা ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। তাই ফ্রান্সের মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ ইউরোপকে বিশেষ করে যুগধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা-

নন্দের আদর্শ বুঝে নিতে বলেছেন—তবেই পশ্চিম বাঁচবে ও তথায় শান্তি বিরাজমান থাকবে। হাক্সলি প্রমুখ চিন্তানায়কগণও পূর্ব দেশের আধ্যাত্মিকতাকে বুঝতে ও ইউরোপকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু ওদেশের কথা যাক এদেশবাসী আমরাই কি নিজেদের গড়ে তুলতে পেরেছি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর দেওয়া আদর্শ অনুসারে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তোষজনক নয়। আজ আমাদের রাজনৈতিক জীবনাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতার সিংহদ্বারে নাকি এসে আমরা দাঁড়িয়েছি—কিন্তু এ কি ভীষণ অন্ধকার আমাদের সামনে! চারিদিক থেকে একটা কালো ধোঁয়া জমাট বেঁধে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। বাংলার অবস্থা সবচাইতে বেশী শোচনীয়—অথচ এ বাংলাই বর্তমান ভারতের ব্যাপক জাগরণের প্রথম দীপশিখাটি জ্বালিয়েছিল। রাজনীতিকে ঘিরে আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর একটানা দুর্ভিক্ষ অনটন ও মহামারী, তার সাথে চূড়ান্ত অনৈক্য, অসংখ্য মতবাদ, কুৎসিত স্বার্থপরতা, চরম অসাধুতা ও কালোবাজারি জোচ্চুরী—এসব এসে বাংগালী জীবনের সকল সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করেছে।

একদা বুকের পাঁজর দিয়ে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে বাংগালী স্বাধীনতা লাভের দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথে একাকী নির্ভয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, সে যাত্রা আজ হঠাৎ এ দীর্ঘপথ চলার ক্লান্তিতেই যেন থেমে আসার উপক্রম হয়েছে। ত্যাগ, চরিত্রসংগঠন, শক্তি ও আদর্শপ্রিয়তার বদলে আজ তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে মতবাদের দলাদলি, ধর্মহীন রাজনীতির কচ্‌কচানি, আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে উচ্ছৃংখলতা। এদেশে বর্তমানে শক্তিশালী একদল গড়ে উঠেছে, যাদের প্রভাব তরুণ-তরুণীর উপর খুব বেশী—এরা এদেশের ঐতিহ্য কিছুই মানে না, রাশিয়ার দিকে সর্বদা সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে—স্বাভাবিক জীবনের বদলে এক কৃত্রিম জীবনের মোহ এদের গ্রাস করেছে। সর্বোপরি বাইরে থেকে আঘাতের পর আঘাত এসে বাংগালীকে যেন একেবারে নির্জীব ও শক্তিহীন করে ফেলেছে। আমাদের আভ্যন্তরীণ গলদগুলি না শুধরে, পুঞ্জীভূত সামাজিক কুসংস্কার ও শত ভেদ-বিভেদ ও অসাম্যকে দূর না করেই আমরা এগিয়েছিলাম বড় বড় কাজ করতে। কিন্তু চালাকি দ্বারা তো কোন মহৎ কার্য হয় না। তাই এসেছে সাময়িক ভাবে আমাদের জীবনে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া।

এসময় আবার নূতন করে স্মরণ করা দরকার আমাদের ঠাকুর-স্বামীজি, আমাদের বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের কথা। এ চরম দুর্দিনে তাঁদের জীবন থেকেই আবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আনন্দঘন পরিবেশের মাঝে আজ যদি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা নূতন করে অন্তরে গেঁথে নিতে পারি, তবেই আবার আসবে আমাদের জীবনে উৎসাহ, কর্মশক্তি ও একতা ঐ বলিষ্ঠ ধর্মাদর্শের প্রভাবে। এই জন্মোৎসব সভার সার্থকতাই এখানে। জন্মতিথি পালনের এ উৎসবকে শুধু উৎসব বলে যেন আমরা না গ্রহণ করি—উৎসবের অনাবিল আনন্দের মাঝে আমাদের অন্তর-বীণায় বেজে উঠুক তাঁরই গান, তাঁরই বাণী। এ বিশ্বাস যেন আমাদের থাকে যে এত বড় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে আমরা কখনও মুছে যাবো না এ ধরার বুক থেকে। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি এত শীগ্‌গির যাবার নয়, তা যতই আঘাত বাইরে থেকে এর গায়ে লাগুক না কেন। আমাদের উত্তরাধিকার বোধ দেবে আমাদের উৎসাহ একতা ও শক্তি, শক্তি এনে দেবে মুক্তি, যে মুক্তির আশায় আজ আমরা শ্মশান জাগিয়ে বসে আছি।
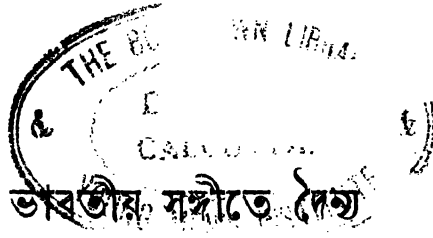
ভারতীয় সঙ্গীতে দৈন্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সঙ্গীতে 'দৈন্য' বল্‌তে আমাদের একথা বলারই উদ্দেশ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতের সাধক সঙ্গীত কলার রীতিমত চর্চা বা সাধনা করেন সত্য, কিন্তু সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপকে জানার আগ্রহ তাঁদের অনেকের আছে ব'লে আমরা বিশ্বাস বেশী করি না সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপ তার ক্রিয়াংশ (practical) ও উপপত্তিকাংশ (theoretical) এ দুটো নিয়ে গড়ে উঠেছে। মানুষের মনে সন্দেহ ও প্রশ্নের অবকাশ চিরদিনই থাকবে; আমাদের তাই উচিত সে সন্দেহের নিরসন ক'রে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করা।

সঙ্গীত আমরা আচার্য বা উস্তাদের কাছে নিষ্ঠার সঙ্গেই শিখি। ধৈর্যের আমাদের ত্রুটী থাকে না, অধ্যবসায়ও যথেষ্ট থাকে, গানের বাদী, সংবাদী ও বিবাদী স্বর জানাতেও আমাদের কার্পণ্য থাকে না, স্বরলিপি ও স্বরের জ্ঞান আমরা আয়ত্ত করি; গলায় স্বর, সুর বা রাগ-রাগিণীর যথাযথ প্রকাশ করায় আমাদের যত্ন অবশ্যই থাকে, অথচ এসকল অটুট থাক্‌লেও আমরা এসবকে ঠিক ঠিক পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ বল্‌তে কিন্তু গররাজী। স্বর, সুর অথবা রাগ-রাগিণীর ঠাট বা গঠন, বৈশিষ্ট্য, তাদের ধ্যান, রস ও ভাব অক্ষুণ্ণ থাক্‌লেও সুরের দরদ ও মিষ্টতার অভাবকেও না হয় আমরা তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখ্‌তে পারি; ঘরোয়ানাভেদে একই রাগ বা একই রাগিণীর গঠন ও বিস্তার-প্রণালীতে ভেদ ও ঠাট-বৈষম্য প্রকাশ পেলেও বৈচিত্র্যকে সম্মান দেওয়ার খাতিরে আমরা না হয় তাকে মেনেও নিতে পারি, কিন্তু রাগ-রাগিণী, স্বর ও ঠাটের গঠনভঙ্গীর ভেদ সময় অনুসারে কেন হ'ল, সামাজিক পরিবেশ প্রাকৃতিক প্রভাব ও বিজ্ঞানের নীতি-কৌশল তাদের পেছনে সত্যিই কিছু আছে কি না—এসবের মীমাংসা যদি আমরা না করতে পারি তবে দুঃখের কথা ব'লেই স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেমন সূর্য না ওঠার আগে গান করি আমরা ভৈরব তথা ভৈরোঁ রাগ। ভৈরবকে আমরা রাগিণী না ব'লে 'রাগ' বলি, কেন না আধুনিক সঙ্গীতশাস্ত্রে ভৈরবকে পুরুষ ব'লে গণ্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাগ ও রাগিণী—স্ত্রী-পুরুষ এরকম ভাগ করার সঙ্গীতে কোন সার্থকতা নেই, কারণ রাগই সব। তবে রাগ ও রাগিণী এরকম ভাগ করার অর্থ হ'ল তাদের রস-পরিবেশন এবং প্রকৃতি ও গঠনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার জন্যে। অনেকের মতে রাগ ও রাগিণী এ রকম ভাগ করাটা নিরর্থক অথবা পাগলামীরই নামান্তর। কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার চতুর কল্লিনাথ এরকম মন্তব্য করায় আপত্তি জানিয়েছেন। শাস্ত্রকারদের মতে স্ত্রী-পুরুষ ভাগ করার অন্তর্নিহিত রহস্য একটা আছে যেটা সাধারণতঃ আমরা জানি না ব'লেও লজ্জার কোন কারণ নেই। তারপর ভৈরব-রাগ গান করা হয় সূর্য ওঠার ঠিক আগে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে—কেন? ঠিক সূর্য ওঠার আগেই ভৈরব-রাগ আলাপ না ক'রে যদি আমরা সন্ধ্যার সময় তার গান বা আলাপ করি তবে তাতে ক্ষতি কি হয়? সাধারণতঃ সঙ্গীত-সাধকেরা বল্‌বেন—

রাগভ্রংশ হয়। কিন্তু রাগভ্রংশ হবার কারণই বা তার অঙ্গে কি থাকতে পারে? কারণ সন্ধ্যায় গাইলেও ভৈরব-রাগের ঠাট, রূপ ও রস-পরিবেশনের বৈশিষ্ট্যে কোনই ব্যতিক্রম হয় না। অথচ শাস্ত্রকারেরা (যদিও তাঁরা আধুনিক) বলেছেন, ভৈরবকে প্রত্যূষেই গাইতে হবে, নইলে রাগ-রূপের ব্যতিক্রম হবে। ললিত-রাগিণীতে প্রভাত তথা সূর্যকে ওঠবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভৈরব-রাগ দিয়ে সূর্যকে রীতি-মত আরতির অর্ঘ্য দান করা হয়। কাজেই বুঝতে হবে যে, ভৈরব-রাগের স্বরবৈচিত্র্যে ও স্বরগুলির বিস্তারে এমনি একটি শক্তি আছে যার প্রভাব ও পরিবেশনের সঙ্গে সূর্যের অভ্যুদয়-কাল ও প্রভাতের ভাব ও পরিবেশের সম্পূর্ণ একটি মিল আছে। এখন জিজ্ঞাসা হ'তে পারে সে মিলটি কি? স্বর তো শব্দতরঙ্গের সমষ্টিমাত্র; তবে শব্দে রস আছে ও রসের ভাব-প্রকাশক সামর্থ্যও আছে। কাজেই আমাদের জানা দরকার যে, ভৈরব-রাগ গান করলে কি শক্তির প্রভাবে প্রভাতের গাম্ভীর্য ও প্রশান্ত ভাবের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

শুধু তাই নয়, ভৈরব-রাগে যে স্বর-বিন্যাস করা আছে তার ভেতর ব্যাকরণ (Grammar) ছাড়াও বিজ্ঞানের কোন ইঙ্গিত আছে কিনা আমাদের জানা উচিত। যদি থাকে তবে তা-ই বা কি? তা ছাড়া ভৈরবের আবার রূপভেদ আছে। পণ্ডিত দামোদর তাঁর সঙ্গীতদর্পণে তিন চার রকম ভৈরবের পরিচয় দিয়েছেন। তা ছাড়া সম্পূর্ণ তিন রকম ওড়ব ও ষাড়ব ভৈরবের কথাও শাস্ত্রেই বলা আছে। সম্পূর্ণের ভেতরে প্রথম রকম—আরোহণে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণেও তাই, দ্বিতীয়—আরোহণে কোমল নিষাদ ও অবরোহণেও তাই, আর তৃতীয়—আরোহণে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণে উভয় নিষাদ। তা ছাড়া পাঁচ স্বরের সমষ্টি ওড়ব এক রকম ও ছ'স্বরের সমষ্টি ষাড়ব আর এক রকম। পণ্ডিত অহোবল তাঁর সঙ্গীত-পারিজাতেও ওড়ব ভৈরবের পরিচয় দিয়েছেন। এই তো গেল স্বর-রূপের ভেদ। আধুনিক কালের রচনা হ'লেও রাগগুলির ধ্যানেরও রচনা-স্বাতন্ত্র্য আছে। কাজেই এই সকলের সমন্বয় ভাব-জগতের দিক থেকে কি ভাবে সঙ্গীতে করা যায় তারো উপায় আমাদের জানা উচিত।

এর পর ভৈরব-রাগে সাতটি স্বরের ভেতরে দুটি স্বর আবার কোমল। কোন কোন জায়গায় তিনটি স্বর। দুটি কোমল স্বর যেমন ঋষভ ও ধৈবত, আর তিনটি কোমল স্বর যেমন ঋষভ, ধৈবত ও নিষাদ। এ ছাড়া একটিমাত্র কোমল স্বরের কথারও উল্লেখ আছে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, কতকগুলি স্বর কোমলই বা করব কেন? যদি বলি তা হ'লে রাগ-রূপই তৈরী হবে না। কিন্তু আবার যদি বলি কেন হবে না?—সে প্রশ্নের উত্তরও আমাদের যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভাবেই দিতে হবে। আচার্য অথবা উস্তাদজীর ঘরোয়ানা ব'ল্লে কিন্তু ঠিক বলা হবে না। সমস্ত কথার শাস্ত্রে উল্লেখ আছে আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু শাস্ত্রকারের সে বিষয়ে সত্যিকার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি—সে রহস্যের সমাধানও আমাদের অবশ্য করা উচিত। এখানেই সমস্যার সমাধান নয়; কোমলেও আবার 'তর' ও 'তম' আছে। কৈশিক-নিষাদ কিছু কাকলি-নিষাদ নয়; চ্যুতষড়্জ কিছু অচ্যুতষড়্জ নয়, অথবা সাধারণ-গান্ধার কিছু অন্তর-গান্ধার নয়। এরকম ভেদ মধ্যম ও পঞ্চমেও আছে। তীব্র ও কোমলেও তফাৎ আছে। এর সমাধান যদিও বাইশ শ্রুতির মারফতে দেখয়াতে বিশেষ কিছু কষ্ট পেতে হবে না, তবুও কেন একই স্বরের ভেদ ও বিভাগ শাস্ত্রকারেরা করেছেন

এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তাঁরা করেছেন এর একটি সদুত্তর আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। উত্তর অত্যন্ত কঠিন না হ'লেও আমাদের বক্তব্য হ'চ্ছে এ সকলেরই রহস্য-কথা সাধকমাত্রেরই জানা দরকার, সরল অথবা কঠিনের প্রশ্ন অবান্তর মাত্র। তা ছাড়া শ্রুতি, অলঙ্কার, মূর্ছনা, তান, বাট, গমক, মীড় এ সবেরও ঐতিহাসিক ও বৈকাশিক জন্মকথার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সাধনার তাদের ব্যবহারের উপযোগিতাকেও আমাদের জান্‌তে হবে; আর এজন্যেই আমরা আগে বলেছি যে, সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপ আমাদের জানার আগ্রহ চাই। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি—এসব জানার আগ্রহ আমাদের অনেকের ভেতরই নেই। ভৈরব-রাগ সম্বন্ধে জানার যে রকম খুঁটিনাটি আছে, সকল রাগ-রাগিণীর বেলায়ও ঐ এক কথা। সঙ্গীতের সাধনা ও অনুশীলন যাঁরা করেন তাঁদের অন্তত সঙ্গীতের পরিপূর্ণ মূর্তি জানা উচিত। সঙ্গীতামোদী ও ঐতিহাসিকদের পক্ষেও তাই। বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনার যথেষ্ট উন্নতি হ'লেও সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপ বা মূর্তি ও ইতিহাস জানার আগ্রহে দৈন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। দেশের সুপ্রভাতের ও সব-কিছুর দীনতা দূরের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের দৈন্যও সমাজ ও সাধকের মন থেকে দূর করা উচিত; আর এ দায়িত্বের ভার বেশীর ভাগ সঙ্গীতকলা ও শাস্ত্র নিয়ে যাঁরা সত্যিকার অনুশীলন করেন তাঁদের ওপরই রয়েছে।

কালরাত্রি

শ্রীসংযুক্তা কর

ঘনাইছে কাল অমানিশা।
পঙ্গু আজ পৃথিবীর মাটি,
পিশাচের হাঁক যায় শোনা,
অমঙ্গল ছায়া যত করে আনাগোনা,
দিকে দিকে বাজে যেন প্রলয়-ঝঙ্কার
নামিছে কি মৃত্যুর আঁধার?

শান্তি-হারা ক্ষুব্ধ কলরোলে,
তৃণে তৃণে পুষ্পে পুষ্পে শ্বসিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
জীর্ণ হ'লো শান্ত শিব রূপ,
সুন্দরের পূজারীরা হারায়েছে প্রাণ,
নিঃশ্বাস উঠিছে শুধু কামনার ধূপ,
শুব্ধ আজ কল্যাণের শান্ত শিব গান।

হানো হানো পদাঘাত তব
মৃত্যুরূপা কালরাত্রি এস নেচে নেচে,
যুগান্তের কলঙ্কিত আবর্জনা যত
ফুৎকারেতে যায় উড়ে ছিঁড়ে
বাসনার শিখা-ভরা ধরণীর বুক
টলমল হো'ক্‌ পদভরে।

ক্ষান্ত হোক্‌ পূজার ছলনা
মূক হোক্‌ শক্তির ভান উপাসনা,
ডমরুর তালে তালে গ্লানি
ঝরাফুল সম খসে যাক্‌
ধ্বংসের স্তূপের পরে শুধু
পদচিহ্ন তব জেগে থাক্‌

ব্রহ্মসূত্র-বিচারসার

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

প্রথম পাদ

১। জিজ্ঞাসাধিকরণ (১) ১।১।১

বিষয়—বেদান্তবাক্য-বিচার।

সংশয়—বেদান্তবাক্য কিংবা ব্রহ্মবিচার কর্তব্য কিনা?

সিদ্ধান্ত— কর্তব্য।

২। জন্মাদ্যধিকরণ (২) ১।১।২

বিষয়—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, (তৈঃ উঃ ৩।১)

সংশয়—জন্মাদি ব্রহ্মলক্ষণ কিনা?

সিদ্ধান্ত—জন্মাদি ব্রহ্মলক্ষণ (তটস্থ) সত্যাদি (স্বরূপ)

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ (১) (৩) ১।১।৩

বিষয়—অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ (বৃঃ উঃ ২।৪।১০)

সংশয়—ব্রহ্ম বেদকর্তা বলিয়া সর্বজ্ঞ কিনা?

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম বেদকর্তা বলিয়া সর্বজ্ঞ।

ঐ (২)

বিষয়—তং তু ঔপনিষদং পুরুষম্ (বৃঃ উঃ)

সংশয়—ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকগম্য কিনা?

সিদ্ধান্ত – ব্রহ্মশাস্ত্রৈকগম্য।

৪। সমন্বয়াধিকরণ (৪) ১।১।৪

বিষয়—সমুদয় বেদান্ত।

সংশয়—বেদান্ত কর্মাঙ্গ দেবতা বা কর্ত্রাদিপর কিংবা নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মপর?

সিদ্ধান্ত—বেদান্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মপর।

৫। ঈক্ষত্যধিকরণ (৫) ১।১।৫

বিষয়—সদেব…তদৈক্ষত (ছাঃ উঃ)

সংশয়—সৎশব্দবাচ্য জগদুপাদান প্রধান কি ব্রহ্ম?

সিদ্ধান্ত—সৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম জগদুপাদান।

৬। আনন্দময়াধিকরণ (১)(৬) ১।১।১২

বিষয়—অন্নময়ঃ…অন্যঃ অন্তরঃ আত্মানন্দময়ঃ (তৈঃ উঃ ২।৫)

সংশয়—আনন্দময় ব্রহ্ম কি জীব?

সিদ্ধান্ত—আনন্দময় পরমাত্মা।

ঐ (২)

বিষয়—ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈঃ উঃ ২।৫)

সংশয়—এখানে ব্রহ্ম কি আনন্দময়ের অবয়ব কিংবা স্বপ্রধান?

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম স্বপ্রধান।

৭। অন্তরধিকরণ (৭) ১।১।২০

বিষয়—এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ (ছাঃ উঃ ১।৬।৬)

সংশয়—এই পুরুষ কোন উন্নত সংসারী অথবা পরমেশ্বর?

সিদ্ধান্ত—ইনি পরমেশ্বর।

৮। আকাশাধিকরণ (৮) ১।১।২২

বিষয়—অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি আকাশঃ (ছাঃ উঃ ১।৯।১)

সংশয়—আকাশ কি ভূতাকাশ অথবা পরব্রহ্ম?

সিদ্ধান্ত—এই আকাশ ব্রহ্ম।

৯। প্রাণাধিকরণ (৯) ১।১।২৩

বিষয়—কতমা সা দেবতা ইতি প্রাণ ইতি হোবাচ (ছাঃ উঃ ১।১১।৪-৫)

সংশয়—এই প্রাণ কি ব্রহ্ম বা বায়ুবিকার?

সিদ্ধান্ত—এই প্রাণ ব্রহ্ম।

১০। জ্যোতিশ্চরণাধিকরণ (১০) ১।১।২৪

বিষয়—যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই জ্যোতিঃ কি তেজঃ বা ব্রহ্ম ?

-এই জ্যোতিঃ ব্রহ্ম।

১১। প্রাতর্দনাধিকরণ (১১) ১।১।২৮

বিষয়—প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা। (কৌষীঃ উঃ)

সংশয়—এই প্রাণ কি বায়ু, কি ইন্দ্র, কি জীব অথবা পরব্রহ্ম ?

সিদ্ধান্ত—এই প্রাণ ব্রহ্ম।

২য় পাদ

১। সর্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণ (১২) ১।২।১

বিষয়—স ক্রতুং কুর্বীত, মনোময়ঃ (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই উপাস্য মনোময় কি শারীর, না পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—এই উপাস্য মনোময় পরমাত্মা।

২। অত্রধিকরণ (১৩) ১।২।৯

বিষয়—যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতঃ ওদনঃ (কঠঃ উঃ)

সংশয়—এস্থলে অত্তা কি অগ্নি, না জীব, না পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—অত্তা পরমাত্মা।

৩। গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণ (১৪) ১।২।১১

বিষয়—ঋতং পিবন্তৌ···গুহাং প্রবিষ্টৌ (কঠঃ উঃ)

সংশয়—ইহারা কি বুদ্ধি ও জীব কিংবা জীব ও পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—ইহারা জীব ও পরমাত্মা।

৪। অন্তরাধিকরণ (১৫) ১।২।১৩

বিষয়—যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই অক্ষির অন্তর পুরুষ কি প্রতিবিম্বাদি কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—অক্ষির অন্তর পরমাত্মা।

৫। অন্তর্যাম্যধিকরণ (১৬) ১।২।১৮

বিষয়—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্···অন্তর্যাম্যমৃতঃ (বৃঃ উঃ)

সংশয়—এই অন্তর্যামী কি প্রধান, কিংবা অণিমাদি-বিশিষ্ট জীব কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—এই অন্তর্যামী পরমাত্মা।

৬। অদৃশ্যত্বাদ্যধিকরণ (১৭) ১।২।২১

বিষয়—যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ (মুঃ উঃ)

সংশয়—অদৃশ্য কি ভূতযোনিরূপ প্রধান কিংবা শারীর কিংবা পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—ইনি পরমাত্মা।

৭। বৈশ্বানরাধিকরণ (১৮) ১।২।২৪

বিষয়—যঃ তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রং···বৈশ্বানরম্ (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই বৈশ্বানর কি জাঠরাগ্নি, কি ভূতাগ্নি, কি আদিত্যাদি, কি শারীর, কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—বৈশ্বানর পরমাত্মা।

৩য় পাদ

১। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ (১৯) ১।৩।১

বিষয়—যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী ·· (মুণ্ডক)

সংশয়—এই আয়তন কি প্রধান, কি জীব, কি পরব্রহ্ম ?

সিদ্ধান্ত—এই আয়তন ব্রহ্ম।

২। ভূমাধিকরণ (২০) ১।৩।৮

বিষয়—"ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ···" (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই ভূমা কি প্রাণ না পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—ভূমা পরমাত্মা।

৩। অক্ষরাধিকরণ (২১) ১।৩।১০

বিষয়—এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি···অস্থূলম্ (বৃঃ উঃ)

সংশয়—এই অক্ষর কি বর্ণ, কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—এই অক্ষর পরমাত্মা।

৪। ঈক্ষতিকর্মাধিকরণ (২২) ১।৩।১৩

বিষয়—যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি (প্রশ্নঃ উঃ)

সংশয়—এখানে ধ্যেয়বস্তু হিরণ্যগর্ভাখ্য অপর ব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্ম ?

সিদ্ধান্ত—ধ্যাতব্য পরমাত্মাই।

৫। দহরাধিকরণ (২৩) ১।৩।১৪

বিষয়—অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই দহরাকাশ কি ভূতাকাশ, কি জীব, কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—দহরাকাশ পরমাত্মা।

৬। **অনুকৃত্যধিকরণ** (২৪) ১৷৩৷২২

বিষয়—ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রঃ (মুণ্ডক উঃ)

সংশয়—এই সর্বাবভাসক কি তেজোবিশেষ, কি ব্রহ্ম ?

সিদ্ধান্ত—সর্বাবভাসক ব্রহ্ম।

৭। **প্রমিতাধিকরণ** (২৫) ১৷৩৷২৪

বিষয়—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিরিব··(কঠঃ উঃ)

সংশয়—এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব, কি ব্রহ্ম ?

সিদ্ধান্ত—তিনি প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মা।

৮। **দেবতাধিকরণ** (২৬) ১৷৩৷২৬

বিষয়—তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ (বৃঃ উঃ)

সংশয়—দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি নাই ?

সিদ্ধান্ত—অধিকার আছে। কর্মে নাই।

৯। **অপশূদ্রাধিকরণ** (২৭) ১৷৩৷৩৪

বিষয়—অহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব (ছাঃ উঃ)

সংশয়—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি নাই ?

সিদ্ধান্ত—অধিকার নাই।

১০। **কম্পনাধিকরণ** (২৮) ১৷৩৷৩৯

বিষয়—যদিদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ (কঠঃ উঃ)

সংশয়—কম্পন হেতু বায়ুবিকার কি পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—কম্পন হেতু পরমাত্মা।

১১। **জ্যোতিরধিকরণ** (২৯) ১৷৩৷৪০

বিষয়—য এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই জ্যোতিঃ কি আদিত্যাদি তেজঃ অথবা পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—এই জ্যোতিঃ পরমাত্মা।

১২। **অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণ** (৩০) ১৷৩৷৪১

বিষয়—আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ (ছাঃ উঃ)

সংশয়—এই আকাশ কি ভূতাকাশ বা পরমাত্মা ?

সিদ্ধান্ত—এই আকাশ পরমাত্মা।

১৩। **সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যধিকরণ** (৩১) ১৷৩৷৪২

বিষয়—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (বৃঃ উঃ)

সংশয়—এই পুরুষ কি জীব বা ব্রহ্ম, এজন্ত জীবও অভিন্ন কি ভিন্ন ?

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মাভিন্ন জীব ঐ পুরুষ।

৪র্থ পাদ

১। **আনুমানিকাধিকরণ** (৩২) ১৷৪৷১

বিষয়—মহতঃ পরমব্যক্তম্ (কঠঃ উঃ)

সংশয়—এই অব্যক্ত কি প্রধান, অথবা শরীর ?

সিদ্ধান্ত—অব্যক্ত এখানে শরীর।

২। **চমসাধিকরণ** (৩৩) ১৷৪৷৮

বিষয়—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্ (শ্বেঃ উঃ)

সংশয়—অজা কি প্রধান অথবা তেজঃ অপ্‌ অন্নাত্মক অবান্তর প্রকৃতি ?

সিদ্ধান্ত—অজা এখানে অবান্তর প্রকৃতি।

৩। **সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ** (৩৪) ১৷৪৷১১

বিষয়—যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ (বৃঃ উঃ)

সংশয়—এখানে পঞ্চ পঞ্চ জন কি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রধান অথবা প্রাণাদি ?

সিদ্ধান্ত—পঞ্চ পঞ্চ জন এখানে প্রাণ।

৪। **কারণত্বাধিকরণ** (৩৫) ১৷৪৷১৪

বিষয়—জগৎকারণত্বাদিবাক্য

সংশয়—শ্রুতিতে জগৎকারণত্বাদি বাক্য ব্রহ্মকে বুঝায় অথবা বুঝায় না ?

সিদ্ধান্ত—জগৎকারণত্বাদি বাক্য ব্রহ্মবোধক।

৫। **বালাক্যধিকরণ** (৩৬) ১৷৪৷১৬

বিষয়—যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা··· স বৈ বেদিতব্যঃ (কৌষী: উপঃ)

সংশয়—এই বেদিতব্য কি প্রাণ, কি জীব কিংবা পরমাত্মা ?
সিদ্ধান্ত—এই পুরুষাদির কর্তা পরমাত্মা।

৬। **বাক্যান্বয়াধিকরণ** (৩৭) ১।৪।১৯

বিষয়—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ (বৃঃ উঃ)
সংশয়—এই দ্রষ্টব্য কি জীব বা পরমাত্মা ?
সিদ্ধান্ত—এই দ্রষ্টব্য পরমাত্মা।

৭। **প্রকৃত্যধিকরণ** (৩৮) ১।৪।২৩

বিষয়—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান শ্রুতি (ছাঃ উঃ)
সংশয়—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ বা উপাদান কারণও ?
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত উপাদান উভয়বিধ কারণ।

৮। **সর্বব্যাখ্যানাধিকরণ** (৩৯) ১।৪।২৮

বিষয়—বেদান্ত
সংশয়—পরমাণু ও শূন্যাদি ও ব্রহ্মের ন্যায় জগৎকারণ কিংবা সর্বত্র ব্রহ্মই জগৎকারণ ?
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়াধ্যায়, স্বমতস্থাপন-১ম পাদ

১। **স্মৃত্যধিকরণ** (৪০) ২।১।১

বিষয়—(সাংখ্যস্মৃতির সহিত সমন্বয়ের বিরোধ)
সংশয়—উক্ত প্রথমাধ্যায়ের সমন্বয় সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরুদ্ধ কি না ?
সিদ্ধান্ত—উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় না। কারণ সাংখ্য-স্মৃতি অপ্রমাণ।

২। **যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ** (৪১) ২।১।৩

বিষয়—(যোগস্মৃতির সহিত সমন্বয়ের বিরোধ)
সংশয়—উক্ত প্রথমাধ্যায়ের সমন্বয়ের সহিত যোগ-স্মৃতির বিরোধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—বিরুদ্ধ হয় না। কারণ, প্রধানবাদ অপ্রমাণ।

৩। **বিলক্ষণত্বাধিকরণ** (৪২) ২।১।৪

বিষয়—(তর্কের সহিত উক্ত সমন্বয়ের বিরোধ)
সংশয়—যেহেতু দ্রব্য সেই হেতু আকাশাদি চেতন প্রকৃতিময়,—এই তর্কের সহিত সমন্বয়ের বিরোধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—আগম-বিরোধী তর্ক অপ্রমাণ বলিয়া বিরুদ্ধ হয় না।

৪। **শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ** (৪৩) ২।১।১২

বিষয়—(অন্য তর্কের সহিত উক্ত সমন্বয়ের বিরোধ)
সংশয়—বিভু বলিয়া ব্রহ্ম জগদুপাদান নয় এই তর্কের সহিত উক্ত সমন্বয়ের বিরোধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—এই তর্ক বেদবাধিত বলিয়া বিরোধ নাই।

৫। **ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ** (৪৪) ২।১।১৩

বিষয়—(অন্য তর্কের সহিত উক্ত সমন্বয়ের বিরোধ)
সংশয়—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি বলায় প্রত্যক্ষ-দ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—কল্পিত ভেদ থাকায় প্রত্যক্ষ বিরোধ হয় না।

৬। **আরম্ভণাধিকরণ** (৪৫) ২।১।১৪

বিষয়—(পূর্ববৎ)
সংশয়—অদ্বৈতব্রহ্ম বলিলে ভেদপ্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—কার্যকারণ অভিন্ন বলিয়া বিরোধ নাই।

৭। **ইতরব্যপদেশাধিকরণ** (৪৬) ২।১।২১

বিষয়—(পূর্ববৎ)
সংশয়—জীবাভিন্ন ব্রহ্ম জগদুপাদান মতে উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—বিরোধ হয় না।

৮। **উপসংহারদর্শনাধিকরণ** (৪৭) ২।১।২৪

বিষয়—(পূর্ববৎ)
সংশয়—ব্রহ্ম উপাদান বা কর্তা নহেন, কারণ, তিনি অসহায়, এই তর্কহেতু ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা—বলিলে সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—দুগ্ধ অসহায় হইয়াও দধি হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মই জগদাকার হন—এজন্য সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় না।

৯। **কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ** (৪৮) ২।১।২৬

বিষয়—(পূর্ববৎ)
সংশয়—সাবয়ব বস্তুই নানা আকারে পরিণত হয়, ব্রহ্ম নিরবয়ব, এ জন্য ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি বলিলে সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ?
সিদ্ধান্ত—শব্দমূল শ্রুতি থাকায় বিরোধ হয় না।

১০। সর্বোপেতাধিকরণ (৪৯) ২।১।৩০

বিষয়—(পূর্ববৎ)

সংশয়—অশরীরের মায়া নাই এই ন্যায়ে মায়ী ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি বলিলে সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় কি

সিদ্ধান্ত—সর্বশক্তি ব্রহ্ম এই শ্রুতি থাকায় বিরুদ্ধ হয় না।

১১। প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ (৫০) ২।১।৩২

বিষয়—(পূর্ববৎ)

সংশয়—ব্রহ্ম নিষ্ফল সৃষ্টি করেন না এই ন্যায়ে আপ্তকামের জগৎসৃষ্টি সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় কি না ?

সিদ্ধান্ত—কেবল লীলা মাত্র বলিয়া বিরুদ্ধ হয় না।

১২। বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ (৫১) ২।১।৩৪

বিষয়—(পূর্ববৎ)

সংশয়—বিষম স্রষ্টা নিন্দনীয়—এই ন্যায় হেতু নিরবদ্য ব্রহ্মের সৃষ্টি বলিলে সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় কি না ?

সিদ্ধান্ত—প্রাণিকর্মসাপেক্ষ সৃষ্টি বলিয়া বিরোধ হয় না।

১৩। সর্বধর্মোপপত্ত্যধিকরণ (৫২) ২।১।৩৭

বিষয়—(পূর্ববৎ)

সংশয়—যাহা নির্গুণ তাহা উপাদান হয় না, যেমন গন্ধ এই ন্যায় হেতু নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি বলিলে সমন্বয়বিরুদ্ধ হয় কি না ?

সিদ্ধান্ত—নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্তোপাদানত্ব বিরুদ্ধ হয় না।

পরমতদূষণ—দ্বিতীয় পাদ

১। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ (৫৩) ১০সূত্র ২।২।১

বিষয়—সাংখ্যসিদ্ধান্ত, অচেতন প্রধান জগদুপাদান।

সংশয়—ঐ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক বা ভ্রান্তিমূলক?

সিদ্ধান্ত—উক্ত সাংখ্য প্রমাণমূলক নহে। অতএব প্রথমাধ্যায়োক্ত সমন্বয়ের বিরোধী হয় না।

২। মহদ্দীর্ঘাধিকরণ (৫৪) ১সূত্র ২।২।১১

বিষয়—চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি বলায় সমন্বয়।

সংশয়—তাহা কি কারণগুণ, কার্যে সমানজাতীয় গুণারম্ভক এই ন্যায়ের বিরোধী হয় কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধী হয়। কারণ পরমাণুর ও দ্ব্যণুকের সংখ্যা হইতে দ্ব্যণুকের ও ত্র্যণুকের পরিমাণ হয়। অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধ হয় না।

৩। পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণ (৫৫) ৬সূত্র ২।২।১২

বিষয়—পরমাণুপ্রক্রিয়া দ্বারা জগদুৎপত্তি।

সংশয়—পরমাণুপ্রক্রিয়া প্রমাণমূলক কি ভ্রান্তিমূলক ?

সিদ্ধান্ত—ভ্রান্তিমূলক পরমাণুকারণবাদ অনুপপন্ন। অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধ হয় না।

৪। সমুদায়াধিকরণ (৫৬) ১০সূত্র ২।২।১৮

বিষয়—(সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধমত)

সংশয়—ঐ মত প্রমাণমূলক বা ভ্রান্তিমূলক।

সিদ্ধান্ত—ভ্রান্তিমূলক। অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধী হয় না।

৫। অভাবাধিকরণ (৫৭) ৫সূত্র ২।২।২৮

বিষয়—বিজ্ঞানবাদ, বাহ্যপদার্থাস্তিত্ব।

সংশয়—উহা প্রমাণমূলক বা ভ্রান্তিমূলক।

সিদ্ধান্ত—বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ অনুভবসিদ্ধ। অতএব উক্ত সমন্বয়ের বিরোধ হয় না।

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ (৫৮) ৪সূত্র ২।২।৩৩

বিষয়—(দিগম্বর মত)

সংশয়—ঐ মত প্রমাণমূলক বা ভ্রান্তিমূলক ?

সিদ্ধান্ত—ভ্রান্তিমূলক। বস্তু অনেকরূপ হয় না অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধ হয় না।

৭। পত্যধিকরণ (৫৯) ৫সূত্র ২।২।৩৭

বিষয়—ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতা এই মহেশ্বর সিদ্ধান্ত।

সংশয়—তাহা প্রমাণমূলক কি ভ্রান্তিমূলক ?

সিদ্ধান্ত—ভ্রান্তিমূলক। কারণ ঈশ্বর অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণ। অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধ হয় না।

৮। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ (৬০) ৪সূত্র ২।২।৪২

বিষয়—ভাগবত সিদ্ধান্ত, জীবাদির উৎপত্তি।

সংশয়—তাহা প্রমাণমূলক বা ভ্রান্তিমূলক।

সিদ্ধান্ত—বেদবিরুদ্ধ জীবোৎপত্তি অংশে তাহা ভ্রান্তিমূলক। অতএব প্রথম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধী হয় না।

ব্রহ্মদেশে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন ১৯০০ খ্রীঃ রেঙ্গুনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার উৎসাহে এবং স্থানীয় বাঙ্গালী ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতি স্থাপিত হয়। উক্ত সমিতি কর্তৃক প্রত্যেক বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ১৯০৫ খ্রীঃ রেঙ্গুনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতি রামকৃষ্ণোৎসবে বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আহ্বান করেন। স্বামীজি তদনুযায়ী মাদ্রাজ হইতে ১৬ই মার্চ জাহাজে চড়িয়া ২০শে মার্চ রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। রেঙ্গুনের গবর্ণমেণ্ট হাউসের ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথিরূপে তিনি তথায় পাঁচ দিন ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম প্রচারক। রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র[১] দিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাদ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ

মহাত্মন্,

আমরা রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সভ্যগণ এই শহরে আপনার শুভাগমন উপলক্ষে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাইতেছি।

বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সীমান্ত দেশ বর্মা ও ভারতের মধ্যে পুরাকাল হইতেই ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বিদ্যমান। আমাদের পূর্বপুরুষগণই বৌদ্ধধর্মের পবিত্র আলোক সমুদ্রপারে এই সুদূর দেশে বহন করিয়াছিলেন। ইহা পরম গৌরব ও পরিতোষের বিষয় যে, বহু শতাব্দীর পরে আমাদের এই জাতীয় অবনতির দিনেও আপনার মত আমাদেরই এক সুযোগ্য স্বদেশবাসী ধর্মপ্রচারের জন্য পুনরায় এই সুন্দর প্যাগোডার দেশে পদার্পণ করিয়াছেন।

আপনাকে আমাদের পরমাত্মীয় মনে হইতেছে। আপনার জীবনে প্রাচীন হিন্দুর ত্যাগাদর্শ যেমন মূর্ত হইয়াছে তেমনি লোককল্যাণার্থ সেবাধর্মও জীবন্ত হইয়াছে। আপনার বিশ্ববিশ্রুত গুরু-ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ যে মহৎ কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন সুদূর ভবিষ্যতে তাহার যে পূর্ণ পরিণতি হইবে তাহার কিঞ্চিদাভাস আমরা আপনার কর্মে দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি।

দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে মহাত্মা শঙ্করাচার্য যে বিরাট ধর্মরাজ্যের পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা, এবং প্রায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনি এবং বিবেকানন্দ-প্রমুখ আপনার শক্তিশালী গুরুভ্রাতাগণ যে বিপুল ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠাপূর্বক জগতে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত ও জাগ্রত হইতেছে।

মহাত্মন্, আপনার নাম, আপনার কার্য এবং

১ মূল ইংরাজি অভিনন্দনটী 'ব্রহ্মবাদিন্' নামক মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরাজি মাসিকে ১৯০৫, মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আপনার জীবন আমাদিগকে আপনার গুরু মহাপুরুষ ও ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অভূতপূর্ব জীবনী ও অমৃতময় বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী ও স্বাস্থ্যবান হইয়া হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানরূপ মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করিয়া হিন্দুজাতিকে সঞ্জীবিত করুন।

আপনার গুণমুগ্ধ ও একান্ত অনুরক্ত
রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সভ্যগণ
রেঙ্গুন, ২০শে মার্চ,
১৯০৫

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রবুদ্ধ ভারত' এপ্রিল সংখ্যায় এবং 'ব্রহ্মবাদিন্' মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায়, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত প্রত্যহ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতা ব্যতীত আরও চারিটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ভি এন শিবায়, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বেদ ও বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতাটী স্কুলে প্যাগোডা রোডস্থিত ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত হয়। হিন্দু সোসিয়াল ক্লাবে 'ভক্তি' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা স্বামীজী দিয়াছিলেন তাহাতে সভাপতি ছিলেন এস সি দত্ত, এম-এ, বি-এল। থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীতে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল "ধর্মসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন"; উহাতে পৌরোহিত্য করেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বি কাওয়াসজি। দুঃখের বিষয় উক্ত বক্তৃতাবলীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বর্তমানে রেঙ্গুনে যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত তাহারই সন্নিকটে একটি প্রশস্ত গৃহে স্বামীজি ছিলেন। গৃহের সম্মুখেই খোলা মাঠের উপর বৃহৎ চাঁদোয়া দিয়া উৎসবমণ্ডপ নির্মিত হইল। ঠাকুর সাজাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হাউসের বাগান হইতে আনীত সুন্দর লতাপাতা ও ফুল দিয়া একটি নিকুঞ্জবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কারুকার্যখচিত সিংহাসনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার দুইপার্শ্বে স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদাদেবীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত চাল, ডাল প্রভৃতি দেখিয়া দরিদ্রদের সম্বন্ধে জনৈক যুবক একটি খারাপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। দরিদ্রগণের মধ্যে অধিকাংশই দানের অযোগ্য এবং ভিক্ষাকে অর্থোপার্জনের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে—এই মন্তব্য শুনিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "ভিখারী ও দুঃখী দরিদ্রদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে ডাকবে। এই নাম স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেছেন। দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদ এনো না। তারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান ভেবে তাদের সমান ভালবাসা দিয়ে সেবা ক'রো। এদের সেবা করবার সুযোগ পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করবে। ভিখারীদের ঘৃণা করো না; কারণ আমরা ওদের চেয়ে কম ভিখারী নই। ওরা কত অল্পে সন্তুষ্ট।" ঐদিন প্রায় তিন শত দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষপূর্বক খাওয়ান হইয়াছিল।

উৎসবের দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আদেশে সমিতির কর্মিগণ প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে ঠাকুর-ঘরের কাজে নিযুক্ত হইলেন। স্বামীজি স্বয়ং নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে লইয়া রায় বাহাদুর রামদাস ভট্টাচার্যের বাগান হইতে নাগেশ্বর চাঁপা ফুল আনিবার জন্য চলিলেন। এই ফুল ভগবান রামকৃষ্ণদেব খুব ভালবাসিতেন। সেইজন্য ঐ ফুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বামীজি তাঁহার বিপুল বপু লইয়া ৩।৪ মাইল পথ হাঁটিতে স্বীকার করিলেন। পথে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তখন অখ্যাতনামা যুবকমাত্র) তাঁহাদের সহিত জুটিলেন। স্বামীজি একটি বিশেষ ফুলের জন্য এত

কষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাকে রাস্তায় কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত পূজা করেন কেন ?"

স্বামীজি—পূজা করে বড় আনন্দ পাই।

শরৎচন্দ্র—পূজা করাই কি শ্রেষ্ঠ উপাসনা ?

স্বামীজি—সর্বত্র ভগবদ্দর্শনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ধ্যান মধ্যম, স্তব ও জপ অধম।

শরৎচন্দ্র—তবে লোকে এত আড়ম্বর করে পূজা করে কেন ?

স্বামীজি—পূজা জিনিষটা বাইরের মোটেই নয়, অন্তরের। সাধারণ লোকে ভগবানের তুষ্টির জন্য ভয়ে বা কামনা পূরণের জন্য মানসিক করে পূজা অর্চনা করে ; এসকল বড়ই তুচ্ছ। ভগবানের উপর ভালবাসা না এলে, তাঁর দর্শনের জন্য অশ্রুপাত না হলে তাঁর পূজা হয় না। বিষয়ী লোকেদের পূজা, জপ, তপ ক্ষণিক ; তারপর আর তাদের কিছু মনে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা শ্বাস-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ বা চিন্তা করেন এবং ফুল, পাতা, জল, ফল এই সব দিয়ে নিষ্কামভাবে তাঁর পূজা করে ভক্তিভরে বলেন—

"পূজা উপাসনা সকলি গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই গো ডাকি ॥"

সকলে রাম বাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি নাগেশ্বর চাঁপা ফুলের গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছিল। তাহাদের সৌরভে ও সুষমায় বাগানটি যেন নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল। ফুলগুলি দেখিতে প্রায় সাদা গোলাপের মত। বাগানের বর্মী মালী গাছে উঠিয়া ফুলভরা কয়েকটি ডাল ভাঙ্গিয়া দিল। স্বামীজি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একটি লম্বা বাঁশের সাহায্যে সহস্তে কয়েকটি ফুল তুলিলেন। সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁহার আরাধ্য দেবতার প্রিয় পুষ্পগুলি স্বহস্তে চয়ন করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি খুসী হইয়া বর্মী মালীটিকে কিছু বকশিস্ দিলেন এবং জানিয়া লইলেন যে ঐ ফুলের বর্মা নাম গাড্। প্রবাদ আছে, এই ফুল ভগবান বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল।

উৎসবমণ্ডপে ফিরিয়া স্বামীজি দেখিলেন লাটপ্রাসাদের মালী এক ঝুড়ি সুন্দর গোলাপফুল আনিয়াছে। এতগুলি ফুল পাইয়া তিনি আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং বিবিধ পুষ্পে ও পুষ্পমাল্যে ঠাকুরকে সাজাইলেন। একটি কীর্তনের দল আসিয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিল। কীর্তনান্তে ঠাকুরের ভোগ ও আরতি হইল। আরতির সময় খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও বর্মী বাদ্য তালে তালে বাজিতে লাগিল। সকলের সমবেত 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে উৎসব-মণ্ডপে আনন্দের স্রোত বহিল। খারাবডি, পেগু ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ভক্ত উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। দূরাগত ও স্থানীয় প্রায় একশত ভক্তের সহিত স্বামীজি মধ্যাহ্নে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। উৎসবান্তে সকলে 'জয় ভগবান রামকৃষ্ণ দেব কী জয়' 'স্বামীজি রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কী জয়' ধ্বনি করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বামীজি অবসরমত রেঙ্গুনের প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখিতে যান। উক্ত প্যাগোডা বৌদ্ধ-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। এইরূপ সুবৃহৎ, সুদৃশ্য ও সুবর্ণমণ্ডিত প্যাগোডা কোন বৌদ্ধদেশে নাই। ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি ও কেশ উহাতে সংরক্ষিত হওয়ায় উহা বৌদ্ধদের পরম তীর্থ। উহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া শতাধিক পাথরের সিঁড়ি চড়াই করিয়া উহাতে উঠিতে হয়। উহার প্রধান চূড়া ৩৭০ ফুট উচ্চ। ইহাকে প্রত্যেক বার মেরামত করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সোয়ে=স্বর্ণ, ডাগন=মস্তক ;

উক্ত মন্দিরের চূড়াটি সোনার পাত দিয়া মোড়া বলিয়া উহার নাম সোয়েডাগন। উহার বিরাট চাতালের উপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বসিতে পারে। স্বামীজি প্যাগোডাটি প্রদক্ষিণ করিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বের অপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক পদ্মাসনে ধ্যান-মগ্ন হইলেন। তাঁহার গম্ভীর ও সৌম্য মুখমণ্ডল অনেক তীর্থযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্বর্গীয় ভাবে উজ্জ্বল তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শনে ব্রহ্মদেশীয় রমণীগণ বুদ্ধদেবের চরণে অর্পণ করিবার জন্য যে ফুল আনিয়াছিল তাহার কিয়দংশ ধ্যান-মগ্ন স্বামীজির পায়ে দিলেন। ধ্যানান্তে স্বামীজি যখন এই ফুলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন প্যাগোডার বৃদ্ধ ম্যানেজার স্বামীজিকে ইংরাজীতে ফুলের ইতিবৃত্ত বলিলেন। তিনি স্বামীজির সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া প্যাগোডার পূর্বদিকে অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয়[২] বৃহত্তম ঘণ্টাটি দেখাইলেন। ঘণ্টাটি প্রায় ১৪ফুট উচ্চ, এবং ইহার ওজন ৯৪,৬৮২ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ছয়টা লোক পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে। প্যাগোডার সর্বোচ্চ চূড়ায় তিন লক্ষ টাকা মূল্যের একটি রুবি আছে। অন্ধকার রাত্রে এই রুবিটি দূরস্থিত তারকার ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়। ব্রহ্মদেশের স্বাধীন রাজা মিন্ডুন্ মিন জগদ্বিখ্যাত মোগক্ রুবি খনি হইতে উক্ত রুবি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের চূড়ায় রক্ষা করেন।

প্যাগোডা-প্রাঙ্গণে জনৈক আইরিশ ফুঙ্গীর সহিত স্বামীজির পরিচয় হইল। ইনি আয়ারলণ্ডের এক শিক্ষিত খৃষ্টান। বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মদেশে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই মুণ্ডিত-মস্তক, শ্বেতাঙ্গ, নগ্নপদ, গৈরিকধারী আইরিশ ফুঙ্গী সমগ্র বর্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ইনি এই সোয়েডাগন প্যাগোডার পার্শ্বে একটি ফুঙ্গীচঙ্গে (বৌদ্ধমঠে) থাকেন। ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁহার মঠে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজি সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরদিন ভিক্টোরিয়া হলে তাঁহার যে বক্তৃতা হইবে তাহাতে যাইবার জন্য ফুঙ্গীকে বলিলেন। তদনুযায়ী ফুঙ্গী স্বামীজীর বক্তৃতায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। সভা ভঙ্গ হইলে ফুঙ্গী স্বামীজির নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।" শিশু-স্বভাব স্বামীজি নিজের গলার মালাটি ফুঙ্গীকে পরাইয়া দিলেন এবং পরদিন সকালে তাঁহার সঙ্গে যাইবেন বলিলেন। তৎপরে ভক্তগণ স্বামীজিকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত রয়েল লেকে (হ্রদে) বেড়াইতে লইয়া যান। স্বামীজির গাড়ীতে আইরিশ ফুঙ্গী ও শরৎচন্দ্র ছিলেন। হ্রদে পৌছিয়া স্বামীজি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও রমণীয় সৌন্দর্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যায় হ্রদটী দীপান্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্বামীজি উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া বাসায় ফিরিলেন। পরদিন তিনি আইরিশ ফুঙ্গীর মঠে গিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু সন্ন্যাসীর মধ্যে যে ধর্ম-প্রসঙ্গ[৩] ইংরাজিতে হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আইরিশ ফুঙ্গী—আমি জগতের সকল ধর্মের অসারতা ও বৌদ্ধধর্মের সার্বভৌমিকতা উপলব্ধি করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছি। এই ধর্ম জগতের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে।

স্বামীজি—আমরা জগতে প্রচলিত সকল ধর্মকেই ভক্তি করি। সকল ধর্মই সমান ও সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক।

২ পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম ঘণ্টা মস্কোতে আছে।

৩ এই কথোপকথনটী শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (৩০—৩২ পৃষ্ঠায়) আছে।

আইরিশ ফুঙ্গী—এই মতের প্রবর্তক কে?

স্বামীজি—যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

আইরিশ ফুঙ্গী—তাঁর প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি?

স্বামীজি—সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীবুদ্ধ, যিশু মহম্মদ প্রভৃতি অবতার সকলেই স্ব স্ব প্রবর্তিত পন্থাকেই একমাত্র মুক্তিমার্গ বলে ঘোষণা করেছেন। ইঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য এই যে, তিনি নিজে কোন ধর্মমত প্রচার করেন নি। জগতে প্রচলিত সকল ধর্মের সার সত্যটুকু নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে তিনি যত মত তত পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অনন্ত রূপ ও অনন্ত ভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত কেহই বুঝাতে পারেন নি। সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারলে অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় না। এই বিশ্বাসে উক্ত ত্যাগীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কোনদিন টাকা পয়সা স্পর্শ করেন নি। তিনি সহধর্মিণীকে আনন্দময়ীর রূপ জ্ঞানে করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের এইরূপ জলন্ত উদাহরণ জগতে আর কোথাও নাই।

আইরিশ ফুঙ্গী—বুদ্ধদেব কেবল মাত্র নির্বাণের কথা বলেছেন। বাসনার ক্ষয় হলেই নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরবাদ তিনি স্বীকার করেন নি।

স্বামীজি—ধর্মক্ষেত্র ভারতে নাস্তিক্য বাদ থাকতে পারেনা। যারা বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মবাদী বা আত্মবাদী না বলে নিরীশ্বরবাদী বলেন, তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত। বুদ্ধদেব দার্শনিক মতাবলম্বী ঈশ্বরবাদী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম পবিত্র আর্যধর্ম। তাঁর সাধনা ভগবান লাভেরই জন্য। আমরা তাঁকে অবতার জ্ঞানে পূজা করি।

তারপর স্বামীজি ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই জগৎরহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা হিন্দুর বেদে আছে। বৌদ্ধগণ বেদ মানতেন; এই সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৈদিক মতের পর বৌদ্ধমত, বৌদ্ধমতের পর বেদমত নয়।"

আইরিশ ফুঙ্গী হতাশভাবে বলিলেন, "পরমার্থ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।" স্বামীজি বলিলেন, "ঈশ্বর একমাত্র শুদ্ধ মনের গোচর। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি ধ্যানে এক, বিচারে বহু।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি আইরিশ ফুঙ্গীকে বলিলেন, "সব পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। আপনার নিজ ধর্মেই মুক্তিলাভ হত। স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করে ভুল করেছেন। হিন্দুশাস্ত্র বলে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র রেঙ্গুনে তখন ব্যারিষ্টার ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন রেঙ্গুনে পদার্পণ করেন তখন নবীনচন্দ্র তথায় পুত্রের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। কবি স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কথাপ্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মত সর্বধর্মসমন্বয়কারী একজন অবতারের অতীব প্রয়োজন বর্তমান যুগে ছিল। স্বামীজি তাঁহাকে বলেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় বাণী জগৎ গ্রহণ করে শান্তিলাভ করবে।" কবি স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া পরম প্রীত হন এবং তাঁহার পুত্রের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডারউইন, টীণ্ডল, মিল প্রভৃতির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া নিজেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামীজি বলিলেন,—"যারা নাস্তিক তারা বেশী আস্তিক, নাস্তিকেরাই সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে খুঁজছে। যাদের মন দিবা রাত্র ঈশ্বরান্বেষণে ব্যস্ত তারা কি নাস্তিক হতে পারে? ঈশ্বর নির্ণয় ক'রতে

হ'লে নিবিষ্ট মনে বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল দর্শন ক'রতে হয়। কার্যকারণপরম্পরার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি সহজেই অনুমিত হয়। কর্তা ব্যতীত কর্ম হ'তে পারে না। যখন জগৎ র'য়েছে তখন এর সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছে, এতে ভুল নেই।"[৪]

শরৎচন্দ্র—যদি স্বভাবকে জগতের কারণ বলি?

স্বামীজি—স্বভাবের উৎপত্তির কারণকে তবে ঈশ্বর বলতে পার।

শরৎচন্দ্র—স্বভাবের কারণ যদি ঈশ্বর হন তাহ'লে তাঁর কারণ কে?

স্বামীজি—ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবের কারণ এবং ইচ্ছাশক্তির কারণ স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া ভগবানের আদি কারণ নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি স্বয়ম্ভু, অনাদি, অদ্বিতীয়। তাঁকে ডাকতে হ'লে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে শুদ্ধ মনে সাধন-সাগরে ডুব দিতে হয়, উপর উপর ভাসলে হ'বে না।"

শরৎচন্দ্র—যুক্তি ও পাণ্ডিত্য খানিক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে বটে; কিন্তু তার পরে সব অন্ধকার।

স্বামীজি—কে বল্লে অন্ধকার? তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে খোঁজ, নিশ্চয়ই দেখা পাবে, সংশয়-গ্রন্থির পরপারেই অপরূপ জ্যোতিঃ ও অপার আনন্দ-সাগর। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে অনেকে তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হ'য়েছেন, জগতের সমস্ত ধর্ম ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বিষয়ী লোকেরা সব কথা শুনে যায়; কিন্তু বিশ্বাস করে না।

শরৎচন্দ্র—এত অবিশ্বাস আসে কেন বলুন তো?

স্বামীজি—এই অবিশ্বাসই হ'ল বাধা। শুধু বাধা নয় বিষম ব্যাধি। পূর্বজন্মের সংস্কারগুলো ক্ষয় ক'রে ফেলতে হ'বে। যার বিশ্বাস এসে গেল সে ভাগ্যবান। তার আর কোন অভাব রইল না। বিশ্বাস দুর্লভ ধন। আমাদের রোগ হ'চ্ছে বাসনা—প্রতিকার হ'চ্ছে বিবেক। এই বিবেকরূপী ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন; তাঁকে ভুললেই সব পণ্ড।"

শরৎচন্দ্র—আপনি বহুদিন তো আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা করেছেন, কিছু পেলেন কি?

স্বামীজি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু আমাদের নন। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। ভগবান তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাণীটির সার্থকতার জন্য অধর্মের অভ্যুত্থান, ধর্মের সংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ ও পাপী তাপীদের উদ্ধারের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন। তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে, খৃষ্টরূপে, মহম্মদরূপে, বুদ্ধরূপে, শঙ্কররূপে ও গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে অনেক লীলা ক'রে গিয়েছেন। বর্তমান যুগে তিনিই সর্বধর্ম সমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতার বাণী তিনি জীবনে প্রতিফলিত ক'রেছেন; তাঁর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত, লোক-শিক্ষার্থ দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা এবং "যত মত তত পথ" ঘোষণা, ধর্মজগতে যুগান্তর এনেছে। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "কথামৃত বাণী" সারা বিশ্ববাসীর তৃষিত প্রাণে শান্তি-বারি সেচন ক'রছে। তিনি ব'লেছেন—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—এসব তিনি আছেন ব'লে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু একককে মুছে ফেললে শূন্যের কোন

[৪] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কথোপকথন গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়) আছে।

মূল্য থাকে না, জন্ম, মৃত্যু, এসব ভেল্কির মত; এই আছে এই নেই। শুধু আহার, নিদ্রা, বাসনা ও ভোগের সেবাতেই জীবন ক্ষয় ক'রলে কি ধর্ম হয়? ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র—তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কেন?

স্বামীজি—ঠাকুর ব'লতেন, "সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই, সংসারে ঈশ্বর আছেন, সাধনা চাই।" তিনি আরও ব'লেছেন—পানায় ঢাকা পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ব'লছ পুকুরে জল নেই, যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে ঈশ্বর দেখা যায় না; যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও মায়াকে সরিয়ে ফেল।

শরৎচন্দ্র—এই মায়া বস্তুটি কি?

স্বামীজি—ব্রহ্মের যে শক্তিদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি হ'য়েছে সেটির নাম মায়া! মায়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। আমাদের মায়াবৃত বিষয়মুখী মন, স্ত্রী, পুত্র, মান, যশ এই সবেতেই মুগ্ধ থাকে; আর এই সব অসার অনিত্য ধনকে সার নিত্য ব'লে ম'নে হয়। ভগবানের দয়া না হ'লে এই মায়ার হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। কিন্তু তাঁর কৃপা হয় কার উপর? তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ভাবছেন, কিন্তু জীবের প্রাণ কি তাঁর কৃপা পাবার জন্য লালায়িত হ'য়েছে? তাঁর কৃপা পাবার উপায় হ'চ্ছে চোখের জল,—তাঁর একান্ত শরণাগত হ'য়ে কেঁদে কেঁদে কৃপা ভিক্ষা চাইতে হয়, তাঁর দয়া তখন হয়, যখন তিনি বোঝেন হাঁা, এ ঠিক ঠিক আমায় ভালবাসে, আমাকেই চায়—কামিনী-কাঞ্চনে এর মন নেই। এদিকে বিষয়ে ষোল আনা টান রয়েছে, ওদিকে মুখে শুধু কৃপা কর, দেখা দাও ব'ললে কি তাঁর আসন টলে? এই কপট ভণ্ডামি যেদিন চলে যাবে, প্রাণ সরল হবে,—মন শুদ্ধ হবে সেই দিনই তাঁর দয়া হ'বে।

শরৎচন্দ্র—ঈশ্বর যদি জীবের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ভাবেন, তবে তাদের এত দুঃখ কেন?

স্বামীজি—তিনি শুধু মঙ্গলময় নন, তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান, ভগবান যখন যা কিছু করেন সবই জীবের মঙ্গলের জন্য। আমাদের বাপ মাও ছেলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁরা সর্বশক্তিমান নন। ঈশ্বরে একত্রে এ দুটি গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি দুঃখ কষ্ট দেন, তবে নিশ্চয়ই জানবে এ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁর দয়া নিহিত আছে। যাকে আমরা দুঃখ বলি, বাস্তবিক তা দুঃখ নয়—দীক্ষা। ক্ষণিক সুখের লোভে আমরা ভগবানকে ভুলে যাই, তাই তিনি কৃপা ক'রে দুঃখ রূপ দীক্ষা দিয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দেন। তাঁর দয়া দুই ভাবে অনুভব ক'রতে হয়। অনুকূল দয়া ও প্রতিকূল দয়া। কখন তিনি জীবের প্রার্থিত ধন, জন, পুত্র, পরিবার, মান, ঐশ্বর্য প্রভৃতি দিয়ে খেলাঘর সাজিয়ে দেন তখন সেটি তাঁর অনুকূল দয়া। আর যখন সেগুলি একে একে কেড়ে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে তাঁর দিকে টেনে নেন, তখন হচ্ছে তাঁর প্রতিকূল দয়া।

শরৎচন্দ্র—অদৃষ্ট, দৈব, পুরুষকার জিনিসগুলি কি ভাল বুঝতে পারি না।

স্বামীজি—এ সংসারে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ চণ্ডাল, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান, কেহ হিংস্র, কেহ দয়ালু, কেহ দেবসেবা ক'রে সুখ্যাতি অর্জন ক'রছে, কেহ বিষ্ঠা পরিষ্কার করে ঘৃণিত হচ্ছে। এই বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করলেই পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল বা অদৃষ্ট স্বীকার করতে হয়। দৈব ও পুরুষকার, এই উভয়ই আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে। দৈবের

ফল পূর্ব জন্মের ফলে মানুষ বর্তমান জীবনে পেয়ে থাকে। বর্তমান জীবনের কৃতকর্মফলের কতক অংশ হয়তো বর্তমানেই পায়, কিন্তু পুরো পায় না। সেইটে দৈবরূপে পর জীবনে তার সুখ দুঃখের কারণ হয়। পুরুষকারটিও দৈবশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাঁর কৃপা ছাড়া 'পুরুষকার' কথাটা অর্থহীন। দৈবের সাধনায় পুরুষকার আবশ্যক, আবার পুরুষকার দ্বারা কর্মসাধনায় দৈব বা ভগবৎকৃপা আবশ্যক।

শরৎচন্দ্র—ভাগ্য বা অদৃষ্টের খণ্ডন হয় কি?

স্বামীজি—সংসারী লোক অহংকারেই মত্ত। কিন্তু যখন দুঃখে, শোকে, পীড়ায়, দারিদ্র্যে ও হতাশায় জর জর হ'য়ে পড়ে, যখন নিজের চেষ্টা, নিজের উদ্যম, নিজের যত্ন ও পরিশ্রম কোনরূপেই ফলদায়ক হয় না তখনই সে ভাবে অদৃষ্টের কথা। আর বলে—'অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়।'

শরৎচন্দ্র—যদি আমার কর্মফলজনিত-অদৃষ্টে যা আছে, তাহাই অনিবার্য হয় তবে ঈশ্বর আরাধনা বা ধর্মকর্মে প্রয়োজন কি?

স্বামীজি—অদৃষ্টবাদে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস; কিন্তু অদৃষ্ট অখণ্ডনীয় এ কথায় আমার আস্থা নাই। কর্মফলরূপ অদৃষ্ট প্রকোষ্ঠে ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ যা কিছু সঞ্চিত হ'য়েছে, তা একেবারে অচল অটল অখণ্ড বা অপরিবর্তনীয়—একথা আমি বিশ্বাস করি না। এক পরমাত্মা ভিন্ন এই বিশ্ব-সংসারে অদাহ্য, অখণ্ড, অশোষ্য, অচ্ছেদ্য বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আর কিছু থাকতে পারে না। যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ; যেখানে অন্ধকার সেইখানেই আলো; যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই পরিত্রাণ; যেখানে ধর্মগ্লানি সেইখানেই ধর্ম-স্থাপন—ইহাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। সকল বিষয়েই যদি এক নিয়ম, তবে অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিপরীত হবে কেন? যদি দুঃখের ভার লাঘব হবার উপায় না থাকে তা হলে লোকে এত পুণ্য সঞ্চয় করে কেন? এত পরোপকার, এত দান, এত কঠোর তপস্যা, এত তীর্থ দর্শন, এত শাস্ত্র চর্চা ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যদি দুরদৃষ্ট খণ্ডনীয় বা পাপমোচনের কোন উপায় না থাকে তবে যুগে যুগে অবতারের প্রয়োজন কি? যীশুখৃষ্টের পরিত্রাতা saviour কিংবা মহম্মদের রসুল prophet অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কপাল-মোচন নামের সার্থকতা কোথায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—"তুমি একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব"; যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—চোখের জলে পূর্বপূর্ব জন্মের পাপ ধৌত হ'য়ে যায়; যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ব'লেছেন—ভগবানের আর একটি নাম 'কপাল মোচন'। তাঁর কৃপা হ'লে এক মুহূর্তে মানুষের কপাল (অদৃষ্ট লিখন) মুছে যেতে পারে। ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে এই ব'লে প্রার্থনা কর, হে দয়াময়! আমি অসহায় দুর্বল; ইহ জন্মে বা জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে সকল পাপ সঞ্চয় করেছি তুমি দয়া ক'রে সেইগুলি ক্ষমা কর। আমার সমস্ত কর্ম ফল ক্ষয় ক'রে দাও, প্রভু! অনুতপ্ত হৃদয়ে এইভাবে প্রার্থনা করলে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতে পারলে নিশ্চয় তাঁর দয়া হ'বে। ছেলে কাঁদলেই মায়ের আসন টলে।

শরৎচন্দ্র—সকলেই কি কাঁদতে পারে?

স্বামীজি—বেশী বুদ্ধিমান হ'য়েই তো তোমরা মুস্কিলে পড়েছ! পাটোয়ারী বুদ্ধিটুকু সরিয়ে ফেল, পথ সহজ হবে। হেসে কেউ ভগবান লাভ করে নি। যারা তাঁকে পেয়েছে কাঁদতে কাঁদতেই পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা গেরুয়া না প'রেও সন্ন্যাসী হওয়া যায় কি?

স্বামীজি—ধর্ম হ'চ্ছে মনের। গেরুয়া না প'রেও মুক্ত হওয়া যায়, মানুষ মনেই বদ্ধ,

মনেই মুক্ত। আগে চাই মন, পরে বাহিরের সাহায্য, মন ভাল হ'লে গেরুয়ায় যেমন বাহিরের কিছু সাহায্য ক'রে, মন খারাপ হ'লে তেমনি গেরুয়ার দ্বারা ভণ্ডামির সহায়তা হয়। গেরুয়া পরা, তিলক ফোঁটা কাটা, তীর্থযাত্রা, হজ, কীর্তন, জপ, তপ কিছুই ধর্ম নয়; ধর্মের বহিরাবরণ মাত্র। এগুলি মানুষের মনকে ভগবৎকৃপার অধিকারী হ'তে সাহায্য করে।

শরৎচন্দ্র—তবে কিসে মুক্তি হয়?

স্বামীজি—জীবাত্মা পরমাত্মার জন্য আত্মহারা না হ'লে মুক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র—আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হবার নিয়ম কি?

স্বামীজি—মঠের সন্ন্যাসী হ'তে গেলে প্রথম তিন বৎসর শিক্ষানবীশ থাকতে হয়, তারপর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী থাকতে হয়। এই ছয় বৎসর পরে মঠাধ্যক্ষ তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ততা বিবেচনা করে তবে সন্ন্যাস দেবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সেবক, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হতে হবে।

শরৎচন্দ্র—ঐ ছয় বৎসর কি শিক্ষা ক'রতে হবে?

স্বামীজি—মিশনের মূলমন্ত্র—Renunciation and Service (ত্যাগ ও সেবা), সংসারাসক্তি ত্যাগ, সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করা।

শরৎচন্দ্র—সেবা কাজটি বাড়ীর মেয়েদের কাছেই ভাল শিক্ষা হয়, হিন্দুর মেয়ে আপন স্বামী পুত্রের যে ভাবে সেবা করে তার চেয়ে বড় আদর্শ কিছু হ'তে পারে কি?

স্বামীজি—সতীর পতিসেবার মধ্যেও একটু স্বার্থ গন্ধ থাকে; কিন্তু মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ অসহায় রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পীড়িত নারায়ণ জ্ঞানে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে।

শরৎচন্দ্র—মঠের বড় কঠিন নিয়ম; ছয় বৎসর শিক্ষানবিশী। ছয় বৎসর মেডিকেল কলেজে প'ড়লে ডাক্তার হওয়া যায়।

স্বামীজি—ডাক্তার হ'লে দৈহিক রোগের চিকিৎসা হবে বটে; কিন্তু সন্ন্যাসী হ'তে পারলে ভবরোগ থেকে অব্যাহতি পাবে।

শরৎচন্দ্র—প্রতিবারে কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সাধুর সমাগম হয়, ওঁরা সকলেই কি ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন?

স্বামীজি—ওঁদের মধ্যে পেটের জন্য, নাম-যশের জন্য, ঔষধাদি দিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য, রাজদণ্ড এড়াবার জন্য অনেকে সাধু সেজে থাকেন, কিন্তু ভগবান লাভের জন্য সর্বত্যাগী বিবেক-বৈরাগ্যবান সাধু খুবই কম। বহু জন্মার্জিত তপস্যার ফলে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্ত হ'লে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায়। মুমুক্ষু না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ও কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জলন্ত মূর্তি, গুরুভক্তির জীবন্ত-বিগ্রহ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূতসঙ্গে নাস্তিক শরৎচন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধি অস্থায়ী ভাবে আসিয়াছিল। স্বামীজির বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে বহু বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী ভক্ত স্বামীজিকে প্রণাম-পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে ভক্তগণের চক্ষু জলভারাবনত দেখিয়া তিনিও অভিভূত হইলেন। এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক ভাবে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার পূতস্পর্শে অনেকের মনে ধর্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি ২৫শে মার্চ শনিবার রেঙ্গুন হইতে জাহাজে উঠিলেন এবং ২৯শে তারিখ প্রাতে মান্দ্রাজে অবতরণ করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাইতে ঠাকুরের উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি রেঙ্গুনে যে বীজ ১৯০৫খ্রীঃ বপন করিয়াছিলেন তাহা কালে মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় বিশ বৎসর পরে রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল এবং লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।
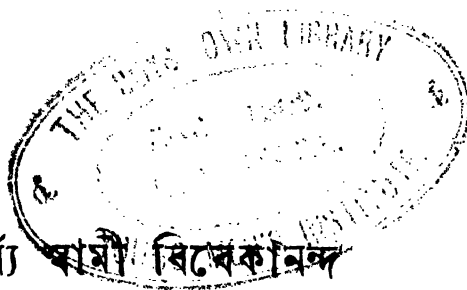
যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, বি-এ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ধরণীবক্ষে নেমে এসেছিলেন। ভারত ও ভারতেতর দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যে অমোঘ আধ্যাত্মিক বীজ বপন করে গেছেন তা ভবিষ্যতে ফলপুষ্পশোভিত মহান মহীরুহে পরিণত হয়ে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে শান্তিছায়া দানে কখনও বিফল হবে না। তবে সেই শক্তির পরিণতি প্রত্যক্ষ করা কিছু সময়সাপেক্ষ। শোনা যায়, তিনি সময় সময় বলতেন, যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত ত বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেল। ভাবী বহুশতাব্দীর চিন্তাধারার খোরাক রেখে গেলুম ইত্যাদি। যাঁরা বর্ত্তমানে জগতের চিন্তাধারা এবং মানবজাতির আদর্শ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে সম্যক পরিচিত আছেন তাঁরাই বিবেকানন্দের ঐ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জন্য অদম্য চেষ্টা চলছে। পুনঃ পুনঃ ভুল পথে চলে ব্যাহত হয়ে অনেকে নবীন উদ্যমে নবোৎসাহে পথের সন্ধানে ছুটে চলেছে। এই উন্মাদ উদ্যমের মূল উৎস ও পরিণতি কোথায় তার অনুসন্ধান করলেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের তাৎপর্য্য বুঝতে পারব। এই যে time spirit বা যুগপ্রয়োজন ইহাই বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে এবং এই যুগ-প্রয়োজন সাধনই বিবেকানন্দ-জীবনের মহান ব্রত। তিনি এসেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন এই দুইটি মহান জাতি পরস্পরের ভাব, শিক্ষা ও সভ্যতার আদান প্রদান করে এক মহান ঐক্যে মিলিত হতে এবং এক মহান বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ জাতি দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতালাভের পূর্ণ সুযোগ লাভে সমর্থ হবে এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখবে। জগৎ এই আদর্শের জন্যই লালায়িত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। সেই উপায়টি কি তাই দেখাবার জন্যই বিবেকানন্দের আবির্ভাব। এই জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু মহনীয়, যা কিছু বরণীয় সেই সমস্তই বিবেকানন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের ধ্যান, জ্ঞান, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সমাধির সহিত পাশ্চাত্যের ব্যবহারকৌশল, কর্ম্মদক্ষতা, শৌর্য্য, বীর্য্য মিলিত হয়ে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ যুগাদর্শে প্রকটিত করেছিল। প্রাচ্যজাতি বহুকাল ধরে যা হারিয়ে জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে অধঃপতিত হয়েছিল তার সেই লৌকিক দক্ষতা ফিরিয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর পাশ্চাত্য জাতি যার অভাবে ধ্বংসের মুখে ছুটে চলেছিল সেই ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শও বিবেকানন্দ ধরেছেন তার সামনে। এই ভাবে উভয় জাতির মিলনসেতু রচনা করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আপন আপন কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা, স্বার্থবুদ্ধি ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে উভয় জাতি যত শীঘ্র বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথে পরস্পর মিলিত হতে শিখবে এবং স্ব স্ব ভাবের আদান প্রদান দ্বারা এক সমৃদ্ধ সার্ব্বভৌম বিশ্বসংঘ গঠন করতে শিখবে ততই বিশ্ববাসীর কল্যাণের দিন ঘনিয়ে আসবে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিবেকানন্দকে চিনবার এবং তাঁকে জানাবার মহান দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁর স্বদেশবাসী ভারতীয়গণের। ভারতই হবে তাঁর অমোঘ ভাবধারার প্রধান কেন্দ্র, যা থেকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে। ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর জন্য ইহাই তিনি দায়স্বরূপ রেখে গেছেন। ভারতবাসীকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন তারা যেন তাদের সনাতন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ হতে কখনও বিচ্যুত না হয়; কারণ ধর্ম্মেই তাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে। অতীতেও ভারত এই ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয়ে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, ভবিষ্যতেও এরই বলে সে সর্ব্বপ্রকারে গৌরবান্বিত হবে। তিনি প্রায়ই বলতেন কোন জাতিই তার জাতীয় বিশেষত্বকে হারিয়ে বড় হতে পারে না, ধর্ম্মই ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব। উহা দ্বারাই সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে এবং জগতের ভাবী কল্যাণে উহাই হবে ভারতীয় জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

তবে ধর্ম্ম বলতে তিনি সচরাচর আমরা যা বুঝি সেই অন্তঃসারশূন্য ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, তন্ত্র মন্ত্র, মন্দির দেবায়তন, তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান উৎসব পার্ব্বণ মাত্র বুঝতেন না। এগুলিকে তিনি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র মনে করতেন। প্রকৃত ধর্ম্ম বলতে তিনি বুঝাতেন তা-ই যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে, যদ্দ্বারা মানুষ সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতার হাত হতে মুক্ত হয়, আপন আত্মার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও দুঃখসম্পর্ক-শূন্য পরমানন্দময় স্বাধীনতালাভে কৃতকৃতার্থ হতে পারে। তাঁর মতে এই অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ; আর সর্ব্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতাই এই অনুভূতি লাভের প্রধান অন্তরায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না, একথা তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলতেন। দেহাত্মবোধ হতেই সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ও দুর্ব্বলতার আবির্ভাব, আর ধর্ম্মলাভের প্রধান প্রয়োজন প্রকৃত জ্ঞানভক্তিলাভ দ্বারা এই দেহাত্মবন্ধন ও তজ্জনিত ভয় ও দুর্ব্বলতা হতে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ।

এজন্য দেশবাসীকে ধর্ম্মের নানা অবান্তর বিভাগে মনোযোগী না হয়ে উপনিষদ্‌ ও গীতা-প্রচারিত বিশুদ্ধ ও প্রাণবন্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করতে তিনি উপদেশ দিতেন। কারণ ঐসব শাস্ত্রে যে বীর্য্যপ্রদ ও আলোকপ্রদ ধর্ম্মের সারশিক্ষা-সকল আছে তাহাই এক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অবলম্বনীয়। শ্রুতিনিগদিত অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপরই তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির স্থান নেই। বেদের একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—সত্য একই; পণ্ডিতগণ তাঁকে বহুভাবে উপাসনা করে থাকেন—এই ছিল তাঁর এক প্রধান শিক্ষা। স্ব স্ব ধর্ম্মপথে নিষ্ঠাবান এবং পরধর্ম্মে বিদ্বেষরহিত হয়ে অকপট ও পবিত্রভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই তিনি ধর্ম্মের সারশিক্ষা বলে মনে করতেন। দেশ কাল পাত্র ভেদে পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল পথই যে এক পরমাত্মাতে নিয়ে যায় একথা তিনি প্রচার করেছেন। তদীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পূর্ণাদর্শরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ধর্ম্মকে শুধু দেবালয়ে, অরণ্যে, কন্দরে আবদ্ধ না রেখে এবং ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উপায় মাত্র না করে কি করে তাকে কর্ম্মজীবনের প্রতিক্ষেত্রে কাজে লাগান যেতে পারে সেটাই ছিল তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের আর এক বিশেষ উদ্দেশ্য। গীতাকারের ন্যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ধর্ম্মের প্রয়োগ দ্বারা কি করে সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতবাসী সমৃদ্ধ হতে পারে তা দেখানই ছিল তাঁর প্রাণের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। তাঁর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ছিল "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ", আত্মমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিতসাধন—"বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়" নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর 'নর-নারায়ণ'সেবার প্রবর্ত্তন—সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন জেনে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়ে, বিপন্নকে আশ্রয় দিয়ে, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদ্যাহীনকে বিদ্যা দিয়ে, ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্ম দিয়ে জীবন ধন্য কর। "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না করে কেহই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করে মোক্ষলাভ করতে পারে না। গীতার এই শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে আমরা কতই না ভুল করছি। সকলে রাতা-রাতি যোগী হবার উদ্দেশ্যে সব কাজ ছেড়ে শুধু ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকতে গিয়ে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হতেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ নর-নারায়ণ-সেবা প্রবর্ত্তন করে ভারতবাসীকে এই ঘোর তমোগুণ হতে প্রকৃত সত্ত্বগুণলাভের উপায় দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, "Work is worship." ভগবৎসেবা বুদ্ধিতে কাজ করলে সে কাজই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যেমন তিনি পরিত্যাগ করতে বলেছেন, তেমনি ধর্ম্মের লৌকিক অপপ্রয়োগদ্বারা আমরা যে সব বর্ব্বরোচিত দেশাচার, লোকাচার, অস্পৃশ্যতা, জাতি, বর্ণভেদ সৃষ্টি করে বসেছি, যা এক্ষণে আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা তাঁর উদার দৃষ্টি এড়ায় নি। এজন্য তিনি দেশাচার লোকাচার স্ত্রী-আচার ত্যাগ করে শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত সদাচার গ্রহণ করতে জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন—ছুঁৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে বলেছেন। স্ত্রীজাতি ও তথাকথিত শূদ্রজাতির স্বত্বাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে উন্নত করা ভিন্ন ভারতের উন্নতির অন্য কোন উপায় নেই, একথা তিনি তারস্বরে প্রচার করেছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সমাজে অন্যান্য যে সব কুসংস্কার আছে প্রকৃত ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রসার দ্বারা সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল তাঁর এক প্রধান শিক্ষা। বর্ত্তমানে ভারতে যে দুটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় একে অন্যের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এ দুটির মিলনেই ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। 'Islamic body with Vedantic brain অর্থাৎ ইসলামধর্ম্মের ব্যবহারিক সাম্যের সহিত হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সাম্যের যোগেই ভবিষ্যৎ ভারত উন্নত হবে, একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। হিন্দুদের দর্শন শিক্ষা দেয়, এক আত্মাই সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সত্য বিকৃত হয়ে নানা জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে বসেছে। ইসলামধর্ম্ম আবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে খুব সাম্য রক্ষা করলেও ধর্ম্মক্ষেত্রে অত্যন্ত গোঁড়া মতা-বলম্বী। স্বামীজি মনে করতেন, হিন্দুরা যদি মুসলমানদের ব্যবহারিক সাম্য গ্রহণ করে এবং মুসলমানগণ যদি হিন্দুদের ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা গ্রহণ করে, তবেই উভয়ের মিলন ও ভারতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল।

এই ভাবে সত্য, প্রকৃত ধর্ম্ম ও শিক্ষার ভেতর দিয়ে ভারতকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারে উন্নত করে তোলা এবং তদ্দ্বারা জগতের আধ্যাত্মিক অভাব মিটিয়ে বিশ্বশান্তি স্থাপন—ইহাই ছিল বিবেকানন্দ-জীবনের সুমহান ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি অগণিত ভারতীয় যুবকের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায়—যা মাত্র ৩৯ বৎসরেই অবসান হয়েছিল—তিনি তাঁর সে আহ্বানের পূর্ণ সাড়া পেয়ে যান নি। তজ্জন্য তিনি সময়ে সময়ে দুঃখিত হয়ে পড়তেন কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যতের গর্ভে তাঁর অসীম শক্তি ও অমোঘ ভাবধারার অপ্রতিহত গতি প্রত্যক্ষ করে আশ্বস্ত হতেন। আজ ৪৫ বৎসর হল এই দেবমানব ধরাধাম হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁর চিন্তাধারা ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্ব্বক্ষেত্রেই যে যুগান্তর এনেছে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তা' অনুভব করছেন। স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের যে অদম্য চেষ্টা, সর্ব্বত্র দেশময় নানাবিধ সেবাপ্রতিষ্ঠান, নারীজাতি ও অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য আন্তরিক প্রয়াস, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কল্পনা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে ধর্ম্মের শনৈঃ শনৈঃ অভিযান, সকল ধর্ম্মের ঐক্যের জয়গান, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সাম্য, মৈত্রী স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি জননায়কদের আপ্রাণ চেষ্টা, সর্ব্বোপরি জগৎময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ধীর স্থির অথচ অপ্রতিহত প্রসার—এই সকলের মধ্যে কি আমরা বিবেকানন্দের অলৌকিক শক্তিরই প্রভাব প্রত্যক্ষ করছি না? সত্য বটে এখনও এসব দিকে করবার ঢের বাকী, এখনো নানা বিরোধী শক্তি এই সব লোকহিতকর চেষ্টার বিষম বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ ভোগলিপ্সা এখনও তার দুর্দ্দম শক্তি নিয়ে ক্রমাগত বিঘ্নের উপর বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। সর্ব্বপ্রকারে আসুরিক ও রাক্ষসী শক্তিকে পরাজিত করে বিবেকানন্দের দৈবী শক্তির পূর্ণবিজয় লাভ এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা বেশ ভালভাবেই জানি 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—শেষে সত্যের ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা ইতিহাসের গতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁরা সকলেই জানেন ভারত এখন জাগ্রত, বিবেকানন্দের আসার পূর্ব্বের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারত আর এখন নেই। ভারত আজ জেগে উঠেছে এবং বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিজেও ধন্য হবে এবং জগৎবাসীকেও ধন্য করবে।

তবে যত শীঘ্র সমগ্র ভারতবাসী যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে পরিণত করবে ততই তার ও অন্যান্য দেশের কল্যাণ। এখনও অনেকে এই নরবর ও তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে পারেন নি, ইহা আক্ষেপের বিষয়। এখনও আমাদের মধ্যে এমন বহুলোক আছেন যাঁরা প্রাচীন জরাজীর্ণ আদর্শের মৃত কঙ্কাল আঁকড়ে পড়ে আছেন অথবা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের নিষ্ফল ও অহিতকর চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাই এখনও স্বামীজির সেই গুরুগম্ভীর বাণী সকলকে শোনাবার ও জানাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি একদা কলিকাতাবাসী নরনারীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "আদান-প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া সব জিনিষ, এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত শিখিব? অবশ্য উহাদের নিকট আমরা কল-কব্জা শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে। আমরা উহাদিগকে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের

নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্যরত্ন পাইয়াছে তাহার জন্য জগৎ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্যেও যাহা সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত', উঠ জাগ যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না। কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভমুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিয়াছে। সহায় অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে অভীঃ এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ' নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব। উঠ জাগ, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। উঠ জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভাবিও না তোমরা দরিদ্র; ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। চাই নচিকেতার মত শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা অন্তর্হিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদের এই উপস্থিত দুর্দ্দশা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মায়, যাহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক, এই আত্মবিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করা রূপ মহান কার্য্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিয়াছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাম্ভীর্য্যের অভাব—এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।"

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিবেকানন্দের মুখনিঃসৃত এই বাণী এখনও আমাদিগকে কল্যাণের পথে আহ্বান করছে, আসুন আমরা সকলে ঐ বাণীর অনুসরণ করে নিজেরাও ধন্য হই—অপরকেও ধন্য করি।

মূলধন

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

তিল তিল করি যাহা এতদিন
রাখিয়াছি নিজ কাছে,
দেখিলাম আজ লাগিল না মোর
জীবনের কোন কাজে।

ফেলিয়া দিয়াছি যাহা অবহেলে
মায়া ছেড়ে অকাতরে,
তাহাই আমায় পথ দেখাইল
আঁধারে প্রদীপ ধরে।

আসল কালাপাহাড়

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গোস্বামী

কালাপাহাড় বলে যিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি পাঠান-সুলতান সুলেমান করনানী ও তৎপুত্র দায়ুদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন। কেউ বলেন, রাজা গণেশ, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য এবং আরো অনেক বিখ্যাত পুরুষ একটাকিয়ার যে ভাদুড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কালাপাহাড়ও সেই বংশের ছেলে। কারও কারও মতে কালাপাহাড়ের আসল নাম নাকি কালাচাঁদ রায়; রায় এঁদের রাজদত্ত উপাধি। কেউ বলেন, এই কালাচাঁদ রাজসাহী জেলার মান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামের অধিবাসী। ইনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত পরম রূপবান পুরুষ এবং পাঠান-সরকারের মনসবদার। ইনি কোন রূপবতী পাঠান রাজকুমারীর প্রণয়াসক্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। অনেক চেষ্টাতেও যখন হিন্দুসমাজে স্থান কর্তে পারলেন না, তখন মুসলমান হয়ে হিন্দুসমাজের হলেন ঘোর শত্রু। তিনি সংকল্প করেছিলেন, হিন্দুকে পাঠান-বাংলা হ'তে একেবারে মুছে ফেল্‌তে, এবং যে অত্যাচার করেছিলেন হিন্দুর উপর, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তিনি ভেঙেছিলেন অসংখ্য মন্দির দেউল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন লক্ষ লক্ষ বিগ্রহ, কলুষিত করেছিলেন হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান সকল, বলপূর্বক হিন্দুকে করেছিলেন মুসলমান। তিনি ১৫৬৫ খ্রীঃ উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রে রাজা মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত এবং হিন্দুর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দদেবের সময় আবার উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রে পুরী লুণ্ঠন করেন। তিনি গড়পাড়কুণ্ডে লুকানো জগন্নাথদেবকে খুঁজে বের করে আগুনে পুড়িয়ে ছাই জলে ভাসিয়ে দেন। মোঘল-ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, দায়ুদ খাঁর সহিত মোঘলদের কালীগঙ্গার তীরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ১৫৮০ খ্রীঃ মোঘলের গোলার আঘাতে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। উড়িষ্যার হিন্দুইতিবৃত্ত-লেখকেরা বলেন, কুষ্ঠ ব্যাধিতে হাত পা খসে যাওয়ায় তিনি দুঃসহ কষ্টভোগ করে মারা যান। কেউ এঁকে রাজু, রাজচন্দ্র, রাজনারায়ণ নামে কামরূপের অধিবাসী বলে পরিচয় দেন। কেউ কেউ দু'জন কালাপাহাড় ছিলেন বলে অনুমান করেন। আবার মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, কালাপাহাড় ছিলেন আফগান জাতীয় মুসলমান। সে তিনি যিনিই হন সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় কাশী হতে চট্টল, উড়িষ্যা হতে হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত এমন প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল না যা তিনি করেন নি কলুষিত এবং ভগ্ন, এমন বিগ্রহ ছিল না যা তিনি করেন নি চূর্ণ-বিচূর্ণ। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন*

* "Kala-Pahar was a Brahmin by birth but had embraced the religion of the Prophet to obtain the hand of princess of Gour and now became a relentless oppressor of his former creed. So terrific did he appear to the Hindoos, that it was reported the legs and arms of the idols dropped off at the sound of his kettle-drum. He made every effort to root out Hinduism ... He pulled down temples and erected mosques with the materials He seized the image of Jagannath which he committed to the flames on the banks of the Ganges." —Marshman's History of Bengal, 111 p.

"কালা পাহাড়ের রণ-ডঙ্কার রবে বিগ্রহের হাত পা খসে পড়্‌তো।" তাঁর এই সব অপকীর্তি ইতিহাসে আছে কলঙ্কের কালো অক্ষরে আরো অনেক মুসলমান ও হিন্দুধর্মত্যাগী কালাপাহাড়ের নাম করা যেতে পারে, যাঁদের ধর্মোন্মত্ততার কলঙ্ক কাহিনী মর্মন্তুদ এবং লজ্জাজনক। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, ঔরংজেব প্রভৃতি ধর্মান্ধ ইতিহাসের পৃষ্ঠা করেছেন গভীরভাবে কলঙ্কিত। কেউ মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ্ গড়েছেন, কেউ বিগ্রহ ভেঙে তা দিয়ে মস্‌জিদে ওঠ্‌বার গড়েছেন সিঁড়ি।

একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশে জন্ম হয় রাজা গণেশের। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পরম অনুরাগী। বাংলার এই বীরপুরুষ পাঠান রাজ্যের অবসান-সময়ে ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপনের রঙিন স্বপন দেখেছিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের মন্ত্রণাকৌশলে পাঠান সুলতানকে অপসারিত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি সামান্য জমিদার হয়েও অসামান্য সাহস ও প্রতিভাবলে সমগ্র বাংলার স্বাধীন রাজা হয়ে সাত বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ কালের ডাকে চলে গেলেন তাঁর স্বপন সার্থক করার ভার পুত্র যদুনারায়ণের উপর অর্পণ করে। যদু-নারায়ণ তাঁর স্বপ্ন সার্থক করবার যে পথ ধরলেন সে পথ ঠিক ছিল না। সে বীরের পথও নয়, বুদ্ধিমানের পথ তো নয়-ই। "ধরণী ঘরণী" বীরের; তিনি পাঠান-বংশীয় নবাব আজিম শাহের পরম রূপবতী এবং বিদুষী কন্যা আশমান তারাকে করেন বিয়ে। তিনি মনে করেছিলেন এতে তিনি পাঠান সামন্তদের সহানুভূতি পাবেন। নবাবকন্যাকে বিয়ে করায় প্রবল হিন্দুসমাজে উঠ্‌লো আন্দোলনের ঝড়; যদু ভীত হয়ে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করলেন বিদ্রোহী হিন্দুজনমত শান্ত করতে, হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে শক্তিমান হতে। স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত হীরে মণি সজ্জিত গরু কেটে খণ্ড খণ্ড করে প্রচুর দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণদের করলেন দানে তুষ্ট। হিন্দুসমাজ শান্ত হলো না; বামুন পণ্ডিতের দল বিপদ দেখে চিরন্তনী রীতি অনুসারে "এঁ্যা আমি খেয়েছি কবে, কৈ না", বলে সরে দাঁড়ালেন! খাওয়া হয়েছে—মুখ ধোওয়া হয়ে গেছে—বিদেয় নেওয়াও হয়ে গেছে, আর তাঁদের পায় কে? যদুর সমর্থকেরাও দাঁড়ালো সরে। কাপুরুষ যদু হলেন ভয়ে বিহ্বল; মুসলমান সামন্তেরাও যদুর এই প্রায়শ্চিত্তে হ'লেন বিরক্ত এবং অপমানিত। যদু পারলেন না দাঁড়াতে বীর্যের সাথে অস্ত্র হাতে নিয়ে, দু'দিন পরে যে সাহস নিয়ে মুসলমান হয়ে করেছিলেন উত্তর-বাংলা হিন্দু-শূন্য। যদু যদি বীর হ'তেন তবে দাঁড়াতেন বুক ফুলিয়ে, ভণ্ডদের দণ্ড দিয়ে গড়ে তুল্‌তেন নতুন স্মৃতি—নতুন সমাজ সময়ের উপযোগী করে প্রয়োজনের মাঝে। তা হলে চিত্রিত হতো আজ বাংলার মানচিত্র ভিন্ন ভাবে। শ্রীহট্টের শাহ সাহেব যদুকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করে তাঁকে রূপান্তরিত করলেন জালালউদ্দীনে। পাঠানেরা দক্ষিণ বাহু উর্ধ্বে তুলে অভয় দিলো জালালউদ্দীনকে। যদুর সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অপব্যবস্থায় অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত সহস্র সহস্র হিন্দু ছলিমউদ্দীন, কলিম-উদ্দীন, বদরউদ্দীন হয়ে গেল। শুধু অত্যাচারিত ঘৃণিত হিন্দু নয়, একটাকিয়ার জমিদার বংশের অনেক শিক্ষিত যুবক ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখনকার দিনে বড় রাজা জমিদারদের অনেক নর্তকী উপপত্নী রাখার ছিল রেওয়াজ। এইভাবে যে সমাজের কত শক্তি ক্ষয় হয়েছে তা বলে যায় না শেষ করা।

সে যাই হোক, যদু পাঠানদের আশ্রয় পেয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজের এই প্রতারণায় উঠ্‌লেন ক্ষেপে। সোনার গরু কেটে দিয়েছিলেন দক্ষিণা যে বামুন-দের, তাঁদের জাত্ মারলেন জোর করে গোমাংস খাইয়ে প্রতিহিংসার বশে। সমগ্র উত্তর-বাংলার

মহানন্দা হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমস্ত দেশ হলো হিন্দুশূন্য। উত্তর-বাংলায় হিন্দুর ঘরে সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চের বাতি গেল নিভে; মন্দিরের আরতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের বাদ্য হলো নীরব চিরতরে।

আমরা এই প্রবন্ধে ওসকল কালাপাহাড় সম্বন্ধে কিছুই বল্‌বো না। কালাপাহাড় একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশেরই হন অথবা বীরজাওনের কালা চাঁদ রায়ই হন আর কামরূপের রাজু বা রাজনারায়ণই হন বা পাঠানবংশীয়ই হন, তাতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। আমরা বুঝ্‌তে চাই, আমরা জান্‌তে চাই, আমরা দেখ্‌তে চাই কিসের জন্য, কার অত্যাচারে বামুনের ছেলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ হলেন, ব্রাহ্মণ কালিদাস হলো গজদানীর পুত্র, পৌত্র হলেন ঈশা খাঁ, রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ হলেন সুলতান জালাল উদ্দীন। আমরা এ সব কালাপাহাড়দের কথা ছেড়ে আসল কালাপাহাড়দের জান্‌তে চাই যাঁরা আমাদের হিন্দুধর্ম ধ্বংস করেছেন—আমাদের অতুলনীয়া নারীকে শত নরকের মলিনতা মাখিয়ে নরকের দুয়ারে বসিয়েছেন—ভগবানের জীবন্ত মন্দির মানবকে অপবিত্র বলে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছেন—পঞ্চম বাহিনীর মত আমাদের ঘরে বসে আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে বিধর্মীর দলে ঠেলে দিয়েছেন। এঁরা কাঠ পাথরের মন্দির বা বিগ্রহ ভাঙ্গেন নি বা কলুষিত করেন নি সত্য, কিন্তু পরম পবিত্র মানবাত্মাকে করেছেন কলুষিত এবং চিরতরে পঙ্গু। এঁদের বংশধরেরা আজো সমাজের বুকে বসে করছেন সমাজকে ধ্বংস। আমরা বল্‌বো সেই আসল কালাপাহাড়ের কথা এই প্রবন্ধে।

হিন্দুরা যাঁকেই বলুন না কেন কালাপাহাড় —আর ঢালুন যত কলঙ্কের গ্লানি তাঁদের ঘৃণিত শিরে, আর ইতিহাস তাঁদের অপকীর্তি ঘৃণায় যত কালো অক্ষরেই রাখুক না লিখে, এঁরা কিন্তু আসল কালাপাহাড় নন। আসল কালাপাহাড় এঁদের হতে শতগুণে ঘৃণিত, সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর, লক্ষ গুণে নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্ন। ঐ সকল কালাপাহাড়েরা পড়েছেন ঘুমিয়ে কালের নিস্তব্ধ বুকে, তাঁদের সকল নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এখন আর আসেন না তাঁরা সোমনাথের ঠাকুর চিরে তাঁর ভেতর হতে বের করতে লুকানো হীরে জহরৎ মুক্তা মাণিক। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, দ্বারকা মথুরার মন্দিরদেউল ভাঙতে বা কলুষিত করতে আজ আর তাঁরা আসেন না। যে সুলেমান করনানীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের রণডঙ্কার ভীষণ রবে সকলে ভীত হতো তা নীরব হয়েছে চিরতরে। যে কালাপাহাড় নিষ্ঠুর হাতে লোহার কুঠার ধরে চূর্ণ করেছেন বিগ্রহ হাজার হাজার, তা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। মুসলমানদের "আলি," "আলি" রণহুঙ্কার হিন্দুর মনে আর ঘৃণা বা ভীতির সঞ্চার করবে না। আর তারা হিন্দুর মন্দির বা বিগ্রহ ভেঙ্গে তা দিয়ে গড়্‌বে না মস্‌জিদে উঠ্‌বার সিঁড়ি কিন্তু যে সকল আসল কালাপাহাড়ের অত্যাচারের নিষ্ঠুর নিষ্পীড়নে রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ জালাল উদ্দীন হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং যা' লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে রূপান্তরিত করেছিল ছলিম উদ্দীন, কলিম উদ্দীন, তমিজ উদ্দীনে, তাঁদের বাঁশের কলমের একটি নির্মম আঘাতে, আজো তাঁদের বংশধরেরা আমাদের ঘরের মেজেতে বসে, আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির দুধ কলা খেয়ে চন্দ্রকান্ত, রজনী, ধরণী, মোক্ষদা, শ্যামাকে জোনশ্, রেবেকা, বাহার উদ্দীন হতে বাধ্য কচ্ছেন, তা আমাদের নজরে পড়ে না, কেন? এরা আদরের দুলাল হয়ে আমাদের মধ্যে থেকেই পঞ্চম বাহিনীর মত কচ্ছেন আমাদের সর্বনাশ। কেউ কেউ বলেন, মুসলমানেরা তরবারী হাতে নিয়ে হিন্দুকে ভয় দেখিয়ে

বানিয়েছে মুসলমান—একি নিছক সত্যি কথা? ইংরেজ ইতিহাসের এ মতলবী মিথ্যে কথা আমরা রেখেছি মুখস্থ করে তোতার বুলির মতো। যেথানে সেখানে কপ্‌চে উঠে বলি তাই। ইংরেজ প্রভু হয়ে লিখেছেন তাঁদের অধীন দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ সুবিস্তৃত অনতিক্রম্য এবং চিরস্থায়ী করতে। ঘৃণা বিদ্বেষ দিয়ে তিক্ত করা হয়েছে হিন্দুর মন এবং তরবারি দেখিয়ে গরু খাইয়ে করা হয়েছে তাদের মুসলমান। পাঁচ সাত শ বছরের মিলন ও মিত্রতা ব্যর্থ করতে লেখা হয়েছে এ মিথ্যা রাজনীতিক ইতিহাস—যাতে এ দুটি বিশাল জাতির মিলন সুদূরপরাহত করে তাঁদের প্রভুত্ব এবং আমাদের দাসত্ব করা যায় চিরস্থায়ী। একথাও অতি সত্য যে মুসলমানদের অত্যাচার ধর্মান্ধতা এবং তরবারির ভয় যত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে তদপেক্ষা বহু সহস্রগুণ নরনারী ধর্মান্তরিত হয়েছে আমাদের নিষ্ঠুর সামাজিক অত্যাচারে—যে নির্মম পৈশাচিক অত্যাচারের কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ করতে কালির অক্ষরগুলিও লজ্জায় হয় স্তব্ধ।

তবে আমরা এ কথা বল্‌তে বাধ্য যে, জোর করে হিন্দুকে মোটেই মুসলমান বানানো হয়নি একথা সত্য নয়। তারা আমাদের ধর্মের উপর, সংস্কৃতির উপর যে অন্যায় আঘাত করে নি মোটেই, তাও সত্য নয়। তবে যে ভাবে সে আঘাত এসেছে তাই আমরা বুঝতে চাই সাদা মনে। অনেক স্থলেই দলিত লাঞ্ছিত এবং বর্জিত হিন্দু মুসলমান হয়ে অত্যাচার করেছেন অনেক, আমাদের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর, প্রতিহিংসা বশে। আমাদের অত্যাচারে আমাদের অবজ্ঞায় যাঁদের বাধ্য হতে হয়েছিল পরিত্যাগ করতে, পুরুষানুক্রমে সেবিত পরম উদার ও উন্নত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে, তাঁরা কেন দেবেন ঠাকুর পুজো করতে আমাদের? তাই তাঁরা জোট বেঁধে মুসলমানের সাথে, জোর করে নিয়ে গেছেন তাঁদের মতো লাঞ্ছিত তাঁদের আত্মীয় স্বজনকে। এ সবাই করে—তাতে আমরা যাই বলি না কেন—এটা যে রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক টান। মুসলমান নেতারা ছিলেন তখন সংখ্যায় অতি অল্প; দূর দেশ থেকে এসে প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য গড়্‌বার পেলেন অপূর্ব সুযোগ। সহস্র ভাগে বিভক্ত জাতির সংহতি নষ্ট হওয়ায় দিয়েছিলো এ সুযোগ তাঁদের। মুসলমানের সাথে কোন দিনই হয়নি ভারতের জাতীয় যুদ্ধ।

ইংরেজকেও হয়নি কোন দিন ভারতের জাতীয় শক্তির সঙ্গে লড়তে। রাজনীতিক কারণে তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল দলিত লাঞ্ছিত হিন্দুদের টেনে নিতে কোলে আদর করে, সমান অধিকার দিয়ে। যারা হিন্দু জনসাধারণ—যারা অন্নদাতা জাতির,—যারা জাতির প্রাণ,—সেই নিম্নশ্রেণীর দলিত লাঞ্ছিতদের কাছেই পেয়েছিলেন মুসলমানেরা তাঁদের ধর্ম প্রচারে প্রবল বাধা। আবার ধর্মের ভিত্তির উপরেই মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের দেখ্‌লেন—সাহসে ও বীরত্বে হিন্দু হীন নয় তাঁদের চেয়ে একটুও। শক্তি-সম্পদে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তারা উন্নত পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে কিন্তু একটি বিষম দুর্বলতা দেখে হয়েছিলেন উৎফুল্ল জয়ের আশায়। সেটা হচ্ছে আমাদের ঘৃণা তাচ্ছিল্য আমাদের নিম্নশ্রেণীর প্রতি। মুসলমানদের তখন নব অভ্যুত্থান, জোয়ার এসেছে তখন তাঁদের জাতীয় জীবনে। তাজা ধর্ম তাঁদের, তাজা সমাজ তাঁদের; প্রাণহীন, ধর্মহীন, সমাজের দুর্বল স্থানে হান্‌তে লাগ্‌লেন নির্মম আঘাত। মনুষ্যত্ব পারে না সহ্য করতে সে অবমাননা; তাই প্রাণবন্ত যারা, তারা হলো বিদ্রোহী মুসলমানের প্ররোচনায়। তারা বিদ্রোহের রক্ত পতাকা হাতে

নিয়ে মিশে গেলো মুসলমানের সাথে। একদিকে ঘৃণা, লাঞ্ছনা মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক অবমাননা —অন্যদিকে মনুষ্যত্বের পূজো ও সমাদর, লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিত হৃতগৌরব নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আরবের মহামানবের নিলো শরণ। মেরুদণ্ড গেলো ভেঙে হিন্দুসমাজের।

আমাদের কালাপাহাড়-শাসিত হিন্দুসমাজ ছিল না পরিচিত ত্যাগ ও বহিষ্কার ভিন্ন অন্য নীতির সাথে। তাই ঘাত, আঘাত, প্রতিঘাত, স্পর্শ ও সংশ্রব দোষে এত সহজে এবং সত্বর দেশটা ভরে গিয়েছিলো মুসলমানে। যার আছে আত্ম-সম্মানের বোধ, যে পারে আপনাকে মানুষ বলে ভাবতে, সে কেমন করে পারবে থাকতে এ হিন্দু সমাজে পশুর মত অবজ্ঞাত হয়ে। আর যদি জোর করে বানানো হয়েই থাকে হিন্দুকে মুসলমান, তবে দোষ কার তাতে? আমরাই বা কেন ত্রুটি সংশোধন করে ফিরিয়ে আনলাম না? জলে ডুবিয়ে কে পারে পদ্মের পাতা ভেজাতে? আমরা নষ্ট করে ফেলেছি ধর্মের শক্তি আমাদের। তাই হিন্দু-ধর্ম পারে না রক্ষা করতে আমাদের। আমরা ভুলে গেছি "শুদ্ধি," তাই মরছি "ছোঁয়াচে" রোগে। হিন্দু হয়ে বেদের মহাবাণী মোটেই মানি না —কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্"—শুদ্ধ করো—আর্য করো, বিশ্বের সকলকে। আমরাই খৃষ্টান মুসলমান ইহুদি যারা হিন্দু হ'তে চায় তাদের সবাইকে হিন্দু করি না কেন? আমার ধর্মের কি নেই সে পবিত্রতা, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করবার, প্রাণ-হীনকে প্রাণ দেবার? আমরা যদি পারতাম সবাইকে হিন্দু বানাতে শ্রীচৈতন্যের মতো, তবে কেউ করতো না হিন্দুকে জোর করে মুসলমান। খৃষ্টান মুসলমান জানে "ছোঁয়াচ" লাগলেই হিন্দুর জাত ধর্ম সব যায় নষ্ট হয়ে—আর ঘরে ফিরতে পারে না, তাই তার জাত মারে, ধর্ম মারে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-সময়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর উপর যে মর্মান্তিক অত্যাচার হচ্ছিল তা সকল সহ্যর সীমা অতিক্রম করেছিল। মানবত্বের মহা আহ্বান, দলিত লাঞ্ছিত মানবাত্মার কাতরতা-ভরা করুণ হাহাকার গৌরের কোমল প্রাণ ব্যথিয়ে তুলে তাঁকে পাগল করে,"সবার পিছে, সবার পিছে, টেনে এনেছিলো ঘরের বাইরে —সবহারাদের মাঝে।" ব্যথায় আকুল, কেঁদে উঠলো পতিতের "দরদীর" প্রাণ; তিনি গোঁড়ামির আস্ফালন অগ্রাহ্য ক'রে অশ্রুধারায় বক্ষ ভিজিয়ে, পতিতদের হাতে ধরে কেঁদে বললেন—

তোদের ধারি বহু ধার, ধর ধর প্রেমের পসার।
তো সবার দুর্গতি নাশিব, প্রাণের সহিত প্রেম দিব॥

"জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার—সাম্যভাব আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শিক্ষা—যাহা লইয়া তাঁহাদের তেজ ও গৌরব উহা স্বায়ত্তীকরণ। তাহা যদি করিতে পার, তোমরা (নিম্নবর্ণ) যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের এক অধ্যায়

শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের যে সমস্ত আধ্যাত্মিক চিন্তারাশি, ভাবধারা ও দর্শনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইয়া আসিতেছি, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের সঙ্গে সেগুলির যে কিছুমাত্র মৌলিক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে তাহা নয়। তথাপি একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক দর্শনের কতগুলি বিশেষ সত্যকে তিনি নিজের সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নব দৃষ্টিভঙ্গিমা এবং প্রখর যুক্তি-সহায়ে এমন এক নূতন আলোকে বিশ্বমানবের কাছে উপস্থাপিত করিয়া আসিতেছেন যাহা বাস্তবিকই অনবদ্য এবং অভূতপূর্ব্ব। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের যে জিনিষটী বিশেষভাবে বর্ত্তমান চিন্তাশীল জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইতেছে ভাবী মানব-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অমর, ঐকান্তিক শুভবাদ (Optimism)। শ্রীঅরবিন্দের এই অভূতপূর্ব্ব শুভবাদ তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত অতিমানব-আদর্শের (The Ideal of the Superman) মধ্যেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার এই অতিমানব-আদর্শ সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মনই ক্রমবিবর্ত্তনের সর্ব্বোচ্চ শিখর নয়। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা মনে আসিয়াই শেষ হইয়া যাইতে পারে না। মানব-মন সীমাবদ্ধ এবং খণ্ড-জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কলুষিত। মন আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং বোধিবিবর্জ্জিত। সমন্বয় এবং ঐক্যের অনুভূতি ইহা ধারণ করিতে অক্ষম। ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধিই ইহার বিশেষ রূপ। দার্শনিক C. G. Jung "exclusiveness, selection and discrimination" এই কয়টী শব্দ দ্বারাই মনের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং মনকেই যদি আমরা ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ বলিয়া বিবেচনা করি তবে আমাদিগকে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক নিদারুণ নৈরাশ্যকেই পোষণ করিয়া যাইতে হইবে। মন-সমন্বিত মানুষটিই ক্রমবিবর্ত্তনের সর্ব্বশেষ লক্ষ্য নয়। ক্রমবিবর্ত্তনের অব্যর্থ বিধানে বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতা-সমন্বিত মানবজাতি এক উচ্চতর, দৈব মনের স্তরে উন্নীত হইবেই। মানব-চেতনাকে দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত করিয়া সমুচ্চতম সচ্চিদানন্দের অনুভূতির মধ্যে অধিষ্ঠিত করাই ক্রমবিবর্ত্তনের লক্ষ্য। কিন্তু এই সচ্চিদানন্দের অনুভূতি আমাদের বর্ত্তমান মনের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি, মনের পরে অতিমনের (Supermind) আবির্ভাব নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, "The supramental change is a thing decreed and inevitable in the evolution of the earth consciousness; for its upward ascent is not ended and mind is not its last summit." (The Mother) এই অতিমন-সমন্বিত মানুষটিকেই অরবিন্দ আখ্যা দিয়াছেন অতিমানব বা Superman। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে, মানবজাতি এই অতিমানবত্বের স্তরে একদিন উন্নীত হইবেই। ক্রমবিকাশের অভ্রান্ত ধারায় ইহা নিয়তিনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে।

তিনি বলিতেছেন, "For man is Nature's great term of transition in which she grows conscious of her aim ; in him she looks up from the animal with open eyes towards her divine ideal." (The Superman) দিব্য, সত্যাত্মক জীবনে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ এক অতিমানব-সমাজ ক্রমবিবর্ত্তনের সর্ব্বশেষ লক্ষ্যকে পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য ধীরে ধীরে জগতের বুকে সৃষ্ট হইতেছে। এই অতিমানব-সমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস দিব্য রূপান্তরের সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। দিব্য রূপান্তরের জন্য শ্রীঅরবিন্দের যে সুতীব্র সাধনা তাহা মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক বিরাট আশার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ঐকান্তিক শুভবাদই শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক নূতন অতিমানব-জাতির জন্ম দেওয়াই পৃথ্বীচৈতন্যের ক্রমবিকাশের একমাত্র লক্ষ্য। এখন শ্রীঅরবিন্দ-কল্পিত অতিমানবের স্বরূপ এবং যথার্থ পরিচয় কি হইবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব-আদর্শ ভারতের প্রাচীন ঋষি-আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁহার অতিমানব-ধর্ম্মে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক চিন্তারাশির প্রভাব অনস্বীকার্য্য। অতিমানবের জীবনাদর্শ ও চরিত্রের যে সুমহান্ রূপ তিনি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে গীতোক্ত দৈবী সম্পদগুলির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জড়জগতের বুকে অতিমানবের বিকাশ কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "To know, possess and be the divine being in an animal and egoistic consciousness, to convert our twilit or obscure physical mentality into plenary supramental illumination, to build peace and a self-existent bliss where there is only a stress of transitory satisfactions besieged by physical pain and emotional suffering, to establish an infinite freedom in a world which presents itself as a group of mechanical necessities, to discover and realise the immortal life in a body subjected to death and constant mutation—this is offered to us as the manifestation of God in matter and the goal of Nature in her terrestrial evolution." (Life Divine). শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব ভাগবত চেতনায় বিকশিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র অহমিকা, মিথ্যা, অসরলতা, তামসিকতা, অবিশ্বাসের স্থান নাই। সমুচ্চতমা ভাগবতী শক্তির পরিপূর্ণ আশ্রয়ে, শান্ত, সমাহিত, অচঞ্চল আধ্যাত্মিক জীবনের স্নিগ্ধ সুষমার ভিতর দিয়াই শ্রীঅরবিন্দ-কল্পিত অতিমানব উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া চলিবে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, বোধি, আনন্দ এবং মুক্তির সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধির দিকে। ইহা ব্যতীত অতিমানবকে পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতে হইবে, "To be the divine man is to be the self-ruler and world-ruler." কিন্তু সে জন্য অতিমানবের জগৎ শক্তিসাধনার পশ্চাতে আধিপত্যস্পৃহার কোন প্রশ্রয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব জগৎ শাসন করিবে কিন্তু তাঁহার মধ্যে আধিপত্যস্পৃহার বিন্দুমাত্র স্থান থাকিবে না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং স্বাভাবিক তেজ অপরের স্বাধীন সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। নেতৃত্বের মোহ তাঁহার আদর্শ জীবনকে কোন সময়েই কলুষিত করিয়া তুলিতে

পারিবে না। ঔদার্য্য, সহানুভূতি এবং ঐক্য-মধ্য দিয়াই তিনি আজীবন মানুষের সঙ্গে কাজ করিয়া যাইবেন। প্রত্যেকের জীবনের সম্ভাবনা-গুলিকে স্বীকার করিয়া এবং পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করাইয়া চলাই হইবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। বিশ্বৈক্য (world-oneness) এবং নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব (impersonal personality) —এই দুইটীর অনুভূতিই হইবে অতিমানবের চরিত্রের যথার্থ পরিচয়। কর্তৃত্বাভিমান-বর্জ্জিত অতিমানব কিরূপে world-ruler হইবেন? "It is to take all qualities, energies, joys, sorrows, thoughts, knowledge, hopes, aims of the world around us into ourselves and return them enriched and transmuted in a sublime commerce and exploitation." (The Superman) মানব-চৈতন্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এই অতিমানব-আদর্শই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। এ হেন অতিমানব-আদর্শের ভিতর দিয়াই সমগ্র মানবজাতি অখণ্ড ভাগবত সত্তাতে চির-অধিষ্ঠিত হইতে পারে।

আমরা শ্রীঅরবিন্দ-কল্পিত অতিমানবের জীবনাদর্শ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। সুদীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস রূপান্তরের জন্য সুতীব্র সাধনা করিয়া আসিতেছেন তাহা এই অতিমানব-আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই জগতের বুকে চিরস্থায়ী এবং সক্রিয় হইয়া থাকিবে। এই আদর্শের উপলব্ধির দ্বারাই সমগ্র মানবজাতিকে দেবত্বে উন্নীত করা সম্ভব হইবে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীঅরবিন্দের মতে সমগ্র মানবজাতি এই অতিমানবত্বের স্তরে একদিন অধিষ্ঠিত হইবেই। তিনি বলিতেছেন, "As there has been established on earth a mental Consciousness and Power which shapes a race of mental beings and takes up into itself all of earthly nature that is ready for the change, so now there will be established on earth a gnostic Consciousness and Power which will shape a race of gnostic spiritual beings and take up into itself all of earth-nature that is ready for this new transformation." শ্রীঅরবিন্দের এই অতিমানব-আদর্শের পশ্চাতে যে যুক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। মানবজাতির এই ভবিষ্যৎ উচ্চতম অবস্থা সম্পর্কে ভারতের তথা সমগ্র জগতের বহু মনীষী একই ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ কবিগুরুর "ঐ মহামানব আসে" গানটী উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন, "Mankind is still in making. Human life as we have it is only the raw material for human life as it might be." তথাপি এ বিষয়ে অত্যুগ্র যুক্তিবাদীদের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতে পারে। এই অল্পপরিসর প্রবন্ধে বর্ত্তমান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রশ্রয় দিতে আমরা অক্ষম। এই ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ কি বলিতেছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি—"It is a call to man to do what no species has yet done or aspired to do in terrestrial history, evolve itself consciously into the next superior type already half foreseen by the continual cyclic development of the world-idea in Nature's fruitful musings." (The Superman).

সর্বধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়-সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

যিনি শতাধিক বৎসর পূর্বে অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুধা বিভক্ত ও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা, ধর্মান্ধতা ও পরমত-অসহিষ্ণুতার বিষে জর্জরিত হইতে দেখিয়া আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি, যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মসমষ্টির মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও সমন্বয় কোথায় তাহা দেখাইবার জন্য সনাতন ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ ও ভাষ্যস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, 'পূর্বগ যুগধর্ম প্রবর্তকগণের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশরূপে' ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও ভারতের বাহিরের অন্যান্য প্রধান ধর্মসমূহ নিজ জীবনে আচরণ ও সাধন পূর্বক প্রত্যেক ধর্মের চরম অনুভূতি লাভ করিয়া 'যত মত তত পথ' রূপ অশ্রুতপূর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচারের দ্বারা জগতের ধর্মান্ধতা, পরধর্মবিদ্বেষ, মতুয়ার বুদ্ধি ও সংকীর্ণ গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রকৃত শান্তি, মৈত্রী, প্রীতি ও সৌভ্রাত্র স্থাপনে সহায়তা করিয়াছেন, প্রেমময় ভগবান্‌কে অন্তরে উপলব্ধিপূর্বক সর্বভূতে সেই হরিই বিরাজমান জানিয়া শিবজ্ঞানে জীব-সেবারূপ এক অভিনব কর্মযোগের প্রবর্তন করিয়াছেন, কোনও মতবাদে বিশ্বাস বা ধর্মমন্দিরে গমনই প্রকৃত ধর্ম নয়—সত্যের সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ ধর্ম, ইহা ঘোষণা করিয়া ধর্মকে এক বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, নারীমাত্রেই জগদম্বার প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া স্ত্রীজাতিকে সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা করিতে উপদেশ দিয়া ভোগসর্বস্ব মানবের সম্মুখে শক্তিসাধনার এক অপূর্ব রূপ প্রদান করিয়াছেন,—সেই দক্ষিণেশ্বরের দেব-মানব জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আমাদের কোটি কোটি ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানাইতেছি। আজ জাতীয় জীবনের মহাসঙ্কটকালে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্মবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণ গোঁড়ামি, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, ধর্মমন্দির কলুষিতকরণ ও অন্যান্য পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন 'ভারতের ত্রিশকোটি মানবের সহস্র সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের ভাষ্য-মূর্তি ও সমগ্র জগতের যুগযুগান্তরের আচরিত বিভিন্ন ধর্ম-মতের সমন্বয়-প্রতীক' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্মসমন্বয়ের ভাব আমাদের হৃদয়ে কি পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে উহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম, সকল মত, সকল পথ, সকল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সকল ধর্ম, মত, পথ ও আদর্শকেই তিনি সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মত-পথ, হিন্দুধর্ম-বহির্ভূত ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম অনু-সরণ ও সাধন করিয়া পরিণামে একই চরম সত্য ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুরুর উপদেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত আচরণ করিয়া, প্রত্যেক ধর্মমত, ধর্মাদর্শ ও যোগমার্গের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, বিধি, ক্রিয়াকলাপ, অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়া, কোনও অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা অসত্য বলিয়া বর্জন না করিয়া, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মত, পথ ও
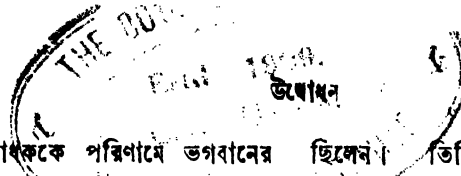
মার্গই সত্য এবং সাধককে পরিণামে ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিভিন্ন ধর্মমত ও আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমত ও ধর্মাদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য না দেখিয়া সকল মত ও সকল আদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণের দ্বারাই তাঁহার ধর্মসমন্বয় একাধারে অভূতপূর্ব, বিশিষ্ট ও মানবজাতির মহাকল্যাণ-বিধায়ক হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমায় সব ধর্ম একবার নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এসব পথ দিয়ে আসতে হয়েছে। দেখলাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আস্‌ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। অনন্ত পথ;—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে। মত-পথ। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও কত কিছু। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যাঁর যে নামে ও যে ভাবে ডাক্‌তে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেইভাবে ডাক্‌লে দেখা পায়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, আবার খৃষ্টান মুসলমান সকলেই ঈশ্বরকে পাবে, আন্তরিক হলে। আমার ধর্ম্ম ঠিক, আমি যা ভাব্‌ছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা—এই মতুয়ার বুদ্ধি খারাপ। বস্তু এক, নাম আলাদা। এক রাম, তাঁর হাজার নাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের পরধর্মসহিষ্ণুতা কেবল পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নয়—তাঁহার সহিষ্ণুতার অর্থ—'সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ'। ইহা ধর্মসমীকরণ নহে—ইহা ধর্মসমন্বয়। বিভিন্ন ধর্মে যাহা ভাল ও গ্রহণযোগ্য উহার গ্রহণ এবং যাহা আপাতবিরুদ্ধ উহার পরিবর্জনকেই ধর্মসমীকরণ বলে। বিভিন্ন ধর্মমতের মূল একত্বকে বুদ্ধি, যুক্তি ও বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি আপাতবিরুদ্ধ মত ও আদর্শসমূহের অনৈক্যগুলিকে সাধনার কষ্টিপাথর দ্বারা একে একে পরীক্ষা করিয়া উহাদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে কেবল বিভিন্ন পথই ফলপ্রসূ ও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু বিভিন্ন দার্শনিক ও আচার্য কর্তৃক প্রচারিত ধর্মাদর্শও তুল্যরূপ সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। কারণ এই সকল পথ ও আদর্শ একই চরম সত্যের বিভিন্ন দিক্ মাত্র। তিনি বিভিন্ন ধর্মাদর্শ ও পথকে বিন্দুমাত্রও অনুপযোগী ও অসত্য বলিয়া বর্জন না করিয়া, সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সার্বভৌম সমন্বয়মূলক দৃষ্টি প্রকৃত পক্ষেই অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্ম-সমন্বয়ই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের নিকট সর্বাপেক্ষা মহতী বাণী এবং জগতের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ দান। এই সমন্বয়বার্তার অমোঘ প্রভাব সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, এবং লেখনী, বাক্য ও বলপ্রয়োগদ্বারা ধর্মান্তরিতকরণ, ধর্মস্থান কলুষিতকরণ প্রভৃতির মূলে চিরতরে কুঠারাঘাত করিবে এবং সকলকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিতে চিরসম্বদ্ধ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। এরূপ সর্বাঙ্গীণ, সর্বব্যাপক ও উদার ধর্মসমন্বয় পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে পূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের বাণীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই বলিয়াছেন, "পরমহংসদেবের মহাপ্রেম এবং বিবেকানন্দের বলবান্ বাহুতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত সকল দেবতার, সত্যের সকল প্রকার অভিব্যক্তির এবং সকল মানবীয় স্বপ্নের যেরূপ মধুর সমাবেশ ও গ্রহণ দৃষ্ট হয়, এরূপ কোন যুগের

ধর্মভাবে আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যাঁহারা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, যাঁহারা ঈশ্বরেও বিশ্বাস করেন না, আবার স্বপ্নরাজ্যেও বিচরণ করেন না কিন্তু অকপট চিত্তে তত্ত্বান্বেষী, যাঁহারা শুভেচ্ছাপ্রণোদিত, যাঁহারা যুক্তিবাদী, যাঁহারা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ, যাঁহারা প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা সাকারবাদী, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, যাঁহারা বুদ্ধিজীবী এবং যাঁহারা নিরক্ষর—সকলের নিকটই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।" শ্রীঅরবিন্দও বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমরা এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাই। এই শক্তির প্রভাবে তিনি সোজাসোজি প্রথমেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, মনে হয় যেন জোর করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। তৎপর একে একে সমস্ত যোগমার্গই অনুসরণ করিয়া এবং অতি ক্ষিপ্রতার সহিত প্রত্যেক যোগমার্গের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া প্রেম, স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে সর্বদাই সেই চরম উদ্দেশ্য ভগবানের শ্রীচরণে পৌঁছিয়াছিলেন। এরূপ সমন্বয় অনন্যসাধারণ।"

সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা স্মরণ করিয়া পৃথিবীর নরনারী সকলেই হৃদয়ঙ্গম করুন যে, অদূর ভবিষ্যতে সসাগরা পৃথিবী এক সার্বভৌম শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ধন্য হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক মহিমময় মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইবে, পরস্পরের ভেদ, বিবাদ ও অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া 'সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়'—এই সমন্বয়বাণীর আশ্রয়ে এক সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

ব্যর্থ হবে রামকৃষ্ণ, তোমার বাণী—তোমার দান ?

শ্রীঅনুকূল চৌধুরী

বিশ্ব যখন ভ্রান্তিমগন ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্বে রত,
বিজাতীয় ভাবের মদে 'ইয়ং বেঙ্গল' সংজ্ঞাহত,
জড়বাদ-মোহসুরা
পানে সবে মাতোয়ারা,
ভগবানে উড়িয়ে দিলে নাস্তিকতার যুক্তি হানি,
তুমি তখন উচ্চারিলে আস্তিকতার সত্যবাণী।

ধর্মমতের মর্মকথা সমন্বয়ের সাম্য গান
গেয়েছিলে উদার কণ্ঠে দূরে গেল সবার মান।
যত মত তত পথ,
সত্য সব ধর্মমত,
সকল পথে মুক্তি মিলে জ্ঞান ভকতি কর্ম যোগে,
বিশ্বাসী পায় ভগবানে অবিশ্বাসী শুধুই ভোগে।

ধর্মমতের পন্থা নিয়ে মিছে দ্বন্দ্ব বৃথাই তর্ক,
সব সন্দ চলে যায় উদয় হলে জ্ঞানের অর্ক।
ঋজু বক্র নানা পথে
চলে সবে ইচ্ছা মতে
এক লক্ষ্যে একই স্থানে, এই কথাই শাস্ত্র বলে,
পন্থা নিয়ে তবু তর্ক অনাদি কাল আসছে চলে।

সমন্বয়ের তব বাণী বিবদমান বহু মতে
সহিষ্ণুতা-শক্তি দিল সকল ধর্মে চলার পথে।
মতবাদ দ্বিধা দ্বন্দ্ব
ঈশ নিয়ে বৃথা সন্দ
হ'ল অবসান, পেল শান্তি কত বাদী নিরীশ্বর,
আঁধার পথে আলোক দেখল ভ্রান্তমতি নারীনর।

তোমারি এই সাধন ভূমে 'ধর্ম গেল' চীৎকারে
আত্মঘাতী হিংসা-বিরোধ দিচ্ছে দেশটি ছারখারে।
মারামারি হানাহানি
দিবালোকে রাহাজানি
দানবতার পায়ে দিচ্ছে মানবতার বলিদান!
ব্যর্থ হবে রামকৃষ্ণ, তোমার বাণী—তোমার দান?

পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গবাসী হিন্দুদের প্রতি নিবেদন

নোয়াখালির সকরুণ ছবি মন হইতে মুছিয়া যাইতে না যাইতে হিন্দুরা আবার একটি মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পূর্ব-বঙ্গবাসী ও সুরমা উপত্যকাবাসী হিন্দুরা আজ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত স্বাভাবিক আবেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মনে আজ এই আশঙ্কা উঠিয়াছে যে, ভারতের সহিত তাঁহাদের আইনগত, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যোগসূত্রগুলিও বুঝি বা শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। উক্ত অঞ্চলে সম্প্রতি যে সকল বীভৎস ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সন্ত্রাস বর্ধিতই হইতেছে।

এই সকল শোচনীয় ঘটনায় আমরা খুবই বিচলিত হইয়াছি। তথাপি পূর্ববঙ্গবাসী আমাদের সহধর্মীদিগকে আমরা বলিতে চাই যে, বর্তমান অবস্থায় বিহ্বল হইলে চলিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইতেছে ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দৃঢ়চিত্তে কার্যে অগ্রসর হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং হিন্দুধর্মে যাহা কিছু মহৎ বস্তু আছে তাহার নামে আজ আমরা তাঁহাদিগকে এই সঙ্কটকালে সাহস অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। এখন তাঁহাদিগকে অধিকতর বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অবলম্বনে নিজস্ব অধিকারগুলি রক্ষায় অগ্রসর হইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিতে হইবে, হিন্দুধর্মের বিনাশ হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম।……হিন্দুধর্ম্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।" আমরা নিজেরা হিন্দু বলিয়াই যে হিন্দুনামে গর্বিত হইতেছি তাহা নহে; পরন্তু হিন্দুত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি অপূর্ব ও অমূল্য তথ্য নিহিত রহিয়াছে যাহার অভাব ঘটিলে সমস্ত জগতেরই পরিতাপের বিষয় হইবে। অন্তর্নিহিত এই শক্তির ফলে হিন্দুধর্ম অতীতে সহস্র বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সে সকল বিপদ কাটাইয়া উঠিবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হইয়াছে—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে।…আনন্দিত হও।…ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতেই উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না, উহা সীমাহীন, সর্ব্বগ্রাসী।"

বস্তুতঃ বর্তমান পরিস্থিতি এত নৈরাশ্যজনক নহে যে আমরা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। অতীতে এতদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক লোকও, এমন কি নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ও শুধু যে আত্মরক্ষাই করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা নহে, তাহারা ইতিহাসের গতি পর্যন্ত পরিবর্তিত করিয়াছিল। শুধু সংখ্যায় কিছু হয় না। আমাদের প্রয়োজন এমন প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির, যাহা সমস্ত সমাজ-জীবনকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে। স্বামিজীর ভাষায়, "আমাদের চাই শক্তি, চাই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, চাই আত্মনির্ভরতা ও অটুট ধৈর্য্য, চাই কার্য্যকুশলতা ও উদ্দেশ্যের ঐক্যবন্ধন এবং চাই উন্নতিতৃষ্ণা।"

এইরূপ নৈতিক বল লইয়া পাকিস্তানের হিন্দু-দিগকে আপনাদের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা জানি যে অনেকে বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাইতে চেষ্টিত আছেন। ইহা

সহজেই বুঝিতে পারি যে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে যাঁহারা শত্রু-পরিবেষ্টিত ও সহায়হীন, তাঁহারা স্বভাবতঃই সন্তানসন্ততির জীবন ও নারীগণের সম্মান রক্ষার্থে তাহাদিগকে শহর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবেন। ইহাও অত্যাবশ্যক যে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদি মূল্যবান বস্তু নিরাপদ স্থানে ভাল ব্যাঙ্কে রাখিতে হইবে—উহা পল্লী অঞ্চলে ফেলিয়া রাখার মানে বিপদ ডাকিয়া আনা। কিন্তু এখনই সকলে মিলিয়া একেবারে দেশত্যাগ করার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ এইরূপ বিশাল জনসমষ্টিকে একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া অতি শক্তিশালী শাসকমণ্ডলীরও ক্ষমতার অতীত। বিশেষতঃ এইরূপ দীনহীন মনোভাব পোষণ করার ফলে হিন্দুদের উপকার না হইয়া সর্বনাশই হইবে। আমরা ধনী মানী হিন্দুসম্প্রদায়ের কতকাংশে দেশত্যাগেরও বিরোধী; কারণ ইহাতে দরিদ্র হিন্দুরা আরও অসহায় হইবে এবং পরের দ্বারা অধিকতর অত্যাচারিত হইবে; এমন কি ধর্মান্তরিত পর্যন্ত হইতে বাধ্য হইবে। অধিকন্তু এতাদৃশ আচরণ অতি কাপুরুষোচিত।

এতদপেক্ষা যুক্তিসংগত পন্থা হইতেছে, হিন্দু-সমাজকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত ও একতাবদ্ধ করা যাহাতে তাহারা সম্যক্‌রূপে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। ইহা করিতে হইলে আমাদিগকে অস্পৃশ্যতা, জাতিগত বিশেষাধিকার এবং ভিন্ন বর্ণের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি সামাজিক আবর্জনা দূর করিতে হইবে। অতঃপর পুরোহিতগণকে জাতিনির্বিশেষে সকল হিন্দুর গৃহে যাজন করিতে হইবে; নাপিতগণ সর্বজাতির ক্ষৌরকর্মাদি করিবে এবং রজকগণ সর্বজাতির বস্ত্রাদি ধৌত করিবে। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য মন্দির, পুষ্করিণী, শিক্ষায়তন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সকল হিন্দুর সমান অধিকার থাকিবে। পরিবারে ভৃত্য নিয়োগকালে জাতিবিচার সম্বন্ধে আরও উদার হইতে হইবে। বস্তুতঃ এখন শুধু জাতি দেখিলে চলিবে না, চরিত্র ও আচরণ দেখিয়া লোকের মর্যাদা ঠিক করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গের মহিলাগণকে আরও বীরত্বপূর্ণ হইতে হইবে। আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁহারা সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন; তাঁহাদের কর্তব্য হইবে বিপত্তিকালে সর্ববিধ বাধা প্রদান করা। তাঁহাদের আচরণ এরূপ হওয়া উচিত যে, দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসভ্যাচরণ করিতে শঙ্কিত হইবে।

আমরা পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, দুর্বৃত্তগণ কাহাকেও ধর্মান্তরিত করিলে, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করাইলে, নারীহরণ করিলে বা অনুরূপ কিছু করিলে তদ্দ্বারা ধর্মনাশ হইবে না। এইরূপ অত্যাচারিত স্ত্রীপুরুষকে অবিলম্বে সসম্মানে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্বোপরি পাকিস্তানের হিন্দুগণকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। অবশিষ্ট হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না, বরং সহায়তাই করিবেন। তথাপি পাকিস্তানী হিন্দুদিগের একটা নিজস্ব গঠনমূলক কর্মপন্থা থাকা আবশ্যক। ইহার জন্য তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় লোকের অভাব নাই। এবিষয়ে অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া বরং পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে অপরের পথ-প্রদর্শক হইতে হইবে।

অধিকন্তু পরীক্ষা না করিয়া প্রথম হইতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি আস্থাহীন হওয়া অনাবশ্যক। রাষ্ট্রপরিচালনার কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হইলে পাকিস্তানী সরকার অন্ততঃ রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য হিন্দুদের ন্যায় বৃহৎ, সুশিক্ষিত ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবেন। বিশেষতঃ দুইটি সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী পরস্পরের সহিত এত বিজড়িত যে তাহারা দীর্ঘকাল শত্রুভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলেও মনে হয়, ঘটনাচক্রের আবর্তনে বিভ্রান্ত ও ধর্মোন্মত্ত জনতার মধ্যে পুনর্বার সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, এবং তাহারা অধিকতর সভ্যভাবে চলাফেরা করিবে। হিন্দুদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও অপর সম্প্রদায়ের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবে। এতদ্ভিন্ন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতেছেন।

সুতরাং পাকিস্তানী হিন্দুরা সমবেতভাবে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর হউন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা ভয়ে বিহ্বল বা প্রলোভনে মুগ্ধ না হইবেন, যতক্ষণ তাঁহারা আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়া বা অযথা অপরের উৎপীড়ন করিয়া আত্মবিনাশে অগ্রসর না হইবেন, ততক্ষণ কেহ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

উভয় বঙ্গ উত্তরাধিকারসূত্রে যে অমূল্য ধন পাইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে যে গভীর প্রেম-বন্ধন রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এই একত্বানুভূতির ফলে একদিন অতীতের এক তথাকথিত চরম সিদ্ধান্তও ব্যাহত হইয়াছিল আজ আবার পশ্চিমবঙ্গকে ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সে পূর্ববঙ্গকে দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলিয়া দেয় নাই। উভয়ের অন্তর্নিহিত একত্বকে আজ আর্থিক সাহায্য, রক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিক উৎসাহদানাদি বিবিধ উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গ যেন আজ পূর্ববঙ্গকে বুঝিতে দেয় যে সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয়।

বেলুড় মঠ
১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৭

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

Reflections and Reminiscences—৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। হিন্দ্ কিতাবস্ লিমিটেড্ কর্তৃক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। ২২০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন একজন অমর বাঙ্গালী সাংবাদিক। নগেন্দ্রনাথ যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তাহা তৎপ্রণীত 'ভারতীয় জাতীয়তা', 'গান্ধী ও গান্ধীবাদ' প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। লাহোরের 'ট্রিবিউন' নামক ইংরাজি দৈনিকের সম্পাদক রূপে তিনি ভারতব্যাপী সুনাম অর্জন করেন। এই পুস্তকে তাঁহার জীবন-স্মৃতি এবং অন্যান্য তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে। এই সকল স্মৃতির অধিকাংশ 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকে ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বর্তমান শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক চিত্র তাঁহার স্মৃতিতে পাওয়া যায়। প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল উত্তর ভারতের নানা নগরে তিনি সাংবাদিকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বিহার প্রদেশের মতিহারীতে নগেন্দ্রনাথ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মথুরানাথ গুপ্ত আরা জেলার সব জজ ছিলেন। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক

নগেন্দ্রনাথ শেষ বিশ বৎসর বোম্বাইতে অতিবাহিত করিয়া ১৯৪০ সালে দেহত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্রি ইন্‌স্‌টিটিউটে অধ্যয়ন করিতেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে লাহোরে এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটী ইংরাজি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের স্মৃতি ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তিনি একখানি ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুরের সমাধির যে সুন্দর বর্ণনা তিনি 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ পরম প্রীত হন এবং তাঁহাকে পত্র দেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের স্মৃতি কথায় এই পুস্তক সমৃদ্ধ।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'প্রভাত' নামক একটি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পরিচালনা করেন। তাহাতে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লিখিতেন। তখন বাংলা ভাষায় তিনি কয়েকটী উপন্যাস এবং বহু গল্প রচনা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে বিদ্যাপতি পদাবলীর একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হন এবং জনৈক মৈথিলী পণ্ডিতের সাহায্যে ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরাজিতে সুলেখক ছিলেন। তাঁহার এই জীবন-স্মৃতি সুলিখিত, সুপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ ইতিবৃত্তরূপে সমাদৃত হইবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

কাঙ্গালের ঠাকুর ও মুক্তির মহাবাণী—শ্রীঅশ্বিনী কুমার গোস্বামী প্রণীত ও প্রকাশিত। ৩৩ পৃঃ, মূল্য ।৴০ আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত নাম-মাহাত্ম্য মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তগণ ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

গোপীর ধর্ম্ম—শ্রীঅশ্বিনী কুমার গোস্বামী প্রণীত ও প্রকাশিত। ১২ পৃঃ, মূল্য ৵০ আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত গোপী ভাবের নামে বাউল নেড়া কর্তাভজা সাঁই দরবেশ কালা বাতুনী গুরুসত্তি প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে অনাচার চলিতেছে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার প্রকৃত গোপী ভাবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। এই পুস্তিকাখানি বহুল প্রচারিত হইলে ধর্মের আবরণে অনুষ্ঠিত অধর্ম ও দুর্নীতি হইতে বৈষ্ণবসমাজ রক্ষা পাইবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী বিপুলানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২০শে জুলাই রবিবার দিন ১টা ১০ মিনিটের সময় শ্রীমৎ স্বামী বিপুলানন্দ মহারাজ রক্তের চাপে আক্রান্ত হইয়া কলম্বো (সিংহল) শহরে একটি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বরদেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া প্রথমে কলম্বো আশ্রমে আনীত হয় এবং তথা হইতে ট্রেনযোগে ২১৭ মাইল দূরস্থিত ব্যাটিক্যালো শহরে পরদিন আনয়ন করা হয়। এখান হইতে তাঁহার দেহ প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী ক্যালাডি উপড়েই নামক গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবানন্দ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শোভাযাত্রাসহকারে নীত হইলে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর এই স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ সমারোহ সহকারে সমাহিত করা হয়।

স্বামী বিপুলানন্দজী ১৯৪৪ সনে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে থাকে। গত ৩০শে জুন তিনি দক্ষিণ-ভারত হইতে কলম্বো প্রত্যাবর্তন করেন। এই মাসেই প্রাচীন তামিল সংগীত সম্বন্ধীয় তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১০ই জুলাই তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য ১৫ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে আনয়ন করা হয় এবং এই স্থানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী বিপুলানন্দজী ১৯২২ সনে মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৪ সনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তামিল সাহিত্যে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে তাঁহার অত্যন্ত সুনাম ছিল। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সিংহল দ্বীপের নানা স্থানে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি কিছু কাল রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত এই বিদ্যালয়গুলির জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি যোগ্যতা সহকারে 'বেদান্তকেশরী', 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্' (তামিল) সম্পাদন করেন। স্বামী বিপুলানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি গ্রন্থাবলীর কয়েক ভাগ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ১৯৩১-১৯৩৩ সন পর্যন্ত তিনি আন্নামেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল অধ্যাপক এবং প্রাচ্য বিভাগের 'ডিন্' ছিলেন। ১৯৪৩ সন হইতে স্বামী বিপুলানন্দজী সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল অধ্যাপকের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার কর্মশক্তি ও নিষ্কলুষ চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। এই মনীষীর দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশন একজন খ্যাতনামা সভ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন।

তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সাধু ও ভক্ত-সম্মেলন—গত ১৪ই আষাঢ় হইতে দিবসত্রয় উত্তর-বঙ্গের শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের একটি সম্মেলন হইয়াছে। সমগ্র উত্তর-বঙ্গ, কুচবিহার, পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র এবং মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে অনেক সন্ন্যাসী এবং ভক্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথম দিন উদ্বোধনী বক্তৃতায় বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ বলেন যে হিন্দুজাতিকে বাঁচিতে হইলে কার্যকরী ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথে যত সত্বর সম্ভব সমাজ ও ধর্মকে রূপায়িত করিতে হইবে। এই দিন সন্ধ্যায় সমবেতকণ্ঠে শ্রীরামনামকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন

প্রাতে বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণের আলোচনান্তে যাহাতে হিন্দুজাতি একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে এরূপ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপরাহ্নে দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যার পর কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত কীর্তন করেন। শেষদিন প্রাতে প্রতিনিধিগণ বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত রামকেলী দর্শন করিয়াছেন। অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় কুচবিহারের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন, কাটিহারের শ্রীযুক্ত মাধুর্যময় মিত্র, দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী, মালদহের স্বামী পরশিবানন্দজী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং সমগ্র হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পতাকাতলে সমবেত হইতে অনুরোধ করেন।

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী :—

(ক) অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩, হইতে প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

১। **India** ১২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ আনা।

২। **Caste, Culture and Socialism.** ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ আনা।

৩। **Poems.** ৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।৶০ আনা।

৪। **Thoughts on the Gita.** ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

৫। **Sadhanas or Preparations for Higher Life.** ১৩পৃষ্ঠা, মূল্য।৵০ আনা।

৬। **Work and its Secret.** ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য।৶০ আনা।

৭। **The Powers of the Mind.** ২৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০ আনা।

৮। **Life After Death.** ৩৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা।

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত।

১। বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ডি, এস, শর্মা রচিত **The Prince of Ayodhya** (মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান ইংরাজী গদ্যে লিখিত) চারিশত পৃষ্ঠার উপর। মূল্য বোর্ড ৪৲, কাপড় ৬৲টাকা।

২। নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত **Atmabodha—Self-Knowledge** (ভারতীয় সংস্করণ) আচার্য শঙ্কর প্রণীত, ৩১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ টাকা।

(গ) নিউইয়র্ক (আমেরিকা) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত।

স্বামী নিখিলানন্দ প্রণীত **Essence of Hinduism.** ৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৬ডলার ২৫ সেন্ট্।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে ডাঃ শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যতীন্দ্র বাবু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু ছিল 'The Position of Women in Vedic Ritual'. তাঁহার 'Contribution of Women to Sanskrit Literature' নামক সাত খণ্ড গ্রন্থ বিদগ্ধ জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। 'Patronage and Contribution of Muslims to Sanskrit Literature' নামক দুই খণ্ড গ্রন্থ ডক্টর চৌধুরীর অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' কলিকাতার প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ডাঃ চৌধুরী প্রাচ্যবাণীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধাররূপেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন। অধ্যাপনাক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের প্রধানতম কাজ গবেষণা পরিচালনা এবং সর্বত্র সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা। প্রাচ্যবাণীর সম্পাদক ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ সমিতির সম্পাদকরূপে ডাঃ চৌধুরী গবেষণাকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ইহাও সুবিদিত যে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারেই তিনি ও তাঁহার বিদুষী পত্নী ডাঃ রমা চৌধুরী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা— গত জুন ও জুলাই মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্ মহাশয় সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", স্বামী বিবেকানন্দের "দেববাণী", শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে "দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস", "ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) জীবনী" এবং "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জীবন-কথা" আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব মহাশয় সাপ্তাহিক ধর্মাধিবেশনে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" পাঠ করিয়াছেন।

চন্দ্রকোণায় (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব— মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক কিছুদিন হইল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বাদশাধিক শততম জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজাদি হয় এবং মধ্যাহ্নে কয়েকটি গ্রাম হইতে সমবেত প্রায় ৮০০ ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ পরিতোষ-পূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্বামী ঋতাত্মানন্দজী, কাশী অদ্বৈতাশ্রমের স্বামী জ্ঞানানন্দজী, বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহারাজের মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়। পরদিন সন্ধ্যায় স্বামী রামানন্দজী সুললিত কণ্ঠে কালীকীর্তন ও ভজনসংগীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির

আবেদন

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রাম। এইস্থানে ১৩৩০ সনে একটী মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং যথা নিয়মে নিত্য পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই স্থানটি ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মস্থান কামারপুকুর হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই দুইটি পুণ্য তীর্থ দর্শন অভিলাষে ভারতের নানা প্রদেশ এমন কি ভারতের বহির্দেশ হইতেও অনেকে অতি আগ্রহের সহিত আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্দিরের নিকটে তাঁহাদের বিশ্রামোপযোগী কোন গৃহ না থাকায়, দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। বাঁকুড়ার জেলাবোর্ড শ্রীমন্দির পর্যন্ত আমোদর নদের উপর একটী ইষ্টকনির্মিত পুলসহ রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া জনসাধারণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তদের বাসের কোন ব্যবস্থা আমরা এখনও অর্থাভাবে করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমরা সর্বসাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইতেছি। আশা করি সকলেই এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়া শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভাজন হইবেন। বিশ্রামাগারটী নির্মাণের জন্য ৩৫,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। ইহা মাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের স্মৃতিরক্ষার্থ "শ্রীশ্রীসারদানন্দ ধাম" নামে অভিহিত হইবে। এই জনহিতকর কার্য্যে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ
অধ্যক্ষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমন্দির, জয়রামবাটী,
…শড়া, (বাঁকুড়া)

স্বাধীন ভারত

সম্পাদক

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার ভারতীয় গণ-পরিষদ্ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্বদিন গভীর নিশীথে বিশ্ববাসী যখন সুষুপ্তির শান্তিতে নিমগ্ন, তখন দীর্ঘকালের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ ভারতবাসী জাগ্রত হইয়া শৃংখল খুলিয়া ফেলিল, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি ভারতের জাতীয় প্রতিনিধির হস্তে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চক্রশোভিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা নৈশ আকাশে উত্তোলিত হইল, দুর্গশীর্ষ হইতে মুহুর্মুহু কামানের গভীর গর্জন রজনীর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এই বার্তা ঘোষণা করিল, চারিদিকে নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য যুগপৎ বাজিয়া উঠিল, স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠ হইতে উদাত্ত স্বরে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া ঘন ঘন উচ্চারিত হইল—'বন্দে মাতরম্'—'জয় হিন্দ্'। দেখিতে দেখিতে উৎসবানন্দ-মুখর বিভাবরীর অবসানে যেন এক নূতন জাতির জীবন প্রভাত হইল—কবির ভাষায় "নূতন যুগ-সূর্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি"। ভারতের স্বাধীনতার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী যাবৎ জাতির কল্পনায়, জাতির স্বপ্নে, জাতির জাগরণে, জাতির সাহিত্যে, জাতির কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণা দান করিয়াছে, আজ তাহা সফল হইল। স্বাধীনতার সম্মোহিনী শক্তি-প্রভাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বরত হিন্দু-মুসলমান অকস্মাৎ সম্মিলিত হইয়া সমগ্র দিন উৎসবে যথার্থই মাতিয়া উঠিল, মুক্তি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ গণ-জীবনে এক অদৃশ্যপূর্ব স্বতোৎসারিত প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা গেল, লাট-প্রাসাদ সৈন্যাবাস বিচারালয় জেলখানা থানা ডক্ জাহাজ অফিস স্কুল-কলেজ কারখানা ব্যাঙ্ক দোকান মন্দির গির্জা মসজিদ অট্টালিকা পর্ণকুটির সর্বত্র ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইল, স্থানে স্থানে পত্র-পুষ্প-পতাকাযুক্ত সুদৃশ্য তোরণ শোভা পাইতে লাগিল, রাজকর্মচারী সৈন্য পুলিশ ধনী দরিদ্র জনসাধারণ দলে দলে রাস্তায় বাহির হইয়া নব ভারতের নবীন জাতীয় ঋক্ 'জয় হিন্দ্' বলিয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। এই আনন্দ-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল বরণীয় দিনটি যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরম পবিত্র দিনরূপে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাংলার কবি ভারতের স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়া বহু বৎসর পূর্বে গাহিয়াছিলেন, "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে।" আজ সত্য সত্যই ভারতবাসীর একান্ত বাঞ্ছিত সেই পরম গৌরবের দিন আসিয়াছে। ভারতবর্ষ

এক অভূতপূর্ব উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতা এক পশু-শক্তির উপর অপর পশু-শক্তির প্রতিষ্ঠামূলক স্বাধীনতা নয়, ইহা পাশব শক্তির সহিত আত্মিক শক্তির সংগ্রামলব্ধ স্বাধীনতা, ইহা হিংসার সহিত অহিংসার সংঘর্ষার্জিত স্বাধীনতা, ইহা সাম্রাজ্যবাদের অন্ধ প্রলোভের উপর গণতান্ত্রিক মানবতার বিজয়সঞ্জাত স্বাধীনতা। এরূপ অহিংস উপায়ে, এরূপ সামান্ত অন্তর্বিপ্লবে, এরূপ অল্প রক্তপাতে স্বাধীনতা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এ পর্যন্ত অর্জন করিতে পারে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক এবং সত্য ও অহিংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধী এই অশ্রুতপূর্ব অহিংস সংগ্রামের প্রবর্তক ও পরিচালক। তিনিই বহু বিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সর্বাগ্রে বর্তমান জগতের এই শ্রেষ্ঠ মানবকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট (Provisional Government of Free India) এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অসাধারণ উত্তম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার এই একনিষ্ঠ উপাসকের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন ভারত-মাতার বন্ধন-মুক্তির জন্য যাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন বলি দিয়াছেন, যাঁহারা নানা ভাবে নির্যাতন সহিয়াছেন, যাঁহারা ঐহিক সুখ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের অক্লান্ত সাধনায় এই স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে, সেই খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা মহাপ্রাণ শহিদদের উদ্দেশ্যেও আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

স্বাধীনতার উৎসবানন্দে প্রমত্ত ভারতবাসীকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আজ যে স্বাধীনতা তাহারা লাভ করিয়াছে, ইহা তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ সুযোগ মাত্র। এই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সাফল্য নির্ভর করে ভারতের জনসাধারণ—যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, জাতির প্রাণশক্তি, তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপর। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভারতের স্বাধীনতা ছিল রাজতন্ত্রমূলক; সেকালে রাজাই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। বর্তমান ভারতের স্বাধীনতা প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রমূলক; ইহাতে দেশের জনগণই সর্বেসর্বা। এই জন্য এই স্বাধীনতার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব জনগণের। কারণ, তাহাদের অধিকাংশের অভিমতেই এখন দেশ শাসিত হইবে। এরূপ স্বাধীনতা ভারতে আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠাম পরিকল্পনা করিবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমবায়ে একটি গণ-পরিষদ্ গঠিত হইয়া কয়েক মাস যাবৎ ইহার কার্য পরিচালিত হইতেছে। ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণও ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এই পরিষদের চেষ্টায় ভারতের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতীক-স্বরূপ একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিকল্পিত হইবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতের সকল নরনারীর শিক্ষার অভাব, অন্ন বস্ত্র ও আবাসের অভাব এবং নানা বিষয়ে ভোগ ও অধিকারের অভাব প্রভৃতি দূর করিয়া সকল বিষয়ে তাহাদের উন্নতি সাধন হইবে ইহার প্রধান আদর্শ। ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উত্তম শিক্ষা, অর্থকরী বৃত্তি, স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য, রোগে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং সকলকে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভে সমান সুযোগ দানই হইবে ইহার লক্ষ্য। এইরূপ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভে ভারতের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

দীর্ঘকালের পরাধীনতার পাষাণ চাপে ভারতের জনগণ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে পিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও তাহারা পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাহাদের অবনতির জন্যই সমগ্র ভারত আজও অবনত। তাহাদিগকে উন্নত করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সম্ভব হইবে না। ভারতের উন্নতির অর্থই ভারতের জনসাধারণের উন্নতি। অভিজাত উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির উন্নতিকে সমগ্র ভারতের উন্নতি বলা যায় না। তাঁহারা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ উন্নত হইতে পারে নাই। নিম্নশ্রেণীর জনগণকে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ও সংগতিসম্পন্ন অভিজাত উচ্চশ্রেণীর স্তরে উন্নত করাতেই ভারতের উন্নতির সার্থকতা। এতদিন বিদেশীর অধীনতা, শাসন ও শোষণ এবং এক শ্রেণীর স্বদেশী অভিজাত ও ধনিকদের উৎকট স্বার্থপরতার জন্য ভারতের আপামর জনসাধারণের উন্নতি সম্ভব হয় নাই। পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি শিক্ষানীতি কৃষিনীতি শিল্পনীতি সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা-সমূহও তাহাদের উন্নতির অনুকূল ছিল না। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণকে এই সকল বিষয়ক প্রচলিত ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে সর্বসাধারণ সকল বিষয়ে অতি শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারে। ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ—এমন কি সমাজও প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ইহা কার্যে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এ জন্য সকল বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুগধর্মসম্মত গঠনমূলক কার্য-প্রণালী ব্যাপক ভাবে প্রবর্তন করা আবশ্যক। ইহা সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি অপরিহার্য। আশা করি, সঙ্ঘমুক্ত স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নরনারীর পক্ষে এই মহান উদ্দেশ্যে সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইবে।

স্বাধীন ভারত কেবল স্বগৃহের উন্নতি সাধনের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে না, অধিকন্তু বিশ্ব-মানবের কল্যাণসাধনের জন্যও অবশ্য চেষ্টা করিবে। পরাধীন অবস্থায় ভারতবর্ষ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের বাহনে পরিণত হইয়া এশিয়ার অনেক দেশকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে এবং পৃথিবীতে ইংরাজের প্রভুত্ব বিস্তারে সহযোগিতা করিয়া বিশ্বমানব-সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। এই জন্য ভারতের দাসত্ব কেবল ভারতবাসীর নহে পরন্তু পৃথিবীর বহু জাতির মহা অনিষ্টের কারণ ছিল। এই হেতু পরাধীন ভারতবাসীকে পৃথিবীর কোন স্বাধীন জাতি সম্মানদৃষ্টিতে দেখিত না। পরাধীনতার জন্য ভারতের সাধারণ নরনারী দূরের কথা সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বহু ব্যক্তিও দেশ-বিদেশে নানা ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত ও অসম্মানিত হইয়াছেন। ইহা কেবল ব্যক্তিগত নহে, পরন্তু ভারতের জাতীয় অপমান। ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীর এই জাতীয় কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া ফেলিবে, তাহারা পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মর্যাদা লাভ করিবে এবং তাহাদের স্বাধীনতা এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিরও স্বাধীনতা-লাভের কারণ হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি-রূপে পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ দূরীভূত হইয়া বিশ্বমানবের মধ্যে যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা নিশ্চিত।

স্বাধীনতার দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়াই ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ ইন্দোনেশিয়া (জাভা) ও ভিয়েৎ-নামের (আনাম) স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং ব্রহ্মের স্বাধীনতা-আন্দোলনে আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন এশিয়ার সকল দেশের সঙ্গে নানাবিধ

ভাবের আদান-প্রদানমূলে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের জন্ত গত মার্চ মাসে দিল্লী নগরীতে 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলন' আহূত হইয়াছিল। ইহাতে এশিয়ার ছোটবড় বাইশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাচ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে প্রাচ্যের সকল জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই মহান্ আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্ত এশিয়ার সকল জাতির প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই কমিটির সুযোগ্য সভ্যগণের চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে নবজাগ্রত এশিয়াবাসী পাশ্চাত্যের শাসন ও শোষণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে এবং তাহারা ধর্ম ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানমূলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিশ্বের স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিবে।

অতীতের স্বাধীন ভারত এই মহান আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগে ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির প্রচারকগণ এশিয়ার অনেক অসভ্য ও অনুন্নত জাতিকে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়াছেন—ভাষা ও শিক্ষা দিয়াছেন—সর্বোপরি দিয়াছেন এক অপূর্ব দর্শন ও ধর্ম—যাহা মানুষকে চরম ও পরম শান্তি দান করিতে পারে। এই মহাত্যাগী প্রচারকগণ ধর্মপ্রচারের আবরণে কোন জাতির জাতীয় ধর্ম সমাজ কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেক জাতির প্রচলিত ধর্ম সমাজ ও রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে উন্নত ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দান করিয়াছেন। এই ভাবে পৃথিবীর সকল দেশের সকল নরনারীকে ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দানই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এবং ইহাই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর মহাদেশ কয়টির মধ্যে এশিয়া সকল ধর্মের জন্মভূমি এবং সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আবার ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতে ধর্ম ও দর্শন যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে এরূপ আর কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম ও দর্শনের উপর ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের যে প্রভাব আছে ইহা এখন সর্বজনস্বীকৃত। পরাধীনতার সর্বতোমুখী গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ধর্ম ও দর্শন পৃথিবীতে প্রসার লাভ করিবার তেমন সুযোগ পায় নাই। তথাপি এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও ভারতে অনেক অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ধর্মাচার্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম কেবল স্বদেশে নয় পরন্তু ইতোমধ্যেই বিদেশেরও বহু মনীষীর শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ সাফল্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরাধীন ভারতে ইহার সূচনা হইয়াছে, এবং স্বাধীন ভারতে ইহার পূর্ণপরিণতি সন্দেহাতীত। স্বাধীন ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি যে পূর্বাপেক্ষাও সমৃদ্ধিলাভ করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের সুশিক্ষিত মানবসমাজকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিবে এবং ইহার অমৃতপ্রসূ ফলস্বরূপে বিশ্বমানবের মধ্যে যে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই সকল কারণে ভারতের স্বাধীনতা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইলেও ভারতবর্ষকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করায় এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী

পরিণতিরূপে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় আমরা যথার্থই মর্মান্তিক বেদনা বোধ করিতেছি। আবহমান কাল হইতে ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক দিয়া কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী এবং করাচী হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হিমাদ্রি-কিরীটিনী নীলাম্বুবেষ্টিতা ভারতবর্ষ এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন। ইতিহাস সংস্কৃতি ধর্ম সমাজ শিল্প সাহিত্য রাষ্ট্র ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বপাঞ্জাবের সহিত পশ্চিম-পাঞ্জাব এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধানের জন্য ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার বিষমফলরূপে বিক্ষিপ্ত অংশসমূহের অধিবাসি-গণের মধ্যে সকল বিষয়ে পারস্পরিক যোগসূত্র ও সহযোগিতা নষ্ট হইয়া বিরোধ-বিদ্বেষ সৃষ্ট হইবার যথেষ্ট আশংকা আছে। কিছুকাল যাবৎ পাকিস্তান অঞ্চলসমূহে যে সকল বীভৎস ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহাতে এই আশংকা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে অনেকে উৎপীড়িত হইয়া এবং অনেকে উৎপীড়নের আশংকায় তাহাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই হতভাগ্য নরনারীগণকে ভারত-বিভাগের কুফল কার্যতঃ এখনই ভোগ করিতে হইতেছে। পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুযুবকগণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা যে নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে যথার্থই অতুলনীয়। ভারত-বিভাগের ফলে স্বাধীনতার এই একনিষ্ঠ পূজারীদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহারা আশংকা করিতেছেন যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার কার্যতঃ রক্ষিত হইবে না। এই জন্য ভারতব্যাপী স্বাধীনতার মহোৎসবে যোগদান করা এই উভয় শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব হয় নাই।

ভারতের পূর্বাকাশে স্বাধীনতার স্মিতোজ্জল নবারুণরাগ এবং স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত ঘনকৃষ্ণ মেঘের আবির্ভাব অনির্দেশ্য বিপদজ্ঞাপক হইলেও উহা দেখিয়া পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুগণকে বিচলিত হইলে চলিবে না। এই মেঘ দেখিতে দেখিতে হাওয়ায় বিলীন হইবেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া আরব্ধ কার্যে তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সাহস সহকারে উহাকে বরণ করিয়াই কার্যে অগ্রসর হওয়া তাহাদের কর্তব্য। অনাগত ভীষণ বিপদের আশংকায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পৈত্রিক আবাস ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে এখনই দারুণ বিপদ ও দুঃখের সম্মুখীন হইতে হইবে। কারণ, পাকি-স্তানের বিশাল হিন্দুজনসমষ্টিকে হিন্দুপ্রধান স্থানে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা সদ্যস্থাপিত স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে কোটি কোটি হিন্দুনরনারীর এইরূপ ভীতিবিহ্বল পরাজিত মনোভাব হিন্দুজাতির সর্বনাশের কারণ হইবে। এত অধিকসংখ্যক নরনারী সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার চেষ্টা করিলে উহা যে কখনও ব্যর্থ হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। এই সকল কারণে পাকিস্তান অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হইলেও তথাকার হিন্দুগণকে আপাততঃ ইহা স্বীকার করিয়া ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করাই তাহাদের পক্ষে বিধেয়। এই বিষয়ে তাহারা সমগ্র ভারতের সাহায্য নিশ্চয় পাইবে। পাকি-স্তানের নেতৃবৃন্দও বাস্তবতার যতই সম্মুখীন হইতে থাকিবেন, ততই সুশৃংখল ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনের জন্য তথাকার সুশিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দু-প্রতিবেশীদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিতে বাধ্য হইবেন। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের

গণ-পরিষদের সভাপতি কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না এবং পূর্বপাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া হিন্দুদের সর্ববিধ অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও পাকিস্তানের হিন্দুদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আতংকিত না হইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করাই তাহাদের কর্তব্য। এ জন্য তাহাদের আপন গৃহে ঐক্য স্থাপনের পথের প্রধান বিঘ্ন অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক ভেদ বিরোধ প্রভৃতি অবিলম্বে দূর করা একান্ত আবশ্যক। পাকিস্তানের হিন্দুগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহারা বর্তমানে যে বিপদে পড়িয়াছে, ভারতের স্থানে স্থানে হিন্দুজনসমষ্টি বহুবার ইহা অপেক্ষাও প্রলয়ংকর বহির্বিপ্লব ও অন্তর্বিপ্লব অতিক্রম করিয়া আজও অক্ষত দেহে বাঁচিয়া আছে। ভবিষ্যতেও হিন্দুগণ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া তাহাদিগকে জাতীয় জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, সংখ্যায় কিছু যায় আসে না। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে সংখ্যালঘু অনেক সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কেবল আত্মরক্ষায়ই কৃতকার্য হয় নাই, অধিকন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন করিতেও সমর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতিও একেবারে নৈরাশ্যজনক নহে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণ তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার জন্যও তথাকার হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করিতে নিশ্চিত বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই ভরসায় থাকিলে পাকিস্তানের হিন্দুদের চলিবে না। তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য তাহাদিগকেই সর্বতোভাবে অবশ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এ জন্য চাই—অদম্য আত্মবিশ্বাস, চাই সুদৃঢ় সংহতিশক্তি, চাই সিংহতুল্য নির্ভীকতা, চাই অসাধারণ ত্যাগ, চাই উন্নতির প্রবল তৃষ্ণা, চাই মর্মস্থলোত্থিত স্বাধীনতা-স্পৃহা, চাই জ্বলন্ত স্বদেশভক্তি, চাই প্রদীপ্ত স্বজাতিপ্রীতি।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির চাপে ভারতবর্ষ এবং পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা দেশ আপাততঃ দ্বিধাবিভক্ত হইলেও এই মহা অনিষ্টকর বিভাগ যাহাতে স্থায়ী না হয় তজ্জন্য হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে উভয় রাষ্ট্রের স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উভয় রাষ্ট্রে এই বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করাই এই মহা অনর্থ দূর করিয়া ভারতের সকল প্রদেশকে পূর্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়। উভয় রাষ্ট্রের পরিচালকগণ যদি প্রথম হইতেই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল বিষয়ে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলে রাষ্ট্রীয় সকল কার্য পরিচালন করেন এবং এক প্রদেশের অধিবাসিগণ যদি অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ কার্যতঃ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সকল প্রদেশ পুনরায় সম্মিলিত হইবে। ভারতবাসী মাত্রেরই মনে-প্রাণে বুঝা আবশ্যক যে, যত দিন ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত এবং প্রদেশ কয়টি ছিন্নবিচ্ছিন্ন থাকিবে, তত দিন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া থাকিতে হইবে এবং কোন সম্প্রদায়েরই আশানুরূপ উন্নতি সম্ভব হইবে না। ইহার ফলে ভারতের স্বাধীনতাও অপূর্ণ এবং অগ্নিগর্ভ ভূকম্পের ন্যায় অনির্দেশ্য বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ

থাকিবে। ভারতের দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র একীভূত হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে ইহা যে অতি শীঘ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সমস্বরে বলিতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে উভয় রাষ্ট্র একীভূত হইয়া এক অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রে অবশ্য পরিণত হইবে। আমরা আশা করি, তাঁহাদের এই মহান অভিপ্রায় অতি শীঘ্র কার্যে পরিণত হইবে। ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিভাগের ন্যায় ভারতবর্ষ এবং পাঞ্জাব ও বঙ্গের বর্তমান বিভাগও স্থায়ী হইবে না।

স্বাধীনতার নবারুণ-প্রভায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী জাগ্রত হইয়া সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ভুলিয়া ঐক্যের মহান আদর্শে মাতিয়া উঠুক, স্বাধীনতার মোহিনী শক্তি ভারতের সকল নরনারীকে নব নব ভাবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ যথার্থ সাম্য-মৈত্রী-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, স্বাধীন ভারতবাসীর ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রাচীন যুগ অপেক্ষা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া বিশ্বমানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করুক এবং ইহার প্রভাবে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিরোধ-বিদ্বেষ চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, স্বাধীনতার আবির্ভাবে ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

কয়েক মাস পূর্বে ভারতীয় গণ-পরিষদ্ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা পরিকল্পনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। গত ২২শে জুলাই মঙ্গলবার রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই কমিটির পরিকল্পিত একটি পতাকা পরিষদে উপস্থিত করিয়া ইহা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে তুমুল জয়ধ্বনি সহকারে পরিগৃহীত হয়। এই পতাকাটি প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি ও ভবিষ্য ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে অত্যন্ত ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। অতি সহজ-বোধ্য ও সাধারণ কয়েকটি নিদর্শনের সমবায়ে শিল্প-কলার দিক দিয়াও ইহার সৌন্দর্য চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের মহিমময় আদর্শ এই নবপরিকল্পিত জাতীয় পতাকায় যথার্থই রূপায়িত হইয়াছে।

এই পতাকার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ ও সেবার প্রতীক গাঢ় পীতবর্ণ, মধ্যভাগে সত্য জ্ঞান ও পবিত্রতার প্রতীক শ্বেত এবং নিম্নভাগে সাম্য-মৈত্রীর প্রতীক নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ সবুজ। ইহার শ্বেতভাগের মধ্যস্থলে বসান হইয়াছে একটি চক্র। এই চক্রটি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত সারনাথের শিলা-স্তম্ভ হইতে গৃহীত। প্রসিদ্ধি আছে যে ধর্মাশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ ও পরিচালনে হিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আদেশে অহিংসা ও শান্তির প্রতীকরূপে আলোচ্য চক্র-শোভিত স্তম্ভটি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় এই চক্রটির স্থানদান অত্যন্ত শোভন হইয়াছে। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চক্রটি কেবল তন্তুবায় বা কুম্ভকারের চক্র নয়, অথবা ইহা শুধু আধুনিক যন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক কারখানার চক্রও নয়, অধিকন্তু ইহা অশোক-চক্র—ধর্মচক্র—মানব-জীবন-চক্র—অদৃষ্ট-চক্র। এই চক্রটি গতিশীলতার প্রতীক—সদা প্রবহমাণ কালের প্রতীক—প্রগতিশীল কর্মের প্রতীক। এই চক্রের 'পাকি' (spoke) গুলি জীবন আলোক স্বাস্থ্য ও শস্যের আশ্রয়স্বরূপ সূর্যের প্রতীক। সত্য জ্ঞান ও পবিত্রতাকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগ ও সেবা এবং সাম্য-মৈত্রী আশ্রয়ে কালচক্র অবিরাম গতিতে ঘূর্ণিত হইয়া সকল নরনারীকে কর্মে প্রবর্তিত করিতেছে। এইজন্য এই সকল অবলম্বনে মানুষমাত্রকেই অক্লান্ত ভাবে অবিরত কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই এই পতাকার ভাবার্থ।

ভারতের জাতীয় জীবনের এই চিরাচরিত বিশ্বজনীন ভাবধারা স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় যথার্থই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাও সংরক্ষিত হইয়াছে। অতীত ও বর্তমানের সংযোগে এরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবের অভিব্যক্তি পৃথিবীর অন্য কোন দেশের জাতীয় পতাকায় দেখা যায় না। অতীত ভারত এই মহান ভাবই বিশ্ববাসীর নিকট উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইহার দ্বারা সকল দেশের মনীষিগণ প্রভাবিত হইলেও অধিকাংশ নরনারী ইহা আজ পর্যন্তও গ্রহণ করে নাই। এই জন্য পৃথিবীর মানব-সমাজে এখনও বহুবিধ সমস্যা-জনিত অশান্তির অপ্রতিহত রাজত্ব চলিতেছে। দীর্ঘ-কালের পরাধীনতা হইতে সদ্যমুক্ত নবচেতন ভারতবর্ষ তাহার সেই জ্ঞানগর্ভ পুরাতন বাণীই নূতন করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিবে। অতীত ভারত যে কার্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই, ভবিষ্য ভারত তাহাই সম্পন্ন করিবে, এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা পরিকল্পিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহেরু গণ-পরিষদে এই পতাকাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, "এই পতাকা কোনও সাম্রাজ্যের পতাকা হইবে না, সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইবে না, একের উপর অপরের প্রভুত্বের নিদর্শন হইবে না। এই পতাকা হইবে মুক্তির প্রতীক; শুধু আমাদের মুক্তি নহে, এই পতাকা যাহারা দেখিবে, তাহাদেরও সকলের মুক্তির প্রতীক হইবে। এই পতাকা বহন করিবে সাম্যের বাণী, ভারতবর্ষ যে সকল দেশের মিত্র—এই বাণী। যাহারা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত, ভারতবর্ষ তাহাদিগকেও সাহায্য করিতে প্রস্তুত—এই বাণী।" সকল বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হওয়া এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীকে মুক্ত করাই ভারতের মর্মবাণী। এই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মুক্তির বাণীই সদ্যমুক্ত ভারতের জাতীয় পতাকায় রূপ লাভ করিয়াছে।

পরিশেষে পণ্ডিতজী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, "সহকর্মিগণ, আপনারা স্বাধীনতা-যুদ্ধের গৌরবান্বিত সৈনিক। আপনাদের যিনি সেনাপতি, আপনারা সেই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, অহিংসা ও সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ, বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করুন। পাশব বলের সহিত আত্মিক বলের সংঘর্ষ, সশস্ত্র অন্যায়ের সহিত নিরস্ত্র ন্যায়-ধর্মের যুদ্ধ—পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় যুদ্ধের কথা আর শোনা যায় নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একমাত্র ভগবান নিরস্ত্র ছিলেন; আর বিংশ শতাব্দীর এই যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী হইতে তাঁহার সকল সৈন্য-সামন্তই নিরস্ত্র। মর্তলোকে দুর্লভ যে মহাপুরুষ আপনাদের সেনাপতি, তাঁহার আদেশ ও নির্দেশে আপনারা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইয়া

আজিকার এই পতাকাকে স্বাধীনতার সমুন্নত বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। তরুণ তেজোদ্দীপ্ত হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদেরই দিকে চাহিয়া আজ আমি রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া এই মহান অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। দৃঢ় সংকল্পে উদ্ভাসিত আপনাদের নির্মল ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, বিস্তৃত বক্ষ এবং বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় দেখিয়া আমার ভরসা হইতেছে, আজিকার সমুন্নত জাতীয় পতাকার গর্ব ও গৌরব ম্লান হইবে না। হে বীরগণ, আপনারা এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হস্তে স্বাধীনতার দুর্গম পথে যাত্রা করুন।" পণ্ডিতজীর এই মর্মস্পর্শী বাণী ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকগণকে যে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহা নিশ্চিত।

আমরা আশা করি, স্বাধীন ভারতের এই স্বাধীন পতাকা বিশ্ববাসীর নিকট বহন করিবে সর্ববন্ধনবিমুক্তির বাণী—যুদ্ধ-বিগ্রহ সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসা-বিদ্বেষপ্রমত্ত নরনারীর নিকট প্রচার করিবে সাম্য-মৈত্রীর বাণী। পৃথিবীর যেখানে ভারতের রাষ্ট্রদূত থাকিবেন, যেখানে ভারতবাসী অবস্থান-করিবেন, সেইখানেই এই পতাকা এই মহতী বাণীই ঘোষণা করিবে। ভারতের বাণিজ্যপোতে রণপোতে এরোপ্লেনে ট্রেনে সৈন্যাবাসে বিচারালয়ে কারখানায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসে সর্বত্র এই পতাকা এই বাণীই উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিই এই পতাকার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা স্বাধীন ভারতের এই জাতীয় পতাকাকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন করিতেছি।

স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা

গত ১১ই আগষ্ট পাকিস্তান গণ-পরিষদ্ কর্তৃক স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পরিগৃহীত হইয়াছে। এই পতাকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিয়াছেন, "পতাকাটি সমকোণী (rectangular) এবং ইহার দণ্ডের (mast) দিকের এক চতুর্থাংশ শ্বেতবর্ণ এবং অবশিষ্ট অংশ সবুজবর্ণ হইবে। সবুজ অংশের মধ্যভাগে ডান দিকে হেলান শ্বেতবর্ণের একটি অর্ধচন্দ্র এবং পঞ্চকোণবিশিষ্ট একটি তারকা থাকিবে।" পতাকার সবুজবর্ণ অর্ধচন্দ্র ও তারকা মুসলমানধর্মের প্রতীক এবং শ্বেতবর্ণ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রমুখ অ-মুসলমান ধর্মসমূহের প্রতীক। এইরূপে পতাকাটিতে সকল ধর্মের স্থান আছে বলিয়া ইহা অসাম্প্রদায়িক। মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁও এই পতাকাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই পতাকা কোন রাজনীতিক দল বা ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের পতাকা নহে। ইহা পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর জাতীয় পতাকা। ইহা পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবে।"

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্বাধীন পাকিস্তানের এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সকল অধিবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের এই উপদেশ প্রতিপালিত হইবে এবং পাকিস্তান যাহাতে অবিলম্বে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তজ্জন্য হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলে মিলিয়া অবশ্য চেষ্টা করিবেন।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সীল-মোহর

ভারতীয় গণ-পরিষদ্ স্বাধীন ভারতের জাতীয় সীল-মোহর পরিকল্পনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি সম্রাট অশোকস্থাপিত সাঁচিস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ অবলম্বনে উহার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই স্তম্ভটি একটি অখণ্ড চুনার পাথরের তৈরী। অভগ্ন অবস্থায় ইহার উচ্চতা ছিল ৪২ ফুট। শিল্পীর দক্ষতায় এই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সম্পূর্ণ গোলাকার এবং মার্বেলের ন্যায় মসৃণ ও চকচকে আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্তম্ভ একটি খোদিত শৃংখল-পরিবেষ্টিত। স্তম্ভটির মস্তকে চারিটি সিংহ স্কন্ধে স্কন্ধ মিলাইয়া চারিদিকে মুখ ব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান। ইহাদের মুখভঙ্গী কেশর ও থাবার রূপায়ণ প্রাণবন্ত। এই সিংহ শাক্যবংশের শাক্য রাজগণের শৌর্যের প্রতীক। ইহার নিম্নভাগে একটি পদ্ম বিদ্যমান। প্রাগুক্ত কমিটির অভিমত অনুসারে স্তম্ভটির মাত্র উপরিভাগ এবং চারিটি সিংহের স্থলে তিনটি সিংহ ও পদ্ম জাতীয় সীল-মোহর রূপে গত ২২ শে জুলাই গণ-পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।
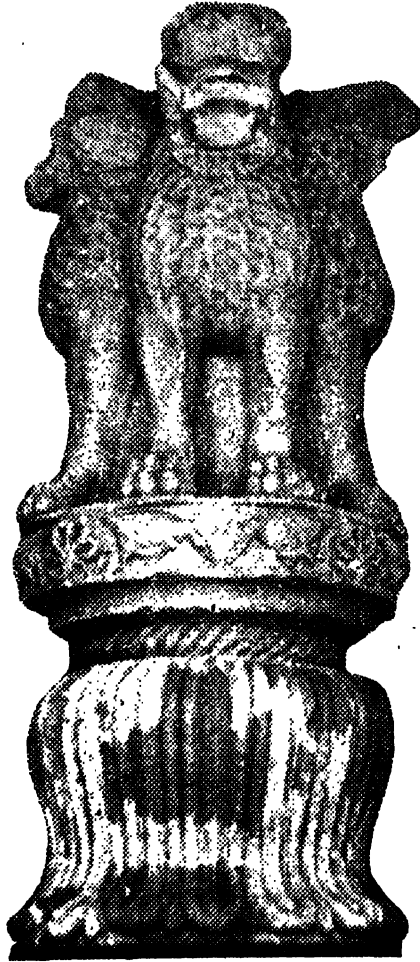
ঐতিহাসিকগণের মতে স্মরণাতীত কাল হইতে বিজয়ের স্মৃতিরূপে স্তম্ভ স্থাপনের পদ্ধতি বর্তমান। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ধর্মাশোকের ন্যায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে আর কেহ সমর্থ হন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ভারত ভিন্ন ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিজয়-স্মৃতিরূপে তিনি এই স্তম্ভটি স্থাপন করেন। এই জন্য ইহা 'অশোক কী লাট' বা 'অশোক স্তম্ভ' নামে অভিহিত। এই স্তম্ভগাত্রে অশোকের নিম্নলিখিত বাণী খোদিত আছে: "আমার অভিপ্রায়—এই (বৌদ্ধ) সংঘ ঐক্যবদ্ধ হউক এবং দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকুক।" পরাধীনতা-মুক্ত ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হউক, ভারতের স্বাধীনতা স্থায়ী হউক, ভারত সকল বিষয়ে বিজয়ের পথে অগ্রসর হউক, ইহাই ভারতবাসীর একান্ত কাম্য। এই

সাদৃশ্যের জন্য স্তম্ভটির উপরিভাগ জাতীয় সীল-মোহররূপে গ্রহণ করা অত্যন্ত শোভনীয় হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন স্তম্ভস্থিত পদ্ম ও সিংহ প্রতীক দ্বারাও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগসূত্র অভূতপূর্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে। পদ্মটি সৌন্দর্য অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং সিংহ শক্তি শৌর্য ও নির্ভীকতার প্রতীক। এই প্রতীক-সমূহের অন্তর্নিহিত মহান ভাবরাশি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতের সকল নরনারী তাহাদের জাতীয় জীবনে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হউক, ইহাই স্বাধীন ভারতের এই সীল-মোহরটির ভাবার্থ। এই মহৎ উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় জীবনে সাফল্য লাভ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত পত্র

Lloyd Triestino.

Piroscafo Conte Verde.

৬।৩।৩৬

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

স্বামীজি!

আপনার ২রা ডিসেম্বর তারিখের পত্র যথা-সময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু নানা কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি যে প্রবন্ধের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা লিখিতে পারি নাই প্রধানতঃ দুইটী কারণে। প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সাহস হয় না। দ্বিতীয়তঃ গত দুই তিন মাস আমি ক্রমাগত ঘুরিয়াছি এবং স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিতে পারি নাই।

তথাপি আপনি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। "নিবেদিতার" মত আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব ততদিন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের" একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—এ কথা বলা বাহুল্য।

পরশু দিন আমরা বম্বাই পৌছিব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

* 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে লিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীমতী কল্যাণী কর, এম্-এ

হে মহামানব, আজিকার দিনে
কী গান গাহিব বল?
থেমে গেছে সুর, থেমে গেছে যত
আনন্দ-কোলাহল।
আজি চারিদিকে শুধু হাহাকার
আকাশে বাতাসে জাগে বারেবার,
পথহারা সবে চলিয়াছে কোথা
কোন্ প্রলয়ের পথে,
পার্থসারথি হ'য়ে এসো আজি
মানবজীবন-রথে।

যুগে যুগে তুমি আসিয়াছ, তুমি
বাঁচায়েছ মানবেরে,
নামিয়া আবার এসো প্রভু তুমি
ধরণীর ধূলা 'পরে।
এই দুর্দ্দিনে এসো আর বার,
বাঁশের বাঁশরী বাজাও আবার,
আপনারে ভুলি গোপিনীরা যত
ছুটে যাক্ তব কাছে;
পথহারা যত নরনারী তারা
হের কোথা চলিয়াছে।

উদ্যতফণা মৃত্যুনাগিনী নিঃশ্বসে
দ্বারে বসে,
প্রলয় বজ্র মাথার উপরে
ক্ষণে ক্ষণে নির্ঘোষে।
গভীর পঙ্কে ডুবে নরনারী,
স্বার্থের লাগি' করে কাড়াকাড়ি,

সেদিনের মত রাজগৃহ ছাড়ি'
মানবের দুখ লাগি'
আবার বাহিরি' এসো তপোধন
সবার মুক্তি মাগি'।

সেদিনের মত প্রেমের প্লাবনে
ভাসাও ভারতভূমি,
ধন্য হউক এ ভারতের ধূলি
তোমার চরণ চুমি'।
যত সংশয় করে দাও দূর,
আবার জাগুক দৃপ্ত সে সুর—
'করিস্‌নে ভুল, আছে সে যে আছে,
জানি আমি তাঁরে জানি।'
সেদিনের মত লও হে আবার
সকলের কাছে টানি'।

কী কহিব আর আমি ঋষিবর
তোমার জনমদিনে,
আজি যেন কেহ নাহি করে ভুল
তোমারে লইতে চিনে।
সবার মাঝারে আবার জাগিয়া
সত্যের পথে লও হে টানিয়া,
আঁধারের মাঝে জ্বালাও তোমার
অনির্ব্বাণ দীপখানি,
দিকে দিকে আজি ধ্বনিয়া উঠুক
তোমার অমৃত-বাণী।
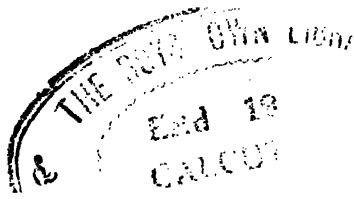
দর্শনে ভারতের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক কনভ আচার্য (শান্তি নিকেতন)

কোনো গভীর বিষয় চিন্তা করবার জন্য চাই প্রচুর শান্তি; কারণ সুগঠিত চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে এবং চরমভাবের শান্তিকে লক্ষ্য করেই গড়ে ওঠে জাতীয় সংস্কৃতি। সেজন্য জাতীয় সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে শান্তির প্রয়োজন সকলের আগে। গত কয়েক শতাব্দী বাদ দিলে দেখা যায় যে উত্তরের সু-উচ্চ পর্বতমালা এবং দক্ষিণের সমুদ্র ভারতবর্ষকে চিরকাল বহিঃশত্রু থেকে রক্ষা করে এসেছে, এবং ভারতের সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা ভূমি ভারতবাসীদের জন্য খাদ্য এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে এসেছে। সে জন্য ভারতবাসীরা জীবনকে (ইউরোপীয়দের ন্যায়) "যুদ্ধ-ক্ষেত্র" বলে ভাবতে শেখেনি। ভারতবাসীরা ধন, দৌলত এবং ক্ষমতাকে সমাজের শীর্ষস্থানে বসায় নি; বরঞ্চ তারা চেষ্টা করেছিল কি করে এই সুখ-পূর্ণ পৃথিবীকে আরও সুখের করে তুলতে পারে। তাই তারা জীবনের আদর্শকে উচ্চ হতে উচ্চতর করবার চেষ্টায় ছিল। তারা দেখেছিল 'মৃত্যুই' কেবল এক মাত্র জিনিষ যাকে সাধারণ মানুষ কোন দিন জানতে পারবে না এবং সে জন্যই "মৃত্যু" সাধারণের কাছে ভয়াবহ বলে মনে হয়। সে ভীতি থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য আমাদের দেশে দর্শনের আবির্ভাব। "মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারলেই মানুষ অনন্তের সন্ধান পায়—এই অনন্তই পূর্ণানন্দের বিকাশ"—তারই সন্ধান আমাদের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য।

ইউরোপে দর্শন গড়ে উঠেছিল রাজনীতি সমাজনীতি বা ধর্মকে লোকচক্ষে সত্য প্রতিপন্ন করবার জন্য। সে জন্য সেখানে দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে "মেটাফিজিক্স্" বা কথার কথা যার দাম হয়ত ব্যক্তি-বিশেষের কাছে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণের কাছে তার দাম কিছুই নয়। ভারতীয় দর্শনপদ্ধতি মানুষ মাত্রেরই "মোক্ষের" জন্য—দর্শন ভারতে ব্যক্তি-বিশেষ বা সমাজ-বিশেষের বিলাসিতার অঙ্গমাত্র নয়। এদেশে দর্শন মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্যেই বোধ করি মোক্ষমূলর বলেছিলেন যে প্রত্যেক ভারতবাসীই দার্শনিক অর্থাৎ দর্শন ব্যতিরেকে ভারতবাসী এক পা চলতে পারে না। মাণ্ডুক্য উপনিষদে কথিত আছে, "ব্রহ্ম-বিদ্যা সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ব-জ্ঞানই সর্ব-বিদ্যার আধার। কৌটিল্য বলেন, "দর্শন প্রদীপ-স্বরূপ; এ দীপ্তি হতেই বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং কর্ম আলোকিত হয়।"

কোন দেশের দর্শন-বিদ্যা সে দেশের জলবায়ু এবং জাতীয় সংস্কারের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে ভারতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে ভারতীয় মতবাদ বিভিন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে চিন্তাধারার একটা বিশিষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় দার্শনিকগণ কোন কোন স্থানে গ্রীক-মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্যজাতি ভারতবর্ষে আসবার পর

ভারতের বাইরে অন্যান্য আর্যগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন নি। এক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সময় ছাড়া এদেশের সহিত ইউরোপীয়দের কৃষ্টির দিক দিয়ে মেলামেশার সুবিধা কখনও হয় নি

অনেক সময়ে দেখা যায় যে 'সমভাব' বিভিন্ন স্থানে 'সমমত' গঠন করে। সেজন্য Peripatetic এর সঙ্গে ন্যায়ের, Ionic এর সঙ্গে বৈশেষিক অথবা Platonic এর সঙ্গে বেদান্তের সামঞ্জস্যে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই না। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের ধারণা যে গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, ব্যাস, কপিল এবং পতঞ্জলি প্রভৃতি যথাক্রমে Aristotle, Thales, Socrates, Plato, Pythogoras and Zeno প্রভৃতির নিকট হতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইহা সর্বৈব মিথ্যা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় দার্শনিকগণ বাহ্যিক বা জাগতিক সুখকে দর্শনের মধ্যে স্থান দেন নি। তার কারণ পার্থিব সুখের অভাব তাদের ছিলও না কোন দিন। সেজন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনকে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে নিয়োজিত করেছিলেন। এক কথায় ভারতীয় দর্শনকে "অধ্যাত্মবাদ" বলা যেতে পারে। পার্থিব পদার্থের জ্ঞানের সীমার শেষে ভারতীয় দর্শনের জন্ম— সেজন্য রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনকে কোনও দিন স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। এই কারণেই ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির আধিপত্য—ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করতে পারে নি।

পার্থিব জগতের বাইরে আধ্যাত্মিক জগৎই ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রণালী নির্দেশ করে। এ আধ্যাত্মিক জগৎ ছাড়া ভারতবাসী কোনও দিন থাকতে পারে নি। এই আধ্যাত্মিক জগৎ তার কাছে সর্বদাই সুস্পষ্ট ছিল। সেজন্য ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আমরা অবিচ্ছিন্নতা বা অদ্ভুততা (Super-lunacy) পাই না। এ জন্য ভারতীয় দর্শন কখনও কোন ব্যক্তি-বিশেষের হ'য়ে দাঁড়ায় নি। বরং আমরা দেখতে পাই গীতা কিংবা উপনিষদ্ সাধারণের জ্ঞান এবং বিশ্বাসের বাইরে নয়। সেজন্যই আমাদের 'পুরাণ' এত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ। দার্শনিক তত্ত্ব ভারতের জলবায়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের আয়ত্ত করতে হয় না। দার্শনিক তত্ত্বকে আমরা জীবনের সংস্কার হিসেবে পাই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে 'ধর্ম' কোন একটা 'অন্ধবিশ্বাস' নয়। ধর্ম আমাদের জীবনযাত্রার অন্যতম প্রণালী। ধর্ম ব্যতিরেকে আমরা এক পাও চলতে পারি না। হ্যাভেল বলেছেন, "In India religion is hardly a dogma, but a working hypothesis of human conduct adapted to different stages of spiritual development and different conditions of life." এ সব কারণেই হিন্দুধর্মের এত প্রসার এবং বিস্তৃতি। যখনই এদেশে কোন মত বদলাবার দরকার হয়েছে তখনই ভারতে বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর প্রভৃতি যুগ-প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়েছে। জীবনকে সুষ্ঠুতর করে তোলবার জন্য আমরা কোনও দিন পুরনো মতকে অন্ধের মত আঁকড়ে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করি নি।

ঈশ্বর কি? জীবনের পরিণতি কি? এবং জীবাত্মার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ কি? এ সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্যই ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মের উৎপত্তি। উক্ত প্রশ্নের সমাধান দর্শন জ্ঞানের দ্বারা ক'রে থাকে। এবং মানুষ ধর্ম অথবা কর্মের দ্বারা সেই জ্ঞানের উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। দর্শন এবং ধর্ম অনেকের কাছে আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন

মনে হলেও বাস্তব পক্ষে ধর্ম এবং দর্শন ভারতে বিভিন্ন নয়।

সত্যকে উপলব্ধি করবার প্রণালী দুই প্রকারের :—(১) জ্ঞাতা হিসাবে (Subjectively) এবং (২) জ্ঞেয় হিসাবে (objectively)। হিন্দু-শাস্ত্রের মূল কথা হচ্ছে—"আত্মানং বিদ্ধি" অর্থাৎ আত্মাকে জান। বিভিন্ন মতবাদ "আত্মাকে" বিভিন্নভাবে জানবার চেষ্টা করেছে। সেজন্যই দেখা যায় হিন্দুদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন ধর্ম নেই—যত জন তত মত।

ভারতীয় দর্শনের মূলকথা হচ্ছে "উপলব্ধি"—জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ বিশ্ব এবং আত্মার সম্বন্ধ জ্ঞান।* ভারতীয় দার্শনিকগণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র জাগ্রৎ অবস্থার বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে যেয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বস্তু এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ (analysis) দ্বারা বস্তুসত্তার জ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরা দেখে-ছিলেন যে এ বিশ্লেষণ দ্বারা জগতের জ্ঞান সম্যকরূপে লাভ করা যায় না। সেজন্য তাঁরা বিশ্লেষণ অপেক্ষা সংগঠনের (synthesis) বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা কোন বস্তুকে বিশ্বাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখবার চেষ্টা করেন নি। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে বস্তুসত্তার ধারণা একেবারে অসম্ভব। সত্য উপলব্ধি করবার জন্য তাঁরা বলতেন যে, নিজের সত্তাকে বিশ্বের সত্তার মধ্যে লীন করে দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়।

জাগ্রৎ অবস্থায় বস্তু বিশ্বের এবং আত্মার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য আমাদের দেশে বস্তুবাদ, দ্বৈতবাদ এবং বহুবাদের সৃষ্টি এবং স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টায় পূর্ণবাদ অথবা ব্রহ্মবাদের সৃষ্টি। অতএব দেখা যাইতেছে তিনরূপ অবস্থায় বস্তু বা বিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণের একটা ঐকান্তিক চেষ্টা আমাদের বরাবরই ছিল।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা এত অধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক ছিলেন যে তাঁরা বস্তুসত্তার বিষয়টা একেবারে বাদ দিয়েছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে দেখা যায় যে গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বনিয়াদ আমাদের দেশের মাটীতেই প্রথম প্রোথিত হয়। রসায়ন এবং আয়ুর্বেদ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয়দের আয়ত্ত ছিল।

একথা গোড়াতেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষের বিচার করতেন, সেজন্য তাঁদের দর্শন "সীমাবাদ" অপেক্ষা অনেকটা "অসীমবাদ" হয়ে পড়েছে। তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বিষয় জানবার বেশী চেষ্টা করেছেন, এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা জগৎকে জানবার চেষ্টা একটা "প্রচণ্ড ব্যর্থতা" ব'লে মনে করতেন। দর্শনকে তাঁরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় কতকগুলো তর্কজালের সমষ্টি ক'রে তোলবার প্রয়াস পান নি। সেজন্য আমাদের দর্শন আজও সজীব এবং

* সত্য সর্বদাই শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ সত্য চিরকালই সত্য হয়ে থাকে। ভারতীয় দার্শনিক-গণ যখন জাগ্রত অবস্থায় সত্য নিরূপণ করতে গেলেন তখন তাঁরা দেখলেন অবস্থাবিশেষে জ্ঞানও বিশিষ্টরূপ ধারণ করে। স্বপ্নাবস্থায় যে বোধ হয় তা স্বপ্নেতে বাস্তব বোধ হলেও জাগ্রত অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই সেটা ভ্রান্তি। সেরূপ জাগ্রত অবস্থাকে আমাদের ঋষিরা বলেছেন বৃহত্তর স্বপ্নাবস্থা। মৃত্যুর সংঘাতে জাগতিক সত্য প্রচণ্ড মিথ্যায় পরিণত হ'তে দেখে একদল দার্শনিক বলেন যে শাশ্বত সত্যের সন্ধান একমাত্র সুষুপ্তি অবস্থায়ই সম্ভব।

ইউরোপীয় মেটাফিজিক্স এর ন্যায় কথার কথা হয়ে দাঁড়ায় নি।

ভারতীয় দর্শনে "আত্মা"কে মূল বলা যেতে পারে। এ আত্মাকে কখনও আমরা জড়ভাবে, কখনও চেতন ভাবে, কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে, কখনও অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কখনও জ্ঞেয় হিসাবে এবং কখনও বা জ্ঞাতা হিসাবে দেখে থাকি। আত্মা ব্যতিরেকে ভারতীয় দর্শন এক পা'ও চলতে পারে নি। এই আত্মাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখ্‌বার ফলে হিন্দুদের অগণিত দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। এ সকল দর্শনের মধ্যে কোথাও আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনেছি এবং কোথাও মানি নি। যেখানে মেনেছি সেখানে তাঁকে এক বা বহুরূপে দেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যুক্তির খেই কোথাও হারাই নি। যেখানে যুক্তি যায় নি সেখানে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি যে সৃষ্টির রহস্য দুর্জ্ঞেয়। নিরীশ্বরবাদী এবং শূন্যবাদী দার্শনিকের সংখ্যা আমাদের দেশে নেহাৎ কম নয়।

ইউরোপের নব্য দার্শনিকগণ আমাদের দার্শনিকগণকে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলে থাকেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের দর্শনের সজীবতাকে না বুঝতে পেরে আমাদের দর্শনকে নিন্দা করেছেন। গ্রীক, ব্যাবিলোনিয়ন দর্শন এবং সভ্যতার বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে তাদের সেই অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার আজ মাটীর নীচে প্রস্তররূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সনাতন ভারতের আর্যসভ্যতার পূর্ণতম রূপ আজও ভারতের প্রত্যেক নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে সম্যক ভাবে ধরা পড়ে। গোড়া থেকেই ভারতীয়গণ সত্যে পৌছবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করেছিলেন—সেজন্য সংকীর্ণতা তাঁদের মনকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

অনেকে বলে থাকেন যে হিন্দু-দর্শন অতিমাত্রায় দুঃখবাদী; সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উদাসীন। দুঃখবাদ বলতে যদি সত্যসন্ধিৎসা হয় তবে আমার মনে হয় কোন দর্শনই দুঃখবাদী না হয়ে থাকতে পারে না। বোসাঙ্কের (Bosanquet) ন্যায় ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করতেন, "That no optimism is worth its salt that does not go all the way with pessimism and arrive at a point beyond it." অর্থাৎ সেই সুখই যথার্থ—যা সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে একমাত্র ভারতেই দর্শনের সঙ্গে মানব-জীবনের সংযোগ দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে ধর্ম আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী এবং দর্শনের আদর্শকে কর্মে নিয়োজিত করবার জন্যই ধর্মের উৎপত্তি। সেজন্য ধর্ম আমাদের দেশে মন্দিরে আবদ্ধ নয়—ধর্ম আমাদের মধ্যে প্রত্যেক কাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আমাদের জীবন-প্রণালীকে সুন্দরতর ক'রে তোলবার চেষ্টা করছে।

আধুনিক নব্যন্যায় হয়ত অনেক ক্ষেত্রে "পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্রে"র মীমাংসা করতে গিয়ে কথার কচ্‌কচি হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ভারতীয় দর্শনে বাদরায়ণ, অথবা শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণ বিশ্ব-দর্শনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে। চিন্তাজগতে Plato, Aristotle, Descartes, Hume অথবা Hegel এর দান কম নয়; কিন্তু বুদ্ধ, নাগার্জুন, বাদরায়ণ, শঙ্কর প্রভৃতির তুলনায় এঁদের শিশু বলা যেতে পারে। সেজন্যই অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেছেন "If we were to ask ourselves from what literatures we (Europeans) may draw that corrective which is most wanted, in order to make our inner life more perfect, in fact more truly human—I should point to INDIA." পাশ্চাত্য দার্শনিক রোলাঁ, রাসেল, জোড প্রভৃতি বলেন যে ইউরোপীয়গণকে আপনাদের জীবন মানুষের ন্যায় চালিত করবার জন্য ভারতীয় দর্শনের মতবাদ গ্রহণ করতেই হবে। কুস্যাঁ বলেছেন, "আমরা যখন ভারতীয় দর্শনের দিকে চাই, তখনই আমাদের ইউরোপীয় দার্শনিকগণের 'ক্ষুদ্রতার' বা অপূর্ণতার দিকে চোখ পড়ে। আমরা আশ্চর্য হ'য়ে যাই ভারতীয় দর্শনের আদর্শে এবং যুক্তিতে যে পূর্ণতার পরিকল্পনা, তার আভাস পর্যন্ত ইউরোপের কোন দার্শনিক কখনও দেন নি।"
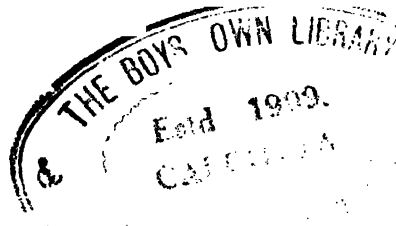
সারদামণি

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ

মেয়েদের মধ্যে থাকে দুজাতের সত্তা। একজন মা আর একজন প্রিয়া। মাড়বারের মেয়ে মীরা আর বাংলার মেয়ে সারদা ছিলেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের মানুষ। নীরস, রুক্ষ মরুর মেয়ের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল বিশ্বপ্রিয়ার সত্তা —না-পাওয়ার বেদনার গান দিয়েই তিনি 'চিরপাওয়ার' আনন্দের সাধনা করে গেছেন। শস্যশ্যামল বাঙলার মেয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছিল বিশ্বমায়ের সত্তা—পাওয়ার তৃপ্তিতে ভরা জীবন দিয়ে তিনি 'না-পাওয়ার' আনন্দের সাধনা করে গেছেন। লৌকিক জীবনে মীরা যে স্বামীকে পেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনকে ভরিয়ে দিতে পারেন নি। তাই লৌকিক জীবনের সীমা বর্জন করে তিনি দিব্যজীবন যাপন করে গেছেন। সংসারের স্বামীর মধ্যেই সারদা পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পরম স্বামীকে। তাই তাঁর জীবনে বর্জন নেই। তিনি সীমার মধ্যে অসীমকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—লৌকিক জীবনের সব কিছু বাঁধনের মধ্যেই দিব্য জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

মীরা তাঁর সাধনায় সফল হয়েছিলেন। তাঁর এক একখানি গান তাঁর অন্তরের বিশ্বপ্রিয়ার অভিসার যাত্রার এক একটি জয়ের মালা। যেখানে শ্রাবণ নেই সেই দেশেও তাঁর শ্রাবণের গানখানি বেদনাতুর নরনারীর হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে বাদলবেলার ব্যাকুলতা। সে ব্যাকুলতা অন্তর্যামীর জন্য মানুষের চিরন্তন ব্যাকুলতা।

সারদার জীবনও সিদ্ধিতে ভরপুর। তাঁর মধ্যে মায়ের সত্তা এক অপরূপ দিব্য মূর্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

প্রিয়া শুধু চায়—সেই চাওয়ার মধ্যেই তার আপনাকে দেওয়া। মা শুধু দেয়—সেই দেওয়ার মধ্যেই তার সব চাওয়া সফল হয়। মায়ের আপনাকে দেওয়া বড় আড়ম্বরহীন, চুপচাপ। মাটির বুকে কি যে বেদনা—কি যে আনন্দ, কে কবে তা শুনতে পায়? সারদামণির শান্ত, সরল, অনাড়ম্বর জীবনখানি ভরে আছে তেমনি নিঃশব্দে দেওয়ার ইতিহাস। তাঁর আধ্যাত্মিক দিব্যদ্যুতিতে অপরূপ জীবনের পরিধির মধ্যে অদৃষ্টের তাপে ক্লিষ্ট, পালছেঁড়া ভাঙা তরীর যাত্রী যে এসে পড়েছে তাকেই তিনি নিজেকে দান করেছেন। অবশ্য অধিকারী ভেদে সকলে সে মহাদান আপন আপন জীবনে গ্রহণ করতে পারে নি। যে করেছে তার মন প্রাণ ভরে উঠেছে। এই মহাদানের ইতিহাস সারদামণির দিক থেকে আমরা বিশেষ পাই না। মীরার মত তাঁর লেখা গানও নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের মত তাঁর বলা মধুর কথামৃতও নেই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে পেয়ে যাদের জীবন ভরে উঠেছিল তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু উপকরণ আমরা পাই। সিস্টার নিবেদিতার জন্ম হয়েছিল বিদেশী সমাজে। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিমণ্ডলে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব লঘু ভাবালুতায় ভরা ছিল না। লৌকিক জীবনের সব কিছু তিনি যে রকম নিঃশেষে বিশ্বমানুষের সেবায় দান করেছিলেন তা কোন ভাবালু হৃদয় পারে না। সারদামণির মায়ের সত্তা সেই নিবেদিতার জীবনে কি অপূর্ব রূপে নিজেকে দান করেছিল তা একখানি চিঠিতে

বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর নিবেদিতা লিখছেন :

"মাগো,

আজ ভোরবেলা সারার জন্য প্রার্থনা জানাতে গির্জায় গেছলুম। গির্জার মধ্যে বসে সকলেই যীশুর মা মেরীর কথা ভাবছিল, আমার হঠাৎ মনে পড়ল তোমাকে ;—তোমার সেই মুখখানি, সেই স্নেহভরা চোখদুটি, তোমার শাদা সাড়ী আর হাতের বালা! তোমার সব কিছুই মনের মধ্যে ভেসে উঠল। বোধ হল, সারা যে ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে আছে সেখানে তাকে সান্ত্বনা ও আশিস্ দিতে পারে একমাত্র তোমার উপস্থিতি।

আর কি মনে হল জানো? মনে হল, সন্ধ্যাবেলা শ্রীরামকৃষ্ণের আরতির সময় তোমার ঘরে বসে যে ধ্যানের চেষ্টা করতুম, তাতে কি বোকামিই না করেছি কেন তখন বুঝতে পারি নি যে ছোট্ট খুকুর মত তোমার পায়ের কাছে বসতে পারাই ত সব পাওয়া। মা, তোমার সবটুকুই ভালবাসায় ভরা। সে ভালবাসা আমাদের ভালবাসার মত বা সংসারের ভালবাসার মত আবেগময় ও উদ্দাম নয়। তা এক মধুর শান্তির ভাব,—তা সর্বদা সকলের ভাল করতে উন্মুখ, কখন কারুর অনিষ্টের চিন্তা তাতে জাগে না। তা এক দিব্যদ্যুতি, তার আভা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে পড়ে, কি আনন্দের দিন না সেই রবিবারটি,—কয়েক মাস হয়ে গেল, বাইরে যাবার আগে যেদিন সব কাজের শেষে তোমার কাছে ছুটে গেলাম, আবার ফিরে এসে সব কাজের আগে এক মুহূর্তের জন্য গিয়ে হাজির হয়েছিলুম তোমার কাছে। সেদিন তোমার সেই যাবার আগে আশীর্বাদ আর ফিরে আসার পর আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কি অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলুম। মা, ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাকে দিয়ে যদি একটি চমৎকার স্তোত্র লিখে আজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু জানি তাতেও তোমার কথা ঠিকঠিক বলা হত না, তাতে আসত শব্দের আড়ম্বর,—গানের চেয়েও গোলমাল উঠত জেগে। ভগবানের এক অপরূপ সৃষ্টি তুমি, মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার বিগ্রহ,—তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর সন্তানদের বিচ্ছেদবিধুর দিনগুলির জন্য ফেলে যাওয়া একখানি স্মৃতিচিহ্ন। তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হওয়া উচিত একেবারে চুপচাপ—একান্ত শান্তভাবের,—অবশ্য একটু আধটু মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা করতে হবে বৈকী। ভগবানের সৃষ্টিকরা যত কিছু ভাল জিনিস—হাওয়া, রোদ, ফুলের গন্ধ ও গঙ্গার কুলুকুলু—সবই শান্তভাবে ভরা। অজানিত এসে তারা আমাদের জীবন ভরে রেখেছে। কেবল এদেরই মধ্যে পাওয়া যায় তোমার তুলনা। * * *"

নিবেদিতা সারদামণির কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাঁর তৃষিত প্রাণের কামনার ধন। সে পাওয়ার মধ্যে ছিল না উপদেশের স্তূপ বা পথনির্দেশের সঙ্কেত। তাই তিনি একে বলেছেন নিঃশব্দ দান সারদামণি জলহাওয়ার মতই নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে চরমদানে মানুষের মন ভরে দিতেন।

কথা উঠতে পারে, নিবেদিতা এবং রামকৃষ্ণমণ্ডলির ভক্তেরা সারদামণির মধ্যে আরাধ্য মাতৃশক্তিকে যতটা দেখেছিলেন তার চেয়ে বেশি হয়ত কল্পনায় গড়ে তুলেছিলেন,—হয়ত তাঁদের গুরুভক্তির আভায় তাঁর মধ্যে এক কল্পিত ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তর্ক দিয়ে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। জীবনে যিনি পরম প্রিয় তাঁকেই মানুষ দেবতার আসনে বসাতে চায়। অপূর্ণ আধারে দেবতাকে গড়ে তুলে মানুষের হৃদয়ের চরম অতৃপ্তি কোন দিন দিব্য সান্ত্বনা পায় নি।

রামকৃষ্ণমণ্ডলির কাছে সারদামণি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী ছিলেন না। আপন মহিমার জোরেই তিনি তাঁদের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সারদামণির জীবনে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের নবমূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ভিত্তিমূলে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সত্তা আপন মহিমায় স্বতন্ত্র ছিল। তাই রামকৃষ্ণ-ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের পাশে সারদামণির মন্দির। শুধু গুরুর স্ত্রী বলে কেউ পৃথিবীতে এত বড় সম্মানের আসন পেতে পারে না। চৈতন্যদেবের পাশে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির বেশি নেই। মীরার অনুরাগীরা মীরার স্বামীকে ভজনা করে নি।

রামকৃষ্ণমণ্ডলির কত তৃষিত হৃদয় তিনি ভরে দিয়েছিলেন তার হিসাব নেই। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" বইখানিতে নানা ভক্ত তাঁর দানের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই লেখক নন,—মনের কথা অকৃত্রিম মনের ভাষাতেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বইখানি ভরে আছে উচ্ছ্বাসে। তাঁর জীবনের কথা, তাঁর দানের স্বরূপটি সম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু ব্যক্ত করতে পারেন নি। এ থেকে সারদামণির দানের বিশিষ্ট প্রকৃতিটি বোঝা যায়। তিনি আকাশের আলো হাওয়ার মতই মানুষকে নিঃশব্দে দিতেন। সে দান পেয়ে মানুষ অনুভব করত অপরূপ কিছু পেয়েছে, কিন্তু ঠিক কি যে পেয়েছে তা বুঝতে পারত না,—অপরকে বোঝাতেও পারত না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-স্মরণী

শ্রীচিত্ত দেব (শান্তি নিকেতন)

দুর্ভাগ্যের কালো জলে অবিরাম করি' সন্তরণ
যুগে যুগে বঙ্গমাতা আহরিছে অমূল্য রতন
আপন সাধনবলে, কালরত্নাকর-গর্ভ মাঝে
কঠোর দুঃস্বপ্নমাখা ছদ্মবেশী ডুবুরীর সাজে
মুকুতা মাণিক খুঁজে সারা, প্রতি দিবসে ও রাতে
সলিল সমাধি রচি' জীবনের সম্মুখে পশ্চাতে ;
কোলে করে পুত্রধন মাতৃত্বের মহাগর্ব নিয়ে
জগতের উচ্চাসনে কর্তব্যের পূর্ণাহুতি দিয়ে
মহাতেজে ফিরিবারে পৃথিবীর মানবসভায় ;
বঙ্গজননীর ভালে সর্বগ্লানি লুকায় লজ্জায় !

হে আচার্য শিক্ষাগুরু বঙ্গভারতীর যশোধন,
অমর প্রফুল্লচন্দ্র ধরণীতে তব উদ্বোধন-
শঙ্খ যবে জয় রবে ধ্বনিয়া উঠিল এ ধরায়
মায়ের আনন্দরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য-সুষমায়
তোমার মানসরাজ্যে দিব্যভাবে উঠিল উদ্ভাসি।
জীবনের মূল মন্ত্রে বেজে ওঠে চেতনার বাঁশী
উদার হৃদয় তব ;—রন্ধ্র তার পুরিয়া অমৃতে
ফুৎকারি ঘোষিল বাণী—'কর দান স্বার্থ পরহিতে।'

ত্যাগের অভীপ্সা নিয়ে সেই পুণ্য মহেন্দ্র লগন
মানবের চিত্ত ভরি যুগে যুগে হইবে স্মরণ।
সত্যময় পুণ্যালোকে উজ্জ্বল উদাত্ত চিত্ত তব
দেবতার পুণ্যশ্লোক—মানবের কীর্তি অভিনব
ঘোষিবে অমৃতময়ী জীবনের বাণী বিশ্বময়
দূরাতীত সে-প্রভাত মৌনমুখে হইবে বাঙ্ময়।

ভাগ্যশীলা বঙ্গমাতা স্নেহসুরে সম্বোধি' তোমায়
মিলাইল কল্পচ্ছবি দিবানিশি প্রভাত সন্ধ্যায়
জল মাটি তরু লতা পীড়িত ক্ষুধার্ত সবে ঘিরে ;
সমাজের সংসারের অবজ্ঞাত সকল প্রাণীরে।
নির্মম করুণাহীন ; মানুষেরা যাহাদের পরে
অশ্রুপূর্ণ তব আঁখি ধ্যানমগ্ন তাহাদের তরে।

তাইতো জীবনব্যাপী বৈরাগ্যের অসাধ্য-সাধন
কর্মডোরে বাঁধি নিজে—অপরেরে করিলে আপন!
মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য—জীবপ্রাণে অনন্ত প্রবেশ
শোণিতপ্রবাহে তাই মিশে গেল—তোমার স্বদেশ।

জীবনের সুরু হতে শেষ—তায় যতটুকু পথ
অতিক্রম করেছিল তব পুণ্য-স্পর্শ-শুভ্র-রথ
পরার্থের ক্ষণপ্রভা রাঙিয়েছে ততটুকু জানি
মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী স্বর্ণরেখা টানি'।
শুধু ইতিহাস কেন—আত্মিক আদর্শ ব্রতাচার
জগতের নীতিশাস্ত্রে উচ্চাসনে পাবে অধিকার ;
এ কথা নিশ্চিত জানি হে কুমার, হে চির সন্ন্যাসী
আপনার লাগি' কোন বৈভবের ছিলে না প্রত্যাশী!

কোন্ স্রষ্টা সৃজিলেন তোমার আত্মার উপাদান ··
কী ধনে হইয়া ধনী ত্যজিলে পার্থিব অর্থ মান···
কোন্ মন্ত্রে লভেছিলে জীবনের মহাব্রত ফল···
কোন্ যন্ত্রে গড়েছিলে দৈনন্দিন কর্মের শৃঙ্খল···
কোন্ কৃচ্ছ্র সাধনায় সত্য দিয়ে জীবনেরে সাধি···
কোন্ সরস্বতী মায়ে রেখেছিলে প্রজ্ঞাডোরে বাঁধি?
তোমার সাধনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ সারা বাঙ্গালার
ভগবান তথাগত তব রূপে আসিয়া আবার
জীবেরে করিয়া ধন্য, জাতিরে করিয়া সচকিত
পুনরায় নিত্যধামে দিব্যালোকে হলে উপনীত।

দধীচির দানতৃষা হেথা জাগে তোমার শিক্ষায়
দাম্ভিকের পাপমুক্ত জীবনের স্বজ্ঞান চিন্তায়।
বিজ্ঞানের হিমালয় বিশালতা তুলনাবিহীন
স্বদেশের ভাগ্যশীর্ষে জ্ঞানখনি কল্যাণবিলীন।

মহামূল্য জীবনের সবটুকু করিয়া উজাড়
দেখালে মানবপ্রাণ ধরণীতে কত যে উদার!
দাতার অকুণ্ঠমূর্তি—যে দেখেছে বারেক তোমায়
সে কি গো অনন্তকালে অন্তরেতে তোমাকে হারায়!

তোমায় জেনেছি আমি সত্যের কঠোর নীতিপথে
আত্মবিসর্জন আর পরার্থে আরূঢ়—পুণ্যরথে।
জীবনস্পন্দন-সাথে শুভযাত্রা গেছে তব থামি
জানাব অপরে কিসে—বিশ্বাস করি না তাহা আমি।
কোন্ ভাষা আছে মোর তব সত্তা করিতে প্রচার···
মনে করি এই চিত্ত দুনিয়ার চিত্ত সবাকার।
যে-সুর-লহরী তব তরঙ্গিত মম আত্ম-মাঝে
অখিল মানবচিত্তে সেই গান নাহি কি গো বাজে?

পবিত্র চরিত্র-মধু-পানে যবে হই আত্মহারা
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কি গো একই ভাবে হইবে না সারা?
মৃত্যুরে দিয়েছ ঠাঁই অমৃতের নিত্য-উপাসক
অকল্যাণ ভস্ম করি কল্যাণের জ্বালাও পাবক!

জীবনের দীপালোক কল্পিত মরণ পার হতে
তোমার সাধনখানি এনে দিক্ আজি এ মরতে।
কোনো ক্ষতি কোনো গ্লানি চিত্তেরে না করুক শঙ্কিত
তোমার জীবনলেখ বিশ্বময় হউক অঙ্কিত।
জীবনের কর্তব্যেরে বুঝে নিক্ সে-শুদ্ধ-লিপিকা
জ্বলুক ভাস্করসম নির্বাণের সত্য দীপশিখা।
আত্মার নির্মল জ্যোতি ধূপগন্ধ করুক বিস্তার
অশান্তির ঝঞ্চা হতে ধরণীরে দানহ নিস্তার।
মানবের মহাতীর্থ বঙ্গভারতীর রত্নাকর
বঙ্গজননীর কোলে তোলে দিক্ নিত্য দিবাকর!

মরণেরে ভুলে যাই তব রূপ করি অনুধ্যান
চরিত্র-কুসুম-বাসে পৃথ্বি বুঝি স্বর্গীয় উদ্যান!
কবির কবিতা তুমি—কালের যাত্রায় তুমি কবি
তোমারই কবিতাময় পৃথিবী, তারকা, চন্দ্র, রবি।
চিরন্তন সত্তা নিয়ে ধ্বংস নাই কোনো কালে যাঁর
অবিনাশী আত্মময় হে আচার্য করি নমস্কার!

আপেক্ষিকতা, অভিবেগ ও সঙ্কোচন *

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ নাথ সেনগুপ্ত
(রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব মতে দেশ ও কালকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না, যেমন চুম্বকের একটি ধ্রুবকে অন্যটি হইতে বাদ দিয়া চিন্তা করা যায় না। কাল যেন ধনাত্মক ধ্রুব এবং দেশ যেন ঋণাত্মক ধ্রুব। জীবন ও প্রসারের সারাংশ কালের মধ্যে নিহিত; অপর পক্ষে দেশের এক অবস্থার নাম পদার্থ। উহা ধারাবাহিক গতিসম্পন্ন অর্থাৎ অবস্থান ও স্থিতিকালের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশক। দেশ ও কাল সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণাকে এক ধ্রুব হইতে অন্য ধ্রুবে পরিবর্ত্তন করিতে পারি; আমরা একটিকে দীর্ঘতর ও অন্যটি হ্রস্বতর করিতে পারি, যেমন যে গ্রহের অভিবেগ অধিকতর তাহার কাল আমাদের কাল অপেক্ষা হ্রস্বতর; অভিবেগ হ্রস্বতর হইলে কাল দীর্ঘতর। কিন্তু তাই বলিয়া একটিকে বাদ দিয়া অন্যটি বজায় রাখা যায় না। এইরূপ অবস্থায় দৈর্ঘ্য ও কালের চিরস্থায়ী ও নিরপেক্ষ কোনও মান পাওয়া যায় না।

বেশ কিছুপূর্ব্বে A. H. Loventz ও G. F. Fitzgerald তাঁহাদের সঙ্কোচন-মতবাদের সাহায্যে দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই মতবাদ হইতে জানা যায় যে প্রত্যেক পদার্থই তাহার অভিবেগের দিকে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়; এই সঙ্কোচনের পরিমাণ পদার্থও দ্রষ্টার আপেক্ষিক-অভিবেগের সহিত সমানুপাতি। যদি কোনও পদার্থ খুব দ্রুত চলিতে থাকে, তবে তাহা দৈর্ঘ্যে সঙ্কুচিত হইবে কিন্তু পার্শ্ব-দেশ ঠিকই থাকিয়া যাইবে। দ্রষ্টা পদার্থ হইতে সরিয়া থাকিলেই এই সঙ্কোচন দেখিতে পাইবে কিন্তু সঙ্কুচিত পদার্থের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্কোচন বুঝা যাইবে না।

এই সত্য হইতে এই নির্দ্দেশ পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক চলন্ত পদার্থেরই কতকগুলি সর্ত্ত ও সীমা-নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজস্ব সময়ের মাপ আছে এবং সার্ব্বভৌম অথবা নিরপেক্ষ কাল বলিয়া কালের কোনও মাপ হইতে পারে না। বিভিন্ন দ্রষ্টার কাছে দূরত্ব ও ক্ষণ, মিটার অথবা সেকেণ্ডের অর্থ বিভিন্ন। আজ যদি আমাদের পৃথিবী আয়তনে বিশেষ বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পাইত, তবে সময়ের সঙ্গে সব কিছুই সেই পরিমাণে বাড়িত অথবা কমিত। অন্য কোনও নৈসর্গিক পদার্থের সহিত তুলনা না করিয়া পৃথিবীর কেহই এই বৃদ্ধি অথবা ক্ষয় বুঝিতে পারিত না।

Michelson Morley-এর পরীক্ষা আলোচনা করিলে এই পর্য্যালোচনা সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়।

আলোকের একটি মতবাদ আলোক ও শক্তির বাহক হিসাবে 'ঈথর'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। A. A. Michelson ও E. W. Morley ঈথরের তুলনায় আলোকের অভিবেগ নির্ণয় করিবার জন্য একটি পরীক্ষা করেন। তাঁহারা সাদা একটি আলোকরশ্মিকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন এবং আয়নার সাহায্যে একটিকে পাঠাইলেন পৃথিবীর বিষুবরেখা—অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্ত্তনের দিকে, অন্যটিকে পাঠাইলেন সমান-দৈর্ঘ্যযুক্ত পৃথিবীর আবর্ত্তনের লম্ব দিকে (perpendicular)। ঈথর যদি নিশ্চল না হইত, তবে পৃথিবীর

* Relativity ও Reality হইতে।

আবর্তনের দিকের আলোক-রশ্মি অন্যটি অপেক্ষা পূর্ব্বেই উৎসস্থলে পৌছিত। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে দুই আলোক-রশ্মি একই সময়ে পৌছিয়া যায়।

এই পরীক্ষা পরে আরও অনুকূল অবস্থায় আরও সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি সাহায্যে করা হইয়াছিল এবং R. J. Kennedy ও E. M. Thorndike কালিফোর্ণিয়া টেকনলজি বিদ্যালয়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ বিষয়ের সাহায্যে এই পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা আপেক্ষিকতা-মতবাদের প্রধান অন্যতম অনুমানটি সমর্থন করিয়াছেন। অনুমানটি এই যে, ঈথরের তুলনায় অপরিবর্ত্তিত অভিবেগ (uniform velocity) কোনও পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় না এবং প্রত্যেক দ্রষ্টার নিকটই আলোকের অভিবেগ সমান। এমন কি আলোক-উৎপত্তিস্থলের অভিবেগের উপরও ইহা নির্ভর করে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যত দ্রুতই কোন তারকা ছুটিতে থাকুক, তাহার আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার অথবা ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে পৌছিবে।

অসীম ও সসীমের মধ্যে যে সম্বন্ধ, একটি রেখা ও বিন্দুর মধ্যে যে সম্বন্ধ আলোকের গতি ও পদার্থের অভিবেগের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। একটি রেখার যে কোনও স্থানে একটি বিন্দু থাকুক না কেন, সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দিকের রেখার শেষ সীমা পর্য্যন্ত অসংখ্য বিন্দু রহিয়াছে। সেইরূপ আলোকের উৎস যত দ্রুতই চলুক না কেন অথবা যেখানেই থাকুক না কেন, আলোকের গতি সব অবস্থাতেই সমান।

আপেক্ষিকতা আরও বলে যে, অভিবেগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের বস্তু-পরিমাণ (mass) ও বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ Fitzgerald-এর সঙ্কোচনের পরিমাণ হইতে জানা যায়। যদি কোনও দণ্ড এমন দ্রুত চলিতে থাকে যে তাহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধেক হইয়া যায়, তবে তাহার বস্তু-পরিমাণ হইবে দ্বিগুণ। যদি ইহার অভিবেগ আলোকের গতির সমান হইয়া যায়, তবে তাহার ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটন্‌গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। এই মতবাদ হইতে জানা যায় যে আলোক শুধু বিশ্লিষ্ট ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি; সেগুলি পরমাণু আকারে আবদ্ধ নহে। ইলেক্‌ট্রন্ বিদ্যুতের একক শক্তির নির্দ্দেশক। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে আলোক ও বিদ্যুতের অভিবেগ সমান। ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতবাদ আরও দৃঢ় হইতেছে। যদি আমরা কোনও বস্তু পুড়াইয়া ফেলি, তখন সেই বস্তু হইতে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন্ বিশ্লিষ্ট হইয়া আলোক উৎপাদন করে। রেডিয়মের মত আলোক-বিকিরণ ক্ষমতা-সম্পন্ন (radio-active)। কতকগুলি মূল পদার্থের পারমাণবিক গতি আলোর গতিবেগের সহিত সমান। সেইগুলির মধ্যে বন্ধন নিশ্চয়ই খুব শিথিল এবং তাহাদের পথ উন্মুক্ত হইলেই তাহারা মূল এককে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই যে বিশ্লেষণ তাহাকেই বিকিরণ বলা হয়। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পদার্থের গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের গতিবেগ অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না।

মনে করা যাক্ একটি পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩,০০০ মাইল বেগে চলিতেছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ৭/৮ অংশ-এ পরিণত হইবে কিন্তু প্রস্থ ঠিকই থাকিয়া যাইবে। যদি ইহা আলোকের গতিবেগের সমান চলিত, তবে ইহার উচ্চতা শূন্যে পরিণত হইত। যদি সেই বস্তুর সঙ্গে একটি ঘড়ি বাঁধা থাকিত, তবে ইহাও সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে চলিত। যখন বস্তুটি আলোকের সমান গতিতে চলিত, তখন ঘড়িটি বন্ধ হইয়া যাইত। সঙ্কোচনের নিয়মটি যেমন "স্থান" সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তেমনি "কাল" সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিয়াই শুধু যে পদার্থের উচ্চতা শূন্যে পরিণত হইত, তাহা নহে, ঘড়িটিও অদৃশ্য হইত। দেশ ও কাল উভয়ই অন্তর্হিত হইত।

সাধক কমলাকান্ত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ই-আই-রেলওয়ে বর্ধমান হইয়া লুপ লাইনে খানা জংশন ষ্টেশন পর্যন্ত এবং যথা হইতে ২॥০ মাইল উত্তরে যাইলে চান্না গ্রাম পাওয়া যায়। এই চান্না গ্রামের ঈশান কোণে দেবী বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে বর্ধমানের মহারাজার কোন আত্মীয় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে শ্মশান ও নিকটে খড়্গেশ্বরী নদী প্রবাহিতা। মন্দির একটী ছোট কক্ষ। উহার সম্মুখে রোয়াক আছে। দেবীর মূর্তি একটী গোল সিন্দুর-মাখান রক্ত বর্ণ মুখ মাত্র বলিয়া মনে হইল। মন্দিরের বায়ুকোণে একটী পঞ্চমুণ্ডী আসন আসে। সাধক কমলাকান্ত এই আসনে সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। স্থানীয় লোকে বিশালাক্ষীতলাকে সিদ্ধপীঠ বলে। বর্ধমানের মহারাজা উক্ত পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর সমচতুষ্কোণ চার ফিট স্থানটী বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তদুপরি একটী একফুট শ্বেত মর্মর প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে—

সাধকপ্রবরস্যাদ্যাপদপঙ্কজসেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্তস্যাত্রৈবাসীৎ দ্বিজন্মনঃ॥

অর্থাৎ আদ্যাদেবীর পাদপদ্মসেবী সাধকপ্রবর দ্বিজ কমলাকান্তের সিদ্ধাসন এইখানেই ছিল। বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে বর্ধমানের মহারাজ-প্রদত্ত দেবত্র সম্পত্তি আছে। অনেক পুরোহিত পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজা করেন ও উক্ত সম্পত্তি ভোগ করেন। বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যানমন্ত্র এই—

ধ্যায়েৎ দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদপ্রভাং।
দ্বিভুজাম্ অম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখর্পরধারিণীং॥
নানালঙ্কার-সুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥
মুণ্ডমালাবতীং রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শিরোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাং।
সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥

চান্না গ্রামে এখন ২০।২৫ ঘর ব্রাহ্মণের নিবাস। তাঁহারা সকলেই শাক্ত। পূর্বে এই ব্রাহ্মণপল্লীতে কালী নামের চব্বিশ প্রহরা হইত। একদা গ্রামটী সমৃদ্ধ, জনপূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। উহার চতুর্দিকে এখনও শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান। চান্নার উত্তরে খড়্গেশ্বরী নদীর অপর পারে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে বিখ্যাত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা (অনুর্বর পতিত উচ্চভূমি) অবস্থিত। চান্না গ্রাম কমলাকান্তের মাতুলালয়।

সাধক কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনায় আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মসাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১১৭৯ বঙ্গাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১২১৬ বঙ্গাব্দে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর সাধকপ্রবরকে কালনা হইতে বর্ধমান নগরে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করেন। তখন কমলাকান্তের বয়স ৪০-এর অধিক। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন; তাঁহারা দুই সহোদর, তন্মধ্যে কমলাকান্ত জ্যেষ্ঠ। পিতা দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলাকান্ত পিতৃ-হীন হইলে তাঁহার মাতা পুত্রদ্বয়কে লইয়া চান্না

গ্রামে পিত্রালয়ে গমন করেন। কমলাকান্তের মাতুল নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভাগিনেয় দুইটীকে কয়েকটী গরু ও কিছু জমি দান করেন। কমলাকান্ত কালনায় যজমান-গৃহে থাকিয়া স্থানীয় একটী টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার তত আগ্রহ ছিল না। তিনি আজন্ম সুকণ্ঠ ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই গান গাহিতে ভালবাসিতেন। এই সময় তাঁহার মাতুল তাঁহার উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উপনীত হইবার পরেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প করেন। পুত্রের মনে সংসারে আসক্তি জন্মাইবার জন্য চান্না হইতে প্রায় ছয়ক্রোশ দূরে লাড়ুকা গ্রামের জনৈক ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরেও তিনি সন্ন্যাসীর মতই থাকিতেন। এই সময়ে বর্ধমানের উত্তরে চান্না হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে উন্দ্বড়ে গ্রামের রক্ষাকালী পূজা দেখিতে যান। সেখানে সাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি পরিচিত হন। কেনারাম বর্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্তী অমরার গড়ে বাস করিতেন। উক্ত গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি আছেন। কেনারাম বাদ্যযন্ত্রে ও কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। কমলাকান্ত তাঁহারই নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। চান্না গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব হইত। সেই সময় তথায় কাল্না হইতে কমলাকান্তের বহু শিষ্য আসিতেন। চান্না হইতে কাল্না প্রায় বারো ক্রোশ। এক উৎসবে তাঁহার কোনও ধনী শিষ্য চান্নায় আগমন করেন। তিনি গুরুর আর্থিক অসচ্ছলতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদিগকে কাল্নায় লইয়া যান। কিছুদিন পরে মাতার মৃত্যু হইলে, সাধক পুনরায় চান্নায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পরে তাঁহার সাধ্বী পত্নী পীড়িতা হন এবং স্বর্গারোহণ করেন। পত্নীকে শ্মশানে চিতায় ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কমলাকান্ত নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন :—

রাগিণী-জঙ্গলা ; তাল-একতালা

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।

নাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা
রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের
ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস,
তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুখে রাখ, সুখে রাখ মা,
কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্‌ দিয়ে পরেছি আর,
পুঁছ্‌তে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ,
কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম জান্‌বে কেটা॥

সাধক গান গাহিবার সময় এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত, এবং তাঁহার মন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিত। কমলাকান্তের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে দস্যুগণও মুগ্ধ হইত। চান্না হইতে অমরার গড়ে যাইবার সময় ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার পূর্বপ্রান্তে আসিলে তিনি একদা বিশে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হন। সাধক নিঃসহায় হইয়া বিপদ কালে গান গাহিয়া জগন্মাতাকে স্মরণ করেন। তাঁহার প্রাণমাতানো গান শুনিয়া দস্যু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিল। বিশালাক্ষী-তলায় পঞ্চমুণ্ডী আসনে

বসিয়া সাধন করিবার সময়ও তিনি একবার অপদেবতাগণ কর্তৃক আসন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। বিপন্ন সাধক জগদম্বার উদ্দেশে গান গাহিতে থাকেন। ডাকাতগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তিভাবে চাম্নায় লইয়া যায়। ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় দস্যুকবলে পতিত হইয়া কালীসিদ্ধ কমলাকান্ত নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন :—

রাগিণী—জঙ্গলা ; তাল—একতালা

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোমার,
কেবল দুটী চরণ রাঙা।
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হৈলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি-বন্ধু-সুত-দারা, সুখের সময় সবাই তারা।
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
ঘর-বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখো।
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, যারে বলি মনের ব্যথা।
জপের মালা ঝুলি-কাঁথা, জপের ঘরে
রইলো টাঙ্গা॥

উপরোক্ত গানটী হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কমলাকান্ত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় সত্যই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার সিদ্ধি ও সঙ্গীতের সুখ্যাতি চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ১২১৬ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে সাদরে বর্ধমানে লইয়া যান এবং তাঁহাকে সভাপণ্ডিত-রূপে নিযুক্ত করেন। বর্ধমান শহরের পশ্চিমে বাঁকা নদীর তীরে কোটালহাটে মহারাজ কালীমন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহাকে বাস করিতে দেন। ওখানেও কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় পূর্বে মহাসমারোহে কালীপূজা হইত। উক্ত কালীমূর্তি দর্শন করিয়া উহা আমাদের খুব জাগ্রত মনে হইয়াছিল। তেজশ্চন্দ্রের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদও কমলাকান্তকে গুরুতুল্য ভক্তি করিতেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রও বহুপূর্বে কমলাকান্তকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনিও কালীবাড়ীতে আসিয়া প্রায়ই গুরুমুখে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। কমলাকান্ত রাজসভার কাজ শেষ করিয়া কালীর ধ্যানে ও সঙ্গীতরচনায় অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন।

সিদ্ধিলাভের পর কমলাকান্তের অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়াছিল। একবার মহারাজ তেজশ্চন্দ্র গুরুর সিদ্ধিলাভে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষাচ্ছলে তাঁহাকে অমাবস্যার রাত্রিতে চন্দ্র দেখাইতে বলেন। সিদ্ধগুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর নিশীথে স্বীয় শিষ্যকে আকাশের দিকে তাকাইতে বলেন। মহারাজ তমসাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হন। এই ঘটনার পরে গুরুর প্রতি মহারাজের ভক্তি বৃদ্ধি হয়। কয়েক বৎসর পরে রাজা তেজশ্চন্দ্র গুরুপরীক্ষার জন্য পুনরায় কৌতূহলী হন। তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্ত সাধনের সহায়করূপে মদ্য ব্যবহার করিতেন। ইহাতে তাঁহার দুর্নাম রটিয়া যায়। তাহা শুনিয়া তেজশ্চন্দ্র একদিন স্বয়ং কোটালহাটের কালীবাড়ীতে গুরুর অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হন। রাজগুরু তখন অনুপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে, মদের একটী প্রকাণ্ড বোতল হাতে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে কমলাকান্ত ফিরিয়া আসেন। তদ্দর্শনে মহারাজের গুরুভক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। তিনি সক্রোধে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, বোতলে উহা কি?' কমলাকান্ত বলেন; 'দুধ'। রাজা ইহা বিশ্বাস না করিয়া গুরুর সন্নিকটে যাইয়া বোতলের মধ্যে কি আছে তাহা স্বচক্ষে দেখিতে চান। কমলাকান্তও রাজার কথামত বোতলের মদটা অঞ্জ

পাত্রে ঢালিয়া দেখাইলেন। রাজা দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, 'এ দুধে কি সর বা ঘৃত হয়?' কমলাকান্ত বলিলেন, 'নিশ্চয়ই।' তৎক্ষণাৎ সেই দুধ হইতে ঘৃত তৈয়ার করিয়া গুরু শিষ্যকে বলেন, 'আমি এই ঘৃত দিয়া হোম করিব। আপনি দাঁড়াইয়া দেখুন।' মহারাজ গুরুর আদেশে হোম দেখিতে লাগিলেন। পরে পূর্ণাহুতি দিবার সময় গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'মহারাজ, এই পূর্ণাহুতি দিলাম। অদ্যাবধি আপনার রাজবংশে কোন বংশধর জন্মিবে না।' মহাপুরুষের সিদ্ধবাক্য ভবিষ্যতে সফল হইয়াছে। শোনা যায়, তদবধি বর্ধমান রাজবংশে আর কোন বংশধর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সিদ্ধপুরুষকে অবিশ্বাস ও পরীক্ষা করার নির্বুদ্ধিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

কমলাকান্ত কত বৎসর জীবিত ছিলেন বা কবে তিনি দেহত্যাগ করেন তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কী দুঃখের বিষয় যে, বাংলার এই অমর মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক এ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন গবেষণা করেন নাই বা তাঁহার কোন বিস্তৃত জীবনী রচিত হয় নাই। তাঁহার কোন স্মৃতি রক্ষা ত দূরের কথা, আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত সমসাময়িক ছিলেন। এই শাক্ত সাধক কবি-যুগলের সঙ্গীতসম্পদ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শাক্ত সঙ্গীত বাংলার অমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালীর ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য তাহাই উক্ত সঙ্গীতে সুব্যক্ত। আনন্দের বিষয় এই যে, বর্ধমান মহারাজের উৎসাহে 'কমলাকান্তের পদাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুশয্যা হইতে অনুরক্ত শিষ্যকে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানান্তর বলেন, 'এইবার আমার জীবনান্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; আমায় মৃত্তিকার উপর শয়ন করাইয়া দিন।' মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া শিষ্য গুরুকে গঙ্গা-তীরস্থ হইবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করেন। সিদ্ধ গুরু এই পদটী গাহিয়া শিষ্যকে উত্তর দেন—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাবো।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি শরণ লব॥"

কমলাকান্ত দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজ এবং সমাগত ভক্তগণ কৃতার্থ হন। দেহভোগের মহাপুরুষ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের গৃহেও কোন শুভযোগের সময় জাহ্নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

কমলাকান্ত তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রাদির ভেদবিধি সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই হস্তলিখিত পুঁথিখানি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশালাক্ষী দেবীর কোন পূজারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। উহা কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'সাধক-রঞ্জন'। কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'সুললিত ভাষায় মনোহর ছন্দে অতি অল্পের মধ্যে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তত্ত্বসকল আর কেহ এত সহজে বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।' উক্ত পুস্তকের সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বলেন, তিনি বাংলা ভাষায় সাধন সম্বন্ধে এমন সুন্দর পুঁথি দেখেন নাই।

'সাধক রঞ্জন'এর শেষে কমলাকান্ত আত্মপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন,—

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দ মঠে গোবিন্দের স্থান॥

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তক ভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধক-রঞ্জন॥

উক্ত কয়েক পংক্তি হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায়, কমলাকান্তের মাতুল ও অভিভাবক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি অম্বিকা (কাল্‌না) ও নিবাস বর্ধমান জেলায়। শ্রীপাট গোবিন্দ মঠের চন্দ্রশেখর গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন তিনি বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা করেন এবং রামপ্রসাদের ন্যায় কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তির যে সমন্বয়-সুর রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় রামকৃষ্ণে। বাংলার ধর্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ রামকৃষ্ণের জীবনে পাওয়া যায়।

'সাধকরঞ্জন' গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত এবং ৫১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কমলাকান্ত উহাকে 'যোগগ্রন্থ' বলিয়াছেন। উহাতে অন্তর্যজন, ভক্তিলক্ষণ, নাড়ীনির্ণয়, ষটচক্রবর্ণনা, ব্রহ্মনিরূপণ, সমাধিনির্ণয়, আসনবিধি, প্রাণায়াম, সুষুম্নাদ্বারমোক্ষ, মোক্ষবার্তা, দশদ্বারনিরূপণ, বায়ুবিবরণ এবং পিঙ্গলালক্ষণ আছে। ভক্তিলক্ষণ-শীর্ষক অধ্যায়ে ভক্তির বাল্যভাব, মধ্যাবস্থা এবং উত্তমাবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত। ষট্‌চক্র বর্ণনাধ্যায়ে প্রত্যেক চক্রটি পৃথক্‌ভাবে লিখিত। ষট্‌চক্র নিরূপণ নামক যে সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থ আছে উহা ব্যতীত ষট্‌চক্রের এত সরল ও সুন্দর বর্ণনা বাংলা বা সংস্কৃতে দৃষ্ট হয় না। স্বানুভব না হইলে এত জীবন্ত বর্ণনা সম্ভব হয় না। সমাধিনির্ণয় অধ্যায় হইতে জানা যায় কমলাকান্তের ব্রহ্মদ্বার বিদীর্ণ এবং সমাধি লাভ হইয়াছিল। তিনি সমাধির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা কুলার্ণবতন্ত্রে প্রদত্ত নিম্নোক্ত সমাধি-বর্ণনা সদৃশ

যদত্র নাত্র নির্ভাসঃ স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
স্বরূপশূন্যং যৎ ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে॥

যে ধ্যান নির্ভাসরহিত, স্বরূপশূন্য এবং প্রশান্ত সাগরবৎ স্থির তাহাই সমাধি। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের ন্যায় কমলাকান্ত কালীধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তোমার পূজার মন্ত্র　　শেফালী-সম্ভারে,
যাগ-যজ্ঞে, পূজা-হোমে,　　তন্ত্র-উপচারে
মন্ত্রিত হয় নি কভু,　　মিথ্যা আড়ম্বরে
শুধু রাখিয়াছি ঢেকে　　দুর্বল অন্তরে।
সীতার সতীত্ব যেথা　　আজো কেঁদে মরে,
দ্রৌপদী সে বিবসনা　　দুঃশাসন করে,
ভীরুতা ঘুরিয়া ফেরে　　ক্ষমারূপ ল'য়ে,
নির্বীর্য অহিংসার　　মন্ত্রবাণী ব'য়ে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত যেথা　　মাতার সম্মান,
সে মন্দির-তলে মা গো　　নহে তব স্থান।
তুমি জাগো সত্য যবে　　পরম গৌরবে
দলিত মথিত করে　　মিথ্যা দম্ভ সবে!
মৃত্যু যবে ঝলকিয়া　　ত্রিশূলের সম
চূর্ণ করে যুগান্তের　　পুঞ্জীভূত তমঃ।

তুমি আছ মানবের　　ন্যায্য অধিকার,
বিজয়-পতাকা ল'য়ে　　যেথা আপনার,
তুচ্ছ করি' জীবনের　　সর্ব দ্বিধা ভয়
ঊর্ধ্বলোকে জেগে আছে　　উদার-নির্ভয়।
তুমি জাগো পৌরুষের　　শাণিত কৃপাণে,
অত্যাচারী কাঁপে যেথা　　শঙ্কিত পরাণে।
তুমি জাগো নারী যেথা　　মাতা মহীয়সী,
নহে শুধু শৃঙ্খলিতা　　নিয়ত ক্রন্দসী।
প্রসন্ন মহিমা-স্নিগ্ধ　　প্রশান্ত-বদনে,
কল্যাণের মন্ত্রবাণী　　উজলে নয়নে।
সৃজনের বরাভয়　　ল'য়ে দুটি হাতে,
রচিছে জীবন-স্বপ্ন　　শান্ত আঁখি-পাতে।
সে মহামন্দির-তলে　　শক্তিরূপা মা গো
হে রুদ্র-মধুরা দেবী　　মাতৃরূপে জাগো।

সঙ্গীত-গ্রন্থ-রচয়িতা বিদ্যারণ্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় দর্শনের আলোচনা যাঁরা করেন তাঁদের কাছে বিদ্যারণ্যের নাম অপরিচিত নয়। সাধারণতঃ আমরা জানি বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবেদান্তের বিবরণ সম্প্রদায়ের লোক ও তিনি 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ', 'পঞ্চদশী' ও 'দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক'[১] প্রভৃতি বিখ্যাত বেদান্তগ্রন্থের লেখক। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই বিদ্যারণ্য প্রকৃত কে ছিলেন, মাধবাচার্য ও বিদ্যারণ্য একই লোক কি-না আর তিনিই বাস্তবিক পঞ্চপাদিকা-বিবরণের ভাষ্য অথবা প্রকাশিত 'বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন কি-না—এই সব প্রসঙ্গের মীমাংসা নিয়ে মতভেদের এখনো ঠিক ঠিক অবসান হয় নি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর *A History of Indian Philosophy* (Vol. II) পুস্তকে বিদ্যারণ্যের দার্শনিক মতবাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে বিদ্যারণ্য ও সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য একই-লোক বলেছেন : "Vidyâranya is reputed to be the same as Mâdhava, brother of Sâyana, the great Vedic commentator."[২] ডাঃ দাশগুপ্ত সেজন্যে মাধবাচার্য অর্থাৎ বিদ্যারণ্যকেই 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ছাড়াও 'বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ', 'পঞ্চদশী' ও 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থগুলির রচয়িতা বলেছেন: "In addition to the *Sarva-darsana-samgraha* Mâdhava wrote two works on the Sankara Vedanta, viz. *Vivarana-prameya-samgraha* and *Pancadasi*; and also *Jivan-mukti-viveka*."[৩]

কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডাঃ দাশগুপ্তের এই অভিমতের সঙ্গে সকলে আবার ঠিক একমত হ'তে পারেন নি। ডাঃ মহাদেবন তাঁর *The Philosophy of Advaita* (1938) বইয়ের মুখবন্ধে বিদ্যারণ্যের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর *Indian Philosophy* (Vol. II) পুস্তকে বিদ্যারণ্যকে বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ, পঞ্চদশী ও জীবন্মুক্তিবিবেকের গ্রন্থকার ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : Vidyâranya (fourteenth century), generally identified with Mâdhava, wrote *Vivarana-prameya-samgrha* as the gloss on Prakâsâtman's work. While his *Pancadasi* in a classic of later Advaita, his *Jivanmuktiviveka* is also of considerable value."[৪] পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় (স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ) তাঁর বাংলা অদ্বৈতসিদ্ধির (১ম ভাগ) ঐতিহাসিক ভূমিকায় বিদ্যারণ্যকে একাধারে পঞ্চদশী, সর্বদর্শন-সংগ্রহ, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, অনুভূতিপ্রকাশ, জীবন্মুক্তিবিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, ১০৮ উপনিষদের টীকা, সূতসংহিতার টীকা, ঐতরেয়,

১ ব্রহ্মানন্দ ভারতী বলেছেন দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকের রচয়িতা ভারতী তীর্থ। অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন ভারতীর্থ বিদ্যারণ্য।

২ Vide *HIP*, vol. II, p. 215.

৩ Ibid., p. 214.

৪ Vide *Indian Philosophy*, *Vol.* II. p. 551.

তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্যকবার্তিকসার, শঙ্করবিজয়, জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, মাধবীয় ধাতুবৃত্তি, পরাশরমাধব ও কালমাধব প্রভৃতির গ্রন্থকার বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] মোটকথা তিনি বিদ্যারণ্য ও মাধবাচার্যকে একই লোক ব'লে প্রতিপন্ন করেছেন।

ডাঃ মহাদেবনও বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে মোটামুটী বিশদ আলোচনা করে প্রায় ঐ একই সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন বিদ্যারণ্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর লোক ও বিদ্যারণ্য বিজয়নগররাজ হরিহর (প্রথম) ও বুক্কের আচার্য ও শৃঙ্গেরী মঠের অধীশ্বর (১৩৭৭-১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন। কিন্তু এম্ এ দোরাই স্বামী আয়াঙ্গার বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে ১৩৭৭-১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যারণ্য একজন সামান্য শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ মাত্র ছিলেন ব'লেই পরিচিত।[৬] তাছাড়া রামা রাও তাঁর *The Mâdhava-Vidyâranya Theory* প্রবন্ধে[৭] পঞ্চদশী ও বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ বিদ্যারণ্য মুনিরই রচিত ব'লে স্বীকার করলেও তিনি আবার বলেছেন বিদ্যারণ্য সায়ণের অগ্রজ মাধবাচার্য। একথার সমর্থন শৃঙ্গেরী মঠের কোন তথ্য থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মাধবাচার্যের লেখা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাজা বুক্ক (প্রথম) মাধবাচার্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর বিদ্যারণ্যের সম্বন্ধে যতগুলি অনুশাসন (inscriptions) পাওয়া যায় সে সমস্তই ১৩৭৭-১৪০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিহরের (দ্বিতীয়) সময়কারই,[৮] কিন্তু ডাঃ এন্ বেঙ্কটরমনয় মিঃ রামা রাওয়ের সঙ্গে আবার ঠিক একমত হ'তে পারেন নি। তিনি বলেছেন বিদ্যারণ্য বিজয়নগরের রাজা হরিহরের (প্রথম) সময়কারই লোক। রাজা হরিহরই প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা ও বিজয়নগর তিনি বিদ্যারণ্যের নামেই নামকরণ করেছিলেন।[৯] কিন্তু ডাঃ মহাদেবন্ এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে বলেছেন: তাম্রলিপির বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য লিপির মিল অত্যন্ত কম। তবে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ ও ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের দুটী লিপিতে মাত্র রাজা হরিহর রায়ের সময়েই যে বিদ্যারণ্য জীবিত ছিলেন ও তাঁর নামানুসারে বিজয়নগর রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছিল একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী অভেদানন্দ আবার বলেছেন পঞ্চদশী মাধবাচার্যেরই লেখা এবং মাধবাচার্য ও সায়ণ একই লোক ছিলেন। তিনি তাঁর *The Philosophy of Panchadasi* বক্তৃতায় বলেছেন: 'Mâdhava was at first the Prime Minister of the King Bukka of South India and he flourished some 400 years after Sankarâchârya. Afterwards he renounced his ministership, property and worldly position and entered the order of *Sannyasin.* He was initated into that order by a *Sannyâsin* named Bhârati Tirtha and thenceforth was[১০] called Vidyâranya.'

বিদ্যারণ্যের গুরু সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও অনেক

৫ অদ্বৈতসিদ্ধি (১ম ভাগ), পৃঃ ৩৫

৬ Vide *Indian Historical Quarterly*, Vol. XII.

৭ Vide the article *Vidyaranya and Mâdhavâcârya* in *Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, p. 701.

৮ Vide *The Origin of Mâdhava-Vidyâranya Theory* in *Indian Historical Quarterly* Vol. VIII, pp. 78-92.

৯ Vide *Vijayanagara, Origin of the City and the Empire* by Dr. N. Venkataramanayy

১০ Vide *The Philosophy of Panchadasi* বিশ্ববাণী, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃঃ ১৪৮।

আছে। কারো মতে বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন শঙ্করানন্দ; কারো মতে ভারতীতীর্থ ও কারো কারো মতে বিদ্যারণ্যের গুরু অথবা আচার্য ছিলেন বিদ্যানন্দ।[১১] ডাঃ দাশগুপ্ত আবার বলেছেন, ভারতীতীর্থ, বিদ্যাতীর্থ ও শঙ্করানন্দ এঁরা তিনজনেই বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন।[১২]

কিন্তু সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার অপ্পয়দীক্ষিতের স্বীকৃতি আবার ভিন্ন রকমের। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যের আচার্য কি-না এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না ক'রে তিনি বরং ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য যে একই লোক ছিলেন এই কথাই স্বীকার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: "বিবরণোপন্যাসে ভারতীতীর্থবচনম্"। বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহকে অপ্পয়দীক্ষিত 'বিবরণোপন্যাস' বলেছেন, "ইতি শ্রীবিবরণোপন্যাসে প্রথমবর্ণকম্ সমাপ্তম্"। ডাঃ মহাদেবন্‌ও অপ্পয়দীক্ষিতের এই স্বীকৃতি দেখে বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন: "From the evidence afforded by the *Siddhantalesa* of Appaya Diksita * *, we are led to the conclusion that Bhâratitirtha was the author of the three works and that the name Vidyâranya was an appellation which was common to both Mâdhava and Bhâratitirtha."[১৩] এ থেকে এটুকুই প্রমাণ হয় যে, মাধবাচার্য ও ভারতীতীর্থ এই দুজনের পদবীই ছিল 'বিদ্যারণ্য'। কাজেই বিদ্যারণ্য নামে নির্দিষ্ট কোন লোক ছিলেন না। বিদ্যারণ্য বলতে মাধবাচার্য-বিদ্যারণ্য ও ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য এঁদের দুজনকেই বোঝাত, আর অপ্পয়দীক্ষিতের স্বীকৃতি অনুসারে ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যই বিবরণোপন্যাস তথা বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহের রচয়িতা। ডাঃ মহাদেবন্ আবার বলেছেন ভারতীতীর্থবিদ্যারণ্য ও মাধবাচার্য-বিদ্যারণ্য দুজনে সমসাময়িক হ'লেও ভারতীতীর্থই বয়সে বড় ছিলেন। তাছাড়া ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দের একটি অনুশাসন ('one of the inscriptions') থেকে প্রমাণ হয় যে বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন ও ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য মাধববিদ্যারণ্যের আচার্য ছিলেন।[১৪]

মোটকথা, বিদ্যারণ্য অদ্বৈত বেদান্তের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ নেই। এছাড়া মীমাংসা, স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society* (Vol. II, pt.2) পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় এম রামকৃষ্ণ কবি *Literary Gleanings* প্রবন্ধে "*Vidyâranya as a Writer on Music*" শীর্ষক আলোচনায় বিদ্যারণ্য যে একজন কৃতবিদ্য সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌ও ছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[১৫] তিনি বলেছেন: "It would be a surprise to scholars that Vidyâranya doubly bent upon the Darsanas especially Mimâmsâ and Vedânta should write on music. Of course his activities were multifarious, and in the midst of his ministerial duties it is really

১১ বিদ্যানন্দের জায়গায় সম্ভবতঃ বিদ্যাতীর্থ নামই হবে, কারণ বিদ্যানন্দ একজন প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যারণ্য কোন জৈন পণ্ডিতকে আচার্যপদে বরণ করেছিলেন এরকম কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

১২ Vide *A History of Indian Philosophy*, ol. II, p. 215

১৩ Vide *The Philosophy of Advaita*, p. 7.

১৪ *Ibid.*, p. 7.

১৫ Vide *The Quarterly Journal of the AHRS*, Vol. II, pt. 2, pp. 142-143 দ্রষ্টব্য।

no wonder that an inspired genius as his worked also in the fine arts." মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি সঙ্গীতসুধার গ্রন্থকার তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: রাজা রঘুনাথও তাঁর সঙ্গীতসুধার রচনার সময় অনেক জায়গায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যারণ্যের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন "প্রসিদ্ধরাগাঃ" পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন: "সঙ্গীতসারং সমবেক্ষ্য বিদ্যারণ্যাভিধশ্রীচরণপ্রণীতম্।"[১৬]

তাছাড়া সুর অথবা স্বর সম্বন্ধে দোষ নির্ণয় করার সময়েও রঘুনাথ উল্লেখ করেছেন: "দোষাংশ্চ তেষাং প্রবদামি বিদ্যারণ্যাভিধশ্রীচরণোপদিষ্টান্।" সঙ্গীতসুধায় পুনরায় তিনি "শ্রীবিদ্যারণ্যমতম্" ব'লে[১৭] ৪১২-৪১৩ দুটি শ্লোকে কয়েকটি রাগ ও রাগ-সংখ্যার নামোল্লেখ করেছেন। যেমন,

"নিরূপিতা লক্ষণতো বিবিচ্য রাগাশ্চতুঃষষ্ট্য-ধিকং শতে দ্বে॥

কর্ণাটসিংহাসনভাগ্যবিদ্যারণ্যাভিধশ্রীচরণা-প্রণীতাঃ।

আরভ্য রাগান্ প্রচুরপ্রয়োগান্ পঞ্চাশতং চাকলয়ে ষড়ঙ্গান্,

রাগাস্ত পঞ্চাশদিহোপদিষ্টা নট্টাদয়ঃ সর্বজগৎ-প্রসিদ্ধাঃ॥"

মহীশূরের চিক্কদেবরায় ভরতসারসংগ্রহে ও ন্যায়দেব তাঁর সঙ্গীতনারায়ণেও বিদ্যারণ্য-নির্দিষ্ট অনেকগুলি রাগ নাকি উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যারণ্য প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থের নাম অনেকের মতে 'সঙ্গীতসার'। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি উল্লেখ করেছেন: বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে নাকি 'সঙ্গীতসার' নামে একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত আছে। ঐ সঙ্গীতসারে ১৬০টি শ্লোক আছে, তবে রচয়িতার নামের কোন উল্লেখ তাতে নেই। উমাপত বা উমাপতম্ বলেছেন, সঙ্গীত-সার গ্রন্থখানিতে নন্দীকেশ্বরের মতানুযায়ী ২৬৪টি রাগের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মহা-মহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবির অভিমত হ'ল ঐ সঙ্গীতসার গ্রন্থটি বাস্তবিকই বিদ্যারণ্যের অথবা বিদ্যারণ্যের মতানুযায়ী কি-না তা এখনো সঠিক ভাবে জানা যায় নি। তারপর ঐ সঙ্গীতসারে সঙ্গীতের কতকগুলি বিষয় আবার আলোচনা করা হয়েছে যেগুলি ১৬শ কিম্বা ১৭শ শতাব্দীর সঙ্গীতধারার সঙ্গেই সম্পূর্ণ মিল খায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ 'সঙ্গীতসার' অথবা বিদ্যারণ্যের নামে নির্দিষ্ট কোন সঙ্গীতগ্রন্থই এখনো পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে আমরা দেখি নি।

[১৬] Vide সঙ্গীতসুধা, Music Academy Series 1), পৃ ১৫২

[১৭] Vide সঙ্গীতসুধা, পৃ ১৫২

পনেরোই আগষ্ট

মাঝ রাতে কভু সূর্য্য উঠেছে
এমন কখনো হয় ?
গভীর অমার বক্ষ বিদারি
সহসা অভ্যুদয় !
আমরা দেখেছি নয়ন ভরিয়া
সেই মহাবিস্ময়,
বিশ্ব যখন ঘুমে অচেতন
ভারত জাগিয়া রয়
খরদহনের সূর্য্য এ নহে,
নবজীবনের রবি,
করুণা-কিরণে করিবে রচনা
শান্তির শ্যামছবি।

ভায়ে ভায়ে আজ নিয়েছি আমরা
তাহারি শপথ-বাণী,
"সবার উপরে মানুষ সত্য"
ইহাই সত্য জানি।
হাতে হাত আজ মেলাও বন্ধু
আর মিছে দেরী নয়,
ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আর তবে কেন
পথ চলিবার ভয় ?
ধরো হাতিয়ার, কঠিন মুষ্টি,
সাবাস নওজোয়ান,
গাও উদাত্ত, অকুণ্ঠ স্বরে
নবজীবনের গান।

ব্রহ্মসূত্র-বিচারসার

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী *

(পূর্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় পাদ—শ্রুতিতে পরস্পর-বিরোধী ভাব

১। বিয়দধিকরণ (৬১) ৭সূত্র ২।৩।১

বিষয়—"তৎ তেজোঽসৃজত" ও "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"।

সংশয়—ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ কি না ?

সিদ্ধান্ত—পরস্পরবিরোধী নহে। আকাশও ব্রহ্মকার্য, অতএব ১ম অধ্যায়ের সমন্বয়ের বিরোধী নহে।

২। মাতরিশ্বাধিকরণ (৬২) ১সূত্র২।৩।৮

বিষয়—বায়ুর উৎপত্তিবিষয়ক শ্রুতিবাক্য।

সংশয়—বায়ুর উৎপত্তি আছে কি নাই ?

সিদ্ধান্ত—উৎপত্তি আছে।

৩। অসম্ভবাধিকরণ (৬৩) ১সূত্র ২।৩।৯

বিষয়—"ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা" এবং "ত্বং জাতো ভবসি"।

সংশয়—উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে বিরোধ আছে কি নাই ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ সদাত্মক ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই।

৪। তেজোঽধিকরণ (৬৪) ১সূত্র ২।৩।১০

বিষয়—"বায়োরগ্নিঃ" এবং "তৎ তেজোঽসৃজত"।

সংশয়—এই তেজ ব্রহ্মজন্য, কি বায়ুজন্য ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, তেজঃ বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্মজন্য ইহাই পরম সিদ্ধান্ত। বায়ু ব্রহ্মমাত্রজন্য ইহা একদেশিমত।

৫। অবধিকরণ (৬৫) ১সূত্র ২।৩।১১

বিষয়—"অগ্নেঃ আপঃ" ও "তদপোঽসৃজত"।

সংশয়—জল অগ্নিজন্য, কি ব্রহ্মজন্য ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। জল তেজোভাবাপন্ন ব্রহ্মজন্য। একদেশিমতে জল অগ্নিদাহ্য বলিয়া অগ্নিজন্য নহে।

৬। পৃথিব্যধিকারাধিকরণ (৬৬) ১সূত্র ২।৩।১২

বিষয়—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ও "তা অন্নমসৃজন্ত"।

সংশয়—পৃথিবী জলজন্য কি অন্ন জলজন্য ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই, কারণ অন্ন অর্থ এখানে পৃথিবী, ওদনাদি নহে।

৭। তদভিধ্যানাধিকরণ (৬৭) ১ সূত্র ২।৩।১৩

বিষয়—সর্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রুতি এবং ভূতের ভৌতিক সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রুতি।

সংশয়—ভৌতিকসৃষ্টির কর্তা ব্রহ্ম কিংবা ভূতসকল ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। পরমেশ্বরই সর্বসৃষ্টিকর্তা কারণ, তাঁহার ঈক্ষণে সর্বসৃষ্টি হয়।

৮। বিপর্যয়াধিকরণ (৬৮) ১সূত্র ২।৩।১৪

বিষয়—শ্রুত উৎপত্তিক্রমে লয়ক্রম, এবং সোপান পরম্পরারূঢ়ের ব্যুৎক্রমে লয়ক্রমবোধক শ্রুতি-বাক্য।

সংশয়—শ্রুত উৎপত্তিক্রমে লয় হয় অথবা উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লয় হয় ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লয়।

৯। অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণ (৬৯) ১সূত্র ২।৩।১৫

বিষয়—করণোৎপত্তিক্রম-বোধক শ্রুতিবাক্য সকল।

সংশয়—পূর্বোক্ত ক্রম করণোৎপত্তি ক্রমের সহিত বিরোধ হয় কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ হয় না। কারণ, যে ক্রমে ভূতোৎপত্তি সেই ক্রমেই ভৌতিকের উৎপত্তি

১০। চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণ (৭০) ১সূত্র ২।৩।১৬

বিষয়—"ন জীবো স্রিয়তে" এবং জাতেষ্টি কর্মবোধক শ্রুতি।

সংশয়—এতাদৃশ শ্রুতি বশতঃ জীবনিত্যতা ও জীবজন্মের মধ্যে বিরোধ হয় কিঁ না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ হয় না। কারণ, জীবের জন্মমরণ দেহাশ্রয়ী.

১১। আত্মাধিকরণ (৭১) ১সূত্র ২।৩।১৭

বিষয়—"সর্ব এতে আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" এবং "স বা এষ মহানজ আত্মা। অজো নিত্যঃ"।

সংশয়—এতাদৃশ শ্রুতিদ্বয়ে বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, জীবজন্ম ঔপাধিক।

১২। জ্ঞাধিকরণ (৭২) ১ সূত্র ২।৩।১৮

বিষয়—"আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ" "পশ্যংশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য।

সংশয়—এতাদৃশ শ্রুতিদ্বয়ে বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, স্বয়ংজ্যোতি বাক্য স্বরূপবোধক, এবং পশ্যংশ্চক্ষু ইত্যাদি উপাধিবোধক।

১৩। গত্যধিকরণ (৭৩) ১৪ সূত্র ২।৩।১৯

বিষয়—"সর্বব্যাপী" এবং "এষঃ অণুরাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি।

সংশয়—সর্বব্যাপিত্ব ও অণুত্বশ্রুতির বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ অণুত্বশ্রুতি ঔপাধিক।

১৪। কর্ত্রধিকরণ (৭৪) ৭ সূত্র ২।৩।৩৩

বিষয়—(আত্মার কর্তৃত্বাকর্তৃত্ববোধক বাক্য)

সংশয়—বুদ্ধি কর্ত্রী কিংবা জীব কর্তা ?

সিদ্ধান্ত—আত্মাই কর্তা বুদ্ধি নহে।

১৫। তক্ষাধিকরণ (৭৫) ১ সূত্র ২।৩।৪০

বিষয়—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" এবং কর্তার ইষ্টসাধনবোধক বিধিবাক্য।

সংশয়—এতাদৃশ স্থলে বিরোধ থাকে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে।

১৬। পরায়ত্তাধিকরণ (৭৬) ২ সূত্র ২।৩।৪১

বিষয়—"এষ হেব সাধুকর্ম কারয়তি" ও বিধি শাস্ত্র

সংশয়—ইহাদের বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব জীবকর্মাধীন।

১৭। অংশাধিকরণ (৭৭) ১১ সূত্র ২।৩।৪৬

বিষয়—"তত্ত্বমসি", এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্।"

সংশয়—এই অভেদ ও ভেদ বোধক শ্রুতির বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ জীব ঈশ্বরের অংশের ন্যায়, স্বাভাবিক নহে।

চতুর্থ পাদ। ইন্দ্রিয়াদিতে শ্রুতি-বিরোধ পরিহার।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ (৭৮) ৪ সূত্র ২।৪।১

বিষয়—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" এবং "ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসৎ আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি।

সংশয়—ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব ও অসদ্ভাবজন্য বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, অন্নময়ং হি সোম্য ! ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োৎপত্তি শ্রুতি আছে।

২। সপ্তগত্যধিকরণ (৭৯) ৩ সূত্র ২।৪।৫

বিষয়—"সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" অন্য শ্রুতিতে ৮, ৯, ১০, ১১টি প্রাণের কথা।

সংশয়—প্রাণের সংখ্যায় বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ অন্য শ্রুতি আছে।

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণ (৮০) ১ সূত্র ২।৪।৭

বিষয়—"প্রাণাঃ সর্বে অনন্তাঃ" এবং উৎক্রান্তি শ্রুতি

সংশয়—এই শ্রুতিদ্বয়ে বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া সূক্ষ্ম ইত্যাদি।

৪। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণ (৮১) ১ সূত্র ২।৪।৮

বিষয়—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" এবং "আনীদবাতম্।"

সংশয়—মুখ্য প্রাণোৎপত্তি এবং মহাপ্রলয়ে প্রাণসদ্ভাব শ্রুতি বিরুদ্ধ কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরুদ্ধ নহে। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রেষ্ঠপ্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

৫। বায়ুক্রিয়াধিকরণ (৮২) ৪ সূত্র ২।৪।৯

বিষয়—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" "খং বায়ুঃ" "যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ"।

সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি বায়ু, কি ইন্দ্রিয়ব্যাপার কিংবা বায়ুবিশেষ ?

সিদ্ধান্ত—বায়ু বিশেষ।

৬। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ (৮৩) ১ সূত্র ২।৪।১৩

বিষয়—উৎক্রান্তি শ্রুতি এবং "সম এভিঃ"।

সংশয়—উৎক্রান্তি আদি শ্রুতির সহিত প্রাণবিভুত্ব শ্রুতির বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণ অণু পরিচ্ছিন্ন ও সূক্ষ্ম।

৭। জ্যোতিরাদ্যধিকরণ (৮৪) ৩ সূত্র ২।৪।১৪

বিষয়—"আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা" "চক্ষুষা হি রূপাণি"।

সংশয়—ইন্দ্রিয়াদি দেবতাধীন চেষ্টাবৎ কিংবা নহে ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, 'চক্ষুষা হি' এই শ্রুতি হেতু দেবতাধিষ্ঠিতত্বের বিরোধ নাই।

৮। ইন্দ্রিয়াধিকরণ (৮৫) ৩ সূত্র ২।৪।১৭

বিষয়—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" এবং "তে এতস্য এব সর্বে রূপম্ অভবন্"

সংশয়—ইন্দ্রিয়গণের উক্ত তত্ত্বান্তরত্ব শ্রুতির সহিত এই প্রাণাত্মকত্ব শ্রুতির বিরোধ আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ, শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ভিন্ন কালাদিকে ইন্দ্রিয় বলা হয়।

৯। সংজ্ঞামূর্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ (৮৬) ৩ সূত্র ২।৪।২০

বিষয়—"অনেন জীবেন আত্মানং" এবং "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিতা"।

সংশয়—উক্ত জীব কর্তৃত্ব শ্রুতি এবং উক্ত পরমেশ্বর কর্তৃত্ব শ্রুতি পরস্পরবিরোধী কি না ?

সিদ্ধান্ত—বিরোধ নাই। কারণ অল্পবুদ্ধি জীবের পক্ষে মহীমহীধর নির্মাণ অসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায় (সাধন অধ্যায়)

প্রথম পাদঃ বৈরাগ্যার্থ জাগ্রদবস্থার সংসার প্রকার

১। তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণ (৮৭) ৭ সূত্র ৩।১।১

বিষয়—(জীবের প্রয়াণ সংক্রান্ত শ্রুতি)

সংশয়—দেহারম্ভক অপঞ্চীকৃত ভূতভাগের সহিত প্রয়াণ করে কি রহিত হইয়া করে ?

সিদ্ধান্ত—সহিতই গমন করে।

২। কৃতাত্যয়াধিকরণ (৮৮) ৪ সূত্র ৩।১।৮

বিষয়—তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা

সংশয়—স্বর্গ হইতে অবরোহণ সানুশয় অথবা নিরনুশয় ?

সিদ্ধান্ত—সানুশয় হইয়া অবরোহণ।

৩। অনিষ্টাদিকার্যাধিকরণ (৮৯) ১৭ সূত্র ৩।১।১২

বিষয়—(যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ ইত্যাদি)

সংশয়—পাপীর চন্দ্রলোকগতি আছে কি না ?

সিদ্ধান্ত—নাই; ইষ্ট্যাদিকারীর আছে।

৪। সাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ (৯০) ১ সূত্র ৩।১।২২

বিষয়—"অথ এতমেব অধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে"ইত্যাদি।

সংশয়—স্বর্গ হইতে অবরোহণকারী জীব আকাশাদি স্বরূপ লাভ করে, কি তৎসাম্য লাভ করে ?

সিদ্ধান্ত—সাম্য লাভ করে।

৫। **নাতিচিরাধিকরণ** (৯১) **১সূত্র** ৩।১।২৩

বিষয়—(সাদৃশ্যলাভের কাল)

সংশয়—জীব অধিক কাল কি অল্পকাল ঐ সাদৃশ্য লাভ করে?

সিদ্ধান্ত—অল্প কালের জন্য সাদৃশ্য লাভ করে।

৬। **অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ** (৯২) **৪ সূত্র** ৩।১।২৪

বিষয়—তে ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়ঃ।

সংশয়—ব্রীহি আদি ভাবে জীবের উৎপত্তি মুখ্য কি জীবান্তরাধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদিতে সংসর্গ মাত্র?

সিদ্ধান্ত—সংসর্গ মাত্র হয়।

দ্বিতীয় পাদঃ স্বপ্নাবস্থায় সংসারপ্রকার

১। **সন্ধ্যাধিকরণ** (৯৩) **৬ সূত্র** ৩।২।১

বিষয়—"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"।

সংশয়—স্বপ্নসৃষ্টি ব্যবহারিকী অথবা মায়ামাত্র?

সিদ্ধান্ত—মায়ামাত্র।

২। **তদভাবাধিকরণ** (৯৪) **২ সূত্র** ৩।২।৭

বিষয়—"আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি"

সংশয়—জীব সুষুপ্তিতে নাড়ী পুরীতৎ পরমাত্মার মধ্যে কোথাও থাকে কিংবা নাড়ী পুরীতৎ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাতে যায়?

সিদ্ধান্ত—পরমাত্মাতে গমনই মুখ্য।

৩। **কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণ** (৯৫) **১ সূত্র** ৩।২।৯

বিষয়—("পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি" ইঃ)

সংশয়—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত জীব ভিন্ন কি অভিন্ন?

সিদ্ধান্ত—সুপ্ত জীবই উত্থিত হয়।

৪। **মুগ্ধাধিকরণ** (৯৬) **১ সূত্র** ৩।২।১০

বিষয়—(মুগ্ধাবস্থা ও সুষুপ্তি)

সংশয়—মুগ্ধাবস্থা সুষুপ্তির অন্তর্গত কি না?

সিদ্ধান্ত—অন্তর্গত নহে।

৫। **উভয়লিঙ্গাধিকরণ** (৯৭) **১১ সূত্র** ৩।২।১১

বিষয়—"সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ" এবং অস্থূলম্ অনণু"

সংশয়—ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্বিশেষ অথবা উভয়রূপ?

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও একরূপ।

৬। **প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণ** (৯৮) **৯ সূত্র** ৩।২।২২

বিষয়—"দ্বে বাব ব্রাহ্মণঃ রূপে" এবং "অথাত আদেশঃ নেতি নেতি"।

সংশয়—প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম উভয়ই নাই অথবা একটী নাই, তন্মধ্যে কোন্‌টী নাই?

সিদ্ধান্ত—নির্বিশেষ ব্রহ্মব্যতিরিক্তই নাই।

৭। **পরাধিকরণ** (৯৯) **৫ সূত্র** ৩।২।৩১

বিষয়—(অথ য আত্মা স সেতুঃ)

সংশয়—ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু আছে কি নাই?

সিদ্ধান্ত—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আবিশ্যক সব লইয়া সর্বগতত্ব সিদ্ধ।

৮। **ফলাধিকরণ** (১০০) **৪ সূত্র** ৩।২।৩৮

বিষয়—("স বা এব মহানজঃ" ইত্যাদি।

সংশয়—সকল প্রাণীর কর্ম হইতে ফল হয় অথবা ঈশ্বর হইতে হয়?

সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বর হইতেই ফল হয়।

তৃতীয় পাদ (সগুণ বিদ্যাবাক্যার্থ)

১। **সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ** (১০১) **৪সূ** ৩।৩।১

বিষয়—(প্রতিশাখার উপাসনাবোধক শ্রুতি)

সংশয়—পঞ্চাগ্নি প্রাণ—দহর শাণ্ডিল্য বৈশ্বানর প্রতিশাখায় ভিন্ন কি অভিন্ন?

সিদ্ধান্ত—অভিন্ন।

২। **উপসংহারাধিকরণ** (১০২) **১ সূত্র** ৩।৩।৫

বিষয়—(শাখাভেদে বিদ্যা)

সংশয়—সর্বত্র উপাসনাগুলির একত্ব হইলেও এক শাখাস্থ বিদ্যাতে শাখান্তরের অধিক গুণের উপসংহার হইবে কি না?

সিদ্ধান্ত—সমান উপাসনা হইলে গুণোপসংহার উচিত।

রাখী-বন্ধন

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

বাঙালীর আজ জেগে ওঠার পেছনে র'য়েছে শতাব্দীর সাধনা। বাংলার বীরপুত্র প্রতাপাদিত্যের পতনের সংগে-সংগে বাংলায় স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন বিলুপ্ত হ'য়েছিল। যথাক্রমে দীর্ঘকাল মোগল ও ইংরাজের অধীনতার বিষক্রিয়ায় বাঙালী ভুলে গিয়েছিল তা'র পৃথক্ সত্তা আছে, জাতি আছে, তা'র দেশ আছে। বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত হ'য়েছিল। তা'রপর ক্রমশঃ যখন শ্বেতাংগ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হ'ল এবং রাজদণ্ড ক্রমশঃ ভারতকে নিঃশেষ করার শোষণ-যন্ত্রে বাস্তব হ'ল, তখনই এক রুদ্ধ অন্তর্বিদ্রোহ জাতির প্রাণে গভীর হ'য়ে ওঠে। ভারতের স্বার্থ ও ইংলণ্ডের স্বার্থসংঘাতে ক্রমে এমন অসহ অবস্থার সৃষ্টি করে, যা'র বৃশ্চিক দংশনের উগ্রতায় উন্মাদ হ'য়ে ওঠে এই মহাজাতি। স্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয় জাতির প্রাণে স্বাতন্ত্র্য, সুপ্তবীর্য। জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেয় জাতীয়তার বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়—মুমূর্ষু জাতির সঞ্চারিত হয় নবীন জীবন। মেঘ-মন্দ্রে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মন্ত্রিত হয় জয়তু জননী।

১৯০০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল, এই পাঁচ বছর বাংলার জাতীয় জীবনে মহাসন্ধিক্ষণ। স্বাধীনতার তপস্যায় হোমাগ্নির যে সমিধ বাঙালী সঞ্চয় ক'রেছিল, এই যুগে তা' প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল পূর্ণতর তেজে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন দু'ভাগে বাংলাকে ভাগ করেন। তা'র প্রতিবাদে বাঙালী জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সমগ্র ভারতে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এতে যেন কেউ মনে না করেন যে, বঙ্গভঙ্গ ঘটনা থেকেই স্বদেশী আন্দোলন সুরু হ'য়েছিল। দীর্ঘসঞ্চিত জাতীয় অপমান ও অত্যাচারের ফলে জাতির অন্তরে যে রুদ্ধ বেদনা, তা' বঙ্গভঙ্গের আঘাতকে প্রধান হেতু ক'রেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মত প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এসেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল এক দেশ-পরিব্যাপী বিরাট আন্দোলন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যা'বে কোন একটা আকস্মিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। জাতীয় সংহতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য সবই বিপর্যস্ত হ'তে চলায় বাঙালীর অবরুদ্ধ শক্তি প্রচণ্ড বিক্ষোভে বিস্ফুরিত হ'য়ে পড়ে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন যখন অধিকতর উদ্দীপ্ত, তখন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যাত্রামোহন সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আনন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি বাংলার কংগ্রেস নেতারাই সর্বাগ্রে তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। বাংলার সর্বত্র সভা-সমিতি-বক্তৃতা ক'রে যুব-সমাজের চিত্তে দেশাত্মবোধ, জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত ক'রে তোলেন তাঁ'রা। বঙ্গভঙ্গ বাতিল করবার জন্যে তাঁ'রা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠান ঘন ঘন উগ্র প্রতিবাদ।

সাহিত্যের কমল-বনেও বহ্নির ঝঙ্কারে বেজে ওঠে কবির রুদ্রবীণা। আত্মশক্তির সাধকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান

ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁ'র সাথে এসে যোগ দেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্রের "নিউইণ্ডিয়া" পত্রিকায় ঐ নূতন দলের মতবাদ প্রচারিত হ'তে আরম্ভ হয় জ্বালাময়ী ভাষায়। দেশের চারিদিকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে সে মতবাদ দ্রুত গড়ে উঠ্‌তে থাকে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার প্রবল আলোড়নে প্রাচীন ও নবীন দুই দলই একত্রিত হ'য়েছিলেন। ঐ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কল্‌কাতা টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তা'রপর ১৬ই অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হ'বে ব'লে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয়। সেইদিনই সমগ্র বাঙালীর মিলনকে সার্থক করার জন্যে চিরস্মরণীয় "রাখী-বন্ধন" উৎসবের ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের সহযোগিতায় রাখী-বন্ধনোৎসবের পরিকল্পনা করেন। সমগ্র বাঙালী জাতিও সর্বান্তরিকতায় সে উৎসব গ্রহণ করে।

১৬ই অক্টোবর কল্‌কাতায় রাখী-বন্ধন উৎসব হয় প্রথম উদ্‌যাপিত। প্রত্যূষে সেদিন সহস্র সহস্র নগ্নপদ স্নানার্থী বাঙালীর বিশাল শোভাযাত্রা। সমবেত কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ দেশের জয়—রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি, বাংলার জল" জাতীয় মহাসংগীত। রাস্তার দু'ধারে প্রতিটি বাড়ীর ছাদে, অলিন্দে, বারান্দায় সর্বত্র জনারণ্য। সোৎসুক কুল-ললনাদের ঘন ঘন লাজবর্ষণে এক মহাভাবের ব্যঞ্জনা লীলায়িত হ'য়ে ওঠে—শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হ'য়ে ওঠে। গঙ্গাস্নানান্তে সহস্র সহস্র বাঙালী শুচিবাসে বন্দেমাতরম্‌ গীতে অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখী পরান, পরস্পর পরস্পরকে আলিংগন করেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে রাখী পরানো হয়। এমন কি মসজিদে-মসজিদে গিয়েও রাখী পরানো হয় সবাইকে। সবাই আনন্দের সাথে, আগ্রহের সাথে, প্রীতির সাথে, তা' বরণ ক'রে নেন। ব্রহ্মচারী বাঙালী সারাদিন উপবাস করেন। কল্‌কাতার সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। বাঙালীর মনের মণি-কোঠায় স্বপ্ন এঁকে দেয় নূতন আশার স্বর্ণজ্যোতি। সেদিন কী সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কী সে এক অপূর্ব দৃশ্য! জাতীয় ঐক্যের অপূর্ব অনুভূতি! অপরাহ্নে ফেডারেশন্ হল্ গ্রাউণ্ডে শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা হয়। জাতীয় সংকল্প-বাক্য ঘোষিত হয়···বাঙালী বঙ্গ-বিভাগ কখনই মেনে নেবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত জাতি তা'র সমস্ত শক্তি দিয়ে আন্দোলন চালা'বে। তড়িৎ-তরঙ্গে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সেই জাতীয় সংকল্প-বাক্য ছড়িয়ে পড়েছিল। আর দিনের পর দিন পঠিত হ'য়েছিল তা' হাজার-হাজার সভায়। ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বাংলার প্রতীকস্বরূপ "মিলন-মন্দিরের" ভিত্তিও সেদিন আনন্দমোহন স্থাপন করেন।

সে দিনের সে আন্দোলন সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনার বস্তু ছিল না। আত্ম-বোধনের বীর্যোন্মেষে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সাম্রাজ্য-বাদী শ্বেতাঙ্গশক্তির স্পর্ধিত প্রতিশোধ কি ভাবে নিতে হয়, চরমতরভাবে বাঙালী তা' দেখিয়ে-ছিল। সে জাতীয় স্পর্ধা আজও ক্ষুণ্ণ হয় নি, আজও ম্লান হয় নি, আজও শিথিল হয় নি। কারার অত্যাচার, নির্বাসনের লাঞ্ছনা, ফাঁসি-কাঠের বিভীষিকা শ্লাঘ্য গৌরবের দৃঢ় বনিয়াদ থেকে বাঙালীকে এক পাও টলাতে পারে নি। জাতীয় আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ সিদ্ধ বিত্তরূপেই বাঙালীকে সুরবীর্য দিয়েছে। বিপ্লবের বহ্নিমন্ত্র বাঙালীকে অগ্নিশুদ্ধ ক'রেছে। বাঙালী আজ বিধাতার বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ আশিস্।

রাখী-বন্ধনের সংক্ষিপ্ত বাহ্য ইতিহাস হ'ল এই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম জন্ম নিলেও জাতীয় মিলন উৎসব রূপে প্রবর্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত হ'ল রাখীবন্ধনানুষ্ঠান। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তা'কে আমরা আহ্বান ক'রে এনেছিলাম গভীর মিলনাদর্শের ভাবানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, আসিন্ধু-হিমানী তা'র স্বয়ম্পূর্ণ মৈত্রীর সার্থকতার দিকে তাকিয়ে তুংগ অসংগতিকে ভুলতে চেয়েছিল, তার মধুর স্পর্শ কামনায় একান্তচিত্ত হ'য়ে উঠেছিল—সেই পুণ্য ও পরমোত্তম তিথি এবারেও এসেছে রক্তিম অভ্যুদয় নিয়ে, বেদনা-জর্জর বাংলার মহামিলনের উন্মুখতা নিয়ে।

এই রাখীপূর্ণিমার মূলে র'য়েছে মিলনের বিচিত্র ও বিপুল অনুভূতির অনুপ্রেরণা। জ্ঞাত ভাবে হোক, অজ্ঞাত ভাবে হোক— সচেতন ভাবে হোক্, অবচেতন ভাবে হোক্ এই অনুভূতি সবার মধ্যে ক্রিয়া করে। বার্তমানিক দুঃখ, ব্যথা ও গ্লানিই সব বা শেষ কথা নয়। ভবিষ্যৎ আছে, আশা আছে।

রাখী-বন্ধনের অন্তর্নিহিত বাণীর মর্ম অনুধাবন করলে আমরা উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ঘরের বাইরের বাংলার সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর, সর্বসম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্বের ঐক্য অনুভব করতে পারি। সহস্র-সহস্র বছরের যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের পশ্চাতে রয়েছে, তার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ স্মৃতির সায়রে প্রবাহিত। বারম্বার বিপর্যয়ের আঘাত এসেছে, বহু রকমের বিবর্তন ঘটেছে, তবু সে প্রবাহ প্রতিহত হয়নি। ইতিহাসের তরংগময়ী ধারা-স্বরূপে এখনো যেমন বইছে গংগা, গোদাবরী, সিন্ধু—তেমনি আমাদের সনাতন কৃষ্টির মূলধারা নানা রূপাবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের সংগতি রক্ষা ক'রে আমাদের অধুনাতন জীবনেও এসে পৌছিয়েছে, জীবনকে ক'রেছে সঞ্জীবিত। এই ইতিহাস ও সংস্কৃতি আমাদের যে আভিজাত্য দিয়েছে, যে মর্যাদা দিয়েছে, তা' থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ আমাদের বিচ্যুত করতে পারে নি। পাশ্চাত্যের দুর্নিবার দানবতা থেকে এ রক্ষা-কবচের মত আমাদের রক্ষা করেছে। আজিকার রাবণরূপী বহুগুণ বলদর্পী বণিকী বর্বরতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়ার যদি কোন পথ থাকে, আমাদের গরিমোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সংস্কৃতিই সেই পথের নির্দেশ দিচ্ছে। পশ্চিমী পশুশক্তি যদি আমাদের আভিজাত্যের পায়ে অবনত না হয়, তা' হ'লে তা'র শৃঙ্খলের পেষণ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার, মুক্তি-সংগ্রামে জয়যুক্ত করার চেষ্টাও হ'বে আমাদের মূঢ়তা। বিবেকানন্দের জীবন, রবীন্দ্রনাথের জীবন, গান্ধীজীর জীবন, তিলক-দেশবন্ধু-সুভাষের জীবন এই দিক থেকেই আমাদের পক্ষে পরমতম আশার বাণী বহন করছে। যে শক্তি রাজনীতিতে আমাদের অপেক্ষাকৃত অবশ ক'রেছে, সংস্কৃতিমূলক আভিজাত্যের মর্যাদায় আমরা তা'কে ছাড়িয়ে উঠেছি। এমন বিচিত্র ঘটনা ইতিহাসে আর কোথাও ঘটে নি। এর কারণ আমরা পৃথিবীর বুকে আকস্মিক বিস্ফুরণ মাত্র নই—অন্তহীন অতীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং সংকুচিত হ'ব কেন? সংকিত হ'ব কেন? পশ্চাদ্‌পদ হ'ব কেন? রাখীপূর্ণিমার একাত্মতার এই যে প্রত্যক্ষ স্পর্শন বাংলার, তথা ভারতের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উদার অনুভূতির মধ্যেই একে পরিতৃপ্তিতে প্রসন্ন ক'রে তুলবো, সার্থকতায় সম্পূর্ণ ক'রে তুলবো। রাখী-বন্ধনের জয়যাত্রা—প্রেমের জয়যাত্রা, ঐক্যের জয়যাত্রা, ভ্রাতৃত্বের জয়যাত্রা। এর বাধা নেই, বিরাম নেই, বিরতি নেই।

রাখী-বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃশাসনী স্বৈরশক্তির পাশবতার অবসান এবং দিকে দিকে

নূতন ক'রে নূতন বাংলা, নূতন ভারত গড়্‌বার সংকল্প-সমন্বিত গণ-দেবতার পাদক্ষেপের সন্ধিতলে দাঁড়িয়ে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে দিব্য দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, অদূর অনাগতে অখণ্ড সৌভ্রাত্রের দুর্জয় স্ফুরণ; আর সেই স্ফুরণে মহামুক্তির নবীন আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবে আরো প্রত্যক্ষ করবো মুক্তির সংগ্রামে বিরাট একীয়তার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু আসুরিক শক্তি সর্বশেষে শ্মশান-প্রান্তরের বহ্নিমান্ চিতাচুল্লীতে ঢলে পড়েছে।

প্রতি বছরের এই ভ্রাতৃমিলনের পরম ক্ষণে জাগরণের নব প্রেরণায় উদ্দীপিত, রক্তের মন্ত্রে দীক্ষিত প্রত্যেকটি বাঙালীকে, প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে আমরা প্রত্যেকটি বাঙালী, প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমাদের অন্তরময় অভিনন্দন জানাবো—এই হো'ক্ আমাদের সংকল্প। আর, ঈশ্বরের পাদপদ্মে এই প্রার্থনাই পৌঁছে দেবো, যে, রাখী-বন্ধনের নিবিড় সৌহার্দ্যের, নিবিড় মৈত্রীর মধ্য দিয়ে অভিযাত্রা-পথে দানবীয় বাধা অপসারণে অভিযাত্রিকের সর্বোত্তম, সম্মিলিত সংকল্পের শক্তি সাফল্যমণ্ডিত হোক্—আমাদের সমষ্টি-জীবনে মুক্তির কল্যাণ, শ্রী, শান্তি এবং সিদ্ধবীর্য নেমে আসুক্ পুষ্পধারার অজস্রতায়।
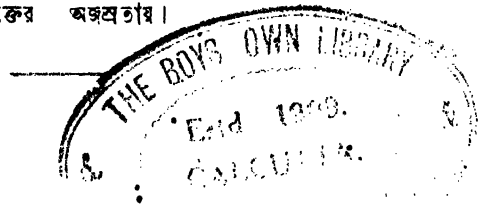
বিবেক-মন্দির

শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি-এ

রচিলে মরতে নব তপোবন
অতি মনোহর শিল্প'ছবি।
নূতনের মাঝে চিরপুরাতন
জগতে শিখালে তাপস কবি।
হে বীর সন্ন্যাসী, ভুলাবে বিস্মৃতি
জানিলে ধেয়ানে, নবীন সাজ।
অনন্ত কালের বুকে দীপ্ত স্মৃতি
আচার্য্যে সঁপি মহান্ আজ।

চির-নূতনের সাধক বিবেক
সাবাস্ সাধনা কঠোর তপ।
বহু দেব মাঝে বিরাজিত এক
শিখালে মানবে, চিনালে পথ।

ওগো কর্ম্মবীর আসি ধরাতলে
পরহিত ব্রতে কত না শ্রম,
স্থাপিলে কীর্ত্তি মিশি দলে দলে
উদিল প্রভাতে নব আশ্রম।

ভরে মহিমায় দূর হতে দূর,
গাহিছে গাথায় কত না কবি।
অমিয়া ঝরায় ঝরিণী বেলুড়
তুষিছে সেবায় মহান্'ছবি।

তাপিত জ্বালায় জুড়াতে ব্যথায়
কত দেশ হতে আসিছে যাত্রী
লভিতে প্রসাদ জমিছে সেথায়
পোহাবে পরশে গহন রাত্রি

অস্থি-লতা ঘেরি লাবণি তনিমা,
প্রেমের কমল কামপল্বলে
মোহন মন্তরে অতীত মহিমা
জাগালে সাধক হোম-অনলে।
জীবনের দীপে লভিতে প্রভাতী
ব্যাকুল বাসনা নিল গো টানি,
সদাই ভাবনা হবে না সে সাথী
কাঁদি গো আকুলি পেতে সে বাণী।

স্বাধীনতার জয়যাত্রা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দীর্ঘ রজনীর গাঢ় তমিস্রা বিদূরিত করিয়া প্রভাতের বালসূর্য্য দিঙ্‌মণ্ডল অপূর্ব্বচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ব্বগগনে উদিত। সকলের মুখে হাসি, হৃদয়ে নবীন আশা এবং মন আনন্দে ভরপুর। রজনীপ্রভাতে যেন কোনও যাদুস্পর্শে অতীত জীবনের দুঃখময় ইতিহাসকে বিস্মৃতির অতলগর্ভে সমাহিত করিয়া সকলে নবীন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছে। কেন এই আনন্দোচ্ছ্বাস! কারণ বেশী দূরে নয়। নিজ হৃদয়েই উহা অনুভূত হইতেছে। ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারী আজ স্বাধীন। বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খলে দৃঢ়শৃঙ্খলিত আমাদের পরমপ্রিয় ভারতমাতা আজ মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন। ভারতবাসীর বুকের উপর হইতে ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় দাসত্বের জগদ্দল পাষাণ আজ অপসৃত হইয়াছে, তাই আজ প্রত্যেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। যেন সগর্ব্বে সকলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছে 'পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন জাতির ন্যায় ভারতবাসীও আজ স্বাধীন, বিশ্বসভ্যতায় তাহার অবদান কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, এবং বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় পুনরায় ভারতই হবে অগ্রদূত।' যে আলোকরশ্মি এই পুণ্য প্রাচ্যভূমি হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যুগযুগান্তরে অন্যান্য দেশকে আলোকিত করিয়াছে, যে ভারত চিরদিন শান্তি, মৈত্রী ও ধর্ম্মের শাশ্বত বাণী দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়া আসিয়াছে, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় যদিও সে আলোকরশ্মি কিছু কালের জন্য নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও তাহার প্রচারিত শান্তির বাণী পরাধীন দেশের বাণী বলিয়া অপরের কর্ণে প্রবেশ করে নাই কিন্তু আজ সর্ব্বপ্রকার অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া যখন সে বিশ্বের দরবারে, তাহার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে তখনই অপর দেশের চমক ভাঙ্গিয়াছে। স্বাধীন ভারতকে অভিনন্দন জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "সকল দেশের দৃষ্টিই আজ ভারতের প্রতি নিবদ্ধ। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকৃত শান্তির পথ ভারতই দেখাইবে।" ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সভ্যতা ও বিশ্বসমাজে ভারতের অবদানের কথা চিন্তা করিলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আশা যে মোটেই অলৌকিক নয় ইহাই প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দিন হইতেই ভারতের হৃতগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে। এই ঐতিহাসিক দিবসকে আমরা অন্তরের সহিত স্বাগত জানাইতেছি। সেই দিবসের কথাই এখন বলিব।

১৫ই আগষ্ট শুক্রবার ভারতের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন শক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক অবস্থা ও ভারতীয় জনমতের চাপে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে দেশ-শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিখ্যাত "ভারত পরিত্যাগ কর" (কুইট্ ইণ্ডিয়া) প্রস্তাব বোম্বাই অধিবেশনে

গৃহীত হয়। এই সময় হইতে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও দেশবাসী স্বাধীনতা লাভের সংকল্পে অবিচলিত থাকিয়া এই স্মরণীয় দিনটিকে স্বাগত জানাইবার নিমিত্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সকাতর প্রার্থনা পরম কারুণিক পরমেশ্বর পূর্ণ করিয়াছেন।

পরাধীন ভারতবাসী যে এত শীঘ্র তাহাদের চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা কেহ ধারণা করিতে পারে নাই। শুনা যায়—ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন বলিয়া ছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যেই ভারত এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিবে।' তাঁহার বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। সত্যই ভারতবর্ষ এক অলৌকিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা বিদ্রোহে ভারতের স্থায় একটি উপমহাদেশের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করা যথার্থই কল্পনাতীত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইবার কাহিনী এবং ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীনতালাভের ইতিহাসের সহিত ভারতের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস তুলনা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। পৃথিবীর পরাধীন দেশ মাত্রকেই স্বাধীনতার জন্ত উপযুক্ত মূল্য দিতে হইয়াছে। ইহার তুলনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের চল্লিশকোটী নরনারীর স্বাধীনতালাভের জন্ত যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহা খুব বেশী নহে। ইহার মূলে ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর অবদানই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা আজ আর কে অস্বীকার করিবে? সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভারতবাসীর অশেষ পুণ্যফলে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মাজী ভারতের জনমতকে যেভাবে জাগ্রত করিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যেভাবে সুষ্ঠু পরিচালিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলেরই মস্তক আজ শ্রদ্ধায় অবনত।

১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে যখন সমগ্র জগৎ সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে নিদ্রায় অচেতন, সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুহূর্ত্তে দিল্লীর ঐতিহাসিক গণ-পরিষদ-কক্ষে ভারত তাহার সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতার শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বাধীনতাকে বরণ করিল। স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য প্রথম প্রধান মন্ত্রী একটি সময়োচিত অভিভাষণ প্রদান করিয়া গণপরিষদকে একটি সার্ব্বভৌম স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহার ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিসহকারে গৃহীত হইল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে দেশের সর্বত্র মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং সকলে অন্তরের সহিত স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইল।

পরদিন প্রাতে ভারতের নবনিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভার হস্তে দেশ-শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ভারতের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে, লাট-প্রাসাদে, দুর্গে দেশের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ সাড়ম্বরে ও সগৌরবে মধ্যস্থলে অশোকচক্র-শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করিলেন। পরাধীন বলিয়া এতদিন কোনও স্বাধীন জাতি ভারতবাসীকে সম্মান করে নাই বরং অনেকেই অবমাননা করিয়াছে। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে তাহারাও আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকাকে অভিবাদন করিয়া ভারতবাসীর প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ-বাসীর মনে সাহস ও আশার সঞ্চার করিয়াছে। বহু খ্যাত ও অখ্যাত শহীদ এই পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই পতাকা ত্যাগ, শৌর্য্য, সাম্য, মৈত্রী, পবিত্রতা, শান্তি, কর্ত্তব্য ও মিলনের

প্রতীক। কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই আজ এ পতাকা সম্মানিত হইবে না, পরন্তু দেশ-বিদেশে এই পতাকাকে সকলেই উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করিবে।

সেদিন দুই লক্ষাধিক দর্শকের সমক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই ত্রিবর্ণ পতাকা সম্রাট সাজাহান-নির্ম্মিত দিল্লীর বিখ্যাত লাল কেল্লার উপর উত্তোলন করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। নেতাজী তাঁহার আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে তিনি জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন, দিল্লীর লালকেল্লার উপর ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেই হইবে। তাঁহার সেই অভিপ্রায় আজ পূর্ণ হইল। এত শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করিবার মূলে যে ভারতমাতার উপযুক্ত সন্তান ভারতবাসীর প্রাণের নেতাজীর অসীম সাহস, অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও তাঁহার সৃষ্ট আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অলৌকিক কৃতিত্ব বিদ্যমান, এ সম্বন্ধে এখন আর দ্বিমত নাই।

দেশের সর্ব্বত্র ও বিদেশের নানাস্থানে ভারতের জাতীয় পতাকা আজ সগৌরবে পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে দেখিয়া সকলের মন আনন্দে ভরপুর এবং হৃদয় গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র পতাকার মর্য্যাদা যেন আমরা যথাযথ রক্ষা করিতে পারি। অমর কবির ভাষায় সে কারণ প্রার্থনা জানাইতেছি,

"তোমার পতাকা যারে দাও
বহিবারে তারে দাও গো শকতি।"

স্বাধীনতা-উৎসবে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই মনে প্রাণে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা শহরের এই দিনের উৎসব বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও যেখানে হিন্দু ও মুসলমান আত্মঘাতী কলহে ব্যাপৃত ছিল, ঐদিন কোন এক ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরম আনন্দ, উৎসাহ ও উল্লাস সহকারে সমগ্র শহর পরিভ্রমণ এবং 'জয় হিন্দ্' 'বন্দে মাতরম্' ও 'হিন্দু মুসলমান এক হও,' 'সকলে ভাই ভাই' ইত্যাদি ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুরা নির্ভয়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এবং মুসলমানরা নির্ভয়ে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে চলা-ফেরা করিতেছে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব ঈদ্ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান একত্রে আনন্দ করিয়াছে এবং সেদিনও শান্তি শোভাযাত্রায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান একত্রে সমগ্র শহরে শান্তির ও মিলনের বাণী প্রচার করিয়াছে। বহুকাল এ দৃশ্য দেখা যায় নাই।

পশ্চিম-বঙ্গের নব নিযুক্ত গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী এই দৃশ্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলেন, 'বাংলা চিরকালই অপরকে পথ দেখাইয়াছে' এবং তিনি আশা করেন যে হিন্দু-মুসলমান মিলনেও বাংলাই অন্যান্য প্রদেশকে পথ দেখাইবে। 'মহামতি গোখলেও বলিয়াছিলেন, 'What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow.' বাংলা দেশই যে ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ দেখাইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাস। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন তৃতীয়পক্ষ সরিয়া দাঁড়াইলেই আমরা ঘরের ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিব। উহা যে এত শীঘ্রই সত্য হইতে চলিয়াছে তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। সুখের বিষয় যে, কলিকাতার এ মিলনের হাওয়া পূর্ব্ববঙ্গে এবং মফঃস্বলে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে উহা সমগ্র ভারতেই বহিবে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক স্থায়ী মিলন ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিবে। স্বাধীনতাই আজ আমাদের এ মিলন আনিয়াছে।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীকে অনেক নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সহায়ে ধ্বংসোন্মুখ মানবসভ্যতাকে রক্ষা করাই স্বাধীন ভারতবাসীর প্রধান দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব সম্পাদনের উপযোগী করিয়া এখন সমগ্র দেশকে গঠন করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যাহারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অশিক্ষায় জীবন যাপন করিতেছে, যাহাদের পরনে একখণ্ড বস্ত্র নাই, ছেলেপুলেদের শিক্ষাদানের উপায় নাই, রোগ হইলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, বর্ষায় মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই, তাহাদের উন্নতির দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই সকল অনর্থের জন্য এতদিন আমরা বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়াছি, কিন্তু এখন আমাদের নিজেদের লোক গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত করিবেন, কাজেই দেশের জনসাধারণের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের। এই দায়িত্ব পালনের সময় তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই মহতী বাণী:

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহান্ উপদেশ:

..."ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের (ভারতমাতার) জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার রক্ত, তোমার ভাই...।"

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে যাত্রায় আমরা বহির্গত হইয়াছিলাম, তাহাতে আজ আমরা জয়লাভ করিয়াছি। স্বাধীনতারূপ মহাসম্পদ লাভ করিবার ফলে আজ আমাদের ক্রমোন্নতির দ্বার উন্মুক্ত। প্রার্থনা করি, ভারতের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী হউক! বন্দে মাতরম্!!

স্বাধীনতা

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

স্বাধীন ভারত
স্বাধীন ভারত
স্বপনের রূপ লভিল প্রাণ।

শহীদের বলি
তপ্ত রুধির
সবার উপরে তাঁদের দান।
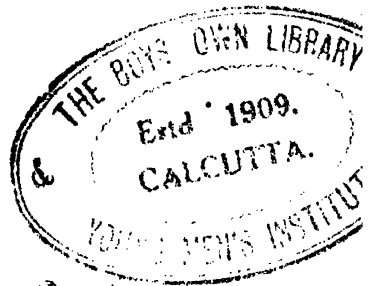
স্বাধীন ভারত
স্বাধীন ভারত
ধরায় নামিল স্বরগধাম;

"স্ব" এর অধীন
হ'তে যদি পারি
সার্থক হ'বে "স্বাধীন" নাম।

সত্তমুক্ত স্বাধীন ভারত

স্বামী পুণ্যানন্দ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজী বন্ধুগণের নিকট ইয়োকোহামা থেকে একখানি পত্র লিখেন। সত্ত্বজাগ্রত জাপানীদের প্রাণস্পন্দন অনুভব ক'রে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁর স্বদেশের জন্ম ব্যথিত হ'য়ে লিখছেন—"এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সবজাতি কেমন উন্নতি-পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হ'বার জন্ম, উন্নত হবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করি। * * ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

সহস্র কেন বহু সহস্র যুবক—স্বামিজীর বাঞ্ছিত যুবক—ভারতকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম আত্মাহুতি দিয়েছেন। অনেককেই আমরা জানি না, হয়ত কখনও জানবও না। জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে অনেক যুবক লোকচক্ষুর অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে তিলে তিলে নিজের বুকের রক্ত দান করে জাতির পাপের জন্ম তর্পণ করেছেন। কংগ্রেসের বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবকরূপে বহু কর্ম্মী এ জাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম আত্মোৎসর্গ করেছেন। দধীচির মত তাঁরা শুধু দানই করেছেন আর তাঁদের সেই আত্মোৎসর্গের ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে আজকের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের এই সুপ্রভাতে সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে স্মরণ করেই যেন আমরা এই সব শহীদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলে না যাই।

আজ ভারত স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের অধিবাসী আমরা একথা ভাবতেও যেন প্রাণে এক বিরাট স্পন্দন আসে। একটা গৌরবময় অতীত ছিল আমাদের। পৃথিবীর সভ্যতার ভাণ্ডারে আমাদের দান ত কম ছিল না। তার পর এক ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন করে ফেলে এ জাতিকে দীর্ঘ ২০০ বৎসরের জন্ম। বিধি আমাদের ললাটে অঙ্কিত করে দেন পরাধীনতার গ্লানিরূপ তিলক; পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আসে আত্মবিস্মৃতি। আত্মবিশ্বাসের অভাবে একটি বিরাট জাতি দুর্দ্দশার চরমে এসে উপস্থিত হয়। পরাধীনতার মত বড় অভিশাপ জাতির ভাগ্যে যেন কখনও না আসে। পরাধীনতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। আজ স্বাধীনতা তাই এত মধুর, এত আদরের, এত প্রাণের।

অনেকে বলেন—খণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতার এত আনন্দ কেন? খণ্ডিত স্বাধীনতা ত জাতির লক্ষ্য ছিল না। সত্য বটে, কিন্তু বিদেশীর নাগপাশমুক্ত জাতি আজ খণ্ডিত ভারতকে অখণ্ড করবার জন্ম নূতন সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা পাবে। বন্ধনে সে প্রেরণা আসতো না। তৃতীয় পক্ষ—যাদের কূট কৌশলে আজ ভারত দ্বিখণ্ডিত, তারা যবনিকার অন্তরালে গেলে আমাদের আবার খণ্ডিত ভারতকে অখণ্ড ভারতে পরিণত করবার জন্ম চেষ্টা করতে হবে। ভারতের যে সব হিন্দু মুসলমান ভাই আজ আমাদের কাছ থেকে কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন দেশবাসী হয়েছেন, আমরা মুহূর্ত্তের জন্মও তাদের যেন ভিন্ন দেশবাসী মনে না করি। স্বাধীনতার জন্ম যেমন আত্মবলিদান দিতে জাতির যৌবনশক্তি কার্পণ্য করে নি, দ্বিখণ্ডিত ভারতকে অখণ্ড ভারতে পরিণত করবার জন্মও নূতন সাধনায় তারা আত্মোৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হবে না। আজ স্বাধীনতার আনন্দে আমরা যেন ভুলে না যাই যে আমাদের সাধনা

অসমাপ্ত ; এখনও অনেক ত্যাগ তপস্যার প্রয়োজন হ'বে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে।

কেউ কেউ বলেন, এ তো পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। এখনও ত আমরা পৃথিবীর নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা লাভ করেছি। তাঁরা ভুলে যান এ ব্যবস্থা সাময়িক মাত্র। বর্ত্তমান গণপরিষদ্ ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁরা সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্বাধীন ভারতের জন্যই তাঁরা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কচ্ছেন। সুতরাং আমাদের আজকের স্বাধীনতা অলীক নয়—কল্পনাবিলাস নয়, অতি বাস্তব।

পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সত্যই, এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। যুদ্ধ না করে বা রক্ত-বিপ্লব না করে এত বড় একটা দেশ ও জাতি স্বাধীনতা লাভ করলো, এ সত্যই অভূতপূর্ব্ব। যে অতিমানব এ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকবে। যে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী মহাত্মাজী মানবজাতিকে দিলেন উহাই ত ভারতের বাণী—উহাই ত বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতের অবদান।

কি ভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন স্বদেশীযুগে ফাঁসির মঞ্চে যে মৃত্যুঞ্জয়ী চারণদল মুক্তির গান গেয়ে গেলেন উহাই স্বাধীনতা লাভের সোপান, কেহ কেহ বলেন,—সাম্রাজ্যবাদী পাশব শক্তি ভারতীয় দেশসেবকদের হিংসামূলক কার্য্যকলাপ দ্বারাই বিব্রত হলো। কেহ বলেন—কংগ্রেস যে বিরাট গণশক্তির পরিচয় দিল উহার নিকট নতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না। আবার অন্যপক্ষ বলেন,—নেতাজীর অদ্ভুত প্রতিভা-পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অপূর্ব্ব বীর্য্য; নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদিতে বৃটিশ শক্তি বিপর্য্যস্ত হয়েছে। আবার কেউ বলেন—দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের জন্য, আবার অপর পক্ষ বলেন—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ও তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার জন্যই বৃটিশ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আমাদের মনে হয় ইহার প্রত্যেকটি কারণই সত্য এবং এইসব আন্দোলনের সমষ্টিভূত শক্তি এত বিরাট ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে বৃটিশের ভারত ত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এ ছাড়াও ভারতবাসী সর্ব্বক্ষেত্রেই তার নিজ সুপ্ত চেতনার জাগরণের পূর্ব্বাভাস লাভ করে নূতন স্পন্দনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। কূটকৌশলী বৃটিশের নিকট ইহার ফলাফল দেয়ালে লেখার মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তাই বৃটিশ ভারত ত্যাগ করলো বা করতে বাধ্য হলো। আবার বলি ধন্য সেই মানব যিনি এত বড় বিপ্লবী শক্তিকে সুসংহতভাবে পরিচালিত করে আমাদের অতীত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌লেন।

স্বাধীনতা ত পেলাম, কিন্তু তারপর? স্বাধীনতা লাভ করা সহজ কিন্তু রক্ষা করা কঠিন; ততোধিক কঠিন লব্ধ সুযোগকে মানবসেবায় নিয়োজিত করা। পৃথিবীতে অনেক স্বাধীন দেশ আছে। সত্য বটে এসব দেশ ভোগবিলাসে জীবনের মানদণ্ড অনেক উপরে উঠিয়েছে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? স্বাধীন দেশগুলি যে আদর্শ মানব সমাজকে দিয়েছে তার বিষময় ফলাফল আমরা দুই মহাযুদ্ধে দেখেছি। মনীষীরা বলেন, তৃতীয় মহাযুদ্ধ হলে বর্ত্তমান পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য।

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বহুদিন পূর্ব্বেই এই কথা বলেছিলেন—"The western civilization is standing on a volcano." তাই এখন প্রশ্ন আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমরা কি অন্যান্য স্বাধীন জাতির মতই হিংসা দ্বেষ ও power-politics নিয়ে জগতের সম্মুখে দাঁড়াব, না, ভারতের স্বাধীনতা লাভের অভিনব উপায়ের মত স্বাধীনতা রক্ষা করবারও অভিনব উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করব?

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, সভ্যতার প্রভাত থেকে, ভারত যে আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার করেছে, যে আদর্শের জন্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন ভারত এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু হয় নি, সেই আদর্শকেই বিবদমান ধ্বংসোন্মুখ জাতির সম্মুখে স্থাপিত করবে। সচিবোত্তম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের বৈদেশিকনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতের আত্মার বাণীই ঘোষণা করেছেন। সাম্য, মৈত্রী, নিপীড়িত, অত্যাচারিত জাতির মুক্তির সমর্থন—ইহাই হ'বে ভারতের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। ভারত কখনও উড়োজাহাজ বা আণবিক বোমার দ্বারা তার সভ্যতার বাণী অন্য দেশে বহন করবে না, এবং এ জন্যই মনে হয় ভারতের স্বাধীনতার মধ্যেই আছে ধ্বংসোন্মুখ মানবসভ্যতার মুক্তির আবাহন। সত্যদ্রষ্টা স্বামীজি ত একথাই পুনঃ পুনঃ বলেছেন। ইহাকেই তিনি বলেছেন ভারতের বৈদেশিক-নীতি।

* * *

বিদেশী শাসকশ্রেণী শাসনের নামে শোষণ করে আমাদিগকে "চলমান শ্মশান" জাতিতে পরিণত করেছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আমাদের দেশকে রোগ, শোক, ব্যাধির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করেছে। সমগ্র জাতি আজ মুমূর্ষু। স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শে আজ প্রাণে স্পন্দন এসেছে। এমন সহনশীল, নিরভিমান কষ্টসহিষ্ণু জাতি জগতে বিরল। যা কিছু গলদ আজ আমাদের মধ্যে এসেছে তার কারণ আমাদের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছিল। আজ যাঁরা শাসনশক্তি হাতে পেয়েছেন তাঁদের কর্তব্য হবে—সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জাতির এই প্রাণশক্তিকে পরিচালিত করা। রাশিয়ার মত বিরাট দেশ যদি ৩০ বৎসরের মধ্যে এত উন্নতি করতে পারে আমরাই বা পারবো না কেন?

দেশের যারা প্রাণ তারা হচ্ছে কৃষক, মজুর। বিদেশী ও স্বদেশীর অত্যাচার উৎপীড়নে এরা সমস্ত শক্তি তিলে তিলে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু এরাই জাতির মেরুদণ্ড। ভাল আহার্য্য, আলো-বাতাসযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, সর্ব্বোপরি মানুষের মত ব্যবহার এদের সঙ্গে করতে হবে। এই মনুষ্যত্বের অবমাননা করার ফলেই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা। স্বাধীনতা লাভ করে আমরা প্রথমেই যেন জাতির ললাট থেকে এই কলঙ্ক কালিমা মুছে ফেলি। পুঁজিবাদী, কায়েমী স্বার্থবাদীরা বহু আকারে, বহু ছদ্মবেশে এই নূতন গতিকে রোধ করতে সঙ্ঘবদ্ধ হবে কিন্তু সর্ব্বত্রই যেমন হয়েছে, ভারতেও তেমনি সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। হিটলারের নাৎসীবাদ, মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্টবাদের ইতিহাসই উহার প্রমাণ দেয়।

স্বামিজীর বাণী যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এ যুগে শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান হবে, বৈশ্যশক্তির লোপ সুনিশ্চিত; আমাদের আজ গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে, এই যে সমুত্থিত বিরাট গণশক্তি, একে আমরা কি ভাবে পরিচালিত করবো! নিশ্চয়ই আমাদের নিজস্ব আদর্শানুযায়ী; বৈদেশিক অঙ্গুলিসঙ্কেতে নয়। প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব ভাবধারা থাকে, উহা জাতির প্রাণস্বরূপ। জাতির সমস্ত শক্তি উহাতে নিহিত। ঐ ভাবধারাকে ভিত্তি করেই যুগপ্রয়োজনে ও অন্যান্য জাতির সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য আমাদের কর্ম্মপন্থা স্থির করতে হবে—অন্ধ অনুকরণ করে নয়। সর্ব্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে যাঁরা আজ শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছেন এ জাতিকে শুধু বড় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই নয়, আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমরা যেন মনে প্রাণে অনুভব করি আমরা স্বাধীন জাতির প্রতিনিধি। এই জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই।

আজ স্বাধীনতা লাভের আনন্দের দিনে মনে হয় সেই কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসীকে, যিনি ভিক্ষাপাত্র মাত্র সম্বল করে সুদূর আমেরিকায় একদিন ভারতের মর্ম্মবাণী সগৌরবে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করেছিলেন। যাঁর সমগ্র জীবন ভারতের তথা বিশ্বমানবের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। যিনি একদিন সেই যুগে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"Liberty is the only condition of growth," আজ তাঁর অশরীরী আত্মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা ভারতকে পুনরায় তার অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমের মর্ম্মস্পর্শী বাণী

ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের উচ্ছলিত স্বদেশ-প্রেমের মর্ম্মস্পর্শী যে বাণীসমূহ মুক্তিকামী শহীদগণকে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, উহাদেরই কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এখন আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, * * কিন্তু হায়, এদেশের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমি কিরূপ ব্যথিত, মর্ম্মাহত হইয়াছি কি বলিব! চক্ষুর অশ্রুধারা রুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করা বৃথা প্রয়াস মাত্র। এই কারণেই,—ভারতের দীন-দরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই, আমি আমেরিকা যাইতেছি।"

"মাতঃ, আমি নাম যশ দ্বারা কি করিব যখন আমার জন্মভূমিকে অসীম দারিদ্র্যের অতলে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি! ওহো, আমরা দরিদ্র ভারত-বাসীরা কি দারুণ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এক মুষ্টি অন্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আর এদেশের (আমেরিকার) লোকেরা ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে! কে ভারতের ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাইবে, কে তাহাদিগকে এই দীন অবস্থা হইতে উত্থিত করিবে? মাতঃ, কি প্রকারে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।"

"ভারতবর্ষে দীন-হীন নিম্নশ্রেণীর লোককে আমরা কি চক্ষে দেখিয়া থাকি তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দারুণ ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই অবনত অবস্থা হইতে উঠিবার, এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধারের কোন সুযোগ, কোন উপায় তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। * * দিন দিন তাহারা দুর্গতির অতলে ডুবিতেছে। নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদের উপর যে মুষ্টির আঘাত বর্ষণ করিতেছে, তাহা তাহারা অনুভব করিতেছে, অথচ জানে না কোথা হইতে তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। ইহার পরিণামই দাসত্ব। ওহো, উৎপীড়ক দুরাত্মাগণ, তোমরা জান না যে উৎপীড়ন এবং দাসত্ব একই জিনিষের এ-পিঠ এবং ও-পিঠ,—দাসত্বই উৎপীড়কের ভাগ্য-লিপি! * * লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার উদ্যম-উৎসাহে অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া, অটল ভগবদ্‌বিশ্বাসের বর্ম্মে সুরক্ষিত হইয়া, দীন-হীন-পতিত-পদদলিতদের জন্য সমবেদনা-সঞ্জাত সিংহ-বিক্রমে পূর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিচরণ করুক এবং মুক্তি, সেবা ও সাম্যের বেদবাণী দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক। * * * হে বৎসগণ, তোমরা মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও। প্রভু আমাকে এইজন্য আহ্বান করিয়াছেন। এজীবনে কত যন্ত্রণা, কত পীড়ন সহ্য করিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে, প্রাণাধিক প্রিয়তমের অনশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে হইয়াছে। লোকে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে এবং যাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতির জন্য আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। একমাত্র 'আশা তোমাদের উপর যাহারা নিরহঙ্কার, নম্রস্বভাব, নীচ, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাসী। * * তোমরা দীন দুঃখীর দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব কর এবং সাহায্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—তবেই তোমরা সাহায্য পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুঃখের বোঝা হৃদয়

বহন করিয়া, এই চিন্তা মস্তকে লইয়া বহু বৎসর দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, তথা-কথিত ধনবান্ ও মহাজনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। এখন ব্যথাদীর্ণ, রক্তাক্ত হৃদয়ে অর্দ্ধভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া সাহায্যের জন্য এই বিভুঁই-বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু দয়াময়, সুমহান। আমি জানি তিনি আমার সহায় হইবেন। আমি শীতে অথবা অনাহারে মরিতে পারি; কিন্তু, হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, মূর্খ, পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম দায়স্বরূপ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইব। * * হাঁ, প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর; তোমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ কর, আত্ম-বলিদান কর এই ত্রিশ কোটি লোকের মুক্তির জন্য যাহারা প্রতিদিন ডুবিতেছে। * * প্রভু ধন্য, আমরা জয়ী হইবই। এই সংগ্রামে শত শত যোদ্ধা মরিবে, শত শত আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবে। চাই বিশ্বাস, চাই সমবেদনা,—জ্বলন্ত বিশ্বাস, জ্বলন্ত সহানুভূতি; নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া, শীত, অনশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হও! প্রভু আমাদের সেনাপতি,—প্রভুর জয়।"

"লোকে patriotism অর্থাৎ দেশানুরাগের কথা বলে। আমিও 'পেট্রিওটিজমে' বিশ্বাসী। আমারও দেশানুরাগের আদর্শ আছে। মহৎ কার্য্যের জন্য তিনটি জিনিষের আবশ্যক। প্রথমটি হইতেছে হৃদয়বত্তা। আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তি (reason) কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া থামিয়া যায়, কিন্তু হৃদয় হইতেই প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যে প্রবেশ করিবার দ্বার। অতএব, হে স্বদেশভক্ত সংস্কারকবৃন্দ, ভালবাস, অনুভব করিতে শিক্ষা কর। তোমরা কি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছ যে, দেব ও ঋষিগণের কোটি কোটি বংশধর প্রায় পশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি নরনারী বহুযুগ ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, অজ্ঞতার কাল মেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় কি তোমরা বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতেছ? * * এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের এই দুর্দ্দশার, বিনাশের কথাই কি তোমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়, ধ্যানের বিষয় হইয়াছে? এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া তোমরা কি তোমাদের মান, যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন কি দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? যদি এইরূপ করিয়া থাক তবে তোমরা প্রথম সোপানে,—স্বদেশানুরাগের প্রথম সোপানে পৌঁছিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান যে, আমেরিকার ধর্ম্ম-মহাসভার জন্য আমি যাই নাই। দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচনের চিন্তা ভূতের মত আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্য করিবার কোন উপায় ও সুবিধা পাইলাম না। এ জন্যই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল। ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হউক বা না হউক, তাতে আমার কি যায় আসে? এখানে, আমার স্বদেশে, আমার রক্তমাংস-স্বরূপ জন-সাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে,—তাহাদের কথা কে ভাবে?"

"জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ, স্বজাতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হউন। * * অন্যান্য দেবতা নিদ্রিতা, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমাদের স্বদেশীয় জন-সাধারণ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার

কর্ণ, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন্ নিষ্ফলা দেবতার সন্ধানে তোমরা ধাবিত হইবে, আর তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পার না? এই দেবতার পূজা সম্পন্ন হইলে পর তোমরা অপর দেবতার পূজা করিতে সক্ষম হইবে। * * তোমরা প্রত্যেকেই যোগী হইতে চাহিতেছ, প্রত্যেকেই ধ্যান করিতে চাহিতেছ! ইহা যে অসম্ভব। সমস্ত দিবস সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া অর্থের সন্ধানে উন্মত্তবৎ ছুটিবে আর সন্ধ্যাবেলায় অল্পক্ষণের জন্য বসিয়া নাক টিপিলেই ধ্যানী যোগী হইয়া যাইবে? ইহা এতই সহজ? * * আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা। চিত্তশুদ্ধি কি করিয়া হইবে? সর্ব্বপ্রথমে বিরাটের পূজা দ্বারা—যাঁহারা তোমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান তাঁহাদের পূজা দ্বারা। * * ইঁহারাই, তোমাদের স্বদেশবাসিগণই এখন তোমাদের উপাস্য দেবতা হউন। হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্বের পরিবর্ত্তে তোমাদের স্বদেশবাসিগণের পূজা কর।—ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষরূপ মহাপাপের ফলে তোমরা দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবুও কি তোমাদের চক্ষু খুলিবে না? * *।"

"এই সে প্রাচীন দেশ, ভারতবর্ষ, যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কোন দেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে স্বীয় বাস-ভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এদেশের আধ্যাত্মিকতার মন্দাকিনী জড়জগতে, একদিকে, বিশাল নদনদীরূপে সবেগে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরের সহিত মিলিত, একীভূত হইয়াছে; এবং অপর দিকে, তুষার-কিরীটী, অনাদি-অনন্ত হিমালয়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক যেন সুরলোকের রহস্যসমূহের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে! এই ভারতের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম মানব-প্রকৃতি এবং অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। এদেশেই সর্ব্বপ্রথম মানবাত্মার অমরত্ব, ব্রহ্মের অস্তিত্ব, ঈশত্ব এবং সর্ব্বভূতান্তর্যামিত্ব-বিষয়ক মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। এদেশেই ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতেই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী বারংবার প্লাবিত করিয়াছে। আর, ধ্বংসাভিমুখী জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবার জন্য এই ভারত হইতেই পুনরায় সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইবে। এই ভারতই শত শত শতাব্দীর আঘাত, বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত রীতি-নীতি বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; নিজের অবিনশ্বর বীর্য্য ও জীবন লইয়া পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এদেশের জীবন আত্মারই মত অনাদি, অনন্ত, অমর। আর, আমরা এমনি দেশের সন্তান। হে ভারত-সন্তানগণ, তোমাদিগকে কতকগুলি কাজের কথা বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এ দেশের অতীত গৌরবের কথা তোমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাহা এই। লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে,—অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বৃথা, বরং তাহাতে অবনতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে।—একথা সত্য। কিন্তু অতীতের গর্ভ হইতেই ভবিষ্যতের জন্ম হয়। অতএব অতীতের দিকে যত দূর পার দৃষ্টিপাত কর,—পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিতা তাহা হইতে জ্ঞান-বারি আকণ্ঠ পান কর; তারপর সম্মুখ দিকে তাকাও, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হও; ভারতবর্ষ অতীত কালে যত মহান্, যত গৌরবান্বিত, যত মহিমান্বিত ছিল তাহাকে তদপেক্ষা গরীয়ান্, তদপেক্ষা মহীয়ান্, অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ কর। ... আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে। আমরা কি উপাদানে গঠিত, আমাদের ধমনীর শোণিতের উপকরণ কি, আমাদিগকে জানিতে হইবে। আমাদের শোণিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা অতীত যুগে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে;—তারপর সেই বিশ্বাস এবং অতীত মহত্ত্বানুভবের বলে অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

"পাশ্চাত্য দেশের অনেক বন্ধু তাঁহাদের স্বার্থলেশহীন পবিত্র হৃদয়ের প্রীতি দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ কিন্তু আমার সমগ্রজীবনের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা—কৃতজ্ঞতা আমার এই মাতৃ-ভূমির প্রাপ্য। যদি আমার জীবন সহস্র মানবজীবনের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে ঐ সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার স্বদেশবাসী নর-নারীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতাম। কারণ, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে,—এই জড়দেহ, মনন-শক্তি এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ্, এই সমস্তের জন্যই আমি আমার জননী জন্মভূমির নিকট ঋণী। যদি আমি জীবনে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি তবে তাহার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ও গৌরব আমার স্বদেশ-বাসিগণের প্রাপ্য; আর আমার যত কিছু দুর্ব্বলতা, যতকিছু অকৃতকার্য্যতা তাহার জন্য আমি নিজেই দায়ী; আমার অক্ষমতাই এই সকল দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতার কারণ। এ দেশবাসী জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে মহতী শিক্ষালাভ করিয়া জীবনকে মহৎ ও কৃতার্থ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমি ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া আমার মধ্যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে।"

"আমার জন্মভূমির মত দেশ আর কোথায় আছে? যে কোন ব্যক্তি, তিনি ভারতবাসীই হউন, অথবা বিদেশী হউন—যদি তাঁহার আত্মা পশুত্বে পরিণত না হইয়া থাকে,—এই পুণ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হন—তিনিই নিজেকে জীবন-প্রদ চিন্তা-রাশিদ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভব করেন,—যে সকল চিন্তা মানবেতিহাসের অজ্ঞাত সহস্র সহস্র শতাব্দী যাবৎ নরকুলশ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা ভারতীয় মহাপুরুষগণ মনুষ্যজাতিকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিবার জন্য উদ্ভাবিত করিতেছেন। এদেশের পবন আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। এদেশ দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উদ্ভাবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পাশব জীবনের অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিবার জন্য, এবং যে শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার পশুত্বের বাহ্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অজর, অমর, অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মারূপে প্রকাশিত হয় সেই শিক্ষা দিবার জন্য এই ভারতই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এ দেশই মানবজীবনের যাহা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া, আবার, এ জীবনের দুঃখ-তাপ পূর্ণতররূপে সহ্য করিয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল যে এই সুখদুঃখময় মানবজীবন অলীক, মায়ামাত্র। এই ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম ভোগ-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, সামাজিক গৌরব-গরিমার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অশেষ প্রতাপের অধীশ্বর নব যৌবনের প্রারম্ভে সকল মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন! সুখ-দুঃখ, অশ্রু-হাস্য, ঐশ্বর্য্য-দারিদ্র্য, শক্তি-দৌর্ব্বল্য, জন্ম-মৃত্যুর ভীষণ সংঘর্ষের মধ্যে আবর্ত্তিত অসংখ্য মানবের বাসভূমি এই ভারতেই অনন্ত শান্তি ও অটল স্থৈর্য্যের আশ্রয় ত্যাগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আমাদের এই মাতৃভূমিতেই জীবন-মৃত্যুর সমস্যা, সর্ব্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্র দহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্যা সর্ব্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল; এবং তাহা

এরূপ ভাবে মীমাংসিত হইয়াছিল যে জগতের অপর কোন দেশ সেরূপ মীমাংসায় এ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। শুধু এদেশই আবিষ্কার করিয়াছে,—এই ঐহিক জীবন এক পরম সত্যের ছায়ামাত্র, অতএব অমঙ্গলের আকর। আমার এই মাতৃভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নর-নারী জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দুর্জ্জয় সাহসে সমাধিগর্ভে মগ্ন হইয়াছে, যখন অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজ নিজ বাসনা পূরণের আশায় উন্মত্তের মত ধাবিত হইয়াছে। কেবল এদেশেই মানবহৃদয় এতদূর প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহা শুধু মানুষ নহে, সমস্ত পশু-পক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে। * * কেবল এ দেশেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বের একত্ব, অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে।"

"বিদেশী প্রচারকগণ আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের দুর্গটি বিচূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াও কি আমরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিব? আমরা কি আমাদের প্রাচীনদের মত বীরগর্ব্বে পৃথিবীর সমুদয় জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিব না? আমরা কি সঙ্কীর্ণ সামাজিক গণ্ডির ভিতর ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকিব অথবা ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য জগতের নানা জাতির চিন্তাধারাকে আমাদের ধর্ম্মবিস্তার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিব? নিজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতবর্ষকে প্রবল হইতে হইবে, ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, তাহার সমস্ত জীবন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।"

"ভারতবর্ষের অবনতির কথা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি। এক সময়ে আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রের ভিতরকার প্রকৃতরূপ অবগত হইয়া এখন আমার নেত্র হইতে ভ্রান্ত সংস্কারের তিমিরাবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন আমি অহঙ্কারমুক্ত অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার দেশকে আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অয়ি পুণ্য আর্য্যভূমি! তুমি কখনও, কোন কালে পতিত, অবনত হও নাই। * * * আমি ভয়বিস্ময়-মিশ্রিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি, অপূর্ব্বজ্যোতির্ম্মণ্ডিত যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিশ্রান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে,—এই দীর্ঘায়তন কাল-শৃঙ্খলের কোথাও একটু মলিনতা দৃষ্ট হইলে আবার দেখিতে পাইতেছি, পরবর্ত্তী কালে তাহাই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিতেছি, ভারতভূমি, আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য,—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। ভূ-লোকে কিংবা সুরলোকে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা ভারতের এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে। * * * সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন-ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, তাহার জীবনের মেরুদণ্ড ও ভিত্তি, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। এই মহান্ ব্রত পালনের পথ হইতে ভারত কখনও এক চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হয় নাই,—মোগলই দেশ শাসন করুক,

অথবা পাঠান অথবা ইংরেজ শাসন করুক। * * * আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি, প্রত্যেক সভ্যদেশের কোটি কোটি নর-নারী ভারতবর্ষ হইতে সেই অমৃত বাণী লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে যাহা, ধন-দেবতার অর্চ্চনার অনিবার্য্য পরিণামস্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ঐ সকল দেশে নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকে ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শই তাঁহাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইবে।"

"উন্নতির মুখ্য উপায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয়।"

"জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

"নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে—তাতে পেয়েচে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি।······ অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

"যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে, অথচ ইহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।"

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ······।"

"হে যুবকবৃন্দ, যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবন বলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য।"

"যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য! আসুন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিত ভাবে কাজে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোনও শক্তিই তাহা পাইবার প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে! আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল। তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত।"

সমালোচনা

বিদ্ধি—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক—মডেল পাব্লিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৩২; মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই বইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান-পিপাসা জন্মানো কিংবা বাড়ান,—জ্ঞানপিপাসা মিটানো এর উদ্দেশ্য নয়। গুটিকতেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে শুধু একটুখানি পথ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এর পর পথিক নিজে নিজে চলতে পারেন এবং এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তীব্র হয়ে জাগে।" আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বিরাট বিশ্ব, পৃথিবীর জন্ম ও বয়স, ভূমণ্ডল, জীব-জগতের অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তিবাদ, আদিমানবের সন্ধানে, মানবের জাতিবিভাগ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, ধর্ম, মায়াপুরী প্রভৃতি কয়টি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরূপ সুষ্ঠুভাবে এবং পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সহিত আলোচনা করিয়াছেন যে ইহাতে পাঠক-পাঠিকা মাত্রেরই জ্ঞান-পিপাসা উদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এদিক দিয়া বিচার করিলে পুস্তকখানির 'বিদ্ধি' নামটি যথার্থরূপে সার্থক হইয়াছে। পুস্তকে আদ্যোপান্ত গ্রন্থকারের বিষয়বস্তুগুলির স্বচ্ছ অবধারণা এবং সুন্দর প্রকাশভঙ্গী কৃতিত্বের পরিচায়ক। শেষের দিকে রাষ্ট্র, ধর্ম, সভ্যতা ও মায়াপুরী—এই চারিটি বিষয়ের আলোচনা বেশ উপভোগ্য ও উদার দৃষ্টি-প্রণোদিত হইয়াছে। ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও মুদ্রণ সুন্দর। এই পুস্তক বিক্রয়ের নেট লাভ গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-সমিতিকে শিক্ষাবিস্তারকল্পে দান করা হইয়াছে। আমরা ছাত্রসমাজ ও সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল

প্রেমানন্দ (দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী চণ্ডীচরণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির, পোঃ কুণ্ডা, বৈদ্যনাথ-দেওঘর (বিহার)। ১৮৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৸৹ আনা।

স্বামী প্রেমানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছয়জন ঈশ্বরকোটী শিষ্যের অন্যতম। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এবং বলিতেন 'এর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ'। ঠাকুরের ভাবাবস্থায় প্রেমানন্দই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রেমঘনমূর্তি মহাপুরুষের বিস্তৃত জীবনী, কথোপকথন ও উপদেশাবলী পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রেমানন্দের পত্রাবলী দুই খণ্ড পুস্তক ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সেই অভাব কতকাংশে পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি স্বামী প্রেমানন্দের পূত সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই মহাপুরুষের দিব্য সঙ্গে বেলুড় মঠে, কাশীধামে ও পুরীধামে বাস করিয়া যাহা যাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন ও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগ পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের বিবরণও অতি হৃদয়গ্রাহী। পরিশিষ্টে প্রেমানন্দজীর ১২ খানি পত্র সংযোজিত। পত্রাবলীর কয়েকখানি রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দজী কর্তৃক প্রদত্ত। পুস্তকের মলাটে বেলুড় মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মন্দিরের ছবি এবং মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বামী প্রেমানন্দের ছবি দেওয়া হয় নাই। যাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক লিখিত তাঁহার একটী ছবি না থাকিলে পুস্তক অঙ্গহীন হয়। পরিশিষ্টে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী অপ্রাসঙ্গিক। পুস্তকের কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাই সুন্দর, তবে মূল্য একটু বেশী মনে হয়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বাধীনতা দিবস—গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেলুড় মঠ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠাদি এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী মহারাজের দেহত্যাগ—গত ১৩ই ভাদ্র অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় শ্রীমৎ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী মহারাজ কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭৫ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিয়া মণি-কর্ণিকায় জল-সমাধি দেওয়া হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনি রক্তের চাপ জনিত ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন, এবং ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছিল।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী গৃহস্থাশ্রমে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার ধর্মভাব ও শাস্ত্রানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইহারই প্রেরণায় তিনি ১৯৪০ সনে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাশীধামে থাকিয়া সাধন-ভজন ও শাস্ত্র-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। বাংলা দেশে যে সকল মনীষী বেদান্ত-প্রচারে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন এবং অনেক শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ," "শাঙ্কর গ্রন্থাবলী" "অদ্বৈতসিদ্ধিঃ" "ব্যাপ্তিপঞ্চক" "ব্রহ্মসূত্রম্ বা বেদান্তদর্শনম্," "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা," "তর্কসংগ্রহ," "ভাষা-পরিচ্ছেদঃ বা ন্যায়সাহস্রী," "তর্কামৃত," "শাস্ত্রসার-সংগ্রহ" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'উদ্বোধন' পত্রে বেদান্ত সম্বন্ধীয় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আমাদের হাতে আছে। উহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজীর অনন্যসাধারণ জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, অভিমানরাহিত্য ও অমায়িক ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা এই পণ্ডিতাগ্রণী সন্ন্যাসি-প্রবরের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি রবিবার ও বুধবার নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন:

(১) "ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অভ্যাস," (২) "কুণ্ডলিনী—মানুষের নিদ্রিতা দৈবশক্তি", (৩) "দ্বিতীয় জন্ম", (৪) "সকল ধর্ম যে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত", (৫) "হওয়া বা না-হওয়া", (৬) "ওঁ—ঈশ্বরের প্রকৃত নাম", (৭) "ঈশ্বর ও জগৎ", (৮) "বাহ্য ও আভ্যন্তর মানুষ", (৯) "যদি আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করি"।

এতদ্ভিন্ন স্বামিজী প্রতি শুক্রবার বেদান্তের ক্লাস করিয়াছেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল (যুক্তপ্রদেশ)—১৯৪৬ সনের এবং ১৯৪৭ সনের ষাণ্মাসিক কার্য-বিবরণী:—১৯৪৬ সনে এই

সেবাশ্রমের ৪৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই বৎসর সেবাশ্রম-হাসপাতালের ইন্‌ডোর বিভাগে ১০৬৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। আউট্‌ডোর বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল সর্বসমেত ৩৬৮৪০; ইঁহাদের মধ্যে নূতন রোগী ১২৪৮৯ এবং repeated cases ২৪৩৫১। ১৯৪৬ সনের শেষে সেবাশ্রম-পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১। সেবাশ্রমে দুইটি লাইব্রেরী আছে—একটি সাধারণের জন্য, অপরটি রোগীদের জন্য। এই দুই লাইব্রেরীতে ৩৬৮৬ খানা পুস্তক আছে। এই বৎসর ৩০৫৮ খানা পুস্তক পঠিত হইয়াছে। এবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩০০ জনের অধিক দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ২৯৫৬১।৶২ পাই এবং মোট ব্যয় ৩১১১৭।৶২। সুতরাং ১৫৫৬৲ টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

সেবাশ্রমের ১৯৪৭ সনের ষাণ্মাসিক কার্য-বিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই হাসপাতালের ইনডোর বিভাগে এই ছয়মাসে ৩৩১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সনের পূর্বার্ধের তুলনায় এই বৎসরের পূর্বার্ধে ইনডোর বিভাগে ৫১ জন অধিক সংখ্যক রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষার্ধে আউটডোর বিভাগে নূতন রোগীর সংখ্যা ৭১১৪, repeated cases ১৫৬৩৯। লক্ষ্য করিবার বিষয় পূর্ববৎসরের প্রথমার্ধের তুলনায় এই বৎসরের প্রথমার্ধে আউটডোর বিভাগে প্রায় ৮০০০ অধিকসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে।

অধিকন্তু এই বৎসর সেবাশ্রম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গৃহহীন ৩০০০০ আশ্রয়-প্রার্থীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬০০০ জনের অধিক রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। এই বৎসরার্ধে সেবাশ্রমের মোট আয় ১৪১১১৶৮ পাই এবং মোট ব্যয় ১৮০২৭/৬ পাই। সুতরাং ৪০০০৲ টাকা এই ছয়মাসে ঘাটতি হইয়াছে।

ঔষধ, আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য এবং হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য অবিলম্বে সেবাশ্রমের ২৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন সেবাশ্রম হাসপাতালের Pantry, Bedding ও Linen room-এর জন্য ৪০০০৲, আভ্যন্তর জলনিষ্কাষণ ব্যবস্থার জন্য ৫০০০০৲, কূপ হইতে মোটর পাম্প দ্বারা জল সরবরাহের জন্য ১৫০০৲, রান্নাঘর ভাঁড়ার ও ডাইনিং হল প্রভৃতির জন্য ১৫০০০৲, নৈশ বিদ্যালয়ের জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য ১৫০০০৲, গোশালা নির্মাণের জন্য ১০০০০৲ এবং রোগীদের আরও ২২টি বেডের (প্রত্যেক বেডের জন্য ৬০০০৲) প্রয়োজন। সাহায্য আশ্রমের সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলে ইহা সাদরে গৃহীত এবং ইহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Shankara's Crest-Jewel of Discrimination—(Viveka-Chudamani) Translated by Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood. Published from Vedanta Press, Hollywood, California. Page 149, Price 2 dollars, 50 cents.

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ— নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ৫৪ বৎসর বয়সে গত ২৪শে শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। মণীন্দ্র বাবু স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রায় সকল সন্ন্যাসী শিষ্যের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জীবনের শেষাংশে সংসার ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী হন। মণীন্দ্রনাথ ভক্ত মনোমোহনের কনিষ্ঠ ভাগিনেয় ছিলেন। জনসেবাকার্যে তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি স্যার গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউটের সহকারী সম্পাদক ও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। উত্তর-বঙ্গের বন্যায়, গত দুর্ভিক্ষের সময় এবং গত বৎসর কলিকাতার দাঙ্গায়ও তিনি অক্লান্ত ভাবে সকলের সেবা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থী এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বন্যা-বিধ্বস্তদের সাহায্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

পাঞ্জাবে যে সকল বীভৎস ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা জনসাধারণের নিকট এতই সুবিদিত যে, আর স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরর্থক। হতাহত ও আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নিত্যই বাড়িয়া চলিতেছে। আর্তদিগের সমুচিত সাহায্যের ব্যবস্থা করা ভারত-সরকারের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, অথচ হৃদয়বান কাহারও পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না।

এইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন স্থির করিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ভারত-সরকারের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা রাখিয়া পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন। ইতোমধ্যে মিশনের জন কয়েক সেবক কার্য্যারম্ভের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন; এবং সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ক্রমে কার্য্যের প্রসার করা হইবে।

চট্টগ্রাম বিভাগের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলেও মিশন সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন এবং ঐ জন্য সেবকেরা ইতোমধ্যেই কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ স্থানের জনগণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। আবার এই বন্যাতে গৃহহারা ও সর্ব্বস্বহীন হইয়া তাহারা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সুতরাং তাহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

আমরা এই জনসেবার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে ও যথোচিত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি তদর্থে জনসাধারণের নিকট অর্থ ও দ্রব্যাদির জন্য আবেদন করিতেছি। দাতাদের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত উভয় কার্য্যের যে কোনটির জন্য অর্থাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে:

(১) জেনারেল সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেঃ হাওড়া।

(২) কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

(৩) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বেলুড় মঠ (হাওড়া)
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
জেনারেল সেক্রেটারী,
রামকৃষ্ণ মিশন

শিল্পীর অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত — শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু
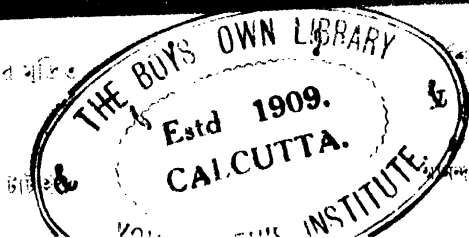
বোধন

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

কঙ্কালাকীর্ণ এ যুগ-সভ্যতার শ্মশান-অঙ্গনে
স্বাজাত্যের চিতা-চুল্লী অনির্বাণ জ্বলে ধূ ধূ জ্বলে ;
শবগন্ধী, শতজিহ্ব সে বহ্নির পিঙ্গল কিরণে
মহাকাল-মুখ শুধু অহোরাত্র উদ্ভাসিয়া ঝলে।
একদিকে বুভুক্ষার মরুজ্বালা, মারী-বিড়ম্বন,
মানব-আত্মার হেলা, অপমান, পীড়ন পুঞ্জিত ;
রুধিরাক্ত ধরিত্রীর আর দিকে বুকের ক্রন্দন,
দিগন্ত-বিস্তৃত বায়ে করিয়াছে বিষ-কলুষিত।
ধ্বনিত হউক তব সুদুর্জয় অমৃত-আহ্বান
মেঘমন্দ্রে হে মাতৃকা, সাড়াহীন জাতির অন্তরে ;

উদ্বোধন

ঘুমের সমাধি হ'তে চিরতিক্ত ভারতের প্রাণ
মুক্তির সঙ্কল্প ল'য়ে জাগুক্ সে ক্ষিপ্র বীর্যভরে।
প্রসন্ন দিঠিতে তব দূরে যা'ক দীনতার স্তূপ,
বুভুক্ষা মুছিয়া যা'ক্, ধুয়ে যাক্ ক্লীবতার গ্লানি;
বহ্নিবীর্যে দীপ্ত ক'রে তোল তা'র সু-সুপ্ত স্বরূপ,
দাঁড়াক্ উন্নত শিরে আবার সে গৌরবেরে আনি'।
আবার উঠুক্ বেজে বন্ধনাশা বোধনের শাঁখ,
মঙ্গল-দীপের শিখা প্রজ্বলিত হো'ক্ অন্ধকারে;
চিত্তে চিত্তে ধূপ-গন্ধ মিলনের ত্রিবেণী বহাক্,
নামিয়া আসুক্ শান্তি বন্যাবাহে প্রতি গৃহদ্বারে।
দুরন্ত এ অকালের দুর্দিনের মাঝারে আবার
অকাল-বোধন দেবি, প্রয়োজন হ'য়েছে যে জানি;
দিগন্ত মুখর ক'রে কোটি কণ্ঠে ওঠে অনিবার
মনের মিনতি তাই…মাতা জাগো, জাগো মা রুদ্রাণি।
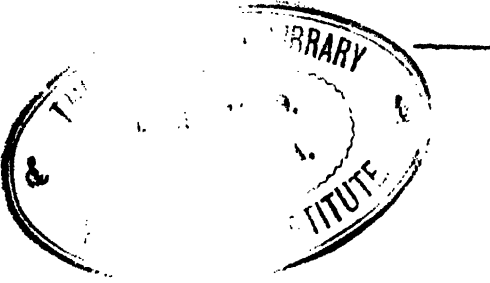
"বলিপ্রদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অনুকল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিত দান, যে উদ্দেশ্যে পূজা, সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। বেদ বলেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ", ত্যাগই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমর হইবার একমাত্র উপায়। কেবল আত্মজ্ঞান কেন, স্বার্থ-সুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না এবং ঐ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি এবং হোমের একমাত্র লক্ষ্য।"

—ভারতে শক্তিপূজা

পণ্ডিত জওহরলালের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

সম্পাদক

রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার "দি ডিস্‌কাভারি অব্‌ ইণ্ডিয়া" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়ও প্রবুদ্ধ ভারতের ধর্ম-জাগরণে এবং সংস্কার-আন্দোলনে এই মহাপুরুষদ্বয়ের অবদানের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গের প্রারম্ভে পণ্ডিতজী ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য ভাবরাশির প্লাবনে ভারতের এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। তাঁহারা প্রতীচ্যের প্রায় সকল বিষয়কেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময়ে বাংলার কতিপয় মনীষী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করেন। তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া হিন্দুধর্মকে বাঁচাইবার জন্য রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক যুক্তিবাদ ও সমাজ-সংস্কারমূলে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে অধিকতর খৃষ্টীয় রূপ প্রদান করেন। বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের বহু পরিবার ইহা দ্বারা প্রভাবিত হন। পণ্ডিতজী বলেন, এই পরিবার-সমূহ পরে প্রাচীন বেদান্ত-ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপর পণ্ডিত নেহেরু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, গুজরাটি সন্ন্যাসী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্যসমাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পাঞ্জাবের হিন্দুদের মধ্যে এই সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করে। বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তনই এই সম্প্রদায়ের আদর্শ। আর্যসমাজ বেদের পরবর্তী বেদান্তকেও অস্বীকার করেন। পণ্ডিতজীর মতে ইসলাম ও খৃষ্টান—বিশেষ করিয়া প্রথমোক্ত ধর্মের প্রতিক্রিয়ারূপে আর্য-সমাজ প্রবর্তিত হয়। বাহ্য আক্রমণ হইতে হিন্দুদিগকে সংরক্ষণ এবং আভ্যন্তর সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করণ, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আর্যসমাজ অহিন্দুগণকে হিন্দুধর্মে আনয়নও সমর্থন করেন। এই জন্য ধর্মান্তর-গ্রহণ-সমর্থনকারী অহিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বিরোধ বিদ্যমান। পণ্ডিতজী বলেন, আর্যসমাজের শিক্ষাবিস্তার কার্য এবং নারী ও অবনত জাতির উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের এই সংক্ষিপ্ত

পরিচয় দিয়াই পণ্ডিত নেহেরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথক ধরনের ছিলেন। তাঁহার জীবন বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। এই মহাপুরুষের কোন পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু গভীর বিশ্বাস ছিল। সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমাজ-সংস্কারে তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি প্রকৃত পক্ষে শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভারতীয় মহাপুরুষদের পর্যায়ভুক্ত, ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ ও উদার ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকদের উপদেশ অনুসারে এতদুভয় ধর্মও আনুষ্ঠানিক ভাবে সাধন করেন। পণ্ডিতজী বলেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত ছিলেন, তাঁহারাও এই মহাপুরুষকে দেখিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহাদের এই অমূল্য সম্পদ তাঁহারা হারাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুর বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। তিনি একাধারে এই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। তিনি অন্যান্য ধর্মকেও তাঁহার মতের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার কোন সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন, সকল মত ও পথেই একই সত্যকে লাভ করা যায়। পণ্ডিতজী বলেন, যাঁহারা এই মহাপুরুষকে দেখেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই রূপ ব্যক্তিদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখিয়াছেন।

প্রধানতঃ এই কয়টি কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় দিয়া পণ্ডিত জওহরলাল স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সহায়তায় অসাম্প্রদায়িক রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের মহত্ত্বগর্বিত হইয়াও জীবন-সমস্যায় আধুনিক এবং অতীত ও বর্তমানের সেতুস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস, আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং ভারতবর্ষকে অগ্রগামী করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। পণ্ডিতজী যথার্থই বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অবনত ও চরিত্রহীন হিন্দু-মনের 'টনিক' স্বরূপ ছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেই খানেই উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। তাঁহাকে কেহ একবার দেখিলে আর বিস্মৃত হইত না। আমেরিকায় তিনি 'ঝঞ্ঝা-হিন্দু' (Cyclonic Hindu) নামে অভিহিত হইতেন। পণ্ডিতজীর মতে স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নিজেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রতীচ্য জাতিসমূহের ধর্মের অভিব্যক্তি স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বরং তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ আরও দৃঢ় হইয়াছিল। পণ্ডিতজী বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিতে অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতই জগতের আলোক।

অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল ধর্ম-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, তিনি অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক ছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে ইহাই জগতের চিন্তাশীল মানবের ভবিষ্যৎ ধর্ম হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন, বেদান্ত মতে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই নামরূপের অভিব্যক্তি। বেদান্ত মানুষের অন্তর্নিহিত একত্বে ও দেবত্বে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে ভগবান দর্শনই প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন। কিন্তু এই নির্বস্তুক বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বেদান্ত সম্বন্ধে স্বামীজীর এই অভিমত যুক্তিবাদী পণ্ডিতজীর যে মনঃপূত হইয়াছে, ইহা তাঁহার লেখায় পরিস্ফুট।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমত সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াই তাঁহার সমাজ-সম্বন্ধীয় অভিমত পণ্ডিত নেহেরু সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, প্রথমাবস্থায় বর্ণ বা জাতি সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উহা পরে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া জনসাধারণের উৎপীড়নের কারণ হইয়াছে। জাতি সামাজিক প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং ইহা ধর্ম হইতে পৃথক্। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক। স্বামীজীর এই মত উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, তিনি অর্থহীন সামাজিক ব্যাপারসমূহ—বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের 'আমায় ছুঁয়োনা' ভাবের এবং হিন্দুধর্ম যে ভাতের হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়াছে, এই সকলের খুব নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ভারতের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইউরোপীয়দের ন্যায় সমাজ গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

পণ্ডিত নেহেরু লিখিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন এবং তিনি তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা ও সাম্য-প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের উন্নয়নের উপর পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোর দিয়াছেন, ইহা গুণগ্রাহী পণ্ডিতজীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হইতে নিম্নলিখিত বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া এই মহাপুরুষের স্বদেশপ্রাণতা এবং জাতিগঠনমূলক ভাবের মহত্ত্ব কীর্তন করিয়াছেন: 'চিন্তায় ও কার্যে স্বাধীনতা জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টির একমাত্র উপায়। এই স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তি ও জাতি অবশ্য ধ্বংস হয়।' 'জনসাধারণই ভারতের একমাত্র আশা। উচ্চবর্ণ শারীরিক ও নৈতিক ভাবে মৃত।' 'মৈত্রী, স্বাধীনতা, কার্য ও শক্তিতে তুমি প্রতীচ্য অপেক্ষাও প্রতীচ্য হও এবং সমভাবে ধর্ম সংস্কৃতি ও প্রবৃত্তিতে যথার্থ হিন্দু হও।'

আন্তর্জাতিক মিলনের অগ্রদূত পণ্ডিত জওহরলাল স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিক ভাবের প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহও সংকীর্ণ জাতীয় ভিত্তিতে সমাধান না করিয়া এখন আন্তর্জাতিক আলোকে সমাধান করিতে হইবে। প্রত্যেকটি উচ্চ ভাব জগতে প্রসারিত এবং উচ্চ আদর্শে বিশ্বমানবের জীবন নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। কারণ, কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর ব্যক্তি বা জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া এখন বাঁচিতে পারে না। দেখা যায়, যেখানে মহত্ত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ভানে কোন ব্যক্তি ও জাতি অপর ব্যক্তি বা জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই সংকীর্ণতার ফল ভয়ানক হইয়াছে। ইহাই ভারতের অধঃপতনের কারণ। পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, স্বামীজীর এই মতের সঙ্গে তাঁহার প্রচারিত বেদান্ত-দর্শনের সামঞ্জস্য আছে।

অতঃপর পণ্ডিত নেহেরু স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তাঁহারই বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন: 'জগতে যদি কোন পাপ থাকিয়া থাকে তাহা দুর্বলতা। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর, দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।' 'আমাদের দেশ এখন চায় লৌহের ন্যায় পেশী, ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু এবং অসুরের ন্যায় সেই ইচ্ছা-শক্তি, যাহাকে কোন কিছুই প্রতিরোধ করিতে পারে না, এবং যাহা জগতের রহস্য বা গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, —যাহা যে কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম,—এমন কি সমুদ্রের তলদেশে যাইয়া যদি

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মৃত্যুকেও বরণ করিতে হয় তাহাতেও প্রস্তুত।' 'যাহাই তোমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন করে, তাহাই বিষবৎ ত্যাগ কর।' 'সেই জ্যোতির্ময় শক্তিপ্রদ উজ্জ্বল উপনিষদে ফিরিয়া যাও এবং রহস্যিক ব্যাপারসমূহ যাহা দুর্বলতা আনয়ন করে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দাও।'

পরিশেষে পণ্ডিত জওহরলাল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে নাইনিতালের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্রের নিম্নলিখিত অংশ ফুট্‌নোটে উদ্ধৃত করিয়াছেন: "উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের ও চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানব-সাধারণের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে, (কারণ তাহারা হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি) কিন্তু কর্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism) —যাহা সমগ্র মানব-জাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হিন্দুদিগের মধ্যে সার্বজনীন ভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

"পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যভাবে এই সাম্যের সমীপবর্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইস্‌লাম-ধর্মাবলম্বিগণ এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইস্‌লাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না, এই মাত্র প্রভেদ।'

"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্‌লাম-ধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি আমার মানস চক্ষে ভবিষ্যৎ সর্বাংগ-সম্পূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল অজেয় ভারতকে এই বিশৃঙ্খলতা ও বিসম্বাদের মধ্য দিয়াও বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ লইয়া অভ্যুত্থিত হইতে দেখিতে পাই।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মহান্ ভাব যে দেশগতপ্রাণ পণ্ডিত নেহেরুর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্বামীজীর স্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে এই সেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। দুঃস্থজনগণের সেবার উদ্দেশ্যে রিলিফ কার্য পরিচালনে এবং সমাজ-সেবায় এই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয়। প্রাচীন ফ্র্যান্‌সিস্‌ক্যান্ —বিশেষ করিয়া কোয়েকারদের ন্যায় ধর্মাবলম্বনে শান্ত অনাড়ম্বর ভাবে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে দুঃস্থিত মানবের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন। ভারতবর্ষ এবং ইহার বাহিরেও যেখানে বিষম বিপদ উপস্থিত হয়, সেইখানেই তাঁহারা রিলিফের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।"

শ্রীশ্রীকালী

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

(১)

যিনি সর্ব্বভূতকে 'কলন' বা গ্রাস করেন তাঁহাকে "কাল" বলে। সেই কাল-শক্তির যিনি নিয়ন্ত্রী তিনিই "কালী"। কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

কাল-নিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী। ১১।১৮

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম "কালী", ইনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

"কালী" নামের তাৎপর্য্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥ ৪।৩১

মহাকাল সর্ব্বপ্রাণীকে 'কলন' অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া উক্ত নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও কলন কর বলিয়া তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা।

"আদিভূতত্বাদ্ আদ্যা" (মহানির্ব্বাণ, ৪।৩২) এই বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব প্রসূত হইয়াছে, এই কারণে তাঁহাকে "আদ্যা" বলা হইয়া থাকে।

সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থ কালগর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মহাকালের প্রভাব অপ্রতিহত। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সাগর পর্ব্বত চরাচর সমুদয় জগৎ মহাপ্রলয়কালে রুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তনে ধূলিকণায় পরিণত হইয়া মহাব্যোমে উৎক্ষিপ্ত হয়। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে মহাকালের এই প্রলয়-তাণ্ডবের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। যে মহাশক্তি মহাকালের সর্ব্বসংহার শক্তির নিয়ন্ত্রী তিনিই "কালী"। উপনিষদের ঋষি সেই মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু (কাল) স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে।

এই মহাশক্তি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" উদ্যত বজ্রের মত অতি ভীষণ। (কঠ ২।৩।২)

মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করিয়া কালশক্তি কালীতে লীন হইয়া যায়। তখন তমোরূপিণী কালীই একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্। ৪।২৫

সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোরূপে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর।

মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ" এই তমঃই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি কালিকা।

ভগবতী গীতায় দেবী হিমালয়কে বলিয়াছেন, আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমেই স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমাকে শিব-শক্তি উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন,—

সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ।

শিবঃ প্রধানপুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম্‌॥ ৪।১০-১১

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইলে শক্তি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ শক্তি হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সকল কারণের কারণ পরম ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র,—

নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ-কারণম্‌॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪।২৬

পরব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বক সান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় শক্তি পরব্রহ্মের সত্তামাত্রেই সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। বৃক্ষসমুদয়ের পুষ্পপল্লবাদি উদ্গম বিষয়ে বসন্ত ঋতুর সান্নিধ্য যেরূপ নিমিত্তমাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। সদাশিব আদ্যাশক্তিকে বলিতেছেন,—

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্‌॥
মহানির্ব্বাণ ৪।২৯

পরাৎপরা মহাযোগিনী তুমি ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি কর, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাক।

ভগবতী গীতায় দেবী বলিয়াছেন,—

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্‌।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া।
দুর্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরম-পুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে। ৪।১২-১৩

আমি ব্রহ্মারূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি, আবার অন্তকালে স্বেচ্ছাক্রমেই মহারুদ্ররূপে জগৎ সংহার করি। হে মহামতে, আমি দুষ্ট দমনের জন্য পরম পুরুষ বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করিয়া থাকি।

(২)

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘটপটাদি বস্তুরই রূপ আছে। যাঁহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী, সূক্ষ্মা হইতেও সূক্ষ্মতরা সেই আদ্যাশক্তি মহাকালীর রূপধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সদাশিব উত্তর দিয়াছেন,—

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৫।১৪০

মহাকালজননী মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী কালিকার বস্তুতঃ কোনও রূপ নাই, তিনি অরূপা। পরন্তু সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাবহেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য্য অনুসারে তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥ ৪।১৬

তুমি উপাসকগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবদিগের সংহারের জন্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক।

চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে, দানব সংহারাদিদ্বারা দেবগণের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবী ভগবতী যখন কোন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন তখন বলা হয় যে তাঁহার উৎপত্তি হইল। বস্তুতঃ তিনি নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই।

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

জীব পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি কালিকার নিরাকার স্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। অরূপার রূপ নির্ম্মাণ করিয়াই তাঁহাকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতাঃ নরাঃ।

পরব্রহ্ম রূপাতীত ও চিন্তার অনধিগম্য। জীবগণ অরূপা পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তির স্থূলরূপ কল্পনা করিয়া উপাসনাদিমূলক কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া থাকে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ১৩।১৩

অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত গুণানুসারে ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

স্থূলরূপের সাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইয়া কেহ তাঁহার সূক্ষ্মস্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। এইজন্য পরতত্ত্বের কোনও একটি স্থূলরূপকে আশ্রয় করিয়াই সাধককে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হয়। ভগবতী গীতায় এই তথ্যটি এইভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে,—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ভবেৎ।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ ॥ ৪।১৭

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ বোধগম্য হইবে না। ঐ সূক্ষ্মরূপের দর্শনেই জীবের মোক্ষ লাভ হয়। অতএব মুক্তিপিপাসু ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূলরূপের আশ্রয় লইবে।

ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৮

ক্রিয়াযোগানুসারে যথাবিধি সেই সকল স্থূলরূপের অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে।

হিমালয় ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোমার স্থূলরূপ ত অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কোন রূপকে আশ্রয় করিলে সাধক অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিতে পারে? দেবী উত্তর করিলেন,—

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবী-মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ৪।২০

হে ভূধর! স্থূলরূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছি। সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতমা যেহেতু দেবীমূর্ত্তি আশুমুক্তিপ্রদায়িনী।

শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৪।২৯

হে মহারাজ! আমার শক্তি-মূর্ত্তি অনায়াসে মুক্তি প্রদান করে। তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আসু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
৪।২২-২৩

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুর-সুন্দরী (কমলা), ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী—এই দশ মহাবিদ্যা নরগণকে মোক্ষফল প্রদান করেন। ইঁহাদের প্রতি পরম ভক্তি করিলে অবিলম্বে মোক্ষ লাভ হয় সন্দেহ নাই। পরিশেষে দেবী পর্ব্বতরাজ হিমালয়কে বলিলেন, এই দশ মহাবিদ্যার মধ্যে যে কোন এক বিদ্যাকে ক্রিয়াযোগে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি মনবুদ্ধি অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আসামন্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪।২৪

(৩)

তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা নির্ব্বিকারা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা। ইনি আদিরূপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্য-দায়িনী। অপরাপর মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। নিরুত্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা প্রিয়ে।

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধ্যে দক্ষিণা কালী সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ।

যোগিনীতন্ত্রে শিব বলিতেছেন,—

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মতা।
যামাসাদ্য চ নির্ব্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ।
অস্যা উপাসকাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

এই কালিকা বিদ্যা মহা মহা ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা দ্বারা মহা পাপিষ্ঠও নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ কালিকার উপাসক।

কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ন হি কালীসমা বিদ্যা ন হি কালীসমং ফলম্।
ন হি কালীসমং জ্ঞানং নহি কালীসমং তপঃ॥ ৯।২১

কালীর তুল্য বিদ্যা নাই, কালীর তুল্য ফল নাই, কালীর তুল্য জ্ঞান নাই, কালীর তুল্য তপস্যাও নাই।

তন্ত্রশাস্ত্র ভূয়োভূয় বলিতেছেন, কালীর উপাসনা সর্ব্বযুগে সকল জীবকেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে; পরন্তু কলিযুগে পরাপ্রকৃতি কালীই বিশেষভাবে জাগ্রতা, তাঁহার উপাসনাতেই জীবগণ শীঘ্র সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়।

কুব্জিকা-তন্ত্র বলেন, "কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্র-ফলপ্রদা" মোক্ষদায়িনী কালিকার উপাসনাই কলিযুগে শীঘ্র ফলপ্রদান করে। পিচ্ছিলা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যদেব কলৌ যুগে" কলিযুগে কালীই একমাত্র আরাধ্য, কলিযুগে অপর কেহ আরাধ্য নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন,—

শ্রীআদ্যা-কালিকা-মন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ॥ ৭।৮৬

আদ্যা কালিকার মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধি প্রদান করে, বিশেষতঃ কলিযুগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কালিকার উপাসনা দ্বারা সাধক ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। কালীতন্ত্রে ভৈরব বলিতেছেন,—

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বলং পুষ্টিং মহদ্ যশঃ।
কবিত্বং ভুক্তি-মুক্তী চ কালিকা-পাদ-পূজনাৎ॥ ১১।১০

সাধক কালিকার পদ পূজা করিয়া আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বল, পুষ্টি, বিপুল কীর্ত্তি, কবিত্ব শক্তি, ভোগ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

সর্ব্ব-প্রাণি-হিতকরং ভোগ-মোক্ষৈক-কারণম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু-সিদ্ধিদম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৭।৫

পরা প্রকৃতি কালীর সাধনা সমুদয় প্রাণিগণের হিতকর এবং ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণ এই সাধনা দ্বারাই সত্বর সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়।

কালীর অর্চ্চনাকারী সাধক কিরূপ ভাগ্যবান্ এবং ঐ অর্চ্চনা দ্বারা তিনি কি প্রকার ঋদ্ধি লাভ করেন, কালিকাতন্ত্রে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "যিনি দেবীর সম্যক্ অর্চ্চনা করেন, তাঁহার মুখে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ বিরাজিত। কালীসাধক ধনে কুবেরতুল্য, তেজে সূর্য্য-সদৃশ এবং বলে বায়ুতুল্য হইয়া থাকেন। কালীসাধক সঙ্গীতে তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বতুল্য, দানে কর্ণসদৃশ এবং জ্ঞানে দত্তাত্রেয়তুল্য হইয়া থাকেন। যে সাধক দেবী কালিকার সম্যক্ অর্চ্চনা করেন তিনি শত্রুনাশে বহ্নিতুল্য, মলিনতা নাশে গঙ্গাতুল্য, পবিত্রতায় অগ্নিতুল্য এবং চন্দ্রের ন্যায় সুখদায়ক হন। তিনি যমতুল্য শাসনকারী, কালের মত দুর্ব্বার গতি, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং বজ্রের মত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকেন। তিনি বৃহস্পতির মত বাগ্মী, পৃথিবীর মত সহিষ্ণু এবং রমণীগণের নিকট কন্দর্পতুল্য বিবেচিত হইয়া থাকেন। (নবম পটল, ১৩-১৯)

স এব সুকৃতী লোকে স এব কুল-নন্দনঃ।
ধন্যা চ জননী তস্য যেন দেবী সমর্চ্চিতা॥ ঐ ৯।১২

যে সাধক দেবী কালিকার সম্যক্ অর্চ্চনা করেন, তিনিই এই সংসারে সুকৃতী, তিনিই বংশের গৌরবস্বরূপ, তাঁহার জননী ধন্যা।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যা-প্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ৭।৮৯

আদ্যা কালিকার অনুগ্রহে সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী নর যে জীবন্মুক্ত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বন্দ্ব
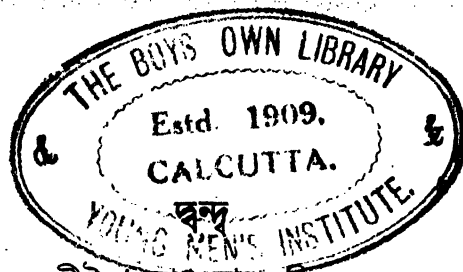
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ

কেউ বলে শাদা ধবধবে ভালো
সোনালি রঙের চুলটা,
শ্যামচিক্কণ ভালো বলে কেহ
মেঘরঙা কেশ—উল্টা।
কভু অবতার গৌরচন্দ্র
কভু নবঘন মূর্ত্তি,
কভু ভালো লাগে নির্জ্জনবাস
কখনো রঙ্গ ফূর্ত্তি।
কভু মনে হয় ঝালে ঝোলে খাই
কভু সে পায়েস পিষ্ট,
কভু খুঁজে মরি সোডাওয়াটার,
তেঁতুল চাটনি মিষ্ট।
চা'য়ের বাটিতে পুরি কাট্‌লেট
হ'য়ে উঠি কভু দৃপ্ত,
গরমে বাঁচি না ছটফট করি
ঘোল খেয়ে হই তৃপ্ত!
যাত্রীর ভিড়ে দলা হয়ে যাই,
একা পথে যেতে শঙ্কা,
কভু মনে হয় ঘরে থাকা ভালো
কভু যেতে চাই লঙ্কা!

কভু ঋণ করে ঘৃত পান করি,
সাধু পথে থাকি অন্ত,
বিনা লেখাপড়ি গাড়িঘোড়া চড়ি,
কালাবাজারেতে মস্ত।
'প্রবাসী না হ'লে সুখী তারে বলে'
মহাভারতের পাল্টা,
কভু ফিরে চাই ফিন্‌ল্যাণ্ডে যাই
হনলুলু যাই মাল্টা।

কেহ বলে হরি কাশীতে আছেন,
গয়াপীঠে দাও পিণ্ড,
কেউ বলে আমি চাহি না মোক্ষ,
ক্ষুধায় অন্ন দিন্ ত!
কেউ বলে দেখো 'কায়েদে আজম,'
কেহ বলে দেখো গান্ধী,
কেহ বলে, দেহ ভারত ছাড়িয়া,
কেউ বলে, রাখো বান্ধি'।
কেহ বলে যীশু প্রেম-অবতার,
কেউ বলে বুড় বুদ্ধ,
কেহ বলে খোদা হাফিজ আছেন,
কারো নারায়ণ শুদ্ধ!

কারো মতে যেতে ভেস্তের পথে
ছুরিকা হইবে সঙ্গী,
কাহারো স্বর্গ দেশের মাটিতে,
কেউ বলে-'ওটা ভঙ্গি'!
মন্দিরে নহে মস্‌জিদে নহে
গির্জ্জায় নহে ধর্ম্ম,
বুকে বুকে আছে ধর্ম্মের ঠাঁই
দেশের মাটিতে কর্ম্ম।
কারো বুকে লেখা টাকা-রাম নাম,
নারীরূপে কেহ মগ্ন,
দেশের নিমাই গেছে সন্ন্যাসে—
'দেশ' 'দেশ' শুধু স্বপ্ন!
কেহ নাচিতেছে আহ্লাদে মাতি,
মোদের কপাল মন্দ,
টুটিল না বাধা, খুলিল না দ্বার,
ঘুচিল না হরি দ্বন্দ্ব।

অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে কি না? *

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন)

('প্রবুদ্ধ ভারত' হইতে গৃহীত)

প্র:—যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া উচিত কি না?

উ:—নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া অনায়াসে যাইতে পারে এবং করা উচিত। তাহা না হইলে, দিন দিন আমাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন, যখন মুসলমানগণ ভারতে আসেন, তখন হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এখন হিন্দুর সংখ্যা বিশ কোটি মাত্র। আবার কেহ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হয়, শুধু তাহাই নহে, সে হিন্দুসমাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আবার অনেকে কেবল তরবারির চোটে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান হইয়াছে। তাহাদের সন্তানসন্ততিই এক্ষণে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দু না করিবার কারণ কি? আর যাহারা স্বাভাবিক হিন্দুসমাজের বহির্ভূত, তাহাদের অনেককে প্রাচীন কালে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখনও এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতর গ্রহণ করার ব্যাপার চলিয়াছে। শুধু অসভ্যজাতি, ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য জাতি এবং মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত-আক্রমণকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ই যে এইরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে, পুরাণে যে সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ অহিন্দুজাতি হইতে গৃহীত, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে গেলে অবশ্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহারা কেবল তরবারির বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, (যেমন কাশ্মীর ও নেপালে দেখা যায়) অথবা যে সকল বিধর্ম্মিগণ হিন্দু হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা বিহিত নহে।

প্র:—কিন্তু স্বামিজী, ইহারা কোন্ জাতির অন্তর্গত হইবে? অবশ্য তাহাদের কোন জাতির অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে তাহারা অবশ্য হিন্দুদের সহিত মিশিতে পারিবে না।

উ:—স্বধর্ম্মত্যাগীরা পুনর্ব্বার গৃহীত হইলে, অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিতে যাইবে। আর নূতন যাহারা আসিবে, তাহারা নিজেদের জাতি নিজেরাই গঠন করিবে। বৈষ্ণবেরা ইহা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে এবং হিন্দু-বহির্ভূত জাতি হইতেও অনেকে আসিয়া এই বৈষ্ণবজাতি গঠন করিয়াছে—আর ইহাদের, সমাজে বেশ একটু প্রতিপত্তিও আছে। রামানুজাচার্য্য হইতে চৈতন্য-দেব পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ করিয়াছেন।

প্র:—ইহারা কোথায় বিবাহ করিবে?

উ:—অবশ্য এখন যেমন করিয়া থাকে, নিজেদের মধ্যে।

প্র:—যাহারা বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে কি নূতন জাতিগত নাম দিতে হইবে?

উ:—হাঁ, নামে যথেষ্ট কাজ হয় বৈ কি।

প্র:—উহারা কি হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ ভাবের ভিতর হইতে কোন ভাব নিজেরা বাছিয়া লইবে, না, আপনি তাহাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবের উপদেশ দিবেন?

উ:—এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? উহারা আপনারাই আপনাদের উপযোগী ধর্ম্ম বাছিয়া লইবে। তাহা না হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল ভাবেরই উপর আঘাত করা হইবে। হিন্দুধর্ম্মে যে যেরূপ ইচ্ছা, ইষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে।

* ১৩০৯ সনের ১লা আশ্বিন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত।—উ: স:
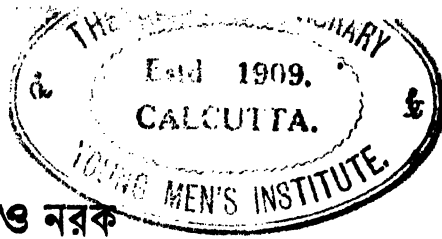
স্বর্গ ও নরক

অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য (বিশ্বভারতী)

পৃথিবীর সকল জাতি এবং সম্প্রদায়ের ভিতরই স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিমত দেখা যায়। ধর্ম্মের আলোচনায় স্বর্গ-নরকের কল্পনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কল্পনার তথ্যাতথ্য বিচার করা অসম্ভব। শাস্ত্র বা অনুশাসনকে বিশ্বাস না করিলে আর কিছুই বলিবার থাকে না। বিচার্য্য বিষয় যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়, তবে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস বা অনুভব তিনি সেই রূপই মনে করিয়া থাকেন। স্বর্গ ও নরকের কল্পনা মানব-জাতির চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। ভাল কাজ করিলে পুণ্য হইবে এবং খারাপ কাজ করিলে পাপ হইবে, পুণ্যের ফলে স্বর্গভোগ এবং পাপের ফলে নরক-যন্ত্রণা, এই ভাবের কতকগুলি ধারণার সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় থাকায় সংসারে পারস্পরিক ব্যবহার এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। পাপ-পুণ্যের ধারণা এবং তাহার মানদণ্ড যেখানে যত শিথিল সেখানেই অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, মারামারি, হানাহানি প্রভৃতির অবাধ গতি।

অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের ধারণা সমধিক দৃঢ় ও বদ্ধমূল। হিন্দুর উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ ও আখ্যায়িকা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ও জন্মান্তরবাদ পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। ভাল কাজের ফল পুণ্য বা শুভ অদৃষ্ট, খারাপ কাজের ফল পাপ বা অশুভ অদৃষ্ট। শুভ অদৃষ্টের ফল স্বর্গভোগ, অশুভের ফল নরকভোগ। কর্ম্মফলের আংশিক ভোগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ, তারপর কর্ম্মানুষ্ঠান, কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যু। কর্ম্ম, ফলভোগ ও জন্মমৃত্যু গাড়ীর চাকার ন্যায় চলিতেছে। মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমান গতিতে চলিতে থাকিবে। এই গতানুগতিকতা হইতে কেহই অব্যাহতি পান না। ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মহাজ্ঞানী পণ্ডিত পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন। এই বিষয়ে হিন্দুর সকল শাস্ত্রের একই সিদ্ধান্ত। নিরক্ষর গ্রাম্য চাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বেদবেদান্তের অধ্যাপক পর্য্যন্ত এই ধারণা একই ভাবে পোষণ করিয়া থাকেন। যুক্তিতর্কে অনভিজ্ঞ সরলবিশ্বাসী নিরক্ষর সম্প্রদায়ের ভিতর এই সকল ধারণা অতিমাত্রায় সুদৃঢ়। কর্ম্মফল ও জন্মান্তরে বিশ্বাস শোকদুঃখে সান্ত্বনালাভের প্রধান উপায়, ইহা সকল সংসারী ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

খৃষ্টান ও মুসলমানগণের অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কল্পনায় মন সায় দেয় না। একবার যে ব্যক্তি নরকে ডুবিয়াছে তাহার আর উদ্ধার পাইবার পথ নাই, ইহা অতিশয় নিষ্ঠুর কল্পনা।

যম-রাজার কেরাণী চিত্রগুপ্তের খাতায় প্রত্যেক প্রাণীর কাজের হিসাব, মৃত্যুর পর যমরাজ কর্ত্তৃক সেই খাতার লিখিত ফল অনুসারে স্বর্গে বা নরকে প্রেরণ, স্বর্গপুরীতে ইন্দ্রের দেবসভা, সাধু-পুরুষদের সম্মিলন, অপ্সরাদের নাচগান, অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য, নন্দনকাননস্থ কল্পপাদপের কামনা পূরণের সামর্থ্য, নরকের প্রজ্বলিত তৈল-কটাহ, ক্রিমিকুণ্ড, অমেধ্য বস্তুর পূতিগন্ধ এই সকল বর্ণনার সহিত প্রত্যেক হিন্দুরই অল্পাধিক পরিচয় আছে।

পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায়, স্বর্গপুরী মর্ত্ত্যলোকের উর্দ্ধতন দেশবিশেষ এবং নরক স্বর্গেরই নিকটস্থ অথবা মর্ত্ত্যলোকের অধস্তন দেশবিশেষ। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই সকল দেশ বা লোকের কল্পনা টিকিতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় বর্ণনায় এই কল্পনাও বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। মর্ত্ত্যলোকের অপর নাম ভূর্লোক। ভূর্লোকের উপরে ক্রমশঃ ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্য-লোক বিদ্যমান। ভূর্লোকের নিম্নস্তরে ক্রমশঃ অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সাতটি লোক অবস্থিত। সর্ব্বশুদ্ধ লোকের সংখ্যা চৌদ্দ; এই কারণে বলা হয় 'চতুর্দ্দশ ভুবন'। স্বর্গ, মর্ত্ত্য (ভূর্লোক) ও রসাতল এই তিন লোককে বলা হয় 'ত্রিভুবন'। আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বেদান্তসিদ্ধান্ত।

মর্ত্ত্যলোক আংশিকভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় কিন্তু স্বর্গ ও রসাতল আমাদের নিকট চিরকাল পৌরাণিক বর্ণনারই বিষয়। বঙ্গভাষায় রসাতল এবং পাতালের মধ্যে কোন প্রভেদ মানা হয় না। ত্রিলোক ছাড়া অপর এগারটি লোক সম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে বিশেষ কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। স্বর্গলোক দেবতাদিগের বাসভূমি, আভিধানিকগণ স্বর্গকেই ত্রিদশালয় বলিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যলোক প্রাণিগণের কর্ম্মভূমি এবং স্বর্গলোক ভোগভূমি। স্বর্গ হইতে পতনের পরে মনুষ্যযোনিতেই জন্ম হইয়া থাকে এবং একটি জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত হয়। এই সকল অভিমত পৌরাণিক। স্বর্গলোক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও স্বর্গের সহিত আমাদের অস্পষ্ট পরিচয় কম নহে। আমরা মৃতব্যক্তির নামের আগে চন্দ্রবিন্দু (৺) ব্যবহার করি; ইহা ঈশ্বর এবং স্বর্গের প্রতীক। উচ্চারণ-কালে বলি, স্বর্গীয় অমুক বা ঈশ্বর অমুক। মৃত পূর্ব্বপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় আমরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি। তাঁহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছেন এই কল্পনা এবং বিশ্বাস আমাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। হিন্দুদের অধিকাংশ কাম্য ব্রত-পূজার উদ্দেশ্য স্বর্গপ্রাপ্তি। রামায়ণ এবং মহা-ভারতের আলোচনাতেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, শিশুকাল হইতেই হিন্দুসন্তানের মনে স্বর্গের উজ্জ্বল ছবি ভাসিয়া উঠে।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্বশরীরে স্বর্গারোহণের কথা সকলেই জানেন। মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনায় জানা যায়, হিমালয়ের উত্তরে মেরু পর্ব্বত অবস্থিত; তাহারই সর্ব্বোচ্চ প্রদেশের নাম স্বর্গলোক। স্বর্গলোক দেবতাদের বাসভূমি। অন্যান্য পৌরাণিক বর্ণনায়ও ভূর্লোকের উর্দ্ধতন লোকবিশেষকে দেবতা ও পুণ্যাত্মাগণের লীলা-নিকেতনরূপ স্বর্গ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই রক্তমাংসের শরীর লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাগণ স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। সেখানে দিব্যবস্তুসমূহ তাঁহাদের উপভোগ্য। ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ভৌতিক শরীরের সহিত জীবের যোগ হয়, ইহাই জন্ম।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। গীতা ৯।২১

বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যটীকায় (২।১২) বলিয়াছেন, স্বর্গ ও নরক ভোগ করিবার নিমিত্ত অপর দেহের প্রয়োজন, ভৌতিক দেহে সেই সুখ এবং সেই দুঃখ ভোগ করা চলে না। 'জন্মান্তরে শুভ ফল ভোগ করিব' এই আশায় পুণ্যজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীব দেহত্যাগের পর ভোগোপযোগী দেহধারণ করিয়া স্বর্গ ভোগ করে। কামক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় অসাধু কর্ম্ম করিলে মৃত্যুর পর নরক নামক স্থানবিশেষে ভোগোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা

ভোগ করে। কর্ম্মফলের আংশিক ভোগ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে দেহ ধারণ করা সকল জীবের পক্ষেই অপরিহার্য্য। আপন আপন কৃত কর্ম্ম ও উপার্জ্জিত জ্ঞান অনুসারে কোনও কোনও আত্মা শরীর গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাণিগর্ভে প্রবেশ করে, কেহ কেহ স্থাবরত্বাদি প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে এই কথা বলা হইয়াছে—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।

স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠ ২।২।৭

স্বর্গলোকে জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, জীব সেখানে শুধু আনন্দই ভোগ করিয়া থাকে। কঠোপনিষদে নচিকেতার উক্তি হইতে ইহা জানা যাইতেছে—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি

ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বাশনায়া পিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ কঠ ১।১।১২

এই সকল আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে, স্বর্গ সুখভোগ করিবার উপযোগী লোকবিশেষ এবং নরক দুঃখভোগের উপযোগী লোকবিশেষ। স্থানবিশেষকে যাঁহারা নরক বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে (২৭, ২৮ অ) ছিয়াশী প্রকার নরকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সংসার-তাপদগ্ধ মানুষের পক্ষে আশার কথা এই যে, নিরন্তর দুঃখস্বরূপ নরকের কল্পনা হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। নরকভোগের পর পাপী পাপ-মুক্ত হইয়া পুনরায় নবতর জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইতেছে—স্বর্গ ও নরকনামে কোন লোক বা স্থানবিশেষ নাই; এই মর্ত্ত্য-লোকই অবস্থাবিশেষে স্বর্গ এবং অবস্থাবিশেষে নরক হইয়া থাকে। মনের প্রীতিকর বিষয়ই স্বর্গ আর অপ্রীতিকর বিষয়ই নরক। সেই সকল বিষয়ের ভোগই স্বর্গভোগ ও নরকভোগ। ইহ-লোকেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কোন কোন গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তের মূলে প্রাচীন একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ইহৈব নরকস্বর্গাবিতি মাতঃ প্রচক্ষতে।

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

হে মাতঃ, ইহলোকেই স্বর্গ ও নরক ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। মনের প্রীতিকর বিষয়ই স্বর্গ এবং অপ্রীতিকর বিষয়ই নরক। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষও বলিয়াছেন স্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ কোন স্থান নাই। যে বিষয়ে যাহার অনুরাগ থাকে সেই বিষয়ই তাহার পক্ষে স্বর্গ।

স্বর্ন কাচিদথবাস্তি নিরূঢ়া

সৈব সা চলতি যত্র হি চিত্তম্। নৈষধীয়চরিত ৫।৫৭

তৃতীয় অভিমত হইতেছে—দুঃখসংস্পর্শশূন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের নাম স্বর্গ। সেই অনাবিল অনন্ত সুখভোগের নামই স্বর্গভোগ। সংসারে সুখ ও দুঃখ পরস্পর জড়িত। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সুখ ও দুঃখ রথচক্রের ন্যায় গতিশীল, কিন্তু যে সুখের পর দুঃখ নাই, নিরন্তর সুখই চলিতেছে, সেই সুখই স্বর্গ। উপভোক্তার ইচ্ছামাত্র সেই সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহা সকলেরই কাম্য। এই প্রকার স্বর্গ সম্বন্ধে প্রাচীনগণের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ আছে—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।

অভিলাষোপনীতং যত্তৎসুখং স্বঃ-পদাস্পদম্॥

চিন্তা করিলে বুঝা যায়, অবিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ স্বর্গ এবং কোন কোন দার্শনিকের মুক্তিপদার্থ একই। যে সকল দার্শনিক মুক্তিকে নিত্য আনন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বর্ণিত মুক্তি ও উল্লিখিত সুখের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। এই প্রকার স্বর্গ সাময়িক এবং ক্ষয়শীল নহে; ইহা ব্রহ্মাস্বাদ হইতে অভিন্ন। নিত্যসুখস্বরূপ স্বর্গ হইতে সিদ্ধ জীবের কখনও পতন হয় না—

ন স পুনরাবর্ত্ততে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদান্ত-দর্শন

৺স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব এবং উহাতে আছে কি ইহা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে বেদান্তদর্শনের প্রাচীনত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

এজন্য কাশী রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ মহাশয় কাশী ললিতাঘাট অচ্যুত কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্কর ভাষ্যাদি গ্রন্থে হিন্দি ভাষায় একটী উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; তাঁহার অনুমতি অনুসারে উহার বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। এরূপ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা আর দেখা যায় না। এসকল কথা বঙ্গভাষাতেও প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ভূমিকাটী লিখিত বলিয়া পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত অনেক ঐতিহাসিক কথা তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ইহা অনুভব করিয়া কবিরাজ মহাশয় আবশ্যক-মত ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁহার অবসর না থাকায় আমরাই যথাসাধ্য সেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এজন্য তাঁহার প্রবন্ধটীর সমুদয়ই ইহাতে অনুবাদ করিয়া আমাদের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম আমরা পরিবর্ধনই করিয়াছি, পরিবর্তন করি নাই।

এক্ষণে আমরা প্রথমে দেখিব যে ব্রহ্ম-সূত্রকার বাদরায়ণই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কি না।

ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস

বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এবং পুরাণাদির সাহায্যে জানা যায় "কৃষ্ণ" নামক বাদরায়ণ ব্যাসই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা। দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণ নামে দ্বৈপায়ন বিশেষণটী সংযুক্ত করা হইয়াছে। এজন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ব্যাসেরই নামান্তর।

কিন্তু ইদানীং অনেক পাশ্চাত্য ও কতিপয় প্রাচ্য পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিতেছেন। তন্মতে একটী কারণ, সূত্র মধ্যে বাদরায়ণ মতের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থকার কখনও নিজ নাম দিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না। তাদৃশ সূত্র যথা—১।৩।২৬, ১।৩।৩৩, ৩।২।৪১, ৩।৪।৮, ৩।৪।১৯, ৪।৩।১৫, ৪।৪।৭ এবং ৪।৪।১২, ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, বাদরায়ণকে ব্যাস বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তিনিই যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, এবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং এইরূপ আপত্তি হইলে বিচার্য বিষয়—(১) বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রকার কিনা এবং (২) বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিনা?

প্রথম বিচার্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহর্ষি পাণিনির সূত্রমধ্যে ভিক্ষুসূত্রকার একজন পারাশর্যের যে উল্লেখ দেখা যায়, তিনি কোন পারাশর্য ছিলেন? তিনি ভিক্ষুসূত্রকার পারাশর্য কিনা? ভিক্ষু শব্দটী সন্ন্যাসী শব্দের পর্যায়বাচক মাত্র। সুতরাং ইহা অনুমান করিতে পারা যায় যে, পাণিনিকথিত ভিক্ষুসূত্রটী সন্ন্যাসিগণের পঠন-যোগ্য উপনিষদাদিকে ভিত্তি করিয়া রচিত গ্রন্থ-বিশেষ। যদি এইরূপ কল্পনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুসূত্র, বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র হইতে

পৃথক্ গ্রন্থ হইতে পারে না। পারাশর্য শব্দে পরাশরের পুত্র বুঝায়। অতএব পরাশরপুত্র ব্যাস রচিত একখানি ভিক্ষুসূত্র অতি প্রাচীন কালেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বুঝা যায়। ভগবান্ পাণিনির সূত্রে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে পাণিনি ঐ গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন। বর্তমান কালে যে ব্রহ্মসূত্র প্রচলিত আছে তাহাও বাদরায়ণ ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রচলিত গ্রন্থখানি প্রাচীন ভিক্ষু-সূত্র হইতে অভিন্ন অথবা সেই সম্প্রদায়ের কোনও নবীন গ্রন্থ ইহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। তবে এবিষয়ে ইহাই বলা যায় যে, কোনও প্রবল বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কেবল কল্পনা বলে একাধিক বেদান্ত সূত্রকার ব্যাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব বলা যায় পারাশর্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নই ব্রহ্মসূত্রকার। আর ব্রহ্মসূত্রের সাম্প্রদায়িক মত- বর্ণনপ্রসঙ্গে সূত্রকারের নিজ নিজ মতের বিশেষত্ব মাত্র উল্লেখ করিবার জন্য সূত্রমধ্যে নিজ নাম উক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে বলিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বাদরায়ণ এবং তিনিই ব্রহ্মসূত্রকার বলিতে কোন. বাধা হয় না।

ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনত্ব

অধ্যাপক জ্যাকোবি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে, প্রচলিত বেদান্তসূত্র-খানি অন্যান্য দর্শনের সূত্রগ্রন্থের পরবর্তী কালে রচিত। কারণ বেদান্তসূত্রের ২য় অধ্যায় ২য় পাদে খণ্ডনার্থ যতগুলি পূর্বপক্ষাত্মক দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে ঐগুলি সবই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। সাংখ্য, সাংখ্যানুগত যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, আর্হত, পাঞ্চরাত্র ও পাশুপত-মতগুলি তৎ তৎ মতে প্রবাহরূপে প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে উহারা অত্যন্ত প্রাচীন নহে। কেন না অতি প্রাচীন সাংখ্যমতের খণ্ডন বেদান্তসূত্রে করা হইয়াছে এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকায় সাংখ্যদর্শনের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই খণ্ডন বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়। আসুরি, পঞ্চশিখ, জৈগীষব্য, বার্ষগণ্য, জনক ও পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ সাংখ্যশাস্ত্রে পারংগত হইয়া জগতে উহার প্রচার করিয়াছিলেন। বোঢ়ু ও সনন্দন প্রমুখ আচার্যগণ সম্বন্ধেও ঐরূপই প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চশিখাচার্যের প্রাচীন ষষ্টীতন্ত্র নামক গ্রন্থপ্রতিপাদ্য জ্ঞান ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকোপদিষ্ট জ্ঞান হইতে সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন নহে। মহাভারত শান্তিপর্ব, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থেও কোনও কোনও স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণিত আছে। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে বেদান্তদর্শনের প্রাচীন সাংখ্যমত খণ্ডিত হয় নাই, এজন্য দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে বেদান্তদর্শন প্রাচীন নহে, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে বলা যায় যে ইদানীন্তন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের উক্ত কল্পনা সমীচীন মনে হয় না। কারণ—(১) ব্রহ্মসূত্রে অতি প্রাচীন ঋষিগণ ব্যতীত অর্বাচীন কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, বা তদ্রূপ কোনও দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপনকর্তা কোনও আচার্যের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্র প্রাচীন ইহাই এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাহার পর ব্রহ্মসূত্রে যে সাংখ্যমত নিরস্ত হইয়াছে, তাহাও অতি প্রাচীনকালের সাংখ্যমত হইতে কোন বাধা নাই। বস্তুতঃ সাংখ্যমতের মধ্যে নানা মতভেদের কথা যত মহাভারত শান্তি-পর্বে আছে তত আর কোথাও নাই। আর মহাভারতের কথার প্রামাণ্য অপেক্ষা অন্য কোন গ্রন্থের কথার প্রামাণ্য যে অধিক হইতে পারে

না তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই মহাভারতে শান্তিপর্ব মধ্যে ৯টী কথোপকথন প্রসঙ্গে প্রায় ৩৬টী অধ্যায়ে সাংখ্য মতের কথা আছে। কোথাও বশিষ্ঠ বক্তা, কোথাও জনক বক্তা, কোথাও পঞ্চশিখ বক্তা, কোথাও কপিল বক্তা ইত্যাদি নয় জনের মুখ দিয়া সাংখ্যমত প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মার বহুত্ব ও একত্ব উভয় কথাই দেখা যায়। কিন্তু সাংখ্যমত-প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্র-মধ্যে আত্মার নানাত্ব কোথাও কথিত হয় নাই। অথচ সাংখ্যকারিকা মধ্যে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য সূত্রকার ব্যাস যে সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সাংখ্য-কারিকার সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে নহে। সাংখ্য-কারিকার রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণের কত পূর্বে পঞ্চ-শিখ তাহাও কোথাও কথিত হয় নাই। মহা-ভারতে পঞ্চশিখের নাম আছে, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম নাই। এজন্য ব্যাস যে সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা প্রাচীন সাংখ্যমত বলিয়াই বোধ হয়। তবে একটী কথা এই যে শঙ্করাচার্য সাংখ্যকারিকার বচন ভাষ্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য শাঙ্করভাষ্য যদি ব্যাসাভিমত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে ব্যাস সাংখ্যকারিকার মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিতে হয়। কিন্তু একথার উত্তর এই যে শঙ্করাচার্যের সময় যে সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহার সঙ্গে যে অংশে ব্যাসের খণ্ডিত সাংখ্যমতের ঐক্য ছিল সেই অংশের প্রমাণের জন্য শঙ্করাচার্য সাংখ্যকারিকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিলে কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্যের সময় কোন সাংখ্যমতের প্রাচীন গ্রন্থ ছিল না। সাংখ্য সূত্রনামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যে খণ্ডিত ছিল তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা শঙ্করাচার্য বা বাচস্পতি মিশ্র বা গৌড়পাদাচার্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন আচার্যের অজ্ঞাত ছিল। যে পঞ্চশিখের ষষ্ঠীতন্ত্র ঈশ্বরকৃষ্ণ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন বলিয়াছেন, সেই ষষ্ঠীতন্ত্রের সত্তা শঙ্করাচার্য উপলব্ধি করেন নাই। আর কোন প্রাচীন গ্রন্থেও দেখা যায় না। যে পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের ১০।১৫টী বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায় সেই ব্যাসভাষ্য নানা কারণে শঙ্করের পরবর্তী কালে এবং বাচস্পতি-মিশ্রের পূর্বকালে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, শঙ্কর বা তাঁহার পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ব্যাসভাষ্যের কথা দেখা যায় না। এই সব কারণে ব্যাস যে সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা প্রাচীন সাংখ্যমত, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যমত নহে। বস্তুতঃ কপিল, পুরাণমধ্যে একুশ জন দেখা যায়। তন্মধ্যে তিনজন কপিল সাংখ্যমতের বক্তা। অতএব ডাঃ জ্যাকোবির কথা সঙ্গত হইতে পারে না।

এইরূপ ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত যাহা ব্রহ্মসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে তাহাও প্রচলিত গৌতম বা কণাদসূত্র প্রতিপাদিত নহে। কারণ, ইহার আভাস ব্রহ্মসূত্রের ২।২ পাদোক্ত তত্তৎ মত খণ্ডনে দেখা যায়। এই ন্যায়বৈশেষিকের কথায় ভাষ্যের টীকাকারগণ বৈশেষিকের প্রাচীন ভাষ্য রাবণ-ভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মপাদের পঞ্চ-পাদিকা গ্রন্থেও ন্যায়বৈশেষিকের প্রাচীন সিদ্ধান্তের কথা আছে। অতএব বর্তমান ন্যায়-বৈশেষিক দেখিয়া এবং তাহার কথা ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আছে দেখিয়া তাহাকে জ্যাকোবি সাহেব যে আধুনিক বলেন তাহা সঙ্গত নহে।

আবার বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের খণ্ডন ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া গেলেও ঐগুলি যে জ্যাকোবির মতে অত্যন্ত অর্বাচীন ঐতিহাসিক বৌদ্ধমতবিশেষ এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের সর্বাস্তি-বাদের সিদ্ধান্ত বীজাকারে কথাবত্থু প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও পাওয়া যায়। যোগাচার সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা বোধিসত্ব মৈত্রেয়নাথ এবং

যোগাচার্য অসঙ্গের পূর্বেও বিজ্ঞানবাদ বিদ্যমান ছিল। ইহা লঙ্কাবতারসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা যায়। অধিকন্তু পালি সাহিত্যেও উহার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। মাধ্যমিক মত নাগার্জুনের কালে তাঁহার গ্রন্থে এবং আর্যদেব, ধর্মত্রাত, ভব্য প্রভৃতির গ্রন্থে বর্ণিত আছে ইহা সত্য, পরন্তু শূন্যবাদ নাগার্জুনের পূর্বে অশ্বঘোষের গ্রন্থেই কেবল নহে লঙ্কাবতার সূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। প্রাচীন উপনিষৎ প্রভৃতিতেও সূক্ষ্মরূপে এই সিদ্ধান্তগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রমধ্যে উক্ত বৌদ্ধমতের খণ্ডন দেখিয়া তাহাকে প্রচলিত বৌদ্ধমতের পরবর্তী বলা যায় না। তাহার পর বৌদ্ধমতের নবীন প্রাচীন বিভাগ বৌদ্ধ এবং বৈদিক গ্রন্থাদি হইতেই পাওয়া যায়। কারণ—প্রথমতঃ বৌদ্ধগ্রন্থেই এই ভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—বৌদ্ধগণই স্বীকার করেন—২৪ জন বুদ্ধের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ২৩শ ব্যক্তি। ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ আসিবেন। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে একশত বুদ্ধের কথা আছে, ইত্যাদি। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ আগম লঙ্কাবতারসূত্র নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আদি বুদ্ধের নাম বিরজ বুদ্ধ। তিনি রাবণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই লঙ্কাবতারসূত্র। এই বিরজ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাতে যে বৌদ্ধমত আছে তাহাতে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট। ইহাতেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে কলিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই রাবণ ত্রেতাযুগের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আধুনিক অনেক পণ্ডিত বলেন লঙ্কাবতারসূত্রের কথা খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পূর্বে গ্রন্থে দেখা যায় না বলিয়া ইহাকে ত্রেতাযুগের গ্রন্থ বলা সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু কোন কিছুর উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহার অভাব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কোন প্রাচীন কথার অর্বাচীনতা, যদি কোন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবেই তাহার অর্বাচীনতা স্বীকার্য। ভবিষ্যদ্বাণী দেখিয়া তাহাকে অর্বাচীন বলিলে ভাগবত, মহাভারতও অর্বাচীন হয়। তাহার পর বৈদিক গ্রন্থেও বৌদ্ধমতের প্রাচীন নবীন বিভাগ যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় যাগযজ্ঞাদির প্রভাবে যখন দেবতাগণকে রাক্ষসগণ ভৃত্যকর্মে বাধ্য করিতেছিলেন তখন দেবতাগণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে মায়ামোহ নামক এক পুরুষকে উৎপাদন করিয়া কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও নির্বাণপ্রাপ্তির প্রশংসা প্রচার করিতে বলেন। ইহাতে মায়ামোহ বিজ্ঞান ও শূন্যতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন দেখা যায়। শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় বৌদ্ধ ও জৈন মতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ত্রেতাযুগে রাবণ লঙ্কাবতারসূত্রে বিরজ নামক প্রথম বুদ্ধ বৌদ্ধমতের উপদেশ দিতেছেন। অতএব বৌদ্ধ ও বৈদিক উভয় মতেই গৌতম বুদ্ধের পূর্বতন বৌদ্ধমত যে একটা ছিল, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

তাহার পর "ব্রহ্মসূত্রের" আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪ সূত্রে ভাষ্যকার প্রথমে আকাশের বস্তুতা সম্বন্ধে বেদপ্রমাণ দিয়াছেন, তৎপরে যুক্তি-প্রমাণ দিয়াছেন, তৎপরে সুগত বুদ্ধের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আকাশের বস্তুতা সিদ্ধ করিতেছেন দেখা যায়। এতদ্দ্বারাও সিদ্ধ হয় বৌদ্ধমতের প্রাচীন নবীন বিভাগ খুবই সঙ্গত। আর এই সব কারণে জ্যাকোবি সাহেবের কল্পনা সঙ্গত নহে। প্রাচীন বৌদ্ধমতে আকাশ অবস্তু, বেদব্যাস তাহা খণ্ডন করিয়া আকাশকে বস্তু বলিলেন, আর তজ্জন্য সুগত বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ দিলেন। সুতরাং সুগত বুদ্ধের মত ও নবীন বৌদ্ধমত অভিন্ন হইল না। প্রাচীন বৌদ্ধমতে শূন্য অসদ্বস্তু, নবীন বৌদ্ধমতে তাহা অসদ্বস্তু নহে, তাহা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত বস্তু।

তাহার পর প্রাচীন বৌদ্ধমতে বেদের "নিমিষ শাখায়" বুদ্ধের কথা আছে স্বীকার করায় তাঁহার

বেদও মানিতেন বলা যায়। নবীন বৌদ্ধমতে বেদের প্রামাণ্য নাই। এইরূপ বহুস্থলে প্রাচীন নবীন ভেদ বৌদ্ধমতে স্বীকার্য। এই সব কারণে জ্যাকোবি সাহেবের মত ঠিক নহে।

তাহার পর অমরকোষ গ্রন্থেও "সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ" এবং পরে "শাক্যমুনিস্তু যঃ" এইবাক্যে দুইজন বুদ্ধেরই সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব বৌদ্ধমতের প্রাচীন নবীন বিভাগ খুবই সঙ্গত। যদি বলা যায়—বর্তমান ব্রহ্মসূত্র পাণিনিকথিত অতি প্রাচীন ভিক্ষুসূত্রের অভিনব সংস্করণ বলিব? কিন্তু অনুকূল প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ইহা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। তুষ্যতু দুর্জনন্যায়ে—তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, এই গ্রন্থখানিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যত নবীন মনে করেন উহা তত নবীন নহে।

তাহার পর পাঞ্চরাত্র এবং পাশুপত গ্রন্থগুলি হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসূত্র আধুনিক গ্রন্থ নহে। কেন না উক্ত দুইটী মত কতকটা অবৈদিক মত হইলেও মহাভারতের কালেও প্রচলিত ছিল। মহাভারত শান্তিপর্ব আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। মহাভারতে পাঞ্চরাত্র মতকে বেদমান্য করা হইয়াছে।

তাহার পর আর্হত মতকেও অত্যন্ত নবীন বলা অনুচিত। কারণ, প্রাচীন বৈদিক, বৌদ্ধ, এবং জৈন শাস্ত্রগুলির আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ প্রকার দার্শনিক মতবাদ পরম্পরাক্রমে প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে ঐ মতগুলি সংগৃহীত হইয়া দৃষ্টিভেদানুসারে লিখিত হইয়াছে মাত্র, এবং প্রত্যেকে এক একটি দর্শন নামে খ্যাত হইয়াছে।

যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বাংশের বিশেষরূপে আলোচনা করেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন। কেবল সাদৃশ্য মাত্র দ্বারা কোনও মতকে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব মত বলিয়া গণনা করা উচিত নহে। কারণ তত্তৎ সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছে মাত্র। কাহারও মতবিশেষ লৌকিক উপায়ে জানা না গেলেও ব্যক্তিগত সাধনজন্য দৃষ্টিপ্রভাবে উহা অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু সেস্থলে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে বিচার করিতে হয়।

বস্তুতঃ বেদমধ্যেই বৌদ্ধ জৈন পাশুপত পাঞ্চরাত্র, ন্যায়বৈশেষিক মতের বীজ যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বৌদ্ধাদিমতেও তাহাদের বীজ আরও প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হয়। যথা গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ২২জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মহাবীরের পূর্বে ২৩জন জৈনাচার্য ছিলেন। শিব পাশুপত মতের বক্তা, নারায়ণ পাঞ্চরাত্র মতের বক্তা, গৌতম কণাদ ত্রেতাযুগের ঋষি ইত্যাদি। অতএব এইসব মত ব্রহ্মসূত্র-মধ্যে থাকায় ব্রহ্মসূত্রকে আধুনিক বলা সঙ্গত নহে। প্রত্যুত প্রবাদ অনুসারে কলির প্রারম্ভে আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন।

বাদরায়ণের গ্রন্থে আটজন প্রাচীন আচার্যের নামোল্লেখ দেখা যায়। যথা, (১) বাদরি, (২) কাশকৃৎস্ন, (৩) আত্রেয়, (৪) কাশকৃৎস্ন, (৫) ঔড়ুলোমি, (৬) কার্ষ্ণাজিনি, (৭) জৈমিনি, (৮) বাদরায়ণ। ইঁহারা প্রাচীন আর্য বেদান্তের আচার্য ছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় ব্রহ্মসূত্র প্রাচীন গ্রন্থ, আধুনিক গ্রন্থ নহে। ইঁহাদের দার্শনিক মতবাদ সর্বপ্রকারে অভিন্ন নহে।

ব্রহ্মসূত্রোক্ত প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণের মত ও পরিচয়

(১) আচার্য বাদরি—ইঁহার নাম ব্রহ্মসূত্রে চারি স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—ব্র, সূ, ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০। মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্রে আচার্য বাদরির নাম উল্লিখিত আছে। (মীঃ সূঃ ৩।১।৩, ৬।১।২৭,

৮।৩।৬, ৯।২।৩০)। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে আচার্য বাদরি কর্ম ও ব্রহ্ম মীমাংসা বিষয়ে সূত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বৈদিক শ্রৌত কার্যে সকলেরই অধিকার আছে। জৈমিনি এই মত খণ্ডন পূর্বক শূদ্রের অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন। উপনিষদে কোনও কোনও স্থানে সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে প্রাদেশমাত্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার উপপাদন কি প্রকারে সম্ভব? এ বিষয়ে আচার্য আশ্মরথ্য (১।২।২৯, ১।৪।২০) ও আচার্য জৈমিনির ১।২।২৮, ১।২।৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৪।২, ৩।৪।১৮, ৩।৪।৪০, ৪।৩।১২, ৪।৪।৫, ৪।৪।১১, ৩।৪।৪০ স্থানে আচার্য বাদরির মতও ব্রহ্মসূত্রে উদ্ধারপূর্বক খণ্ডন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আচার্য বাদরির বক্তব্য এই যে প্রাদেশ মাত্র ব্যাপ্ত হৃদয়ে অবস্থান হেতু মনকেও শাস্ত্রে প্রাদেশ মাত্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং সেই মনের দ্বারা পরমেশ্বরকে স্মরণ করা হয়। এ কারণে পরমেশ্বরও প্রাদেশ মাত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা" ইত্যাদি বাক্যে চরণ শব্দ প্রযুক্ত আছে। এই চরণ শব্দের এস্থলে অর্থ কি? এ বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আচার্য বাদরির মতে ঐ চরণ শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায়। অনুষ্ঠান-বাচক চরণ শব্দের তিনি কর্ম অর্থে প্রয়োগ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৪।১৫।৬) "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এস্থলে ব্রহ্মশব্দে পরব্রহ্ম বা কার্যব্রহ্মের গ্রহণ হইবে ইহাতে সন্দেহ হয়। জৈমিনি মতে ইহা দ্বারা পরব্রহ্মেরই গ্রহণ করিতে হইবে। পরন্তু আচার্য বাদরি বলেন, ইহা পরব্রহ্মের বোধক হইতেই পারে না। পরব্রহ্ম সর্বগত এবং গন্তা (গমন কর্তা) প্রত্যগাত্মস্বরূপ; সুতরাং উঁহাতে গন্তা, গন্তব্য ও গতি এরূপ ভেদ হইতে পারে না। প্রত্যুত কার্যব্রহ্ম প্রদেশবিশিষ্ট, এজন্য উঁহাকে গন্তব্যরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ফলতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহা কার্য ব্রহ্মবাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।২।১) মুক্ত পুরুষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি"। এস্থলে জিজ্ঞাসা হয় যে ঈশ্বরভাবাপন্ন জ্ঞানীর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে কি না? বাদরি বলেন, থাকে না। এই হেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৫) বলা হইয়াছে "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ ইত্যাদি।"

(২) আচার্য আশ্মরথ্য—বাদরায়ণ আশ্মরথ্যের উল্লেখ দুইটি সূত্রে করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ১।২।২৯, ১।৪।২০) আশ্মরথ্যের মতে পূর্বোক্ত প্রকরণের "প্রাদেশমাত্র" শব্দের ব্যাখ্যা অভিনব প্রকার দেখা যায়। তিনি বলেন পরমেশ্বর বস্তুতঃ অনন্ত হইলেও উপাসককে অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রাদেশমাত্র রূপে আবির্ভূত হয়েন। কারণ সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। হৃদয়াদি উপলব্ধিস্থানগুলিতে অর্থাৎ প্রদেশে পরমেশ্বরের উপলব্ধি বিশেষ ভাবে হয়, এজন্যও পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্র বলা যায়। ইহা তাঁহার মতে বৈকল্পিক ব্যাখ্যা। তাঁহার মতে বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাতে পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান। "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে যে এক বিজ্ঞানবশতঃ সর্ববিজ্ঞানবাদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে (বলা হইয়াছে) উঁহা দ্বারাও ভেদাভেদ বাদ সিদ্ধ হয়। আচার্য আশ্মরথ্যের ভেদাভেদ বাদই পরবর্তী কালে যাদবপ্রকাশ, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইহা শ্রুতিপ্রকাশিকাকার সুদর্শন আচার্য স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। মীমাংসা দর্শনেও (৬।৫।১৬) আচার্য আশ্মরথ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর নিজ ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২) আচার্য আশ্মরথ্যের মত নিম্নলিখিত ভাবে উপন্যস্ত করিয়াছেন—"আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বম্ অভিপ্রেতং তথাপি—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি সাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্যকারণভাবঃ কিয়ানপি অভিপ্রেত ইতি গম্যতে" (দ্রষ্টব্য শাঙ্কর ভাষ্য)

(৩) আচার্য আত্রেয়—ব্রহ্মসূত্রে এক স্থানে (৩।৪।৪৪) মাত্র আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত আছে দেখা যায়। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা যজমান কর্তৃক এবং ঋত্বিক কর্তৃক উভয় প্রকারেই বলা যায়। এই হেতু সংশয় হয় যে উহার ফল কে পাইবে। এ বিষয়ে আচার্য আত্রেয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্মফল স্বামী বা যজমান প্রাপ্ত হইবেন, ঋত্বিক নহে।

যা ঘটে তা সবই ভগবানের চোখে পড়ে

(লিও টলষ্টয়এর 'গড সিজ দি টুথ বাট ওয়েটস' গল্প)

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ

ভ্ল্যাডিমির শহরে একজন কমবয়সী বেনে বাস করত, নাম আইভ্যান অ্যাকসিওনভ। তার দুটো দোকান আর নিজস্ব বাড়ি ছিল। তাকে দেখতে ছিল বেশ সুশ্রী, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, হাসি খুশী মুখ। সে খুব গান ভালবাসত। যৌবনে একদিন খুবই মদ খেত—মাতলামিও করত। কিন্তু বিয়ের পর থেকে মদ একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল—কখন সখন দু-এক চুমুক খেত।

একদিন ও নিজনী শহরের হাটে মাল বেচতে যাবার জন্য যাত্রা করেছে এমন সময় ওর স্ত্রী বললে, আজকে তোমার যাওয়া হবে না। কাল আমি তোমার সম্বন্ধে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

আইভান হো হো করে হেসে বললে, অর্থাৎ শহরে গিয়ে আমি ফূর্তি করব সেই ভয় হচ্ছে ত তোমার?

স্ত্রী বললে, অতশত জানি না। তবে ভীষণ খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তুমি যেন শহর থেকে ফিরে এসে মাথার টুপিটা খুলে রাখছ, আমি দেখতে পেলুম তোমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে।

আইভান আবার হেসে বললে, আমার চুল সব সাদা হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখেছ? ও খুব শুভ চিহ্ন। দেখবে এবার সব মাল বেশ দামে বিক্রি হয়ে যাবে। ভয় নেই, তোমার জন্তে ভাল উপহার কিনে আনব। এই বলে সে যাত্রা করলে।

আধেক পথ যখন পৌঁচেছে এক চেনা কারবারীর সঙ্গে ওর দেখা হল। রাত কাটানোর জন্ত দুজনে একই সরাইখানায় ঢুকল। তারপর একসঙ্গে চা খেয়ে পাশাপাশি ঘরে শুতে গেল।

আইভানের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ওঠা। তাছাড়া, রোদ ওঠবার আগে যাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পরের দিন খুব ভোরে গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ি তৈরি করতে বললে। তারপর পেছনের চালা ঘরে সরাইখানার মালিকের কাছে গিয়ে তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যাত্রা করলে।

প্রায় মাইল পঁচিশ যাবার পর ঘোড়ার খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে গাড়োয়ান গাড়ি থামালে। আইভান সরাইখানায় ঢুকে একটু বিশ্রাম করে তার জন্ত এক-ঘটী গরম গরম সামোভার আনবার হুকুম দিলে। তারপর বাইরের বারান্দায় বসে নিজের গিটারটি বার করে বাজাতে লাগল।

হঠাৎ একখানি ট্রয়কা গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল। তা থেকে নামলেন একজন রাজকর্মচারী সঙ্গে দুজন সৈন্য।

রাজকর্মচারী আইভানের কাছে এসে তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আপনার নাম কি, কোথা থেকে আসছেন? ইত্যাদি। আইভান সব কথার জবাব দিয়ে বললে, আসুন, দুজনে চা খাওয়া যাক্। কিন্তু রাজকর্মচারী তাকে আরও সওয়াল করতে লাগলেন, কাল কোথায় রাতটা কাটিয়েছিলেন? একলা ছিলেন, না সঙ্গে ছিল আর একজন বেনে? আজ সকালে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন? অত

ভোরে চুপিচুপি সরাইখানা থেকে চলে এসেছিলেন কেন ?

আইভান অবাক্ হয়ে ভাবলে, এ সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কেন। তবু যা যা ঘটেছিল সব বলে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এভাবে আমাকে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন, আমি চোর না ডাকাত ? নিজের কারবারের ব্যাপারে শহরে যাচ্ছি. আমাকে এসব জিজ্ঞেস করা কেন ?

রাজকর্মচারী সঙ্গের সৈন্যদের ডেকে আইভানকে বললে, আমি এই জেলার পুলিশ অফিসার। তোমাকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে তোমার সঙ্গী বেনেটিকে সরাইখানার ঘরে আজ সকালে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা তোমার মালপত্র খানাতল্লাসি করব।

তারা সরাইখানার ভিতরে ঢুকে আইভানের গাঁটরিপত্র খুলে দেখতে লাগল। হঠাৎ অফিসারটি একটা থলি থেকে একখানা ছোরা বার করে বললেন, এটা কার ছোরা ?

আইভান মুখ তুলে চেয়ে দেখে একখানা রক্তমাখা ছোরা। সে খুব ভয় পেয়ে গেল।

—ছোরায় রক্ত লাগল কি করে ?

আইভান জবাব দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু প্রথমে মুখ দিয়ে তার মোটেই কথা বেরুল না। অতিকষ্টে তোতলামি করে বললে, আনি জা-ই জানি না-না-না।

তখন অফিসারটি বললেন, আজ সকালে দেখতে পাওয়া যায় বেনেটি গলাকাটা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। ভেতর থেকে সরাইখানা বন্ধ ছিল, রাত্রে তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এ কাজ তোমারই। তার সাক্ষী এই রক্তমাখা ছোরা আর তোমার শুকনো মুখ। এখন বল কি ভাবে লোকটাকে কেটেছিলে আর কত টাকা পেয়েছ ?

আইভান বারবার দিব্যি গেলে বলতে লাগল, আমি এ কাজ করি নি। রাত্তিরে দুজনে একসঙ্গে চা খাবার পর ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। আমার কাছে মাত্র নিজের আট হাজার রুবল রয়েছে দেখুন। ও ছোরাও আমার নয়।

অফিসার তার কোন কথায় কান না দিয়ে সৈন্যদের হুকুম দিলেন ওকে বেঁধে গাড়িতে তোল। সৈন্যেরা তার পা দুটো বেঁধে গাড়িতে তুলে নিলে। ও কাঁদতে লাগল আর মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। ওর মালপত্র টাকাকড়ি সব কেড়ে নেওয়া হল। তারপর সব চেয়ে কাছের থানায় এনে ওকে হাজতে রাখা হল। ব্ল্যাডিমির গাঁয়ে পুলিশের লোক ওর চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ করলে। পাড়াপড়সীরা বললে, আগে ও নেশাভাঙ করত বটে কিন্তু লোকটা ভাল, চোরডাকাত নয়। তারপর আদালতে ওর বিচার হল—ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল এই, ও রায়াজান গাঁয়ের এক বেনেকে খুন করে তার কুড়ি হাজার রুবল চুরি করেছে।

আইভানের স্ত্রী খবর পেয়ে খুব মনমরা হয়ে গেল। ছেলেরা সব ছোট।—একটা ত মাত্র ক মাসের, এখনও ওর বুকের দুধ খায়। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ও এসে হাজির হল শহরের যে জেলখানায় আইভানকে আটক রাখা হয়েছিল। প্রথমে স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার হুকুম পেলে না। তারপর অনেক কাকুতি-মিনতি জানাবার পর অফিসারদের হুকুমে তাকে আইভানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। জেলের পোশাক পরা, হাতবাঁধা আইভানকে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে আটক দেখে ও বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, অনেক ক্ষণ জ্ঞান হল না। জ্ঞান হলে ছেলেদের জড়িয়ে নিয়ে স্বামীর

কাছে গিয়ে বসল। তারপর বাড়ির সব খবর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি হয়েছিল? আইভান সব কথা খুলে বললে। তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, এখন আমাদের কি করতে হবে?

—রাজার কাছে আর্জি পাঠাতে হবে।

স্ত্রী বললে, আর্জি পেশ করা হয়েছিল, ওরা নেয় নি।

তা শুনে আইভান হতাশায় মাথা নিচু করে বসে রইল।

তখন স্ত্রী বললে, মনে আছে? আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম তোমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। তোমার সেদিন যাত্রা করা উচিত হয় নি। তারপর স্বামীর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা সত্যি করে বলো। আমি তোমার স্ত্রী আমার কাছে গোপন করো না। তুমিই লোকটাকে মেরেছিলে, নাঃ?

—তোমারও ঐ সন্দেহ! দুঃখে বেদনায় আইভান হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলে।

ঠিক সেই সময়ে একজন পাহারাওলা এসে বললে, সময় হয়ে গেছে।

ছেলেদের নিয়ে স্ত্রী চলে গেলে আইভান ভাবতে লাগল স্ত্রীর সন্দেহের কথা। শেষে মনে মনে বললে, দেখছি ভগবানই কেবল জানতে পারেন সত্যি ব্যাপার কি। ন্যায় বিচারের জন্য তাঁকেই ডাকা উচিত। মুক্তির তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানানো উচিত।

ও আর কারো কাছে আর্জি পাঠালে না সব আশা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত ভগবানকে ডাকতে লাগল।

শেষে আদালতের বিচারে ওর শাস্তি হল ওকে চাবুক মারা হল। তারপর সেই ঘা শুকোলে অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হল।

সাইবেরিয়ায় একটি একটি করে কেটে গেল ছাব্বিশ বছর। আইভানের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেল। ফাঁক ফাঁক লম্বা দাড়ির চুলও পেকে গেল। ওর সেই আগেকার বেপরোয়া হাসিখুশি ভাব আর ছিল না। কোমর ভেঙে শরীর নুয়ে পড়েছিল। ও আস্তে আস্তে চলত, কারুর সঙ্গে কথা বলত না। ওর মুখে কেউ কখন হাসি দেখতে পেত না। সময় পেলেই ও আপন মনে ভগবানের কাছে একলা একলা প্রার্থনা করত।

কিছু কিছু করে পয়সা জমিয়ে ও কিনেছিল একখানা "সন্তদের জীবনী" জেলে সারাদিনের নিয়মিত খাটুনির পর সন্ধ্যার আগে যেটুকু আলো থাকত ও একমনে বসে বসে সেই বইখানি পড়ত রবিবারে জেলগির্জায় গিয়ে সমবেত গানে যোগ দিত—ওর মিষ্টি গলা তখনও নষ্ট হয় নি।

জেলের কর্তৃপক্ষ ওর ভদ্র ব্যবহারের জন্য ওকে ভালবাসত। অন্যান্য কয়েদীরা শ্রদ্ধা করত। কেউ বলত দাদু। কেউ বলত সাধু-মহারাজ। কর্তৃপক্ষের কাছে কোন নালিশ করতে হলে ও হত কয়েদীদের প্রতিনিধি। তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে ওকে মানত মধ্যস্থ।

আইভান এতদিন বাড়ির খবর একটুও পায় নি। স্ত্রী ছেলেপুলেরা বেঁচে আছে কিনা জানত না।

এমনি ভাবে দিন যায়। একদিন একদল নতুন আসামী এসে হাজির হল। সন্ধ্যাবেলা নতুনেরা পুরাতন কয়েদীদের কাছে জড়ো হয়ে পরস্পরের খোঁজ খবর নিতে লাগল। কে কোন্ গাঁ থেকে এসেছে, জেল হল কেন,—এই সব কথা। তাদের মধ্যে এক পাশে বসে আইভান সকলের গল্প শুনছিল।

একজন ষাট বছরের বুড়ো নতুন আসামী তখন নিজের গল্প বলছিল, আমি ভাই গাড়ি থেকে একটা ঘোড়া খুলে নিয়েছিলুম। তাতেই আমাকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পুরেছে। বার-বার বল্লুম, ঘোড়াটা চুরি করার মতলব আমার একটুও ছিল না। তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছাবার দরকার ছিল তাই খুলে নিয়ে এসেছিলুম। বাড়ী পৌছেই ছেড়ে দিয়েছিলুম। তাছাড়া গাড়ির গাড়োয়ান ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওরা বললে, না, তুমি চুরি করেছিলে। তখন জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় কেমন করে চুরি করলুম। তার আর কোন জবাব দিতে পারলে না। অবশ্য একবার সত্যি সত্যিই আমি একটা পাপকাজ করেছিলুম। ন্যায়ধর্ম অনুসারে অনেক আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেবার ধরা প'ড়নি। এবার কিন্তু আমাকে মিথ্যে মিথ্যে শাস্তি দিয়েছে।··আঃ, বাজে কথা সব বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করছ নাকি? তামাসা করছি। আগে একবার আমাকে সাই-বেরিয়ায় পাঠিয়েছিল, তবে বেশিদিন থাকতে হয় নি।

একজন জিজ্ঞাসা করলে তোমার দেশ কোথায়?

—আমাদের বংশের আদিবাস ব্ল্যাডিমির গাঁয়ে। আমার নাম মাকার। কেউ কেউ সেমিওনিক বলেও ডাকে।

আইভান চকিতে মাথা তুলে বললে, তুমি ব্ল্যাডিমির গাঁয়ের একজন কারবারী আইভানের পরিবারের কারুকে চিনতে? তারা কেউ এখনও বেঁচে আছে?

—চিনি বই কি। তার ছেলেরা এখন বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছে। বাপটাত সাইবেরিয়ায়, হয়ত আমাদের মতই একজন পাপী। আচ্ছা, দাদু, তুমি এখানে কি জন্যে এসেছিলে?

আইভান তার দুর্দশার গল্প করতে ভালবাসত না। ও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমার পাপের জন্যে আজ ছাব্বিশ বছর জেল ভোগ করছি ভাই।

মাকার জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম পাপের জন্যে?

আইভান শুধু বললে, আর ভাই সে কথা কি আর বলব? নিশ্চয়ই আমার প্রাক্তন কিছু ছিল।

ও হয়ত আর কিছুই বলত না কিন্তু ওর সঙ্গীরা নতুন কয়েদীদের গল্পটা সব বললে। তা শুনে মাকার আইভানের দিকে তাকিয়ে নিজের হাঁটুতে একটা থাবড়া মেরে চেঁচিয়ে উঠল, এ ত ভয়ঙ্কর অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু, দাদু, তুমি এর মধ্যে এত বুড়ুটে হয়ে গেছ!

তার এ রকম উত্তেজনা দেখে সকলে মাকারকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এ রকম আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ কেন? এর আগে কি দাদুকে কোথাও দেখেছ?

মাকার তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বললে, এখানে এমনি ভাবে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়া আশ্চর্যের কথা বই কি, কি বল ভাই সব?

তার কথা শুনে আইভান ভাবলে, হয়ত এ লোকটা জানে কে সত্যিসত্যি সেই বেনেকে খুন করেছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলে, মাকার তুমি বোধ হয় এই খুনের সম্বন্ধে গল্প আগেই শুনেছিলে? আমাদের কি কোথাও আগে দেখেছ?

—ও গল্প কানে না এসে থাকে? সংসারে ও রকম গল্প রটতে কতক্ষণ লাগে? তবে অনেক দিনের ব্যাপার, ভুলে গেছি কি কি শুনেছিলুম।

আইভান জিজ্ঞাসা করলে, কে খুন করেছিল তুমি হয়ত তাও শুনেছিলে?

মাকার হো হো করে হেসে জবাব দিলে, যার থলিতে ছোরা পাওয়া গেছল সে ছাড়া আর কে খুন করবে? অন্য লোক যদি খুন করে থাকে ধরা না পড়া পর্যন্ত লোকে ত তাকে খুনী বলবে না। আর এও বলি, তুমি যে থলির উপর মাথা দিয়ে শুয়েছিলে তার ভেতরে অপরে ছোরা রাখবেই বা কেমন করে? রাখলে তোমার ঘুম নিশ্চয়ই ভেঙ্গে যেত।

এই সব কথা শুনে আইভানের দৃঢ় বিশ্বাস হল, এই লোকটাই প্রকৃত খুনী। সে উঠে চলে গেল। সারা রাত তার ঘুম হল না। যন্ত্রণায় ভিতরটা মোচড়াতে লাগল যত রাজ্যের পুরোন স্মৃতি তার মনে পড়তে লাগল। হাটে যাত্রা করার আগে স্ত্রীর কাছে বিদায় নেবার ছবি মনে পড়ল। সত্যি সত্যি স্ত্রী যেন সামনে হাজির রয়েছে, সেই মুখ, সেই চোখ দুটি। ওর মনে হল, ও যেন স্ত্রীর হাসি—কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারপর মনে পড়ল ওর ছেলেদের ছবি—সেই এতটুকু সেদিন যেমন ছিল। ও নিজে তখন কি বেপরোয়াই না ছিল—তরুণ বয়স, সাদা হাসিখুশী। যে দিন ওকে গ্রেপ্তার করে সেদিনও সরাইখানায় ও কি আনন্দেই গিটার বাজাচ্ছিল! ক্রমে একে একে ওর মনে ভেসে উঠল আদালতে বিচার, বেতমারা, হাতকড়া, খুনী আসামীদের সঙ্গে বাস—এই ছাব্বিশ বছরের কারাজীবন ও অকালবার্ধক্যের কথা। দুঃখও দুর্দশার কথা ভাবতে ভাবতে বেদনায় ওর ইচ্ছা হল আত্মহত্যা করবার।

এই সব দুর্দশার মূল হচ্ছে ঐ পাষণ্ড মাকার! এ কথা মনে পড়তেই আইভান এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে তার ইচ্ছা হল এখনই প্রতিশোধ নেয়। নিজেকে দমন করবার জন্য ও সারারাত ইষ্টদেবের নাম জপ করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলে না। পরের দিন যতদূর সাধ্য মাকারকে এড়িয়ে চলল।

একদিন রাতে এমনিভাবে ও পায়চারী করছে এমন সময় একজন কয়েদীর বিছানার তলা থেকে খানিকটা মাটি এসে পড়ল ওর পায়ের উপর। ও থামতেই মাকার এসে দাঁড়াল ওর সামনে—ভয়ে তার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। আইভান তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মাকার তার হাত জড়িয়ে ধরে বললে, আমি জেলের পাঁচিলের তলায় একটা গর্ত করছি। রোজ জুতোর মধ্যে মাটি লুকিয়ে নিয়ে সকালে কাজে যাবার সময় বাইরে ফেলে আসি। তুমি এ কথা বলে দিও না, দাদু। একদিন তুমিও তাহলে পালিয়ে যেতে পারবে। যদি বলে দাও, বেতের চোটে আমার প্রাণ যাবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে খুন করব নিশ্চয় জেনো।

আইভান ওর চিরশত্রুর দিকে তাকিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাত ছিনিয়ে নিলে। বললে, আমার পালাবার কোন ইচ্ছে নেই। আর আমাকে খুন করবার তোমার দরকার হবে না—অনেক আগেই তুমি আমাকে খুন করে রেখেছ। তোমার গর্ত খোঁড়ার কথা বলে দেব কি না তা এখন জানি না—ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে।

পরের দিন পাহারাওয়ালারা কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবার সময় খোঁজ পেলে কে একজন জুতোর তলা থেকে মাটি ফেলে দিয়েছে। তখনি জেলের চারদিকে খানাতল্লাসি করা হল। এক কোণে পাঁচিলের ধারে কাটা সুড়ঙ্গ বেরুল। জেলার এসে প্রত্যেক কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এ কাজ করেছে তুমি জান?

সকলেই মাথা নেড়ে বললে, জানি না। যারা জানত তারাও মাকারের নাম বললে না।

শেষে জেলার আইভানের দিকে তাকিয়ে

বললে, তুমি বুড়ো মানুষ, বিশ্বাসী। ভগবানের নাম নিয়ে বল কে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে ?

জেলারের কথা শুনে আইভানের হাত ঠোঁট ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলে না। ভাবলে, যার জন্যে আমার সারাজীবন কষ্ট হয়েছে তাকে আমি বাঁচাতে যাব কেন ? আমরা সকল দুর্দশার প্রতিশোধ এখনও ভোগ করব কিন্তু ওর উপর আমার সন্দেহ মিথ্যেও ত হতে পারে। তাছাড়া, আমি নাম বলে দিলে ওকে হয়ত বেত মেরে শেষ করে দেবে, তাতে আমার কি লাভ হবে ?

জেলার ফের ডেকে বললেন, আইভান, তুমি ভাল মানুষ, সত্যি কথা বলে ফেল।

আইভান চকিতে একবার মাকারের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে, হুজুর, আমি কিছু বলতে পারব না। ভগবানের ইচ্ছে নয় আমি বলি। আপনি আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিতে পারেন।

জেলার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু আইভানের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরুল না।

সেইদিন রাতে আইভান তার বিছানায় শুয়ে আছে। সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে এমন সময় চুপি চুপি কে এসে তার বিছানায় বসল। ও ঘুমে জড় চোখ টেনে তাকাতেই চিনতে পারলে মাকারকে। বিরক্ত হয়ে বললে, এখানে কি করতে এসেছ ? আমার কাছ থেকে আবার কি চাও ?

মাকার ওর উপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস করে বললে, আইভান আমাকে মাপ করো।

—কিসের জন্যে ? আইভান জিজ্ঞাসা করলে।

—সেই বেনেকে আমিই খুন করে তোমার থলির মধ্যে ছোরা লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমাকেও খুন করবার আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাইরে কিসের শব্দ হতেই ছোরাখানা লুকিয়ে রেখে আমি জানালা টপকে পালিয়ে যাই।

ইভান হতভম্ব হয়ে চুপ করে বসে রইল। মাকার বিছানা থেকে নেমে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে বললে, আমায় ক্ষমা করো, আইভান। এবার সব কথা স্বীকার করব, বলব, আমিই সেই বেনেকে খুন করেছিলুম। তাহলে তুমি ছাড়া পাবে। ছাড়া পেয়ে বাড়ি যেতে পারবে।

আইভান রুক্ষস্বরে বললে, খুব যে বক্‌বক করে বকছ ? তোমার জন্যে এই ছাব্বিশ বছর যে কত ভুগলুম ! আর এখন ফিরে যাবার জায়গাই বা কোথা আছে ? আমার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেরা আমাকে ভুলে গেছে। না, না, আমার আর ফিরে যাবার জায়গা নেই।

মাকার এবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললে, আমাকে মাপ করো, ভাই। এখন তোমার অবস্থা দেখে যে রকম অসহ্য লাগছে, ওরা যখন জেলে আমাকে চাবুক মেরেছিল তখনও এত অসহ্য লাগে নি। তবু তুমি দয়া করে আমার নাম বলে দাও নি। ভগবান ওপর থেকে সব দেখতে পেয়েছেন। আমায় মাপ করো, আমি বড় অভাগা। এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

তাকে কাঁদতে দেখে আইভানও কেঁদে ফেললে। ও বললে, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন ভাই। হয়ত আমি তোমার চেয়েও বড় পাপী। কথাগুলো বলতেই ওর মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছা আর রইল না।

আইভানের মানা সত্ত্বেও মাকার সব দোষ স্বীকার করলে। কিন্তু আইভানের মুক্তির হুকুম যখন পাওয়া গেল তখন আর ও বেঁচে ছিল না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত কথোপকথন

স্বামী শান্তানন্দ

হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন—"তাঁর ভাব কি সামান্য ছিল? কোন কোন সময় এমন কি বহির্জগৎও তাঁর ভাব অনুযায়ী বদলে যেত। একবার মথুর বাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে ওঁর জুড়ি গাড়ী করে ঠাকুরকে ওঁদের জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ী যখন চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ওঁর এরূপ ভাব হল যে উনি যেন সীতা হয়েছেন আর রাবণ ওঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—উনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মথুর বাবু ভাবলেন, এমন কেন হলো? ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পরে ওঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি সমস্ত বিবরণ বললেন। তিনি বললেন, ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি দেখলেন যেন রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণের রথ আক্রমণ করেছে এবং সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মথুর বাবু শুনে বললেন, 'বাবা, এমন হলে ত তোমার সঙ্গে রাস্তা চলা মুস্কিল'!"

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন—"একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে এসে হল ঘরে বসেছেন। ভক্তরাও অনেকে উপস্থিত আছেন। বলরাম বাবু ঠাকুরকে পরখ করবার জন্য একথালা সন্দেশ ঠাকুরের সামনে এনে ধরলেন। সন্দেশগুলি তিনি পৃথক ভাবে মনে মনে ভাগ করে রেখেছিলেন—এইটি ঠাকুরের, এইটি নরেনের, এইটি বাবুরামের, এইটি রাখালের, ইত্যাদি করে। ঠাকুর কিন্তু যেটি তাঁর নাম করে রাখা হয়েছিল সেটি গ্রহণ করলেন। তখন বলরাম বাবুর সংশয় কাটলো।"

একদিন ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে রামলাল দাদা (রামলাল চট্টোপাধ্যায়—ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, "অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলা দেশে এসে শুনলেন যে কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ীর লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম্ এত্না তকলিব করকে অযোধ্যাছে উন্‌কো ওয়াস্তে পয়দল আঁতে হে আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ীর সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২।৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এ সময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ ক'দিন খাস নি, এই পায়েস এনেছি, খা।' এই বলে ওঁকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন। রামলাল-দা এই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।"

গতি ও মাধ্যাকর্ষণ*

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

(রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাহির হইতে কোনও শক্তি আসিয়া যদি অবস্থানের অথবা গতির পরিবর্ত্তন সাধন না করে, তবে যে কোনও 'কণা' হয় স্থির থাকিবে নতুবা সরল রেখায় একই গতিতে চলিতে থাকিবে। কিন্তু আপেক্ষিকতা-বলে যদি কোনও বাধা প্রাপ্ত না হয় অথবা কোনও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়ে, তবে একটি কণা সব চাইতে কম বাধার পথেই অপ্রতিহত ভাবে একই গতিতে চলিতে থাকিবে। যদিও সেই চলার পথ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে হ্রস্বতম দূরত্ব সূচিত করিবে। যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা কোনও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়ে তবে ইহা নিশ্চল হইতে পারে (অবশ্য বাধার সঙ্গে তুলনা করিয়া); ইহার গতিবেগের পরিবর্ত্তন হইতে পারে অথবা পথের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, ক্রিয়াশীল হওয়াই (to possess energy) পদার্থের পক্ষে স্বাভাবিক, স্থিতিশীল হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। আমরা পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি কেন? কারণ আমাদের পায়ের তলাকার কণাগুলি আমাদিগকে গড়িয়া যাইতে বাধা দেয়। সুতরাং আমাদের পথ সীমাবদ্ধ। আমরা স্বাভাবিক প্রেরণার পথে চলিতে পারিতেছি না, এবং সেই জন্যই অন্য চলন্ত পদার্থ সম্বন্ধে অপ্রতিহত ভাবে কোনও কিছু পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি না। ইহা স্বতঃই প্রমাণ হয় যে, আমরা যদি কোনও পড়ন্ত বস্তুর পিছনে চলিতে থাকি তবে কোনও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদিগকে প্রভাবিত করিতে পারিবে না। কোনও দ্রুত চলন্ত ভারবাহী ব্যক্তির হস্তস্থিত পদার্থের ওজন কমিয়া যায়, সেই ব্যক্তির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করিবে না। ইহা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত সত্য প্রমাণিত হয়।

গতির যদি ব্যতিক্রম না হয়, তবে বাহিরের কোনও পদার্থের সঙ্গে তুলনা না করিলে দ্রষ্টা তাহার গতিবেগ বুঝিবে না। কিন্তু যদি গতির ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যদি উহা বর্দ্ধিত হয় অথবা ক্ষয় পায় তখনই দ্রষ্টা গতির উপর কোনও শক্তির খেলা বুঝিতে পারে। এই যে শক্তি তাহার নাম নিশ্চেষ্টতা (inertia)। কাজেই মাধ্যাকর্ষণ ও নিশ্চেষ্টতা উভয়ই গতির ব্যতিক্রমের ফল। সুতরাং উভয়ই কৃত্রিম। কেন্দ্রাপসারিণী (centrifugal) কেন্দ্রাভিসারিণী (centripetal) শক্তির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। পৃথিবীর সঙ্গে যদি না ঘোরা যায় তবে এই কৃত্রিম শক্তির কোনও প্রভাব তাহার উপর থাকিবে না। যেমন, পৃথিবীর উত্তর-মেরুতে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

মাধ্যাকর্ষণ, নিশ্চেষ্টতা, কেন্দ্রাপসারিণী ও কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি কৃত্রিম, কেন না কোনও প্রকার বেষ্টনী উহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিতে

* Relativity ও Reality হইতে।

পারে না। সমস্ত প্রকার চলন্ত পদার্থের উপর ইহাদের প্রভাব সমান।

তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি?

গতির ব্যতিক্রমের দ্বারা কৃত্রিম ভাবে মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি এবং দেশের বক্রতার জন্যই গতির ব্যতিক্রম। কোনও কোনও আপেক্ষিকতাবাদী মনে করেন যে, দেশের বক্রতা ও পদার্থের মধ্যে কোনও বিভেদ নাই। পদার্থ সমস্ত দেশ জুড়িয়া দেশের সঙ্গে একীভূত হইয়া আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সমরূপ নহে। দেশের বক্রতা (curvature) পদার্থের ঘনত্বের সহিত সমানুপাতী। তথাকথিত শূন্যদেশের বক্রতা প্রায় শূন্য। এই শূন্যতা নিরপেক্ষ নহে, কারণ নিরপেক্ষ শূন্যদেশ হইতে পারার মত কোনও অবস্থা হইতে পারে না। যখন দ্রষ্টার পথ বক্র হয়, তখনই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব বুঝা যায়, এবং চতুর্থ পরিমাণ ধারাবাহিকের (Space-time-continuum) জন্যই এই বক্রতা।

মাধ্যাকর্ষণরূপ প্রহেলিকার সৃষ্টিকারী দেশ-কাল-ধারাবাহিকের বক্রতা বুঝিতে পারা সুসাধ্য নহে; কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে তৃতীয় পরিমাণ জগতের বক্রতা পদার্থগুলির মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি করে। যেমন, পড়ন্ত দুইটি বস্তু ক্রমশঃ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে যেন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায় যে, কোনও প্রাণী সরল রেখায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাধার সম্মুখস্থ হইলে, সরলরেখা হইতে সরিয়া উহার পার্শ্বে বক্রাকারে ঘুরিয়া যায়। বাধাটি যে তাহাকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিল তাহা নহে, বাহিরের কোনও শক্তি দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া তাহার স্বাভাবিক পথেই সে চলিয়াছে।

চতুর্থ-পরিমাণ জগতের জ্যামিতি-অনুযায়ী বস্তুকে কাল দ্বারা গুণফলের (mass multiplied by time) নাম কাজ (action)। দেশ-কালের বক্রতাই কাজ। যেখানেই বস্তু, সেখানেই কাজ, সুতরাং সেখানেই বক্রতা। তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র (electromagnetic field) ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী একটি মাত্র সূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে—সেই সূত্রটির নাম হ্রস্বতম কাজের সূত্র (principle of least action)।

পদার্থকে ঘিরিয়া যে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র রহিয়াছে দেশ-কালের বক্রতাই তাহার উপাদান এবং এই বক্রতাই পড়ন্ত বস্তুর গতির ব্যতিক্রমের কারণ। সূর্য্যমণ্ডলের গ্রহগুলি তাহাদের স্বাভাবিক পথ বৃত্তাভাসে (ellipse) ভ্রমণ করে; এই পথই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম পথ—কারণ বস্তুর সন্নিকটবর্ত্তী দেশ ও কাল বক্র। তাহা হইলেই পদার্থের বস্তু (mass) ও ঝোঁকের (momentum) পরিমাণ দেশ-কালের বক্রতা অথবা চতুর্থ-পরিমাণ জগতের উপর নির্ভর করে (আপেক্ষিকতাবাদী ঈথরের পরিবর্ত্তে জগৎ অথবা চতুর্থ-পরিমাণের জগৎ ব্যবহার করেন)। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্ষেত্রে পদার্থের গতির ব্যতিক্রম বস্তুর জন্যই হইয়া থাকে। এই যে গতির ব্যতিক্রম বা আলোড়ন, ঈথরের প্যাঁচ বা বক্রতা—ইহাই পদার্থ। উত্তাপের ঘটনার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে। কোনও বস্তুর কণাগুলি আলোড়িত হইলে বস্তু উত্তপ্ত হয়। উত্তাপই যে কণাগুলি কম্পিত বা আলোড়িত করে, তাহা নহে; পরন্তু এই কম্পনকেই উত্তাপ বলা হয়। ঠিক সেইরূপ পদার্থও জড় মানকেই বক্রতা বলে। ইহা কার্য্যমাত্র, কারণ নহে।

দেশে চলন্ত বস্তুর মত আলোকও হ্রস্বতম কাজের পথে বিচরণ করে। এই পথ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম পথ। আইনষ্টাইন্ গণনা করিয়াছেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুইটি ঘটনাদ্বারা সমর্থিত

হইয়াছে। ইহার ফলে আপেক্ষিকতা-মতবাদকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বুধগ্রহের রবিনীচের (perihelion) গতি ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে একটি। কতকগুলি গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী হইতে জানা যায় যে গ্রহের রবিনীচের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্যিকারের পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিলিল না। আইন্‌ষ্টাইন্‌ দেখাইলেন যে, গ্রহগুলি রবি-উচ্চ অপেক্ষা রবিনীচে দ্রুততর বেগে চলিয়া থাকে। তিনি তাঁহার মতবাদ অনুযায়ী এই বৃদ্ধি গণনা করিলেন। সেই গণনা পরীক্ষালব্ধ ব্যতিক্রমের কারণ বুঝাইয়া দিল।

অতিদূর দেশের তারকা হইতে আলোক-রশ্মি তাহার চলার পথে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ গণ্ডির মধ্য দিয়া আসিবার সময় কিছুটা বাঁকিয়া চলে—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। ইহার ফলে দেশের প্রভূত বক্রতার প্রমাণ হয়। আইন্‌ষ্টাইন্‌ বলেন, আলোক একপ্রকার পদার্থ; আলোক-কণাগুলি অথবা ফোটনসমূহ সূর্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী বক্রদেশ কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইবে। তারকাগুলি আমাদের দিকেই আসুক অথবা দূরেই সরিয়া যা'ক, তাহাতে কোনও ইতরবিশেষ হইবে না; কারণ আলোকের গতি নিরপেক্ষ ও স্থির। এই গণনা ১৯১৯ সালের ২৯ মে এবং ১৯২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সূর্য্য-গ্রহণের সময় সমর্থিত হয়।

মাধ্যাকর্ষণ শুধু বক্রতার ফল এবং ইহা একটা অধ্যাস (illusion)। ইহা বহিঃস্থ কোনও শক্তি নয় অথবা প্রকৃতির কোনও সুশৃঙ্খল নিয়মও নয়। যে দ্রষ্টা মুক্ত অথবা স্বতঃই পড়িতে থাকেন, শক্তির কোনও ক্ষেত্র তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এই প্রকারের যুক্তি এবং তৎসঙ্গে গণিতের গণনা দ্বারা আপেক্ষিকতাবাদী এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে তিন-পরিমাণ জগতের উপাদান-শক্তি ও পদার্থ আমাদের মনের ধারণা মাত্র এবং সেইজন্যই অবাস্তব এবং চতুর্থপরিমাণ জগতের অজ্ঞেয় স্বরূপের প্রাকৃতিক ঘটনা।

রবীন্দ্র-প্রয়াণ

শ্রীচিত্ত দেব

মৌন প্রকৃতির বুকে মুখর মানব-কলরব
অকস্মাৎ থেমে গেল যেন।
'চলন্ত বাস্তব বেগে প্রগতির কী ক্ষতি সম্ভব ?'
অন্তরের অন্তরালে
শুধু এক অব্যক্ত জিজ্ঞাসা!
বিষাদের কালোছায়া নিশীথ রাতের অন্ধকার
নেমেছে প্রাণের পরে।
জড়ের জড়ত্ব নেই তরুলতা নভ মৃত্তিকার
ধ্যানমগ্ন কল্পছবি দৃশ্যপটে
শোকাবেগ প্রকাশে বাঙময় !

বসুন্ধরা-সারথির সাধ্যটুকু শিহরণে সারা
জীবনের চক্ররথে মূর্চ্ছাগত।
নিরবধি কাল বুঝি আহ্নিক-আবর্ত্ত পথহারা
গহন-কানন-শুদ্ধ
নিশ্চল নিস্পন্দ গতিহীন।
রূপ রস শব্দ গন্ধ লেখনীতে লভেছে জীবন
বাণীর বন্দনে যাঁর মূক ও মুখরে নেই ভেদ
সে-রবি-জীবন-দীপ-মহানির্বাপন
শ্রাবণের ঘন ঘোরে আজ
মুহূর্ত্তের মহাদান
অনন্তকালের এই খেদ!

তিথি, দিন, মাস ও বর্ষ

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

কালসৃষ্টি

শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দু-ধর্ম্মিগণের ইহাই বদ্ধমূল ধারণা যে যুগান্তে প্রলয়ের পরে পুনরায় পূর্ব্ব-সৃষ্টিবৎ জীব ও জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের অন্ধ-তমিস্রার দূরীকরণের জন্ত ব্রহ্ম-প্রলীন পঞ্চ-ভূতের সৃষ্টির পরে ভূত-পঞ্চীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য ও চন্দ্রের কল্পনা (সৃষ্টি) করিলেন। এই সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের গতির আবর্ত্তন-মূলক 'কাল' উৎপন্ন হইল। সূর্য্য-চন্দ্রের আবর্ত্তন-পরম্পরা অর্থাৎ দিন ও রাত্রির ভেদাত্মক অন্তর না থাকিলে কাল-জ্ঞানের জন্ত অন্ত কোনও মাপক সাধন আমাদের থাকিত না। অন্ত পক্ষে মহাপ্রলয়-কালীন অন্ধ-তমিস্রা দূরীভূত হইবার ফলে ও কালজ্ঞানের মাপক সাধন (মাপকাঠি) থাকায় দেশ বা দূরত্বেরও জ্ঞান সহজ-বোধ্য হয়। ভূ-পৃষ্ঠবর্ত্তী দূরত্বের মাপে এ কথা শুনিবা মাত্র একটু অসংবদ্ধ মনে হইতে পারে, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের উপরিবর্ত্তী অতি দূর-স্থিত কোনও গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরত্বের মাপে বৈজ্ঞানিকগণ আলোর গতির কাল অনুযায়ীই উহার দূরত্বের নিশ্চয় করেন। ভূ-পৃষ্ঠেও আমরা যান-বাহনাদি বা স্বীয় পদ-ক্রম ব্যতীত কালানুযায়ী পথের দূরত্বেরও অনুমান করিয়া থাকি।

সূর্য্যদর্শন-কালকে দিন এবং তাহার অদর্শন-কালকে 'রাত্রি' বলা হয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে যেরূপ গ্রহ নক্ষত্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সৃষ্টি এবং তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট কালে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত, নবীন সৃষ্টির পরেও পূর্ব্ব-কল্পবৎ সব কিছু অনুবর্ত্তিত হইতে থাকে, ইহাই আস্তিক বেদ-বিশ্বাসী হিন্দুগণের ধারণা।

চান্দ্র দিন বা তিথি ও চান্দ্র মাস

আমাদের অরণ্যচারী পূর্ব্ব-পুরুষগণের পর্য্যবেক্ষণের ফল-স্বরূপই হউক বা আর্ষ আবিষ্কাররূপই হউক, বৈদিক যুগ হইতেই দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থা ও গতি অনুযায়ী দিন ও মাসের কল্পনা এবং তদনুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা-কালীন চন্দ্রের উদয় ও অনুদয় অনুসারে মাসকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। চন্দ্রোদয়-যুক্ত অংশকে 'শুক্লপক্ষ' ও সন্ধ্যা-কালীন চন্দ্রোদয়-রহিত পক্ষকে 'কৃষ্ণপক্ষ' বলা হয়।

পূর্ব্ব কালে এবং এখনও চান্দ্র মাসের গণনা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি হইতে হয়। এক মতে পূর্ণিমার পরদিন হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পক্ষ-দ্বয় লইয়া মাস ধরা হয়। এই জন্যই পূর্ণিমার অপর নাম 'পৌর্ণমাসী'; কারণ পূর্ণিমা-দিবসে মাস পূর্ণ হইয়া থাকে। অন্যমতে অমাবস্যার পরদিন হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত পক্ষদ্বয় লইয়া মাস ধরা হয়। এই মতানুযায়ী মাস-কল্পনার প্রচার পূর্ব্বে অধিক ছিল ও এখনও দৈনিক ব্যবহারে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। যে পক্ষ-দ্বয়স্থ তিথিগুলি 'সংখ্যা' দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্ত

যে নিয়ম ভারতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা এই অমান্ত মাসের অবলম্বনেই করা হইয়াছে। যেমন অমাবস্যার পরের দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি সংখ্যা দ্বারা জ্ঞাপিত করিবার জন্য '১' সংখ্যার ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ার জন্য '২' ও তৃতীয়ার জন্য '৩'; এইরূপ পূর্ণিমার জন্য '১৫'। পূর্ণিমার পরের দিন কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদের সংখ্যা '১' না ধরিয়া '১৬' রাখা হইয়াছে; এইরূপ কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার জন্য '১৭', কৃষ্ণা তৃতীয়ার জন্য '১৮'। এই ক্রমে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর জন্য '২৯' ও অমাবস্যার জন্য '৩০' সংখ্যা মানা হইয়াছে। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে দিন-পঞ্জিকায় বাম দিকের স্তম্ভে পাঁচটী অঙ্ক দ্বারা যে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ জ্ঞাপক 'পঞ্চাঙ্গ' দেওয়া থাকে, তাহাতেও এই নিয়মানুসারেই তিথি-জ্ঞাপক সংখ্যা বা অঙ্কগুলি শুক্ল-প্রতিপদ (১) হইতে অমাবস্যা (৩০) পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

রাশি-চক্রে ত্রিশ-ত্রিশ অংশে বিভক্ত বারটী রাশি আছে। সুতরাং সম্পূর্ণ রাশি-চক্রটী ৩৬০° অংশ ব্যাপী। এই রাশি-চক্রে বা ভ-চক্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগুলি পরিক্রমা করিয়া থাকে। চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন সূর্য্যের সম-রাশি-অংশ-কলাদি পরিমিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন অমাবস্যার অন্ত হয় ও শুক্লা প্রতিপদ তিথির আরম্ভ হয়। মোট তিথি ত্রিশটী। চন্দ্র ও সূর্য্যের রাশিচক্রে ভ্রমণ-ক্ষেত্র ৩৬০° অংশ; সুতরাং ৩৬০° অংশকে তিথি-সংখ্যা ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রতি তিথির গম্য বা ব্যাপক ভাগ ১২° অংশ পরিমিত হইতেছে। সূর্য্যের ও চন্দ্রের রাশিচক্রে একই রাশি-অংশ-কলাদি পরিমিত স্থান হইতে (অর্থাৎ চন্দ্রের স্ফুট হইতে সূর্য্য-স্ফুট বাদ দিলে রাশি-অংশ-কলাদি যখন সবই '0' শূন্য হয় তথা হইতে) প্রতি বার-বার অংশ পরিমিত (চন্দ্রস্ফুট '—' সূর্য্যস্ফুট) অধিক স্ফুটাংশ দ্বারা এক-এক তিথির কল্পনা করা হয়। 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি', 'পিতামহ-সিদ্ধান্ত' ও 'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত' আদি সকল প্রাচীন সিদ্ধান্ত-গ্রন্থেই সূর্য্য হইতে চন্দ্রের বার-বার অংশপরিমিত অধিক সংক্রমণে গৃহীত সময়কেই এক-এক তিথি বলা হইয়াছে।

আমরা পৃথিবীবাসী; সুতরাং পৃথিবীতে সংঘটিত তিথিই আমাদের গ্রহণীয়। পৃথিবী হইতে দৃশ্য সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি-জ্ঞাপক ভূ-কেন্দ্রীয় কোণ বা স্ফুট (Geocentric Longitudes)-এর ব্যবধানজাত তিথিই আমাদের গ্রহণীয়। চন্দ্রের কক্ষাবৃত্ত বা ভ্রমণ-মার্গ অণ্ড-বৃত্তাকার (Elliptical); এই জন্য এক এক তিথি সূর্য্য হইতে চন্দ্রের অগ্রগতি-রূপ সংক্রমণের বার-বার অংশ পরিমিত হইলেও ঐ বার অংশ পরিমিত কক্ষা-ভ্রমণে পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান তিথি বা ঐ বার অংশ অতি-ক্রমণকালীয়, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে পর্য্যবেক্ষণ-জন্য, সময় চন্দ্রের সব সময়ে সমান হয় না। এই জন্য তিথির 'অংশ' দ্বারা ব্যাপকতা ১২° হইলেও, তিথির ভোগ-কাল-জন্য সময়ের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এই প্রকার তিথির ভোগ-কালের হ্রাস ও বৃদ্ধির অন্তর এক মতে ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট, অন্য মতে সাড়ে চার ঘণ্টা।

ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত এই তিথি ও তিথি-জন্য চান্দ্র-মাসের ব্যবহার পূর্ব্বকালেও হইত ও এখনও হয়। যে সময়ে ঘটিকা-যন্ত্রাদির আবিষ্কার হয় নাই, সে সময়ে 'দর্শ' ও 'পৌর্ণমাস' নামক যজ্ঞানুষ্ঠান, যাহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে করা হইত, তাহা দ্বারা মাসের দিন সংখ্যাদির ঠিক রাখা হইত। চন্দ্র যে দিন ঠিক অর্দ্ধোদয় গোলক-বিশিষ্ট হইত ঐ দিন 'অষ্টকা'-কৃত্যাদিরও অনুষ্ঠান

করা হইত। এইরূপে মাসের চার দিন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দুইটী অষ্টমী তিথির বৈশিষ্ট্য চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার বার-বার অংশ ব্যাপী তিথি হইলেও, তাহার ভোগ-কাল সব দিন সমান হয় না, তাহা বলা হইয়াছে; এবং ঐ তিথির আরম্ভ বা অন্ত দিন-রাত্রির যে কোনও সময়ে হইতে পারে। ইহার ফলে তিথি অনুসারে সামাজিক দিন-গণনায় বড়ই অসুবিধা হয়। এই জন্য লোক-ব্যবহারে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক 'দিন' বা তারিখের কল্পনা করিয়া, সূর্য্যের গতি অনুসারে সৌর-তিথি বা সৌর-দিবস ও সৌর মাসের কল্পনা করা হইয়াছে। যে সব প্রদেশে তিথি অনুসারেই দিন তারিখের ব্যবহার করা হয় সেখানে সুবিধার জন্য সূর্য্যোদয় কালে যে তিথির ভোগ-কাল তদনুসারেই ঐ দিবসীয় দিবা-রাত্রির নাম-করণ করা হয়।

সৌর দিন বা তারিখ ও সৌর মাস

রাশি-চক্র বা ভ-চক্রে গৃহীত রাশি-সংখ্যা বার; এবং সম্পূর্ণ রাশি-চক্র ৩৬০° অংশ পরিমিত। সুতরাং এক-এক রাশি (৩৬০° ÷ ১২) ৩০° অংশ পরিমিত। চন্দ্র প্রতিদিন ন্যূনাধিক ১৩° অংশ সংক্রমণ করিয়া এক চান্দ্র-মাসে সম্পূর্ণ রাশি-চক্রটী অর্থাৎ ৩৬০° অংশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যের দৈনিক গতি এই রাশি-চক্রে ন্যূনাধিক ১° অংশ মাত্র। সুতরাং ৩০° অংশ পরিমিত একটী রাশিকে অতিক্রমণ করিতে সূর্য্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক একমাস সময় লাগে। এইরূপে মেষের ০° অংশ হইতে সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিলে ৩৬০° অংশ সংক্রমণ করিয়া ০° অংশে পৌঁছিতে সূর্য্যের ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ড লাগিয়া থাকে। চন্দ্রের পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে উদয়-কালের অনিয়ম বশতঃ চন্দ্রোদয় হইতে দিন-কল্পনায় অসুবিধা; কিন্তু সূর্য্যের প্রতিদিন পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে উদয়-কাল একরূপ স্থির থাকায় সূর্য্যানুসারে দিন-কল্পনা সহজ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্র-গতিদ্বারা বার্ষিক অয়ন বা ঋতু আদির পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা হয় না; সূর্য্যের গতিদ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূন শতাব্দীকাল (৭২ বৎসর) পর্য্যন্ত অয়ন ও বিষুব-কালাদি-জন্য ঋতুর একরূপতা থাকে। এই জন্য সূর্য্য-গতিদ্বারা বর্ষাদি গণনার প্রচার ও ব্যবহার সমগ্র জগতেই পরিলক্ষিত হয়।

সৌর দিন হিন্দুগণ সূর্য্যোদয় হইতে পরদিবসীয় সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত মানিয়া থাকেন। মুসলমানগণ চান্দ্রমাসের অনুগামী বলিয়া এবং তাঁহাদের চন্দ্রোদয় হইতে মাসারম্ভ হয় বলিয়া, চন্দ্রোদয়-কালীন সন্ধ্যা হইতে পর-দিবসীয় সন্ধ্যা সময় পর্য্যন্ত এক-এক দিনের কল্পনা করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য জগতে সূর্য্য ও চন্দ্রোদয় জন্য সময়াদি না লইয়া রাত্রি ১২টা হইতে দিন প্রবৃত্তি মানিয়া পর-দিবসীয় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এক দিনের কল্পনা করেন। অবশ্য লণ্ডনে (অক্ষাংশ ৫১°-৩২´ উত্তর) তৎস্থানীয় রাত্রি ১২ টায় দিনারম্ভ মানিলে ঠিক ঐ সময়ে কলিকাতায় (অক্ষাংশ ২২°-৩৫´ উত্তর) প্রায় সূর্য্যোদয় কালই হইয়া থাকে। কলিকাতায় অক্টোবর মাস বা বাঙ্গলা সনের মধ্যভাগে (আশ্বিন) সূর্য্যোদয়-কালে লণ্ডনে ঠিক তৎস্থানীয় রাত্রি ১২টাই হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'উদ্বোধন' ১৩৫২, চৈত্র-সংখ্যায় 'পঞ্জিকা'-শীর্ষক প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

গোল-চক্রে কোনও আদি বা অন্ত্যবিন্দু থাকে না; কিন্তু সৌকর্য্যার্থ ভ-চক্রে মেষের আদি-বিন্দুকে ০° অংশ ধরা হয়। মেষ-রাশির ০° অংশে সূর্য্যের প্রবেশকাল হইতে মাসারম্ভ ও বাঙ্গালায় বর্ষারম্ভ

মানা হয়। মাসগুলির নাম-করণ দুই প্রকারে করা হয়,—(১) রাশির নাম অনুসারে, যেমন 'মিথুন' বা 'মিথুন-রাশিস্থ ভাস্কর' মাস ও (২) দ্বিতীয়, নক্ষত্রের নাম অনুসারে,. যেমন 'জ্যৈষ্ঠ'—যে মাসে 'জ্যেষ্ঠা' নক্ষত্রে পূর্ণিমা (পৌর্ণমাসী) হয়, তাহাকে (চন্দ্র-স্থিতি অনুযায়ী) 'জ্যৈষ্ঠ' মাস বলা হয়। এইরূপ অশ্বিনী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা আদি নক্ষত্রানুযায়ী আশ্বিন, কার্ত্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ আদি মাসের নাম-করণ হইয়াছে।

চন্দ্রের যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্যের গতির ব্যবধান-মূলক ১২° অংশ সংক্রমণে পৃথিবী হইতে পর্য্যবেক্ষণীয় সময়ের নূন্যাধিক্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যেরও প্রতি রাশির ৩০° অংশ পরিমিত কক্ষা-অতিক্রমণে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ৩০ দিন লাগিয়া থাকে। ইহার হেতু ইহাই যে, পৃথিবীর কক্ষা-বৃত্ত বা ভ্রমণ-মার্গ অণ্ড-বৃত্তাকার (Elliptic)। এইজন্য সূর্য্যের রাশি-চক্রে পরিভ্রমণে পৃথিবীর উত্তর অক্ষাংশ-স্থিত দেশ-সমূহে 'মিথুন' রাশির ৩০° অংশ অতিক্রমণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় (৩২ দিন) এবং 'ধনুঃ' রাশি অতিক্রমণে সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা কম সময় (২৯ দিন) লাগিয়া থাকে। প্রাকৃতিক বা জ্যোতিষিক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায় হিন্দুদিগের স্বীকৃত মাসারম্ভ ও মাসের দিন-সংখ্যা যথার্থ জ্যোতিষিক বিজ্ঞান-সম্মত; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য জগতের ব্যক্তি-বিশেষ (যেমন, জুলিয়াস্ বা অগাস্টাস্) দ্বারা স্বীকৃত ও প্রদত্ত খেয়ালী মাসারম্ভ বা মাসের দিন-সংখ্যা বিশিষ্ট নহে। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে পৃথিবীর সকল জাতীয় মাসারম্ভ, বর্ষারম্ভ, ও মাসের এবং বৎসরের দিন-সংখ্যা আদি হিন্দু জ্যোতিষ-মতে যাহা গৃহীত তাহাই যুক্তিযুক্ত ও অধিক সমীচীন।

পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর গতি অনুসারে সকল বৎসরে সকল রাশিতে সূর্য্যের পরিভ্রমণের সময় একরূপ থাকে না। এইজন্য হিন্দুদিগের পঞ্জিকায় প্রতি বৎসরেই মাসের দিন-সংখ্যায় কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে সূর্য্যোদয় কালেই সূর্য্যের রাশি-বিশেষ প্রবেশ-রূপ মাসারম্ভও সাধারণতঃ হয় না; দিবা-রাত্রির যে কোনও সময়ে ইহা হইতে পারে। তাই ব্যবহারিক দিন সূর্য্যোদয় হইতে মানা হয় বলিয়া মাসারম্ভের দিন বা তারিখ ঐ দিবসকে কল্পনা করা হয়, যেদিন সূর্য্যোদয়ের পরে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সূর্য্যের রাশি-প্রবেশ বা রাশ্যন্তর সংক্রমণ হয়। মধ্য-রাত্রির পরে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের নিকটবর্ত্তী সংক্রমণ-কাল হইলে পর-দিবসীয় সূর্য্যোদয় হইতে মাসারম্ভ ধরা হয়। ইহা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাঙ্গলা দেশে এই দিনকে (সূর্য্যের রাশ্যন্তর সংক্রমণ দিবস) পৌর্ব্ব-মাসিক দিন-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত 'সংক্রান্তি' বা 'মাসান্ত' মানা হয়। কিন্তু সমগ্র ভারতের জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের 'পঞ্চাঙ্গে' এই দিনকে মাসারম্ভ ধরিয়া ইহার দিন-সংখ্যা ১ 'গতে' (১লা তারিখে) দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা-সমূহে প্রদত্ত মাসের দিন-সংখ্যার আরম্ভই যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত, অথবা পশ্চিম ভারতীয় 'পঞ্চাঙ্গ'-সমূহে গৃহীত মাসারম্ভের প্রচলিত দিন-সংখ্যাই (যেমন, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় সংক্রান্তি-দিবস বা পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ৩০-এ অর্থাৎ অন্তিম দিবসই পশ্চিম ভারতীয় 'পঞ্চাঙ্গে' পরবর্ত্তী মাসের ১লা তারিখ হয়, তাহাই) অধিক যুক্তি-সঙ্গত ও সমীচীন কি না, ইহা জ্যোতিষিক গবেষক সুধীবৃন্দের বিচার্য্য বিষয়।

সৌর বর্ষ দুইটী 'অয়নে' বিভক্ত। যখন হইতে সূর্য্য উত্তর দিকে সংক্রমণ করিতে থাকেন তখন হইতে 'উত্তরায়ণ' ও যখন হইতে তাঁহার দক্ষিণ দিকে সংক্রমণ করা আরম্ভ হয়, তখন হইতে 'দক্ষিণায়নে'র আরম্ভ ধরা হয়। এক এক 'অয়ন' প্রতি ছয় মাসে হইয়া থাকে। পৌষ-মাসান্তে

'মকর' রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হইতে 'উত্তরায়ণ' কাল আরম্ভ হয় এবং তাহার ছয় মাস পরে আষাঢ় মাসান্তে 'কর্কট'-রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশ-কাল হইতে 'দক্ষিণায়ন' আরম্ভ হয়। সুতরাং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস 'দক্ষিণায়ন' মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত 'উত্তরায়ণ'।

'অয়ন'-মার্গের প্রতি বৎসর ৫০."২৬৮ বিকলা পরিমিত পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া প্রায় ৭২ বৎসর পরে সূর্য্য ও চন্দ্র-কৃত, পৃথিবীতে, ঋতু-সমূহ এক দিন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে। এইজন্য ইদানীং দেখা যায় যে, যে-যে মাসে যে 'ঋতু' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বেই (যথার্থরূপে ২২ দিন পূর্ব্বে) ঐ ঋতুর আরম্ভ বা তৎ-তৎ ঋতুর সকল প্রকার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত আদি ঋতুর প্রতি লক্ষ্য করিলেই বাঙ্গালা-দেশে ইহা অতি সহজেই বোঝা যায়। 'অয়ন'-মার্গের বা 'অয়নাংশে'র বিস্তৃত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এইরূপে 'সম-দিবা-রাত্রি'র দিবস প্রায় প্রতি ৭২ বৎসর পরে একদিন পূর্ব্বে সরিয়া যাইতেছে। ঋতু-আদির পশ্চাৎগমন হইলেও, হিন্দুদিগের সৌর বর্ষারম্ভ 'নিরয়ণ' মেষ-রাশির 0° অংশে সূর্য্যের সংক্রমণ কাল হইতেই লওয়া হয় বলিয়া ইহা চিরকাল একরূপই থাকিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, হিন্দুদিগের বর্ষ, মাস, মাসারম্ভ ও মাসের দিন-সংখ্যা অত্যন্ত জ্যোতিষিক নিয়ম ও যুক্তি-সঙ্গত; এইরূপ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোনও জাতীয় বর্ষারম্ভে দেখা যায় না

চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র-সৌর-বৎসর বা 'সম্বৎ' (Luni-Solar Year)

বঙ্গদেশে সূর্য্যের মেষ-সংক্রমণ দিবস হইতে বৈশাখ মাস ও তদনুযায়ী বৎসরের আরম্ভ মানা হয়; এবং বঙ্গে ও ভারতের সর্ব্বত্র তিথি অনুযায়ী চান্দ্র-মাসানুসারে সমস্ত দেব-পিতৃ-কার্য্যাদি সম্পন্ন করা হয়। ত্রিশটি তিথি ঠিক ত্রিশ দিন ব্যাপী হয় না; উহা সৌর দিন বা মাসের পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূন ২৯½ সাড়ে উনত্রিশ দিন ব্যাপী হয়। সৌর বর্ষের সৌর মাস ২৯ দিন হইতে ৩২ দিন ব্যাপী হয় এবং সৌর বর্ষ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ড পরিমিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সৌর বর্ষ হইতে চান্দ্রমাসানুযায়ী গণিত চান্দ্র বর্ষ প্রতি বৎসরে ১১ হইতে ১২ দিনের মত কম হইয়া যায়।

বঙ্গীয় 'সন' সৌর দিন বা তারিখ এবং সৌর মাসের অনুসারে হইয়া থাকে; হিজরী আদি সন চান্দ্র দিন ও চান্দ্র মাসানুযায়ী গণিত হয়। ফলে তাহাদের বৎসর ক্রমেই পশ্চাদনুসারী হইতেছে। চান্দ্র ও সৌর মাসে এই প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিয়া উভয়-মত-সমঞ্জস 'সম্বৎ' বৎসরের প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে বৎসর-গণনায় সৌর বৎসরের সঙ্গে মিল রাখা হয় এবং মাস-গণনা চান্দ্র দিন বা তিথি অনুসারে করা হয়। এই 'সম্বৎ' বৎসর চৈত্র-অমাবস্যার পর হইতে আরম্ভ হয়। যেমন, এবার ৮ই চৈত্র, ১৩৫৩, ২২-এ মার্চ্চ, শনিবার, রাত্রি ঘঃ ১০।২৮ মিনিট সময়ে অমাবস্যান্তে শুক্ল-প্রতিপদ (১) হইতে ২০০৪ 'সম্বৎ' আরম্ভ হইয়াছে।

এই 'সম্বৎ'-বর্ষকে সৌর বর্ষের সহিত মিল রাখিবার জন্য প্রায় প্রতি সৌর ২½ আড়াই বৎসর পরে চান্দ্র-মাসানুযায়ী ১২ মাসের বৎসরের সহিত 'অধিক' একটি চান্দ্র-মাস ধরা হয়। এই আড়াই বৎসর পরে যে মাসে দুইটি অমাবস্যা পড়ে ঐ মাসকে 'অধিক' বা 'মল'-মাস ধরিয়া চান্দ্র ১২ মাসের সহিত যোগ করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রতি পাঁচ বৎসরে সৌর মাসের ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ডের এক এক বৎসর গত হয়; কিন্তু প্রতি পাঁচ সৌর বৎসরে ৬২টী চান্দ্র-মাস গত হয়।

বাঙ্গলার শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার দৃষ্টান্ত লইলেই বোঝা যাইবে যে, পূজা চান্দ্র-তিথি অনুযায়ী হইলেও ঠিক এই ভাবেই সৌর আশ্বিন মাসেই উহা রাখা হয়। যেমন ১৩৫২ সনে দুর্গা-পূজা ২৭-এ আশ্বিন, ১৩-ই অক্টোবর ও ১৩৫৩ সনে ১৬-ই আশ্বিন, ২-রা অক্টোবর হইয়াছে। এইরূপে কিঞ্চিদধিক ১১দিন পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এই শুক্লাসপ্তমী তিথি বিহিত দুর্গা-পূজা ভাদ্র-মাসেও পড়িতে পারিত। কিন্তু ২½ বৎসরে একটি 'অধিক' বা 'মল' মাসের কল্পনা করা হয় বলিয়া বস্তুতঃ ভাদ্রমাসে পূজা না হইয়া ঐ শুদ্ধ আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ঠিক সম্ভাবিত ভাদ্র-মাসস্থ শুক্লা-সপ্তমীর দিন হইতে চান্দ্র-মাসের এক মাস পরে লওয়া হয়। এই জন্যই পূজা প্রতি তৃতীয় বৎসরে আশ্বিনের শেষে (এমন কি কার্ত্তিক মাসে পর্য্যন্ত) চলিয়া যায়।

অয়ন-গতি ও পঞ্জিকা-সংস্কার

হিন্দুগণের চান্দ্র মাসও বৎসরে সংস্কার পূর্ব্বক সৌর বৎসরের সহিত মিল রাখা হয়। কিন্তু মুসলমানী 'হিজরী' সনে এরূপ কোনও সংস্কার নাই বলিয়া তাহাদের 'মহরম' আদি প্রতি বৎসরে ন্যূনাধিক ১১ দিন পূর্ব্বেই সংঘটিত হয় এবং ফলে প্রতি তিন বৎসরে মাসাধিক পূর্ব্বেই উহা সম্পন্ন হইতে থাকে।

চান্দ্র মাস ও বৎসর অনুযায়ী ঋতু ও অয়নাদিও ঠিক থাকে না বলিয়া সৌর মাস ও সৌর বৎসরের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনতম যুগ হইতেই হিন্দুগণ জানিতেন। তাহাতেও প্রতি ৭২ বৎসরে এক দিন ঋতু পশ্চাদ্‌গামী হয় বলিয়া 'অয়ন-শোধন' প্রণালীও হিন্দুগণই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে দিন বার্ষিক গতিতে সূর্য্যের ঠিক বিষুব-রেখা (Equator) পার হওয়া উচিত, প্রায় ৭২ বৎসর পরে তাহার একদিন পূর্ব্বেই সূর্য্য বিষুব-রেখা অতিক্রম করিয়া থাকে। সূর্য্যের এই বিষুব-রেখা অতিক্রমণের দিবসে দিবা ও রাত্রি সমান থাকে। এই পরিবর্ত্তন-শীলতারও লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ Precession of Equinoxes বা 'অয়ন-শোধন' সংস্কার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৫০″ বিকলা হিসাবে হইয়া বর্ত্তমানে (বৈশাখ, ১৩৫৪), এই 'অয়ন'-সংস্কার ২৩° অংশ ৬′ কলা ২৪″ বিকলায় দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগে মেষ-সংক্রান্তি দিবসেই বাসন্ত ক্রান্তি-পাত (Vernal Equinox) সংঘটিত হইত। ঐ বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত দিবস হইতেই তখন বৎসরের আরম্ভ মানা হইত। কিন্তু এবং-বিধ বৎসর ক্রমে পশ্চাদনুসরণ করে বলিয়া, পরে সংস্কার পূর্ব্বক সূর্য্যের দক্ষিণায়নান্ত দিবসে (Winter Solstice) অর্থাৎ সূর্য্য বিষুব-রেখা হইতে দক্ষিণ দিকে সংক্রমণ করিতে করিতে যেদিন গতি-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখী হন, ঐ দিন (মকর-সংক্রান্তি) হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। ইহার পরে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালেও চান্দ্র-মাসের সংস্কার পূর্ব্বক পূর্ণিমা-তিথিতে পৌর্ণমাসী 'তিথি'র (মাস পূর্ণ হইবার দিন বা তারিখের)—অর্থাৎ পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে মাসারম্ভের—পরিবর্ত্তন করিয়া অমাবস্যায় মাস পূর্ণ হওয়া ধরিয়া অমাবস্যান্তে শুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে মাসারম্ভ গণনা আরম্ভ করা হয়। পরে বরাহ-মিহিরের সময়ে চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর সৌর বর্ষের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া কি ভাবে 'সম্বৎ' বর্ষ গণনা করা হয়, তাহার বিবরণ উপরি-উক্ত 'চান্দ্র-সৌর বৎসর' অংশে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ('সম্বৎ' বর্ষ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে আরম্ভ হইলেও) সমগ্র ভারতে সৌর-বর্ষারম্ভ মেষ-সংক্রান্তি দিবসেই মানা হয়। বাঙ্গলায় 'সম্বৎ' আদি বৎসরের প্রচার না থাকায় এ বিষয়ে কোনও গোলমাল নাই।

তিথি-শব্দের রূঢ়ার্থ

সাধারণতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যের সংক্রমণের ব্যবধান-রূপ বার-বার অংশ পরিমিত কক্ষা-বৃত্ত অতিক্রমণে চন্দ্রের পৃথিবী হইতে পর্য্যবেক্ষণে যে সময়টুকু লাগে তাহাকেই 'তিথি' বলা হয়। বর্ত্তমানে ইহাই 'তিথি' শব্দের রূঢ়ার্থ রূপ দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্র মাস হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় ও চন্দ্রোদয় হইতে চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত সময় 'তিথি' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইত। বাঙ্গলা দেশে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দিবা-রাত্রিকে 'তারিখ' বলা হয়, 'তিথি' শব্দ দ্বারা ঐ সময়-বিশেষকে অভিহিত করা হয় না। কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে পশ্চিম-উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র সংক্রান্তির পর দিন-সংখ্যাকেও 'তিথি' বলে। প্রতিপদ আদি চান্দ্র-তিথির সঙ্গে পার্থক্যবোধের জন্ম কোনও রাশি-বিশেষে সূর্য্য-সংক্রমণের পর হইতে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, দিন-সংখ্যাকে সর্ব্বত্রই "সৌর-তিথি" বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীরা ইহাকে মাসের 'তারিখ' বলেন; কিন্তু ভারতের বঙ্গেতর সমগ্র প্রদেশবাসী 'তারিখ' বলিলে কেবল ইংরেজী বৎসরের জানুয়ারী আদি মাসেরই দিন-সংখ্যাকেই বুঝিয়া থাকেন। সৌর-মাসিক দিন-সংখ্যাকে বঙ্গেতর প্রদেশ-সমূহে 'গতে', 'তিথি', 'সৌর-তিথি', 'পৈঠ' ও 'মিতি' আদি শব্দে অভিহিত করা হয়। হিন্দুস্তানী পণ্ডিত-সমাজে অনেক নিমন্ত্রণাদির দিন-জ্ঞাপনের জন্ম এই 'তিথি' শব্দ 'দিন', 'বাসর', 'তারিখ' বা 'মিতি' আদি শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' আদি সমস্ত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে চন্দ্র ও সূর্য্যের সংক্রমণ-জনিত যে বার-বার অংশ পরিমিত অতিক্রমণে গৃহীত সময়রূপ 'তিথি'র শাস্ত্র-সিদ্ধ সংজ্ঞা রহিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে 'চান্দ্র দিন ও তিথি' অংশে বলা হইয়াছে।

সুতরাং এখনও শাস্ত্র-সিদ্ধ সংজ্ঞা-যুক্ত 'তিথি'র সহিত সৌর দিবস বা তারিখ (সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়)-কেও 'তিথি' বলা সত্ত্বেও যেমন কোনও বিরোধ নাই, সেইরূপই প্রাচীন কালেও কোনও বিরোধ ছিল না বুঝিতে হইবে। অতএব যাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণা করিতে গিয়া হিন্দুদিগের বর্ত্তমানে প্রচলিত 'তিথি' সম্বন্ধে ধারণাকেও 'Tradition' বা 'ব্যবহারিক আচার' কিম্বা 'কিম্বদন্তী' অথবা সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সমুদায়ের সংস্কোচিত দৃক্-সিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা-রহিত অঙ্কজাল-মাত্র সিদ্ধ সময়-বিশেষ রূপে আখ্যা দিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের গবেষণা কতখানি জ্যোতিষিক বাস্তব সত্যের উপর নির্ভর করে তাহা জ্যোতিষিক জ্ঞান-সম্পন্ন সুধীবৃন্দেরই বিবেচ্য।

তিথি ও পঞ্জিকা-সংস্কার

প্রাচীন যুগে অয়ন-গতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য ও চন্দ্রাদির সংক্রমণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষিক সংস্কার হইয়া আসিয়াছে। ভাস্করা-চার্য্যের অয়নাংশ-সম্বন্ধে মন্তব্য-পাঠে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্রহ্মগুপ্ত হইতে আর্য্যভট, ভাস্করাচার্য্য এমন কি দুর্গ-সিংহ, মিহির ও কেশব দৈবজ্ঞের সময় পর্য্যন্ত জ্যোতিষিক সংস্কার হইয়াছে।

অয়নাংশ ও চরাদির পরিবর্ত্তন বশতঃ আজকাল বঙ্গীয় যে সকল পঞ্জিকা 'মকরন্দ-তিথি-চিন্তামণি', 'সিদ্ধান্ত-রহস্য' ('দিন-চন্দ্রিকা' ও 'দিন-কৌমুদী') আদি গ্রন্থ অবলম্বনে গণিত হয়, সেই সকল গ্রন্থের গণনা-ফল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের চন্দ্রসূর্য্যাদির স্ফুট এবং তজ্জন্য 'তিথি' আদিরও অশুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। এজন্ম গগন-পরিদর্শনের সাহায্যে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থিতি-জন্ম তিথ্যাদির সংস্কার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

যদি 'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত', 'পিতামহ-সিদ্ধান্ত', 'আর্য্য-সিদ্ধান্ত' (যদনুসারে দক্ষিণ-ভারতে পঞ্জিকা গণিত হয়), 'ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত' (যদনুসারে রাজপুতানা ও বোম্বাই অঞ্চলে পঞ্জিকা গণিত হয়), 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' (যাহার সংজ্ঞানুসারে বাঙ্গলা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে পঞ্জিকা গণিত হয়) ও 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' আদি জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সমুদায় মতে তিথির গণনা করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে গগনে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থিতি ঠিক ঠিক অবগত হইতে হইবে। যথাকালোচিত অয়নাংশাদির সংস্কার পূর্ব্বক চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থিতি-জ্ঞাপক বিশুদ্ধ স্ফুট (Geocentric Longitudes of the Moon and the Sun) হইতে তিথির গণনা করিলে ঐ তিথি বিশুদ্ধ এবং হিন্দুর সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী হইবে। এই প্রকারে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সমুদায়ের সংজ্ঞা-সিদ্ধ বর্ত্তমান-কালোচিত তিথি না দিয়া যাঁহারা অন্যবিধ উপায়ে গণিত তিথির ব্যাপক কাল ও তিথ্যন্তযুক্ত অশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড করিতেছেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ইহাই যে বঙ্গীয় "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" এই নীতি ও উদ্দেশ্য রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাতে দৃক্-শোধিত চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুট এবং তদনুসারে বিশুদ্ধভাবে গণিত তিথি ও তিথ্যন্ত কালাদি দিয়া থাকেন। বাঙ্গলার পঞ্জিকা-প্রকাশক-সমাজে পঞ্জিকাসমূহের অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়ে বহুবিধ আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে।

আমরা আশা করি, অনতিবিলম্বে মাননীয় পণ্ডিত-সমাজ পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে একমত হইয়া বঙ্গীয় সকল পঞ্জিকাতেই দৃক্-শোধিত যথাযথ গ্রহাবস্থানমূলক, চন্দ্র-সূর্য্যাদির, গ্রহ-স্ফুট এবং তদনুযায়ী সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ তিথি, নক্ষত্র, যোগ এবং করণাদিযুক্ত আদর্শ পঞ্জিকা শীঘ্র প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-সমাজের সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইবেন।

পূজা

শ্রীমতী ঊষা দেবী

তুমি অনন্ত আমরা ক্ষুদ্র শোনো শোনো ভবপতি
তুমি আদর্শ তুমি উপাস্য চরম পরম গতি !
ভবকাণ্ডারী বুঝিতে কি পারি স্বরূপে তোমায় ভবে
ক্ষুদ্র যে জন আদর্শ তার অনন্ত কি করে হবে ?
সাগরের মতো পুকুর খনন কভু যে সম্ভব নয়
আকাশের মতো চাঁদোয়া নির্মাণ আমাদের দ্বারা হয় ?
মানুষের দেশে ক্ষুদ্রের বেশে এ জগতে যাঁরা আসে
'মহামানব' খ্যাতিতে যাঁদের শিরোপা নিয়ত ভাসে
তাঁদের জানিয়া পূজিয়া মানিয়া পদানুসরণ করি
চলি যদি পথ—পাব না কি পথ বৈতরণীর তরী ?
তাই যদি হয় পরম আশ্রয় মানুষের মাঝে তুমি
বহুরূপী হয়ে বহু বেশ নিয়ে গড়িলে কি রণভূমি ?
মাতাপিতারূপে সখাবন্ধুরূপে আছে তব পরিচয়
তাঁহাদের পূজা প্রেম ভালবাসা—সে কি তব
পূজা নয় ?

অমৃত তীর্থের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসংযুক্তা কর

রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঔপনিষদিক কবি। তিনি শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিক, তিনি স্রষ্টা। যে ভারত একদা দৃপ্তকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে বলেছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', যে ভারতের সীমাহারা তারাভরা রাতের আঁধারে প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডের সামনে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্', যে ভারতের শাশ্বত অন্তরের বাণী অমৃতত্বের প্রচার-ছলে মৃত্যুর স্বরূপ ঘোষণা করে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।

রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের কবি। 'মানুষের অমৃতত্বলাভের অধিকার তিনি স্বীকার করেন। জীবনকে তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ!' মৃত্যুকে তিনি বলেন, জীবনের সিংহদ্বার। ঔপনিষদিক ঋষির মত সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি প্রচার করতে চান—'মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' তাঁর জীবনছায়ায় মরণের বেদনা-সায়রে যেন ফুটে উঠে অমৃতের শতদল।

রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর মত একটা শাশ্বত জীবন, একটা চিরন্তন অব্যাহত গতিতে বিশ্বাস রাখেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপনার তথা সমগ্র মানবতার এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে তিনি আস্থা স্থাপন করেন। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে চিরবিরাজমান "Primal Sympathy" তাঁর সমস্ত জীবনের সুরে ধ্বনিত হয়। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে এক প্রচ্ছন্ন চিরন্তনী সুদূর অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে চিরদিন একই ভাবে একই ছন্দে, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবন তারই একটা বিশেষ অবস্থামাত্র। এর তাই নেই কোন শেষ, কোন চরম পরিণতি বা সমাপ্তি। খণ্ড খণ্ড জীবন যেন অনন্ত অখণ্ডের কণারূপে বিচ্ছুরিত দীপ্তি। মৃত্যুর তোরণ দিয়ে মানবাত্মা চিরদিন যেন জন্ম হতে জন্মান্তরে চলেছে। এ যেন তার খেয়া তরী বাওয়া একঘাট হতে অপর ঘাটে। জীবনকে উদ্দেশ্য করে তিনি তাই বলেছেন—"এক ঘাটে পূর্ণ কর বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য ঘাটে।" একক জীবনগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য যেন অনন্ত 'এক'-এর স্বরূপের অভিব্যক্তি। তাই তিনি বলেছেন—

"জগতের মধ্যে আমাদের এমন এক নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয় প্রকৃতি ক্রমাগতই 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে—'এক' কাড়িয়া আর এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে, যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শত সহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ একের দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই।"

এই এক হতে একান্তরে যাওয়াকে সোজা কথায় জন্ম হতে জন্মান্তরে যাত্রা বলে বোঝা যেতে পারে। তাঁর এ বিশ্বাসবোধ রবীন্দ্রনাথের আর একটা বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে। সে হচ্ছে তিনি জন্মান্তরবাদী। রূপ হতে রূপে,

প্রাণ হতে প্রাণে তাঁর আত্মা যেন চিরদিনের চলার ছন্দেই চলে আসে। তিনি তাই বলেন—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

আলো এবং অন্ধকারের মত জীবন ও মরণ অবিচ্ছেদ্য। একের অভাবে অন্য নিরর্থক ও ব্যর্থ। দার্শনিক এ সত্য তিনি বিশ্বাস করেন বলেই তিনি অনুভব করেন জন্ম হতে মরণ যেন কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যাওয়া। এ যেন প্রবাস থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। চিরদিনের চিরকালের যে গতির ছন্দে মানবাত্মা চলে আসে যুগে যুগে, জীবন যেন সেই চলার পথের পাশে ক্ষণিক বিশ্রামের স্থান। শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াবক্ষে সে অপেক্ষা করে থাকে চিরযাত্রী মানবাত্মার জন্য। বিপুল আগ্রহে, অসীম মমতায় সে তাকে বরণ করে আপনার ক্রোড়ে। সে ভালবাসায়, সে মাটির মায়ায় মানুষ ভোলে তার সত্য। মরণকে সে মনে করে না আপনার একান্ত আত্মীয়, অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপে তার বুক। মাটিকে সে আঁকড়ে ধরতে চায় নিষ্ফল আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যর্থ পরিহাসে বিচলিত নন। তিনি তাই চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি মহা অজানার জয়গান করেন। ভীরু মানবকে তিনি বলেন—

কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়

*　　*　　*　　*

দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানি
সেই কি শূন্যময়?

রবীন্দ্রনাথ অমৃতের পূজারী। অমরতাকে তিনি উপেক্ষা করেন না। তিনি হতে চান চিরজয়ী, অজেয় অমর। কিন্তু সে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নয়; এড়িয়ে নয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে; তাকে স্বীকার করে। নিজেকে তিনি সমগ্র বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপনার সত্তা এককের সীমায় সীমায়িত করতে চান না। আপনার ভালমন্দ সুখদুঃখকে সমগ্র প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখতে চান অন্তরে, তিনি তাই চান পরম শান্তির ইঙ্গিত। বেদনা তাঁর আনন্দ হয়ে উঠে। তিনি তাই বলেছেন—

"নিজের প্রবহমাণ জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই। আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি।...... আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ-প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু মাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়। সেই জন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।"

বারবার তিনি বলেছেন মৃত্যুর সত্য দিকটা উপেক্ষা করে যতই তাঁর 'কষ্টের বিকৃত ভান', 'ত্রাসের বিকট ভঙ্গী', 'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা' বিশ্বাস করা যায়, ততই হয় 'অনর্থ পরাজয়'। তিনি বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে এর হারজিত খেলা জীবনের 'মিথ্যা এ কুহক'।

বলিষ্ঠ এ 'চেতনা'র উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাই জন্মান্তরবাদী। তিনি মনে করেন মৃত্যু জীবনের সিংহদ্বার। যে সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে জীবন হতে জীবনে আমাদের যাত্রা। এই জন্মান্তরবাদ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত সত্য। মৃত্যুকে স্বীকার করেই তিনি মৃত্যুকে

জয় করতে চান। এই পৃথিবী, এই সোনালী রোদে মোড়া, পীত শস্যক্ষেতের মৃদুগন্ধে সুরভিত, শ্রাবণরাতির কদম্বকেশরদীর্ণ, বসন্তের বাসন্তী দোলায় দোলায়িত চিরযৌবনা এই পৃথিবী তাঁর যেন কতকালের চেনা। কোন এক আদিম প্রভাতে সুন্দরী তরুণী পৃথিবী যখন প্রথম তার সমুদ্র স্নান সেরে উঠে এসেছিল সেদিনের প্রথম নবজাগ্রত চেতনার স্পর্শ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যুগান্তের পর যুগান্ত গেছে। তরুণী ধরার উপর এসেছে কত পরিবর্তন। তবু সেদিন প্রথম সে জীবনোচ্ছ্বাসে যে উদ্বেল আনন্দ তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, যে একান্ত আত্মীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে তার হয়নি বিন্দুমাত্র হ্রাস। নব নব যুগে চিরপরিচিত এই পৃথিবীর বুকেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তিনি বলছেন—

"তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একথা মুখোমুখি বসলেই সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্প অল্প মনে পড়ে।"

মৃত্যুকেই তিনি শেষ মনে করেন না। যে বিরাট-আমির প্রকাশ এই খণ্ড খণ্ড আমি, সে-আমির কখনও সমাপ্তি হয় না। হতে পারে না। এ বিশ্বাস তাঁর মনে এনেছে প্রাণের প্রাচুর্য, এনেছে চিরসজীবতা। চিরদিনের আমিকে তিনি অজেয় অমর বলেই মনে করেন। তাই তিনি জানেন এই সুখদুঃখবিজড়িত মাটির জীবনের পার্থিব পরিসমাপ্তি তার নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন প্রকৃত সত্তার অমরতার পথে অন্তরায় নয়। যে আমি এই শরতের আতপ্ত গন্ধভারাক্রান্ত বসুধার নিশ্বাসে নিশ্বাসে খুসীর হাওয়ায় দুলে দুলে উঠল, সে আমি এই নশ্বরতার পরিসমাপ্তির পরও এই পৃথিবীর চক্রে চক্রে আবর্তিত, নিত্যতরঙ্গিত রূপরস গন্ধের উৎসববাসরে বেঁচে থাকবে শান্ত হয়ে। তাই তিনি বলেন,—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই ঘাটে

*　　　*　　　*

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলার করব খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডা'কবে মো'রে বাঁধবে নতুন বাহুর জোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

মৃত্যু নয় জীবনের কলঙ্ক। এ আশীর্বাদ। মৃত্যু যদি না থাকত, যদি অন্তকের প্রলয়খেলা এখানে হত অজ্ঞাত, তবে জীবন হারাত তার অনির্বচনীয়তা। তাই তাঁর মতে প্রলয়ের দেবতা'র রুদ্র নৃত্যতাণ্ডবে আমাদের চিত্ত যেন শঙ্কিত না হয়; আশঙ্কার শিহরণে সে নৃত্যের উন্মাদনায় যেন না আসে আবিলতা। কেন না রূপ আছে তাই আছে অরূপ; সীমা আছে, তাই আছে অসীম; বন্ধন আছে, তাই আছে মুক্তি; মৃত্যু আছে, জীবন তাই চিরনবীন চিরশ্যামল। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রার্থনা করেন, "সংহারের রক্ত-আকাশে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতেও আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তোলে। জীবনে দুঃখবিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব যেন প্রকট হয়ে উঠে। তিনি বিহ্বল আবেগে গেয়ে উঠেন,—

কহ মিলনের একি রীতি এই,
ওগো, হে মোর মরণ।

জীবনের পরম সত্যের পরিচয় নিতে হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই অন্যত্র তিনি বলছেন—"জীবনকে সত্য বলে জানতে পেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলেই জীবনকে সে

পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।"

মৃত্যুকে যারা ভয় করে জীবনকে তারা চেনে না। আশঙ্কার কণ্টকশয্যায় তাদের কাছে সমগ্র পৃথিবীর মাধুর্য পাণ্ডুর হয়ে আসে। পুরাতনের একটানা ছন্দের সুরে তাদের গতি হয় অচল, পঙ্গু, বিকল। মৃত্যু যে জীবনের বিপ্লব এ কথাটাই যেন মানবের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। যখন পুরাতনের হাওয়ায় সমাজের বুকে ঘুণ ধরে, যখন প্রাচীন তার চিরাচরিত প্রথাটা দিয়ে নবীনের কণ্ঠরোধ করে, জরা যখন সমাজে আসে ঘনিয়ে তখন প্রগতিশীল যৌবন ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লবের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে। জীবনে আকস্মিক অভাবিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবজীবনের স্রোত আনে প্রবাহিত করে। সুপ্তিভাঙ্গা কর্মচঞ্চল জীবনে লাগে তখন আনন্দ-চঞ্চলতার ঢেউ, মৃত্যুম্লান জীবনে জাগে নববসন্তের হাওয়া। নবীনের এ জয় প্রাচীনের কাছে জীবনের এক অমোঘ সত্য। এরই সুর রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন মর্মে মর্মে। এই সুরের আভাস তিনি শোনেন প্রকৃতির অঙ্গনে প্রাঙ্গণে দিকে দিগন্তরে। তাঁর 'ফাল্গুনী'তেও তিনি এই কথারই প্রতিধ্বনি ফুটিয়ে তুলতে চান। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরপুরাতনই চিরনবীনতার আলোকে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বসন্তের মুকুলিত আম্রম্বর গন্ধবিধুর কচি পত্রে পত্রে যে নবীন বাণী অরূপ সুষমায় উঠল ফুটে, সে বাণী আজ যে চিরকালের, চিরদিনের। যারা গিয়েছে মরে, যারা কোনদিন করেনি পাথেয়ের বিচার, যারা বাধাবন্ধহারা চলার ছন্দেই জীবন-পরিক্রমা সমাপ্ত করে মৃত্যুকে হাসিমুখে নিয়েছে বরণ করে, সেই ঝরা পাতার অন্তরের বাণীই আজ কচি কিশলয়ে কিশলয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারা আজ অমরতার বাণীই পাঠাল বিশ্বের প্রাঙ্গণকে চিরশ্যামল, চিরস্নিগ্ধ করে তুলতে। তা যদি আজ না হত, আজ "তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার মর মর শব্দে সমস্ত অরণ্য শিউরে উঠত।"

এই বিশ্বাসের প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ চির-আশাবাদী, চিরজীবনবাদী। আজ যে আঁখির আড়ালে চলে গেল, যার জাগতিক প্রয়োজন হল নিঃশেষ, যে আত্মগোপন করল অজ্ঞাতের অন্তরালে, ঐহিক বিচারে তার মৃত্যু হলেও তার সমাপ্তি হল না। তার সত্তা চির জাগ্রত রইল অনাগত সম্ভাবনার কোরকে। চলতে চলতে যে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জরাকে উপেক্ষা করেই সে হল অমর। পূর্ণতায় সে হলো অভিষিক্তি। দিগন্তরে বিলীন হয়ে যাওয়া তার ছায়া "পূর্ণের পদপরশ" লাভে ধন্য হল। প্রাণবান বিশ্বের মাথায় তার স্থাপিত হল নিকট সংযোগ। মরণ-যমুনার ওপারে মোহন-মূরতি কোন জ্যোতির্ময় দ্যুলোকে ভূলোকে তাকে বিকীর্ণ করল। মৃত্যু তার হল আশীর্বাদ। মরণকে জয় করে সে অমর সত্যের সন্ধান পেল। সাবিত্রীর মত ফিরিয়ে আনল হারান তার একান্তই নিজস্ব সত্যকে স্বরূপকে। মৃত্যুর এ তোরণপথে সে লাভ করল অমৃতের অধিকার। রবীন্দ্র-মানসের এই পরিস্থিতিতে যে ঔপনিষদিক সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হল সে সত্যং শিবমদ্বৈতম্। দুর্বার প্রেরণার তাগিদে মানুষ ছোটে প্রেয় থেকে শ্রেয়ের দিকে, শ্রেয় থেকে অমৃতের দিকে। এইই মানবের চিরন্তন ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ধর্মবোধের এই যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত, মানুষ সেই অধিকার লাভ করেছে। কেন না জীবের মধ্যে মানুষই

শ্রেয়ের ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে।……যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পাবে যাবে কি করে? সেই জন্যই মানুষ প্রার্থনা করে অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—অর্থাৎ অসৎ হতে আমাকে সতে নিয়ে যাও—তম হইতে জ্যোতির্লোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু হতে অমৃতলোকে নিয়ে যাও।

মৃত্যুর দিকে মানুষের এই অভিযান তাই তার বিজয় অভিযান। এ যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ যেতে চান সগর্বে। তিনি তাই কামনা করেন মৃত্যুর বৈজয়ন্তীহাতে তিনি যখন "যাত্রাতরী বেয়ে" জ্যোতির্ময় অমৃতলোকের দিকে তাঁর যাত্রা সুরু করবেন তখন যেন "জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্ট" তাঁকে বিচলিত না করে! ধরার ধূলায় তাঁর যে প্রার্থনা যে কামনা, অন্তরের যে দীপ্যমান সত্য এতদিন ছিল লুণ্ঠিত, অবহেলিত, আজ সে সবের ডালি তিনি মৃত্যুর অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি বিদায়-পূরবীর সুরে যাত্রার ক্ষণটিকে যেন না করে বেদন-বিধুর। ধরণীর সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের বন্ধন যেন হয় ছিন্ন। তাই তিনি বলেছেন,—

পশ্চাতের সহচর ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।

আলো আর আঁধারে মেশা কান্না আর ছায়ায় ঘেরা এ ধরণীর আবর্তে আবর্তে একদিকে সৃজনের লীলা, অন্য দিকে মরণের মহোৎসব। সৃষ্টির প্রেরণায় এই যে সহস্র সহস্র সম্ভাবনা নিত্যনবীন প্রাণের সৌরভে মুকুলিত হয়ে উঠছে—এ যেমনই সত্য, মৃত্যুর ফেনিল নীল তরঙ্গে তরঙ্গে যবনিকার যে ছায়া পৃথিবীর বুকে নিরন্তর দীর্ঘ পাদক্ষেপ করে চলেছে সেও তেমনই সত্য। জন্ম ও মৃত্যুর, মিলন ও বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব ও শান্তির এ কাঁটাবনে চিরপ্রস্ফুটিত হয়ে আছে অমৃতের শতদল। রবীন্দ্রনাথ সে অমৃতের অধিকারী, তাই তিনি ভারতের চিরন্তন কবি—শাশ্বত অজর ও অমর।

ভাল ও মন্দ

শ্রীস্নেহময় বিশ্বাস

মঙ্গলময়ে বুঝিতে পারি না,
তাই অমঙ্গলে রোষ;
দুখ না থাকিলে সুখ কোথা হয়?
গুণ আছে, তাই দোষ।
কান্না পাইলে হর্ষ কি হয়?
মিল আছে, তাই দ্বন্দ্ব;
নিদ্রা বিহনে কোথা জাগরণ?
ভাল আছে, তাই মন্দ।

স্বর্গ র'য়েছে, তাইতো নরক,
আলো আছে, তাই ছায়া,
দুখ-সুখে ভরা তাই এ জগৎ;
বুঝি না ব্রহ্ম-মায়া।
আপনারে নিজে খণ্ড করিয়া
অখণ্ডের লীলা-খেলা;
বিশ্বের হাটে দুখ-সুখে তার
মায়াময় মণিমেলা।

অনুসন্ধান

শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য

মানুষ ও তার জগৎ

ব্যষ্টিগত পরিস্থিতি ও আবেষ্ঠনীর মধ্যে নিজস্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমরা মানসপটে বৈচিত্র্যময় জগতের ছবি অঙ্কন করে থাকি। প্রত্যেক মানুষ ঘটনাবলী বা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে থাকে নিজের মনোবৃত্তি অনুসারে। অস্তমান দিবাকরের সুদূরপ্রসারী কুন্তলের নিস্তব্ধ ভাষা কবি বা ভাবুক চিত্তকেই স্পর্শ করে,—বেরসিক বিষয়গ্রাহী চিত্তকে নয়। এইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির তারতম্য অনুসারেই আমরা গড়ে তুলি আমাদের নিজস্ব জগৎ। এইভাবেই আমরা জগৎ ও তার সঙ্গে আমাদের বিভিন্নমুখী যোগসূত্র খুঁজে পাই, বেছে নি আমাদের কর্মজীবনকে। কেউ হন কবি, কেউ ধার্মিক, কেউ বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতি এখানে অবিচলিত। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে স্বয়ং পাথরের মত বসে আছেন। যে যে ভাবে এসে তাঁকে যাচাই করে সে সেই ভাবেরই রসদ পায়। তাই বলে জগতের কোনো সংজ্ঞা নেই, উহা ব্যষ্টিগত ভাবধারার সমষ্টিমাত্র। সুতরাং আমাদের কাজে তা সঙ্কীর্ণ ও অস্পষ্ট; কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে এক সর্ব-ব্যাপকতার অভিব্যক্তি, যেখানে আমরা মূর্ত হয়েও অমূর্ত, যার মধ্যে ভাবুক ও রসিক প্রাণ অহরহ হিল্লোলিত; যেখানে ব্যষ্টির ভিতর দিয়েও একটি সামগ্রিক ঐক্য ফুটে উঠেছে, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি হয়ে উঠে নন্দিত; সমস্ত গণ্ডির সঙ্কীর্ণতা মুক্তি পায় এক অব্যক্ত রসাস্বাদনে, সেখানে সব হয়ে যায় একাকার। মানবের ব্যক্তিগত গোঁড়ামি লোপ পেয়ে এক বিমল অনুভূতির মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে।

জীবনের দুর্বহ কর্মস্রোতে মুহ্যমান প্রাণের বেদনায় অতিষ্ঠ হয়ে ভাবুক চিত্ত যখন জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন প্রথমই তার দৃষ্টি উদারপ্রসারিণী আকাশের দিকে আকৃষ্ট হয়। তার জিজ্ঞাসু চোখ ও দ্বিধাপূর্ণ মন এই আকাশের মধ্যেই যায় তলিয়ে; ক্রমাগত কল্পনাযানে আরোহণ করে মন চলতে থাকে ওই সুদূরপ্রসারী কোটি কোটি নক্ষত্রের দিকে, ওই রাশিরাশি ছায়াপথে বিলীয়মান অগণিত নক্ষত্র সমবায়ে গঠিত এক একটি নীহারিকার প্রতি, যাদের অস্তিত্ব হবে প্রায় ২০।৩০ কোটি আলোক বৎসরের পথে,—আর হিসাবেও যারা অগণ্য (আলোকের গতি প্রতি সেঃ ১'৮৬০০০ মাইল, আর এই হিসাবে পাঁচলক্ষ আশি হাজার কোটি মাইলে এক আলোক বৎসর)। এই সব নক্ষত্র-জগতের সাধারণ কোনো মণ্ডলীপ্রদেশের একজন অধিবাসী হচ্ছে আমাদের এই সৌর জগৎ—সূর্য ও তার চারিপার্শ্বে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহ। সুবিশাল বিশ্বে এদের স্থান যে কোথায় তা নির্ণয় করা যায় না; আর এরই একটি সাধারণ ভাই আমাদের পৃথিবী। এখানে অণুপরমাণুসদৃশ আমাদের ক্ষীণ জীবন তার আণবিক দম্ভে জগৎটাকে তোলপাড় করবার স্বপ্নে মসগুল আছে। এখানে এতো হানাহানি এতো মারামারি; অভিমানে উচ্ছ্বসিত দৈত্যের মত সব কাজ করে যাচ্ছে। তা দেখে হয়ত কোনো সুদূরের বিরাট আকার নক্ষত্র

না হেসে পারবে না, যেমন আমরা পিঁপড়ের দ্বন্দ্ব দেখে করে থাকি।

এই বিরাটের কাছে আমাদের আয়ুষ্কালীন জীবনও খুব তুচ্ছ, আর এর মধ্যে ক্ষণকালীন অভিনয়ের মত একটা অস্পষ্ট খেলা খেলে যাই,—যার অর্থ হয়ত কিছুই বোধগম্য হয় না। তাই জগৎ বা জীবনকে কেউ স্বপ্নবৎ বল্লে তাকেও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

দেশ ও কাল

পরম বিজ্ঞানী নিউটন আমাদের সামনে জগতের যে ছবি ধরেছিলেন তা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও যন্ত্র-বিশেষ। মাটিতে পতিত আপেলের গতিবেগের মধ্যে যে আহ্নিকগতি বা বার্ষিকগতির সম্পর্ক রয়েছে তা' কে জান্‌তো? যাই হোক্ তাঁর মহাকর্ষবাদের উপর ভিত্তি করে আমরা দেশ ও কালের যে ছবি পেয়েছি তা নিত্য।

ঘটনাবলীর অবস্থান্তর-প্রত্যক্ষেই আমাদের সময় বা কালের অনুভূতি হয়; পরন্তু কোনো ঘটনা বা বিষয় আমাদের দেশ ও কাল ব্যতীত প্রত্যক্ষ হয় না। সময় বা কালের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না, উহা একটি অনুভূতিরূপেই প্রতীয়মান হয়। যাই হোক্ বিজ্ঞান এই সময়ের গতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মেপেচে কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার সাহায্যে

আর কোনো একটি বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলেই দেশ বা দিকের প্রয়োজন হয়; এই দেশ অগ্রপশ্চাৎ ইত্যাদি ভেদে ত্রৈমাত্রিক, কিন্তু সময় একমাত্রিক। দেশ দ্বারা ঘটনার অবস্থান নির্ণয় হলেই সময় দ্বারা তার অন্তরজনিত তারতম্য উপলব্ধ হয়

তার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আইনষ্টাইনের যুগে আমরা জগতের যে ছবি পেলাম তা গতিশীল ও চঞ্চল। দেশ ও কাল এখানে হল একাকার; সময়ের গণ্ডী গেল ঘুচে—সবই হল আপেক্ষিক। ঠিক ঘটনা ঘটবার সময়টি আর প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভূত সময়টি এক হতে পারে না। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোনো নিত্য সম্বন্ধ নেই;—নক্ষত্রবাসীর কাছে যা বর্তমান আমাদের কাছে তা ভবিষ্যৎ, আর আমাদের যা বর্তমান তাদের কাছে তা' অতীত। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও অবস্থানের উপর দেশকালের মাপ যায় বদলে।

আইনষ্টাইনের মতে জগতের উপাদান হচ্ছে ঘটনারাজি, কোনো বস্তু বা বিষয়কে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, যা দেখে থাকি তা হচ্ছে আলোর প্রতিফলনরূপ ঘটনামাত্র। যন্ত্র-সহযোগে যা দৃষ্ট হয় তাও ঘটনা। এইমতে জড়, শক্তি, প্রাণ, মন ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এখানে বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় দর্শনের "মায়াবাদ" যায় মিলে। যাই হোক্, এইগুলি এবার আমরা নিজেদের তরফ থেকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করব।

সংস্কার ও জ্ঞান

নিজস্ব সংস্কার ও অন্তঃকরণবৃত্তি অনুসারে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়; মন যখন যে বিষয় দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তখন সেই বিষয়েরই জ্ঞান হয়; অভিজ্ঞতার মাত্রার উপরে এই জ্ঞান নির্ভর করে। অভিজ্ঞতা আবার স্মৃতি বা সংস্কারের একীকরণ চিত্তবৃত্তি থেকে উৎপন্ন। সংস্কার তিন প্রকার—প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত, স্মৃতিগত ও মজ্জাগত বা স্মৃতিভিন্ন।

স্মৃতি, সংস্কার ও অভিজ্ঞতা ক্রমাগত আমাদের জ্ঞানের সহায়ক হয়ে চলেছে। মজ্জাগত সংস্কার হচ্ছে যা' বহুদিনের অভ্যাসলব্ধ। যেমন যন্ত্রবাদককে প্রথমতঃ বহু আয়াসের সহিত উহা আয়ত্ত করতে হয়; পরে যন্ত্রটি তার এরূপ আয়ত্তে

আসে যে বিশেষ কোনো মনোযোগ ব্যতীতই সে উহা বাজিয়ে যেতে পারে। পুরুষানুক্রমিক আচারাদিও এরূপ সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। ঈদৃশ বিচারহীন সংস্কারসমূহ অনেক সময় আমাদের জ্ঞানবত্তার প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাকেই সাধারণ কথায় কুসংস্কার বলা হয়।

আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতার উপরেই জ্ঞানের মাত্রা নির্ভর করে, এবং ইহাও আমরা নিশ্চয় জানি যে সাধারণত মানুষের অভিজ্ঞতা আমরণ বৃদ্ধিই পেতে থাকে কোনো প্রতিবন্ধক না হলে। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলা যে আমাদের জ্ঞান বা অন্তঃকরণবৃত্তি পরিবর্তনশীল (পরিবর্তনশীল হলেও অবশ্য পূর্বাপর একটি যোগাযোগ থাকে)। আর এইজন্য বলা চলে যাকে আমরা জ্ঞান বলি বস্তুত তার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।

প্রকৃতির সব কিছুরই আমরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গ্রহণ করে থাকি; তাই বলে প্রকৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তিনি তো আছেনই, তবে আমাদের নিজস্ব ভাবানুযায়ী। আজ আমরা মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, এটমের ন্যায় ক্ষুদ্র জগতে মোটেই তার সে চেহারা নেই, কোনো স্থূল পদার্থই সে দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। সুতরাং আমরা যা দেখ্ছি, তাই সত্য বলি কি প্রকারে? যদি বলা হয় যার কাছে যে ভাবে প্রতিভাত হয় তাই সত্য; কিন্তু পরস্পরবিরোধী বিষয় কখনো সত্য হতে পারে না। যা আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অনুভূত হয় তার উপরই আমরা একটা নামারোপ করে নিয়েছি। জড়, শক্তি, প্রাণ, মন এবং কার্যে দৃষ্ট চেতনা ইত্যাদি এই প্রকার নামারোপ মাত্র। ঘটনাসমন্বিত কার্যস্থলেই কেবল এইগুলি উপলব্ধ হয়, তা ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জড় যেমন শক্তি ভিন্ন দাঁড়াতে পারে না, তদ্রূপ শক্তিও জড় ভিন্ন দাঁড়াতে পারে না; আর জড় ও শক্তি না থাকলে প্রাণ, মন, চেতনাই বা দাঁড়াবে কোথায়? জগতের ঈদৃশ সম্বন্ধবিনিময় দেখে শেষ পর্যন্ত আমাদের বল্‌তে হয় উহারা একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ। এই এপিঠ ওপিঠ দৃষ্ট বস্তুগুলিই আমাদের মানবীয় অনুভব অনুযায়ী আরোপিত। ভ্রম হলেই আমরা আরোপ করে থাকি, সুতরাং সব দৃষ্ট বস্তুই ভ্রম বা মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়; ইহাই অজ্ঞতার লক্ষণ। যেমন মেঘে চোখ ঢেকেচে না বলে সূর্য ঢেকেচে বলি, এইভাবে সূর্যকে করি খাট, তেমনি সত্যকে বা সত্যের স্বরূপকে অপলাপ করে তার উপর আমরা নানারূপ আখ্যা আরোপ করচি।

সত্যানুসন্ধান

আমরা দেখচি দেশকাল ও সংস্কার অথবা ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির কাছে আমরা রয়েচি আবদ্ধ; এবং এই বলেই আমরা মুক্তির স্বাদ পাচ্চি না। আজ আমি আশাবাদী, কাল নিরাশাবাদী হচ্চি। একটা অস্পষ্টতার মধ্যে জীবন যাপন করচি; বস্তুতঃ আমরা যে কী চাই তা বুঝে উঠতে পারি না। শিশু ভাবচে একটা ময়ূরপঙ্খী খেলনার নৌকা পেলেই সে ধন্য হবে এবং অনেক কান্নাকাটি অথবা চেষ্টার পর যখন সে উহা পেল তখন খুব সন্তুষ্টচিত্তে ওটা নিয়ে মেতে থাকবে, কিন্তু দুদিন পরই তার এটাতে আর আসক্তি থাকবে না। সমস্ত জীবনব্যাপীই আমাদের এরূপ ঘটতে থাকে। পরিশেষে কালের করাল স্পর্শে আমাদের এখানকার অভিনয় শেষ হয়ে যায়। তাহলে কী মৃত্যুর জন্যই সব? এই প্রশ্নটি ভাবুক চিত্তকে চিরদিন ভাবিয়ে তুলচে। আমরা সকলেই জানি আমাদের একদিন মৃত্যু হবে; কিন্তু তবু মনে হয় আমি এখন মরব না। এরূপে কোনো এক অজ্ঞাত ভাবী দিনের আড়ালে এই কথাটাকে আবৃত করে নিজ নিজ অভিনয়ে ব্যস্ত থাকি। এই দিক দিয়ে ভাবলে দেখা যায়—মৃত্যুর জন্য আমরা

জগতে আসি না, আসি কাজের জন্য। কাজ আনন্দ সুখ ও শান্তির জন্য। তা কখনো জ্ঞান ব্যতীত হতে পারে না, এই বিষয়ে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হবেন। তাহলে জ্ঞানী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য হচ্চে সত্যকে জানা। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ নিজস্ব ভাবধারা ও প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্চে। কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, দার্শনিক তাঁর অনুভূতি ও বিচার দিয়ে এবং ধার্মিকগণ তাঁদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও সাধনার ভিতর দিয়ে সত্যকেই খুঁজ্‌ছেন। এই খোঁজার পথেই যত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সত্যের মূলগত কোনো ভেদ থাক্‌তে পারে না। অনেকে হয়ত বলতে পারেন সত্য সম্বন্ধে মহাপুরুষদের মতামত বিভিন্ন—তাহলে সত্য এক হবে কেন? ইহা হচ্চে সম্পূর্ণ উপলব্ধির জিনিষ; কোন্ মহাপুরুষ সত্যের পথে কতটুকু অগ্রসর হয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে গেচেন তা আমাদের মত মানববুদ্ধির অগম্য; সুতরাং আমরা সত্যের সম্বন্ধে যে বিভেদ দেখতে পাই তা আমাদেরই অজ্ঞতার ফলে।

সাধনা ও ব্যাপকদৃষ্টি

সত্যকে জানার প্রতিবন্ধক হচ্চে আমাদের এই আবদ্ধাবস্থা। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার দাস। শুধু প্রবৃত্তির দাস বল্লে চলে না, কারণ অভিজ্ঞতা সব সময়েই ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলচে; আর কেবল অভিজ্ঞতার দাস বল্লেও চলে না। প্রত্যেক মানুষ তার অতীত কার্যাদিবলে যে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয় তার ফলে ভাল এবং মন্দের সাধারণ সংজ্ঞা বুঝতে সমর্থ হয়; কিন্তু তাহলেও তার কুসংস্কার ও প্রবৃত্তি তাকে মন্দের দিকে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতাই যদি মানুষকে সর্বাংশে পরিচালনা করতে পারত তাহলে আমাদিগকে সত্যের জন্য এত পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করতে হত না। অভিজ্ঞতাবলে প্রবৃত্তিকে জয় করার যে পুরুষকার তাই প্রকৃত সাধনা। এক কথায় সঙ্কুচিত মনোবৃত্তি অথবা দুর্বলতাকে জয় করাই সাধনা।

অসীমের ধারণা অবশ্য সাধারণ মানবচিত্তের অগম্য। তবু ব্যাপক অনুভূতিতে চিত্তের প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ একটা মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। একজন পরিচিত লোককে সাধারণতঃ আমরা দেখে থাকি পরস্পর ব্যবহারজনিত স্মৃতিগত সংস্কারাদির মূর্ত প্রতীকরূপে। অবশ্য এই প্রতীক ক্রমশঃ বদলে যায় নিত্য নূতন ব্যবহার ও প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত সংস্কারপ্রভাবে, এবং এই জন্যই কোনো মানুষের বিশেষ পরিচয় আমরা পেতে পারি না। এই যে পরস্পর সংস্কার-জনিত প্রত্যক্ষ প্রভাব, ইহাই আমাদিগকে সঙ্কুচিত করে রাখে। আমরা ভেবে দেখি না যে আমার এই পরিচিত বন্ধুটি জগতের এক একটি প্রাণীর কাজে এক এক রকমে প্রতিভাত হচ্চেন। মা, বোন, মাসী, পিসি ইত্যাদি যাবতীয় ভেদে বিভিন্ন রকমে পরিচিত হচ্চেন। আমাদের নিজের সম্বন্ধেও তাই। একটা মোটামুটি অস্পষ্টতার মধ্যে আমরা পরস্পরে পরিচিত হই এবং পরিচয় লাভ করি। মানুষের স্বভাবজনিত বিশেষ গুণপ্রত্যক্ষেই আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি ইনি দয়ালু, মেধাবী, কবি, শিল্পী ইত্যাদি। সমন্বয়দৃষ্টিতে এই গুণগুলি এক হলেও প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন দেখি।

এখন আমরা একজন পরিচিত ব্যক্তিকে যদি সবদিক দিয়ে দেখতে যাই তাহলে আমাদের ব্যষ্টিগত সংস্কার পড়বে চাপা, তখন দেখব তার একটি ভিন্নরূপ, মনে হবে যাকে এতদিন যে ভাবে দেখে এসেচি এতো সে নয়; তেমনি আরো ব্যাপক অর্থাৎ মানবজাতিত্বের প্রতীকরূপে কিম্বা প্রাণিত্বের প্রতীকরূপে দেখলে তার সম্বন্ধে পরিচয়ধারণা

যাবে একেবারে বদলে। দেখব বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গেই এর অন্তরঙ্গতা রয়েছে, তখনই সংস্কাররূপ গণ্ডির বাঁধ যাবে ভেঙ্গে; তাকে আরো অন্তরের কাছে টেনে নিতে পারব তখনই যখন দেখব বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক ছন্দে সেও একদিকে পা ফেলে চলেচে; তার বা আমার ব্যবহারজনিত রাগ, দ্বেষ অথবা সুখসৌহার্দ্যের পরিচয়ই যথেষ্ট নয়, আমরা এ ছাড়া আরো ভিন্ন।

এইরূপ ব্যাপক দৃষ্টিতে আমরা সাময়িক ক্রোধ ও দুঃখাদি থেকেও অব্যাহতি পেতে পারি। নিজের দুঃখের সঙ্গে যখন জগতের সকলের দুঃখ এক করে দেখতে যাই তখন নিজের দুঃখ যায় ম্লান হয়ে। রাগান্বিত হওয়ার কারণ ঘটলে একে ব্যাপক বিচারভঙ্গিতে দেখলে আর রাগ হতে পারে না। ধরা যাক একটি নগরীর কোনো গৃহে বসে আমি রাগ করতে যাব এমন সময় যদি একটি অসীম বোধের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে যাই অর্থাৎ—এত বিশাল বিশ্ব যার মধ্যে পৃথিবীর স্থান কোথায় ভেবে পাওয়া যায় না, সেই পৃথিবীর কোনো এক ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত এই নগরী এবং তারই কোন অতি ক্ষুদ্রকায় গৃহে অবস্থিত আমি রাগ করচি। এরূপ ভাবলে রাগের পরিবর্তে হাসিটাই আগে আসে।

এই ব্যাপক অনুভূতি সংস্কারাদি মুক্তিতে যে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; উহা ক্রমশঃ আমাদিগকে অনাসক্ত করে, অহরহ সত্যানুন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। ইহা আমাদের বাস্তবতার রাজ্যে নিয়ে যায়, যেখানে আমাদের হৃদয়ে নিবিড় যোগসূত্র রয়েচে, যেখানে এক আত্মগত মিলনে আমরা সকলে আবদ্ধ, সেখানে উচ্চ নীচ ভেদ নেই, এ জগৎ সে জগৎ নেই, এক শাশ্বত আনন্দে সমস্ত নিমগ্ন, তাই সত্য এবং আমাদের লক্ষ্য।

আমাতে নিখিল

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

নিখিল গানের ধ্বনি
　　আমারি প্রাণেতে বাজে,
বিপুল বিশ্বখানি
　　রাখিনু হৃদয় মাঝে।
সবাকার আরাধনা
　　আমারি পূজাতে মিলে,
যেখানে যত না জানা
　　মানিনু আমারি বলে।
সকলের ব্যথা ক্ষত
　　পুঞ্জিত হল বুকে,
অখিল নর্মস্রোত
　　মিলিল আমারি সুখে।

উদার ধরণী পরে
　　সুন্দর শিব যাহা,
চিত্ত চাহিছে তারে
　　আপন করিয়া নেওয়া।
নিখিল আমাতে হেরি
　　কাটিল ভ্রান্তি ঘোর,
জীবন-সত্য ধরি
　　ধন্য জীবন মোর।

সমালোচনা

বেদান্ত-দর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী প্রণীত। বিশ্বভারতী বর্তৃক প্রকাশিত। ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য উল্লেখ নাই।

বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ 'বেদান্ত-দর্শন'। গ্রন্থকর্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী মহাশয়ার ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য হইলেও কয়েকটি স্থানে সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে কিছুটা ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আগামী সংস্করণে এইদিকে লক্ষ্য রাখিলে গ্রন্থখানি নির্দোষ হইতে পারিবে মনে করিয়া এই সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(১) "রজ্জুকে সর্পরূপে অথবা শুক্তিকে মুক্তারূপে ভ্রম করিলে রজ্জু সর্পত্বে অথবা শুক্তি মুক্তাত্বে সত্যই পরিণত হয় না।" (৫ পৃঃ ২৩ পংক্তি)

এইস্থানে হওয়া উচিত—রজ্জু সর্পে অথবা শুক্তি মুক্তাতে সত্যই পরিণত হয় না। সর্পত্ব ও মুক্তাত্ব যথাক্রমে সর্প ও মুক্তার ধর্ম। রজ্জু ও শুক্তি যথাক্রমে রজ্জুত্ব ও শুক্তিত্বের ধর্মী। ধর্মীর পরিণতি ধর্মে হয় না। দুগ্ধ দধিরূপেই পরিণত হয়, দধিত্ব-রূপে নহে।

(২) "জগৎকে সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ-অনির্বচনীয় বলা হয়।" (৯।২৪) উদ্ধৃতিসূচক চিহ্নের ভিতর অন্য ভাষার উক্তি উদ্ধার করিলে যথাযথরূপে উদ্ধার করাই উচিত মনে করি। বাঙ্গালী পাঠক "সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ" শব্দ হইতে সৎ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্য প্রকার, অসৎ হইতেও বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্য প্রকার, এই অর্থ বুঝিবেন কি? এই স্থলে ভুল সংস্কৃত লেখায় অর্থ জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) "স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন বা অন্তঃকরণ, বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদেহ—এই ষষ্ঠ উপাধি।" (১২।৮)

উল্লিখিত ছয়টিই উপাধি। সুতরাং এই ছয়টি উপাধি বা এই ষড়ুপাধি—এই প্রকার পাঠ হওয়া উচিত।

(৪) "অধ্যাসের অভাবই মুক্তির কারণ বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবিত অবস্থাতেও মুক্তিলাভ হইতে পারে।" (১৯।১১)

মুক্তির কারণ—এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় মুক্তি পদার্থটি কার্য বা অনিত্য ইহা বুঝা যাইতেছে। অদ্বৈতবেদান্তমতে মুক্তি নিত্য পদার্থ, ব্রহ্মস্বরূপ, মুক্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। অধ্যাসের তিরোধান হইলে মুক্তির স্বপ্রকাশতা উপলব্ধ হয়—এইরূপ লিখিলে বোধ হয় সিদ্ধান্তের উপর আঘাত পড়ে না।

(৫) "ত্বৎ ত্বমসি।" (২০।১)

এখানে ত্বৎস্থানে তৎ হইবে।

(৬) "জ্ঞানই মুক্তির কারণ।" (২১।১)

এরূপ স্থলে কারণশব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত কি? প্রকাশক, অবভাসক প্রভৃতি কোনও শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। দার্শনিক প্রবন্ধে কারণ শব্দ দেখিলেই কার্যকারণের কথা মনে জাগে। (দ্রষ্টব্য ৪নং)

(৭) "একটি প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অপর একটি অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞানের নাম অনুমান।" (২২।২৪)

এই লক্ষণ তো দৃষ্টার্থাপত্তি প্রমাণেও অতিব্যাপ্ত হইতে পারে। সরল ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতেও লক্ষণকে অসম্ভব, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত রাখিতেই হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের নাম অনুমান—এইরূপ লক্ষণ করিলেই বোধ করি অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না।

(৮) অর্থাপত্তির আলোচনায় শ্রুতার্থাপত্তিকে গ্রন্থকর্ত্রী স্থান দেন নাই। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র বুঝিতে হইলে শ্রুতার্থাপত্তির জ্ঞানই বিশেষভাবে প্রয়োজন নয় কি? (২৩)

(৯) "প্রলয়কালে প্রত্যেক কার্য স্ব স্ব কার্যে বিলীন হয়।" (৩৭।২২) স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়—ইহাই সিদ্ধান্ত।

(১০) "জগৎ জগতই, ব্রহ্মও নহে জগৎও নহে।" (৫০।১)।

'জগৎও নহে'—এইস্থলে 'জীবও নহে' হওয়াই সঙ্গত বোধ করি।

অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
(শান্তিনিকেতন)

মনস্তত্ত্ব—শ্রীললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ প্রণীত। শ্রীহেমচন্দ্র বণিক্ কর্তৃক রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত। ২৬৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট পুস্তক নাই। আলোচ্য বইখানিতে সেই অভাব আংশিক ভাবে মিটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব বর্তমানে বিজ্ঞানপদবীতে আরূঢ়। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার মনঃসমীক্ষার বৈজ্ঞানিক শৈলী প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। বিভিন্ন মানস ব্যাপার (mental phenomena)-ও আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। তবুও বইখানির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন দ্বারা চরিত্রগঠন, সৎসংস্কারযুক্ত মনের অভাবনীয় প্রভাব ইত্যাদি গ্রন্থকার অতি সহজ ও চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখাইয়াছেন। মোটের উপর মামুলী ধরনের ছাত্রপাঠ্য মনোবিজ্ঞান লেখা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের কল্যাণকর অভিব্যক্তি দ্বারা আমাদের জীবন কি ভাবে সুন্দর ও সুমহান্ হইতে পারে তাহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পেশাদার মনোবিৎ পণ্ডিত যাহাই বলুন, যথার্থ আত্মোৎকর্ষকামী পাঠক এই বইখানা পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কালিদাসের নাট্যকাহিনী—শ্রীভ্রমরী দেবী, বি-এ প্রণীত। এস্ সি সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ, ১-সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৫৩ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা মাত্র।

অমর কবি কালিদাস তিনখানা নাটক লেখেন। উহাদের মধ্যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' সর্বজনসমাদৃত এবং রবীন্দ্রনাথ গোটে প্রভৃতি রসস্রষ্টার সোচ্ছ্বাস প্রশস্তির বিষয়ীভূত। বাকী দুই খানা 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'। লেখিকা এই তিন খানা নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্তমান যুগোপযোগী বাংলা ভাষায় লিখিয়া রসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন বলিতে পারি। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের একটি সুচিন্তিত ভূমিকা বইখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনটি নাটকের সমভাবে সংস্কৃত নাম দেওয়া উচিত ছিল। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' কানে বাজে। রম্যাণি বীক্ষ্য ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কালিদাসোক্তিতে একাধিক অশুদ্ধি লক্ষ্য করিলাম। লেখিকার ভাষা খুবই প্রাঞ্জল। ছাপা, বাঁধান ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

নিত্যকর্ম্ম-স্মৃতিব্যবস্থা-সংগ্রহ—সঙ্কলক ও অনুবাদক শ্রীআশুতোষ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ। প্রকাশক শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ-স্মৃতিরত্ন, ৩৪, তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা। প্রথম খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷০; দ্বিতীয় খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

গ্রন্থকার প্রবীণ স্মার্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্বাহ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত ও তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাগ্রন্থের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের মূল, অনুবাদ ও প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ

হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূমিকা ও পরিশিষ্টাংশে বিধবা-বিবাহ, আপদ্ধর্ম ও বর্তমান সমাজবিপ্লবে কর্তব্যনির্ণয় প্রমুখ বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার হিন্দুমাত্রেরই দৈনন্দিন নিত্যকর্ম স্তব-স্তুতি, শান্তি, পূজা, ধ্যান, প্রার্থনা এবং উপনিষৎ ও গীতোক্ত উপদেশাদি আলোচনা করিয়াছেন। শেষে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী দেবানন্দজীর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে ধর্মানুরাগী হিন্দু নরনারীমাত্রই উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। আমরা এই শাস্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইহার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

প্রভুর আহ্বান—শ্রীঅশ্বিনীকুমার গোস্বামী প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, বহরপুর পোঃ (ফরিদপুর)। ১১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵৹ আনা।

এই সুলিখিত পুস্তিকাখানিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীসুদর্শন—(শ্রীবৃন্দাবন নিম্বার্ক আশ্রমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র)—সম্পাদক—ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার। ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীতারাচাঁদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৲ টাকা।

আমরা এই পত্রের 'জন্মাষ্টমী' বিশেষ সং. (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৪ সন) পাইয়াছি। এই সংখ্যাখানি খ্যাতনামা লেখকগণের মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট উত্তম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী সম্ভাবানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২৭শে ভাদ্র প্রাতে শ্রীমৎ স্বামী সম্ভাবানন্দ মহারাজ ৫৭ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছু কাল পূর্ব হইতে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য মিহিজামে বাস করিতেছিলেন।

স্বামী সম্ভাবানন্দজী ১৯১৭ সনে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া ১৯২৩ সনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-কল্পে তিনি অনেক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে তিনি হাইস্কুলে পরিণত করেন।

স্বামী সম্ভাবানন্দজী কয়েক বৎসর যাবৎ নানা রোগে ভুগিয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহুগুণান্বিত ছিলেন এবং তাঁহার কর্মশক্তি অসাধারণ ছিল। এ জন্য তাঁহার প্রতি অনেকে আকৃষ্ট হইতেন।

স্বামী সম্ভাবানন্দজীর দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ একজন প্রকৃত কর্মযোগী হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক—এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৩ সনে স্বামী নিখিলানন্দজী কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৯৩৯

সন হইতে ইহার নিজস্ব একটি চতুষ্তল গৃহে কার্য পরিচালিত হইতেছে। এই কেন্দ্রে প্রতি রবিবার সকালে প্রার্থনা-সভার অধিবেশন এবং প্রতি শুক্রবার অপরাহ্নে ধ্যানশিক্ষা দান ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আলোচনা হয়। সহস্রাধিক ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উহাতে যোগদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে ১১২ জন ছাত্র সদস্যতালিকাভুক্ত। গত এক বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠানটির আলোচনা-সভা অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইতেছে।

১৯৪৫ সনের ৩১শে অক্টোবর The East and West Association কর্তৃক নিউ ইয়র্ক টাউন হলে স্বামী নিখিলানন্দজী একটি সভায় আমন্ত্রিত হন। ইহাতে তিনি "স্ব স্ব ভাবে ভগবদুপাসনার অধিকার" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৪৬ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি Brooklyn Institute of Arts and Sciences-এ Butterick Endowment Series-এর প্রথম বক্তৃতা দেন। ২৯শে মার্চ দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ আশ্রমগৃহে "ধর্মের তাৎপর্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। নিউ ইয়র্কে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ স্বামী নিখিলানন্দজীর অতিথিরূপে অবস্থান করেন। ১৮ই জুন স্বামী নিখিলানন্দজী নিউ ইয়র্ক টাউন হলে 'হিন্দুধর্মের গূঢ়তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি রেডিও বক্তৃতা দেন। ৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী নিউইয়র্ক টাউন হলে আহূত বিশ্বধর্মসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে খৃষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, কংফুসীয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলামধর্মের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী নিখিলানন্দজী ১৪ই নভেম্বর আশ্রমগৃহে "হিন্দুধর্ম" এবং ১০ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের ধর্মসভায় "মানবসম্পর্ক-সৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের আদর্শ ও দান" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন। এই সভায় সদস্যগণের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুনর্বার ১৯৪৭ সনের ১৪ই জানুয়ারী "মানবসম্পর্ক-সৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় ১৯৪৬ সনেও প্রতিষ্ঠানটিতে দুর্গাপূজা ও ঈশোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজী আমেরিকার আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেবাশ্রম—১৯৪৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও মঠ বিভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, দেবদেবী ও মহাপুরুষগণের জন্মোৎসব এবং ২৯৪টি ধর্মালোচনা বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে।

মঠের পুস্তকাগারে ১৩৪১ খানা পুস্তক আছে। এবার মোট ২১১১ জন পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মোট ২৪ খানা মাসিক পত্রিকা ও দুই খানা দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠাগারে রক্ষিত ছিল।

এই মিশন কর্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। মোট রোগিসংখ্যা ৬৫৬২৭ জন; ইঁহাদের মধ্যে নূতন রোগী ২৪১৬৩ ও পুরাতন ৪১৪৬৪ জন। ১৯৫২ জনকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। দূরবর্তী রোগিগণের চিকিৎসার সৌকর্যার্থে তাঁহাদের জন্য কয়েকটি কুটির আছে। ইহাতে আলোচ্য বর্ষে মোট ২১১৫ জন রোগী ছিলেন।

এবার বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে মোট ১০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। একজন উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৭ জন মঠে বাস করিয়া পড়াশুনা করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৯ জন ছাত্র সারদানন্দ ছাত্রাবাসে বাস করিয়া স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহ ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে

২ জন প্রবেশিকা ও ১ জন আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এবার রামহরিপুর অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২৩ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। এই বিদ্যালয়টিকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী (Class VI) খোলা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সেবাবিভাগ হইতে কালপাথর, আন্দারখোল ও গঙ্গাজলঘাটী থানার ১২টি গ্রামের ৭২০টি পরিবারের ১৪০০ লোকের মধ্যে মোট ২৯॥৯ সের চাল, ৪৩৮ খানা কাপড়, ৫৫টি কোট এবং ১৮টি পরিবারকে ৩৯৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আন্দারখোল ও কালপাথর ইউনিয়নের ৭টি গ্রামের ১৭০ জন দুঃস্থকে সূতা কাটিবার জন্য ২/ মণ পশম দেওয়া হইয়াছিল; সূতার মজুরী মোট ৯৩৪/৬ পাই দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬৭০ জন রোগীর মধ্যে ১ পাউণ্ড ৫ আউন্স ৩ ড্রাম ৩৫ গ্রেণ কুইনাইন, ২৮৮ জনের মধ্যে ১২৩০৭ ভিটামিন ট্যাবলেট এবং ৬৪টি শিশুর মধ্যে ২/৪ গুঁড়া দুধ বিতরিত হইয়াছে।

বর্তমানে আশ্রম-পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রাবাসের ছাত্র, অভিভাবক, সাধু, অতিথি ও ভক্তগণ এবং মঠ ও মিশনের কর্মিগণের জন্য নূতন গৃহ নির্মাণের অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহাতে আনুমানিক কুড়ি হাজার টাকা আবশ্যক।

এতদুপলক্ষে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে: স্বামী মহেশ্বরানন্দ, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, আলমোড়া হিমালয়—হিমালয় ভ্রমণকালে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। ইহার সৌম্যগম্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে তপস্যানুকূল এমন একটি কেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে নিস্তব্ধতা ও শান্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিবে। স্বামীজীর এই শুভ ইচ্ছার ফলস্বরূপে তাঁহারই গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নীরব সাধনায় ১৯১৬ সালে আলমোড়া শহরের অনতিদূরে নির্জন পাহাড়ের ক্রোড়ে সাধন-ভজনোপযোগী একটি মনোরম আশ্রম গড়িয়া উঠে। ইহারই বর্তমান নাম শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর। মঠ-মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন কেন্দ্রে দীর্ঘকাল গুরুতর পরিশ্রমের পর কিছুদিন এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া ধ্যান ধারণা ও শাস্ত্রপাঠাদি করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবে সাধনভজনেচ্ছু সকলকে তপস্যার এই সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না।

ভারতের বিভিন্ন সাধুসম্প্রদায়ের যে সকল পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আলমোড়া হইয়া হিমালয়ের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ কৈলাস, মানস সরোবর, কেদারনাথ ও বদ্রিনারায়ণ দর্শনে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্রামার্থ এই আশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করেন।

এই আশ্রমের পানীয় জল প্রতিদিন লোক-সাহায্যে বহুদূর হইতে আনিতে হয়। ন্যূনকল্পে আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে আশ্রমে জলের কল আনয়ন করিয়া বহুকালের এই অভাবটি দূর করা যাইতে পারে।

আশ্রম-লাইব্রেরিতে সাধু-ব্রহ্মচারিগণের পাঠোপযোগী ধর্ম, দর্শন বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় পুস্তক রাখাও একান্ত প্রয়োজন।

এই আশ্রমের পূর্বোক্ত অভাব-দূরীকরণ ও ব্যয়-নির্বাহের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে: স্বামী বগলানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, আলমোড়া পোঃ, হিমালয়।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব মহোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত জন্মাষ্টমী দিবসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই পুণ্য তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত দেহাস্থি তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক এইস্থানে সমাহিত হয়।

জন্মাষ্টমী দিন প্রাতে, বেলুড় মঠের সাধুগণ বৈদিক আবৃত্তি করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যাবির্ভাব পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ভক্তসমাগমে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। বিভিন্ন স্থানের কালীকীর্তনের দলগুলি সকলের আনন্দ বর্ধন করে। এই দিন এই তীর্থক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ সহস্র ভক্তসমাগম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, পুরী—গত ৭ই আশ্বিন উড়িষ্যার মাননীয় গভর্নর মহোদয় সন্ধ্যাকালে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। বেলুড় মঠের স্বামী শর্বানন্দজী লাইব্রেরী-প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অতঃপর লাইব্রেরী-হলে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হয় এবং কমিটির সভাপতি এমার মঠের মোহন্ত মহারাজ গভর্নর বাহাদুরকে মাল্যভূষিত করেন। স্বামীজী লাইব্রেরীর ইতিহাস ও কার্য-বিবরণী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলে গভর্নর মহোদয় একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। শেষে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য শেষ হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী—গত ২৪শে ভাদ্র কলম্বো-নিবাসী বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ্ ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী ৭০ বৎসর বয়সে আমেরিকায় বোষ্টন শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্বে কলম্বো লণ্ডন নিউইয়র্ক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি বোষ্টন শহরের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস্ বিভাগের প্রাচ্য শিল্পের গবেষক ও পরে কিউরেটর ছিলেন। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ডঃ কুমারস্বামী ৬০ খানা পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহযোগে ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার দেহত্যাগে ভারতবর্ষ একজন খ্যাতনামা শিল্পতত্ত্ববিদ্ হইতে বঞ্চিত হইল।

আমরা এই মনীষীর পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করি।

পরলোকে ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩রা আশ্বিন তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাসভবনে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ রক্তের চাপজনিত ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন; হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হওয়াই তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পঠদ্দশায় ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল বেলুড় মঠে বাস করিয়া

কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আমেরিকায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং ডাব্লিনে ধাত্রীবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং সহৃদয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অভাব হইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে শ্রীযুক্তা বিষ্ণুমোহিনী দেবী—গত ১৯শে ভাদ্র শেষ রাত্রে ভক্তপ্রবর মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা বিষ্ণুমোহিনী দেবী ৬৮ বৎসর বয়সে কাশীধামে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর নিজক্রোড়ে লইয়া তাঁহাকে কয়েকবার আদর করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি পরম ভক্তিমতী বুদ্ধিমতী কর্মনিপুণা ও বিদুষী ছিলেন। বিষ্ণুমোহিনী প্রাচীন সন্ন্যাসিবৃন্দের সহিত ভক্ত রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন। যোগোদ্যানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে তিনি নিজেকে ধন্যা জ্ঞান করিতেন। তিনি যোগোদ্যানকে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুক।

পরলোকে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে—নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলানিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে মহাশয় ৪৫ বৎসর বয়সে গত ১৩ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মণীন্দ্র বাবু ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানের একনিষ্ঠ সেবক এবং স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত লেগো-নিবাসী শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের চরণাশ্রিত নীরবকর্মী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে গত ২২শে শ্রাবণ সজ্ঞানে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর কাল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঝিখিরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছেন। প্রমথ বাবু সরল অমায়িক ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

পরলোকে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কিছুদিন হয় ২৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরার্থপরতা ও সেবাভাব আদর্শস্থানীয় ছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।
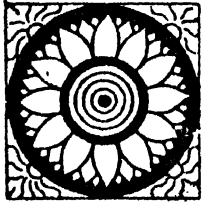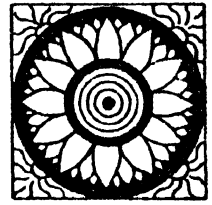
পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি

সম্পাদক

পূর্ববঙ্গে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তথাকার সকল বিভাগেই মুসলমানদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ বিঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল হিন্দু রাজকর্মচারী এবং পুলিসের স্থলে মুসলমান রাজকর্মচারী এবং পুলিস নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে মুসলমান গুণ্ডাদের উৎপীড়নের সুবিধা হইবে আশঙ্কা করিয়া তথাকার হিন্দুরা আতঙ্কিত হইয়াছে। এইজন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজকর্মচারী এবং পুলিস সর্বত্রকেই পশ্চিমবঙ্গে চাকরি দানের প্রলোভন দেখান রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নাই। কেননা, ইহাতে মুষ্টিমেয় হিন্দু রাজকর্মচারী ও পুলিসের সুবিধা হইলেও তথাকার হিন্দু জনসাধারণের বিপদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজকর্মচারীর সংখ্যা এত অতিরিক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বসাইয়া মাহিনা দিতে হইতেছে। এই কারণে পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানী সরকারের অধীনে কার্য করিতে হিন্দু রাজকর্মচারী ও পুলিসদের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইলেও সেখানকার হিন্দু জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাদিগকে সেখানে রাখাই সঙ্গত ছিল। বর্তমানে তথাকার অধিকাংশ মুসলমান রাজকর্মচারীই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন; তাঁহাদের নিকট হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতই সুবিচার পাইতেছে না। ইহার ফলে সেখানে স্থানে স্থানে কতকটা অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের বহু স্থান হইতে প্রতিদিন সংবাদ আসিতেছে যে, 'মুসলিম ন্যাসন্যাল গার্ড' রেল ষ্টিমার ও বাসের হিন্দু যাত্রীদের মালপত্র বিনা ওয়ারেন্টে খানাতল্লাস করিয়া আটক রাখিতেছে। শ্রীহট্টে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ধরিয়া হাজতে পাঠাইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বলপূর্বক হিন্দুদের জিনিস-পত্র লইয়া যাইতেছে। পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গের কয়েকটি শহরে মুসলমান রাজকর্মচারীদের বাসের জন্য হিন্দুদের অনেক বাড়ী অন্যায় রকমে দখল করিয়াছেন। স্থানে স্থানে হিন্দুদের শোভাযাত্রা চিরন্তন পথে যাইতে বাধা দেওয়া হইয়াছে এবং কীর্তন ও পূজায় বাদ্য রহিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে মুসলমান গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের মেয়েদের বিবাহ করিবার দাবী করিতেছে এবং অনেক মেয়ে ও তাহাদের অভিভাবকদের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিতেছে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু জোতদারগণ তাহাদের মুসলমান বর্গাদারগণের নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য

শস্য পাইতেছে না। এখন পূর্ববঙ্গের মুসলমান-মাত্রই হিন্দুর জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি নগণ্য মূল্যেও ক্রয় করিতে প্রায়শঃ নারাজ। কোন মুসলমান উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্থানীয় মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে বাধা দিতেছে। তাহারা প্রকাশ্যে বলিতেছে যে, হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের সকল সম্পত্তি অধিকার করিবে। অধিকাংশ থানায় এই সকল গুরুতর অপরাধের এজাহার গ্রহণ করা হইতেছে না এবং কোর্টে নালিশ করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। পূর্ব-পাকিস্তানের কংগ্রেস পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তাঁহার বিবৃতিতে এই অভিযোগগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সকল বিষয়ে অভিযোগ করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তারা হয় এ বিষয়ে উদাসীন, না হয় বিশৃঙ্খলা দমনে অত্যন্ত দুর্বল।" ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকার হিন্দুদের চিরন্তন জন্মাষ্টমীর মিছিলের লাইসেন্স দেওয়া সত্ত্বেও একদল অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানের বাধা দানের ফলে উহা কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মচারি-গণের চক্ষের সম্মুখে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলেও তাঁহারা ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিক্রিয়াপন্থী মুসলমানদের প্রভাব এখনও সামান্য নহে। কিরণশঙ্কর বাবু তাঁহার বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্তানী সরকারের নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কার্যেও হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা যাহাই বলি না কেন, কংগ্রেস যখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তখন যাঁহারা নিরাপদ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যাইতে পারেন।" সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্তানের পুনর্মিলন-প্রচেষ্টাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে পাকিস্তান-রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে এবং পাকিস্তান-রাষ্ট্র সম্বন্ধে তথাকার হিন্দু-মুসলমান জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

এই সকল কারণে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুগণ সেখানকার পাকিস্তানী গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহাদের ধর্ম সংস্কৃতি ধন প্রাণ ও সম্মান নিরাপদ মনে করিতেছে না। পশ্চিম-পাকিস্তানের কয়েকটি প্রদেশে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখকে নিতান্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইয়া পার্শ্ববর্তী হিন্দু-প্রধান অঞ্চলসমূহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তানী পশ্চিমপাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে উহা অবর্ণনীয়। এই হতভাগ্যগণকে তাহাদের কোন অস্থাবর সম্পত্তিও সঙ্গে আনিতে দেওয়া হয় নাই। উচ্চপদস্থ পশ্চিম-পাকিস্তানের কর্মচারিগণ পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিয়াও মতলব করিয়াই তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ও শিখ অধিবাসিগণকে যে রক্ষা করেন নাই ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিষদের ভূতপূর্ব ডেপুটি স্পিকার শ্রীযুক্ত গিরিধারী লাল পুরীর বর্ণনায় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। অবশ্য পশ্চিম-পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ারূপে পূর্বপাঞ্জাবের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু ও শিখ অধিবাসিগণ কংগ্রেসের আদেশ অমান্য করিয়া তথাকার মুসলমান অধিবাসি-গণকে তাড়াইয়া দিয়াছে। তবে তাহাদের

অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়ন গবর্নমেণ্টের রিলিফ ও পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছেন, "আগামী পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমপাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশ হিন্দু ও শিখ এবং পূর্বপাঞ্জাব মুসলমান-শূন্য হইবে।" এই কল্পনাতীত দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আতঙ্ক চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশ কয়টিতে যাহা ঘটিয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানেও তাহা ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ প্রকৃতই আতঙ্কিত হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় তথাকার ধনবান ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। এজন্য সেখানকার দরিদ্র ও অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণ ক্রমেই অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতেছে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের এই পরিস্থিতিকে কেবল ভাব-প্রবণতার দিক হইতে দেখিয়া আশান্বিত মনে করিলে চলিবে না, পরন্তু বাস্তব সত্যের দিক হইতে যদি ইহা নিরাশা-ব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও স্পষ্টভাবে তাহাদিগকে সময় থাকিতে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, ইহার উপর তাহাদের ধন-প্রাণ নির্ভর করে। ভাব-প্রবণতার দিক হইতে সকলেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে পাকিস্তান-রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত আনুগত্য স্বীকার এবং সংঘবদ্ধ ভাবে আপনাদের ন্যায্য অধিকার-সমূহ রক্ষা করিয়া মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া থাকিতেই উপদেশ দেন এবং আমরাও এই ব্যবস্থারই একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই উপদেশ পাকিস্তান-রাষ্ট্রের নীতিবিরুদ্ধ কি না। যদি ইহা পূর্ববঙ্গ গবর্নমেণ্টের রাষ্ট্র-নীতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তথাকার সংখ্যালঘু হিন্দুগণের পক্ষে নিরাপদে বাস করা কদাচও সম্ভব হইবে না। এই জন্য পূর্ব-পাকিস্তান-রাষ্ট্রনীতির উপরই তথাকার হিন্দুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে। সুখের বিষয় যে, বাস্তব সত্যের দিক হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা এবং তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করাই পূর্ব-পাকিস্তান-রাষ্ট্রের নীতি বলিয়া তথাকার উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর বাবু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, নাজিমুদ্দীন-মন্ত্রিমণ্ডলীর এই ঘোষণা মৌখিক নহে পরন্তু আন্তরিক। তাঁহারা হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেই একান্ত আগ্রহান্বিত। মিঃ নাজিমুদ্দীন এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী অনেকবার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুসলমান গুণ্ডা এবং মুসলিম ন্যাসন্যাল গার্ডদের বেআইনী কার্যসমূহ একেবারেই সমর্থন করেন না। হিন্দুদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও তাঁহারা বারংবার দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় কার্যতঃ ইহার সন্তোষজনক বিরুদ্ধ-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করা হিন্দুদের পক্ষে সমীচীন নহে।

সুখের বিষয়, পূর্ব-পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিবৃতি ও বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া কার্যতঃও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গত শারদীয়া পূজা ও ঈদ পূর্ববঙ্গের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কোন স্থানেও সংঘবদ্ধ ভাবে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। শারদীয়া পূজায়

সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ হিন্দু-মুসলমানে শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পর্যটন করিয়া এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং কর্মিগণ সমবেত ভাবে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহার ফলে তথাকার হিন্দুদের আতঙ্কও ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ঐ সময়ে কিরণশঙ্কর বাবুও প্রচার উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে গিয়াছিলেন। তিনি মানিকগঞ্জের এক জনসভায় বলিয়াছেন, "পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছে পাঞ্জাবের তুলনায় ঐ সকল নগণ্য। পূর্ব-পাকিস্থান সরকারকে এখন নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারা হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিতে যথার্থই আগ্রহান্বিত। এজন্য আতঙ্কে ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র না যাইয়া আপনাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষা করাই হিন্দুদের কর্তব্য। দেখা যাইতেছে—কিরণশঙ্কর বাবু তাঁহার প্রথম বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের সক্ষম হিন্দুগণকে অন্যত্র যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইতোমধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে স্থানত্যাগ না করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সকল নেতাই সমস্বরে এখন এই উপদেশই দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক বিশিষ্ট নিরপেক্ষ ব্যক্তি পূর্ববঙ্গ পর্যটন করিয়া এইরূপ বিবৃতিই সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছেন।

প্রশ্ন উঠিতেছে—পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই যদি তথাকার যথার্থই রাষ্ট্রনীতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেখানকার হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ করা হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ লীগনেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজশক্তির সাহায্যে বাংলাদেশে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়াছেন, উহার ফলেই তথাকার হিন্দুদের উপর বিক্ষিপ্ত ভাবে অত্যাচার চলিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা মুসলিম লীগের নীতি ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লীগপন্থীদের এই নীতি সফল হইয়াছে। এখন পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষা করিবার জন্য তথাকার হিন্দুদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করাই লীগের বর্তমান রাষ্ট্রনীতি বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বহু কালের সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে যে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এখন অল্প দিনের চেষ্টায় উহা সম্পূর্ণ ভাবে দমন করা উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের অক্লান্ত চেষ্টায়ও সম্ভব হইতেছে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা ঢাকা ও নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সংঘবদ্ধ ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হইয়াছিল, পাকিস্তান স্থাপিত হইবার পর সেরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাংলাদেশের কোন স্থানে এ পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয় নাই। যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে বিতাড়িত করাই পূর্ব পাকিস্তান-রাষ্ট্রের নীতি হইত, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মুসলমানদের একচ্ছত্র প্রাধান্যপূর্ণ স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানে এই নীতি অতি সহজেই এতদিনে অবলম্বিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সত্য বটে, পশ্চিমপাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু ও শিখ বিতাড়ন-নীতি অবলম্বিত

হইয়াছিল এবং সিন্ধু-প্রদেশেও অনেকটা এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটি পাকিস্তানী প্রদেশ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলসমূহ দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত, পক্ষান্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় চারি দিকেই হিন্দুপ্রধান অঞ্চলসমূহ বিদ্যমান। এ অবস্থায় যদি পূর্ববঙ্গে হিন্দুবিতাড়ন-নীতি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে চারিদিকের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলসমূহে ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্তিত্ব যে অত্যন্ত বিপন্ন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পশ্চিম-পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-বিতাড়ন-নীতি অবলম্বিত হইলে অর্থনীতির দিক দিয়াও এই রাষ্ট্র অচল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কারণ, তথাকার হিন্দুগণ ধন-সম্পদ ও শিক্ষায় মুসলমানদের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানের ন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-বিতাড়ন-নীতি এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে বর্তমানে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর স্থানে স্থানে যে উৎপীড়ন হইতেছে ইহা তথাকার রাষ্ট্রনীতি না হইলে এবং এই সকল দুষ্কার্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সমর্থন না থাকিলে ক্রমে হ্রাস পাইবে। সেখানকার মুসলমান জনসাধারণও এই অরাজকতা সমর্থন করে না। এখন সমগ্র দেশ এক অশ্রুতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এরূপ অবস্থায় স্থানে স্থানে কতকটা অরাজকতা অস্বাভাবিক নহে। সংবাদ-পত্র পাঠে জানা যাইতেছে এবং আমরাও বহু স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি যে, পূর্ববঙ্গে অরাজকতা ক্রমেই কমিতেছে। কিরণশঙ্কর বাবু জানাইয়াছেন, "পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ এবং সেখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুদের সহিত শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইলেও তাহারা অধিকাংশ লোককে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে এবং গবর্নমেণ্টকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের কাজ সহজ করিয়া তুলিতেছে খবরের কাগজগুলির মিথ্যা সংবাদ-প্রচার। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, গবর্নমেণ্ট যদি গুণ্ডা, মিথ্যা সংবাদ-প্রচার এবং সমাজের অন্যান্য অহিত-কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই অবস্থা সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে।"

আর একটি দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানের দুই নেশনবাদ-নীতির সমর্থনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখন তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতেছে যে, হিন্দু-মুসলমানকে দুই নেশন বলিয়া স্বীকার করিলে ভারতীয় মুসলমানগণকে ভারতে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বা বিদেশী রূপে থাকিতেই হইবে। পাকিস্তান প্রদেশ কয়টিতে ভারতীয় ইউনিয়নের সাড়ে চার কোটি মুসলমানের স্থান হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। কাজেই ভারতীয় মুসলমানগণকে ভারতে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণ ভারতীয়রূপে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানকে এক নেশন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, বর্তমানে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ থাকিলেও দুই নেশন থাকিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষেও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় হইলেও দুইটি পৃথক নেশন নহে। উভয়ের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও শিল্পনৈতিক

স্বার্থ এবং সাহিত্য ভাষা প্রভৃতিও এক। বিহার গবর্নমেণ্টের পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ আব্দুল কাইয়ুম আনসারী বলিয়াছেন, "মিঃ জিন্নার দুই নেশনবাদ কেবল মুসলমানদের পক্ষে নহে পরন্তু দেশের পক্ষেও বিপজ্জনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও অন্যান্য মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানগণ পাকিস্তানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু এখন তাহারাই বিশেষ বিপদগ্রস্ত।" এই সকল কারণে লীগপন্থীদের দুই নেশনবাদ প্রয়োজনের প্রেরণায় ভারতীয় ইউনিয়নে পরিত্যক্ত হইবেই। ইহা কার্যে পরিণত হইলে পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানও এক নেশন বলিয়া নিশ্চয় পরিগণিত হইবে। ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে স্বতঃই চেষ্টা করিবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে উভয় রাষ্ট্রের পুনর্মিলনও সম্ভব হইবে।

এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ একেবারে নৈরাশ্যজনক বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ঘরবাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। পশ্চিমবঙ্গের সংকীর্ণ এলাকায় পূর্ববঙ্গের প্রায় দেড় কোটী হিন্দুর স্থান সঙ্কুলন এবং আহার্য সংগৃহীত হওয়াও অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে হাজারকরা পাঁচ-সাতটি পরিবারেরও পৈতৃক আবাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করিবার উপযোগী সঙ্গতি নাই। এরূপ অবস্থায় তথাকার দরিদ্র হিন্দুজনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া তাহাদের পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে সকল দিক দিয়াই দুঃখের সাগরে পতিত হইতে হইবে। এ জন্য যে পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান সরকার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কার্যতঃ হিন্দু-বিতাড়ন-নীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের ধর্ম সংস্কৃতি ধন প্রাণ একেবারে বিপন্ন না করেন এবং তাহাদিগকে ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করিতে আগ্রহ দেখান, সে পর্যন্ত মুষ্টিমেয় গুণ্ডার অত্যাচারে আতঙ্কিত হইয়া পূর্ববঙ্গের কোন হিন্দুরই পৈতৃক আবাস ত্যাগ করা উচিত নহে। চরম বিপদের সম্মুখীন না হইলে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসঙ্গত। বর্তমান অরাজকতা দমনে যখন তথাকার রাষ্ট্রের সমর্থন আছে, তখন হিন্দুগণ সংঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিলে ইহার মূলোচ্ছেদ করাও তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন হইবে না। ইহাতে ভারতীয় ইউনিয়নেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুদের সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ বিরোধ অনৈক্য অসামঞ্জস্য অধিকার-বৈষম্য অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা প্রভৃতি যে সকল সর্বনাশকর ব্যাধি আছে, এই গুলি দূর করিয়া সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলেই বর্তমান অরাজকতা বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এজন্য পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক জেলা মহকুমা এবং প্রধান প্রধান গ্রামে 'হিন্দুদের অধিকার রক্ষা সমিতি' এবং ইহার অধীনে এক একটি সুগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকা আবশ্যক। কোন স্থানে এক জন হিন্দুরও ন্যায্য অধিকার কেহ নষ্ট করিলে, সেখানকার সমিতি সর্বপ্রযত্নে উহার প্রতিকার এবং হিন্দুমাত্রেরই ধন প্রাণ সম্মান অবশ্য রক্ষা করিবে। এইরূপ ভাবে কার্য করিলে সকল হিন্দুরই ন্যায্য অধিকার রক্ষা পাইবে, এবং আতঙ্কও অন্তর্হিত হইবে। এই সকল কারণে পুনরায় আমরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ না করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একলা পথের পান্থ হ'য়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে,
"বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই"
এ মন্ত্র দিলে।

কাটলে বাঁধন পরতে রাখী,
তোমায় বলে কে বৈরাগী?

প্রাণমৃণালে যার ফলে নীল কমল প্রেমের সুখ-অনিলে!
ছাড়লে নিখিল ছড়িয়ে দিতে নিখিলনাথে এ-নিখিলে।

অঢেল' মেলে মুগ্ধ মুনি, যশের যোগী শক্তি-অধীর,
কোটির মাঝে গুটিক মেলে আত্মভোলা প্রেমের
ফকির।

তাই তো হ'য়ে সর্বহারা
ভাঙলে পলে পাষাণকারা,

অহঙ্কারের মরণ শেষে অমরণীর গান গাহিলে
সবার তরেই আপন পরের অবোধ মোহ কাটিয়েছিলে।

"একৈবাহং জগত্যত্র"

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

রক্তবীজকে বধ করিবার জন্য লীলাময়ী মহামায়া নিজের দেহ হইতে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির প্রকাশ করেন। দৈত্যবিধ্বংসিনী মহাশক্তির এই লীলাসঙ্গিনীগণ রণক্ষেত্রে দেবীর পার্শ্ববর্তিনী হইয়া সসৈন্য রক্তবীজ ও নিশুম্ভাসুরকে সংহার করিলেন। দেবীশক্তির অমোঘ আক্রমণে দানবসমূহ বিনষ্ট ও বিপর্য্যস্ত দেখিয়া হতসৈন্য, অমিতবীর্য্যশালী দানবাধিপতি শুম্ভ যুদ্ধের জন্য মহামায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দম্ভভরে বলিল—"হে বলদর্পাভিমানিনি দুর্গা! তুমি আর বলের গর্ব্ব করিও না। অপরের শক্তির সহায়তায় তুমি যুদ্ধ করিতেছ, সুতরাং তোমার শক্তির অহঙ্কার বৃথা।" বলদর্পোদ্ধত দানবপতির এই দম্ভোক্তি শুনিয়া দেবী বলিয়াছিলেন—"একৈবাহং জগত্যত্র"—ওরে দুষ্ট দানব! এই জগতে এক আমিই আছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই। অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই আমি, আমার সত্তার অতিরিক্ত কোন কিছুই নাই।

করুণাপরায়ণা বিশ্বরূপিণী মহামায়া দাম্ভিক দানবের অজ্ঞতাসম্ভূত ভ্রম অপনোদন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য খুব গভীর ও ব্যাপক। এই কথাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আরও অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। উপনিষদে যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় অদ্বৈত-তত্ত্বের নির্দ্দেশ আছে, দেবীর এই কথাদ্বারা সেই তত্ত্বই সূচিত হইতেছে।

উপনিষদে আছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই একটী অখণ্ড সত্তার অন্তর্গত, সেই অখণ্ড সত্তার বাহিরে কোন কিছুই নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (নৃঃ তাঃ ৭), "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।১), "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" (ঈশ ১) ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যদ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্ত, অব্যক্ত যাহা কিছু পদার্থ আছে তাহা সমস্তই এক ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই ব্রহ্মময়। মহামায়ার "একৈবাহং"—এই উক্তিদ্বারাও উপনিষদুক্ত এই পরম তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

উপনিষদ বলে—ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই, সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মই রহিয়াছেন। বহুরূপে যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তাহা মায়িক মাত্র;—বহুত্বের বাস্তব সত্তা নাই। এক সত্তাই নাম ও রূপের সাহায্যে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; নাম এবং রূপ বাদ দিলে সমস্তই এক হইয়া যায়। এই পরম দুর্জ্ঞেয় ও জটিল তত্ত্ব প্রতিপাদন করার জন্যই মহামায়া বলিলেন—"একৈবাহং"।

বিষয়টী আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা না করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে না। মহামায়ার স্বরূপ কি; সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের স্বরূপই বা কি; কি ভাবে নামরূপের সাহায্যে একের বহুরূপ অবস্থা হয় এবং নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত সেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত মহামায়ার সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলে "একৈবাহং"—এই কথার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবে না।

প্রথমতঃ মহামায়ার স্বরূপ কি এই প্রসঙ্গে মহর্ষির সিদ্ধান্ত আলোচনা করা যাক। মায়া-বিমুগ্ধ হৃতরাজ্য রাজা সুরথ মেধস মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:

ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
(চণ্ডী—১৬০)

"ভগবন্! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তাঁহার উৎপত্তি কিরূপে হইল এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি প্রকার?" রাজা সুরথ আরও জানিতে চাহিলেন—মহামায়ার স্বভাব ও স্বরূপ কিরূপ ও তাঁহার উৎপাদক কে?

এই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যের অবতারণা। সুতরাং দেবী মহামায়াকে বুঝিতে হইলে এই প্রশ্নের উত্তর বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। রাজা সুরথের এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাহা বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার সারার্থ এই—"বিশ্বরূপিণী মহামায়া নিত্যা এবং নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্রী। তাঁহার উৎপত্তি নাই কিন্তু তিনি সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রয়োজনানুরূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন এবং এই আবির্ভাবকেই তাঁহার জন্ম মনে করা হয়। তিনিই এই বিশ্বের অধীশ্বরী—নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতিও বিনাশের কারণও তিনি। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন—জগতের মূলাধাররূপে তিনিই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অন্তকালে মহাকালীরূপে তিনিই জগৎ সংহার করিবেন। তিনিই শক্তিস্বরূপা, জীব বর্গের অভ্যন্তরস্থিত বোধস্বরূপা, সৌন্দর্য্য আশ্রয়ভূতা ও তুষ্টিস্বরূপা। সৎ বা অসৎ বলিতে যাহা কিছু আছে সেই সমুদ পদার্থের তিনিই সত্তাস্বরূপা।

ঋষিকথিত মহামায়ার এই স্বরূপ বর্ণ-

হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু ব্যাপিয়া যে সত্তা রহিয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীর চেতনারূপে যাহা প্রতিভাত হয়, সেই সমুদয় মিলিত হইয়াই মহামায়া। জড় ও চেতন এই দ্বিধা বিভক্ত সমস্ত পদার্থ মহামায়ারই স্বরূপ, মহামায়াকে বাদ দিলে কোন কিছুই থাকে না।

দেবীসূক্তেও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়:

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ইত্যাদি।

"আমিই রুদ্র ও বসুগণের সহিত অবস্থান করি। আমি মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করি।"

দেবীসূক্তের অন্যান্য মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই—"অখিল বিশ্বে আমিই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত। আমিই জীবাত্মারূপে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। দ্যুলোক, ভূর্লোক এবং অন্তরিক্ষলোকে আমি অধিষ্ঠিত এবং এই লোকত্রয় অতিক্রম করিয়াও আমি বিরাজ করিতেছি। এই বিশ্বরাজ্যের আমিই অধীশ্বরী, যাজ্ঞিকদিগের হৃদয়ে জ্ঞানযজ্ঞের দিব্যালোক আমিই প্রথম বিস্তার করি, দেবতাগণ নানাস্থানে বিবিধ রূপে আমাকে প্রকাশিত করিয়াছেন; আমার স্থান অসীম ও অনন্ত, সর্ব্বত্র বহুরূপে আমিই পরিব্যাপ্ত। আমার সাহায্যেই সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে;—আমাকে না জানিলে অজ্ঞানান্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। রুদ্রদেব যখন শত্রুনাশে উদ্যত হন—আমিই তাঁহাকে ধনুঃ ও অস্ত্র দান করিয়া শক্তিমান্ করি। আমিই বায়ুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করি, আমিই আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি।"

মহামায়ার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপবর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় জলে-স্থলে, আকাশে বাতাসে, দ্যুলোকে ভূলোকে গোলকে সর্ব্বত্র তিনিই বিভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন। যিনি জীবের চৈতন্য-রূপিণী, দেবতারা এমন কি মৃত্যুপর্য্যন্ত যাঁহার বশীভূত, অমৃত যাঁহার ছায়া—সেই মহামহিম-শালিনী আনন্দময়ী বিশ্বপ্রকৃতিই মহামায়া। অভ্রভেদী পর্ব্বতসঙ্কুলা কাননকুন্তলা সমুদ্রমেখলা এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবী তাঁহারই সৃষ্টি; চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কনিচয় তাঁহার প্রভাতেই জ্যোতির্ম্ময়। বিশ্বভুবনের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ অপরিসীম কর্ত্তৃত্ব ও মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাই মহামায়ার স্বভাব—ইহাই তাঁহার স্বরূপের পরিচয়। তিনি সকলের উৎপত্তির কারণ কিন্তু তাঁহার উৎপত্তির কারণ কেহ নাই। সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে মেধস মুনি এই মহামায়ার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎস্বরূপা মহামায়া কখনও যোগ-নিদ্রারূপে, কখনও মহিষমর্দ্দিনীরূপে, কখনও বা বিষ্ণুমায়ারূপে আসুর শক্তি খর্ব্ব করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই মহামায়াই শুম্ভাসুর-বধকারিণী।

এখন বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মসম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃংহধাতুর অর্থ বৃদ্ধি, এই বৃদ্ধির যাহাতে পরাকাষ্ঠা তাহাই ব্রহ্ম। এইরূপে অর্থানুসন্ধান করিলে স্পষ্টতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সর্ব্বত্রই যাঁহার সত্তা বিদ্যমান তিনিই ব্রহ্ম। কারণ সর্ব্বত্র যদি সত্তা না থাকে, কোনও দেশে বা কোনও কালে যদি ব্রহ্মসত্তার অভাব থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মকে সর্ব্ববৃহৎ বলা যায় না। কারণ কোনও দেশে বা কালে অভাব থাকিলেই তাঁহাকে সসীম বলিতে হয় এবং

সীমার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে তাঁহার বৃহত্ত্বের হানি ঘটে। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের দ্বারাই বুঝা যায় যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক।

বিভিন্ন উপনিষদেও ব্রহ্মের এই সর্ব্বব্যাপকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অদ্বিতীয় এক সৎস্বরূপই ছিল। সৃষ্টির পরেও এই অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হয়। যেমন ফুলের মালার মধ্যে একই সূত্র প্রতিটি ফুলের সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ এই সৎ বস্তুও জড় বা চেতন যে কোন জাগতিক পদার্থই ধরা যাক সকলের মধ্যে অনুস্যূত। ফলকথা এই, জগতে বিদ্যমান সমস্ত বস্তু সম্বন্ধেই "এই বস্তুটি আছে" এইরূপ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানের ভিতরে "আছে" এই অংশ দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয়। এই অস্তিত্বই সৎস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ। যাহার কোনও কালে কোনও দেশে অস্তিত্ব থাকে না সে কখনও বস্তু হইতে পারে না। বস্তু অর্থই অস্তিত্বশীল পদার্থ।

এই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, ব্রহ্মের তুলনায় বিশ্বের অন্য সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সত্য" সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই নাম বলা হইয়াছে ;—"তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্" (ছাঃ ৮।৪।৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলা হইয়াছে "তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি" (বৃঃ ২।১।২০)। এইরূপে অন্যান্য উপনিষদেও একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই পারমার্থিক সত্য বলিয়াছে।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক এবং এক। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্মের তুলনায় জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মেরই মায়িক অভিব্যক্তি মাত্র।

মহামায়ার স্বরূপবর্ণনায়ও দেখিতে পাওয়া যায় মহামায়াই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত এবং সমস্ত পদার্থস্বরূপা। মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি প্রথমেই বলিয়াছেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"—জগৎস্বরূপা মহামায়াই নিত্য। যাহা নিত্য তাহাই সত্য এবং সৎপদার্থ—ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সৎস্বরূপ ব্রহ্ম এবং মহামায়া একই পদার্থ।

মহামায়াও জগদ্‌ব্যাপিনী। ঋষি বলিয়াছেন —"ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর"— মহারাজ! সেই মহামায়াই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। মহামায়া সর্ব্বব্যাপিনী এবং এই বিশ্বব্যাপকতার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপা। এই মহামায়াকে স্তব করিবার কালে দেবগণও দেবীর একত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্বের উল্লেখ করিয়াছেন "ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ"— মাতঃ এক তুমিই অদ্বিতীয়রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াকে স্তব করিবার কালে ব্রহ্মা বলিয়াছেন :

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥

"হে সর্ব্বস্বরূপিণী! যেখানে যে কোনও বস্তু আছে, তাহা সৎ বা অসৎ যাহাই হউক না কেন সেই নিখিল বস্তুর শক্তিস্বরূপা তুমি, সুতরাং তোমাকে আর কি স্তব করিব।" এইস্থানে মহামায়াকে 'অখিলাত্মিকে' সম্বোধন করায় এবং সমস্ত পদার্থের শক্তিস্বরূপা বলাতে মহামায়ার অদ্বিতীয়ত্ব এবং সর্ব্বব্যাপকত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ও বিভিন্ন উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেও মহামায়াই যে ব্রহ্মস্বরূপা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মের লক্ষণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

(তৈঃ ২।১) ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অখণ্ড। বৃহদারণ্যক বলিয়াছে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ ইহা এখানে পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং মহামায়াও সৎস্বরূপিণী ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক মহামায়া চিৎস্বরূপা এবং আনন্দস্বরূপা কি না। যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার স্তবের ভিতরে দেবীকে বোধস্বরূপা বলা হইয়াছে। "ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা" —তুমিই বোধস্বরূপা বুদ্ধি। শুম্ভাসুরপীড়িত দুর্ব্বল দেববৃন্দ ও বিষ্ণুমায়ারূপিণী মহামায়ার স্তবের ভিতরে দেবীকে চৈতন্যস্বরূপা বলিয়াছেন :

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

"যে দেবী নিখিল প্রাণিবর্গের অভ্যন্তরে চেতনারূপে বিরাজ করেন তাঁহাকে নমস্কার করি।" আরও বলিয়াছেন :

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।

"যিনি চৈতন্যরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার করি। সুতরাং মহামায়া যে চৈতন্যময়ী ইহাতে আর সন্দেহের সম্ভাবনা নাই, এই চৈতন্যময়ী মহামায়ারই অপর নাম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। অতএব মহামায়ার চৈতন্যময় ব্রহ্মত্ব সুপরিস্ফুট।

ব্রহ্ম আনন্দময় ইহা পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাউক মহামায়াও আনন্দময়ী কি না। ব্রহ্মাকৃত মহামায়ার স্তবে মহামায়াকে তুষ্টিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "তুষ্টিস্ত্বং" তুমিই তুষ্টি। বিষ্ণুমায়ার স্তবে আছে "সুখায়ৈ সততং নমঃ" সুখস্বরূপা সেই দেবীকে সর্ব্বদা নমস্কার। আবার দেবীকে সর্ব্ব প্রাণীর তুষ্টিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।" যোগনিদ্রার স্তবে ব্রহ্মা মহামায়াকে অমৃতস্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে" হে শাশ্বতরূপিণি! সর্ব্ববিকাররহিতে! তুমি সুধাস্বরূপা। অতএব দেবী মহামায়া আনন্দরূপিণী। ইহা দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, উপনিষদুক্ত আনন্দময় ব্রহ্ম এই মহামায়ারই স্বরূপ।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে ব্রহ্মকে সর্ব্ব জগতের অধীশ্বর বলা হইয়াছে—"এষ সর্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" (মাঃ ৬) "এই ব্রহ্ম সকলের ঈশ্বর, এই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, এই ব্রহ্ম সকলের কারণ—ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও ব্রহ্মকে সকলের ঈশ্বররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৬।৮)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ ………এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২)—এই ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সকলের অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, সর্ব্বলোকের বিভাজক ধারক এবং পোষক। এইরূপ অন্যান্য উপনিষদের বর্ণনা হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় ব্রহ্মই জগতের প্রভু, অধীশ্বর, তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে।

মহামায়ার বর্ণনাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনিই জগতের অধীশ্বরী, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিয়াছে। মেধস ঋষি প্রথমেই বলিয়াছেন—"সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী"—সেই মহামায়াই সকল ঈশ্বরেরও অধীশ্বরী। হরিনেত্রকৃতালয়া যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াকে 'বিশ্বেশ্বরী' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে— "বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহারকারিণীম্।" স্থিতি ও সংহারকারিণী জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরীকে

স্তবরত দেবগণ দেবী মহামায়াকে চরাচর জগতের ঈশ্বরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য"—হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী। যোগনিদ্রাকেও পরমেশ্বরী বলিয়া ব্রহ্মা স্তব করিয়াছেন—"পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী"—শ্রেষ্ঠ হইতেও তুমি পরমশ্রেষ্ঠ,—তুমিই পরমেশ্বরী। শুম্ভাসুরমর্দ্দিনীকে দেবতাগণ ভক্তিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন:

> বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
> বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
> বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

"তুমি বিশ্বেশ্বরী, সুতরাং বিশ্বজগত পালন করিতেছ,—তুমিই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ—সুতরাং তুমি বিশ্বাত্মিকা। বিশ্বের যাঁহারা অধীশ্বর (ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি) তাঁহারাও তোমাকে বন্দনা করেন। যাহারা ভক্তিনম্র চিত্তে তোমাকে ভজনা করে সমগ্র বিশ্বই তাহাদের আশ্রয়।"—দেবীমাহাত্ম্যের বহুস্থলেই মহামায়াকে সকল জগতের অধীশ্বরী, পালনকর্ত্রী প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদে বর্ণিত সর্বেশ্বর ব্রহ্ম ও মহামায়া এই কথা বলা চলে। ব্রহ্মই জগতের নিয়ামক—ইহা উপনিষদে পাওয়া যায়, মহামায়াও জগতের পালনকর্ত্রী। পালন করিতে হইলেই সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, সুতরাং মহামায়াই জগতের নিয়ন্ত্রী। তাঁহার ইচ্ছাতেই চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারকাখচিত আকাশমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক প্রতিমুহূর্ত্তে নিয়মিত পথে পরিচালিত হইতেছে। এই মহামায়াই মহাশক্তিরূপে সর্বত্র বিরাজ করিয়া নিখিল বিশ্বকে শক্তিশালী করিতেছে।

উপনিষদুক্ত সৎস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বেদে নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "একই সদ্‌বস্তুকে তত্ত্বদর্শিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন:

> ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহ
> রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
> একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
> অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

একই সদ্‌বস্তুকে পণ্ডিতেরা বহুরূপে বহু নামে কল্পনা করিয়া থাকেন—"একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" (ঋগবেদ ১।১১৪।৫)। উল্লিখিত এই বৈদিক সূক্তে "বদন্তি" "কল্পয়ন্তি" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগবিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ, নানাত্ব বা বহুত্ব ব্রহ্মের কল্পিতরূপ মাত্র, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। নানাত্ব বা বহুত্ব ব্রহ্মের প্রকৃত স্বভাব হইলে "বদন্তি" বা "কল্পয়ন্তি" ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা যাইত না। যাহা কল্পিত তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না; সুতরাং নানাত্ব সত্য নহে—একত্বই সত্য ইহাই বৈদিক মন্ত্রের অভিপ্রায়। এক ব্রহ্মই মায়াস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হন—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮)—ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন এবং বিবিধরূপে প্রতিভাত হন। এখানে ইন্দ্রশব্দের অর্থ পরমেশ্বর। এই মন্ত্রসমূহ হইতে বহুত্ব একেরই বিভিন্নরূপে মায়িক অভিব্যক্তি মাত্র ইহা পরিস্ফুট হইল।

লীলাময়ী মহামায়াও অদ্বিতীয় এবং মায়াবশতঃ নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ইহা পাওয়া যায়। দেবী নিজেই শুম্ভাসুরকে বলিয়াছেন:

> অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
> তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥

"আমি বিভূতিদ্বারা এখানে যে বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম,—সেই বহুরূপ প্রতিনিবৃত্ত

করিলাম, যুদ্ধে আমি এখন একাই আছি, এইবার যুদ্ধে স্থির হও।" দেবী বিভূতির সাহায্যে বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিভূতিই মায়া, এই বিভূতির সাহায্যেই লীলাময়ী মহামায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, এই বিভূতির সংস্পর্শেই দেশকালের অতীত হইয়াও নাম ও রূপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। মায়া ব্যতিরেকে অসীম অখণ্ডস্বরূপা বিশ্বব্যাপিনীর মানুষের ধারণার উপযোগী সসীম মূর্ত্তিতে প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে না। যিনি বিশ্বাতিগ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার এক ক্ষুদ্র কণিকা মাত্র, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য দেহ তাঁহার সম্ভব হইতে পারে কেবল মাত্র অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার সংস্পর্শে। এইজন্যই মহিষাসুরবধ-হৃষ্ট দেববৃন্দ মহাশক্তিকে স্তব করিবার কালে বলিয়াছেন 'তুমিই সমস্ত জগতের মূলস্বরূপা, দোষের দ্বারা ত্রিগুণশালিনী হইয়াছ, অনন্ত-স্বরূপিণী তোমাকে হরিহর প্রভৃতি দেবগণও জানিতে পারেন না। সকলের আশ্রয়ভূত এই অখিল বিশ্ব তোমারই অংশ। অব্যাকৃত আদ্য প্রকৃতিও তুমিই।'

> হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
> র্নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
> সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
> মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপাত্মক জগৎ যখন অব্যাকৃত অবস্থায় ছিল তখনও এই মহামায়াই বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই আদ্যাপ্রকৃতি। সুতরাং জগতের কারণস্বরূপা।

মহামায়া দোষ অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ার সংস্পর্শে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের আশ্রয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের 'সৌকর্য্যের' জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এক হইয়াও বহুরূপে এই অভি-ব্যক্তিই মায়ার কার্য্য, ইহাই মহামায়ার কথিত রূপ। সুতরাং কল্পিতরূপ নিবৃত্ত করিয়া দেবী শুম্ভাসুরের নিকটে অদ্বিতীয় রূপে অবস্থান করিয়াছেন।

এই আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে উপনিষদে ব্রহ্মের যে মায়িক অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে মহামায়ার নানারূপে আবির্ভাব সেই মায়িক বিকাশ মাত্র। মায়িক বস্তু মিথ্যা ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব মহামায়ার অপেক্ষায় পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ইহা বলা যায়। সুতরাং মহামায়াই একমাত্র পরমার্থ সত্য; বিশ্বের একমাত্র সারবস্তু।

এই পর্য্যন্ত আলোচনাদ্বারা উপনিষদুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত মহামায়ার ঐক্য বুঝা গিয়াছে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মের সগুণ ভাবের বর্ণনাও উপনিষদে প্রচুর আছে। উপনিষদের মতে সগুণ ও নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। যিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ মায়াবশে তিনিই সগুণ হন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের একটী নাম বর্ণিত আছে। "তজ্জলান্" (ছাঃ ৩।১৪।১), তজ্জ, তল্ল, ও তদন। অর্থাৎ তাহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন; তল্ল"—অর্থাৎ তাহাতেই জগৎ লীন; তদন—তাহাতেই জগৎ অবস্থিত। ছান্দোগ্যের এই পরম রহস্য-নির্দ্দেশ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।১), যাহা হইতে ভূতবর্গ উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাহার দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং পরিণামে যাহাতে বিলীন হইবে তাহাই ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্রকারও ব্রহ্মের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (বেদান্তদর্শন, ১।১।২) এই সূত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয়ের কারণরূপে

ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন। ফলকথা—জগতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণই সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ।

বিশ্বজননী দেবী মহামায়া এই সগুণ ব্রহ্মরূপাও হন। দেবীমাহাত্ম্যে দেখা যায়—মহামায়ার স্বরূপ বলিতে যাইয়া ঋষি প্রথমেই বলিয়াছেন—"তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্"—সেই মহামায়াই চরাচরাত্মক এই বিশ্বভুবন সৃজন করিয়াছেন। সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, "তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"—সেই মহামায়াই অখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন। যোগনিদ্রার স্তবে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন :

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥

"তুমিই সর্ব্বদা এই বিশ্ব সৃজন কর, তুমিই বিশ্ব ধারণ কর, তুমিই পালন এবং সংহার কর।" এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণীরূপে ঋষিও বর্ণনা করিয়াছেন—"সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণীম্।" দেবগণও মহামায়াকে জগতের কারণরূপে স্তব করিয়াছেন : 'সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।' এই ভাবে বহুস্থলেই মহামায়াকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নিখিল বিশ্ব যখন প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল, তখন এক মহামায়া ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; চরাচর সমস্ত জগৎ নাম ও রূপশূন্য অবস্থায় মহামায়াতেই লীন ছিল। স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপা চিন্ময়ী মহামায়া সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে প্রলয়ের সেই গহনান্ধকার ভেদ করিয়া জীব ও জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইলেন;—আপনার মধ্যে অব্যাকৃত বিলীন জগৎকে নাম ও রূপের দ্বারা প্রকাশিত করিলেন। এইজন্যই দেবগণ বলিয়াছেন—"অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা"—তুমিই অনভিব্যক্ত আদ্যা পরম প্রকৃতি। এই পরম প্রকৃতিই দোষবলে ত্রিগুণাত্মিকা হইয়া জগদাকারে অভিব্যক্ত হন—"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ"—তুমিই সমস্ত জগতের মূল কারণ এবং দোষ বশতঃ ত্রিগুণশালিনী হও। প্রলয়পয়োধিজলে মহামায়াই প্রথম সৃষ্টি বীজ রোপণ করেন, মহাপ্রলয়ের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া সৃষ্টির আলোক বিকাশ করেন। "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বম্"—তুমিই সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হও। এই মহামায়াই স্থিতি-স্বরূপা—ইনিই জগদাধার, জগতকে পালন করিতেছেন। "স্থিতিরূপা চ পালনে"—পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপিণী। আবার মহাকালের অলঙ্ঘ্য বিধানে অন্তকালে মহামায়াই সংহাররূপে সমস্ত সংহার করেন। "সংহৃতিরূপান্তে"—অন্তকালে তুমিই সংহাররূপা।

লীলাময়ী মহামায়ার এই অপূর্ব্বলীলা—এই অদ্ভুত বিচিত্র অভিব্যক্তি—অতি অপূর্ব্ব অতীব মনোহর। ভীম-কান্ত গুণের এইরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, সৃজনসংহারের এমন রমণীয় সমাবেশ কেবল মহামায়াতেই সম্ভব। নিত্যস্বরূপিণী বিশ্ব-ব্যাপিনী সেই মহামায়াই মহাশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পরে কল্যাণী মূর্ত্তিতে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করেন, তিনিই পালন করেন, আবার অন্তকালে মহাভৈরবীরূপে তিনিই সংহার করেন। তিনিই ভক্তজনবৎসলা পরম করুণাময়ী স্নেহনির্ঝরিণী গৌরী—আবার মহাকালের লীলা সহচরীরূপে বিস্তৃতবদনা জিহ্বাললনভীষণা নৃমুণ্ডমালিনী মহামারীস্বরূপা মহাকালী। তিনিই জনগণের লক্ষ্মীস্বরূপা—তাঁহার করুণায় রাষ্ট্রৈশ্বর্য্য এমন কি পরমমুক্তি পর্য্যন্ত হয়। এইজন্যই মেধস ঋষি বলিয়াছেন :

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকালে মহাকাল্যা মহামারীস্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥

"হে মনুজেশ্বর! এই বিরাট মহাকালে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যত ও অতীত কালে মহামারীস্বরূপিণী সেই মহাকালীই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই সেই সনাতনী মহামায়াই যথাকালে মহামারীরূপা হন; নিত্যস্বরূপা তিনিই সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত হন এবং তিনিই ভূতবর্গ পালন করেন।" মহামায়া হইতেই জগতের উৎপত্তি। সুতরাং তিনি জগজ্জননী; তিনিই জগতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি জগদ্ধাত্রী। অন্তকালে সমগ্র বিশ্ব তাঁহার ভিতরেই লীন হয়, সংহারমূর্ত্তিতে তিনিই বিশ্ব গ্রাস করেন; সুতরাং তিনি মহাকালী। সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম সমস্তই মহামায়ার স্বরূপ, এইজন্যই তিনি ব্রহ্মময়ী। সংসারে মায়াপাশে তিনিই জীবকে বদ্ধ করেন, মোহগ্রস্ত করেন, আবার করুণাময়ী মূর্ত্তিতে তিনিই জীবের ভববন্ধনগ্রন্থি মোচন করিয়া পরম মুক্তি প্রদান করেন। তিনি কল্পতরুস্বরূপা—ধন, জন, রূপ, যাহা কিছু ইহলোকের সুখের নিদান, প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা সমস্তই দান করেন। আবার বিবেক-বৈরাগ্যভরে শুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করিলে পরম চৈতন্য পরম আনন্দ তিনিই প্রদান করেন। জীবের মোহের কারণও তিনি, আবার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া চৈতন্য সম্পাদনও তিনিই করেন। অসীম তাঁহার মাহাত্ম্য, অনন্ত তাঁহার বিভূতি। তিনিই দুঃস্থ ও ভয়ার্ত্তের শরণ, পরম আশ্রয়, দুর্গতদিগের দুর্গতিবিনাশিনী সুতরাং তিনি দুর্গা। এই সচ্চিদানন্দময়ী ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গদায়িনী। দেবী মহামায়াই যুগে যুগে নানারূপে অবতীর্ণা হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। পাশব বলে বলীয়ান্ দর্পোদ্ধত দানবশক্তিকে পরাভূত করিয়া দুর্দ্দম দাম্ভিক অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে আর্ত্ত বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে রক্ষা করেন—অশান্তির দাবানলে শান্তিবারি সেচন করিয়া সুসমৃদ্ধ প্রেমপূর্ণ রাজ্য স্থাপন করেন। লীলাময়ী মহামায়ার এই লীলানৈপুণ্য বহুত্বের ভিতর দিয়া সেই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির উপলব্ধি করিলেই জীব কৃতকৃতার্থ হয়—জন্মমৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ হইয়া যায়। এই বহুত্বের মধ্যে ঐক্যানুভূতি না হইলে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না, নিস্তরঙ্গ আনন্দের মহাসমুদ্রে জীব মগ্ন হইতে পারে না। এই জন্যই করুণাময়ী মহামায়া জীবের অজ্ঞতাসঞ্জাত ভ্রম অপনোদন করিয়া দিব্যজ্ঞান উদয়ের উদ্দেশ্যে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন:

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"

ক্ষুদ্র রসায়নিগণ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণ কমল রায়, এম-এসসি

মানুষ আজ রসায়নবিজ্ঞানে অপরিসীম প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা পরিচালিত রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের ভূরি ভূরি তথ্য নিত্য পুঁথি-পুস্তকে পরিবেশিত হইতেছে। কিন্তু মানুষ ছাড়াও যে একপ্রকার জীবন্ত রসায়নী আছে, এ খবর সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। আমরা যদি মনে করি আমাদের মত নিপুণ রসায়নী দুনিয়ায় আর নাই তবে আমাদের ধারণা ভুল। অনেকে হয় ত অবগত আছেন যে রসায়নে অম্লরুসেক বা ফার্মেণ্টেসন (fermentation) নামক একটি অধ্যায় আছে। প্রকৃতির রাজ্যে ফর্মেণ্টেসন চিরকাল প্রকট। জীবজন্তু ও গাছপালার পচন এই অম্লরুসেকের বিষয়বস্তু। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে বিবিধ জীবাণু দ্বারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র কারিগর এরূপ নিপুণ রসায়নী যে আমরা কোন দিন উহাদের গোপন কাঠির সন্ধান পাইব কিনা সন্দেহ। উক্ত জীবাণুগণ জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে থাকিয়া সতত মানুষের জন্ম প্রাণপাত করিতেছে। যে অননুকরণীয় সাম্য ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে উহাদের কার্য্যাবলী পরিচালিত হয় তাহা এক বিস্ময়ের বস্তু। যে দিন মানুষ ঐ রাসায়নিক আবহাওয়াটির মালিক হইবে সেদিন রসায়নের চরমোৎকর্ষের দিন।

পৃথিবীবক্ষে আর এক প্রকার ক্ষুদ্র রসায়নীরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম কীটাণুগণ ভূমির ২।৩ ইঞ্চির মধ্যে বাস করে। উহাদের সমাজ গুণ কর্ম্ম দ্বারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন বহুবিধ জীব-জন্তুর বাস, তদ্রূপ ভূম্যভ্যন্তরে ব্যাকটেরিয়া (Bacteria), শেওলা (fungus) ছত্রক (Algae) প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবনের আড্ডা। ইহা ছাড়া অগণিত কীটও আছে। পণ্ডিতগণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক একর ভূমিখণ্ডে অন্ততঃ ৪।৫ টন্ ব্যাক্টেরিয়া, ২।১ টন ছত্রক, এক হন্দর এল্‌জি ও অন্ততঃ এক হন্দর অন্যান্য প্রাণী আছে। উক্ত প্রাণিগুলি প্রায় সব সময় সক্রিয় থাকে। উহারা লতা পাতা, ডালপালা খায়। এমনকি, সময় সময় একে অন্যকে ভক্ষণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। দেখা গিয়াছে অবস্থা-বিশেষে যখন এক শ্রেণীর প্রাণী বেশ পুষ্ট হইয়া উঠে, অপর শ্রেণী আসিয়া তখন উহাদিগকে ভক্ষণ করে। এ সমস্ত প্রাণী অনেক সময় আলু, পটল, ইত্যাদি গাছ-গাছড়ায় সঙ্গে একত্র ভূমি হইতে একই খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা নিজ কোষের মধ্যে নাইট্রোজেন গচ্ছিত করিয়া রাখে। মৃত্যু হইলে ঐ নাইট্রোজেনই বড় বড় গাছপালার খোরাক হিসাবে কাজ করে।

গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বহু বৈজ্ঞানিক ঐ প্রাণসমুদ্রের বিস্তারিত কাহিনী উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ফলে বহু অপ্রত্যাশিত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ব্যাক্টেরিয়াগুলির রাসায়নিক কর্ম্মতৎপরতা [বিশেষ করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দেখা গিয়াছে, বহু মটর-কলাই জাতীয় (Liguminous) গাছগাছড়ার

শিকড়গুলিতে এক প্রকার গ্রন্থি বা পিণ্ড পাওয়া যায় যেখানে হাজার হাজার ব্যাক-টেরিয়া বাস করে। এই সূক্ষ্ম কীটাণুগণ প্রত্যেকে রসায়নে বিশেষজ্ঞ। ইহাদের কাজ বায়ু হইতে নেত্রজানকে ধরিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্বদ্ধ করা। ফলে বায়ুর নিষ্ক্রিয় নেত্রজান ভূমির খনিজ পদার্থ ও বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া নাইট্রেট (Nitrate) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের জন্ম দিয়া থাকে। এই নাইট্রেট্ই প্রকৃত পক্ষে ভূমির প্রধান সার পদার্থ। ব্যাকটেরিয়াগণ ইহার কিছুটা গ্রহণ করে; কতকটা দ্বারা মটরকলাই প্রভৃতি গাছগাছড়া পুষ্টিলাভ করে; অবশিষ্টাংশ ভূমির সার হিসাবে থাকিয়া পরবর্ত্তী শস্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে। নেত্রজান অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় পদার্থ। ইহাকে ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করা এক দুরূহ ব্যাপার। বহু ধুরন্ধর রসায়নী ইহাকে বাঁধিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। আজ অবশ্য বিপুল চাপ তাপ ও বহু জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কার্য্য সাধিত হইতেছে। কিন্তু ব্যাক্টেরিয়ার কাজ ইহার তুলনায় খুবই নিপুণতাপূর্ণ। মনে হয় মানুষ তাহাদের যাবতীয় বুদ্ধির পুঁজি একত্র সমাবেশ করিয়াও এ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে না। উহারা প্রকাণ্ড চাপ, তাপ ও যন্ত্রপাতির ধার ধারে না।

লিগুমিনাস (Liguminous) গাছগাছড়া ও ব্যাকটেরিয়া একযোগে কাজ করিয়া থাকে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ সুন্দর সহানুভূতি আছে যে মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না! ব্যাক্টেরিয়া গাছগাছড়াকে নাইট্রেট্ প্রদান করে, গাছগাছড়া আবার কার্ব্বোহাইড্রেটস্ (Carbohydrates) প্রতিদান করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করে। যেমন একের অপরের জন্য সহানুভূতি তেমন সময় সময় মন কষাকষিও হয়। যদি কোনও কারণে গাছ তাহার কার্ব্বোহাইড্রেটস্ দিতে কৃপণতা করে, ব্যাক্টেরিয়া অমনি চটিয়া যায় এবং গাছের ক্ষতি সাধন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। সাধারণতঃ ব্যাক্টেরিয়া মূলপিণ্ডে (nodules) বাস করে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ভূমির মধ্যেও ইহার চলাফেরা করায় বাধা নাই। চব্বিশ-ঘণ্টায় উহারা মাত্র এক ইঞ্চি যাইতে পারে।

ব্যাক্টেরিয়ার সহায়তায় নেত্রজান গ্রহণ সম্ভবতঃ বিশ্বপুষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। প্রাকৃতিক জগতে এ ব্যবস্থা পৃথিবী জুড়িয়া চলিয়াছে। ভূমিতে আর এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া পচা গাছগাছড়া ও জীবশরীর হইতে নেত্রজান উদ্ধার করিয়া নাইট্রেটে পরিণত করে। আশ্চর্য্য এই ক্ষুদ্র রাসায়নিকদের কর্ম্মচাতুর্য্য! মানুষ আজও ইহার খেই ধরিতে পারে নাই। এরূপ সুন্দর, শান্ত, পরিপূর্ণ কর্ম্মপ্রণালী মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর।

মানুষ অনেক সময় এমোনিয়াম সাল্‌ফেট্ (Ammonium Sulphate) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এ জিনিষটা কিন্তু সোজাসোজি গাছের খাদ্য নয়। এখানেও উক্ত কারিগরগণ সাল্‌ফেট্‌কে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া গাছগাছড়ার খাদ্যোপযোগী করিয়া দেয়।

কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক কারখানায় যেমন কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক হয়, তদ্রূপ ব্যাক্-টেরিয়ার মধ্যেও কর্ম্মবিভাগ আছে। রসায়ন-শাস্ত্রে ন্যাইট্রাইট্ (Nitrite) ও নাইট্রেট নামক নেত্রজানও অক্সিজেন-ঘটিত দ্বিবিধ লবণ আছে। নাইট্রাইট নাইট্রেট্-প্রস্তুতির মাঝামাঝি একটি অবস্থা। ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে একদল নাইট্রাইট্-প্রস্তুতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, অপর দল আবার নাইট্রাইট্‌কে নাইট্রেট্ রূপ দিতে

পারদর্শী। কাজেই প্রথম দল অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দ্বিতীয় দলের হাতে ছাড়িয়া দিলে ইহারা কাজ সম্পূর্ণ করে। এই নাইট্রেট্ গাছগাছড়ার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রোটিনের রূপ পাইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে জীবজন্তুর পুষ্টি সাধন করে।

রসায়নে কীটপতঙ্গের দান পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় মানুষ সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব হইলেও তাহার অহঙ্কারের কিছু নাই। প্রতিটি প্রাণ তাহার জীবনধারণের একান্ত সহায়! এ জন্যই সম্ভবতঃ আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রে নানাবিধ প্রাণের কথা আলোচিত হইয়াছে। মানুষ যে অজানিতভাবে কত শত প্রাণীর নিকট ঋণী তাহার ইয়ত্তা নাই। এ ঋণের কথা যাঁহারা ভুলিয়া থাকেন তাঁহারা অকৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান সভ্য জগতে একটি কৃত্রিম আবহাওয়ার জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মূর্ত্তিমান অহঙ্কার উচ্চশিরে আজ দণ্ডায়মান। বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বিধিব্যবস্থা আজ পদদলিত। এই আবহাওয়ায় দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ভূতঋণ পরিশোধের স্থান কোথায়? যে মহান্ সুর সমস্ত প্রাণিজগতে ধ্বনিত হইত, যাহার জন্য সমস্ত জীবজগৎ পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত তাহা আজ বেসুরা হইয়া উঠিয়াছে। এ চাঞ্চল্যের পরিণতি কি কে জানে?

ভুলি নাই

শ্রীপ্রবোধ খান কর্ম্মকার

ভুলি নাই আজ স্বাধীন দিবসে হইয়া আত্মহারা
মুক্তির লাগি' জীবন দানিয়া অকালে গিয়াছে যারা,
কারা-প্রাচীর-অন্তরালে যাদের প্রাণ হয়েছে শেষ,
আজি ভারতের মুক্তির দিনে ভুলে নি তাদের দেশ।
ফাঁসির রশিতে জয়ের মাল্য যাহারা পরেছে হাসি,
মুক্তির দিনে ভুলে নি তাদের স্বাধীন ভারতবাসী।
মৃত্যুরে যারা বরণ করেছে ভুলে নি তাদের আজ,
জীবন করেছে পায়ের ভৃত্য সাধিতে দেশের কাজ।
হাসিখুসিমুখে বুলেটের গুলি বক্ষে লয়েছে যারা,
ছিঁড়িয়ে ফেলেছে লোহার শিকল ভগ্ন করেছে কারা,
করেছে সিক্ত ধরণীর বুক বুকের শোণিত ঢালি,
মুক্তির লাগি' করেছে সংগ্রাম জীবন দিয়েছে ডালি,
গৃহের বন্ধন করিয়া ছিন্ন চলিয়া গিয়াছে যারা,
অজানিত কোন বন্ধুর পথে হয়ে গেছে যারা হারা,
ভুলি নাই মোরা তাদের আর ভুলিব না কোন দিনে
তাদের পুণ্য কাহিনী স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি এইক্ষণে।
তারা যে শহীদ তাঁদের কথা ভুলা যায় কভু ভাই,
যাদের লাগিয়া ভারত স্বাধীন তাদের ভুলি নাই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সংগৃহীত

(১)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মোৎসবের দিন সন্ধ্যারতির পর বেলুড় মঠের ভিজিটার্স রুমে স্মৃতিসভা হইয়াছে। পুরাতন 'উদ্বোধন' হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পঠিত হইল। তৎপরে পূজনীয় সুধীর মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিলেন: "পূজাতে তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা আলমবাজার মঠে আমরা দেখেছি। তখন আমি সাধু হই নি। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজার রাত্রে আলম বাজার মঠে সকাল থেকে আরম্ভ করে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অবিরাম পূজা চলেছিল। শশী মহারাজ পূজা করে ছিলেন। তখন সন্ধ্যারতির সময় 'ভজ শিব ওঁকার' এই গান হত। শশী মহারাজ উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। পাড়ার লোকেরা অস্থির হয়ে উঠত। পাড়ার মধ্যেই মঠ ছিল, কিনা। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ছিলেন। একবার ট্রেনে আসতে একখানি সংস্কৃত নাটক (হনুমৎ নাটক) পড়তে পড়তে এসেছিলেন। স্বামীজীর লেখা তাঁর কাছেই আমরা দেখে দিতে পাঠাতাম। 'ওঁ হ্রীং' স্তবটী প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট সংশোধনের জন্য দেওয়া হয়েছে শুনে তিনি চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্বামীজীর কি ভুল ধরতে হয়? ওসব আর্ষপ্রয়োগ। তবে একদিন আরতির সময় শুনেছিলাম তিনি উক্ত স্তবের অশুদ্ধ অংশগুলি নিজে শুধরে শুধরে আস্তে আস্তে পাঠ করেছিলেন, যাতে অপরে শুনতে না পায়। নানা তীর্থাদি ভ্রমণ না করে এক জায়গায় বসে ঠাকুরের কাজ নিয়ে থাকলেও যে ধর্ম লাভ হয়, শশী মহারাজের জীবন থেকে আজ এটী আমাদের বিশেষ করে শেখবার। তিনি কাশী পর্যন্ত যান নি গুরুপূজা ছেড়ে। রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে যে কয়েকবার গিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের ঐসব তীর্থ দেখার ইচ্ছার জন্য নয়। তবে শ্রীশ্রীমা এবং মহারাজ যখন মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তখন তাঁদিগকে দেখাবার জন্য ঐ সকল তীর্থে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।"*

(২)

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোট একখানা চৌকিতে বসিয়া আছেন। শশী মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কি কাজে দরজার বাহিরে যাইতে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে যাইতে বাধা দিলেন এবং তিনবার এই কথাটী বলিলেন, "দেখ, তুমি যাঁকে খুঁজছ সে এই, (নিজের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া) সে এই, সে এই।"

কাশীপুর বাগানে একদিন শীতকালে গভীর রাত্রে ঠাকুরের কমোড পরিষ্কার করিতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া শশী মহারাজ বাইরে গেলেন। আসিয়া দেখেন, ঠাকুর কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া একপাশ হইতে একখানা লাঠি লইয়া আলনা হইতে একখানা গায়ের কাপড় টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। শশী মহারাজ বড় দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, 'হায়! হায়! আমি অসাবধানতা বশতঃ ভাল করিয়া এঁকে ঢাকিয়া দিই নাই। শীত লাগিয়াছে, তাই বুঝি ঠাকুর অমন করিতেছেন।' ঠাকুরকে বলিলেন, 'আপনি

* স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক ২০।৭।৩৩ তারিখে বেলুড় মঠে কথিত।

কেন আমাকে বললেন না?' ঠাকুর বলিলেন, "তোমার গায়ে দেব বলে ওটা আনছিলাম, আমার শীত করছে না।' মাদ্রাজে শশী মহারাজ অধিকাংশ সময় নিজেই ঠাকুরের পূজা ও সেবাদি করিতেন। তাঁহার চাল চলন, ব্যবহার দেখিয়া মনে হইত বাস্তবিকই তিনি প্রত্যক্ষ ঠাকুরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন! একবার রাত্রে ঠাকুরের শীতল দেবার কিছুই ছিল না। তিনি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন।' রুদ্র মহারাজ বলিতেছেন, 'কি হবে?' তিনি বলিতেছেন, 'আচ্ছা, দেখাই যাক্ না।' অবশেষে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় একজন ছাত্র ময়দা, ঘি, নারিকেল, চিনি প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত। মাঝে মাঝে ঠাকুরের উপর রাগ-অভিমানও করিতেন। কখনও রাগ করিয়া ঠাকুরের ছবির দিকে অগ্রসর হইতেন। কখনও বা রাগ করিয়া বলিতেন, 'তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? অমুকে অমুক খারাপ ব্যবহার করিল, বা অমুক কড়া কথা বলিল, তার জন্য সে ত দায়ী নয়—তোমারইত এসব কাজ।'

ঠাকুরের ভোগ পূজাদি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সম্পন্ন হইত। দিনের ভোগ দিয়া আধঘণ্টা, জলখাবার দিয়া দশমিনিট, রাত্রের ভোগের সময় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিবার নিয়ম ছিল।*

(৩)

শশী মহারাজ বলিতেন, 'ঠাকুর ও মা অভেদ, যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি।' শ্রীশ্রীমা মাদ্রাজে গেলে ঠাকুরের থালা বাসন তাঁহার জন্য বাহির করিয়া দিয়া ছিলেন। গেলাসে জল খাইয়া মা অবশ্য বলিয়াছিলেন, 'এ গেলাসে আর ঠাকুরকে দিও না।' শশী মহারাজ মায়ের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

শশী মহারাজ বলিতেন, 'স্বামিজী হচ্ছেন জগদ্গুরু। তাঁদের বক্তৃতা প্রভৃতি দেওয়া সাজে। আমাদের ওসব করা মানে বানর যেমন মানুষকে দাঁতন করিতে দেখিলে তার পরিত্যক্ত দাঁতন কাঠিটা লইয়া নিজের দাঁতে ঘষিতে থাকে সেইরূপ বাঁদরামো।' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিজে বসিয়া বসিয়া প্রসঙ্গাদি করিতেন। ঠাকুরের ভোগ হইবার পর স্বামীজীর নিকট পাঁচ মিনিট রাখা হইত, তাহার পর সে ভোগ বাহির হইত।'

রামকৃষ্ণানন্দজী বলিতেন, 'স্বামিজীর সমস্ত গ্রন্থাবলী অনন্ত!' বেলুড় মঠে আসিলে তিনি ধুলো পায় ঠাকুর প্রণাম করিতেন। যদিও সকল গুরুভ্রাতাকে তিনি গভীর ভাবে ভালবাসিতেন, তথাপি ব্রহ্মানন্দজী এবং প্রেমানন্দজীকে তিনি ভক্তি করিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কারণ এই দুই গুরুভ্রাতাকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। তাহার কারণ বোধ হয় এই ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন ঠাকুরের মানস পুত্র, তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্র এবং একমাত্র প্রেমানন্দজীকেই ঠাকুর ভাবাবস্থায় তাঁহার দেব-দেহ স্পর্শ করিতে দিতেন। শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) দীর্ঘকাল মাদ্রাজে শশী মহারাজের সেবা ও সঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী ও পূর্ণ কামজয়ী ছিলেন।'

শশী মহারাজ বলিতেন, 'স্বামিজীর বক্তৃতার পর আর কাউকে নূতন কিছু বল্‌তে হবে না। তাঁর বক্তৃতাবলী আমাদের সম্বল।' শশী মহারাজ মাদ্রাজ মঠে তিনি ঠাকুরের পূজায় প্রায় সমস্ত সকালটা কাটাইতেন। তিনি যখন পূজা করিতেন তখন একজন ব্রহ্মচারী তটস্থ থাকিতেন। তিনি পূজাকালে যখন যাহা চাহিতেন তৎক্ষণেই তাহা দিতে হইত, দেরী সইত না। পূজার আসনে যতক্ষণ বসিতেন ভাবস্রোত নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সর্বদা মুখে 'জয়গুরু' উচ্চারণ করিতেন। ঈশ্বর

* বেলুড় মঠে ১৪।১।৩৩ তারিখে স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ সাধুবৃন্দের সমক্ষে স্বামী ধ্যানানন্দ কর্তৃক কথিত।

ব্যক্তিবিশেষ (God is a person) এই ভাবে আরূঢ় হইয়া তিনি পূজা করিতেন। রাজা মহারাজকে এত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, একবার রাজা মহারাজের অসুখ শুনিয়া তিনি মাদ্রাজ মঠের ঠাকুর ঘরের ছবি ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'এবার যদি রাজার অসুখ না সারে তোমাকে সমুদ্রে বিসর্জন দিব। শীঘ্র রাজার অসুখ সারিয়ে দাও।' গরম দুধ ঠাকুরকে ভোগ দিতে লইয়া যাইতেন, দুধে আঙ্গুল দিয়া দেখিতেন দুধ কত গরম। দুধ খুব গরম থাকায় তাঁর আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ে যায়। ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে অভিমানভরে বলছেন, 'আবার গরম দুধ খাওয়াও চাই!' রাত্রিতে একদিন নিজের মশারিতে মশা ঢুকে গিয়েছিল। তিনি গভীর রাত্রে উঠে মশারি তুলে ঝাড়ছেন। হঠাৎ মনে হ'লো, আজ এত মশা, নিশ্চয়ই ঠাকুরের মশারিতেও মশা ঢুকেছে। অমনি ঠাকুর ঘরের তালা খুলে ঠাকুরের মশারি ঝেড়ে দিতে এলেন। ঠাকুর তাঁর কাছে এত জাগ্রত ও জীবন্ত ছিলেন! শশী মহারাজের শাসন কত কঠোর ছিল তাহা নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে: মাদ্রাজ মঠের অদূরেই ডাকঘর অবস্থিত। রুদ্র মহারাজ কোন কাজের জন্য ডাকঘরে গিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্টমাষ্টারের সহিত কথাবার্তায় তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হয়। শশী মহারাজ বিলম্ব দেখিয়া ডাকঘরে যাইয়া পোষ্ট মাষ্টারের সম্মুখেই উক্ত ব্রহ্মচারীকে ভর্ৎসনা করেন আর একবার রুদ্র মহারাজ একটি চিঠি লিখিতেছেন এবং শশী মহারাজ ঠিকানাদি বলিয়া দিতেছেন। চিঠিখানি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর পোর্টব্লেয়ারে যাইবে। রুদ্র মহারাজ ঠিকানাটি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে একটি শব্দ বাদ পড়িয়া যায়। ঠিকানাটি পড়িয়া শুনাইলে শশী মহারাজ যখন দেখিলেন যে, তদুক্ত একটি শব্দ বাদ পড়িয়াছে, তখন তিনি পত্রলেখককে ভর্ৎসনা করেন। শশী মহারাজ চেয়ারে এবং রুদ্র মহারাজ তাঁহার সম্মুখে একটি টুলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হাতের কলমটি পড়িয়া শশী মহারাজের পায়ে বিঁধিয়া রক্তপাত হয়। রুদ্র মহারাজ উঠিয়া শশী মহারাজের পায়ের রক্ত মুছিয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন। তখন শশী মহারাজ বলিলেন, 'তুমি যা ঠিকানা লিখেছিলে তাতে চিঠি যেতো, আমি জানতাম। কিন্তু আমরা যেমনটি বলি তেমনটি ক'রো, তাতে তোমাদের অশেষ কল্যাণ হবে।'*

শশী মহারাজের শাসন যেমন কঠোর ছিল তাঁহার স্নেহ-ভালবাসাও তেমনি গভীর ছিল। আহার করিবার সময় একটি আম মুখে দিয়া যখন দেখিতেন উহা সুমিষ্ট তখনি তাহা পাশে উপবিষ্ট ব্রহ্মচারীর পাতে তুলিয়া দিতেন। তিনি মঠ-মঠবাসিগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যুবক ব্রহ্মচারিগণকে গৃহের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেন। পূর্বস্মৃতি সাধুজীবনের বিশেষ অন্তরায়। একবার বসন্ত মহারাজ (স্বামী পরমানন্দ) বাড়ী গিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার বানরিপাড়া গ্রামে তাঁহার পিতা আনন্দমোহন গুহ-ঠাকুরতা বাস করিতেন। বসন্ত মহারাজ তখন বালক মাত্র। শশী মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। গৃহে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে কয়েকখানি নূতন পরিধেয় বস্ত্র এবং সিল্কের উত্তরীয় দিয়াছিলেন। বসন্ত মহারাজ সেইগুলি লইয়া মাদ্রাজ মঠে গিয়াছেন। শশী মহারাজ নূতন কাপড়গুলি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং ঐগুলি আনিতে বলিলেন। কাপড়গুলি আনিতেই শশী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সিল্কের চাদরটি কাকে দিয়েছেন?' বসন্ত মহারাজ ভয়ে বলিলেন, 'ওটি আপনাকে।' তখন শশী মহারাজ

* স্বামী যোগেশ্বরানন্দ কথিত।

উক্ত চাদরটি চাহিয়া লইলেন এবং যে কাপড়গুলি পিতামাতা পুত্রের জন্য দিয়াছিলেন সেগুলি ফেলিয়া দিতে বলিলেন। কাপড়গুলি ফেলিয়া দেবার পর শশী মহারাজ বলিলেন, 'সন্ন্যাসজীবন রক্ষার জন্য গৃহের সকল স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে।'

আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটীরের রাম মহারাজ একবার বেলুড় মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সাধুদিগের পতন সম্বন্ধে। শশী মহারাজ তদুত্তরে উত্তেজিত হইয়া এই আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন, 'সমুদ্র পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া একজন দেখিতেছে যে, জনৈক তীর্থযাত্রী হিমালয়ের পথে চড়াই ও উতরাই অতিক্রম করিয়া কেদার-বদ্রীর অভিমুখে যাইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অবতরণ, প্রকৃত দৃষ্টিতে তাহাই উচ্চতর 'আরোহণের আয়োজন মাত্র। এই সকল অবতরণ তাঁহাকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতর শৃঙ্গে আরোহণ করাইয়া অবশেষে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু, সমুদ্রপৃষ্ঠে বা পর্বতমূলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যেখানে ছিল সেইখানেই আছে; সে এক পদ ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেদার-বদ্রীযাত্রী আপাত অবতরণ সত্ত্বেও উচ্চতর পর্বতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে উপস্থিত হইল। সাধুর পতন প্রকৃত পক্ষে প্রারব্ধ-ক্ষয় বা সংস্কারনাশ মাত্র। তাঁহার পতন বা অবনতি স্থূলদৃষ্টিতে বিচার্য নহে।' শ্রীশ্রীমাও বলিতেন, 'নাটাইতে সুতা জড়ান বা খোলা দূর হইতে একই প্রকার দৃষ্ট হয়।' যে কর্ম অপরের কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে, সাধকের জীবনে সেই সকল কর্ম সংস্কার ক্ষয় করে মাত্র। এই জন্য শ্রীভগবান গীতাতে বলেছেন যে, যোগভ্রষ্ট সাধক শুদ্ধাচারী শ্রীমানের গৃহে বা যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বজন্মে যেখানে সাধনা বন্ধ হইয়াছিল সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রুতবেগে উন্নত এবং সাধনান্তে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হন।'

বিবেকানন্দ

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস, এম-এ

নিঃস্ব দুলাল কাঙাল মায়ের বিশ্ব-প্রেমিক বর,
বাংলার বীর, পরম সাধক, বিশ্ব তোমার ঘর।
তোমার বিজয় ধর্ম কেতন নিখিল হৃদয় জুড়ে,—
সুদূর-সাগর-ধৌত-দ্বীপের উন্নত শিরে উড়ে।
তোমার নবীন নব উৎসাহে দেশে দেশে পেল প্রাণ;
বাণীর বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে ধ্বনিল মোহন-তান।
তুমি এ যুগের নব অবতার বরষি' করুণা ধারা
শোনাও মাভৈঃ মিলন-মন্ত্রে ভাঙিয়া দ্বেষের কারা!
মহামানবের মিলন আরতি তোমার বীণায় বাজে;
বিভেদ-বৃন্তে প্রেমের কোরক তোমার লীলায় রাজে।
তাপস তোমার ওঁঙ্কার ধ্বনি আজি ঐ শোনা যায়,—
বিচ্ছেদ ভুলি' লক্ষ মানব ডাকে তাই, "আয়, আয়।"

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমোহিনী মোহন দত্ত. বি

১৫ আগষ্ট শ্রীঅরোবিন্দের জন্মদিন। পৃথিবীর অধ্যাত্ম-বিবর্তনের তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় রূপান্তরের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় ও বরণীয়। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে এই দিনটি যেমন পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় তেমনি আবার পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় বৈদেশিক শাসনের অবসানরূপ সিদ্ধিলাভের সহিত স্মৃতিবিজড়িত বলিয়াও বর্তমান বর্ষের পনরই আগষ্ট অবিস্মরণীয়। পৃথিবীতে অতিমানস রূপান্তরের রূপকার তথা অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দ্রষ্টা ও উদ্গাতা শ্রীঅরবিন্দের ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে অপ্রগল্ভ স্থির আধ্যাত্মিক তপঃপ্রয়োগ তাহাই যে তাঁহার জন্মদিবসে সিদ্ধির সার্থকতায় মূর্ত হইয়া উঠে নাই তাহাই বা কে বলিবে? পৃথিবীতে শ্রীঅরবিন্দের অতি-মানস যোগাদর্শের বাস্তব সিদ্ধির জন্য অখণ্ড ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ছিল একান্তই প্রয়োজন। কেননা, স্বাধীন অধ্যাত্ম-ভারতের নেতৃত্বেই শুধু ভগবানের হইয়া ভুবনবিজয় করিতে পারে—ভুবনের সকল গতিবৃত্তিকে আয়ত্তে আনিয় এই পৃথিবীতেই ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এবং ইহাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

মানব-সভ্যতা আজ তীব্রবেগে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে জগন্মাতার কুণ্ঠা নাই। কেননা, ধ্বংসের অর্থ নবজন্ম। এই পঙ্কিল সভ্যতার মূলোচ্ছেদ করিয়া এক নব সভ্যতাকে জন্ম দিবার জন্য জগন্মাতা প্রস্তুত হইয়াছেন। মানুষ ভাগবতশক্তি-বিচ্যুত হইয়া, আজ দানবের অট্টহাসি হাসিতেছে। এখনো জগৎজোড়া মিথ্যাচার, অকল্যাণ, অন্ধ প্রেরণার তাণ্ডবলীলা অবাধে চলিতেছে। এই সুবিপুল জঞ্জালকে গ্রাস করিবার জন্য লেলিহান জিহ্বা মহাশক্তি মহাকালী মুখব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। সমস্ত অশিবকে কুক্ষিগত করিয়া তিনি দিবেন শিবের নবজন্ম—সভ্যতা স্থাপিত হইবে ভাগবত ঐক্যে ও প্রেমে।

ভারত-সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক শ্রীঅরবিন্দ আজ নবজন্মকাতর পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এক নূতন পরমাশ্চর্যময় অধ্যায় প্রবর্তনের জন্য তপোমগ্ন। শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিকতার মর্মবাণী হইল মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে প্রকট ও শরীরী করিয়া তোলা। তাঁহার যোগের লক্ষ্য ব্যক্তিগত ভগবৎ-উপলব্ধি মাত্র নহে; পরন্তু সমষ্টিগত ভগবৎ-প্রকাশ। মানবতার মধ্যে অতি-মানবতার আবির্ভাব—ইহাই শ্রীঅরবিন্দের বাণী। তাঁহার দেবজন্মের অমর বাণী অধ্যাত্ম ও অধিভূতের, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের, মুক্তি ও ভক্তির, জড় ও চৈতন্যের সমন্বয়বাণী।

মানবপ্রকৃতির আমূল রূপান্তর যে একমাত্র অধ্যাত্মসাধনার দ্বারাই সম্ভব, পাশ্চাত্য দেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ কিছুকাল পূর্ব হইতে সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলডুস্ হাক্সলে তাঁহার "Ends and Means" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, আমরা যে জড়জগতের সঙ্গে পরিচিত ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক অধ্যাত্ম-জগৎ এবং সেই অধ্যাত্মজগতের মধ্যেই রহিয়াছে আমাদের প্রকৃত সত্তা; সেই সত্তায়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাইবে। সমগ্র জগতের মূলে যে পরম অধ্যাত্মসত্তা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে ও নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া এক উর্দ্ধতর, উদারতর, দিব্যতর চৈতন্য লাভ করিবে এবং তখনই মানব-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। এই কথাগুলির মধ্যে আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণীরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সুবিপুল সাহিত্যের মধ্যে অজস্র স্থানে অসংখ্য দৃষ্টিকোণ হইতে বলিয়াছেন যে মানুষের সম্মুখে যে চরম সমস্যা—গতানুগতিক ধর্ম্ম, শিক্ষা, নৈতিকতা, সমাজনীতি রাজনীতি কোন কিছুর দ্বারা তাহার প্রকৃত সমাধান হইবে না। চাই মানবপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর—চাই সেখানে ভাগবত শান্তি, শক্তি, জ্যোতি, প্রেম, সৌন্দর্য্য, আনন্দের প্রতিষ্ঠা। পরম সত্যের যে পূর্ণাঙ্গ সাধনায় মানবপ্রকৃতির এই আমূল রূপান্তর সম্ভব বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার একটুখানি ইঙ্গিত তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে—"To pass from the external to a direct and intimate inner consciousness, to widen consciousness out of the limits of the ego and the body, to heighten it by an inner will and aspiration and opening to the Light till it passes in its ascent beyond Mind to bring down a descent of the Supramental Divine through self-giving and surrender with a consequent transformation of mind, life and body—this is the integral way to the truth......"

—"The Riddle of This World."

পৃথিবী আজ এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে এশিয়া আবার তাহার পূর্ব্বেকার গৌরবময় স্থানে ফিরিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ বিশ্ব-ব্যবস্থায় এসিয়া তথা ভারতবর্ষ এক বিশাল অংশ গ্রহণ করিবে। ভারতের অন্তঃপুরুষের সম্মুখে আজ আত্ম-বিরোধ-সম্ভূত এক মহা সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইলেও শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টিবলে দেখিয়াছেন যে উষার ঠিক পূর্ব্বে প্রহরের গাঢ়তম অন্ধকারের মত উহাও কাটিয়া যাইবে—ভারতাত্মা এই অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবে। অতীতের সমস্ত জীবনেতিহাসে যে অধ্যাত্মচেতনাকে ভারতাত্মা মানবজাতির জন্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে, সে অধ্যাত্মসঞ্জীবনীর প্রসাদে ভারতের তথা পৃথিবীর সত্য-প্রতিষ্ঠ বিরাট এক জ্যোতির্ম্ময় ভাগবত রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। শ্রীঅরবিন্দ ভারত তথা পৃথিবীর সেই অধ্যাত্মবিবর্ত্তনের—মানবজাতির সেই অতিমানস সিদ্ধি ও ঋদ্ধির প্রেরণাদায়ক প্রতীক, জীবন্ত বিগ্রহ!

* * *

স্বাধীনতার স্বর্ণতোরণে উপনীত ভারতবাসীকে যে সাবধানী বাণী শ্রীঅরবিন্দ কম্বুকণ্ঠে শুনাইয়াছেন তাহা আজ আমরা শ্রদ্ধা-বিনম্র-চিত্তে স্মরণ করিতেছি: ভারতবর্ষের আত্মাকে বিভক্ত করিয়া যে স্বাধীনতা প্রস্তাবের স্বীকৃতি উহা সমস্যার সমাধান নহে পরন্তু মহা এক অগ্নি-পরীক্ষা!...ভারতের আত্মা এক এবং আমরা যতদিন পর্য্যন্ত ভারত এক ও অবিভাজ্য বলিতে না পারি ততদিন আমাদের ধ্বনি হয় যেন "ভারতের আত্মা চিরজীবী হউক।"

* * *

শ্রীঅরবিন্দ একদা বাঙ্গালীর দুর্দ্দশায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"শক্তি সাধনা ছেড়ে

দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।' বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা এখনো ঘুচে নাই—উহা রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণী আছে যে প্রেমের ইমারৎ জগতে খাড়া রাখা যাইতে পারে শুধু শক্তির স্তম্ভের উপর। তাই মহাশক্তিকে আজ মহাকালীরূপে দেখিয়া ভয়ে মুখ লুকাইলে—ক্লৈব্যকে আশ্রয় করিলে চলিবে না। আত্ম-ত্রাণের জন্যই বাঙ্গালীকে মহাকালীর মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে :

এসো মহাকালী ! প্রলয়ঙ্করী এসো মা !
যে জন ডরে না দুঃখেরে ভালবাসিতে,
নাচিতে যে পারে সর্ব্ব জগৎ নাশিতে,
মৃত্যুরে ধরি' খায় তার মুখে চুমা,
তারি কাছে আসে সর্ব্বনাশিনী মা !

স্বামী বিবেকানন্দ*

তবে ভয় নাই। এই দারুণ দুঃসময়ে পার্থিব বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান এই মহাসন্ধিক্ষণে মহাকালীর লীলানৃত্য দেখিয়া আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। এই ধ্বংসলীলার পশ্চাতে রহিয়াছে সৃষ্টির সচল নীলোৎপল—আছে মসীকৃষ্ণ মেঘমালার প্রান্তে রক্ত রশ্মিচ্ছটা। শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমমৈত্রীর নিম্নোদ্ধৃত বাণী আজ সঞ্জীবনী সুধার মত ভারতের আত্মাকে নব আশায় উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করুক :

"We are living in an exceptional hour at an exceptional turning point of the world's history. Never before perhaps did mankind pass through such a dark period of hatred, bloodshed and confusion and at the same time, never did such a strong, such an ardent hope awaken in the hearts of the people. Indeed, if we listen to our hearts' voice, we immediately perceive that we are more or less consciously waiting for a new reign of justice, of beauty, of harmonious good will and fraternity. And this seems in complete contradiction with the actual state of the world. But we all know that never is the night so dark as before dawn. May not this darkness, then, be the sign of an approaching dawn? And, as never was night so complete, so terrifying, may be, never will dawn have been so bright, so pure, so illuminating as the coming one.... After the bad dreams of night the world will awaken to a new consciousness....

"The civilisation which is ending now in such a dramatic way, was based on the power of the mind, mind dealing with matter and life. What it has been to the world, we have not to discuss here. But a new reign is coming, that of the Spirit; after the human, the Divine."

—Sri Aurobindo Circle :
Third Number.

* লেখক কর্ত্তৃক অনূদিত। —উঃ সঃ

সে ও আমি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পত্রপুষ্পের সমারোহে এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিগ্রহ সজ্জিত, সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতেছে—ধূপ ধুনা অগুরু চন্দন ও ফুলের সুগন্ধ মিশিয়া একটী মিষ্ট সৌরভের সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, বস্ত্র, ফুল ও চামর লইয়া পূজারী পর পর আরতি করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সমস্বরে স্তবগান করিতেছেন। আরতির পর দেবতার জয় দিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। পূজারী সকলকে চরণামৃত দিলেন—উহাতে একটী স্নিগ্ধ স্বাদ; কপালে প্রসাদী চন্দন লেপিয়া দিলেন—উহার স্পর্শে একটী অভিনব পবিত্র শীতলতা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই নূতন রকমের শান্ত অনুভূতিতে সচেতন হইয়া উঠিল। প্রাণেও টের পাইলাম অপূর্ব্ব একটী পুলকের সাড়া। যে 'আমি' সংসারে নানা কাজ করিয়া ঘুরি, খাই দাই, দশটা আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াই—দশখানা বই পড়িয়া, দশরকম আলোচনা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করি, সে 'আমি'কে যেন তখনকার মত ভুলিয়া গিয়াছি। এক নূতন 'আমি' আমার দেহ মন প্রাণে জাঁকিয়া বসিয়াছে। সে যেন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়ী এই ধরণীর অভ্যন্তরবর্ত্তী এক অতীন্দ্রিয় আনন্দঘন সত্তার সন্ধান লইয়া আসিয়াছে।

সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছি। নানা সমস্যা, সংঘর্ষ, লাভ-ক্ষতি-উল্লাস-বেদনার মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়াছি। সে কিন্তু উধাও হইয়া গিয়াছে—আমার সেদিনকার আবিষ্কৃত রহস্য-'আমি'টা। জীবনের বহু-শাখান্বিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাহার যেন কোনই স্থান নাই। চোখ কান নাক প্রভৃতি দিয়া বাহিরের যে জগতের পরিচয় নিত্য লাভ করিতেছি সেই জগৎ তাহার লক্ষ বাহু মেলিয়া আমাকে অনুক্ষণ ঘিরিয়া আছে—উহা ডিঙাইয়া যাইবার বুঝি কোনই উপায় নাই। এই জগতের সহিত লেনদেন করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি, ইহা করিয়াই মরিতে হইবে। ইহা ছাড়া আমার আর অন্য গোপন রহস্য কি?

* * * *

কচিৎ কখনো কিন্তু তাহার কথা মনে পড়ে। শুধু দেবমন্দিরের পরিবেষ্টনীতে নয়—জীবনের আরও কোন কোন অবসরে আমি যেন আমার বর্ত্তমান আমিত্বকে অতিক্রম করিয়া বসি। সে আসিয়া উঁকি মারে। সংসারে কোন প্রচণ্ড আঘাত আসিয়াছে—বাহিরের বৃহৎ বিশ্বটা যেন মনে হইতেছে শূন্য, যেন কোন কিছুর সঙ্গে কোন কিছুর সম্বন্ধ নাই—দুঃসহ ব্যথায় সমস্ত অন্তর যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস সবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে দেহের জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। সেই দারুণ সঙ্কটের মুহূর্ত্তে হঠাৎ যেন দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘটে। দেখি সে বলিতেছে—উঠ, অবসন্ন হইও না। এই দুনিয়াটাই পরম সত্য নয়। এই দেহের, এই সংসারের বাহিরেও তোমার দাঁড়াইবার স্থান আছে, আকৃষ্ট হইবার বস্তু আছে। দুনিয়ার সুখদুঃখ কিছু চিরস্থায়ী নয়—চিরস্থায়ী যাহা তাহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট কর।

মহাসমুদ্রের তীরে—অনন্ত গগনের নীচে দাঁড়াইয়া সীমাহীন তরঙ্গলহরীর, অগণন তারকা-দলের শোভা দেখিতেছি। সেই সর্ব্বপ্রসারী গম্ভীর অমেয় বিরাটত্বের সম্মুখে আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটী লজ্জায় যেন মুখ লুকাইল। দেখিলাম সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিমেষে যেন যাদুকরের দণ্ড ছোঁয়াইয়া আমার শরীর-মন-প্রাণে কি এক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল—আমার সকল সীমা যেন চলিয়া গিয়াছে—ঐ পারাবারহীন জলধির মত, ঐ অনন্ত আকাশের মত একটী অস্তিত্ব যেন আমি লাভ করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রভাত। শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদল,—সদ্য প্রস্ফুটিত নানা বর্ণের, নানা গন্ধের কুসুম-সম্ভার—গাছ লতা পাতারও এক নবীন শ্রী। পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তাভা—চক্রবালের অস্পষ্ট সবুজ রেখাটীর দিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। পাখীর গান, গোবৎসের হাম্বারব কানে আসিতেছে, মৃদু শীতল সমীরণ শরীরে আনন্দ-স্পর্শ দিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ নিজের চেতনার এক রূপান্তর অনুভব করিলাম। আমার সেই রহস্য 'আমি' হৃদয়ে আসিয়া বসিয়াছে। মনে হইল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বোধের প্রাচীরগুলি যেন সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ইহাদের জ্ঞান যেন শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। কে বলে আমি সাড়ে-তিন-হাত-দেহধারী ক্ষুদ্র মানুষ? আমি সকল শব্দ, সকল স্পর্শ, সকল রূপ, রস গন্ধের সহিত এককালে যেন একাত্মতা লাভ করিয়াছি।

গভীর রজনী। ঘোর অন্ধকার সকল কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বজগৎ সুপ্তিমগ্ন। নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। শরীর কর্ম্মহীন—মনেও চিন্তাগুলি বাহিরের নীরবতার সহিত তাল রাখিয়া বেশী সাড়াশব্দ না করিয়া যেন ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া আসিতেছে। এই অবসরে অকস্মাৎ তাহার আবির্ভাব—আমার সেই রহস্য-'আমি'টির। এক চপেটাঘাতে যেন আমাকে আসনচ্যুত করিয়া আমার দেহ-মন অধিকার করিয়া বসিল। দেখিলাম বিশ্বপ্রকৃতি যেন আমারই কোলে ঘুমাইয়া আছে—আমিই উহার জনক—আমিই উহাকে পালন করি—আমারই ডাকে উহা আবার জাগিয়া উঠিবে।

এইরূপে জীবনের কোন কোন বিরল মুহূর্ত্তে আমি আমাকে অতিক্রম করিয়া বসি। সে আসে—আমার রহস্য 'আমি'—আমার উপর 'আমি', আমার বৃহত্তর, মহত্তর, সুন্দরতর—হয়তো আমার যথার্থ 'আমি'। সে যে অন্য সময়ে লুকাইয়া থাকে বোধ হয় তাহা আমারই মূঢ়তার জন্য। আমি এই রক্তমাংসের শরীরটার সহিত এত জড়াইয়া পড়িলাম কেন? এই সংসারকে একমাত্র সত্য মানিয়া সমস্ত মনপ্রাণ ইহাতেই ঢালিয়া দিলাম কেন? নিজেরই মনগড়া আসক্তিপুঞ্জকে দূরে ঠেলিয়া দৃষ্টিকে যদি এই ক্ষুদ্র দেহ-মনের গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত করিতে পারিতাম তো দেখিতাম সে সর্ব্বদাই আমার অতি নিকটে—আমার মঙ্গল 'আমি', আমার সনাতন 'আমি', আমার সত্য 'আমি'।

আমি এই রক্তমাংসের শরীরটাকে পরম আপনার বলিয়া জানি—ইহার সুখে সুখী হই, ইহার কষ্টে মুষড়িয়া পড়ি। সে কিন্তু এই শরীরটাকে একান্তই তুচ্ছ করিয়া চলে—বলে, এই মাটীর দেহ মাটীতেই থাকিয়া যাইবে—আমার ঘর এখানে নয়। এই শরীর ভূমিষ্ঠ হইবার আগেও আমি ছিলাম—এই শরীরের পতনের পরও থাকিব। এই শরীরের সুখ হউক, দুঃখ হউক তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না।

আমি এই অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চরাচর দেখিয়া মুগ্ধ হই—ঊর্দ্ধে কোটী কোটী গ্রহতারাময় অনন্ত আকাশ, কি বিরাট মহাসমুদ্র, গগনচুম্বী তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা, দূরপ্রসারিত উপত্যকা, মরুভূমি, অরণ্যানী—কত রকমের জীবজন্তু—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের কত কীর্ত্তি। কি অদ্ভুত, কি রোমাঞ্চকর, কি সুন্দর! সে কিন্তু এই সৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে না, সুধু হাসে। বলে সৃষ্টি বড় বটে, কিন্তু যাঁহার এই সৃষ্টি তিনি ইহা অপেক্ষা অনন্তগুণ বড়। স্রষ্টাকে না জানিয়া শুধু সৃষ্টি লইয়া থাকা মহামূর্খতা।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি করিতেছি, কি চাই, কেন চাই—আমি বলিব, আমি রাম সিং, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব এ সব জানিনা—সংসার করিতেছি, সুখ চাই বলিয়া—কেন চাই তাহা জানি না। যতদিন বাঁচিয়া আছি এইরূপ করিয়া যাইতে হইবে এই মাত্র জানি। সে কিন্তু এই প্রশ্নগুলির ভিন্ন জবাব দেয়। সে বলে এ পৃথিবীর জীবন আমার আসল জীবন নয়। আমার আসল স্থান অনন্ত অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ ভগবানের ঘরে। তাঁহা হইতেই আমি আসিয়াছি, তাঁহাতেই বাঁচিয়া আছি, তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব। তিনি ছাড়া আমার জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই।

আমি সংসারের উদ্দেশ্যহীন নানা ব্যাপৃতিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরি—সে কিন্তু পরম শ্রেয়ের স্থির অনুসন্ধান লইয়া সর্ব্বদাই শান্ত। নানা ভয় সংশয়, মোহ সর্ব্বদা আমাকে পীড়া দেয়—সে কিন্তু ধ্রুব জ্ঞানের, প্রেমের আলোক লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভয়-সন্দেহ-প্রমাদশূন্য।

সে আমার কাছে অতি কষ্টেই আছে। আমার বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র, শোক-ভয়-মোহ ক্লিন্ন 'আমি'টা হইতে মন ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে আপনার বলিয়া যত ডাকিয়া লইব ততই সে আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে ধরা দিবে। আমার তরফ হইতে শুধু চাহিবারই অপেক্ষা। আমার এই 'আমি' মরিয়া যাক, সেই 'আমি' ইহার আসনে অধিষ্ঠিত হউক। এই ক্ষুদ্র 'আমি', বাসনাচঞ্চল 'আমি', অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন 'আমি'—ইহার প্রয়োজন কাঠমাটীর দুনিয়ায় দুদিনকার পুতুলখেলার জন্য। বৃহৎ অতিজীবন—সত্য, শান্তি, মঙ্গলের ক্ষয়-অপচয়-মৃত্যু-শূন্য আনন্দ-লোকের অনুভূতির জন্য প্রয়োজন সেই "আমি'র। সে যখন আসিবে তখন দেখিতে পাইব সেই আসল সত্য—আমার এতদিনের 'আমি'টা তাহার একটী বিকৃত ছায়া মাত্র।

"যেমন যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে ততক্ষণ চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না; তেমন মায়া অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার ঠিক ঠিক হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদান্ত-দর্শন

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

(৪) **আচার্য্য কাশকৃৎস্ন** (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২) বলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠক হইতে বুঝা যায় যে পরমাত্মা জীব-লোকে অবস্থিত। জীব পরমাত্মার বিকার নহে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "কাশকৃৎস্নস্য আচার্য্যস্য অবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবঃ নান্য ইতি মতম্।" তিনি ঐ মত শ্রুত্যনুসারী বিধায় উহাই বেদান্তমত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) **আচার্য্য ঔড়ুলোমির** নাম ব্রহ্মসূত্রে তিন স্থানে পাওয়া যায় (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২১, ৩।৪।৪৫, ৪।৪।৬)। তাঁহার মতে ভেদাভেদ অবস্থান্তর অনুসারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্যই সংসারদশায় জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে, মুক্তি হইলে অভেদ হয়। বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে ঔড়ুলোমির মত নিম্নলিখিতরূপ উপন্যাস করেন: "জীবো হি পরমাত্মনোঽত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধানসম্পর্কাৎ সর্ব্বদা কলুষঃ তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনা ঐক্যোপপত্তেঃ ইদমভেদেনোপক্রমণম্। এতদুক্তং ভবতি ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদ-কালেঽপি অভেদ উক্তঃ। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

আ মুক্তের্ভেদ এব স্যাৎ জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥"

(৬) **আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির** নাম কেবল মাত্র একটি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যথা (ব্রঃ সূঃ ৩।১।৯)। মীমাংসাসূত্রেও (৪।৩।১৭, ৬।৭।৩৫) কার্ষ্ণাজিনির উল্লেখ দেখা যায়।

(৭) **আচার্য্য জৈমিনি**—বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নামই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু ১।২।২৮, ১।২।৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৪।২-৭, ৩।৪।১৮, ৩।৪।৪০, ৪।৩।১২, ৪।৪।৫, ৪।৪।১১ সূত্রে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহার মতবাদ ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

(৮) **আচার্য্য বাদরায়ণ**—স্বয়ংই গ্রন্থকার। এক্ষণে দেখা গেল—প্রথম সাত জন আচার্য্য কেহই আধুনিক নহেন। এজন্য ইঁহাদের নাম দেখিলেও ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। এবং ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বেও অন্য ব্রহ্মসূত্র ছিল ইহাও কল্পিত হইয়া থাকে।

অন্যগ্রন্থ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনত্ব

অন্যগ্রন্থ দ্বারাও ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনত্ব সিদ্ধ হয়; যথা—প্রাচীন কালে কাশ্যপ-রচিত সূত্রগ্রন্থও প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। ভক্তিসূত্রকার শাণ্ডিল্য নিজ সূত্রগ্রন্থে কাশ্যপ ও বাদরায়ণের মত উল্লেখপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন (মহাভারত ১৩।৩১৯।৫৯)। যে সকল আচার্য্য গন্ধর্ব্ব বিভাবসুকে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বা পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাশ্যপের নামও পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে গ্রন্থকাররূপে আরও ২।৩ জন কাশ্যপের বিষয় জানা যায়। তাঁহাদের মধ্যে একজন আচার্য্য সঙ্গীত ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। অভিনবগুপ্তাচার্য্য নাট্যশাস্ত্রের টীকায় ইঁহার মত প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। হৃদয়ঙ্গমা নামক গ্রন্থে কাশ্যপ

বররুচি প্রভৃতির লক্ষণশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে কাশ্যপ সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে সঙ্গীত ও অলঙ্কার উভয় বিষয়েরই বর্ণনা আছে। রাজা নান্যদেব নিজরচিত সরস্বতী-হৃদয়ালঙ্কার নামে নাট্যশাস্ত্রটীকাতে স্থলে স্থলে কাশ্যপের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে আরও একজন কাশ্যপের উল্লেখ দেখা যায়। প্রথমোক্ত কাশ্যপ হইতে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে বৃহৎ কাশ্যপ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় একজন কাশ্যপের সংবাদ পাওয়া যায় যিনি চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শাণ্ডিল্যসূত্রোক্ত কাশ্যপও মহাভারতোক্ত কাশ্যপ এই তিন জন কাশ্যপ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি কিনা ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ব্রহ্মসূত্রে সিদ্ধান্ত অদ্বৈত

ভক্তিসূত্রকার শাণ্ডিল্যের মতে কাশ্যপ ভেদবাদী এবং বাদরায়ণ অভেদবাদী ছিলেন। বাদরায়ণের সম্বন্ধে শাণ্ডিল্যের মতটি বিচার্য্য। শাণ্ডিল্যবচন হইতে ইহা অবশ্য বুঝা যায় যে, তাঁহার দৃষ্টিতে বাদরায়ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্করসম্প্রদায়ও ঐরূপ বিশ্বাসেই বাদরায়ণের সূত্রগুলি অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করেন।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত থিবো শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের স্বরচিত অনুবাদের ভূমিকায় শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, বাদরায়ণের দার্শনিক সিদ্ধান্ত শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত হইতে সর্ব্ব প্রকারেই ভিন্ন ছিল, শঙ্করাচার্য্য নিজ শুষ্ক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচার করিবার জন্য বাদরায়ণের উপর নিজ মত আরোপিত করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য অধ্যয়ন করিলে সূত্রকারের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত জানা যায় না, ইত্যাদি। ইঁহার সমালোচনার ভাবার্থ-গ্রহণপূর্ব্বক পরবর্ত্তী বহু সমালোচক শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ঐরূপ মতই প্রকাশ করেন। অবশ্য থিবোর মতের খণ্ডনও বহু হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণও ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাতে বিভিন্ন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী ভেদাভেদবাদী আচার্য্য যাদবপ্রকাশ এবং ভাস্কর নিজরচিত ভাষ্যের প্রারম্ভে স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য সূত্রকারের অভিপ্রায় গোপন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, সম্প্রদায়বিৎ পাণিনির গুরু উপবর্ষের মতে ভাষ্য রচনা করিয়া উক্তরূপ অপব্যাখ্যা প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাযথরূপে ......সূত্রাকারের অভিপ্রায় প্রকাশ ও তাঁহার (ভাস্করের) ভাষ্যরচনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উপবর্ষের বৃত্তি দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কারণ তিনি বিশেষ ভাবে কোন বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। শঙ্কর যেমন ব্যাস ও শুকের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শুকশিষ্য হইয়া গৌড়পাদের গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া সেই গৌড়পাদের মতে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়পাদগ্রন্থের শুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। ভাস্কর সেরূপ কিছু করেন নাই। রামানুজাচার্য্য সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। তিনি বলেন যে তিনি বোধায়নবৃত্তি দেখিয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও বোধায়নের বৃত্তি দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কারণ তিনিও বোধায়নের ২।১টী মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বোধায়নবৃত্তি রক্ষার জন্য তাঁহার টীকাদি করেন নাই। রামানুজ স্বামী নিজেই বলিয়াছেন "বিস্তীর্ণাং বোধায়নবৃত্তিং সঞ্চিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যা-

স্যামঃ"। বৃত্তি দেখিলে তিনি 'তদনুসারেণ' লিখিতেন এবং পূর্বাচার্য্যের সংক্ষেপ করণের কথাই উল্লেখ করিতেন না।

শঙ্করভাষ্যের যেরূপ সাম্প্রদায়িক মৌলিকতা অর্থাৎ ব্যাসমূলকতা দেখা যায় ভাস্কর রামানুজ প্রভৃতি কোন ভাষ্যেই সেরূপ সাম্প্রদায়িক মৌলিকতা দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে উপবর্ষের নাম দুই স্থলে করিয়াছেন। এক স্থলে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য স্থলে তাঁহার মত গ্রহণ করেন নাই। ভাস্কর বলিয়াছেন—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"
ইত্যাদি

এই ভাস্কর পাণিনির গুরু উপবর্ষের মতাবলম্বী। ইহা তিনি তাঁহার ভাষ্য মধ্যে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

পণ্ডিত জ্যাকবির মতে নূতনত্ব নাই

উক্ত আলোচনার দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডাঃ থিবো এবং তাঁহার অনুগামিগণের প্রতিকূল আলোচনাগুলি অভিনবত্ব দাবী করিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বকাল হইতেই এরূপ সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু শাণ্ডিল্যের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালেও বাদরায়ণের সূত্রসমূহের অভিপ্রায় অদ্বৈতপর স্বীকৃত হইত। ঐ মত কেবল ভাষ্যকারগণেরই নহে, সূত্রকারগণও ঐরূপই মনে করিতেন। শাণ্ডিল্য যে সকল সূত্রে কাশ্যপসিদ্ধান্ত, বাদরায়ণসিদ্ধান্ত ও নিজ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন সেগুলি নিম্নোল্লিখিত হইল :

১। তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ (২৯)
২। আত্মৈকপরাং বাদরায়ণ (৩০)
৩। উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ (৩১)

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ঋষির বিষয় উল্লিখিত আছে যাঁহারা বিভিন্ন দার্শনিক জ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অসিত, দেবল, গর্গ, জৈগীষব্য, পরাশর, ভৃগু প্রভৃতি ঋষির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বেদান্তের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা অদ্বৈত, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নহে।

কেহ কেহ বলেন, আনন্দময়াধিকরণে (১।১।৬) এবং প্রতিষেধাধিকরণে (৪।২।৬) শঙ্করের ব্যাখ্যা সূত্রের স্পষ্টানুযায়ী নহে। কিন্তু এস্থলে শঙ্করব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে ব্যাসদেবের উপনিষদ্‌জ্ঞানের ন্যূনতা স্বীকার করা হইত। কারণ শঙ্করব্যাখ্যায় আনন্দময়াধিকরণে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয়, বৃত্তিকারসম্মত রামানুজ-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের সগুণত্বই সিদ্ধ হয়, অথচ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব উপনিষৎসম্মত। তদ্রূপ প্রতিষেধাধিকরণে শঙ্করব্যাখ্যা না স্বীকার করিলে জ্ঞানীর উৎক্রমণও স্বীকার করিতে হয়। অথচ উপনিষদে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই ইহা স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর এ সব স্থলে ব্যাসের ত্রুটি মোচন করিয়া প্রকৃত ছাত্রেরই কার্য্য করিয়াছেন।

ব্যাসের পর এবং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বের বেদান্তমত

প্রাচীন দর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায় ব্যাসদেবের পর শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে ১৬ জন প্রধান বেদান্তাচার্য্য ছিলেন, যথা:—(১) ভর্তৃপ্রপঞ্চ, (২) ভর্তৃমিত্র, (৩) ভর্তৃহরি, (৪) উপবর্ষ, (৫) বোধায়ন, (৬) ব্রহ্মানন্দী, (৭) টঙ্ক, (৮) ব্রহ্মদত্ত, (৯) ভারুচি, (১০) দ্রবিড়াচার্য্য, (১১) দ্রমিড়াচার্য্য, (১২) সুন্দরপাণ্ড্য, (১৩) গুহদেব, (১৪) কপর্দ্দী, (১৫) গৌড়পাদাচার্য্য, (১৬) গোবিন্দপাদাচার্য্য।

ইঁহাদের নাম শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্য হইতে জানা যায়। বিষ্ণার্ণব তন্ত্রমতে ব্যাস ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে প্রায় ৫০ জন গুরুর নাম আছে। তাঁহাদের নাম পরে কথিত হইয়াছে। ইঁহাদের সকলেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ গীতাভাষ্য রচনা করেন, কেহ বা গীতা ও ব্রহ্মসূত্র উভয়ের ভাষ্য রচনা করেন। কোনও কোনও আচার্য্যের উপনিষদ্ভাষ্যও তৎকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইঁহাদের সঠিক নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান সময়ে উপায়াভাববশতঃ সম্ভব নহে।

(১) ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ যে কঠ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। সুরেশ্বরাচার্য্য ও আনন্দগিরির সময়েও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। কারণ তাঁহারা যে ভাবে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মত উল্লেখ ও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের গ্রন্থ সাক্ষাৎ সমালোচনা করা সম্ভবপর হয় না।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ স্বয়ং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন। যদিও শঙ্করাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যে তাঁহাকে কোনও স্থলে "উপনিষদম্মন্য" আখ্যাত করিয়া তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তৎকালে দার্শনিকক্ষেত্রে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের পাণ্ডিত্য ও প্রভাব কম ছিল না। এই কারণেই শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বর নিজ বার্ত্তিকে তাঁহাকে সম্প্রদায়বিৎ ও "ব্রহ্মবাদী" বলিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দার্শনিক দৃষ্টিতে তাঁহার মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈত ভেদাভেদ ও অনেকান্ত প্রভৃতি বহুনামে প্রসিদ্ধ ছিল। শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের ভেদাভেদ মত নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"নমু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা অনেকশাখঃ বৃক্ষঃ, এবং অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অতঃ একত্বং নানাত্বংচ উভয়মেব সত্যমেব, যথা—বৃক্ষঃ ইতি একত্বম্, শাখা ইতি নানাত্বং। যথা চ সমুদ্রাত্মনা একত্বম্, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। যথা চ মৃদাত্মনা একত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। তত্র একত্বেন অংশেন জ্ঞানাৎ মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি. নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি। এবংচ মৃদাদিদৃষ্টান্তাঃ অনুরূপাঃ ভবিষ্যন্তি ইতি।"

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে পরমার্থ একও বটে নানাও বটে। ব্রহ্মরূপে এক ও জগদ্রূপে নানা। এই কারণেই একান্ত ভাবে কর্ম্ম বা জ্ঞানকে স্বীকার না করিয়া উভয়েরই সার্থকতা স্বীকার করা হইয়াছে। ইঁহাই জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় স্বীকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের দৃষ্টিতে জীব নানা, ও উহা পরমাত্মার একদেশমাত্র। যেমন উষর (অনুর্ব্বর ভূমি) পৃথিবীর একদেশাশ্রিত থাকে, সেইরূপ জীবও পরমাত্মার প্রদেশবিশেষে থাকে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার একদেশে মাত্র আশ্রিত থাকে)। বিদ্যাকর্ম্ম ও পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার এইগুলি জীবে বিদ্যমান থাকে। অবিদ্যা পরমাত্মা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া জীবে বিকার উৎপন্ন করিয়া অনাত্মস্বরূপ অন্তঃকরণে ধর্ম্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চমতানুযায়িগণ বলেন যে জীব পরমাত্মাকে লাভের পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভাবস্থা মুক্তাবস্থা নহে। কিন্তু মোক্ষের পূর্ব্বে ইহা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থায় পরমাত্মার আভিমুখ্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। কাম বাসনা প্রভৃতি জীবের ধর্ম্ম। জীবের নানাত্ব ঔপাধিক নহে, পরন্তু ধর্ম্ম ও দৃষ্টিভেদ বশতঃ

উহার (নানাত্ব) হয়। ব্রহ্ম এক হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতভাবাপন্ন। অদ্বৈত ভাব যেমন সত্য, দ্বৈতভাবও তদ্রূপ সত্য। দ্বৈতা ভাবের সত্তা থাকায় কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কার্য্য-কারণ ভাব কল্পিত বস্তু নহে, পরন্তু সত্য। মুমুক্ষু ও মুক্ত ব্যক্তির আত্মদর্শন সর্ব্বথা এক প্রকার নহে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ প্রথম প্রকার দর্শনকে (মুমুক্ষুর আত্মদর্শনকে) পরিচ্ছিন্ন দর্শন এবং দ্বিতীয় প্রকার দর্শনকে (মুক্তের আত্মদর্শনকে) অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মদর্শন বলেন। পরিচ্ছেদক বিজ্ঞানই অবিদ্যা। 'অহমেবেদং সর্বং' এইরূপ অর্থ বোধ পরমাত্মাতে নিত্যই আছে, পরন্তু তিরস্কৃতবিজ্ঞান সংসারি আত্মাতে (জীবে) ঐ প্রকার বোধের অস্তিত্ব অনিত্য ভাবে থাকে। অবিদ্যার সম্বন্ধ বশতঃ পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ পদ-বাচ্য হইয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বব্যাপক, ইনিই নিখিল প্রাণীর আত্মা বা জগদাত্মা। হিরণ্যগর্ভের সহিত আসক্তির সম্বন্ধ বশতঃ জীবভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। আনন্দ (আসক্তি) বা বাসনা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—ইহা জীবে সংক্রান্ত হইয়া জীবের ধর্মরূপে পরিণত হয়। জীবই কর্ত্তা ভোক্তা ও জ্ঞাতা হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্মের পরিণামস্বরূপ। ইঁহার মতে ইন্দ্রিয় ভৌতিক, আহঙ্কারিক নহে। মোক্ষ দুই প্রকার, যথা—(১) অপর মোক্ষ বা অপবর্গ, (২) পরামুক্তি বা ব্রহ্মভাবাপত্তি। এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে প্রথম প্রকারের মোক্ষ আবির্ভূত হয়, ইহা জীবন্মুক্তি সদৃশ। ইহার নাম অপবর্গ। বস্তুতঃ ইহা আনন্দ ত্যাগ হেতু সংসারের নিবৃত্তি মাত্র। দেহপাত না হইলে ব্রহ্মে লীন হইতে পারে না। দেহপাতের পর দ্বিতীয় প্রকারের মোক্ষ—পরম মোক্ষের উদয় হয়। ইহা ব্রহ্মে জীবের লয় বা জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তি (ব্যতীত কিছু নহে)। অবিদ্যানিবৃত্তির ফলস্বরূপ এই অবস্থার আবির্ভাব হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হওয়া সত্ত্বেও অপরা মুক্তি বা অপবর্গ অবস্থাতেও অবিদ্যা পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় না। অবিদ্যানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের ব্রহ্মভাবোপলব্ধির প্রতিবন্ধক শরীরটীর সহিত বিচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ দেহটী নষ্ট হয় এবং পরা মুক্তির প্রাপ্তি হয়। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, এই অবস্থাতে সম্পূর্ণ বিশেষ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য অব্যক্ত থাকে না। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গগুলির একত্ব আছে, সেইরূপ অবিশেষ অব্যক্ত পরমাত্মাবস্থায় সকল বিশেষগুলির একত্ব থাকে।

ব্রহ্মের পরিণাম তিন প্রকার, যথা—১। অন্তর্যামী ও জীবরূপে, ২। অব্যাকৃত, সূত্র, বিরাট্ ও দেবতারূপে, ৩। জাতি ও পিণ্ড অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে। উক্ত আট প্রকার অবস্থা ব্রহ্মরই হইয়া থাকে। এইরূপে জগৎ আট প্রকারে বিভক্ত। প্রকারান্তরে উহাকে তিন প্রকারেও বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন, ১। পরমাত্মরাশি, ২। জীবরাশি ৩। মূর্ত্তামূর্ত্তরাশি।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ প্রমাণসমুচ্চয়বাদী ছিলেন। তাঁহার মতে লৌকিক প্রমাণ ও বেদ উভয়ই সত্য। এই কারণে তিনি লৌকিক প্রমাণগম্য ভেদ এবং বেদগম্য অভেদ উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর এই কারণেই তাঁহার মতে যেমন কেবল কর্ম্ম মোক্ষের সাধন হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানও মোক্ষের সাধক হইতে পারে না। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই প্রকৃষ্ট সাধন।

(২) ভর্ত্তৃমিত্র

ইঁহার কথা জয়ন্তকর্তৃক ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের ২২৩,

২২৬ পৃষ্ঠায় এবং যামুনাচার্য্যকর্ত্তৃক সিদ্ধিত্রয় গ্রন্থে ৪, ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। ইহার দ্বারা প্রতীত হয় যে ইনিও সম্ভবতঃ বৈদান্তিক আচার্য্য ছিলেন। ভর্ত্তৃমিত্র মীমাংসাশাস্ত্রেও কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভট্টপাদ কুমারিল নিজকৃত শ্লোকবার্ত্তিকে (১।১।১।১০, ১।১।৬।১৩০-১৩১) তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিল। টীকাকার পার্থসারথি মিশ্র ন্যায়রত্নাকর নামক টীকায় ভট্টপাদ কুমারিলের ঐরূপ আশয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারিল বলেন যে, ভর্ত্তৃমিত্র প্রভৃতি আচার্য্য অপসিদ্ধান্তপ্রভাবে মীমাংসাশাস্ত্র লোকায়তীকৃত হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈত মতের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত (বৈদান্তিক) ভর্ত্তৃমিত্র এবং শ্লোকবার্ত্তিকে উল্লিখিত মীমাংসক ভর্ত্তৃমিত্র একব্যক্তি কিনা ইহা বলা কঠিন। পরন্তু কুমারিলের সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, উহারা পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। মুকুল ভট্ট নিজ অভিধাবৃত্তিমাতৃকা গ্রন্থে পৃথক্‌ভাবে ভর্ত্তৃমিত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। নির্ণয়সাগরে মুদ্রিত গ্রন্থের ১৭পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ভর্ত্তৃহরি

যামুনাচার্য্যের গ্রন্থে সিদ্ধিত্রয়ের ভর্ত্তৃহরি নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভর্ত্তৃহরিকে বাক্যপদীয় গ্রন্থের কর্ত্তা হইতে অভিন্ন স্বীকার করিলে কোনও অনুপপত্তি দেখা যায় না। পরন্তু এতৎকৃত কোনও বেদান্তগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও বাক্যপদীয় একখানি দার্শনিক গ্রন্থও বটে। অদ্বৈতবেদান্ত - সিদ্ধান্তই যে এই গ্রন্থের উপজীব্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কোনও কোন আচার্য্যের মতে ভর্ত্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াই আচার্য্য মণ্ডন মিশ্র স্বীয় ব্রহ্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের উপর বাচস্পতি মিশ্রের ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা নামক টীকা ছিল। উৎপলাচার্য্যের গুরু কাশ্মীরীয় শিবাদ্বৈত মতের প্রধানতম আচার্য্য সোমানন্দপাদ স্বীয় শিবদৃষ্টি নামক গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরির শব্দাদ্বয়বাদের বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছেন। শান্তরক্ষিত - রচিত তত্ত্বসংগ্রহ, অবিমুক্তাত্ম - রচিত ইষ্টসিদ্ধি ও জয়ন্তকৃত ন্যায়মঞ্জরীতে শব্দাদ্বৈতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। উৎপল ও সোমানন্দের বাক্যানুসারে বুঝা যায় যে ভর্ত্তৃহরিও তদনুযায়ী শব্দব্রহ্মবাদী দার্শনিকগণ 'পশ্যন্তী' বাককেই শব্দব্রহ্ম রূপ স্বীকার করিতেন। ইহাও বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে 'পশ্যন্তী'ই পরা বাক্ রূপে ব্যবহৃত হইতে এবং এই বাক্ বিশ্বজগতের নিয়ামক ও অন্তর্যামী—চিৎতত্ত্ব হইতে অভিন্ন।

(৪) উপবর্ষ

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কোন কোন স্থলে উপবর্ষ নামক এক প্রাচীন বৃত্তিকারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃত্তিকার উভয় মীমাংসাশাস্ত্রের সূত্রগ্রন্থের বৃত্তি রচনা করেন, এইরূপ অনুমিত হয়। পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে এই ভগবান্ উপবর্ষ-ই শাবরভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন (মীঃ সূঃ ১।১।৫)। আচার্য্য শঙ্কর বলেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩) যে উপবর্ষ নিজ মীমাংসাসূত্রের বৃত্তিতে শারীরিক সূত্র বৃত্তিতে আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এই উপবর্ষাচার্য্য যে শবর স্বামীর পূর্ববর্ত্তী এবিষয়ে সন্দেহ নাই নাই। পরন্তু কৃষ্ণদেব রচিত 'তন্ত্রচূড়ামণি' গ্রন্থে দেখা যায় যে শাবর ভাষ্যোপরি উপবর্ষের একখানি বৃত্তি ছিল। ভাস্করাচার্য্য বলেন, তিনি উপবর্ষ মতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—Fitz Edward Hall প্রণীত Sanskrit Philosophy.

কৃষ্ণদেবের উক্তির কোনও মূল্য আছে কিনা বলা । যদি তাঁহার উক্তিকে প্রামাণিক স্বীকার করা হয় তাহা হইলে এই উপবর্ষকে প্রাচীন উপবর্ষ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

(৫) বোধায়ন

ব্রহ্মসূত্রোপরি বোধায়নের যে একখানি বৃত্তি গ্রন্থ ছিল ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ঐ বৃত্তি হইতে অনেক কথা আচার্য্য রামানুজ নিজ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (Sacred Books of the East গ্রন্থমালায় থিবো লিখিত বেদান্ত শাঙ্করভাষ্য অনুবাদ-ভূমিকা পৃ, ২১)। প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত Herman এর মতানুযায়ী বোধায়ন মীমাংসাসূত্রেরও কৃত-কোটিনামক বৃত্তি রচনা করেন। (দ্রষ্টব্য Journal of the American Oriental Society, 1911, p. 17) প্রপঞ্চহৃদয় নামক গ্রন্থ হইতে ইহা বুঝা যায় যে বোধায়ন-রচিত বেদান্তসূত্রবৃত্তির নাম "কৃতকোটি" ছিল (দ্রষ্টব্য প্রপঞ্চহৃদয় পৃঃ ৩৯, ত্রিবান্দ্রম্ সং)। শঙ্করের কোন গ্রন্থে বোধায়নের নাম দেখা যায় না। কেহ কেহ ভাবেন এই বোধায়নই উপবর্ষ। কিন্তু প্রমাণ-সাপেক্ষ।

(৬) ব্রহ্মনন্দী

প্রাচীন কালে ব্রহ্মনন্দী নামে এক বেদান্তাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত মধুসূদন সরস্বতী নিজ সংক্ষেপশারীরকটীকায় (৩।২১৭) উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও অদ্বৈত বেদান্ত মতের আচার্য্য ছিলেন। প্রাচীন বেদান্ত-সাহিত্যে ব্রহ্মনন্দী ছান্দোগ্য বাক্যকার বা কেবল বাক্যকার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(৭) টঙ্ক

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্যেও একজন বাক্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার নাম ছিল টঙ্ক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মনন্দ ও টঙ্ককে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। ইহা কতদূর সত্য বলা কঠিন।

(৮) ব্রহ্মদত্ত

শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী কালে ব্রহ্মদত্ত নামে এক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের মণিমঞ্জরী নামক গ্রন্থে (৬।২-৩) উক্ত আছে যে, শঙ্কর ব্রহ্মদত্তের সহিত সাক্ষাৎকারাভিলাষে তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু একথা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। (কারণ, মণিমঞ্জরী নামক গ্রন্থখানি শঙ্কর-সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়ের বিবাদের ফলে রচিত, এবং ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের কুৎসা করাই উদ্দেশ্য মনে হয়। শঙ্করের কোন জীবনীগ্রন্থে একথার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এজন্য মণিমঞ্জরীর কথা তত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ এই ব্রহ্মদত্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা ছিলেন। এজন্য যামুনাচার্য্যের সিদ্ধিত্রয়-গ্রন্থের দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মদত্তের মতে জীব অনিত্য, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যপদার্থ, যথা—

"একং ব্রহ্মৈব নিত্যং তদিতরৎ অখিলং তত্র জন্মাদিভাক্ ইতি আয়াতম্।
তেন জীবোঽপি…জনিমান্।"

এই ব্রহ্মদত্তের মতটীকে বেদান্তদেশিকাচার্য্য নিজ তত্ত্বমুক্তাকলাপটীকা সর্বার্থসিদ্ধিতে (২।১৬) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত বলেন, জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। তাঁহার দৃষ্টিতে উপনিষদের যথার্থ তাৎপর্য্য তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যগুলিতে নহে। পরন্তু "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি

নিয়োগবাক্যেই উপনিষদের যথার্থ তাৎপর্য্য। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ভিন্নবৎ প্রতীত হওয়া সত্ত্বেও জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মদত্তের মতানুযায়ী সাধকের কোনও অবস্থাতেই কর্ম্মসমূহের ত্যাগ হইতে পারে না। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে আশ্মরথ্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্রহ্ম হইতে জীব উৎপন্ন হয়, এবং মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। ঐরূপ ব্রহ্মদত্তও জীবের উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করিতেন। পরন্তু আশ্মরথ্য ভেদাভেদবাদের পক্ষপাতী এবং ব্রহ্মদত্ত অদ্বৈত-বাদের সমর্থক ছিলেন। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি গ্রন্থ (১-৬৮) দ্রষ্টব্য। শঙ্করাচার্য্যের মতে মহাবাক্য-জন্য জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। তাঁহার মতে জ্ঞান উপাসনা হইতে পৃথক্ বস্তু। শঙ্কর উপাসনা-সম্বন্ধে বিধি স্বীকার করিলেও (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) জ্ঞানসম্বন্ধে বিধি স্বীকার করেন না। অবিদ্যা নিবর্ত্তক যথার্থ জ্ঞান বস্তুতন্ত্র হয়, পুরুষতন্ত্র হয় না। এই হেতু আত্মজ্ঞানের জন্য বিধির কোনরূপ আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য বৈদান্তিকগণ জ্ঞান ও উপাসনার এরূপ ভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা কোনও না কোন প্রকারে আত্মজ্ঞানার্থ বিধি অস্বীকার করেন। মীমাংসকগণ বলেন, বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য সিদ্ধ বস্তুর নির্দ্দেশমাত্রই নহে পরন্তু শঙ্করভিন্ন অন্য বৈদান্তিকগণও কর্ম্মের উপদেশ প্রায় ঐরূপই স্বীকার করেন। তাদৃশ বৈদান্তিকগণের দৃষ্টিতে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার ইহাই প্রভেদ যে পূর্ব্বকাণ্ডে কর্ম্মবিধি ও উত্তরকাণ্ডে ভাবনাবিধি (বলা হইয়াছে)। এই হেতু উপনিষদের 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বিধি বাক্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যগুলির নহে। বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ব্যতীত ভাবনা সম্ভবপর নহে। অতএব 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যগুলি বস্তুর স্বরূপবোধক মাত্র হওয়ায় আত্মোপাসনা বিধির শেষ স্বরূপ। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় কাণ্ডই সাধ্যবিষয়ক, সিদ্ধবিষয়ক নহে। সুরেশ্বরাচার্য্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিগ্রন্থে বলিয়াছেন (১-৬৭), "কেচিৎ স্বসম্প্রদায়বলাবষ্টম্ভাৎ আহুঃ, যদেতৎ বেদান্তবাক্যাদহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সমুৎপদ্যতে তন্নৈব স্বোৎপত্তিমাত্রেণ অজ্ঞানং নিরস্যতি, কিং তর্হি অহন্যহনি দ্রাঘীয়সা কালেন উপাসীনস্য সতঃ ভাবনোপচয়াৎ নিঃশেষমজ্ঞানমপগচ্ছতি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি-ইতি শ্রুতেঃ।" জ্ঞানামৃতবিদ্যাসুরভি নামক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির টীকাগ্রন্থে এই মতটী ব্রহ্মদত্তের বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বিশ্বাস করো

সুভাষপ্রিয় ভাই

বিশ্বাস করো বাংলার ভাই তোমরা মানুষ
তোমরা বীর,
বিশ্বাস করো জগতে তোমরা উচ্চে তুলেছ
আপন শির।
বিশ্বাস করো কর্ম্মে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অবিচল,
বিশ্বাস করো তোমরা যা ভাবো কার্য্যে তা হয়
অবিকল।
বিশ্বাস করো আপন ধর্ম্মে সহায় কর্ম্মে ভগবান,
বিশ্বাস করো ভারতমাতার অঙ্কে তোমরা সুসন্তান।
বিশ্বাস করো তোমরা যা কর ভারতীয় তাই করিবেই,
বিশ্বাস করো কীর্তিকাহিনী প্রতিদিন সবে স্মরিবেই।
বিশ্বাস করো আগুয়ান হবে দেশের আগে বঙ্গভাই
বিশ্বাস করো মায়ের বাঁধন মোচন করিবে তোমরাই।
বিশ্বাস করো তোমরা ধন্য করেছ আজি এ ধরণীতল,
বিশ্বাস করো যত্ন চেষ্টা হবেনা হবেনা কভু বিফল।
বিশ্বাস করো তুষার মেরু টলিবে সাগর শোষিবেই,
বিশ্বাস করো নেতাজীর জয় দুনিয়ার লোক ঘোষিবেই।
বিশ্বাস করো বিবেকের বাণী বিশ্বভুবনে সুগম্ভীর,
বিশ্বাস করো সব ত্যাগ করো স্বদেশের তরে
তোমরা বীর।

উপনিষদে পরাবিদ্যা

শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

এই বিশ্বমাঝে আমাদের সকলেরই মধ্যে এই যে 'আমি' 'আমি' ভাব উদিত হচ্ছে, এই আমির প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞানকেই উপনিষদ 'পরাবিদ্যা' বলেন। উপনিষদে এই অপরোক্ষ জ্ঞান ধরা পড়েছে। এই জন্যই উপনিষদকে বেদান্ত বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান এবং অন্ত অর্থে শেষ বা সমাপ্তি; সুতরাং উপনিষদই জ্ঞানের শেষ বা সমাপ্তি বলে ইহা বেদান্ত। এখানে এই জ্ঞান শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, এই আমির প্রকৃত স্বরূপটিই সমুদয় জ্ঞানের কেন্দ্র ব'লে, এর অপরোক্ষজ্ঞান হলে তখন সেই 'এক বিজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞান' সিদ্ধ হয়। কার্যাতঃও দেখা যায়, জগদ্বিষয়ক সমুদয় জ্ঞান একাধারে থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের ক্ষুধা মেটে না বা নিরাকাঙ্ক্ষও হওয়া যায় না; কিন্তু এই আমির প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হলে আর কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না—তখন তিনি একেবারেই 'ন কাঙ্ক্ষতি' হন। আবার প্রয়োজন বা পুরুষার্থের দিক দিয়েও এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ আর কি আছে? তাই ঋষিগণ জড় জগতের সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান রহস্য সম্যক্ অবগত হ'য়ে, এই আমির প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞানকেই বিদ্যার মধ্যে 'পরা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব'লে ঘোষণা করেছেন।

আবার এই আমির প্রকৃত স্বরূপটি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না ব'লে ব্যাপ্তি বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবের অনুমানেরও অবিষয়। সুতরাং এটী 'ঔপনিষদং'। অর্থাৎ, কেবল উপনিষৎ শ্রবণেই এর অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। তাই এই পরাবিদ্যাকে 'শ্রুতিবিদ্যা'ও বলে; এবং উপনিষদকে শ্রুতি বলে। যদিও পূর্ব্বে শ্রবণপরম্পরায় রক্ষিত হত ব'লে সমগ্র বেদকেই শ্রুতি বলা হয়, কিন্তু, যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টির অপরোক্ষ জ্ঞান উক্ত শাস্ত্র শ্রবণেই হয়, সেই শাস্ত্রই যথার্থ শ্রুতি বলে শ্রুতির মুখ্য অর্থ উপনিষদই। অবশ্য, শ্রবণ হতে পরোক্ষজ্ঞান হয় বল্লে কোনই কথা নেই; কিন্তু, অপরোক্ষজ্ঞান হয় ব'ল্লে অনেক কথাই এসে পড়ে। অতএব, আগে এই বিষয়টিই দেখা যাক।

যে জ্ঞানবলে আমি নিজের অস্তিত্বে দৃঢ় নিঃসংশয় থেকে নিজেকে 'আমি' ব'লে জানছি, এই জ্ঞানই এই আমির উপনিষদ্বেদ্য প্রকৃত স্বরূপ ব'লে আমির প্রকৃত স্বরূপের এই জ্ঞানটিই যথার্থ অপরোক্ষ এবং নির্বিকল্পকও বটে; আর যা কিছু আমি এই আমির কর্তৃত্বে এবং করণ সহায়ে জানি, তৎসমুদয়ই পরোক্ষ এবং সবিকল্পক জ্ঞান। কারণ, আমি শব্দটি স্ববোধক; অর্থাৎ নিজের প্রতি ব্যবহারযোগ্য। সুতরাং নিজেকে নিজের জানা না থাকলে কেহই "আমি" ব'লে ব্যবহার করতে পারে না। এখন এই অবস্থায় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যখন অন্য কোন কিছুরই জ্ঞান হয় না, তখন অবশ্য এই জ্ঞান নিজেকেই "আমি" বলে। অতএব এই জ্ঞানই "আমি"র প্রকৃত স্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানই নিজের অস্তিত্বে ও প্রকাশে অন্যের অপেক্ষা করে না ব'লে, আমির প্রকৃত স্বরূপের এই জ্ঞানটীই যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান। কারণ, জ্ঞাতা স্বয়ং যা জানে তাই অপরোক্ষ এবং অপর-

কর্ত্তৃক যা জানে তাই পরোক্ষ জ্ঞান। আবার এটা নির্ব্বিকল্পকও বটে। কেননা, এখানে সবিকল্পক জ্ঞানের কোন লক্ষণই নেই। গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতি কালে অন্তর্ব্বাহ্য সমুদয় জ্ঞেয় বস্তু ত্যাগ করলে যে জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই জ্ঞানটী তখন এই আমির সঙ্গে একাত্ময় ভাবেই অনুভূত হয়, উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। যেমন জ্ঞান আর সত্তার মধ্যে কোন ভেদ নেই—দুই-ই এক; তদ্রূপ আমির প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান এবং আমির মধ্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদরূপ ভেদ নেই। জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের মধ্যে যেখানে ভেদ থাকে সেই সব স্থলেই সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ সম্ভব হয়। বাস্তবিক জ্ঞানই ব্রহ্ম; দেহমধ্যস্থ জ্ঞান বা ব্রহ্ম "আমি" হয়ে প্রত্যগাত্মা নামে অভিহিত হন—"প্রত্যগাত্মতয়া অহমিতি জায়তে।" তাই বাশিষ্ঠযোগে বলা হয়েছে "দেহে ও জীবে অনুপ্রবিষ্ট চিৎ পরমায়ু-কাল পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাকে অহংভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত করেন।" এখানে পরমায়ুকাল শব্দের অর্থ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝতে হবে—যেহেতু, মুক্তি না হওয়া অবধি অধ্যাস যাবার নয়। আর এক কথা—এখানে কিন্তু জ্ঞাতা নিজেকে নিজে জানছে ব'লে "কর্ম্মকর্ত্তৃ-বিরোধ" নেই। কেননা, জ্ঞাতা নিজেকে আমি ব'লে যে জানছে, এর কারণ অনাদি অধ্যাস। সুতরাং অন্য বস্তু জানার সময় ঐ বস্তুর আকারে অন্তঃকরণের একটী পরিণাম অর্থাৎ বৃত্তিরূপ ক্রিয়ার আবশ্যকতা থাকায়, এবং ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব একস্থানে থাকে না ব'লে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধ ক্রিয়ামাত্রেই সম্ভব। আবার ব্রহ্মে বৃত্তি স্বীকারেও গৌরবদোষ আছে, কারণ বৃত্তি অর্থে পরিণাম এবং পরিণাম ক্রিয়ারই ফল। ব্রহ্মে "আমি" বৃত্তি কোনরূপ পরিণাম অর্থাৎ ক্রিয়াজন্য উৎপন্ন নয়। কারণ, ব্রহ্মে "আমির"র অধ্যাসটী যখন অনাদি, তখন এখানে বৃত্তিরূপ পরিণামের অর্থাৎ ক্রিয়ার সাক্ষী কোথায়? আমি বা আত্মা ভিন্ন অপর বস্তু জানার সময় অন্তঃকরণ সেই বস্তুর আকারে পরিণত হ'লে ঐ বস্তুজ্ঞানটীর জ্ঞান এই আমির হয় ব'লে এখানে বৃত্তিব্যাপ্তি দুইই থাকায়, অনুব্যবসায় জ্ঞান এবং জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমান এই পরোক্ষ জ্ঞানেই সম্ভব হয়; আমির নিজ স্বরূপের অপরোক্ষজ্ঞানে এ সবের কোনই প্রয়োজন নেই। তাই এখানে কোন সংশয় নেই, কোন প্রশ্ন নেই—এই জ্ঞানটী স্বতঃ অপরোক্ষ।

এখন আমির এই স্বতঃ অপরোক্ষ স্বরূপের ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদক "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" এই সব উপনিষদ্বাক্য শ্রবণে যদি ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তবে বশিষ্ঠের "জন্মান্ধ ব্যক্তির কেবল উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানই নহে, কেননা প্রত্যক্ষ বস্তুকে পরোক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিলে তাহাকেত ভ্রান্তিই বলিতে হয়—" এই উক্তিই এখানে যথেষ্ট। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি উপনিষদ্বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মের যে অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়, তা পঞ্চদশীকার "তখন ত্বং পদার্থ দ্বারা জীবের অব্রহ্মত্ব এবং তৎপদার্থ দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষত্ব নিবারিত হয়" এই বাক্যে বিশেষ চতুরতা অবলম্বন করে বলেছেন। বাস্তবিকই, উপনিষদের "এই আমিই ব্রহ্ম" "এই অহং নামে যাহা অভিহিত হইতেছেন এই অহংই পরমাত্মা—"যিনি নিত্য আমিতে সদা বর্ত্তমান"। "আমাদের ভিতরে যেটা 'আমি' 'আমি' ক'রছে, তাহাই ব্রহ্ম", এই সব বাক্যে অতি সুস্পষ্ট ভাবে এই আমির স্বতঃ অপরোক্ষ স্বরূপকেই ব্রহ্ম বলা সত্ত্বেও, "মৃদিতকষায়" হতে না পারার জন্যেই হোক্ অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক্, গ্রহীতার গ্রহণধারণের অক্ষমতার জন্যে কি দাতারও ক্ষমতার অভাব স্বীকার ক'রতে

হবে ? শ্বেতকেতুর বিনা "লক্ষণা"তেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়েছিল ; এখন "লক্ষণা"তেও লক্ষ্যহারা। অতএব, উপনিষৎশ্রবণে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় এবং উপনিষদ্‌ই যথার্থশ্রুতি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ অতি দৃঢ়তার সহিত বলেছেন—"সর্ব্বদাই সত্য—কেবল মাত্র সত্য শ্রবণ করিয়াই, এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে।"

তবে শ্রবণের 'পরেও শ্রুতি যে মনন ও নিদিধ্যাসন ক'রতে ব'লেছেন, তা' কেবল শ্রবণের ফলে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে দৃঢ় করবার জন্য। শ্রবণে অপরোক্ষজ্ঞান না হওয়া তবেই সম্ভব হত, যদি আমির এই স্বতঃ অপরোক্ষ স্বরূপকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হত। কিন্তু যখন আমির এই স্বতঃ অপরোক্ষ স্বরূপকেই অবলম্বন ক'রে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়—তখন আমির এই স্বতঃ অপরোক্ষ নিজ স্বরূপকেই "আমিই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম" ব'লে অভ্রান্ত ও দৃঢ় অনুভব করাকেই ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হওয়া বলা হয়, তখন আর শ্রবণে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় না বলার কোনই উপায় নেই।

মনন অর্থে বিচার। আর মনন-নিদিধ্যাসন শ্রবণেরই অঙ্গ মাত্র ; তাই শ্রবণে অপরোক্ষজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও শ্রুতি মনন ও নিদিধ্যাসন ক'রতে ব'লেছেন। কারণ, কেবল কানে শোনা কখনই প্রকৃত শ্রবণ নয়। শুনে তার অর্থ কাজে পরিণত না ক'রলে সকলে তাকে "শোনে নাই"ই বলে। অতএব শ্রুত বিষয়ে আদর শ্রদ্ধাদি থাকা চাই ; তবে তৎসম্বন্ধে সংশয়বিপর্য্যয়াদি থাকলে স্বতঃই মনন অর্থাৎ বিচার জাগ্রত হয় ; বিচারে নিঃসংশয় হ'লে তখন তৎপ্রতি স্বতঃই দৃঢ় একাগ্রতা জন্মে এবং তা ফলপ্রসূও হয়। এখন কথা এই, আমি আমার নিজস্বরূপটীর অপরোক্ষত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় সত্য ; আর আমি নিজে যেমন নিজের নিকট জ্ঞাত, আর কোন কিছুও এর চেয়ে আমার কাছে অধিক জ্ঞাত নয় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ ব'ল্লে, আমার নিজ স্বরূপের জ্ঞান অতি প্রত্যক্ষ কিন্তু, আমি ত আমার এই অতি প্রত্যক্ষ স্বরূপকে ব্রহ্ম ব'লে জানিনে, যে সব লক্ষণ দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করেছেন, আমার এই স্বরূপেও 'তার কোনটীই দেখিনে, বরং উল্টো। আবার শ্রুতিই আমাদের শ্রেষ্ঠ "আপ্ত" ব'লে শ্রুতির মহাবাক্যও অনাদর ক'রতে পারি নে। সুতরাং মনন বা বিচার চাই।

ব্রহ্মই যে আমাদের এই দেহমধ্যে জীবরূপে অবস্থিতি ক'রছেন, শ্রুতি বহু স্থানে "ব্রহ্ম দ্বিপদের পুর অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ সৃজন করিয়া জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট আছেন" এই প্রকারের অতি সুস্পষ্ট বাক্যে বারবার বলেছেন। আর এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রকে শারীরকমীমাংসা বলে। অর্থাৎ শরীরে বাসকারী যে ব্রহ্ম তাঁরই বিচার। কারণ, ব্রহ্মের নিরুপাধিক স্বরূপ পূর্ণজ্ঞানঘন বলে ক্রিয়ারহিত ; জ্ঞানক্রিয়া পূর্ণজ্ঞানভূমি হ'তে নিম্নতর অবস্থা এবং জ্ঞান-ক্রিয়াতেই জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় অর্থাৎ জানা জানি থাকে। তাই শ্রুতি এই শরীরাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট এই স্বতঃ অপরোক্ষ সোপাধিক আত্মাকেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব'লে প্রত্যক্ষ গোচর করাকেই "পরাবিদ্যা" বলেছেন। ভূমাব্রহ্মের উপদেশপ্রসঙ্গে শ্রুতি এই বিষয়টীই বিশেষ ক'রে উপদেশ করেছেন। শ্রুতি ভূমার পরিচয়ে "ভূমাতে কোনরূপ জানা জানির সম্পর্ক নেই" উপদেশ ক'রে ভূমাকে নিরুপাধিক ব্রহ্ম ব'লেছেন। সুতরাং ঐরূপ উপদেশ এই দ্রষ্টা জীব (সোপাধিক

আত্মা) হ'তে ভূমাকে (নিরুপাধিক ব্রহ্মকে) কোন পৃথক তত্ত্ব ব'লে আশঙ্কা হ'তে পারে দেখে, সঙ্গে সঙ্গেই ভূমাকে আমি ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন ; আবার অজ্ঞ সাধারণ দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকে আমি বলে ব'লে, এই আশঙ্কায় তখনই আবার ঐ ভূমা আমিকে আত্মা ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে বলেছেন—এই প্রকার বিদ্বান ব্যক্তি স্বীয় আত্মার মনন ও অনুভূতি দ্বারা "ভূমা" অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষদর্শন ক'রে "স্বরাজ্" অর্থাৎ সমস্ত লোকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন এবং তখন স্বীয় আত্মা হ'তেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি সবই দর্শন করেন। এই সোপাধিক আত্মাই যদি বাস্তবিক নিরুপাধিক ব্রহ্ম হন, তবে ত নিরুপাধিক ব্রহ্মের সকল লক্ষণই এই আত্মাতেও অবশ্য আছে। অতএব, এই দেহাদি-সংঘাতরূপ উপাধির মধ্যে কোন্‌টী আত্মা এবং আত্মাই যে ব্রহ্ম, এখন এইটীই দেখা যাক্।

শ্রুতি ব'লেছেন, এই দেহমধ্যে যিনি অনুভব-কর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং যিনি এই দেহে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম তিনিই আত্মা, আর আত্মাই ব্রহ্ম। আমরা দেখেছি, এই দেহমধ্যে এই যে আমি আমি ক'রছে, জ্ঞানই এই আমির প্রকৃত স্বরূপ ; সুতরাং জ্ঞানই সকলের প্রকাশক ব'লে এই দেহ-মধ্যে এই আমিই জ্ঞাতা। আবার জাগ্রতে সুষুপ্তির সুখ ও অজ্ঞান এই আমিই স্মরণ করে ব'লে তখনও এই আমি জ্ঞান থাকে ; তবে অজ্ঞানই তখন জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বরূপের এই আমি জ্ঞান অজ্ঞাত থাকে। আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনের মধ্যে যখন সুষুপ্তিই সর্ব্বান্তর, তখন অবশ্য এই আমি জ্ঞান সুষুপ্তিরও অন্তরে ব'লে এই দেহে এই আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম। আর 'আত্মা' ও 'আমি' এ দুটী স্বরূপবোধক পর্য্যায়শব্দ মাত্র। অতএব, এই দেহমধ্যস্থ আত্মা আমিই এবং আমিই ব্রহ্ম।

এ বিশ্বরঙ্গালয়ে দেখতে পাই, জ্ঞানই সর্ব্বে-সর্ব্বা "রঙ্গরাজ নটবর হরি"! আবার সমুদয় শ্রুতিও একবাক্যে এই জ্ঞানকেই ব্রহ্ম ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। আমরাও দেখেছি, অনাদি অধ্যাস বশতঃ এই দেহমধ্যে জ্ঞানই নিজেকে নিজে আমি ব'লে অপরোক্ষভাবে জানছে ;—এখানে এই দেহ কিন্তু কারণদেহ বা আনন্দময়কোষ—যাকে মূল-অজ্ঞান বলে। আর জ্ঞানই আমার এই আমির প্রকৃত স্বরূপ ব'লে সারা বিশ্বের অস্তিত্ব আমার এই আমির জানার উপরই নির্ভর করে ; কিন্তু, আমার এই আমির অস্তিত্ব এই আমিরও জানার অপেক্ষা করে না—ব্যবহারক্ষেত্রে এটা কোথা হ'তে এসে হাজির হয় এবং জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হ'য়ে নিজের প্রয়োজন মত এই বিশ্বকে ব্যবহার করে। বাস্তবিক জ্ঞানের নিজ স্বরূপ সম্বন্ধীয় এই আমি জ্ঞান যখন জ্ঞানেরই নিজকৃত অনাদি অধ্যাস হ'তে উৎপন্ন ; কেননা, অজ্ঞান জড় সুতরাং জড়ের কর্তৃত্ব নেই, তখন অবশ্য এই অনাদি অধ্যাসেরও পূর্ব্ব-সিদ্ধ অধিষ্ঠানরূপে জ্ঞানের সত্তা স্বীকার ক'রতে হয় ; সুতরাং জ্ঞান গীতার সেই "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" অর্থাৎ অনাদিরও আদি অমৃত-ব্রহ্ম। আবার অধ্যাস হ'তেই সৃষ্টি ; সুতরাং জ্ঞানই অধ্যাস-কর্ত্তা ব'লে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মও এই জ্ঞানই। আবার জ্ঞানই নিত্যমুক্ত ব্রহ্মও বটে ; কারণ, মুক্তি অর্থে "সমুদয় সৃষ্টিতে যথেচ্ছ অধিকার প্রাপ্তি"—পাথর হ'য়ে যাওয়া নয়! নতুবা মুক্তি পরম পুরুষার্থও হ'ত না এবং ভুলেও কেউ মুক্তির ইচ্ছা করত না। মুক্তি অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা—প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব ; আর এটী জ্ঞানেরই নিজস্ব। তাই আত্মার প্রমাতৃত্ব প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে ভামতীকার বলেছেন, "প্রমাতৃত্ব এই শব্দের অর্থ প্রমার কর্তৃত্ব, সে কর্তৃত্ব হইল স্বতন্ত্রতা। অর্থাৎ, যে প্রমাতা হইবে, সে প্রমার অন্যান্য যে সমুদয় কারক আছে,

তাহাদের দ্বারা সে প্রেরিত হইবে না; অথচ ঐ সকল কারকের সে প্রয়োগকর্ত্তা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এটী আরও সরল ভাষায় অতি সুস্পষ্ট ক'রে বলেছেন—"মুক্ত স্বভাবের অর্থ বাহ্য সকল বস্তুর অনধীনতা। ইহার অর্থ এই, উহা ব্যতীত কোন বস্তুই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না।" আমরা দেখেছি, অধ্যাসই সমুদয় সৃষ্টির মূল; আর জ্ঞানই এই অধ্যাসের কর্ত্তা। সুতরাং মূলে যে বিষয়ে যার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে, সেই একই বিষয়ে পরে কি তার কর্তৃত্ব লোপ পায়? সুতরাং জ্ঞান সেই নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম। আবার মূল-অজ্ঞানই হোক্ অথবা তার যে কোন গুণ বা ধর্ম্মই হোক্, জ্ঞানের জানার উপরই যখন সকলের সত্তা, এবং জ্ঞান যখন পূর্ণ "কামচার" অর্থাৎ ইচ্ছাময়, তখন স্বভাবশুদ্ধ জ্ঞানের কি সেই নিজের অঙ্গীকৃত আগন্তুক গুণ বা ধর্ম্মে কিছুই এসে যায়? দেখা যায়, যাতে যার অধ্যাস হয় তাতে তার গুণ বা ধর্ম্ম কিছুই লিপ্ত হয় না; আর এই অধ্যাস জ্ঞানেরই জ্ঞানপূর্ব্বক অঙ্গীকৃত একটী ব্যাপার মাত্র। অতএব, জ্ঞানস্বরূপ এই আত্মা বা এই আমিই সদাশুদ্ধ ব্রহ্ম—"অহং ব্রহ্মাস্মি"। তবে, আমি ব্রহ্ম হ'য়েও নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন ব'লে যে জানছি, এর কারণ শ্রুতিবাক্য শ্রবণ না করা; অথবা শ্রবণ করেও অনাদর-হেতু বিচার না করায় গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব—অজ্ঞান নয়; কেন না, অজ্ঞান জ্ঞানেরই কর্তৃত্বাধীন। বাস্তবিক জ্ঞানের স্ব-স্বরূপবিষয়ক এই আমি জ্ঞান অনাদি অধ্যাস বশতঃ উৎপন্ন ব'লে অধ্যাস থাকা কাল পর্য্যন্ত এটী আছেই। তথাপি ব্যবহারকালের পূর্ব্বে অজ্ঞ সাধারণের এটী জ্ঞান-গোচর না হ'লেও, তখনও তাদের নিজের অস্তিত্বে কোনরূপ সংশয় না থাকা এবং ব্যবহার-কালে তাদের নিজের জানার কিছু মাত্র অপেক্ষা না রেখেই এসে হাজির হওয়া কি ঐ সময়েও এই আমি জ্ঞানটী থাকার প্রমাণ নয়? আনন্দময় কোষের আমি জ্ঞান জ্ঞানেরই স্বরূপাবগাহী; কারণ, আমি শব্দ স্ব-স্বরূপেরই বোধক হওয়ায় জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা হেতু স্বসংবেদ্য ভাবে জ্ঞানাভেদে একটা "কেবল আমি" জ্ঞান থাকে; নতুবা আমি-উপাধিরহিত ব্রহ্মের নিরুপাধিক স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তথাপি কিন্তু, এখানে আমি-উপাধি থাকা সত্ত্বেও তখন ব্রহ্মের নিরুপাধিক স্বরূপেরই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়; কেননা, তখন অজ্ঞানের আর অপর কোন উপাধিই থাকে না এবং জ্ঞান এখানে এই আমি-জ্ঞানের জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না—জ্ঞানস্বরূপই থাকে। এটী বোঝান এবং বোঝা উভয়ই কঠিন; আর একেই উপনিষদে পরাবিদ্যা বলে।

যদিও আনন্দময় কোষের স্বতঃ অপরোক্ষ জ্ঞান-স্বরূপ আমি-জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক হেতু অজ্ঞ সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকে বটে, তথাপি যখন ঐ জ্ঞানস্বরূপ আমি বহির্ম্মুখতা বশতঃ ক্রমে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে অবলম্বন ক'রে অহম্ ইদম্ এর অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ভেদ হেতু সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন কিন্তু সাধারণের অনুভবগোচরে আসে। তবে, নিজ প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞানা-ভাব বশতঃ এই আমি তখন বুদ্ধ্যাদি করণবর্গকেই আমি ব'লে জ্ঞান করে এবং করণধর্ম্মকেই নিজস্বরূপ ধর্ম্ম জ্ঞান করায় নিজেকে ঐ সকল ধর্ম্মাক্রান্ত বোধে সুখ ও দুঃখভাক হয়; আবার করণের কৃত কর্ম্মও স্ব-কর্ম্মজ্ঞান ক'রে ঐ সকল কর্ম্মের বশে কর্ম্মানুযায়ী লোক ও অবস্থা লাভ করে, এবং নিজেকে বদ্ধজীব ব'লে জ্ঞান করে। তথাপি সত্যকে ভোলা কঠিন; তাই বদ্ধাবস্থা-তেও নিজ মুক্ত স্বরূপের ইঙ্গিত পায় এবং

বুদ্ধ্যাদি জড় বস্তুকে আমি বলা সত্ত্বেও অলক্ষ্যে তাতে নিজ জ্ঞানস্বরূপকেই আরোপ করে। কিন্তু যিনি সুধীর, নিজ প্রকৃত স্বরূপের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, মুক্তীচ্ছায় শ্রুতিবাক্য শ্রবণ ও মনন দ্বারা গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে আনন্দময় কোষে আমির স্বতঃ অপরোক্ষ নিজ প্রকৃত স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হন; এবং তখন স্বতঃই "অহং ব্রহ্মাস্মি" "শিবোহহং" "সোঽহং" এই নিদিধ্যাসন অর্থাৎ একতানভাবের উদয় হয়। তখন শ্রবণ পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রবণের ফল অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু" অর্থাৎ বুদ্ধিরও অতীত সেই "যেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ নিজ প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিতি ঘটে। সুতরাং বুদ্ধ্যাদির অধ্যাসকালেও, পূর্ব্বে নিজ প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া হেতু, "এই সোপাধিক আমিই সেই নিরুপাধিক ব্রহ্ম" এই দৃঢ় ও অভ্রান্ত অনুভব জাগ্রত হওয়ায় তিনি বুদ্ধ্যাদির ধর্ম্ম বা কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। মুক্ত যিনি, তিনি তাঁর জীবনের সমুদয় ঘটনাকেই লীলারূপে দর্শন করায় পাপভাগী অর্থাৎ দুঃখভাগী হন না; আর বদ্ধ যারা, তারা তাদের জীবনের সকল ঘটনাই সত্য এবং অপরিহার্য্য ব'লে জানে, তাই পাপভাগী অথাৎ দুঃখ পায়। এখন শেষ কথা—ব্রহ্মবিদ্যার কেবল অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কখনই পরাবিদ্যা নয়—যদি না তাতে নিজ প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাই চার বেদসহ ব্রহ্মপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও নিজ প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষজ্ঞান না হওয়ায় দেবর্ষি নারদ শোকমুক্ত হতে না পেরে ভগবান সনৎকুমারের সমীপস্থ হয়ে আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে শোকমুক্ত হন। অতএব—"সা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

সভ্যতার প্রকৃতি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন ও প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকিলেও উহা এখনও পরীর দেশের মত বস্তুতন্ত্রহীন পদার্থ মাত্র। অনেকে বলেন, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হইয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে, তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে কতকগুলি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া সার্বভৌমিক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের কথা যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ নয়। শিল্পে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রধান ও একমাত্র বাঁধন কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদের মিলনের সম্ভাবনা অল্প। যদি নরনারীর সুখসম্পদ্‌বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি, বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন সকল রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা একত্রিত হইয়া হয়ত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিত। শক্তিবৃদ্ধি ও পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন জাতির উদ্দেশ্য ও কাম্য

হইলে তাহাদের সহিত অন্য জাতির সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র থাকে না। যদি কোন একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের বাহুবল বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় কিংবা পৃথিবীর সকল নরনারী সাম্যবাদের মত জাতীয়তার উর্ধ্বে কোন উদার সার্বজনীন মতবাদ গ্রহণ করে, তবেই বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব হইতে পারে।

কতগুলি লোকের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতের ঐক্যে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দলের উদ্ভব। দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধি সংকীর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিলে দল বা সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকের ঘৃণা ভয় ও সন্দেহ থাকে, ফলে তাহার সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীনকালে ইহুদীরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি বলিয়া গর্ব অনুভব করিত। এজন্য তাহারা অপর জাতির ঘৃণা ও ঈর্ষা উদ্রেক করিয়াছিল। বর্তমান যুগে শিনটো জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে শিক্ষা দেয় কিন্তু একমাত্র জাপানী ছাড়া অন্য কেহ তাহা স্বীকার করে না। নিজের স্থায়িত্ব কায়েম করিয়া লইতে গিয়া যে প্রতিষ্ঠান ঘৃণা ঈর্ষা ও সংঘর্ষের প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তাহার আয়ু অল্প।

সংকীর্ণ ধর্মমতের ন্যায় উগ্র জাতীয়তাবোধ পৃথিবীতে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। জাতীয় পতাকা জাতির সভ্যতার প্রতীক না হইয়া হিংসার ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা ইংরাজের মনে নেলসন ও ট্রাফালগার, ওয়েলিংটন ও ওয়াটারলু, ক্লাইব ও ভারতবর্ষের ছবি ফুটাইয়া তোলে, তখন সে ভাবে না তাহার সেকস্‌পীয়র, নিউটন ডারউইন ও বার্ণার্ড শ'কে। বিশ্বসভ্যতায় গ্রীসের শ্রেষ্ঠদান আলেকজাণ্ডার ও আলকিবাইডিস্ নয়, তার শ্রেষ্ঠ দান সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল,—ইটালির শ্রেষ্ঠ দান জুলিয়স্ সিজার নয়, দান্তে ও গ্যালিলিও, জার্মেনীর শ্রেষ্ঠদান কাইজার ও হিটলার নয়, গোটে ও কান্ট, ভারতের শ্রেষ্ঠদান চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত নয়, বুদ্ধ শঙ্কর রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। যিনি যে পরিমাণে মানুষের চিত্তকে কল্যাণের পথে চালিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে মহৎ এবং যে জাতির মধ্যে জ্ঞানী ও আদর্শবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি—সেই জাতিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ততদিন স্থান অধিকার করিয়াছে।

সার্বভৌমিক রাষ্ট্র এখনও কবিজনসুলভ কল্পনার বস্তু। বিশ্বসভ্যতার ধারণা অবজ্ঞার বস্তু নয়। জাতি-বিশেষের সভ্যতার অবদান তাহার একচেটিয়া সম্পদ নয়, ইহা সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। জাতিগত অন্ধ সংস্কার ও গর্ব বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, জাতীয়তাবাদ জাতিবিশেষের সভ্যতাকে সকলের উপরে স্থান দিতে চাহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ গর্ব ও অজ্ঞতা। প্রকৃত বিচার-বুদ্ধির আলোকে অহমিকার অন্ধকার দূর হইলে বিভিন্ন জাতির মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। তখন বিশ্ব-কৃষ্টি বা সার্বভৌম সভ্যতার অভ্যুদয় হয়।

স্বার্থের প্ররোচনায় বিভিন্ন জাতি পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল। ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আপাততঃ ঐক্যের ও শান্তির আশা অল্প কিন্তু তাহাদের মনের মিলের একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত আছে। জাতি-বিশেষের সভ্যতার প্রকৃতি ভিন্ন হইলেও মানব-সভ্যতা একটি অখণ্ড বস্তু। এই বোধ লইয়া পরস্পরের সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা করিলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে এবং এই শ্রদ্ধাই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ন্যায় ব্যবহারের মূল।

কোন দেশের ও জাতির শ্রেষ্ঠতা বিচার করিবার সময় তাহাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্মের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। আমরা অনেক সময় এই তিনটি বস্তুকে এক কোঠায় ফেলি, ইহাদের মধ্যে যে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে তাহা ভুলিয়া যাই। সাধারণতঃ সভ্যতা প্রকাশ পায় শিক্ষা জ্ঞান দর্শন বিজ্ঞান শিল্প ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া। সংস্কৃতি প্রধানতঃ আবার অনুষ্ঠান রীতি সাজ-সজ্জা আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে লক্ষিত হয়। সভ্যতা মননের—বিচার-বুদ্ধির এবং সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের ব্যাপার। ধর্ম সংস্কৃতির মূল। বীজ এক হইলেও মাটি ও জলহাওয়ার তারতম্যে ফলের রূপের ও স্বাদের প্রভেদ থাকে। বাংলা পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের লোক হিন্দু বা মুসলমান হইলেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাহারা মনন বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে এক কিন্তু বাহিরের অনুষ্ঠানে পৃথক। সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সভ্যতার বা মননের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি মিলিত হইতে পারে।

সভ্যতা বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেষ্টনীর ভিতর দেশ-বিদেশে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। সভ্যতার রূপ নানা কিন্তু তাহার অন্তর প্রকৃতি এক। রূপ রঙ গন্ধ ও সুষমার সমাবেশে ফুলের সৌন্দর্য। নানা জাতির নানা সভ্যতার দানে বিশ্বসভ্যতার আদর্শ পুষ্ট হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির সমন্বয়ে যে মানস জাগরণ তাহারই নাম বিশ্বসভ্যতা। কোন একটি সভ্যতা অন্য সকল সভ্যতাকে নির্জিত ও উদরস্থ করিলে প্রকৃত বিশ্বসভ্যতা সৃষ্ট হইবে না। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর বিশ্বসভ্যতা-সৌধের প্রতিষ্ঠা হইবে না।

সভ্যতায় মানুষের চিত্তসম্পদের বিকাশ। সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি মানুষের বাহুবল বা বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য বা দৈন্য নয়। যে পরিস্থিতির ভিতর মানুষের চিন্তা বা ভাবের দৈন্য অভিব্যক্ত, যাহাতে তাহার মঙ্গলময়ী বৃত্তি শক্তিহীন ও নির্জীব, সস্তুতির উপাসনায় তাহার মন বিকার-গ্রস্ত; যাহাতে মানবতা বা উদারতার পরিবর্তে পশুত্বের জাগরণ সম্ভব হয়, বিষয়ের জঞ্জালে তাহার চৈতন্য অবলুপ্ত, ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত—যাহাতে তাহার বিবেক বিচার বুদ্ধি ও ধর্মভাব মোহগ্রস্ত, সেই বেষ্টনী বিচিত্র আড়ম্বর আয়োজন সৃষ্ট করিলেও, তাহার বিপুল চাকচিক্য সত্ত্বেও তাহা মানবতায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীতে এখন চারিটি সভ্যতা বর্তমান আছে। প্রথম, ইউরোপীয় সভ্যতা। ইহা প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জার্মেনিক ও শ্লাভ জাতির কর্মশক্তি ও ভাবুকতায় ইহা পুষ্ট। দ্বিতীয়, ইস্লামিক সভ্যতা। ইহা আরবীয় মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। তৃতীয়, হিন্দুসভ্যতা—ভাবপ্রবণতা ও আদর্শবাদ ইহার বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ, চীনা সভ্যতা। ইহা বস্তুতান্ত্রিক এবং বৌদ্ধধর্মের সূত্রে হিন্দুসভ্যতার সহিত সংযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে আত্মিক যোগ নাই। উপক্রান্ত এশিয়াটিক জাতিসকলের প্রতিনিধি এই দুই দেশ ইউরোপীয় জাতিদের শিকারের স্থান এবং ইহাদের মিলন আত্মরক্ষা প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী একটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির অধিকারী। এই সর্বগ্রাসী সংস্কৃতি চীন ভারত ও ইস্লামের যাহা কিছু মহৎ তাহা গ্রাস করিয়া লইয়া

বলসঞ্চয় করিয়াছে কিন্তু চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতার স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ ভাবকে জয় করিতে পারিতেছে না।

মনুষ্য-চরিত্রের ন্যায় সভ্যতারও দুইটি দিক আছে—একটি ইন্দ্রিয়ের, অপরটি অতীন্দ্রিয়ের দিক। ইউরোপীয় সভ্যতায় ইন্দ্রিয়ের দিক প্রবল। ভারতীয় সভ্যতায় অতীন্দ্রিয়ের সাধনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহাতে উভয়ের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কতকটা সফল হইয়াছে। নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে যে রহস্য, যে দুজ্ঞের্য় ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় জীবন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সেবার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান জীবনের সার্থকতার জন্য আবশ্যক।

জীবন-বীক্ষা সভ্যতার ভিত্তি। ইহা সভ্যতার প্রাণ। মানুষের দেহের ওজন ও পরিমাণ ধাতুর ন্যায়, তাহার যান্ত্রিক গঠনপ্রণালী উদ্ভিদের ন্যায়, তাহার বোধশক্তি সাধারণ-জীবের ন্যায়—কিন্তু তাহার উপর তাহার বিচারশক্তি ও আত্মিক জ্ঞান আছে। দৈহিক গঠন ব্যাপারে আমরা বানর ও উদ্ভিদের নিকট আত্মীয়। অধ্যাপক এলিয়ট স্মিথ্ বলেন, মানুষের মগজ সিম্প্যাঞ্জির মগজ হইতে ভিন্ন নয়। কিন্তু তথাপি মানুষ মানুষ হিসাবে ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন, আমাদের দোষ গুণ মানসিক। ইন্দ্রিয়-তর্পণসম্ভূত সম্ভোগ জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলে মানুষ পশুভাবাপন্ন হয়। দেহাত্মবোধ পাশবিক বল ও আত্মিক শক্তির মলিনতা বর্বরতার লক্ষণ। যে সমাজ বা জাতি শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ও দেহ অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষকে অর্থাৎ সত্য শিব ও সুন্দরের অভীপ্সাকে উচ্চতর স্থান দিতে কৃপণতা করে, সে সমাজ বা জাতি সভ্যপদবাচ্য নয়। দেহ মন ও আত্মার সমবায়ে মনুষ্যপ্রকৃতি গঠিত। স্বাস্থ্যবান দেহ, অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি জীবনের উপযোগী হইলেও জীবনের সর্বস্ব নয়। আত্মসেবা আত্মরক্ষা আত্মসুখ ও আত্মপ্রভুত্ব অর্ধ বর্বরতার এবং সমগ্রের জন্য আপন-ভোলা কল্যাণবোধ সভ্যতার নিকষ। যখন ব্যক্তিত্ব বিশ্বজনীনতায় পরিণতি লাভ করে, যখন প্রাত্যহিক জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

কোন জাতিই একেবারে বর্বর নয়। এমন কোন জাতি নাই যাহার দলগত নীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, ন্যায়-অন্যায় বোধ, নীতি বা শিল্পের ধারণা নাই। আমাদের মতে এস্কিমো, রেড্ ইণ্ডিয়ান, বাসুটো এবং ফিজিদ্বীপবাসীরা বর্বর, কারণ তাহাদের ইস্কুল হাসপাতাল ও আদালত নাই। কিন্তু গ্রীক রোমান ইংরাজ বা জার্মানদের মত তাহাদের ধর্মবিশ্বাস আচার-ব্যবহার ও জীবনধারণ-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য আছে। এমন কি পশ্চিম আফ্রিকায় তথা-কথিত বন্য ও বর্বর নিগ্রো মানুষ আমাদের মত আশা আকাঙ্ক্ষাদ্বারা চালিত এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহারা যে ধর্মমত গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ধর্মমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাহারাও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করে, পুনর্জন্মবাদ মানে। তাহারা গভীর দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা করিতে পারে নাই সত্য কিন্তু তাহারাও পরম কারুণিক পাপপুণ্যের বিচারক এক ঈশ্বরের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ অনুন্নত জাতির মানুষ সম্বন্ধে অন্যায়ও অনুচিত ধারণা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বর্বর ও অসভ্য বলিয়া থাকে কিন্তু সত্যকাম ব্যক্তিগণ মাছির মত ব্রণ অন্বেষণ করেন না, মৌমাছির মত মধু সংগ্রহ করেন।

সভ্যতা অন্তরের বস্তু,—বাহিরের জিনিষ নয়। বাষ্পীয় পোত, উড়ো জাহাজ, আণবিক বোমা, টেলিফোন ও টাইপ-রাইটার ব্যবহার সভ্যতার মাপকাঠি নয়। শিক্ষা দিলে বানরও সাইকেল চড়িতে পারে বা এরোপ্লেন চালাইতে পারে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বানর বানরই থাকে, মানুষ হয় না। জড়বিজ্ঞানচর্চায় ও যন্ত্র-আবিষ্কারে প্রাচীন ভারত গ্রীস বা মধ্যযুগের ইটালি পশ্চাৎপদ ছিল কিন্তু তাহারা প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উচ্চস্থান দিয়াছিল, আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

আধুনিক সভ্যতা অর্থনৈতিক বর্বরতার স্তরে অবস্থিত। সম্পত্তি ও শক্তি লইয়াই ইহার কারবার, আত্মা ও মনুষ্যধর্মের উৎকর্ষ ইহার কার্যসূচীর অন্তর্গত নয়। বর্তমানে আর্থিক উন্নতি জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, অর্থনীতি ধর্ম ও সাম্রাজ্য অর্জন পরম সাধনা।

হেগেল বলিয়াছেন, ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে মানুষ ইতিহাস হইতে কিছুই শিক্ষা করে নাই। চীনা ও ভারতীয় সভ্যতার স্থায়িত্বের কারণ তাহাদের মনুষ্যধর্ম ও আত্মিক জ্ঞান। এই সকল দেশেও যুদ্ধবিগ্রহ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট বা রাজার অভাব ছিল না কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সা তাহাদের জীবনের উচ্চতম আদর্শকে খর্ব বা ম্লান করিতে পারে নাই। লোভ ও বাহুবলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের তীব্র কামনা—আসিরিয়ার ধ্বংসের কারণ। যুদ্ধ প্রাচীন গ্রীসের পতন ঘটাইয়াছিল। রোম ভোগের দ্রব্যে ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল কিন্তু মনুষ্যধর্মে রিক্ত হইয়া গিয়াছিল। মানবতার অভাবে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, সভ্যতার পর সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই কঠোর ও রূঢ় সত্য উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

মানুষের চিত্তনদী উভয়তোবাহী বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ—একটি ধারা কল্যাণের দিকে, আর একটি ধারা অমঙ্গলের দিকে প্রবহমাণ। এজন্য মানুষ একদিকে যেমন দেবতা, অন্যদিকে তেমনি মর্কট। সে একদিকে হত্যা লুণ্ঠন রক্তপাত ও শোষণ চালাইতেছে, অন্যদিকে আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য ও দর্শন সৃষ্টি করিতেছে। মধ্যযুগের বর্বরতার মধ্যে আবিলার্ড ও একুইনাসের মত কোবিদদের আবির্ভাব হইয়াছিল, দেশ-জোড়া কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার ভিতর মহম্মদ ও শঙ্করের মনীষার উদয় হইয়াছিল। বিশ্বময় নরমেধ-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের ভিতরও মার্কস, লেনিন ও রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, বার্নর্ড শ ও গান্ধীর মঙ্গলময়ী বাণী শোনা যাইতেছে।

ইতিহাসে দেখি কোন জাতি মানবধর্ম খর্ব করিয়া প্রাণশক্তির অপচয় ঘটাইয়াছে, কোন জাতি বৈষম্যের অন্তরালে মহান্ ঐক্যকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, কোন জাতি জীবন-মহাযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নররূপী নারায়ণের প্রীতি-কামনায় উৎসর্গ করিয়াছে, আবার কোন জাতি বিষয়কামনার জঞ্জালে তাহার আত্মিক সত্তা আবৃত করিয়াছে, ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিজের রিক্ততা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়াছে। ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর মত সভ্যতার ধারা সুদূর অতীতের মহোচ্চ শিখরে কবে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা এখনও অজ্ঞাত। অজানাকে জানিবার, অচেনাকে চিনিবার জন্য মানব যাত্রা কবে চিরবন্ধুর সাধনার পথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল তাহা জানা নাই। সভ্যতার ঋজুশীর্ণ স্রোতরেখা কত ঊষর মরুকান্তার ভেদ করিয়া "মহাসাগরের সাগরতীরে"র দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। জানি না কবে মহাসাগরের বিরাট আত্মা সেই তীর্থোদক পান করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়া শান্তিলাভ করিবেন।

বেদান্ত-দর্শন *

শ্রী—

বেদান্ত-দর্শন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে, এমন কি সমগ্র জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ। কিন্তু এই দর্শন এরূপ নিগূঢ় ও সুকঠিন যে, ইহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ অতি কঠিন কার্য। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ বহু ভাষ্যকার এই দর্শনের বিভিন্ন মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতেরও পুনরায় নানাবিধ ব্যাখ্যা বিভিন্ন টীকাকারগণ করিয়াছেন। এইরূপে অসংখ্য টীকাভাষ্যসমেত বেদান্তদর্শন এক সুবিশাল সমুদ্র। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন মতাবলী সম্যগ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে বেদান্তদর্শন বিষয়ে কোনও সুসম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত ধারণা সম্ভবপর নহে। অথচ, সাধারণ পাঠকের পক্ষে এতগুলি ভাষ্য-টীকা সংস্কৃতে বা অনুবাদের মাধ্যমিকতায় পাঠ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই।

তজ্জন্য বিশেষভাবে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ ডক্টর রমা চৌধুরীলিখিত "বেদান্ত-দর্শন" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের (শঙ্কর, রামানুজ ও নিম্বার্ক) সম্বন্ধে ঈদৃশ বিশুদ্ধ অথচ প্রাঞ্জল আলোচনা দৃষ্ট হয় না। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক স্বল্প সময়ে ও স্বল্পায়াসে আমাদের শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, মোক্ষ, সাধনাবলী, প্রমাণাবলী প্রভৃতি দর্শনের জটিল তথ্যাদি সংক্ষেপে অথচ সুসমঞ্জস ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, "উদ্বোধন" পত্রিকার কার্তিক (১৩৫৪) সংখ্যায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থখানির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে "কয়েকটি স্থানে সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে কিছুটা ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে," তিনি এরূপ দশটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৫, ৯ এবং ১০নং এরূপ পরিষ্কার মুদ্রাকর-প্রমাদ যে, যে কোনো লোকই তাহা পাঠমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, সিদ্ধান্তের ভ্রমপ্রমাদের কোনো প্রশ্নই সে ক্ষেত্রে উঠে না। (৫) "ত্বৎ ত্বমসি"—এস্থলে "ত্বৎ" যে "তৎ" হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। (৯) "প্রলয়কালে প্রত্যেক কার্য স্ব স্ব কার্যে বিলীন হয়"—এক্ষেত্রে কার্য যে কার্যে বিলীন হয় একথা বাতুল ভিন্ন কেহই বলিবেন না। অতএব দ্বিতীয় 'কার্য' স্থলে 'কারণ' হইবে—ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ মাত্র। (১০) "জগৎ জগতই, ব্রহ্মও নহে, জগতও নহে"—এস্থলেও 'জগৎ জগতই জগতও নহে', ইহাও বাতুলপ্রলাপ মাত্র। অতএব শেষ "জগতও নহে" স্থলে "জীবও নহে" হইবে, ইহাও স্পষ্ট মুদ্রাকরপ্রমাদ মাত্র। অপর সাতটী স্থলে কোনো ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে কোনো ভ্রমপ্রমাদ নাই। উপরন্তু এই সকল স্থলের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শনের জন্য অধ্যাপক মহাশয় যে সকল মন্তব্য ও মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলই দর্শনের দিক্ হইতে ভ্রান্ত। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে সাধারণের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই আমি এ সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিতে চাই।

(১) "রজ্জুকে সর্পরূপে অথবা শুক্তিকে মুক্তা-

* ডক্টর রমা চৌধুরী-লিখিত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত।

রূপে ভ্রম করিলে রজ্জু সর্পত্বে অথবা শুক্তি মুক্তাত্বে সত্যই পরিণত হয় না।"

এস্থলে অধ্যাপক মহাশয়ের মতে রজ্জু সর্পে (সর্পত্বে নহে) ও শুক্তি মুক্তাতে (মুক্তাত্বে নহে) পরিণত হয় না—ইহাই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত, কারণ ধর্মীর ধর্মে পরিণতি হইতে পারে না। এস্থলে অধ্যাপক মহাশয় কেবল এক প্রকার অধ্যাসের কথাই, অর্থাৎ কেবল তাদাত্ম্যাধ্যাসের কথাই ভাবিতেছেন বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্কর ধর্মিদ্বয়ের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস এবং সেই সঙ্গে ধর্মিগত ধর্মের পরস্পর সংসর্গাধ্যাস উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। সেজন্য লেখিকা যদি বলিতেন "রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না," তাহা হইলে কেবল ধর্মি-তাদাত্ম্যাধ্যাসের কথাই বুঝা যাইত। কিন্তু "রজ্জু সর্পত্বে পরিণত হয় না" বলাতে ধর্মের সংসর্গাধ্যাস ও ধর্মিতাদাত্ম্যাধ্যাস উভয় প্রকার অধ্যাসের কথাই বলা হইয়াছে। ধর্মাধ্যাস, ধর্মাধ্যাসের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। ধর্মাধ্যাসের অধিষ্ঠানে অবশ্যই ধর্মীর অধ্যাস হইয়া থাকে। (ন্যায়রত্নাবলী ৪৩১ পৃঃ রাজেন্দ্র ঘোষ সং।) লেখিকা স্বয়ংই উহার পরের লাইনে ধর্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসের কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন : "সর্প মিথ্যা প্রতীতি মাত্র।" এইরূপে আলোচ্য গ্রন্থে ধর্মের সংসর্গাধ্যাস দেখাইয়া পরে ধর্মীর তাদাত্ম্যাধ্যাস উভয়ই সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারেও বলা হয় "মানুষ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে", অর্থাৎ, মানুষ পশুত্ব বা পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াই পশু হয়। এ ক্ষেত্রে 'পশুত্বের' সংসর্গারোপই বুঝিতে পারা যায় 'পশুত্বের' সহিত 'মানুষের' তাদাত্ম্যারোপ কদাপি প্রতীত হয় না; এরূপে "সর্প রজ্জুত্বে পরিণত হয় না" বলিলে 'সর্পের' সহিত 'রজ্জুত্বে'র তাদাত্ম্য বুঝায় না, রজ্জুত্বের সংসর্গাধ্যাসই প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই উক্তিতে দোষের কিছুই নাই; উপরন্তু ইহা উভয় প্রকার অধ্যাসেরই দ্যোতক বলিয়া 'সর্প রজ্জুতে পরিণত হয় না' এই উক্তি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদিগণ পাঁচ প্রকার অধ্যাস স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাসের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে "অন্যোন্যস্মিনন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্মাংশ্চাধ্যস্য' ইত্যাদি। এই সিদ্ধান্তভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর আরোপ্য ও আরোপ বিষয়ের, অর্থাৎ ধর্মিদ্বয়ের পরস্পর তাদাত্ম্যারোপ এবং ধর্মিদ্বয়গত ধর্মসমূহেরও ইতরেতরাধ্যাস অর্থাৎ পরস্পর বিনিময়রূপ আরোপ স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বপক্ষগ্রন্থেও ভাষ্যকার শঙ্কর ধর্মিদ্বয়ের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস হইতে পারে না এবং ধর্মিদ্বয়গত ধর্মসমূহেরও পরস্পর বিনিময়াত্মক অধ্যাস হইতে পারে না বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষভাষ্য ও সিদ্ধান্ত ভাষ্য আলোচনা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে ভাষ্যকার শঙ্কর ধর্মিদ্বয়ের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ অন্যোন্যাধ্যাস যেমন স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ ধর্মিগত ধর্ম-সমূহেরও পরস্পর সংসর্গাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু একটী ধর্মীতে অপর একটী ধর্মীর তাদাত্ম্যাধ্যাস মাত্র স্বীকার করেন নাই। এইরূপ একেতর ধর্মের সংসর্গাধ্যাসও স্বীকার করেন নাই। যদিও অপরবাদিগণ সকলেই একেতরাধ্যাসই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন। ধর্মিদ্বয়ের অন্যোন্য তাদাত্ম্যাধ্যাস এবং ধর্মসমূহের পরস্পর সংসর্গাধ্যাস। ভাষ্যকর শঙ্কর কেন অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিলেন, ইহার আলোচনা "পঞ্চপাদিকা" গ্রন্থের প্রথম বর্ণকে ও পঞ্চপাদিকার টীকা-বিবরণে এবং বিবরণ-টীকা "তত্ত্বদীপনে" বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। (পঞ্চপাদিকা ৩৫ পৃ, ২৬ পংক্তি, বিজয়নগর সংস্করণ।)" "সংক্ষেপশারীরক" গ্রন্থেও অধ্যাস

নিরূপণ-প্রসঙ্গে ধর্মিদ্বয়ের অন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাস এবং ধর্মসমূহের পরস্পর সংসর্গাধ্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা "অদ্বৈতসিদ্ধির" টীকা "লঘু-চন্দ্রিকার" ৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৪৭ পৃষ্ঠা (নির্ণয়-সাগর, বোম্বে সংস্করণ) পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। "সিদ্ধান্তবিন্দু" গ্রন্থে মধুসূদন একেতরাধ্যাস খণ্ডন করিয়া অন্যোন্যাধ্যাসের সমর্থন করিয়াছেন এবং "সিদ্ধান্তবিন্দুর" টীকা "ন্যায়-রত্নাবলী" গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দও এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা অদ্বৈতবেদান্তের অধ্যাস আলোচনা করেন, তাঁহারাও এই পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস ও পরস্পর সংসর্গাধ্যাস সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না। এই জন্য এই সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবে না, এই মনে করিয়াই সাধারণ পাঠকের জন্য "বেদান্ত-দর্শন" প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছিল। "লঘুচন্দ্রিকার" ৩৯ পৃষ্ঠাতে গৌড় ব্রহ্মানন্দ ইদমাদি বস্তুতে রজতাদির অধ্যাস দেখাইতে যাইয়া পাঁচ প্রকার অধ্যাসের কথা বলিয়াছেন: যথা—ইদমাদ্যবচ্ছেদে চৈতন্যে (১) রজতাদি (২) রজতাদির তাদাত্ম্য, ও (৩) রজতত্বাদির সংসর্গ অধ্যস্ত হইয়া থাকে, এবং রজতাদ্যবচ্ছেদে চৈতন্যে (৪) ইদমাদির তাদাত্ম্য এবং (৫) ইদন্তাদি ধর্মের সংসর্গ অধ্যস্ত হইয়া থাকে। এই অধ্যস্ত বস্তুগুলি প্রাতিভাসিক, তৎকালোৎপন্ন এবং অবিদ্যো-পাদানক। এইরূপে পাঁচটী অধ্যাস দেখানো হইয়াছে। কেন এইরূপ দেখানো হইয়াছে—ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে গেলে সাধারণ পাঠক কেন, বিজ্ঞ পাঠকেরও ক্লেশ হইবে। এই জন্যই "বেদান্ত-দর্শনে" সরলভাবে অধ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অধ্যাস মাত্রই অন্যোন্যাধ্যাস, একেতরাধ্যাস নহে। যাঁহারা মনে করেন ধর্মীর তাদাত্ম্যাধ্যাস দেখাইলেই হইত, ধর্মের সংসর্গাধ্যাস দেখাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা অধ্যাস-ভাষ্যের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং রজ্জুতে সর্পাধ্যাসেও রজ্জুগত ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে কেবল সর্প ও সর্প-তাদাত্ম্যই অধ্যস্ত নহে, কিন্তু সর্পত্ব-ধর্মের সংসর্গও অধ্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্মের সংসর্গাধ্যাস প্রদর্শন করায় কোনও ন্যূনতা হয় নাই। আরো কথা এই যে, রজতত্বের প্রতীতি ব্যতীত রজতের, এবং সর্পত্বের প্রতীতি ব্যতীত সর্পের প্রতীতি, অব্যাবৃত্ত প্রতীতি। সর্পত্ব আছে বলিয়াই তাহা সর্প, রজতত্ব আছে বলিয়াই তাহা রজত। রজতত্ব, সর্পত্বাদি ধর্মের অনুল্লেখে তাহা রজত বা সর্প-প্রতীতি হইতে পারে না। এই কথাই ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে "গৌঃ স্বরূপেণ ন গৌঃ, নাপ্যগৌঃ, গোত্বাভিসম্বন্ধাত্তু গৌঃ"—এইরূপ রজতত্বরহিত রজত বা সর্পত্বরহিত সর্প বলিলে কোনও অর্থই হয় না। যাহা হউক, বস্তুতঃ আমাদের প্রদর্শিত ধর্মিতাদাত্ম্যাধ্যাস ও ধর্মসংসর্গাধ্যাস উভয়ই আলোচ্য গ্রন্থে সাধারণের সুবিধার জন্য, সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ধর্মের অধ্যাস, ধর্মের তাদাত্ম্যাধ্যাস নহে, ধর্মের সংসর্গাধ্যাস—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের প্রক্রিয়া। আমাদের প্রদর্শিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলেই এই উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভাষ্যকার স্পষ্টভাবে অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিলেও যাঁহারা একেতরাধ্যাস মাত্র স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদের রহস্য দেখাইতে প্রয়াস করেন—বা প্রবন্ধ সংশোধনের সৎ পরামর্শ দেন, তাঁহারা অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

(২) "জগৎকে সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ-অনির্বচনীয় বলা হয়।" এস্থলে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি এই যে, "বাঙালী পাঠক 'সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ' শব্দ হইতে সৎ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্য প্রকার, অসৎ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্য প্রকার, এই অর্থ বুঝিবে। কি? এই স্থলে

ভুল সংস্কৃত লেখায় অর্থ জটিল হইয়া উঠিয়াছে।” এই আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। এস্থলে ভুল সংস্কৃত লেখা হয় নাই, বাঙালী পাঠকের বোধসৌকর্যার্থ “সদসদ্-বিলক্ষণানির্বচনীয়” স্থলে সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া হাইফেনের সাহায্যে লেখা হইয়াছে মাত্র; এবং অর্থ জটিল হইবারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার পরের লাইনেই লেখিকা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন “জগৎ সৎ নহে, সৎ কদাপি বাধিত হয় না। আবার অসৎও নহে, কারণ অসৎ কদাপি প্রত্যক্ষীভূত হয় না।” বস্তুতঃ কথা এই যে অনির্বচনীয় বস্তু, সদ্বিলক্ষণ, অসদ্বিলক্ষণ এবং সদসদ্বিলক্ষণ। এই জন্য অদ্বৈতবেদান্তিগণ অনির্বচনীয়তাকে চতুর্থী কোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৎ-কোটি, অসৎ কোটি এবং সদসৎ কোটি—এই তিনটী হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয়তা চতুর্থী কোটি। পরমার্থতঃ বিবেচনা করিলে অনির্বচনীয় বস্তুকে কোনও কোটিরই অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না। যাহা স্বরূপতঃ অসত্য বস্তু, তাহার কোনও ধর্মই সত্য হইতে পারে না। এমন কি অনির্বচনীয় বস্তুর অনির্বচনীয়তাও পারমার্থিক নহে। এই সকল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা অবশ্য সাধারণ পাঠকের নিকট কঠিন হইত। সেজন্য আলোচ্য গ্রন্থে এই জাতীয় আলোচনার প্রয়োজন নাই।

(৩) “স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন বা অন্তঃকরণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদেহ—এই ষষ্ঠ উপাধি।” এক্ষেত্রে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি এইরূপঃ “উল্লিখিত ছয়টী উপাধি। সুতরাং এই ছয়টী উপাধি বা এই ষড়ুপাধি পাঠ হওয়া উচিত ছিল।” এস্থলে বক্তব্য এই যে,—‘এই ছয়টী উপাধি’ ইচ্ছা করিলে তাহা অবশ্য লেখা যায়। কিন্তু ‘এই ষষ্ঠ উপাধি’ বলিলেও ত অর্থ বা ব্যাকরণের দিক্ হইতে দোষ ধরা যায় না। কারণ, সূক্ষ্মদেহ ষষ্ঠ উপাধি হইলে তাহার পূর্ববর্তী বুদ্ধি পঞ্চম, মনঃ বা অন্তঃকরণ চতুর্থ, প্রাণ তৃতীয়, ইন্দ্রিয় দ্বিতীয় এবং স্থূলদেহ প্রথম উপাধি ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ পর্যন্ত ছয়টীই উপাধি। এই ছয়টী উপাধির মধ্যে প্রত্যেকটীকেই ষষ্ঠ উপাধি বলা যাইতে পারে। ষট্ত্ব সংখ্যার প্রপূরককেই ‘ষষ্ঠ’ বলা হয়।

(৪) “অধ্যাসের অভাবই মুক্তির কারণ”। এক্ষেত্রে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি এই যে, “মুক্তির কারণ—এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় মুক্তি পদার্থটী কার্য বা অনিত্য ইহা বুঝা যাইতেছে। অদ্বৈতবেদান্ত-মতে মুক্তি নিত্য পদার্থ, ব্রহ্মস্বরূপ, মুক্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। অধ্যাসের তিরোধান লিখিলে বোধ হয় সিদ্ধান্তের উপর আঘাত পড়ে না।” কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, মুক্তি নিত্য পদার্থ, তাঁহারা অদ্বৈতশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। কারণ—“অবিদ্যাস্তমায়া মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ” এই সুরেশ্বরবার্তিকে অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হইয়াছে। বিদ্যা ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যাকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়া থাকে। সুতরাং মোক্ষের কোন সাধন নাই, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। অধ্যাপক মহাশয়ের “অদ্বৈতবাদীর মতে মুক্তি নিত্য পদার্থ” এই উক্তির অর্থ কি? অবিদ্যানিবৃত্তি কি নিত্য পদার্থ? সুরেশ্বরাচার্য অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আরো কথা এই যে, “নিবৃত্তিরাত্মামোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ” এই এই উক্তি অনুসারে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে, অবিদ্যা অধ্যস্ত বস্তু বলিয়া তাহার নিবৃত্তি অধিষ্ঠানস্বরূপ। “অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ”। এই

রীতি অনুসারে অবিদ্যার অধিষ্ঠান আত্মাই অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ। কিন্তু আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ সর্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়া জীবের সর্বদাই মোক্ষের আপত্তি হইত, এইজন্য আচার্য জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাকে অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ে জ্ঞান না হইলে আত্মা জ্ঞাতত্ব-উপলক্ষিত হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভাবিত নহে। জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট আত্মাকে অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ বলিলে আত্মজ্ঞানের অবিদ্যমান দশাতে আত্মা জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষণ না থাকিলে বিশিষ্ট থাকে না। এই জন্য আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তির পরে বিদেহ কৈবল্য—আত্ম-জ্ঞানের অবিদ্যমানতা দশাতে মোক্ষের অনুপপত্তি প্রতিসন্ধান করিয়া আচার্য জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাকে অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়াছেন। যদাকদাচিৎ জ্ঞাতত্ব সম্পন্ন হইলে, আত্মা জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু যাহার আত্মবিষয়ক জ্ঞান কখনও হয় নাই, তাঁহার অবিদ্যানিবৃত্তি সম্ভাবিত নহে, মোক্ষও সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ অধ্যাপক মহাশয়-ব্যবহৃত "তিরোধান" শব্দটী অদ্বৈতবাদীরা ব্যবহার করেন না। "তিরোধান" শব্দটী সৎকার্যবাদীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইজন্য গৌড় ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন যে "চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য দৃশ্যাশ্রয়কাল-পূর্বত্বাভাব-নিয়ম এব স্বীক্রিয়তে ন তু নাশহেতুত্বম্।" (লঘুচন্দ্রিকা, ৪ পৃষ্ঠা, ২-৩ পংক্তি)। তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যার নাশক নহে, কিন্তু প্রদর্শিত নিয়মানুসারে চরম তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণে দৃশ্যমাত্রই থাকে না, ইহাই সিদ্ধান্ত। অধ্যাপক মহাশয়ের মতানুসারে "তিরোধান" বলিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বড়ই ব্যাঘাত হইত। অধ্যাপক মহাশয়ের উক্তি "স্বপ্রকাশতা উপলব্ধ হয়"—এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বলাই যাইতে পারে না। "উপলব্ধ" কথার অর্থ উপলব্ধির বিষয়। স্বপ্রকাশ বস্তু, উপলব্ধির বিষয় নহে। মুক্তির স্বপ্রকাশতা বলিলে ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তির স্বপ্রকাশতা ধর্ম—ইহাই সিদ্ধ হইবে। ধর্মমাত্রই মিথ্যা—স্বপ্রকাশতা ধর্মও মিথ্যা। সুতরাং মোক্ষদশাতে মিথ্যাবিষয়ক জ্ঞান থাকিবে, ইহা নিতান্তই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী কথা। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থে, এই সকল বাগ্-বিতণ্ডাবহুল ভুল শব্দাদি ব্যবহার না করিয়া সোজাভাবে 'কারণ' বা 'সাধন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারই শ্রেয়ঃ—তাহাতে অর্থ বা সিদ্ধান্তের কোনো দিক্ হইতে ব্যাঘাত হয় না।

(৬) "জ্ঞানই মুক্তির কারণ।" এস্থলে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি এই যে, "এস্থলে কারণ শব্দ প্রয়োগ করা সঙ্গত কি? প্রকাশক, অবভাসক প্রভৃতি কোনও শব্দ ব্যবহার করাই উচিত।" "জ্ঞানান্মোক্ষঃ" ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্তক, অথবা অবিদ্যার নিবৃত্তিস্বরূপ—ইহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও "জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ" এই সিদ্ধান্তের কোনও অপলাপ ঘটে না। "অবভাসক" বা "প্রকাশক" বলিলেও অবভাসের জনক বা প্রকাশের জনক—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তাহাতে কারণতার অস্বীকার হইল কোথায়? কার্য-কারণ-ভাব স্বীকার না করিয়াই কি দার্শনিকগণ স্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কার্য-কারণ-ভাব পারমার্থিক নহে, ইহা অন্য কথা।

(৭) "একটী প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অপর একটী অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞানের নাম অনুমান"। এক্ষেত্রে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তিঃ "এই লক্ষণ তো দৃষ্টার্থাপত্তি প্রমাণেও অতিব্যাপ্ত হইতে পারে…। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের নাম অনুমান—এইরূপ লক্ষণ করিলেই বোধ করি অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না।" কিন্তু এরূপ আপত্তি সত্যই বিস্ময়কর। কারণ, প্রথমতঃ, লেখিকা ত স্বয়ংই দু' এক পংক্তি পরেই বলিয়াছেন, "অনুমান

ব্যাপ্তিমূলক" (পৃঃ ২৩); এবং সহজ উদাহরণসহ "ব্যাপ্ত" কথাটির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে বস্তুতঃ "ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের নাম অনুমান", অধ্যাপক মহাশয়ের মতানুসারে ইহা বলিলেও তাহা অনুমানের লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুব্যবসায় মানসপ্রত্যক্ষ। মানস-প্রত্যক্ষ অনুমান নহে। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ব্যাপ্তিবিশিষ্ট জ্ঞানও বটে; "ব্যাপ্যোঽহয়ং"—এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান, ব্যাপ্তিরূপ বিশেষণজ্ঞান-জন্য। সুতরাং "ব্যাপ্যোঽহয়ং"—এইরূপ জ্ঞান অনুমান নহে, কিন্তু বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ। সুতরাং এই বিশিষ্টবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানেও অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। এইরূপ আরও বহু দোষ হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতির লক্ষণ বলিলে লিঙ্গপরামর্শে ও ঘটাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আরো কথা এই যে, খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে, অর্থাপত্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক, এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানও ব্যাপ্তিজ্ঞানই বটে। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় অনুমানের যে লক্ষণ স্বয়ং বলিয়াছেন তাহাও ত অর্থাপত্তিতে অতিব্যাপ্ত হইতে পারে। অতএব সাধারণ পাঠকের জন্য যাহা সংক্ষেপে ও সহজ ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে অকারণ দোষ অনুসন্ধান করিতে গেলে, লাভ কিছুই নাই, উপরন্তু বহু ভ্রমপ্রমাদেরই উদ্ভব হইতে পারে।

(৮) অধ্যাপক মহাশয়ের মতে "অর্থাপত্তির আলোচনায় শ্রুতার্থাপত্তিকে গ্রন্থকর্ত্রী স্থান দেন নাই। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র বুঝিতে হইলে শ্রুতার্থাপত্তির জ্ঞানই বিশেষভাবে প্রয়োজন নয় কি?" আমার মতে, সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত গ্রন্থে শ্রুতার্থাপত্তির আলোচনা বর্জন করিয়া লেখিকা কোনরূপ অন্যায় করেন নাই। কারণ, শ্রুতার্থাপত্তি শ্রুতিপ্রমাণ হইতে ভিন্ন অপর একটী প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে মীমাংসকগণ একমত নহেন, এবং এইরূপ একটী বাগ্‌বিতণ্ডাবহুল বিষয়ের অবতারণা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের পক্ষে উপযোগীও নহে। ভাট্ট-সিদ্ধান্তে দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকৃত হইলেও প্রাভাকর মতে শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকৃত হয় নাই।

"অনন্বিতাভিধানঞ্চ বেদস্যাকার্যমানতা।
শ্রুতার্থাপত্তিরিত্যেষু স্থলেষু প্রতিযোগিনঃ।
প্রাভাকরা নিরাকার্যা ভাট্টমার্গানুসারিণা॥" ইতি
মানরত্নাবলী।

ইহার অভিপ্রায় এই যে প্রভাকরমতে অন্বিতাভিধান স্বীকার করা হয় এবং ভাট্টমতে অনন্বিতাভিধান অর্থাৎ অভিহিতান্বয় স্বীকার করা হয়। প্রভাকরমতে কার্য-বস্তুতেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। ভট্টমতে সিদ্ধবস্তুতেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। ভট্টমতে শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করা হয়, প্রভাকরগণ তা' স্বীকার করেন না। সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তিতে মীমাংসকগণের মতভেদ আছে বলিয়াই প্রবন্ধে শ্রুতার্থাপত্তির আলোচনা করা হয় নাই। অদ্বৈতবাদিগণও যেরূপ অভিহিতান্বয়-বাদ স্বীকার করিয়া থাকেন, এরূপ অন্বিতাভিধান-বাদেরও সমর্থন করিয়া থাকেন। যথা, অদ্বৈত-সিদ্ধিতে মধুসূদন, সত্যাদি পদের অখণ্ডার্থত্বোপপত্তি-প্রকরণে অন্বিতাভিধানবাদি-মতেও অখণ্ডতার উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। আর ইহা প্রাচীন আচার্যগণেরও সম্মত। সংক্ষেপশারীরককার "পরদর্শি পুনরন্বিতাভিধানে পদযুগলাৎ স্মৃতিযুগ্মমেব পূর্বম্" ইতি—এই বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়াও অখণ্ডার্থতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ভট্টসম্মত শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার না করিলেই যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে এরূপ নহে। বেদান্তপরিভাষাকার শ্রুতার্থাপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার না করিলে অদ্বৈতবেদান্তের কোনও হানি নাই। যাহা শ্রুতার্থাপত্তিগম্য তাহা শ্রুতিগম্যই বটে, ইহাই প্রাভাকর সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে।

আলোচ্য "বেদান্ত-দর্শন" গ্রন্থটীতে লেখিকা বেদান্ত-দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সুকঠিন বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি পরিবর্জন পূর্বক, যথাসম্ভব সরল সহজভাবে বেদান্তের মূল তথ্যাদি সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত প্রপঞ্চনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কঠিন কার্যে যে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন, ১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী:—গত ৫ই অক্টোবর, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টাত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিশনের ১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৬৫টি কেন্দ্র এবং ৮টি উপকেন্দ্র জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের সেবা করিয়াছে এবং ধর্মের অসাম্প্রদায়িক মূলতত্ত্বসমূহ প্রচার করিয়াছে।

এবার ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত মিশন দুর্গতদিগের মধ্যে ১৭৩৬ খানা কম্বল, ৬০৬০ খানা কাপড়; ২২৭৮ খানা সোয়েটার ও বেনিয়ান, ৪৬৬৯ খানা বাসন, ৩২৫ মণ ২৫ সের চাল, ২০৩ প্যাকেট গুঁড়া দুধ, বহু পরিমাণে মালা, সিন্দুর ও শাঁখা বিতরণ করিয়াছেন। হাইমচরের চিকিৎসা-কেন্দ্রে ১৭৪৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। শ্রীহট্টে আশ্রয়প্রার্থী সেবাকেন্দ্রে ২২১ জন আর্ত ব্যক্তিকে দৈনিক দুইবার খাওয়ান হইয়াছে এবং ৩১৭ জন আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে ১৮১/২ মণ চাল বিতরণ করা হইয়াছে। সারগাছি আশ্রম হইতে কিছু পশমী কম্বল ও চাদর আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত এই সেবাকার্যের জন্য মোট আয় ২৪৯২৭২॥৶৩পাই এবং মোট ব্যয় ৮৬০৫৩৶৯পাই। সেবাকার্য এখনও চলিতেছে।

এতদ্ভিন্ন অল্লায়তনে বিহারে দাঙ্গা-সেবাকার্য এবং কাছাড়, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলায় বন্যা-সেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৫১৪টি রোগিশয্যাযুক্ত ৬টি সাধারণ হাসপাতাল এবং ২টি প্রসূতি-সেবাসদন মিশনকর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। মিশন-পরিচালিত হাসপাতালগুলির অন্তর্বিভাগে ১১৯৭৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। বৃন্দাবনের চক্ষুচিকিৎসা কেন্দ্র এবং সাধারণ হাসপাতালগুলিতে ৩৭৭৩ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। এই বৎসর ৪১টি আউট ডোর ডিস্পেন্সারীতে ৫০০৭৪৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। দিল্লীর যক্ষ্মা চিকিৎসাকেন্দ্র এবং করাচীর চক্ষু-চিকিৎসাকেন্দ্রের রোগিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এবার দুইটি কলেজ, ৪টি আবাসিক হাইস্কুল, ১২টি মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং ১১টি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় মিশনকর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। ইহাদিগের ছাত্রসংখ্যা ৪০৮০ এবং ছাত্রীসংখ্যা ১৯২২। এতদ্ব্যতীত ৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩টি নৈশবিদ্যালয়, ৪টি শিল্প-বিদ্যালয় এবং দুইটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রে যথাক্রমে ৫৬১১, (২৮৮৬ জন বালক ও ২৭২৫ জন বালিকা), ৪১৬, ৩৬৭ এবং ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসরে মিশনপরিচালিত ৩৫টি ছাত্রাবাসে ১৪৮২ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করিয়াছে। রহড়া অনাথ আশ্রমের বালক-সংখ্যা ১৮০। কাশী সেবাশ্রমের মহিলা-বিভাগ; কলিকাতা ও টাকীর প্রসূতি-সেবাসদন, পুরীর বিধবা-আশ্রম, কাশীর দুঃস্থ মহিলা আশ্রয়-নিবাস, মাদ্রাজের সারদা-বিদ্যালয়, কলিকাতার নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রভৃতি মহিলাপ্রতিষ্ঠানও মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

এই বৎসর ভারত-বহির্ভূত মরিসাস সিঙ্গাপুর ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে মিশনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক কার্য পরিচালিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে মিশনের মোট আয় ৩২১০৬৯৯॥/৫ পাই এবং মোট ব্যয় ৩১৫৩৫১৩।০ আনা।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবন, কলিকাতাঃ—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৬ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী যুবকদিগকে যথার্থ উচ্চ-শিক্ষাদান ইহার উদ্দেশ্য। তাহারা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবান্, কর্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এক সুচিন্তিত কর্ম-প্রণালী অনুসারে গত ২৮ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সমাজের সেবা করিতেছে।

আলোচ্য বৎসরে এই ভবনের ৪৩টি ছাত্রের মধ্যে ২১টি ছাত্রের খাওয়া থাকা পুস্তক প্রভৃতির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এবং ১০টি ছাত্রের আংশিক ব্যয়ভার আশ্রম-কর্তৃপক্ষ বহন করিয়াছেন। অবশিষ্ট ১২টি ছাত্র নিজ ব্যয়ে আশ্রমে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। এই বিদ্যার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে পড়ে। অনেক কলেজ-কর্তৃপক্ষই এই আশ্রমের ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়াইয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। দমদমায় প্রায় ৯০ বিঘা জমির উপর ছাত্রাবাসের স্থায়ী অবস্থিতি ছিল। এই জমি ও বাটী প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট অধিকার করায় ইহা বর্তমানে কলিকাতায় ২০ নং হরিনাথ দে রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিচালিত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ১৯৪৬ সালের কার্যবিবরণী—এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠে ১৬৯ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। এবার ১২জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল এবং সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের পরীক্ষার ফলও অতীব সন্তোষজনক। সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল আশ্রমের আদর্শে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, সঙ্গীত, দর্জির কাজ এবং ফুল ও সব্জি বাগানের কাজ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষ হইতে ছাত্রদিগকে ব্যাঙ্ক ও পত্রিকা-পরিচালন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'বিদ্যাপীঠ ব্যাঙ্ক' ও 'বিবেক' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। ভারতীয় বিদ্যালয়ে এই জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ অভিনব।

এখানে ছাত্রভর্তি করার জন্য প্রতি বৎসর অসংখ্য আবেদন আসিয়া থাকে কিন্তু স্থানাভাবে অধিকাংশ ছাত্রকেই গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য ছাত্রদের আরও আবাসগৃহ ও একটি প্রার্থনা-মন্দিরেও বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবেঃ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (সাঁওতাল পরগনা)।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিক সভা—গত ১১ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা নাগরিকগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পৌরোহিত্য করেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। স্বামীজির বাণী ছিল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, নিরন্নকে অন্নদান করাই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষার বড় কথা। আমরা যদি প্রতিগৃহে ক্ষুধার্তের অন্ন যোগাইতে পারি, নিরক্ষরতা দূর করিতে পারি এবং পীড়িতদের সেবা করি, তবেই স্বামীজির জন্মতিথি উদ্‌যাপন সার্থক হইবে। বাংলার অধিবাসিগণ আজ অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষায় পীড়িত। বাংলার জনগণ অর্ধাশনে থাকিয়া যে অপূর্ব আত্মত্যাগের নিদর্শন দেখাইতেছেন, তাহার পর তাহাদের কাছে আর ত্যাগের বাণী শুনাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। স্বামীজি ছিলেন মহাবিপ্লবী ও বাস্তববাদী। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, অপরকে শোষণ করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা সাম্যবাদের আর কোন বড় বাণী নাই। তিনি স্বাধীনচিন্তার পরিপোষক ছিলেন। শাশ্বত ধর্মের চিরন্তন বাণীকে তিনি প্রচলিত রীতিনীতির অচলায়তন হইতে স্বাধীন চিন্তার বলে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ স্বাধীন চিন্তার দ্বারা পুরাতনের পরিবর্তন সাধন করিয়া যদি আমরা যুগধর্মের সাধনায় ব্রতী হই, যদি লোকহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করি, তবে তাহাই হইবে স্বামীজির শ্রেষ্ঠ তর্পণ। এই সাধনাই তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীদের বাঞ্ছিত। বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে মানুষের জন্য সত্যিকার প্রেম ছিল। দেশ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। দুই শত বৎসরের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল হইতে দেশ এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহা করিতে হইলে স্বামীজির মত মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষের জন্য দুঃখ যদি আমাদের হৃদয়কে সিক্ত করে, তাহা হইলে স্বামীজির স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলী বলেন, বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে এদেশে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে পাইয়াছিলেন এবং শেষে তিনি ঈশ্বর হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের অনেক উপরে তাঁহার স্থান। তাঁহার ধর্ম ছিল সার্বজনীন ও উদার। তিনি ছিলেন মহামানব। তিনি ভারতীয় কৃষ্টির মূর্ত-প্রতীক—জগতে ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যাতা। মহাত্মা গান্ধীর মুখে আজ বিবেকানন্দজীর বাণীই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধন প্রভৃতি বিবেকানন্দেরও কর্মের অঙ্গ ছিল। তিনি ভারতকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন—একথা সত্য; কিন্তু তাঁহার অন্তরের আহ্বান ছিল—ভারতবাসী, তোমরা মানুষ হও।

মানুষ হওয়ার পথে অন্তরায় পরাধীনতা, এজন্তই তিনি দেশের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। স্বামীজির প্রেমের ধর্ম অবলম্বন করিলে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে ও তাণ্ডবলীলা দূর হইবে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় বলেন, ভারতের স্বাধীনতাকে যাঁহারা রূপদান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যাঁহারা বিশ্বের দরবারে প্রচার করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ভারতীয় জাতিকে তিনি এক বৈপ্লবিক আবর্তনের মধ্যে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বৈপ্লবিক অভিযানের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন তিনি জ্ঞানবর্তিকা হস্তে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন দত্ত মজুমদার বলেন, বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়াই ভারত প্রথম আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয়ের বাণী শুনিয়াছিল। যে আত্মপ্রত্যয়ের ফলে ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে তাহার সূত্রপাত হয় বিবেকানন্দের মধ্যে এবং পরিণতি লাভ করে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মধ্যে। শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, শ্রীযুক্তা প্রভাময়ী মিত্র, স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী, স্বামীজির জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসু 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বিহারী ঘোড়াই 'বিবেকানন্দ-বন্দনা' গান এবং সোসাইটির যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থি-সেবাকার্য
রামকৃষ্ণ মিশনের
আবেদন

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে বহুসংখ্যক সর্বহারা লোক পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সকল বিপন্ন লোকের সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশন তথায় সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্তমানে শিশুদিগের জন্ত দুগ্ধ বিতরণ এবং পীড়িতগণের চিকিৎসা করা হইতেছে। এই উভয় কার্যেরই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। শীঘ্রই অন্নসত্র খুলিয়া কার্যের প্রসার করা হইবে।

এই সকল সম্পূর্ণ অসহায় নরনারীর দুর্দশা কত শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবার ক্রমেই শীত পড়িতেছে, এই সহস্র সহস্র দুঃস্থ ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সেবাকল্পে আমরা সহৃদয় জনগণের নিকট অবিলম্বে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :—

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া। (২) কার্যাধ্যক্ষ উদ্বোধন-কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। (৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
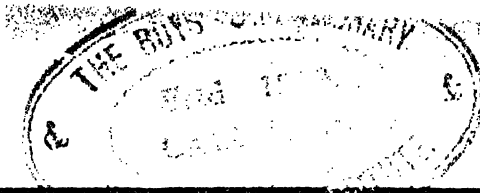
অস্পৃশ্যতা ও জাতীয়তা

সম্পাদক

হিন্দুগণকে উন্নত ও শক্তিমান জাতিতে পরিণত হইতে হইলে তাহাদের পক্ষে কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনই পর্যাপ্ত নহে, পরন্তু তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত আবশ্যক। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে সম-স্বার্থে সংঘবদ্ধ করিয়া জাতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে স্বাধীনতার সম্প্রসারণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সংরক্ষণ সম্ভব হইবে না। বিশ্বময় জাতিতে জাতিতে দুই প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যুগে হিন্দুজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যদি সকল হিন্দুকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া স্বগৃহে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনও ব্যর্থ হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতি ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি প্রভৃতিতে পৃথিবীর সকল জাতিকে অতিক্রম করা সত্ত্বেও স্বগৃহে সাম্য ও সংহতি-স্থাপনের ঐকান্তিক অভাবে অহিন্দু জাতিসমূহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপনাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে হিন্দুদের তুলনায় অহিন্দু জাতিসমূহ ঐ সকল বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়াও স্বগৃহে সাম্য ও সংঘবদ্ধতার জন্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতেছে। হিন্দুরা অহিন্দু জাতিদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন সম্পদ প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াও সংঘ-শক্তির অভাবে তাহাদের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সকল ক্ষেত্রেই পরাজিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের বহুকালপোষিত অস্পৃশ্যতা অনা-চরণীয়তা অদর্শনীয়তা এবং তৎপ্রসূত পারস্পরিক ভেদ বিরোধ ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতিই ইহার একমাত্র কারণ। এই অনর্থগুলির জন্যই স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে তুমুল গৃহবিবাদ চলিয়াছে,—প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু অহিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতেছে,—একজন অহিন্দুকেও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমাজে সম্মানিত স্থান দিতে পারিতেছে না,—স্বগৃহে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বার্থরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না,—ক্রমেই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া ধ্বংসমুখে প্রধাবিত হইতেছে। এই আত্মঘাতী অনর্থসমূহ হিন্দু-জাতিকে এতকাল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে কম সাহায্য করে নাই। স্বাধীন হিন্দুজাতিকে এইগুলি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সংঘবদ্ধ জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত

হইতেই হইবে; অন্যথা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে না।

হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা ও তৎসঞ্জাত অনৈক্য বিরোধ বিদ্বেষ অবিশ্বাস সন্দেহ প্রভৃতি আছে বলিয়াই হিন্দুজাতির মধ্যে জাতীয়তা-বোধ নাই এবং থাকাও সম্ভব নহে। কারণ, জাতীয়তা ও অস্পৃশ্যতা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সমকালে একস্থানে থাকিতে পারে না। সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, হিন্দুরা সামাজিক ভেদ-বৈষম্য দ্বারা বর্তমানেও অসংখ্য বিসদৃশ ও বিবদমান ভাগে বিভক্ত। হিন্দুসমাজে আচরণীয় অনাচরণীয় অস্পৃশ্য ও অদর্শনীয় প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাতীত উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। এই শ্রেণী-সমূহের মধ্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে সিঁড়ির ধাপের ন্যায় নিম্ন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে নানাভাবে অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ মানব-সমাজে সর্বত্রই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত ও ভেদ-বৈষম্য অল্পাধিক পরিমাণে সকল কালেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই অনর্থসমূহ যেরূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়া তাহাদের জাতীয় সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এরূপ আর কোন সুসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এই গুলি হিন্দুর জাতীয় জীবনকে যথার্থই পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই অনর্থরাশির জন্য হিন্দুদের এক বর্ণ বা শ্রেণীর সঙ্গে অপর বর্ণ বা শ্রেণীর সামাজিক ঐক্য নাই এবং সহযোগিতা নাই। তাহারা পরস্পরের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ বোধ করে না। এই সকল কারণে তাহারা দেশের সার্বজনীন জাতীয় স্বার্থকে তাহাদের বর্ণগত বা শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না। বর্তমানেও উচ্চশ্রেণী-মাত্রই দৈনন্দিন সামাজিক ব্যবহারে নিম্নশ্রেণীগুলির প্রতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হীনভাব প্রকাশ করেন। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য প্যারিয়ার পার্থক্যের তুলনায় ইংরাজের সঙ্গে ভারতীয়ের প্রভেদও যে অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি অনিষ্টকর নয়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। এইজন্য হিন্দুসমাজের এই সর্ববিধ্বংসী ভেদ বৈষম্য ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি দূর করিয়া হিন্দুজাতির মধ্যে জাতীয়তা স্থাপন করিতে হইলে যাহাতে উচ্চ-বর্ণের ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য জাতিসমূহের সম্বন্ধ সাম্য-মৈত্রীমূলক হয়, এরূপ ভাবে সর্বাগ্রে হিন্দুসমাজ সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমবায়ে স্বাধীন গণ-তান্ত্রিক (Democratic) বা সমাজ-তান্ত্রিক (Socialist) রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে জনগণের বা সর্বসাধারণের (Demos) সকল বিষয়ে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করা অপরিহার্য। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সকল বিষয়ে সমান অধিকার স্থাপিত না হইলে উভয়ের সমবায়ে জাতীয়তা স্থাপন অসম্ভব। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যদি হিন্দুজাতি তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিতে না পারে তাহা হইলে স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

হিন্দুমাত্রেরই জানা উচিত যে, হিন্দুসমাজের ভেদ বিরোধ ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি মহা অনর্থের উদ্ভবক্ষেত্র অস্পৃশ্যতা যে পরিমাণে বিদূরিত হইবে, সেই পরিমাণে হিন্দুজাতির মধ্যে ঐক্যশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া প্রকৃত জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে এবং হিন্দু-ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহও যথার্থ স্বাধীন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক আকার ধারণ করিবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দ্বারও উন্মুক্ত হইবে। অনেকে মনে করেন যে,

স্বাধীন ভারতে সকল বিষয়ে সকল নরনারীর সমান অধিকারমূলক গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই উহার প্রভাবে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা ও ভেদ-বিরোধ প্রভৃতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তর ব্যাধিরূপ অস্পৃশ্যতার প্রকোপ কতকটা হ্রাস পাইলেও উহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, প্রায় দুই শত বৎসর যাবৎ ভারতে ইংরেজ রাজত্বকালে অনেকটা গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইহার চাপে হিন্দুসমাজের এই দুরন্ত ব্যাধি কতকটা প্রশমিত থাকিলেও ইহা একেবারে দূর হয় নাই। কাজেই হিন্দুসমাজ-শরীরের এই আভ্যন্তর ব্যাধি সম্পূর্ণ দূর করিতে হইলে আভ্যন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কেবল স্বাধীন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থারূপ বাহ্য সাম্যের প্রলেপে হিন্দুসমাজ-শরীরের অস্পৃশ্যতারূপ দুরারোগ্য আভ্যন্তর ব্যাধি কখনও একেবারে দূর হইবে না। এজন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া উহাকে সাম্য-মৈত্রী ও সমান অধিকারমূলক গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান করা একান্ত আবশ্যক।

ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সমাজভুক্ত অধিকাংশ নরনারীর মানসিক ভাবের পরিবর্তন সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। হিন্দুরা তাহাদের ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অস্পৃশ্যতার অনিষ্টকারিতা যতই মনে-প্রাণে অনুভব করিবে, ততই প্রয়োজনের তাগিদে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর জোর করিয়া অস্পৃশ্যতারূপ সাংঘাতিক অপমান ও অসম্মানজনক সামাজিক দাসত্ব-প্রথা চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই। এই ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা যে একেবারে অচল, এ সম্বন্ধে সকল হিন্দুকে বিশেষভাবে অবহিত করাই এই মারাত্মক ব্যাধি দূর করিয়া তাহাদিগের মধ্যে সংঘবদ্ধ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পন্থা।

পরিতাপের বিষয় যে আমরা শিক্ষিত হিন্দুগণ স্বাধীনতা এবং জাতীয়তায় অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়াও ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার পথের প্রবল বাধাস্বরূপ অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আমাদের যাহা করা উচিত তাহা এতদিন আমরা করি নাই এবং এখনও করিতেছি না। আমরা পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের নিকট সকল বিষয়ে সমান অধিকার দাবি করি, কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী স্বধর্মাবলম্বী অস্পৃশ্যগণকে ঐরূপ অধিকার এ পর্যন্ত দেই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিমান জাতিসমূহ দুর্বল জাতিসমূহের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা উহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করি, কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণী যে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের উপর বহুকাল হইতে অত্যাচারের অভিযান চালাইতেছেন, ইহা বন্ধ করিবার জন্য এতদিন আমরা কি করিয়াছি? আমরা নেটাল ট্রান্সভাল কেপকলোনি ফিজি অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গ জাতির দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে চীৎকার করি, কিন্তু আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর অপমান ও অসম্মান-জনক আচরণের বিরুদ্ধে আমরা বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করি না। আমরা বিদেশী ইংরাজের নিকট দাবি করিয়া যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, এই স্বাধীনতা আমাদের স্বদেশবাসী অস্পৃশ্যগণকে দান করা আমাদের পক্ষে ন্যায়তঃ বাধ্যতামূলক হইলেও আমরা এখনও কি তাহাদিগকে ইহা অর্পণ করিতে প্রস্তুত? স্বাধীনতা ঘোষণার পরও অস্পৃশ্যতা পূর্বের ন্যায়ই সর্বত্র চলিতেছে। স্বাধীনতালাভ করিবার পর এখনও পল্লীগ্রামসমূহের অধিকাংশ

হিন্দুই প্রচলিত অস্পৃশ্যতার বিধানগুলি আঁকড়াইয়া আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দুমাত্রই ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের দিক দিয়া মৌখিক অস্পৃশ্যতা না মানিলেও তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার চাপে কার্যতঃ ইহা এখনও মানিয়া চলিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বিদেশী ও বিধর্মীর নিকট হইতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে স্বাধীনতা পাইয়াছেন, উহা স্বদেশী ও স্বধর্মী নিম্নশ্রেণীকে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন! এরূপ ব্যবহার যে চরম স্বার্থাভিসন্ধির পরিচায়ক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উচ্চশ্রেণী যদি দেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন এবং উহা সংরক্ষণ করিতে যথার্থ আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর সকল নরনারীর সঙ্গে পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের সমান সুযোগ পায়—কোন শ্রেণী কোন বিষয়ে অসুবিধা ভোগ না করে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি তাঁহারা একদিকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং অপর দিকে দেশের জনগণকে নিম্ন ও অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার করিতে থাকেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের পক্ষে চরম ভণ্ডামী হইবে। দুঃখের বিষয় উচ্চশ্রেণীর অনেকের ব্যবহারে বহুক্ষেত্রে এইরূপ ভণ্ডামী প্রকাশ পাইতেছে।

এই সকল কারণে উচ্চশ্রেণীর প্রতি নিম্নশ্রেণীর অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হইতেছে। ইতোমধ্যেই তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রতিহিংসা-বশে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া হিন্দুজাতির গৃহবিবাদ ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের কার্য-কলাপ স্বাধীন ভারতের জাতীয় উন্নতির পথে প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও দেখা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ সামর্থ্যসত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকল হিন্দুর সমবায়ে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে এই সকল মহা অনর্থ বিদূরিত হইবে না।

নিম্নবর্ণের অনুন্নত অস্পৃশ্য জাতিসমূহের মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ভিন্ন প্রায় সকলেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আচার-নিয়ম ও নীতি প্রভৃতিতে এখনও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি জাতির বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ এই নিম্নবর্ণের জনসাধারণকে লইয়াই দেশ, তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড—জাতির প্রাণশক্তি; তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি—জাতির অভ্যুদয়। তাহারা সকল বিষয়ে নিম্নে পড়িয়া আছে বলিয়াই সমগ্র দেশ ও জাতির উত্থানও সম্ভব হইতেছে না। এজন্য উচ্চবর্ণই অনেকটা দায়ী। কারণ, স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা দেশের নিম্নশ্রেণীসমূহকে ধর্ম বিদ্যা সংস্কৃতি প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন,—এমন কি তাহাদিগকে ইচ্ছামত সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবার সুযোগও দেন নাই। ইহারই ফলে তাহারা অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছে। ইংরাজ-আমলে উচ্চবর্ণের ন্যায় নিম্নবর্ণও শিক্ষালাভ ধর্মসাধন রাজকার্য যাতায়াত এবং স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন প্রভৃতিতে সমান অধিকার পাইয়াছে বটে কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। ওদিকে উচ্চবর্ণের সকল নরনারী শিক্ষা ও

আর্থিক অবস্থায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। ইহাতে উভয় শ্রেণীর মধ্যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। এই পার্থক্য বিদূরিত না হইলে উভয় শ্রেণীর সমবায়ে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্নবর্ণের জাতিগুলির নিজেদের দোষও কম নহে। তাহাদের উন্নতিলাভের আগ্রহ নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, অপমান-অসম্মানে বেদনা-বোধ নাই। তাহারা স্বগৃহে অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতা এবং উহা হইতে উদ্ভূত অনৈক্য ভেদ বিরোধ ঈর্ষা সন্দেহ প্রভৃতিতে জর্জরিত। এই সকল বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, স্বাধীনতাস্পৃহা, শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতি প্রভৃতিতে নিম্নশ্রেণীর নরনারীকে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ করিতে হইবে। ইহারই নাম দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি, দেশমাতৃকার সেবা, জাতির সেবা এবং ইহাই সকল হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার একমাত্র উপায়। আশা করি, হিন্দুজাতি স্বাধীনতা লাভের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়া এই উপায় অবলম্বনে অস্পৃশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবে।

জাতীয় পতাকা

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্রী-জ্যোতির্ব্বিনোদ

প্রণমি আজিকে জাতীয় পতাকা,
প্রণমি তোমায় মোরা নবীন।
স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আলোকে
স্বাধীন বাতাসে মোরা স্বাধীন।
ক্ষুদ্র আমরা—ভক্ত আমরা—দৃপ্ত আমরা—
আমরা বীর,
জানালে জগতে অহিংস মন্ত্রে,
কি ভাবে জিনিল ভারতবীর।
নির্দ্দেশ তব শিরেতে বহিয়া
কাটায়েছি কত দুঃখ-দিন।

গৈরিক তব 'ত্যাগ ও সাহস',
শুভ্রেতে শোভে 'সত্য সাম্যরস',
'শৌর্য্য-নিষ্ঠা' তব সবুজেতে রাজে,
'প্রগতি' চক্রে হেরি নিশিদিন।
পূজিবার কিছু নাহি উপচার,
আছে প্রীতি-প্রেম অনন্ত আশার,
রাতুল চরণে ঢালিয়া অর্ঘ্য
"জয়হিন্দ" ব'লে গাহি এদিন
প্রণমি আজিকে জাতীয় পতাকা,
প্রণমি তোমায় মোরা নবীন।

শ্রীবুদ্ধ

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

বুদ্ধ তুমি মুক্ত মহান্—চিন্তাপারের অবন্ধনে,
অবিশ্বাসের লক্ষ ফণী নম্রফণা যার চরণে।
যুগে যুগে শৈল কত
লুপ্ত হ'ল কাল-আহত,
তোমার মরমূর্ত্তিখানি রয় জেগে অবিস্মরণে,
পুণ্য নামে শঙ্খ বাজে শঙ্কাবেসুর কাঁটাবনে।
ভক্তিহারা দুঃখভরা মিথ্যামলিন এই জগতে
কান্তি তোমার ভ্রান্তি নাশে, শান্তি আনে
শুভ্রব্রতে।

তনুর কারায় হে অতনু
রাঙলে আকাশ-ইন্দ্রধনু
বিয়োগ কালোয় অশোক আলো, পলের
বুকে চিরন্তনে।
সীমার নিশায় অসীম উষা—অমর রবি
হৃদ্‌গগনে॥

কোরানে উপবাসের তাৎপর্য্য

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কোরানেও উপবাস, 'রোজা' (রূজহ্) বা 'স্বৌম্'-এর নির্দ্দেশ রহিয়াছে;' এবং উপবাস সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "হে (ভগবৎ-অস্তিত্বে) বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায় তোমাদের জন্যও উপবাস (অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট হইল, যাহাতে তোমরা (পবিত্রতা ও) আত্ম-সংযম (শিক্ষা লাভ)- করিতে পার (ল'অল্লকুম্ তত্তকৌন্)।—(ইহা) নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য (স্থিরীকৃত হইল); তবে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অসুস্থ হয়, অথবা ভ্রমণপথে থাকে, তাহা হইলে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের (উপবাস) পরবর্ত্তী কোন সময়ে (পালন করিতে পার)। আর (উপবাসে অক্ষম) ব্যক্তি (উপবাসের) বিনিময়ে একজন দরিদ্রকে অবশ্য ভোজন করাইবে,—ইহার উপরেও যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছামত দান ধর্ম্মাদি করিবে, তাহা অধিকতর ভাল। কিন্তু তোমরা যদি উপবাস রক্ষা করিতে পার, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—তোমরা যদি (ইহার তাৎপর্য্য) জানিতে পারিতে (ব অন্ তস্বৌ মুরা খয়রুন্ লকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ত'লমৌন)! উপবাসপালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট) রম্‌জান্-মাসেই কোরানের (ঐশ্বরিক বাণী সর্ব্বপ্রথম) পথপ্রদর্শকরূপে মানবসমীপে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং ইহাতে (কোরানে) (সদসৎ-) বিচার ও জ্ঞানলাভের পন্থাদি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং যাহারা (স্বগৃহে) এই মাসে উপস্থিত থাকে, তাহাদের উপবাস পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অসুস্থ হয়, অথবা ভ্রমণপথে থাকে, তাহা হইলে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের (উপবাস) পরবর্ত্তী

কোন সময়ে (পালন করিতে পারে)। (বস্তুতঃ) ভগবান তোমাদের সকল (বিষয়) সহজ করিয়া দিতে চাহেন, এবং তোমাদের বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি চাহেন যে তোমরা এই নির্দ্দিষ্ট সময় (উপবাস করিয়া) পূরণ কর, এবং তাঁহার পথপ্রদর্শন হেতু তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর, যাহাতে তোমরা তাঁহার (প্রতি) কৃতজ্ঞ হইতে পার।" (২ ; ১৮৩-১৮৫)

যেমন-'উপ-বাস'-এর প্রকৃত অর্থ নিকটে বাস অর্থাৎ ভগবৎসমীপে থাকিয়া কেবল তাঁহার চিন্তায় কালযাপন করা ; সেইরূপ 'রোজা' বা 'স্বোম্'-এর তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইব যে কোরানের উপবাসও পবিত্র জীবন লাভ করার উদ্দেশ্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'স্বোম্'-এর শব্দগত অর্থ পানাহার প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা ; এবং যিনি ভগবদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় এই সকল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত থাকিয়া ভগবৎ-চিন্তায় কাল যাপন করিতে পারেন, তিনি সত্যই মহান। উপবাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 'যাহাতে তোমরা পবিত্রতা ও সংযম শিক্ষা লাভ করিতে পার'। 'তত্তকৌন্' এর শব্দগত অর্থ 'অসৎ কার্য্যাবলী হইতে (নিজকে) রক্ষা করা' ; এবং যিনি অসৎ কার্য্যাবলী হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন বা আত্মসংযম লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ মুত্তকী হইয়াছেন, তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল 'মুত্তকী' হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নতি লাভ। কোরানে মুত্তকীর অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে,—'বস্তুতঃ ভগবান সত্যবাদী ও আত্ম-সংযমীদের পরম সুহৃদ (ব আল্লাহু বলিয়ু অল্ মুত্তকিয়ন'-৪৫ ; ১৯) ; 'সত্যবাদী ও আত্ম-সংযমীই পরম জীবন লাভ করিবে (অল্-'আক্বিবতু লিল্ মুত্তকিয়ন'-৭ ; ১২৮) ; অথবা, 'সত্যবাদী ও আত্মসংযমীদের জন্যই পুরস্কার-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বাসস্থান সংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে বিরাজ করিবার জন্য স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ সকল সময়ই উন্মুক্ত থাকিবে (ইন্ন লিল্ মুত্তকিয়ন লঃহুস্ন মাবিন্—জন্নাতি 'অদ্নিন্ মুফত্তঃহতন্ লহুম অল্-অবুআবু'-৩৮ ; ৪৯-৫০)।

কোরানের উপবাস ও প্রার্থনা যে বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপবাস পালনের নির্দ্দেশের পরবর্ত্তী শ্লোকেই (অর্থাৎ ১৮৬ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়, "(হে পয়গম্বর,) যখন আমার (ভগবান) ভক্তগণ তোমাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করে, (তখন তাহাদিগকে বল যে) আমি (তাহাদের) নিকটেই আছি,—আমি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর আমার উদ্দেশ্যে সকল প্রার্থনাই শুনিয়া থাকি ; তাহাদেরও উচিত যে স্বেচ্ছায় (উপবাস দ্বারা) আমার আদেশ পালন করে ও আমার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে,—এইরূপ করিলেই তাহারা সৎপথে অগ্রগতি লাভ করিবে।" কোরানের মতে উপবাসের সাহায্যে সংযম শিক্ষা লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক পথে সুষ্ঠু বিচরণ করা যায়। যাঁহারা আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ করেন তাঁহাদের কোরানে 'সা'ইঃহ্' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'সা'ইঃহ্'র অন্য অর্থ 'যিনি পানাহার ও অন্যান্য সকলপ্রকার অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন'। কোরানে (৯ ; ১১২) বিশ্বাসী ও প্রকৃত ভক্তদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, "যাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার (ভগবানের) প্রতি আকৃষ্ট—তাঁহার প্রশংসাবর্ণনাকারী, ভগবৎপথের পথিক (অস্-সা'ইঃহূন) ও প্রার্থনার সাহায্যে তাঁহার নিকট নত স্বীকার করিয়াছে ; (সর্ব্বদা) ন্যায় কাজে লিপ্ত, ও অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত, এবং ভগবানের

বিধি-নিষেধ (সর্ব্বদা) মান্য করিয়া চলে—(এইরূপ) বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দাও (যে তাহারাই প্রকৃত ভগবৎ-প্রাণ)"।

কোরানের উপবাস 'রম্জান্‌মাসে নির্দ্দিষ্ট করিবার কারণ, এইমাসেই পয়গম্বর্ হজ্‌রৎ মহম্মদ্ হীরা পর্ব্বতে নির্জ্জনে ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ কালে সর্ব্বপ্রথম ভগবৎ-জ্যোতির দর্শনলাভ করেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐশ্বরিক বাণীসকল ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এই রম্জানমাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গেই কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে, 'যখন আমার ভক্তগণ তোমাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহাদের বল যে আমি তাহাদের নিকটেই আছি।' এই ভগবৎ-নৈকট্য উপলব্ধি করার প্রকৃষ্ট উপায় আত্মসংযমের সাহায্যে ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করা। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে পয়গম্বর্ রম্জান্-মাসের তহজ্জুদ্ এর নামাজ্ বা প্রার্থনার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন; এবং হদীস-(পয়গম্বরের কিংবদন্তী) এ উল্লিখিত হইয়াছে যে মহম্মদ তাঁহার শিষ্যদের রম্জানমাসে সারারাত্র জাগ্রত থাকিয়া ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন (অল্-বুখারী, ২ ; ২৭)।

রম্জান্‌মাসের শেষ দশটি রাত্রি মুসলমানদের নিকট বিশেষ পবিত্র এবং ইহাদের কোন এক রাত্রেই পবিত্র কোরানের ভগবদ্-বাণী সর্ব্বপ্রথম পয়গম্বরের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই শুভ রাত্রিকে বলা হয় 'লয়লৎ-অল্-কদর্'। 'লয়লৎ-অল্-কদর্' সম্বন্ধে কোরানে (৯৭ অধ্যায়ে) উল্লিখিত হইয়াছে, "বস্তুতঃ আমরা (ভগবান) ইহা (ভগবৎ-বাণী) লয়লৎ-অল্-কদর, অর্থাৎ শব্-ই-কদর্ বা মহিমান্বিত রাত্রিতেই (সর্ব্বপ্রথম) ব্যক্ত করিয়াছিলাম। এবং তোমরা কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ এই মহিমান্বিত রাত্রি কি বস্তু?—ইহা (গুণগ্রামে) সহস্র মাস হইতে উৎকৃষ্ট। এই (শুভ-রাত্রেই) ভগবৎ-ইচ্ছায় তাঁহার প্রত্যাদেশসমূহ (প্রকাশ করিবার জন্য) শুদ্ধাত্মা ও দেবদূতগণ অবতীর্ণ হন। এই (পরম) শান্তির সময়, ভোরের আলো প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (বিদ্যমান থাকে)।"

এই পবিত্র রাত্রিগুলি পবিত্রভাবে যাপন করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও ইসলামমতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মুসলমান সাধারণতঃ রম্জানমাসে, বিশেষ করিয়া ইহার শেষ দশরাত্রি সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া মস্‌জিদ্ বা প্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ স্থানে গমন করিয়া শুদ্ধভাবে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এই অবস্থাকে বলা হয় ইতিকাফ্।

কোরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপবাসপালনের অনেক বিধি-নিষেধ রহিয়াছে। তাহাতে বর্ণিত আছে "ভগবানের (নির্দ্দিষ্ট) বিধিনিষেধ কখনও লঙ্ঘন করিও না। এইরূপে ভগবান তাঁহার আদেশসমূহ লোকদের জন্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন—যাহাতে তাহারা আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারে।"

বস্তুতঃ কোরানের উপদেশসমূহ ভগবদুপলব্ধি করিবার পন্থাদি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে মাত্র। মানব তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর-ভেদে এই সকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলিবে,—যাহার যতটুকু শরীরে সহ্য হইবে, ও মন করিতে ইচ্ছুক হইবে, ততটুকুই করিবে। উল্লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি অসুস্থ, অথবা বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপবাস রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে; কারণ তখন উপবাস রক্ষা করিলে শরীরে তাহা সহ্য হইবে না, এবং মনও সেই অবস্থায় প্রকৃতিস্থ থাকে না বলিয়া ভগবৎচিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে না।

বস্তুতঃ শরীরকে কেবল কষ্ট দিলেই ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্ম মনের ব্যাপার। মনকে ভগবৎ-চিন্তায় নিবিষ্ট করিতে সাহায্য করিবার জন্যই উপবাস পালন করা। যদি উপবাস করিয়া মনে আনন্দই না পাওয়া যায়, বরং মনের চঞ্চলতা আরো বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উপবাস করিয়া কি লাভ? উপবাসের মূল উদ্দেশ্যই হইল আত্মসংযম। এই আত্মসংযম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। সেইজন্যই কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে, "ভগবান তোমাদের সকল বিষয় সহজ করিয়া দিতে চাহেন, এবং তোমাদের বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক নহেন (য়ুরীদু আল্লাহু বিকুমু অল্-য়ুস্‌র্ ব লা য়ুরীদু বিকুম অল্-'উস্‌র্)"।

হেরাক্লিটাসের মতবাদ

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

যেদিন পৃথিবীতে এল মানুষ সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই, ভোরের আকাশে কম্পমান রক্তের ফোয়ারা যখন দিক-দিগন্তে ছুটে বেড়ায়, তখন তার চেতনায় সাড়া দেয় অজানার আহ্বান। তার মুখে শুনি "হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমায় প্রণাম করি; তুমি বিরাট; তুমি সুন্দর; তোমার উন্মেষে বিশ্বে জ্যোতি ফিরে আসুক।" দুপুরের ধূ ধূ করা মাঠের প্রান্তে মর্ম্মরিত সুপারীর বীথি যখন হাহাকার করে কেঁদে উঠে, তখন বিধাতার রহস্যময় সৃষ্টির বৈচিত্র্য তার মনে আনে সহস্র জিজ্ঞাসা। সায়াহ্নের আকাশে প্রথম প্রেমের মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যাতারা যখন দেখা দেয়, তখন তার স্নিগ্ধ আলোর মাঝে মানুষ খুঁজে বেড়ায় উন্মুক্ত জীবনের অকৃপণ আনন্দ। পূর্ণিমার রূপালি ধারায় মানুষ অনুভব করতে চায় সেই সত্তাকে যা বিরাজ করে কৃত্রিম পরিবেশে শৃঙ্খলিত জীবনের বাইরে। নদীর কলোচ্ছ্বাসে সে শুনতে চায় সেই সুর যা মিশে আছে সমস্ত সৃষ্টির সাথে। বিশ্বের বিরাটত্ব যুগ যুগ ধরে তার চোখে একটা চরম বিস্ময় হয়ে রয়েছে। বহু প্রশ্ন তার মনে জেগেছে, কখনও কখনও তার চিন্তাজগৎ নৈরাশ্যের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আবার কখনও কুয়াশার মাঝে দেখা গিয়েছে আশার রক্তমাখা আলো। তবে অজানার পিছনে মানুষের অভিযান কোথাও আসেনি, সমস্ত বাধা ঠেলে এগিয়ে গেছে। তাই প্রাচীন গ্রীসের কৃষ্টির মাঝেও দেখা যায় অজানাকে জানবার একটা বিশেষ চেষ্টা। গ্রীক দার্শনিকগণ জানতে চাইলেন বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর আদিম ইতিহাস—কি করে পৃথিবী এল এবং কোন্ উপাদানে এই পৃথিবী তৈরী হয়েছে।

দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নেই এবং থাকতে পারে না যা চিরদিন অচল হয়ে থাকবে, প্রত্যেকটি পদার্থ চলিষ্ণু এবং বিশ্বসৃষ্টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে পৃথিবীর জিনিষগুলি একটি অন্যের মধ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্থায়িত্বের দাবী নিয়ে এই পৃথিবীতে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। যে নিয়ম অনুসারে পৃথিবী চলেছে তার ফলে প্রত্যেক জিনিষের মাঝেও একটা রীতি বিদ্যমান রয়েছে, অর্থাৎ এই জগতে প্রত্যেকটি জিনিষ যেমন আসে, তেমনি আবার চলে যায়। কোন জিনিষ চিরদিন কোথাও স্থির হয়ে থাকে না, কারণ এর গতির প্রবাহ কোথাও অবরুদ্ধ হলে চলে না। হেরাক্লিটাস প্রমাণ করতে চেয়েছেন জগতের মূল উপাদান হল গতি এবং এই উপাদানকে তিনি তেজ আখ্যা দিয়েছেন। তেজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটা একটা সোজা সরল পথে সব সময় চলাফেরা করে। তবে তেজকে একটা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। দ্বন্দ্বটি হল এই যে একটা অধোমুখী শক্তি এবং আর একটা ঊর্দ্ধমুখী শক্তি তেজকে দুইদিক থেকে আকর্ষণ করে। অধোমুখী শক্তির টানে তেজ জলে পরিবর্ত্তিত হয় এবং তারপর আবার ধীরে ধীরে ক্ষিতিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে ঊর্দ্ধমুখী শক্তির সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত হয় পৃথিবী। হেরাক্লিটাস বলেন, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয় গতি এবং সংঘর্ষই হল সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। যে নীতি জাগতিক প্রত্যেকটি জিনিষকে নিয়ন্ত্রিত কর্চ্ছে তাকে তিনি কখনও বলেছেন নিয়তি এবং প্রজ্ঞা, আবার কখনও বলেছেন ঈশ্বর।

শনি

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ, বি-এ

যেদিকে চায় নয়নমণি,
পাংশুটে হায় রূপের খনি—
কোন্ দানবে জাল্লো আগুন
চলার পথে লাগলো শনি।
আর ওঠে না প্রভাত রবি,
শীতল হাওয়া বয় না, কবি,
চাঁদ ওঠে না ফুল ফোটে না,
খা খা করে দগ্ধ 'গোবি'।
পথের ধারে ভূঁইচাপা ফুল,
'ভূঁয়াবাড়ী' শিউলি বকুল,
বাল্যকালের মাল্যগাঁথা
সে সব কথা সকলি ভুল!
শূন্য গোঠে নাইক ধেনু,
বৃন্দাবনে গায়না বেণু,
যমুনাজল হয় না উতল
লভি শ্যামের অঙ্গরেণু।
গোষ্ঠে রাখাল যায় না দলে,
গোপিনীরা জলের ছলে
যায় না ঘাটে, মাঠের বাটে
কোকিল নাহি গাছের তলে।
শূন্য বাথান খা খা করে,
নাইক অলি ফুলের পরে;
দীপ জ্বলে না, ধূপ গলে না
দেবতাহীন বন্ধ ঘরে।
পুকুরপাড়ি মামার বাড়ি
নাইক পদ্মফুলের সারি,
শানে শানে শেওলা পড়ি
ফাটল ধরে গেছে তারই।

পড়শী ডেকে কয় না কথা,
জিজ্ঞাসিবে কোন্ বারতা,
চৌদিকে যে আগুন জ্বলে,
রক্ত ঝরে, নাই মমতা।
ভা'য়ে ভা'য়ে পরস্পরে
পৃথক হয়ে বসত করে,
গায়ে গায়ে লাগলে ছোঁয়া
বিদ্যুতেরই আগুন ধরে।
বজ্র হ'তে অনল নিয়া
তক্ষকেরই গরল দিয়া
মিকশ্চারি যে তৈরী হোলো
কে নীলকণ্ঠ হবে পিয়া!
জীর্ণ জ্বরে রক্তহীনা
দেশের মাটি ভিক্ষা দীনা,
এ কালব্যাধি ঘুচবে কবে
বাজবে আবার ভগ্ন বীণা।
ঝড়ে বন্যায় গেছে মথে'
দলে' গেছে যমের রথে,
আর্ত্তনাদের উষ্ণ তাপে
ছাই জমেছে পথে পথে।

নাই বনিতা নাই কবিতা
ছন্দে গানে নাই ভণিতা,
মায়ের পানে মুখ ফিরালে
কি বেদনা! আজ গণি তা'।
পুত্রহীনা আর্ত্তনাদে,
স্বামীর তরে পত্নী কাঁদে,

সুধায় নারে পড়শী স্বজন—
কি কালো মেঘ ঢাকলো চাঁদে।
ভালোবাসার ভাঙলো বাসা,
ঘুন ধরেছে সর্ব্বনাশা,
অবিশ্বাসের বিষের বড়ি
কে খাওয়ালো—নাইরে আশা!
নষ্ট গৃহে ধুতুম পাখী
কয় কুভাষা কুডাক ডাকি ;
মায়ের গলার গজমোতি
কে হরিল জানিস তা কি!
কোন্ অভিশাপ পড়লো মাথে
বিষ দিলো তোর দুধের সাথে,
পাংশুটে দুই নয়ন হোলো,
নীলের রেখা পড়লো হাতে।
বংশ গেলো গেলো ভিটা,
নির্বংশরা শুনিস মিঠা,
ঘমঘুমুরে সোহাগ করি
পাঠ করিছ যমের চিঠা।
অন্ধকারের ঘনাঘনি,
হস্তে ছুরি গলায় ফণী,
অগ্নিমাথায় রক্তমুখে
অবতীর্ণ নূতন শনি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মহাপ্রয়াণ*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১৯৩৪ সালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড়মঠের ট্রাষ্টি এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে তাঁহার মহাপ্রয়াণের ঠিক এক বৎসর পূর্বে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৩৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলুড় মঠে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে। তখন তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত তাঁহার মহাপ্রয়াণ আগতপ্রায়। তিনি তখন হইতে শ্রীগুরুর পরমপদে মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৬ই জানুয়ারী রবিবার বেলুড়-মঠ হইতে রওনা হইয়া যখন হাওড়া ষ্টেশনে যান তখন তিনি দিল্লী মেলের কামরাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, 'আর আস্‌ছি না।' মঠের সমাগত সাধুগণ তাঁহাকে উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, 'রামায়ণ লিখছি কিনা। তাই লঙ্কাকাণ্ড শেষ না হ'লে আর আসছি না।' পরদিবস নিরাপদে তিনি এলাহাবাদে পৌছিলেন।

সংঘের কার্যানুরোধে সেবককে সঙ্গে লইয়া প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মহারাজ সেবাশ্রমের মোটর গাড়ীতে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই কাশীতে উপস্থিত হন। মহারাজ পরদিন সেবাশ্রমের বৃদ্ধ-মহিলা বিভাগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনে ও উপস্থিতিতে সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সমারোহে সম্পন্ন হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল বেলা ১০॥টার মধ্যে তিনি কাশী সেবাশ্রমের মোটর গাড়ীতে

* লেখকের 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-চরিত' নামক প্রকাশমান পুস্তকের একটী অধ্যায়।

এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার তিনি শৈলেন মহারাজ এবং প্রিয় ভৃত্য বেণীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা মেলে শেষবার বেলুড়মঠে আগমন করেন। এবার তিনি মাত্র সপ্তাহখানেক থাকিয়া ৮ই মার্চ মঙ্গলবার দিল্লীমেলে এলাহাবাদ ফিরিয়া যান। আর তিনি বেলুড়মঠে আসেন নাই বা অন্য কোথাও যান নাই। এবারে এলাহাবাদে যাইয়াই তাঁহার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। দিনে যে সামান্য আহার ছিল তাহা বন্ধপ্রায় হইল। প্রাতে বেণীকে রন্ধন করিতে বলিতেন; কিন্তু আহারে বসিয়া কিছুই খাইতে পারিতেন না। কলিকাতার বিশিষ্ট ভক্তকে লিখিয়া কয়েক বোতল মিনারেল ওয়াটার রেলওয়ে পার্শেলে আনান হইল। উক্ত জল এবং এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে যে উৎকৃষ্ট সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় তাহাই সমস্ত দিন তিনি বার বার পান করিতেন; অন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার কাছে বাহিরের কোন লোক যেন না আসে এইরূপ আদেশ দিয়া লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং তিনি এই ভাবে দিন কাটাইতেছেন দেখিয়া সেবকগণ শঙ্কিত হইয়া কাশী সেবাশ্রমে এবং বেলুড়মঠে সংবাদ পাঠাইলেন।

২রা এপ্রিল শনিবার তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হন। মঠের সাধুগণ এবং অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। মহারাজ কাহারো সেবা লইতেন না; এমন কি অশক্ত বা অসুস্থ হইয়াও। দেহজ্ঞানরাহিত্যের ফলে তিনি কায়িক ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। এলাহাবাদের অসহ্য শীত বা গ্রীষ্ম এই দ্বন্দ্বাতীত মহাপুরুষকে অতিষ্ঠ করিতে পারিত না। অন্তিম শয্যায়ও তিনি ধীরস্থিরভাবে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিলেন এবং কাহারো সেবা গ্রহণ করিলেন না। শেষ সময়েও তিনি কোন প্রকার চিকিৎসা করাইতে সম্মত ছিলেন না। জীবনে তিনি ঔষধসেবন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার কবিরাজকে তিনি এড়াইয়া চলিতেন এবং বলিতেন, 'এরা যমের agent (দূত)!' জীবনের শেষ কয়েক দিন সেবক ও শিষ্যগণের একান্ত অনুরোধে সামান্যমাত্র ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। মহারাজকে চিকিৎসা করিতে রাজী করিবার জন্য কাশী হইতে কয়েকজন সাধু ও ভক্ত এবং চিকিৎসার্থ কলিকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ মজুমদার আসিলেন। জিতেনবাবু তখন কাশীবাস করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কাশী শিবালয়স্থ শাখা সেবাশ্রমের হোমিওপ্যাথ ডাঃ বাগচীও আসেন। মহারাজের পা দুটি বেশ ফুলিয়া গিয়াছিল। ডাঃ মজুমদার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বেরিবেরি অসুখ হইয়াছে বলিলেন এবং লাইকোপোডিয়াম (২০০ শক্তি) একমাত্রা খাইতে দিলেন। মহারাজের অবস্থার দৈনন্দিন সংবাদ কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন।

এই প্রকার চিকিৎসাদি সত্ত্বেও মহারাজের অসুখের আদৌ উপশম হইল না। তাঁহার আহারাদি একেবারে বন্ধ হইল। সেবকগণ ভয় পাইলেন, পাছে তিনি এই ভাবেই শরীর ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহাদেরও আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাশীতে স্বামী সত্যাত্মানন্দকে পাঠাইলেন তথায় প্রাচীন সাধুদের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য। স্বামী শর্বানন্দ তখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণান্তে কাশীতে বিশ্রাম করিতে-

ছিলেন। শৈলেন মহারাজ কাশী আসিয়া স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ এবং স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে বিজ্ঞান মহারাজের অসুখের কথা সব বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে এলাহাবাদ যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এদিকে বিজ্ঞান মহারাজ বেলুড়মঠে স্বামী দিব্যাত্মানন্দকে তার করিলেন, 'এখানে শীঘ্র এসো'। দিব্যাত্মানন্দজী ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ২॥টার সময় তার পাইয়া পরদিবস এলাহাবাদ মঠে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যখন শেষবার বেলুড়মঠে ছিলেন তখন শ্রীনাথ মহারাজের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে পরে এলাহাবাদ মঠে লইয়া যাইব।' শ্রীনাথ মহারাজ এলাহাবাদ যাইয়া দেখেন মঠবাড়ীর ভিতরের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হইয়া একটি কালো চেয়ারে তিনি বসিয়া আছেন। বামদিকে রাত্রিতে শুইবার খাট ও সম্মুখে একটী টেবিল। টেবিলের উপর একটি থলে, একটি ফাউণ্টেন পেন ও একটি ওয়াচ্। টেবিলের ধারে জলের ৪টী কুঁজো। কুঁজোগুলিতে ঠাণ্ডা জল থাকে। ঐ জল মহারাজ মাঝে মাঝে একটু পান করেন। বারান্দার পার্শ্বেই ঠাকুর ঘর এবং ডানদিকে উঠান। উঠানে একটি খাট। যে রাত্রে খুব গরম পড়ে সেই রাত্রে ঐ খাটে তিনি শয়ন করেন। তাঁহার গায়ের রঙ খুবই মলিন দেখাইতেছিল এবং তিনি অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়া থাকিতেন। তখন গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও গরম। তাই তিনি একটী ভিজা গামছা মাথায় দিয়া বসিয়া ছিলেন। নিকটেই আর একটী গামছা ভিজান ছিল। মাথার গামছাটী শুকাইয়া আসিলে দ্বিতীয়টী আবার মাথায় দেন। গামছাগুলির জল মাথায়ই শুকায়। এইভাবে তিনি গরমকাল কাটান। শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ; গলার ও গালের হাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। পেটটী বড় হইয়াছিল। দেখিয়া মনে হইত যেন ছয়মাসের রোগী। কথা বলিতেছিলেন অতি কষ্টে সরু কণ্ঠে। গায়ে একটি সাদা কোট, দেহের নিম্নদেশ একটী গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা মাত্র। চলিবার শক্তি ছিল না। একমাস পূর্বে বেলুড়মঠে তাঁহার শরীর যেমন ছিল তদপেক্ষা অনেক জীর্ণ ও ভগ্ন। তাঁহাকে হঠাৎ দেখিলে চেনা যাইত না। শ্রীনাথ মহারাজ প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, 'ও! খুব এসেছ ত'? একটু পরে বলিলেন, 'তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হ'বে না। কখনও দরকার হ'লে একটু ব্যাঙ্কে যেতে হ'বে। যাও, স্নান করে আহারাদি কর ও বিশ্রাম কর। ঐ বাড়ীতে গিয়ে থাক।' ঐ বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিবার জন্য বেণীকে আদেশ দিলেন। দিব্যাত্মানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার খাওয়া হয়েছে?' তদুত্তরে মহারাজ বলিলেন, 'খাওয়া দাওয়া কি আর আছে? (বেলুড়) মঠ হ'তে এসে এযাবৎ মাত্র একদিন ভাত খেয়েছি। কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না; আর ভালও লাগে না। তবে তুমি এসেছ, এবারে খাওয়া যাবে। একটু শুক্তোর ঝোল খেতে ইচ্ছে হয়।' দিব্যাত্মানন্দজী বলিলেন, 'বেশত, তাই করা যাবে।' তারপর তিনি ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। একা চলিবার, উঠিবার বা বসিবার শক্তি ছিল না। বেণী তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ার হইতে উঠাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইত এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিত। খাবার সময়ও মাথায় ভিজা গামছা ও গায়ে সাদা কোট। শরীরে মাংস ছিল না বলিলেই হয়, কেবল চামড়া ঝুলিতেছিল। হাঁটু হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সব ফোলা। মহারাজ যখন বিশ্রাম করিতেন বেণী তখন তাঁহাকে হাওয়া করিত। কোন দরকার পড়িলেই বেণীকে তিনি ডাকিতেন। বেণীও মহারাজের আদেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত ছিল। বিশ্রামান্তে দিব্যাত্মানন্দজী বেলা সাড়ে তিনটার সময় মঠ বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, মহারাজ

তখনও ঘরের ভিতর শুইয়া আছেন এবং বেণী তাঁহাকে হাওয়া করিতেছে। একটু পরেই তিনি বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। মাথায় ভিজা গামছা, গায়ে সাদা কোট; তিনি চেয়ারে বসিলে বেণী একটী গেরুয়া কাপড় তাঁহার কোমরে জড়াইয়া দিল। দিব্যাত্মানন্দজীকে দেখিয়াই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্দিরের কাজ তো হয়ে গেছে?' দিব্যাত্মানন্দজী বলিলেন, 'হাঁ মহারাজ, শেষ হয়েছে।" মহারাজ বলিলেন, 'ঠাকুরও মন্দিরে তো বসেছেন?" দিব্যাত্মানন্দজী বললেন, হাঁ, আপনিই ত ঠাকুরকে বসিয়ে এলেন'। তখন তিনি বলিলেন 'ব্যস।' এই শব্দ উচ্চারণের সংগে সংগেই তাঁহার মুখের ভাব অন্যরূপ হইল। তিনি যেন এক বিরাট দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এই ভাব প্রকাশিত হইল। সেদিন হইতে মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত মন্দির সম্বন্ধে আর কোন কথাই তোলেন নাই। এলাহাবাদ মঠের পিয়ন বড় মিঞা সেদিন যে চাঁদা আদায় করিয়াছিল তাহা খাতায় জমা করিলেন। সন্ধ্যার পরে তিনি বারান্দার খাটটীতে শুইয়া পড়িলেন, কিছুই আহার করিলেন না। বেণীকে ঠাকুর ঘর বন্ধ করিতে বলিয়া বলিলেন, 'ও মহারাজকো খানা উন্‌কো কোঠরীপর দে দেও। আউর কেওয়াড়ী বন্ধ করকে চলে জাও।' তাঁহারা উভয়ে মহারাজের নির্দেশমত দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে মঠবাড়ী হইতে তাঁহার মুখনিঃসৃত 'মা' 'মা' শব্দ শোনা যাইতেছিল। পরদিন প্রাতে তিনি বেণীকে ডাকিলেন। বেণী তৎক্ষণাৎ গেল। বেলা সাতটার সময় দিব্যাত্মানন্দজী যাইয়া দেখিলেন, মহারাজ পূর্ববৎ চেয়ারে বসিয়া আছেন। দিব্যাত্মানন্দজীকে তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরঘর খুলিয়া দাও?' সেবক ঠাকুরঘর খুলিয়া দিবার পর মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি খাও?' সেবক বলিলেন যে সাধারণ আহার ব্যতীত তিনি সকালে ও রাত্রে দুধ খান। তাহা শুনিয়া তিনি বেণীকে বলিলেন, 'উন্‌কে ওয়াস্তে আধাসের দুধ ইন্‌থাজাম করনে হোগা।' পরে তিনি এক কাপ চা খাইয়া সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই থলে হ'তে পয়সা নাও। ভাল রুই মাছ ও ভাল মিষ্টিদই আনবে। মাছের ঝোল ভাত ও দই খাবে। এটা গরম দেশ, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। বাজারে যাবার সময় বড় মিঞা বা বেণীকে সংগে নিয়ে যাবে, কখনও একলা যাবে না। এখানে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে। খুব সাবধানে চলবে। যেখানে দু'তিন জন লোক একত্র দেখবে সেখান দিয়ে যাবে না, অন্য রাস্তায় যাবে। পেতোর (নরেন বাবুর) বাড়ীর কাছে ভাল মাছ পাওয়া যায়। যাও, সেখান থেকে মাছ ও দই নিয়ে এসো।' সেবক থলে হইতে পয়সা নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল আপনি সুক্তোর কথা বলেছিলেন।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, একটু সুক্তো কর না, বেশতো।' সেবক বলিলেন, 'আপনি খাবেন তো?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তা একটু ঝোল খাওয়া যাবে।' সেবক বাজার করিয়া আনিলেন ও রন্ধনাদি করিলেন। রান্নার পর তিনি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রান্না হয়েছে। এখন খাবেন?' মহারাজ বলিলেন, 'তুমি খেয়ে বিশ্রাম কর, আমি পরে খাব। আমার জন্য খাবার রেখে দাও।' পরে তিনি ঘরের মধ্যে শুইতে গেলেন। বেণী তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলিলেন, 'ঠাকুরঘর বন্ধ কর।'

তখন বেলা প্রায় ১১টা। বৈকালে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'আচ্ছা, একটু সুক্তোর ঝোল দাও।'

একটী কাপে একটু ঝোল দেওয়া হইল, সামান্যই খাইলেন। পরে বাজারের হিসাব ও সংগৃহীত চাঁদার টাকা জমা করিলেন। সন্ধ্যার পর শোবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেণী বারান্দার খাটে বিছানা করিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল। মহারাজ শুইয়া শুইয়া কেবল বলিতেছেন, 'চলোজী, চলোজী।' রোজই সন্ধ্যার পর এইরূপ বলিতেন। তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহারাজ সারারাত্রি একা থাকিতেন ও 'মা' 'মা' করিতেন। রাত্রে খুব কমই ঘুমাইতেন। সকালে সেবক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কেমন আছেন?' মহারাজ—'ভাল আছি।' সেবক—'ঘুম হয়েছিল?' মহারাজ—'ঐ এক রকম।' রোজ সকালে বলিতেন, 'বাজার থেকে ভাল মাছ প্রভৃতি এনে রান্না কর।' সেবক—'আপনি খাবেন?' মহারাজ—'হ্যাঁ খাব।' কিন্তু তাঁহার আর খাওয়া হইত না। সারাদিন মাঝে মাঝে একটু একটু ঠাণ্ডা জল খাইতেন। দু'দিন আধ কাপ ঘোল খাইয়াছিলেন; একদিন এক কাপ লেমনেড। বেলুড়মঠে তাঁহাকে ব্যাথগেট কোম্পানির লেমনেড খাইতে দেওয়া হইত। সেই লেমনেড খাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'সবই এক রকম; লেমনেড বল, আর যাই বল।' ঠাণ্ডাজলই ছিল তাঁহার একমাত্র পানীয়। তাও বেশী নয়, সারাদিন হয়তো জোর এক কাপ। তবে সকালে রোজ এক কাপ চা খাইতেন। দু-এক জন ভক্ত প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় আসিতেন; কেহ মাছ, কেহ দই আনতেন। মহারাজ ঐ সব জিনিষ ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার আর খাওয়া হইত না। ভক্তদের সংগে মহারাজের কথাবার্তাও বিশেষ হইত না। সকলেই তাঁহার কাছে ভয়ে তটস্থ থাকিতেন, সেবকগণ পর্যন্ত। জনৈক ভক্ত চিকিৎসার জন্য একটি ভাল কবিরাজের কথা উল্লেখ করিলেন। তাহাতে মহারাজ বলিলেন, 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্।' ভক্তটি পুনরায় নিবেদন করিলেন, 'আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যাকে বল্‌বেন তাকেই আনবো।' কোন জবাব না দিয়া মহারাজ তাঁহাকে চলিয়া যাইবার জন্য হাতে ইসারা করিলেন। ভক্তটী প্রণামান্তে বিষণ্ণ মনে বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার পরই বা পূর্বেই মহারাজ শুইয়া পড়িতেন, আর প্রায়ই বলতেন, 'আর কেন মা, আর ত মাত্র কটা দিন বাকী।' একদিন সকালে সমর মহারাজ লক্ষ্ণৌ হইতে কিছু ভাল চিড়া ও মাগুর মাছ লইয়া হাজির হন। সেগুলি দেখিয়া মহারাজ খুবই খুসী হইলেন; কিন্তু তাঁহার খাওয়া আর হইল না। কিছুক্ষণ পরে সমর মহারাজ চলিয়া যাইবার জন্য প্রণাম করিতেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন যাবে, আবার কবে আসবে?' সমর মহারাজ—'যখনই ডাকবেন তখনই আসবো।' মহারাজ একথার কোন জবাব দিলেন না। আর একদিন একটী ভক্ত একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি আনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এই ঔষধটা খুবই ভাল, খেলে নিশ্চয়ই উপকার হবে।' ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য মহারাজ বল্লেন, 'আচ্ছা ওখানে রেখে দাও; পরে খাওয়া যাবে।' কিন্তু সেই ঔষধ তাঁহার খাওয়া হয় নাই। পরদিন সেবক উক্ত ঔষধ সেবন করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ ইসারায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দুই দিন একটী ভক্ত এক ঠোঙ্গা বাতাসা ও গোলাপ ফুলের একটী মালা লইয়া আসেন। বাতাসা ঠাকুরের ঘরে রাখিয়া মালাটী লইয়া মহারাজের কাছে আসাতেই মহারাজ মালাটী তাঁহার গলায় দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ভক্তটী গুরুর গলায় মালাটী পরাইয়া ধন্য মনে করিলেন। ১৭ই এপ্রিল তদনূদিত রামায়ণের প্রুফ প্রেস হইতে আসিল। তাহা তিনি গ্রহণ করেন।

১৮ই এপ্রিল বৈকালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাগত শ্রীহট্টবাসী একজন ভক্ত কাশীর একজন সাধুর পত্রসহ উপস্থিত হইলেন। মহারাজ চিঠিখানি সেবককে পড়িতে দিলেন। ভক্তটী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী। ভক্তটীকে তিনি বলেন, 'এখানে জায়গা নাই। পাশেই কালীবাড়ী। সেখানে গিয়ে থাক। হোটেলে খাওয়া দাওয়া কর। এখানে রান্নার কোন ব্যবস্থা নাই কাল সকালে যমুনায় স্নান করে আসবে, ৯॥ টার সময় দীক্ষা হ'বে।' ভক্তটী বলিলেন, 'আজ রাত্রিটা মঠে থাকবো, কালই কাশী চলে যাব।' মহারাজ বল্লেন, 'আচ্ছা, ঐ বাড়ীর হল ঘরে থাক, আর হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কর।' ভক্তটী সম্মতি-জ্ঞাপনান্তে প্রণাম করিয়া গেলেন। ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার চাকরের দ্বারা সেবককে তখন তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধসূচক সংবাদ পাঠাইলেন। সেবক মনে করিলেন, বোধ হয় মহারাজ ভক্তটীকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি রোজ সকালে যেমন যান, তেমনি মহারাজের কাছে যাইয়া প্রণাম করিতেই মহারাজ একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'এখন যাও!' একটু পরেই সেবককে ডাকাইয়া পাঠান এবং ঠাকুরঘর খুলিতে আদেশ করেন। চা খাবার পর বেণীকে মহারাজ বলিলেন, 'গঙ্গাজল, ফুল, বেলপত্তি সব ইখিজাম করো।' তিনি চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন এবং ভক্তটীকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভক্তটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মালা কোথায়? জপের মালা এনেছ?' ভক্তটী—'না, মহারাজ!' মহারাজ—'যাও, চক হ'তে মালা নিয়ে এসো।' সেবকের পরামর্শমত ভক্তটী বলিলেন, 'এখন সময় নেই, পরে ব্যবস্থা হবে।' তিনি আর কিছুই বলিলেন না। ভক্তটীকে কোশা হইতে জল নিয়া আচমন করিতে বলিলেন এবং দীক্ষার কার্য আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দীক্ষার কালে তাঁহার গলার আওয়াজ ও চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক। তখন আর তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়া মনে হয় নাই। বেশ জোরে স্পষ্ট করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ও অন্যান্য উপদেশ দিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা তাঁহার এই ভাব ছিল। ইহাই তাঁহার শেষ দীক্ষা। বেলুড় মঠে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'যে পর্যন্ত শরীরে একটু শক্তি থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়া দিব।'

দিন দিন মহারাজ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কাশীতে ও বেলুড়মঠে সংবাদ প্রেরিত হইল। ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শোবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেণী বিছানা করিয়া দেয়। তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন, 'চলোজী, চলোজী।' এ ভাবে কিছুক্ষণ চলিল। নিজেই চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিতেছিলেন না। বেণী ধরিতে গেলেই বলতেন, 'আরে ঠারো।' আবার বলেন 'চলোজী, চলোজী।' একটু পরেই সেবককে দেখাইয়া বেণীকে বলিলেন, 'উন্‌কো বোলাও।' সেবক আসিলেন এবং বেণীকে লইয়া উভয়ে তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। রাত্রি পূর্ববৎ কাটিল। রাত্রে আদৌ ঘুম হইল না। পরদিন ২২শে শুক্রবার তাঁহাকে খুব ক্লান্ত দেখা গেল। তাঁহার মুখে কেবল 'মা, মা' শব্দ; বেণী ও সেবক পর পর তাঁহাকে হাওয়া করিলেন। দুইবার বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, দুইবারই শুইয়া পড়িলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে উঠিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসান হইল। একটু চা খাইলেন। সেদিন বেলা ১০॥ টায় ঘরে শুইতে গেলেন এবং ঠাকুর ঘর বন্ধ করিতে বলিলেন। সেদিন তাঁকে ধরিয়া উঠাইবার বা বসাইবার সময় সেবকগণ বুঝিলেন, তাঁহার নিজের নড়বার চড়বার শক্তি আদৌ নাই। এ পর্যন্ত ডাকের চিঠিপত্র

দেখিয়াছেন। সেদিনও মনিঅর্ডার সহি করিলেন। পূর্বদিন পর্যন্ত বাজারের হিসাব ও চাঁদার টাকা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেদিন আর ওসব করেন নাই। বড় মিঞা বাড়ী যাইবার জন্য ছুটী চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আবি মত্ জানা, দো রোজবাদ জানা।' বড় মিঞা বলিল, 'নেই জী, বহুত জরুরী হ্যায়, দোরোজকে ওয়াস্তে জাতে হ্যাঁয়।' মহারাজ ইসারায় তাহাকে যাইতে সম্মতি দিলেন। সেদিনও সন্ধ্যায় শোবার পর কেবল বলিতেছেন, 'চলোজী, চলোজী,' সেবকগণ রাত ৮ টার সময় দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন। খুবই ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত 'মা' 'মা' শব্দ শোনা গেল, বাহির হইতে কখনো কখনো তাহাও শোনা যাইত না। সেবকগণ আশঙ্কিত হইয়া তাঁহার ঘরের দেওয়ালের বাহিরে দাঁড়াইতেন কোনও শব্দ শুনিবার জন্য। সেবকগণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘরের বাহিরে শুইয়া থাকিতে এতদিন সাহস করেন নাই, পাছে তিনি বিরক্ত হন। ২৩শে এপ্রিল শনিবার সকালে বেণীকে আর ডাকিলেন না। পূর্বদিন পর্যন্ত বেণীকে ডাকিতেন। বেণী নিজেই তাঁহার ঘরে গেল, একটু পরে সেবক। তাঁহারা গিয়া দেখেন, মহারাজ চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন, নড়িবার শক্তি নাই। অতি ক্ষীণস্বরে 'ও!' 'ও!' বলিতেছেন; কখনও 'মা' 'মা'। বেণী হাওয়া করিল। বেলা প্রায় ৯ টার সময় বিছানায় বসাইয়া দেওয়া হইল। একটু চা খাইলেন। ঘরে শুইতে যাওয়ার ইসারা করিলেন। ধরিয়া ঘরে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ঘরে যাওয়ার সময় ঠাকুরঘর বন্ধ করিতে বলিলেন। বৈকাল ৪ টায় সেবক গিয়া দেখেন তিনি শয্যায় শায়িত ও বেণী হাওয়া করিতেছে। সেদিন তাঁহাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই 'চলোজী, চলোজী' বলিতে লাগিলেন। বেণী ধরিতে যায় ও সেবককে ডাকিতে থাকে। সেবক দরজার কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ হ্যায়?' সেবক—আমি————। মহারাজ—'ভাগো ইঁহাসে।' সেবক চলিয়া আসিলেন। ২।৩ বার চেষ্টা করিয়াও আসিতে পারিলেন না। অগত্যা ঘরেই শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ঘরটী একটী গুদাম ঘরের মত ছিল, হাওয়া ঢুকিতে পারিত না। তাতে আবার গ্রীষ্মকাল। সেবক ও বেণী সেই রাত্রি তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ঘরে খুব সাবধানে রহিলেন যাতে তিনি জানিতে না পারেন। উভয়ে তাঁহার খাটের দুইপাশ হইতে হাওয়া করিতে লাগিলেন। তিনি বাম পাশে ফিরিলে সেবক হাওয়া করিতেন, ডানপাশে ফিরিলে বেণী। এই ভাবে রাত তিনটা বাজিল। তখন তিনি একটু ঘুমাইলেন। শমির মহারাজ সেদিন সকালে লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছিলেন। সেবক ও বেণী চলিয়া যাওয়ার পর তিনি হাওয়া করিতে লাগিলেন। অন্য কোন সাধু আশ্রমে ছিলেন না।

ইতোমধ্যে দিব্যাত্মানন্দজী কাশীতে লিখিয়াছিলেন, আপনারা শীঘ্র আসুন; মহারাজের অবস্থা খুবই খারাপ যাইতেছে। সত্যাত্মানন্দজী তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সব বলিয়াছিলেন। তদনুযায়ী ২৪শে এপ্রিল রবিবার প্রাতে স্বামী শর্বানন্দ প্রমুখ কয়েক জন সাধু কাশী হইতে এলাহাবাদ মঠে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ খবর পাইয়া হরিদ্বার হইতে আসিলেন। চারিদিক হইতে অনেক সাধু আসিয়া পড়ায় শেষ কয়েক-দিন তাঁহার ধারাবাহিক চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত হইল। স্বামী শর্বানন্দ নিজে মহারাজের কাছে বসিয়া ঔষধ পথ্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বামী ওঙ্কারানন্দ স্বামী মহেশ্বরানন্দকে মহারাজের চিকিৎসার্থ আসিবার জন্য তার করিলেন। সেদিন তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ বোধ হইল। এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার ললিতমোহন বসুকে

ডাকা হইল। ললিত বাবু মহারাজের বন্ধু মেজর বামন দাস বসুর পুত্র। তিনি মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার অসুখ এপিডেমিক ড্রপ্‌সি বলিয়া ঘোষণ করিলেন। স্থানীয় সেবাশ্রমের ডাঃ লালাজী মহারাজের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, 'বহুত দুব্‌লা মালুম হোতা হ্যায়, ঔর কুছ নেহি।' রোজ চা খাবো বলেন। সেদিন চা খাবার কথা বেণী জিজ্ঞাসা করিতেই অর্ধনিমীলিত চক্ষে 'হুঁ' বলিয়া সম্মতি জানান। বেণী চা করিয়া আনিল। উঠিয়া বসিয়া চা খাওয়ার ক্ষমতা মহারাজের ছিল না। শুইয়া শুইয়া খাবার চেষ্টা করিলেন। অর্ধেকের বেশী মুখ থেকে পড়ে গেল। এই ভাবেই নিস্তব্ধ রহিলেন। এলাহাবাদ হইতে কাশীতে মোটর গাড়ীতে ৪ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। সেখানে সেবাশ্রমে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে। তাই স্বামী শর্বানন্দ প্রমুখ সমাগত সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে কাশী লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতেই মহারাজ বলিলেন, 'তোমরা যাও।' তাঁহার শরীরের তাপ সেদিন ছিল ১০১ ডিগ্রী। এলোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ানত দূরের কথা ঔষধের নাম পর্যন্ত তাঁহার কাছে করা যাইত না। 'জল খান' বলে দুইবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান হয়। মাঝে মাঝে একটু গ্লুকোজ দেওয়া হইল। সারাদিন এই ভাবেই কাটিল। সাধুগণ সমস্তরাত্রি পালা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। সেই রাত্রি খুব গরম থাকায় সারারাত তাঁহাকে হাওয়া করা হইল। রাত্রে 'মা' 'মা' শব্দ অস্পষ্ট স্বরে মাত্র কয়েকবার শোনা গেল। রাত্র ১॥ টায় বেণীকে ডাকিলেন। পিপাসার্ত মনে করিয়া বেণী জল নিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি 'হুঁ' বলিলেন এবং একটু জল খাইলেন, মাঝে মাঝে হাত নাড়তেন। বাম বা ডান হাত নাড়িয়া পাশ ফিরিবার ইচ্ছা জানাইতেন। পাশ ফিরাতে তিন জনের দরকার হইত; এইরূপে তাঁহার জীবনের শেষরাত্রি অতিবাহিত হইল।

২৫শে এপ্রিল সোমবার মহাপ্রয়াণের শুভ দিন, তাঁহার জীবনের শেষ দিন। সেদিন সকালে তাঁহার শরীরের তাপ ছিল ১০১ ডিগ্রী। তাঁহাকে খুবই দুর্বল মনে হইল। সকাল হইতে ধ্যান-স্তিমিতনয়ন। স্বামী শর্বানন্দজীর পরামর্শ মত প্রাতে কমলালেবুর রস ও গ্লুকোশ দেওয়া হইল। চায়ের পরিবর্তে সামান্য একটু খাইলেন। সেদিন কাশী হইতে ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার পুনরায় মহারাজকে দেখিবার জন্য আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছেন মহারাজ?' মহারাজ চোখ বুজিয়াই উত্তর করিলেন, 'ভাল আছি।' ইহাই এই মহাপুরুষমুখনিঃসৃত শেষ বাক্য। তারপর আর কোন কথাই বলেন নাই। ডাঃ মজুমদার মহারাজকে দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে ১২টার সময় কাশী ফিরিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে মহারাজের দেহের উত্তাপ বাড়িয়া ১০২ ডিগ্রী হইল। বেলা ১১টা হইতে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দের নির্দেশে সেবক প্রথমে অঙ্গুলী দিয়া ও পরে চামচ দিয়া মহারাজের গলা সাফ করিলেন। গলা হইতে কফ বাহির হইল না; সবুজ রংয়ের সামান্য মাত্র ফেনা বাহির হইল। গলার শব্দ পূর্ববৎ হইতে লাগিল। ডাঃ মজুমদার যাইবার সময় ১২টায় বলিয়া গেলেন কোন ভয়ের কারণ নাই, ১২ ঘণ্টার মধ্যে কিছুই হইবে না।' সেদিন সকালে দুটী মাদ্রাজী যুবক দীক্ষার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা মহারাজের ঐ অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেল। তাঁহাকে সর্বদা হাওয়া করা ও মাঝে মাঝে গ্লুকোজ দেওয়া হইতেছিল। গলার আওয়াজ একই ভাবে চলিল। বেলা ২টার সময়

শরীরের উত্তাপ দেখা গেল ১০৩ ডিগ্রী। সেবকগণ তাঁহাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া বিছানা পরিষ্কার করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি 'য়্যাঁ, য়্যাঁ' শব্দ করিয়া মুখ বাঁকাইলেন। মহাপ্রয়াণ আসন্ন বুঝিয়া সকল সাধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বার হইতে স্বামী অপূর্বানন্দ-কর্তৃক প্রেরিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল তাঁহার মুখে একটু দেওয়া হইল, তারপর মাত্র তিনবার মুখ নাড়িলেন। সকাল হইতেই ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত গম্ভীর। মহাপ্রয়াণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ছিল। বেলা ৩টার সময় স্বামী শর্বানন্দ বুঝিলেন মহারাজের প্রাণবায়ু উৎক্রমণোন্মুখ। মঠের সাধুগণ সমবেত হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে, 'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়' এই মোক্ষদায়ক মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই মধুর ধ্বনি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং তিনি মহাসমাধিতে চিরতরে নিমগ্ন হইলেন। তখন অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিট।

ক্ষণকালের জন্য সাধু ও ভক্তগণ পুত্তলিকাবৎ নির্বাক, নিস্পন্দ। কেহ তাঁহার পদপ্রান্তে নির্নিমেষ নেত্রে দণ্ডায়মান; কেহ বা অদূরে রোদনরত। অতঃপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে নূতন বস্ত্রাদিতে ভূষিত এবং চন্দন ও অগুরু আদি সুগন্ধদ্রব্যে বুজিত করিয়া অপূর্ব সাজে সাজাইলেন। শবদেহে শিবরূপ প্রকাশিত হইল। 'কাশী ও বেলুড়মঠে' তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। রাত্রি ১০টায় ২০ জন মোটরবাসে আসিলেন। মহারাজের ঘরে বাতি ও ধূপ জ্বালা হইল। রাত্রে তাঁহার পায়ের ছাপ নেওয়া হইল। সাধুদের মধ্যে কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, কেহ বা ঘরে, কেহ বা প্রাঙ্গণে রাত কাটাইলেন। পরদিন ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে বাঁকুড়া হইতে স্বামী মহেশ্বরানন্দ আসিলেন। ঐবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হওয়ায় হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থান হইতে সাধুগণ আসিলেন। বেলা ৮টার সময় বাহিরের বারাণ্ডায় একটী খাটে তাঁহার তপঃপূত দিব্যদেহ স্থাপিত হইল এবং খাটটীর উপর একটী চাঁদোয়া খাটাইয়া উহা বিবিধ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সজ্জিত হইল। অতঃপর প্রায় শতাধিক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত মিলিত হইয়া তাঁহার দিব্যদেহ শোভাযাত্রা করিয়া পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীসঙ্গমাভিমুখে লইয়া চলিলেন। যমুনার তীরে ঘাটের চারিদিকে সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ কীর্তন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি বিকশিত ছিল। যমুনাতীর হইতে ত্রিবেণীসঙ্গমে সুবৃহৎ বজরাযোগে যাওয়া হইল। তখন যমুনাতীরবর্তী নরনারীদের মনে হইতেছিল যেন কোন দেবপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ত্রিবেণীসঙ্গমে মহারাজের দেহকে স্নান করান হইল এবং ফুল, চন্দন, আতর ও নানা সুগন্ধি তৈল মাখান এবং নূতন সিল্কের গেরুয়া কাপড় পরান হইল। পরে পূজা, ভোগ ও আরাত্রিক করা হয়। তারপর দেহটী প্রস্তরনির্মিত সুদৃশ্য শবাধারে ভালরূপে শোয়াইয়া উহার মুখ বন্ধ করা হইল। ঠিক ত্রিবেণীসঙ্গমে নৌকার যাইয়া 'জয় শ্রীগুরুমহারাজীকী জয়' এই ধ্বনি করিতে করিতে সলিল-সমাধি দেওয়া হইল। যে পুণ্যতীর্থে মহাপুরুষ ত্রিবেণী দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন সেই দেবক্ষেত্রে তাঁহার স্থূলশরীর বিসর্জিত হইল। মহারাজের বিয়াল্লিশ বর্ষব্যাপী সন্ন্যাসজীবনের প্রায় ৩৮ বৎসর এই প্রয়াগতীর্থে অতিবাহিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ বিজ্ঞানানন্দের ভৌতিক দেহ তাঁহার সাধনপুরী সিদ্ধপীঠ প্রয়াগধামে পঞ্চভূতে বিলীন হইল। শুদ্ধজল যেমন শুদ্ধজলে মিলিত হয় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মে বিলীন হইলেন।

তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে ৭ই মে শনিবার এলাহাবাদ মঠে আনন্দোৎসব ও ভাণ্ডারাদি হইয়াছিল। মুঠিগঞ্জে যে রাস্তার উপর তৎপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত তাহা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রোড' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রয়াগধামে মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়াছে।

স্যার মির্জা ইস্‌মাইলের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব*

অনুবাদক শ্রীরমণী কুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

আপনাদের সাদর আহ্বানে অদ্যকার শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে বিশেষ সম্মানিত মনে করিতেছি। এরূপ স্মরণীয় ঘটনার সহিত যুক্ত থাকিবার সৌভাগ্যলাভের জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশত-বার্ষিকী সম্পন্ন হইতেছে। এই সকল উৎসব দেখিয়া কবির উক্তি মনে পড়ে—"যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা ভবলীলা সাঙ্গ করি, তাহাদিগের হৃদয়-মধ্যে বাস করাই অমরতা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় লোকোত্তর মহাপুরুষগণ চিরদিন অমর হইয়া থাকেন। তাঁহার শতবার্ষিকী সত্যসত্যই একটি ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মশব্দ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহার প্রয়োগ হয় নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলরহস্য—সত্য, প্রেম ও সৌন্দর্য মহান্ ঋষি ও ক্রান্তদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে নিহিত আছে। এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার একটা বিশেষ আনন্দ আছে, কারণ ইহার মূলে এমন এক সার্বভৌম প্রেরণা রহিয়াছে যাহা সকল মতবাদ সাম্প্রদায়িকতা ও ক্রিয়াবাহুল্যকে ছাপাইয়া উঠে।

জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিসংহারিণী ধর্মান্ধতায় বিমূঢ় জনসংঘের কুৎসিত সংগ্রামের কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের কেহই জগতে আধ্যাত্মিক মহাভেষজের আসন্ন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিরুদ্ধ ধর্মমত-সকলকে শুধু মন ও বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়া অথবা উহাদের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতার ভাব পোষণ করিয়া এই আধ্যাত্মিক মহৌষধের মূলরহস্য অবগত হওয়া যায় না। ইহা এসকল অপেক্ষাও অতি গভীরতর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু। জগতের লোকের মন নিতান্তই অব্যবস্থিত—ভয়, সংশয় এবং বিদ্বেষবুদ্ধির প্রাবল্য ঘটিয়াছে। এরূপ চরমদুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহতী শিক্ষা প্রভূত কল্যাণের নিদান বলিয়া অনুভূত হইতেছে। তিনি যে কেবল প্রধান ধর্মমতসকল নিঃস্বার্থ-ভাবে বিচারবুদ্ধি দ্বারাই বুঝিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন এমন নহে, পরন্তু তিনি সত্যসত্যই নিজের জীবনে উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধর্মমতের অনুশাসন ও নির্দেশ পালন করিয়া তিনি উহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনে সকল ধর্ম আচরণ করিয়া উহাদের সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁহার নিদর্শন কি ছিল? তিনি সেই শাশ্বত সত্যকেই পুনঃ আবিষ্কার করিয়া দেখাইলেন যে এক চিরভাস্বর জ্যোতিঃস্বরূপই সকল ধর্মকে উদ্ভাসিত করিতে-ছেন; কৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদের ভিন্ন মত ও পথ আছে কিন্তু সকল মত ও পথ একই উদ্দেশ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি কঠোর তপশ্চর্যা, ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা কবি পোপের সেই

* গত রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে মহীশূরে তথাকার ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার মির্জা ইস্‌মাইল কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

অমর কবিতায় ব্যক্ত সত্যেরই পুনরাবিষ্কার করেন—"ধর্মের বাহ্যিক রূপ লইয়া ধর্মান্ধগণ নির্লজ্জভাবে যুদ্ধ করুক। যাঁহার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি কখনও অন্যায় করিতে পারেন না।"

স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌বেণ্ডের মতে "শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মের লোকগণকে মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিতে যেরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন এরূপ আর কেহই করেন নাই। অন্যান্য ধর্মের যথার্থ ভাব উপলব্ধি করিবার শক্তি ও প্রতিভা ছিল তাঁহার অনন্যসাধারণ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশাল উদারতা, অন্যান্য ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং অপ্রমেয় মানবপ্রেম আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—ত্যাগ। মনস্বী গেটে বলিয়াছেন,—"ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। এই চিরন্তনী গীতি প্রতি মুহূর্তে জীবন ভরিয়া আমাদের কর্ণকুহরে উচ্চ ঝঙ্কার তুলিতেছে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যুর স্বরূপ

শ্রীবেলা দে

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিস্ফুট প্রধান দুটী বিষয়ের প্রতি কবি নিজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রথমটী হচ্ছে তাঁরই ভাষায় "সীমার মধ্যেই অসীমের মিলনসাধনের পালা," অথবা "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা।" দ্বিতীয়টীতে কবি বলছেন—"আর একটা প্রবল প্রবর্ত্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কবিতা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটী বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ।" কিন্তু 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি' রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটী বিশেষ ধারা' জেনেও অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর রচনায় এই তত্ত্ব জানবার জন্য পাঠ করে থাকেন; যদিও তাঁর পরিত্যক্ত আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারের এই বস্তু বাঞ্ছিত পরলোক-তত্ত্ব-সম্পদের পরিচয় লাভ করা তাঁর স্মৃতি-তর্পণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে প্রার্থনীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে প্রথমেই দেখা যায় যে মৃত্যুকে তিনি সাধারণ অর্থাৎ অস্তিত্বলোপের অর্থে স্বীকার বা বিশ্বাস করেন নি, বরং মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়ে তাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছেন ও সেই উপলব্ধি তাঁর কাব্যে, সঙ্গীতে ও নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে যে একটা বিকৃতি আছে সেটাকে স্বীকার কর্ত্তে তিনি কিছু কুণ্ঠিত হয়েছেন। জীবন ও মরণের মধ্যে তাঁর কাছে কোন বিচ্ছেদ নেই! তাঁর কবি-অন্তর কোন অসঙ্গতকে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রাণিজগতের সব কিছুরই শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য আছে, কোন কিছুর উদ্দেশ্যই তাঁর কাছে ব্যর্থ নয়—মৃত্যুও অনর্থক নয়। তাঁর মুগ্ধদৃষ্টি যেমন ফুল ফোটা দেখেছে, ফুল ঝরাও তেমনি দেখেছে—আরো দেখেছে এই ঝরে যাওয়ার মধ্যে কোন বিচ্ছেদের বেদনা নেই, ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন কাতরতা নেই—

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে
করে মুখোমুখী
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

জীবনসন্ধ্যা রাত্রির আঁধারটুকু কাটিয়ে এনে দেবে জীবনপ্রভাত—

জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যময় পথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যাবে জাগায় আলোকে।

মৃত্যুর ছায়া নূতন জীবনের অগ্রদূত হয়ে তাঁর অন্তরে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর রূপ রুদ্র ভয়ঙ্কর নয়, মৃত্যু চিরসমাপ্তি নয়, পূর্ণচ্ছেদ নয়। মৃত্যু মানব-সত্তার সঙ্গে চিন্ময়সত্তার বিলোপ সাধন করতে পারে না। মরণ তাঁর কৈশোরে 'শ্যাম সমান।' আবার সমাপ্তির তীরে দাঁড়িয়ে কবির সকল দ্বিধা, ভয়, সংশয় দূর হয়েছে, আর তিনি বলবেন না "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।"

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে যে দুটী অভিজ্ঞতাকে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন তার মধ্যে একটী হচ্ছে মৃত্যুর স্পর্শ! এই স্পর্শ তাঁর জীবনকে আরো সুন্দর আরো পবিত্র করে দিয়েছে! মৃত্যু তাঁর নিকট ভয়াবহ নয়, সে একটা নতুন অনুভূতি, নবজীবনের প্রবেশলাভের পথ! রহস্যময়ী রাত্রির মত মৃত্যু ও রহস্যময়, রাত্রিটুকু কেটে গেলে যেমন আবার নূতন প্রভাত তেমনি মরণের পরপারে জীবনের প্রভাতে যাত্রার সুরু হবে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভালবাসার অভাব নেই।

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিবো নিশ্চয়।"

আহ্বান

শ্রীউমারাণী বসু

যেদিন শুনিনু বাঁশরী তোমার
আকুল হইয়া খুঁজিনু কত,
দিক দিগন্ত মরু প্রান্তরে
কান্তারে ফিরি পাগল মত।

আকাশে বাতাসে দ্যুলোকে ভূলোকে
সে সুর কোথায় বহিয়া যায়,
কোথা কোন পারে সন্ধানে তার
কোন পথপানে চলিব হায়।

একদিন শেষে নিভৃতে আপন
হৃদয় দুয়ার খুলিয়া দেখি,
বসি নিরজনে সেথা আনমনে
বাঁশিটি তোমার বাজাও এ কি!

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদান্ত-দর্শন

৺ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

ঔপনিষদ্ জ্ঞান মুক্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াও জীবনকাল পর্য্যন্ত ভাবনা আবশ্যক। ব্রহ্মদত্ত বলেন, যদিও দেহের সত্তাকালেও উপায়বলে দেবতা সাক্ষাৎকার হইতে পারে তথাপি তাহার সহিত মিলন তখনই হইবে যখন দেহ থাকিবে না। প্রারব্ধ কর্ম্মার্জ্জিত দেহ উপাস্যের সহিত উপাসকের মিলনের অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। (দ্রষ্টব্য—বৃঃ উঃ বাঃ পৃঃ ১৩৫৭ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-টীকা-চন্দ্রিকা ১-৬৭)। মৃত্যুর পর যেমন স্বর্গলাভ হইতে পারে (পূর্ব্বে নহে) তেমনই দেহত্যাগের পরই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। উভয়টিই বৈদিক বিধি পালনের ফল। ব্রহ্মদত্ত ধ্যাননিয়োগবাদী ছিলেন। তিনি জীবন্মুক্তি স্বীকার করিতেন না। শঙ্করাচার্য্য-মতে মোক্ষ দৃষ্ট ফল, ব্রহ্মদত্ত মতে ইহা অদৃষ্ট ফল। শঙ্করমতে কর্ম্ম হইতে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, মোক্ষ নহে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কর্ম্মাচরণের আবশ্যকতা নাই। এই অবস্থা স্বতঃই কর্ম্মসন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শঙ্করমতে সত্ত্বশুদ্ধি বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না; এই অবস্থায় কর্ম্ম সন্ন্যাসবিধি-প্রাপ্ত (দ্রষ্টব্য ঐতরেয়-ভাষ্য-উপোদ্ঘাত)। এই প্রকারের দ্বিতীয় অবস্থাতে সাধকের পক্ষে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। ব্রহ্মদত্তের দৃষ্টিতে সাধনার ক্রম নিম্নপ্রকার যথা—প্রথম উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান লাভ করা উচিত। তাহার পর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ বিস্তার (ভাবনার) অভ্যাস করা আবশ্যক। এই অবস্থাতে কর্ম্ম আবশ্যক। জীবনকাল পর্য্যন্ত কর্মত্যাগ করা যায় না। এজন্য ব্রহ্মদত্তও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী। সুরেশ্বরাচার্য্যও তাঁহাকে সমুচ্চয়-বাদী রূপেই উল্লেখ করেন। জ্ঞানোত্তম নিজরচিত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির টীকাতে তাঁহাকে (ব্রহ্মদত্তকে) জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদী বলিয়াছেন। "বাক্যজন্যজ্ঞানোত্তরকালীন-ভাবনোৎকর্ষাৎ ভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারলক্ষণজ্ঞানান্তরেণৈব অজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ জ্ঞানাভ্যাসদশায়াং জ্ঞানস্য কর্মণা সমুচ্চয়োপপত্তিঃ।" ব্রহ্মদত্ত বলেন, মুমুক্ষুর পক্ষে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অহং-গ্রহোপাসনা করা উচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১।৪।৭-১০) 'আত্মেত্যেব উপাসীত' এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জীব পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ (পরমার্থতঃ) ভিন্ন কিনা? শঙ্কর অভেদপক্ষকে স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু কোন কোন বেদান্তাচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন না হইলেও অভেদভাবনার আবশ্যকতা আছে। (দ্রষ্টব্য—সম্বন্ধবার্ত্তিক, শ্লোক ৭০২, ৮৪৫; ব্রঃ সূঃ ভাষ্য ৪।১৩; সংক্ষেপ শারীরিক ১।৩০৭-১১; পঞ্চপাদিকা পৃঃ ২৫২-৫৩) ব্রহ্মদত্তের মতে জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। যদি (ঐ সম্বন্ধ) ভেদই হয় তাহা হইলে ঐক্যভাবনাবলে মোক্ষকালে জীব লয় প্রাপ্ত হইবে। যদি জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয় অথবা দুইটির মধ্যে অভেদ সম্বন্ধই থাকে তাহা হইলে ভাবনাবলে ভেদভাবের নিবৃত্তি, অভেদের স্ফুরণ বা সাক্ষাৎকার এবং অন্তে মোক্ষ হইবে। ব্রহ্মদত্তের দৃষ্টিতে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য-সমূহের শ্রবণ দ্বারা আত্মস্বরূপবিষয়ক অখণ্ড বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, ঐ শব্দের তাদৃশ শক্তি নাই। পরন্তু নিদিধ্যাসন বা প্রসংখ্যানের ঐরূপ সামর্থ্য আছে। যদি পূর্ণভাবে প্রসংখ্যান

সম্পন্ন হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা আত্মার অখণ্ডজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। (এজন্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১২৮-১৩০, ১৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

শঙ্করমতের সহিত উক্ত মতের বিরোধ স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুরেশ্বরাচার্য্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে (১-৬৭) এবং পদ্মপাদ পঞ্চপাদিকাতে (৯৯ পৃঃ) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মহাবাক্য হইতে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। পরন্তু মণ্ডন মিশ্র বলেন শব্দ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই পারে না। (এজন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকা ৪।৪।৭ শ্লোক, ৭৯৬ দ্রষ্টব্য)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে, ব্রহ্মদত্ত ত প্রসংখ্যান বা নিদিধ্যাসন হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু সেই প্রসংখ্যানের মধ্যে কি শব্দ থাকে না? থাকিলে শঙ্করমতের সহিত ব্রহ্মদত্তের মতের বিরোধ অল্প হইয়া যায় কিন্তু, মণ্ডনমিশ্রের মতের সহিত বিষম বিরোধই থাকিয়া যায়।

দেবীভাগবত পুরাণাদির মতে একজন ব্রহ্মদত্ত মহাভারতাদিতে উক্ত ছায়া শুকের জামাতা ছিলেন। তিনি রাজা অথচ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। ইঁহারা অভিন্ন কি না, তাহা বলা যায় না।

৯ ভারুচি

রামানুজের বেদার্থসারসংগ্রহ ১৫৪ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় প্রাচীন কালের ছয় জন বেদান্তীর নাম উল্লেখ করা হইতেছে। তাঁহারা রামানুজের পূর্ব্বে বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞানের প্রচারবাসনায় গ্রন্থরচনা করিয়া ছিলেন। আচার্য্য রামানুজের সসম্ভ্রম উল্লেখ দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, তাঁহারা কেহই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ছিলেন না। তাঁহাদের যথা—১। ভারুচি, ২। টঙ্ক, ৩। বোধায়ন, ৪। গুহদেব, ৫। কপর্দ্দী, ৬। দ্রমিলাচার্য্য বা দ্রমিড়াচার্য্য। শ্রীনিবাস দাস যতীন্দ্রমতদীপিকা গ্রন্থে (পুণা সংস্করণ ২ পৃষ্ঠায়) এতৎপ্রসঙ্গে, ব্যাস, বোধায়ন, গুহদেব, ভারুচি, ব্রহ্মনন্দী, দ্রমিড়াচার্য্য, শ্রীপরাঙ্কুশ, নাথমুনি, ও জ্যোতীশ্বর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে টঙ্ক ও ব্রহ্মনন্দী বৈষ্ণবগণের মতে অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহা হউক ভারুচির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা-গ্রন্থে (১।১৮, ২।১২৪), মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরসংহিতার টীকা (২।৩ পৃঃ ৫১০) এবং সরস্বতীবিলাস (প্যারা ১৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে ভারুচি নামক একজন ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায়। আরও মনে হয় ইনি বিষ্ণুকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন। শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়-মধ্যে প্রসিদ্ধ ভারুচি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভারুচি যদি অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার কাল খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্দ্ধ স্বীকার করিতে পারা যায়। এজন্য পি ভি কাণে-কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০ দ্রবিড়াচার্য্য

দ্রবিড়াচার্য্যও প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য্য ছিলেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের একখানি অতি বৃহৎ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। শঙ্কর মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ভাষ্যে (২।২০, ২।৩২) তাঁহাকে "আগমবিৎ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ভাষ্যে তাঁহাকে "সম্প্রদায়বিৎ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য বৃঃ উঃ ভাষ্য, পুণা সংস্করণ, ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেখানে দ্রবিড়াচার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে সেখানেই তিনি সসম্মানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। কুত্রাপি তাঁহার মতের খণ্ডন করা

হয় নাই। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, দ্রবিড়াচার্য্যের সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল ছিল না। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেস্থলে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রসঙ্গ আছে সেস্থলের ব্যাখ্যায় দ্রবিড়াচার্য্য ব্যাধসংবর্দ্ধিত রাজপুত্রের আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন। আনন্দগিরি বলেন যে, "তত্ত্বমসি-বাক্যম্ ঐক্যপরম্ তচ্ছেষঃ সৃষ্ট্যাদিবাক্যম্" এই অভিমতটী দ্রবিড়াচার্য্যের স্বীকৃত।

১১ দ্রমিড়াচার্য্য

রামানুজ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিতে দ্রমিড়াচার্য্য নামে এক প্রাচীন আচার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়। বিচার করিলে দেখা যায়—এই দ্রমিড়াচার্য্য শঙ্কর-কথিত দ্রবিড়াচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত অবলম্বনে দ্রমিড়ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয়-গ্রন্থে উক্ত আচার্য্য সম্বন্ধে বলেন—"ভগবতা বাদরায়ণেন ইদমর্থমেবসূত্রাণি প্রণীতানি বিবৃতানি চ পরিমিত-গম্ভীর ভাষ্যকৃতা।" এস্থলে ভাষ্যকার শব্দে দ্রমিড়া-চার্য্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কাহারও মতে দ্রমিড় সংহিতাকার অলবর শঠকোপ বা বকুলাভরণই বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে দ্রবিড়াচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ।

পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরক-গ্রন্থে (৩।২২১) শ্লোকে ব্রহ্মনন্দি-গ্রন্থের দ্রবিড়ভাষ্য হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা রামানুজকর্ত্তৃক উদ্ধৃত দ্রবিড়-ভাষ্য হইতে অভিন্ন দেখা যাইতেছে। এই কারণেই কেহ কেহ বলেন শঙ্করসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দ্রবিড় এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দ্রমিড় অভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ব্যক্তি নহেন। কিন্তু মঃ মঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহাশয় দ্রমিড়কে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্রবিড়কে অদ্বৈতবাদী বলেন। এজন্য উদ্বোধন পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১২ সুন্দর পাণ্ড্য

ভগবান শঙ্করের পূর্ব্বে সুন্দর পাণ্ড্য নামক আচার্য্য শ্লোকবদ্ধ একখানি বার্ত্তিকগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ বার্ত্তিকখানি ব্রহ্মসূত্রের উপর কোনও প্রাচীন ভাষ্য বা বৃত্তি অবলম্বনে রচিত হয়। পরন্তু উক্ত অবলম্বনভূত ভাষ্য বা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। উক্ত বৃত্তির রচয়িতা বোধায়ন বা উপবর্ষ ছিলেন অথবা অন্য কোনও প্রাচীন আচার্য্য ছিলেন এ বিষয়ে কিছুই স্থির করা যায় না। সমন্বয়াধিকরণের ভাষ্যের শেষভাগে (১।৪।৪ সূত্র) শঙ্করাচার্য্য এই বার্ত্তিক হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

অপিচ আহুঃ—

গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ।
সদ্ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ॥
অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ॥
দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥

ইহাঁর তাৎপর্য্য এই যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিধি ও প্রমাণ সার্থক। আত্মবস্তু হেয় নহে উপাদেয়ও নহে। উহা অদ্বৈত, এইরূপ আত্মবোধে প্রমাণের অপেক্ষা নাই কারণ ঐ অবস্থায়, প্রমাতা ও বিষয় কোনটিই থাকে না। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী-গ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলিকে 'ব্রহ্মবিদ্যা-গাথা' বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু পদ্মপাদকৃত পঞ্চপাদিকা-গ্রন্থের নরসিংহ স্বরূপের শিষ্য আত্মস্বরূপ-রচিত টীকা "প্রবোধপরিশোধিনীতে" ঐ শ্লোকগুলি সুন্দর পাণ্ড্য রচিত বলা হইয়াছে। সূতসংহিতার মাধব-মন্ত্রিকৃত টীকার তাৎপর্য্যদীপিকায় বলা হইয়াছে যে তৃতীয় শ্লোকটি অর্থাৎ 'দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ' ইত্যাদি শ্লোকটি সুন্দর পাণ্ড্য কৃত বার্ত্তিক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অমলানন্দকৃত কল্পতরু-গ্রন্থে ৩।৩।২৫ সুন্দর পাণ্ড্য কৃত 'নিঃশ্রেণ্যারোহণপ্রাপ্যম্' প্রভৃতি আরোও তিনটি শ্লোক এবং তন্ত্রবার্ত্তিক-গ্রন্থে (কাশী ৮৫২-৮৫৩ পৃঃ) এই তিনটি এবং 'তেন যদ্যপি সামর্থ্যম্' ইত্যাদি দুইটি মোট পাঁচটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ন্যায়সুধাতে (পৃঃ ১২৯৮) উক্ত পাঁচটি শ্লোক 'বৃদ্ধানাম্' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোনও কোন আচার্য্যের (বিদ্বানের) মতে সুন্দর পাণ্ড্যের কাল ৬৫০ খৃষ্টাব্দ। তিনি শৈব বৈদান্তিক ছিলেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কোনও পণ্ডিতের মতে রাজা নেডুঁ মারণ নায়নরের নামান্তর সুন্দর পাণ্ড্য ছিল। এবিষয়ে বিশেষ বিবরণ মঃ মঃ পণ্ডিত কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রী লিখিত Some Problems of Identity in the Cultural History of India নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ Journal of Oriental Research, Madras পত্রিকার প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১-১৫) প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উক্ত লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। উহা Proceedings of Third Oriental Conference (পৃঃ ৪৬৫-৪৬৮) এ প্রকাশিত হয়। ইনি পাণ্ড্যরাজ কুব্জবর্দ্ধন বা কুল-পাণ্ড্য নামেও পরিচিত ছিলেন। কাহারও মতে ইঁহার উপাধি 'অরিকেশরী' ছিল। প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য তিরুজ্ঞান সম্বন্দর ইহার সমসাময়িক। তাঁহারই প্রভাববলে সুন্দর পাণ্ড্য জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নিজ সাধনবলে ৬৩জন শৈবাচার্য্যের অন্যতমরূপে স্থান প্রাপ্ত হন। ইনি চোলরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ভট্ট-কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিকের অন্যস্থলে (পৃঃ ২৮০-২৮১) 'আহ চ' বলিয়া দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায়সুধাকরের মতে উহাও বৃদ্ধবচন। ঐ বৃদ্ধ সুন্দর পাণ্ড্য অন্য কেহ নহেন। বুঝা যায় যে সুন্দর পাণ্ড্য পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন।

১৩ গুহদেব

ইঁহার বিশেষ পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল ইঁহার নাম মাত্র রামানুজমতের গ্রন্থে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়

১৪ কপর্দ্দী

ইঁহারও বিশেষ পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না, কেবল নাম মাত্র রামানুজমতের গ্রন্থে দেখা যায়। বিদ্যার্ণবতন্ত্রে যে শঙ্করসম্প্রদায়ের ৭১জন আচার্য্যের নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে ২৪ সংখ্যক গুরুর নাম কপর্দ্দী দেখা যায় এইমাত্র।

১৫ গৌড়পাদাচার্য্য

শঙ্করসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণামমন্ত্রে আছে-নারায়ণ তৎপুত্র ব্রহ্মা, তৎপুত্র বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাস, তৎপুত্র শুক, তৎশিষ্য মতান্তরে শিষ্য ও পুত্র উভয়ই গৌড়পাদ, তৎশিষ্য গোবিন্দপাদ, তৎশিষ্য শঙ্করাচার্য্য, তৎশিষ্য পদ্মপাদাদি ৪জন। যথা-

নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রং
পরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দ-
যোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ
শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্‌গুরূন্
সন্ততমানতোঽস্মি॥

এই শ্লোকে গৌড়পাদকে শুকদেবের পুত্র বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহেতু নারায়ণ হইতে গৌড়পাদ পর্য্যন্ত পুত্রপরম্পরার মধ্যে কথিত এবং গোবিন্দ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে কথিত দেখা যায়।

বিদ্যার্ণবতন্ত্র-(কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত) মধ্যে দেখা যায় গৌড় নামে ৫৫ সংখ্যক গুরু

এবং গৌড়পাবক নামে ৬৫ সংখ্যক গুরু রহিয়াছেন। ইহাতে কপিল হইতে শঙ্করাচার্য্যের নাম আছে। শঙ্করাচার্য্যকে ৭১ সংখ্যক বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বিষয়ে অপর কথা শঙ্কর-সম্প্রদায়প্রসঙ্গে পরে উক্ত হইতেছে। তথাপি গৌড়পাদের নামে ১। মাণ্ডূক্যকারিকা ২। সাংখ্যকারিকাভাষ্য ৩। উত্তরগীতার ভাষ্য ৪। শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রতন্ত্র ৬। সুভগোদয়তন্ত্র ৭। নৃসিংহ-উত্তরতাপনীয়-উপনিষদ্‌ভাষ্য ৮। ব্রহ্মসূত্র-কারিকা এই গ্রন্থগুলির প্রণেতৃত্ব প্রসিদ্ধ আছে। মাণ্ডূক্যকারিকার বচন শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়বিদের রচনা বলিয়া নিজভাষ্য মধ্যে দুই স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মাণ্ডূক্যকারিকার উপর একখানি ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ (কাশী সংস্কৃত কলেজের পুস্তকরক্ষক) বলিতেন, তিনি গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সহস্রশ্লোকাত্মক একটী কারিকা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্যগ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না বুলিয়া অনেকে ইহা অবিশ্বাস করেন। পরন্তু গৌড়পাদের অন্য সকল গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখা যায় না, আর তজ্জন্য যে সে সকল গ্রন্থ গৌড়পাদের নহে বলা হয়, তাহাও ত নহে। অতএব এই অবিশ্বাস ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক গৌড়-পাদাচার্য্যের মতই শঙ্করাচার্য্য প্রচার করিয়াছেন। আর এইকারণে গৌড়পাদাচার্য্য একজন বেদান্তের প্রাচীন আচার্য্য বলিতে হয়।

মাণ্ডূক্যোপনিষদের পরিচয়

আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডূক্যকারিকার প্রণেতা, ইহা তাহার উপর শাঙ্করভাষ্য হইতে জানা যায়। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ দশোপনিষদের অন্তর্গত। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত সারবান্ গ্রন্থ। মুক্তিকোপনিষদে ইহার অত্যন্ত প্রশংসা দেখা যায়। (১।২৬—১।২৯) ইহাতে আছে একমাত্র মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ই মুমুক্ষুগণকে মুক্তি দিতে সমর্থ। এই উপনিষদ্ খানিতে মাত্র ১২টী বাক্য আছে। তন্মধ্যে প্রথম সাতটী বাক্য নৃসিংহপূর্বোত্তরতাপিনী উপনিষদে এবং রামতাপিনী উপনিষদে উপলব্ধ হয়। এই উপনিষদের পরিশিষ্টরূপে আচার্য্য গৌড়পাদ এক কারিকাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। ঐ কারিকাগুলি চারিটী প্রকরণে বিভক্ত। যথা—(১) আগম প্রকরণ, উহার কারিকাসংখ্যা ২৯টী, (২) বৈতথ্য প্রকরণ, উহার কারিকাসংখ্যা ৩৮টী, অদ্বৈত প্রকরণ, উহার কারিকাসংখ্যা ৪৮টী এবং (৪) অলাতশান্তি প্রকরণ, উহার কারিকাসংখ্যা ১০০টী —মোট কারিকাসংখ্যা ২১৫টী।

শেষ তিনটী প্রকরণের কারিকাগুলি ক্রমবদ্ধ কিন্তু প্রথম প্রকরণের কারিকাগুলি মাণ্ডূক্য-উপনিষদের বাক্যগুলির সহিত মিলিতভাবে বর্ত্তমান। যথা ষষ্ঠ বাক্যের পর নয়টী, সপ্তম বাক্যের পর নয়টী, একাদশ বাক্যের পর পাঁচটী এবং দ্বাদশ বাক্যের পর ছয়টী কারিকা সন্নিবেশিত আছে। আগমপ্রকরণে ২৯টী কারিকাগুলি এইভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অদ্বৈতমতে মাণ্ডূক্য উপনিষদের বাক্যগুলি শ্রুতিরূপে স্বীকার করা হয় এবং কারিকাংশটী গৌড়পাদরচিত বলা হয়। কিন্তু মধ্ব বা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতে প্রথম প্রকরণের কারিকাগুলি মাণ্ডূক্য উপনিষদের অংশ ও শ্রুতিরূপ বলা হয়। এই কারিকাগুলি গৌড়পাদকৃত নহে, অন্তিম তিনটী প্রকরণের কারিকাগুলি গৌড়পাদকৃত বলা হয়।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এই দুইটী মতই ভ্রান্ত। তাঁহাদের মতে গৌড়পাদ কেবল ২১৫টী কারিকা মাত্রই রচনা করেন নাই, কিন্তু মাণ্ডূক্য উপনিষদের বারটী বাক্যই গৌড়পাদের রচিত। এ স্থলে যাহা বলা হইল উহা প্রচলিত মতানুযায়ী বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ফলতঃ পণ্ডিতগণ গৌড়পাদবিষয়ে একমত নহেন।

ডাঃ বালেসর (Walleser) বলেন (Der Altere Vedanta, p 5), মাণ্ডুক্য কারিকা খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়। আমাদের মনে হয় এটা Christian prejudice অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের গোঁড়ামির ফল। কারণ, যিশু খৃষ্টের পূর্ব্বে জগতে আলোক ছিল না। তাঁহার মতে গৌড়পাদ কোনও ব্যক্তির নাম নহে, উহা এক সম্প্রদায়ের নাম। সুরেশ্বরাচার্য্য নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিতে (৪।৪১) বলেন যে, কারিকাগুলি গৌড়পাদ-অভিমত, দ্রবিড়সম্প্রদায়ের অভিমত নহে। ইহা দৃষ্টে ডাঃ বেলবেলকর ও ডাঃ রাণাডে নিজ নিজ গ্রন্থে বিশেষভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে গৌড়পাদ কোনও ব্যক্তির নাম কিনা। বেঙ্কট সুব্বা রায় নামক পণ্ডিত জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সন্দেহ অমূলক। এজন্য Indian Antiquary, Oct, 1933, pp 192-3 দ্রষ্টব্য। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে আছে—(৪।৪১-৪৪)

কার্য্যকারণবদ্ধৌতাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ॥
অন্যথাগৃহ্ণতঃ স্বপ্নং নিদ্রাতত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে॥
তথা ভগবৎপাদীয়ম্ উদাহরণম্—
সুষুপ্তাখ্যং তমোঽজ্ঞানং বীজং স্বপ্নপ্রবোধয়োঃ।
আত্মবোধং প্রদগ্ধং স্যাৎ বীজং দগ্ধং যথাভবম্।
এবং গৌড়ৈর্দ্রাবিড়ৈর্ন পূজ্যৈরর্থঃ প্রকাশিতঃ॥

এস্থলে "কার্য্যকারণ" ইত্যাদি শ্লোক দুইটী গৌড়পাদ কারিকার প্রথম প্রকরণের ১১শ ও ১৫শ শ্লোক, এবং "সুষুপ্তাখ্যং" ইত্যাদি শ্লোক শঙ্করাচার্য্যকৃত উপদেশ-সাহস্রীর ১৭শ প্রকরণের ২৬ শ্লোক। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সুরেশ্বরাচার্য্য "গৌড়" পদে গৌড়পাদ এবং "দ্রবিড়" পদে শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ দুইটী শব্দ সম্প্রদায়বাচক নহে।

উত্তরগীতা ও সাংখ্যকারিকার টীকাকারও গৌড়পাদ। কিন্তু তিনি ও মাণ্ডুক্যকারিকা-প্রণেতা গৌড়পাদ অভিন্ন ব্যক্তি নহেন বলিয়া যেন প্রতীত হন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ব্রহ্মসূত্রবার্ত্তিক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—গৌড়পাদ কুরুক্ষেত্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখনও বদরিকাশ্রমে অলকানন্দের পূর্ব্বপারে নারায়ণ পর্ব্বতে গৌড়পাদের গুহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনি শুকদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং তাঁহার সময় কলির প্রারম্ভে, অর্থাৎ আজ হইতে পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে হইবে। আজ কলির বৎসর ৫০৪৮ চলিতেছে, শকাব্দ ১৮৬৯। তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে পূজ্যাভিপূজ্য পরম গুরু বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তাঁহাকে সম্প্রদায়বিৎ বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে গৌড়পাদকে শুকশিষ্য বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যের টীকায় প্রকটার্থকার গৌড়পাদকে শুকশিষ্য বলিয়াছেন। গঙ্গাতীরে বহরমপুরের নিকট 'গৌড়ে' শঙ্করাচার্য্যের সহিত গৌড়পাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এই কথা মাধবীয় শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দেখা যায়। এই কথাটীকে অবলম্বন করিয়া এবং শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদের প্রশিষ্য এই প্রবাদানুসারে পাশ্চাত্য মতানুরাগী আধুনিক পণ্ডিতগণ গৌড়পাদকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। কতিপয় বৌদ্ধমতানুরাগী দেশীয় পণ্ডিতও গৌড়পাদের মতবাদকে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের মতের প্রতিধ্বনি বলিয়া থাকেন। কারণ উভয়ের মতের, এমন কি বাক্যের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বা ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু এই কথার অন্যদিকও আছে; সেই দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই গৌড়পাদের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলিতে

হয়। সাদৃশ্যবশতঃ একজনকে অপরের নিকট ঋণী বলিবার পূর্ব্বে অন্য প্রমাণ সাহায্যে দেখা আবশ্যক যে, কে প্রাচীন এবং কে অপ্রাচীন। প্রথম মতের দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, গৌড়পাদের মত উপনিষদের মত। উপনিষদ্ ভগবান্ বুদ্ধেরও পূর্ব্বের গ্রন্থ, তৎপরে আর্য্যগ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠের মতই গৌড়পাদের মত ইহা অতি স্পষ্ট। অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রাচীন ঋষি আচার্য্য ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব। এই বশিষ্ঠদেব সৃষ্টির প্রারম্ভের ঋষি, সুতরাং বুদ্ধদেবের বহু পূর্ববর্ত্তী, এমন কি বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্র অনুসারে ত্রেতাযুগের রাবণের উপদেষ্টা যে বিরজ নামে আদি বুদ্ধ তাঁহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং মতের দিক্ দিয়া দেখিলেও গৌড়পাদের মত বৌদ্ধমতের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মত। তাহার পর গৌড়পাদের আবির্ভাবকালের দিক্ দিয়া চিন্তা করিলেও দেখা যায়, ২৩শ. গৌতম বুদ্ধ, আজ হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত। কিন্তু গৌড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য এবং মতান্তরে শিষ্য ও পুত্র উভয়ই। সুতরাং গৌড়পাদ কলির প্রারম্ভের ব্যক্তি অর্থাৎ ৫০০০ হাজার বৎসরের পূর্বের ব্যক্তি। আর শুকদেবের শিষ্য যে গৌড়-পাদ, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের প্রকটার্থটীকায় স্পষ্ট ভাবেই কথিত। শ্বেতাশ্বতরভাষ্য কোন্ সময়ে রচিত, তাহা ঠিক নির্ণীত না হইলেও প্রকটার্থ-টীকা যে ভামতীকারের অতি নিকটবর্ত্তী কালে রচিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। ভামতীকার আজ প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন। অতএব আবির্ভাব কালের দিক্ দিয়া চিন্তা করিলেও নাগার্জ্জুন অপেক্ষা গৌড়পাদ প্রাচীন। আর তজ্জন্য ঋণী যদি এস্থলে কেহ হইয়া থাকেন, তিনি নাগার্জ্জুনই হইবেন। পরবর্ত্তীই ঋণী হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তীর নিকট ঋণী হইতে পারেন না।

যদি বলা যায়, গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার, গৌড়পাদের শিষ্যের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, —এই সকল কথার অনুরোধে গৌড়পাদ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে হন না, কারণ, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৬৮৬ অব্দ হইতে ৭২০ অব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন ইত্যাদি, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক প্রবাদানুসারে গৌড়পাদের যোগসিদ্ধিতে বিশ্বাস করিলে কোনরূপ অসঙ্গতিই থাকিতে পারে না। আর যোগসিদ্ধিতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে সহস্র বৎসরের প্রাচীন প্রকটার্থকারের বাক্যানুসারে গৌড়পাদের শুকশিষ্যত্ব—সুতরাং বুদ্ধদেব এবং নাগার্জ্জুন প্রভৃতি হইতে প্রাচীনত্ব স্বীকারে কোন বাধা হইতে পারে না। কারণ, এই দুই পক্ষের প্রমাণ অপেক্ষা গৌড়পাদের প্রাচীনত্বের প্রমাণের বল অধিক হইতেছে। অতএব গৌড়পাদের অপ্রাচীনত্ব বা বৌদ্ধঋণের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়। গৌড়পাদ সম্বন্ধে অন্য কথা স্থানান্তরে সন্নিবিষ্ট করা হইল। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ভগবান্ গোবিন্দপাদের পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

"উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও গীতা

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, বি-এ

বলা বাহুল্য আমরা বর্ত্তমানে এক গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে যদিও আমরা স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি তথাপি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ম এখনও যথেষ্ট চেষ্টা-যত্নের প্রয়োজন রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় আমরা সকলেই অধুনা সেই অবস্থাদ্বারা আক্রান্ত। এই অবস্থায় কি করিয়া আত্মরক্ষা, পরিবার-রক্ষা, সমাজরক্ষা ও দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা করা যায় তাহাই ভারতবাসী—বিশেষতঃ হিন্দুজাতির নিকট প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গুরুতর সমস্যার চাপে ভারতীয় সনাতন আদর্শ ত্যাগ সেবা নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতা পরলোকবাদ সকলেই যেন চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই আর ঐ সব বিষয়ে ভাবিবার অবকাশ পাইতেছেন না এবং বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আবার ঐ সকল বিষয়গুলিকে উন্নতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করিয়া ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা ও কার্য্য সম্পূর্ণ পরিহার করতঃ রাজনীতি ও সমাজনীতি দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছেন। বস্তুতঃ ইদানীং এক দারুণ ইহকাল-সর্ব্বস্বতা যেন আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। এই ঘোর দুর্বিপাকের মধ্যে আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি, সেই সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতে পাই গীতা আমাদের কোন পোষাকী ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না। গীতা আমাদের এমন কথা বলে না যে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা কেবল সুখকর পরিস্থিতির মধ্যেই কার্য্যকরী, অশুভের মধ্যে কার্য্যকরী নহে। যে ধর্ম্ম কেবল সুখের মধ্যেই প্রতিপাল্য সে ধর্ম্মের মূল্য কি? সেরূপ ধর্ম্ম শুধু তোতা পাখীর রামনাম বলার মতই নিরর্থক। যে ধর্ম্ম আমাদিগকে সুখের সময় যেমন, দুঃখের সময়ও তেমন সাহায্য করিতে পারে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মপদবাচ্য। এজন্য আমরা গীতার প্রথম অধ্যায়েই দেখিতে পাই গীতার শাশ্বত ধর্ম্মের বাণী আরম্ভ হইয়াছে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে যাহা আদৌ সুখকর নহে। উহা আরম্ভ হইয়াছে এক ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রে—যুদ্ধকামী দুই সৈন্যদলের মধ্যস্থলে। যদি এইরূপ ভীষণ অবস্থার মধ্যেও ধর্ম্মের বাণী প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তবে বর্ত্তমান গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যেও তাহা প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না কেন?

এইরূপ অবস্থার মধ্যে মায়া-মোহ ও ভয় দ্বারা অভিভূত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের মুখ হইতে যে প্রথম বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, উহাই এক্ষণে আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবান বলিতেছেন—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

"হে অর্জ্জুন, কি হেতু এই বিষম সঙ্কট-

কালে আর্য্যগণের অযোগ্য অধর্ম্মকর ও অযশস্কর এই মোহ উপস্থিত হইল? হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, কেননা ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধের জন্য) উত্থিত হও।" সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভগবন্মুখোচ্চারিত এই 'অভীঃ'-বাণীই নানা বিঘ্ন বিপদ নৈরাশ্য দুর্য্যোগের ভিতর হিন্দু জাতিকে উৎসাহিত করিয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে উহাই আমাদিগকে উৎসাহিত করিবে সন্দেহ নাই। এই দুঃসময়েও ঐ বাণী আমাদের প্রত্যেককেই উৎসাহিত করিয়া যেন বলিতেছে: হে মানব, দুর্ব্বল হইও না, কারণ দুর্ব্বলতা পাপ। উহার পরিণাম ইহলোকে অখ্যাতি, পরলোকে নরকভোগ। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। কোন দুর্ব্বলতাই তোমাতে শোভা পায় না। তুমি যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সন্তান; তাঁহার অনন্ত শক্তির উত্তরাধিকারী। সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্' পরম পুরুষেরই অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তুমিই যে তিনি—'তত্ত্বমসি'। অতএব ভীত হইতেছ কেন? কেন সিংহশাবক হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মেষশাবকের মত আচরণ করিতেছ? এই মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হও; আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া সকল ভয়-ভাবনা ত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মে অবহিত হও। বর্ত্তমান যুগে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির মুখেও আমরা এই অভীঃ-বাণী শুনিতেছি। উহাই এখন আমাদের প্রধানতঃ অবলম্বনীয়।

যে কোন অবস্থার মধ্যে নির্ভীকভাবে স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠানই গীতার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি ইহার পরের কথা। ঐ শিক্ষাই আমাদিগকে বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতে হইতে। তবে স্বধর্ম্ম বলিতে গীতা কি বুঝাইয়াছে তাহা একটু ভাবিবার বিষয়। এই কথাটি পণ্ডিতদেরও একটি বিতর্কের বিষয়। অনেকেই উহাকে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু গীতোক্ত 'গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ' গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অধুনা লোপ হওয়ায় উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা এখন দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় "স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মসংস্কার-প্রাদুর্ভূত সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের তারতম্য দ্বারা গঠিত যে বিশেষ প্রকৃতি তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যথা—সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণী ক্ষত্রিয়, রজঃস্তমোগুণী বৈশ্য, এবং তমোগুণী শূদ্র, এই ভাব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যে ত্যাগ বা যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম তাহাই গীতোক্ত কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এই দুইটি বাক্য মিলাইলে গীতোক্ত স্বধর্ম্ম বলিতে স্ব স্ব প্রকৃতি, জন্ম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী জীব জগৎ ও শ্রীভগবানের সেবা করাই স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করা বোধ হয় ভুল হইবে না। এই স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম বলিতে কেবল মাত্র যাগ যজ্ঞ পূজা হোম অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম বুঝায় না। উহা দ্বারা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, রাজ্যশাসন প্রভৃতি ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম, কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যোচিত কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক শূদ্রোচিত কর্ম্ম সকলই বুঝাইয়া থাকে। আপন আপন রুচি, প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী উহার যে কোন একটী দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কামচিত্তে জীব জগৎ ও ঈশ্বরের সেবা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে,

এ কথাই গীতার অভিপ্রেত। গীতাকার বলিতেছেন :

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা জন্মে, যাঁহার দ্বারা এই সমুদয় ব্যাপ্ত, মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) স্পৃহা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে। ত্যাগ ও সেবার যে মহান্ আদর্শ আমরা গীতোক্ত এই বাণী হইতে পাইয়া থাকি তাহাই অধুনা আমাদের বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয়

ভগবৎসেবাবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে স্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি বলিতে গীতাকার যে সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি বা মুক্তি। কেবল মাত্র মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ ভাবে স্বকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সংসিদ্ধি লাভ সম্ভব। তাঁহাদের পক্ষেই 'স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ' এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, যাঁহারা ইহলৌকিক সুখভোগে এখনও বিতৃষ্ণ হইতে পারেন নাই —যেমন সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তির সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে—তাঁহাদের সম্বন্ধে গীতাকার কি ব্যবস্থা দিয়াছেন? গীতাকার তাঁহাদিগকেও নিরুৎসাহ করেন নাই। বরং সকামভাবে হইলেও স্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখলাভ সম্ভব একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। গীতাকার বলিতেছেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

যদি তুমি নিহত হও তাহা হইলেও নিশ্চিতই স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কুন্তীনন্দন, তুমি স্থির সংকল্প যুদ্ধ কর। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগও যে স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্ভব গীতার এই বাণী হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ ও হইবে না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

'অজ্ঞান ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্ম করাইবেন।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গীতাকার সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষেই অকর্ম্মণ্যতা যে একেবারে পরিহার্য্য একথা উপদেশ করিয়াছেন। ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন ভারত-ভারতীকে এক্ষণে গীতা হইতে এই তীব্র কর্ম্মপ্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে। উহা সকাম হউক, নিষ্কাম হউক কোনটায় আপত্তি নাই।

গীতার আর একটী বাণী—তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া তোমরা পরম শ্রেয় লাভ করিবে। গীতার এই বাণী আমাদিগকে ব্যক্তিতন্ত্র বস্তু হইতে সাবধান হইতে বলিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা উদার হইয়া পরস্পরের জন্য ভাবিতে শিখিব ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। সমষ্টির কল্যাণে যে ব্যষ্টিরও কল্যাণ এ কথা যেন বিস্মৃত না হই। বর্ত্তমানে আমরা যে বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি তাহার কারণ সমষ্টির অবহেলা। ব্যক্তিগত সুখের প্রলোভনে আমরা সমষ্টিগত সুখকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আর তাহারই ফলস্বরূপ এই যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মকলহ, বৈদেশিক শাসন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। যদি আমাদের বাঁচিতে হয় তবে এখনও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায়, ব্যক্তিগত তুষ্টি-পুষ্টির ন্যায় দেবলোক, পিতৃলোক, নরলোক এবং ইতর প্রাণিসকলের

তুষ্টি পুষ্টির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতে হইবে। প্রাচীনদের ন্যায় সাধ্যানুসারে যুগোপযোগী উপায়দ্বারা দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইতে হইবে। তদ্ব্যতীত কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন দিকেই উন্নতির আর উপায় নাই। গীতাকার তাই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।

"হে কুরুসত্তম, যজ্ঞানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তির ইহলোক নাই, অন্য বহু সুখপূর্ণ পরলোক কোথায়?" আধ্যাত্মিক উন্নতি ত দূরের কথা লৌকিক উন্নতির জন্যও আমাদিগকে পরস্পরের সেবক হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন। আজ কাল আমরা সাম্যবাদ, সমাজ-তন্ত্রবাদ, গণতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। রাসিয়া এবং ইউরোপের অন্য কোন কোন রাজ্য নাকি উহা দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, সুতরাং ভারতেও উহার প্রচার আবশ্যক, ইহা অনেকের অভিমত। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই—ভারতবর্ষ কখনও ইউরোপকে অনুকরণ করিতে পারে না। কারণ তাঁহার সনাতন ঐতিহ্যের সহিত ইউরোপের ঐতিহ্যের কোন সাদৃশ্য নাই। তাহার সহস্র সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবন-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সে যে এখন অত্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জাতীয় জীবন গঠন করিবে, ইহা কখনও সম্ভব ও সঙ্গত হইতে পারে না। ভারতেও সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তবে তাহা ব্যবহারিক ভিত্তিতে কার্যতঃ অনুষ্ঠিত হয় নাই। ব্যবহারিক ভিত্তিতে গণতন্ত্রবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, একথা ভারতীয় জাতির গঠনকর্ত্তা আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন। এই বহুধাবিভক্ত সৃষ্টির অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টিদ্বারা "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" বলিয়া অভিহিত যে পরমপুরুষের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন সেই পরমপুরুষের মধ্যেই যে সকল ভেদবিবাদের অবসান হইতে পারে, একথা তাঁহারা তীরস্বরে প্রচার করিয়াছেন। গীতাকার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো
　যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম
　তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

"যাহাদের মন সমতায় অবস্থিত ইহলোকে থাকিয়াও তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সমভাবাপন্ন। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত আছেন।" গীতা আবার বলিতেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

"বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল গরু হস্তী কুকুরের প্রতি জ্ঞানিগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন।" অন্যত্র আবার গীতা বলিতেছেন:

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

"হে অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বজীবের সুখ বা দুঃখ আপনার সুখদুঃখের ন্যায় সমান দেখেন সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই আমার অভিমত।" জগতের কোন গ্রন্থে ইহা অপেক্ষা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার উচ্চতর বাণী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সাম্যের শিক্ষা করিতে আমাদিগকে ইউরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। উহা আমাদের শাস্ত্রে—বিশেষ করিয়া গীতার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। কয়েক শতাব্দী যাবৎ কি ব্যবহারিক কি আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের শাস্ত্রকথিত এই সাম্যের বাণী প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।নীত

এখন তাহার বিষময় ফল আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে। বর্তমানে আমাদের গীতা হইতে এই সাম্যের মহান্ শিক্ষা পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়া পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠনে ব্রতী হইতে হইবে। ধর্মক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে "সূত্রে মণিগণা ইব" যে একত্ব আছে তাহার আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বধর্মসমন্বয়সাধনে তৎপর হইতে হইবে। ব্যবহারক্ষেত্রেও উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, শাসক-শাসিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আর্য্য-ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকল ভেদ বিভেদের মধ্যে এক সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিয়া তদনুযায়ী জাতি-গঠনে প্রয়াসী হইতে হইবে। এক কথায় আবার আমাদের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত একত্বকে মূলভিত্তি করিয়া বর্ত্তমানে ধর্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি প্রচলন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন জাতীয় উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ব হইতেই ভারতে এই সমন্বয়ের কার্য্য হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী দয়ানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় মনীষিগণ আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই সমন্বয়ের কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। আমরা সমগ্র জাতি যত শীঘ্র তাঁহাদের আরব্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

যুগপ্রয়োজনে যুগনায়কগণ-কর্তৃক যে মহা-সমন্বয়ের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে সেই কার্য্যে সহায়ক না হইয়া যাঁহারা এখনও ধর্ম্ম, জাতি, আভিজাত্য, প্রভুত্ব লইয়া কলহে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারা জাতীয় উন্নতির ঘোর শত্রুতা সাধন করিবেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহতী বাণী ও শিক্ষা ধারণ ও পালন করিবার সামর্থ্য আমাদিগকে দিন, ইহাই তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা।

মহাপ্রাণ

শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

জীবন নিয়ত চলিছে বহিয়া মৃত্যুর পারাবারে
অস্তরবির শেষ ম্রিয়মাণ ছবি
নবীন কাটিছে প্রবীণত্বের নিত্য-নূতন রশি,—
গমনের পথে চির লীয়মান সবি।

নিরাশা-আঁধারে বেষ্টিত সেই ভয়াল গম্যপথে
লেলিহান শিখা আপনা মেলিয়া আছে,
ভুল স্রোতোপরে বেড়াজাল বেড়ি' ভুলায়ে সকল দিক
অহরহ তাহা টানিতেছে নিজ কাছে।

জীবন আধার বাড়ব অগ্নি—মহাদাবানল পরে
সিদ্ধ হতেছে অনন্তকাল ধরি।
পরিবর্তন বিবর্তনের গতি মাঝে সক্রিয়
ধ্বংস করাল ভ্রূকুটি তুচ্ছ করি'।

রুদ্র প্রকৃতি, দারুণ দীপ্ত শক্তির সমারোহে
ধ্বংসের পথে নিত্য নূতন চড়ে
সে কুটিল রোষ, নব উন্মেষে করিতে ব্যর্থপ্রায়
মানবশক্তি প্রতিকূলতায় বরে

ধ্বংস সৃজন গতিপথ মাঝে জীবন-দোলক রাজে
আয়ুপরিমাণ যায় বলা হাত গণি'।
মায়ের কাতর আহ্বান শু'নে যখনি সে দেয় সাড়া
সফল অমর থাকে সে চিরন্তনী।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

একদিন বেলুড় মঠে বৈকালে তিনজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছায় অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। মহাপুরুষজীও কোনমতেই রাজী হন না, কিন্তু প্রাণ তাঁর মাখন দিয়ে গড়া, কতক্ষণ আর স্থির থাকতে পারেন? ভদ্রলোকের আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাঁর চিত্ত বিগলিত হল। তিনি তাঁর সেই অপরূপ, ধ্যান-স্তিমিত, পরম পবিত্র স্নেহমাখা চক্ষু দুটী এমন ভাবে ভদ্রলোকের মুখের উপর ফেললেন যে আমার তখন মনে হল মহাপুরুষজী ভদ্রলোকের জীবনের অতীত, ভবিষ্যৎ, প্রারব্ধ, সঞ্চিত কর্ম্ম সব যেন এক দৃষ্টিতে বেশ করে দেখে নিলেন ও পরে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তাঁকে দীক্ষাদান করতে স্বীকৃত হলেন। এর পূর্ব্বে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর ও অপর কয়েকজনের সহিত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি ওরূপ দৃষ্টিপাত একবারও করেন নি। আর একবার এক ব্যক্তি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে এসে দীক্ষাপ্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন, "আমরা কি গুরুগিরি ক'রে বেড়াই, তাই এখানে দীক্ষা দীক্ষা করছ? আমাদের কি গুরুগিরি ব্যবসা? আমরা কি ব্যবসা খুলেছি? এখানে দীক্ষা কি? দীক্ষা টীক্ষা ওসব হবে না; এসেছ, ঠাকুর দর্শন কর, প্রসাদ নাও, ব্যস্।" তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান আমরা সব তখন তাঁর কাছেই বসে ছিলাম। ভদ্রলোকটীও আর কোন কথা না ব'লে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন। এরূপে দেখেছি মহাপুরুষজী লোক চিনে তবে তাঁদের গ্রহণ করতেন এবং যাঁদের তিনি গ্রহণ করতেন তাঁদের সহিত তাঁর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ত তা নিত্য, সত্য।

মহাপুরুষ মহারাজ সবে দাক্ষিণাত্য থেকে মঠে ফিরেছেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব। আমার ছোট ভাইকে নিয়ে মঠে গিয়েছি। গঙ্গাস্পর্শ ক'রে মহাপুরুষজীকে দর্শন করবার জন্য তাড়াতাড়ি ভোগের স্থানে যাচ্ছি। মহাপুরুষজী আমাকে দেখে দূর হতেই সহাস্য বদনে আমার নাম উচ্চারণ করে অতি স্নেহভরে আহ্বান করলেন। আমরা দুজনে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হলাম। কিছুদিন ব্যবধানের পর শ্রীগুরুদর্শনে জীবন ধন্য বোধ করলাম। এ ত আর গুরুগিরি করা গুরু নন! সাক্ষাৎ মহেশ্বর গুরুরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে কত লোককেই শ্রীচরণে স্থান দান করে উদ্ধার কচ্ছেন! জীব-উদ্ধার-কার্য্যের জন্যই ঠাকুর তাঁকে দীর্ঘকাল জগতে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি যে তাঁর আশ্রিত শিষ্যের জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা—তার জীবনসর্ব্বস্ব! অহেতুক কৃপা-সিন্ধু সেই গুরুমূর্ত্তি দর্শন কচ্ছি ও প্রাণের ভিতর আনন্দের তরঙ্গ ছুটছে। এমন সময় মহাপুরুষজী আমার ছোট ভাইকে দেখে বললেন, "এটী ভাই বুঝি, বেশ ছেলে।" মহাপুরুষজী মঠের এক প্রকোষ্ঠে অবস্থিত হয়ে যে যে ভাগ্যবানকে আকর্ষণ করতেন, তাঁদের তাঁর কাছে আসতেই হত, যত দূর দূরান্তরনীত

লোকই তিনি হন না কেন। দূরেই বা বলি কেন? সদ্‌গুরু যে নিয়ত শিষ্যের কাছেই থাকেন, স্থূলদেহে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তাঁর উপস্থিতির কোন ব্যত্যয়ই হয় না। তিনি পিতা, শিষ্য তাঁর সন্তান, তাঁর আশ্রিত, তাঁর প্রতিপাল্য। শিষ্য তার সব দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করে আনন্দে সংসারে বিচরণ করে। জগতে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তার কোনটীরই সহিত এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের তুলনা হয় না। ইহা অপার্থিব। শিষ্যের নিকট গুরুই মোক্ষদাতা ভগবান। গুরু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়তই শিষ্যের প্রাণে সঞ্চার কচ্ছেন।

মহাপুরুষজীর নিকট তাঁর কৃপা প্রার্থনা করারও প্রয়োজন ছিল না। একদিন ঐরূপ করায় বলেছিলেন, "ও কথা আর বাইরে বলার আবশ্যক কি? আমি ত তোমার হৃদয়েই আছি, ঠাকুর তোমার হৃদয়েই আছেন।" শিষ্য যখন তার পরমারাধ্য উদ্ধারকর্ত্তার নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে এই কথা শোনে, তখন কি তার আর কোন উদ্বেগের কারণ থাকে? গুরুস্নেহের ইহাই পরাকাষ্ঠা। মহাপুরুষজী তাঁর আশ্রিত শিষ্যগণকে এরূপ স্নেহই করতেন। কখন কখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কথার অনুকরণে তামাসা করেও তাঁর স্নেহ দেখাতেন। হয় ত বললেন, "হ্যাশের খবর কি?" "যাবা কনে?" তারপর তিনি তাঁর সেই ভুবনভোলান হাসি হাসতে লাগলেন। সে দিব্য হাসি আজও প্রাণে আনন্দ জাগিয়ে দেয়। কখন কখন তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে বিদায় নেবার সময় ব্যাকুলভাবে বলতেন, "তবে যা, ঠাকুর দর্শন করে যা, আর কিছু প্রসাদ নিয়ে যা; তবে যা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা!" আবার কোন্ পথে যেতে হবে, কতটা হাঁটতে হবে ও কতটা পথ বাসে যেতে হবে তারও হিসাব দি[illegible]ন। প্রাতে তাঁর শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হলে বলতেন, "কি রে, কেমন আছিস্? সকালে কি খাস? মাখন আছে, মিছরি আছে, মিষ্টি আছে।" বলার পর তাঁর সেবককে প্রসাদ দেবার জন্য ডাক দিতেন বা তাঁর কাছ হতে নিতে বলতেন। কখন বা মুখুজ্যে মশায়, মুখুজ্যে মশায় বলেই কত আনন্দ করতেন। এই বিশুদ্ধ আনন্দের ভাগ, যাঁরা যাঁরা তাঁর ঘরে সে সময় উপস্থিত থাকতেন, তাঁরাও পেতেন। গৃহী শিষ্যগণের সংসারের বা কাজকর্ম্মের সব খবর নিতেন ও তাদের জীবনযাত্রার বিষয়েও চিন্তা করতেন। একবার টাকা দিয়ে প্রণাম করাতে বলেছিলেন, "তোমার আয় কম, টাকা দিবার কি দরকার? তবে গুরুকে কিছু দিতে হয়। তা তোমার সন্ন্যাসী গুরু, টাকা দিতে হবে কেন? এত আর ব্যবসায়ী গুরু নয়! তোমার দান অবশ্য নিলুম, কিন্তু আমিই আবার তোমায় দিচ্ছি, তুমি টাকা দুটী নিয়ে যাও, কিছু কিনে নিয়ে যেও বা সংসারে খরচ করে ফেল।" রাত্রিতে মঠে থাকলে কোন্ ঘরে থাকা হবে, রাত্রির আহার কিরূপ হল, ঘুম হয়েছিল কিনা ও মশারি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিল কিনা তৎসমুদয় অতি স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করতেন।

১৯৩২ সালের জুলাই মাস। মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তত ভাল নয়, কাজেই দর্শনপ্রার্থীদের যখন তখন দর্শন হওয়া সম্বন্ধে কিছু কড়াকড়ি করা হয়েছে। ঐ সময়ে আমি একদিন অপরাহ্ণে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কচ্ছি। মহাপুরুষজীর সেবক চোখের ইঙ্গিতে আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছেন। আমিও কাতর প্রাণে তাই মেনে নিলুম। এ দিকে মহাপুরুষজী সেবকের চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?" সেবক বললেন, "উ—বাবু।" মহাপুরুষজী অমনি

বললেন, "তাড়াচ্ছ কেন?" যেমন এই কথা বলা, অমনি সেবক আমাকে ঘরে প্রবেশ করার জন্য হাসতে হাসতে পুনরায় চোখের ইঙ্গিত করলেন। এই দীন সন্তানের প্রতি তাঁর অপার স্নেহের বিষয় চিন্তা করতে করতে অতি আনন্দিত মনে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তারপর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঘরে তিনি ও আমি। শিবরূপী গুরু উপবিষ্ট, শিষ্য সেবারত। সেই দৃশ্য ভুলবার নয়। মহাপুরুষজীর বাসঘরটি তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণের নিকট কৈলাসতুল্য। তিনি যে তাঁর এই সেবকটিকে আপন করে নিয়েছিলেন ইহা তাঁর অহেতুকী করুণা। একবার আমার এক আত্মীয়া জলপাইগুড়ি হতে মঠে এসে মহাপুরুষজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি আমার পরিচয় দেন নি, পরে মহাপুরুষজী যখন শুনলেন যে তিনি আমার আত্মীয়া তখন তিনি বলেছিলেন, "তবে ত আমাদের ঘরেরই লোক।" এই ঘটনাটিও তাঁর অপার করুণা ও শিষ্যবাৎসল্যেরই পরিচায়ক।

শিষ্য যদি তাঁর জন্য কোন দ্রব্য মঠে নিয়ে যেতেন, তা' তিনি কৃপা করে গ্রহণ করতেন ও শিষ্যের প্রাণে শান্তি দান করে তাঁকে কৃতার্থ করতেন। একদিন তাঁর জন্য কিছু গাওয়া ঘি নিয়ে গিয়েছিলাম। উহা তাঁকে নিবেদন করে বললাম, "মহারাজ, একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আপনার জন্য যেন কিছু গাওয়া ঘি এনেছি; আপনি উহাতে বললেন—গাওয়া ঘি ত অমৃত।" এই কথা শুনে বলেছিলেন, "তা ঠিক, গাওয়া ঘি অমৃতই বটে।" সময় সময় তাঁর স্নেহ দেখাবার ছলেই যেন কত সাধারণ কথাও জিজ্ঞাসা করতেন। যথা—ওখানে (লেখকের কর্ম্মস্থানে) ওল পাওয়া যায় কি না, নারিকেল হয় কি না, কোথাকার জল খাও, কোথায় স্নান কর—ইত্যাদি। শিষ্যদর্শনেই তাঁর শিষ্য-বাৎসল্য উথলে উঠত। একদিন তাঁর নিকট রয়েছি, এমন সময় তাঁর সেবক ঘরে আসলেন। মহাপুরুষজী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "উ—এসেছে।" যেন উ—র আসাটা তাঁর বড়ই আনন্দের বিষয় হয়েছে! আবার তাঁর সেবাকার্য্যেও অধিকক্ষণ থাকতে দিতেন না। ভাবতেন ওতে শিষ্যের কতই কষ্ট হচ্ছে ও তার প্রাণে কষ্টের সঞ্চার করছে। একদিন সকালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পদসেবা কচ্ছিলাম; যে পাদপদ্ম আমার ভবসমুদ্রের তরণী তার স্পর্শ পাওয়া আমার পক্ষে কতই ভাগ্যের কথা। কিছুক্ষণ বাদে তিনি বললেন, "এ বেটার মাজা ধরে গেল"—কিছু পরে আবার বললেন, "তুই যা, স্নান টান করগে যা।"

মহাপুরুষ মহারাজকে দেখলে সাধারণতঃ খুবই গম্ভীর ও রাসভারি বলে মনে হত। মঠের জনৈক সাধু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদি মহাপুরুষজীকে তাঁর ঘরের নীচের ছোট বারান্দায় উপবিষ্ট দেখতাম ত আমরা তাঁর সামনে দিয়ে গঙ্গার ঘাটে যেতে পারতাম না, গঙ্গার ধারের ঘরের দক্ষিণ দিয়ে ঘুরে ঘাটে যেতাম। তিনি তখন এতই গম্ভীর ছিলেন! কিন্তু যাঁরা মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জানেন তাঁর প্রাণ কত কোমল ছিল। বাহিরে গম্ভীর, ভিতরে স্নিগ্ধ! তাঁর কোমল প্রাণের একটী উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। মা তাঁর সন্তানকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াতেই চান, মার প্রাণের এটা স্বাভাবিক বৃত্তি। মহাপুরুষজীরও ছিল তাই। ১৯৩৩ সালের ১০ই জানুয়ারী—তুরীয়ানন্দজীর জন্মতিথি—মঠে একটী ছোটখাট উৎসব। ঐ উপলক্ষে আনীত

বড় বড় মাছ মঠের অনেক সাধু মহাপুরুষজীকে দেখিয়ে ও কি কি রন্ধন হবে—তা' বলে গেলেন। আমি কিন্তু সেদিন প্রাতে কলকাতা চলে যাব মনে করে তাঁকে প্রণাম করতে গেছি। তিনি আমাকে বললেন, "আজ তোমার নিমন্ত্রণ।" আমি কলকাতা যাওয়ার কথা উত্থাপন করায় বল্লেন, "কাজের ত কিছু ক্ষতি হবে না, তবে আর কি? আজ তোমার নিমন্ত্রণ, খেয়ে যাবে।" এইরূপে ছোট ছোট ব্যাপারেও দেখা যায়, শিষ্যের প্রতি তিনি কিরূপ মাতৃবৎ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। আবার গৃহী শিষ্যগণের সন্তানসন্ততিদেরও তিনি কত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। আমার ছোটছেলে তাঁর গড়গড়া ধরে টানাটানি করত, তখন মহাপুরুষজী তামাক খেতেন, তিনি তাতে বিরক্ত না হয়ে আনন্দিতই হতেন। যখনই তাকে মঠে নিয়ে যেতাম, তখনই তাকে সন্দেশ কমলালেবু প্রভৃতি যখন যা থাকৃত দিবার জন্য সেবককে আদেশ করতেন। একদিন মঠে গিয়েছি, তিনি বলতে লাগলেন—"হাঁরে—গোপাল মুখুজ্যে কেমন আছে? গোপাল?" আমি কিছুই বুঝ্তে না পেরে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে হতভম্ব দেখে তিনি বল্লেন, "ওরে বেটা, তোর ছেলে।" তখন আমি হাসতে লাগলাম। ছেলের প্রকৃত নাম যোগবিলাস, গোপাল বললে বুঝবই বা কেমন করে? কখন কখন মঠে গেলে জিজ্ঞাসা করতেন, "গোপাল কেমন আছে? তার বয়স কত হল? তাকে মুখে মুখে কিছু শিখাচ্ছিস্ ত? তার মা লেখাপড়া জানে?" ইত্যাদি। যিনি স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যিনি যুগাবতারের লীলাসহচর, যিনি ভূমণ্ডলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে বিরাজিত ও যিনি জগদ্ব্যাপী বিরাট রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তাঁর নিকট হতে এইরূপ ব্যবহার কি তাঁর অপার শিষ্যস্নেহের পরিচায়ক নয়? বাস্তবিকই তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম, উহা আমাদের ধারণারই অতীত। তিনি ছিলেন কোমলতা ও ভালবাসার মূর্তবিগ্রহ।

... ১৯৩৩ সালের ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, ১৩৪০ সাল। বহু দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে আমি ও আমার বন্ধু মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে তাঁকে প্রণাম করবার জন্য প্রবেশ করলাম। নববর্ষে বহু ভক্তসমাগম, সকলেই প্রণামাদি করে চলে যাচ্ছেন। কাউকে কাউকে তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করছেন, সকলকে জিজ্ঞাসা এ উপলক্ষে সম্ভবও নয়। আমার প্রণাম করার পালা আসলে আমাকে বললেন, "উ—কেমন?" হাতে কিছু পান্তুয়া ছিল; দেখে বল্লেন, "ওতে কি? কোথাকার?" আমার বন্ধু বাইরে এসে আমাকে বললেন, "পাঁচশো লোকের মধ্যে দেখলাম উনি আপনাকেই নাম ধরে ডেকে কথা বল্লেন। আপনার ওপর আপনার গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ আছে দেখছি।" এইরূপ ব্যাপার আর একদিন হয়েছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তখনকার কলকাতাস্থ Ramakrishna Mission Students' Home পরিদর্শন করার জন্য মটরকার ক'রে Home-এ উপস্থিত হয়েছেন। বহু গণ্যমান্য দর্শনপ্রার্থী উপস্থিত। মটর হতে নেমেই মহাপুরুষজী প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি করে জানলে যে আমি এখানে আসিব?" তখন আমার নতুন দীক্ষা হয়েছে। তারপর ছোট ছেলেটার মত আমি প্রায় সারা দিন তাঁর কাছে রইলাম। মধ্যাহ্নে তাঁর সেবক আমার হাতে পাখা দিয়ে পৃথক ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। সেই প্রাচীন ঘটনাগুলি প্রাণে কত আনন্দ এনে দেয়। সেই স্মৃতিগুলিই এ জীবনের পাথেয়। মুক্তি-কামী আশ্রিত শিষ্যের তিনি স্নেহময়ী মাতা, করুণাময় পিতা ও ভগবান। মর্তে এ এক ভক্ত-ভগবানের লীলা। যতক্ষণ তিনি লীলার মধ্যে রেখেছেন, আমি আছি ততক্ষণ। এ সেব্য-সেবকের 'আমি' বড়ই মধুর। হে গুরো! তুমি যার প্রতি প্রসন্ন, তার আর ভাবনা কি? সে হেলায় এ ভবসমুদ্র অতিক্রম করবে। তুমি অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন, অনন্তপ্রেমময় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি যখন 'আমি'-কে নাশ করে ফেলবে, তখন যা আছে, তাই থাকবে, মুখে বলার আর কিছু থাকবে না।

জয় হিন্দ্

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গোস্বামী

জয়হিন্দ্ শুধু আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের পারস্পরিক সম্ভাষণ বাণী বা সমর-হুঙ্কার নয়, ইহা ভারতের মুক্তিমন্ত্রও বটে। ইহা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার শব্দপ্রতীক—বাংলার মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা সুভাষের সু-ভাষ বা কল্যাণী বাণী। দেশমাতৃকা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রেম ইহার প্রাণশক্তি বা প্রেরণা, বিশ্বমানবের পূর্ণ মুক্তিই সাধ্য বা লক্ষ্য বস্তু। বাংলার সুভাষের দিব্যদৃষ্টি দেখেছিলো—মানুষ যত বলবানই হোক না, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় বঞ্চিত হ'লে, নিজের মানসিক ও দৈহিক মুক্তিসাধনে সমর্থ হ'লেও জগতের সামগ্রিক মুক্তি সাধন কর্ত্তে পারে না। শারীরিক শক্তিবলে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের শান্তিময় পরিবেশের আশ্রয় ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন অসম্ভব। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অশান্তিপূর্ণ সমাজের বুকে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি জন্মাতে পারেন না। কায়িক, বাচিক এবং মানসিক স্বাধীনতা ভিন্ন পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশও এক প্রকার অসম্ভব। তাই বিশ্বপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ ও আরবের হজরত মহম্মদকেও অশুভ শক্তি নাশ করে মনুষ্যত্ব লাভ নির্ব্বাধ ও সহজ করতে অস্ত্র ধর্ত্তে হয়েছিল।

অহিংস শুভ শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও প্রভাব বিস্তার সহজ করার জন্যই বিশ্বপ্রাণ পরম কারুণিক ভগবানকেও দৃশ্যতঃ হিংসার পথ ধর্ত্তে হয়েছিল। পরমেশ্বরকেও ঝড় বজ্র প্লাবন ধ্বংস আনতে হয় এ জগতের বুকে জীবকুল রক্ষার জন্য। কোরানে ও বাইবেলে আছে—ভগবানও নোয়াকে জাহাজে উঠিয়ে মহাপ্লাবন এনে অসৎকে ধ্বংস করেছিলেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষগ্রন্থ পাঠে জানা যায়—জয় শব্দের দুই অর্থঃ এক অর্থে প্রণাম, অন্য অর্থে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিদ্যমানতা। বঙ্কিমের দিব্য-দৃষ্টি-লব্ধ ষড়ক্ষর মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" এবং সুভাষের চতুরক্ষর "জয় হিন্দ্" মহামন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী একই দেশমাতৃকা। সাধনের দ্বারা সাধকের নিকট এই শব্দরূপ মন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়। এই মন্ত্রের সাধক নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন—শুধু আপনাকে নয়—আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিতে হয় মায়ের শ্রীপাদপদ্মে। এই সাধক দেখেন দেশ-মাতৃকাকে, শুধু কল্যাণময়ী অমৃত ওষধিগণের জননী, সুখদায়িনী মৃত্তিকারূপিণীকে নয়—পরন্তু প্রাণময়ী মানসী—ধর্ম্ম বা সত্য দ্বারা পালিতা অমৃতস্বরূপিণীকে। তিনি জগদ্ধাত্রী জগৎ-পালিনী, জগত্তারিণী বিশ্বাত্মা ভগবানের শক্তির অভিব্যক্তি—স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা, অন্নদা। তিনি মাটির মা নন—চিন্ময়ী।" "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি মায়ের স্বরূপ দেখেছেন—"বাহুতে তুমি মা শক্তি—হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে?" অথর্ব্ব বেদের সত্যদ্রষ্টা ঋষির মানস-ক্ষেত্রে মাতৃশক্তি রূপায়িতা হলে তিনি ভক্তি-বিনম্র চিত্তে বলেছিলেন—"আমার কল্যাণী জন্মভূমি—যিনি ওষধিগণের জননী সুখদায়িনী ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক ধৃতা অক্ষয়া, তাঁকে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়ে সর্ব্বদা

সেবা করব।" * বিশ্বাত্মা অ-রূপ ভগবানের বিশ্বপালিনী, জগন্মঙ্গলা মাতৃশক্তিকে প্রথমে ভারতের ঋষি দর্শন করেন জন্মভূমিরূপে। তাই—"জয় হিন্দ্" "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি মন্ত্ররূপে যুগে যুগে সাধকগণের সাধনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন-রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এ মন্ত্রের সাধক আত্মবলি দিয়ে মায়ের সেবার আনন্দে আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তিনি এ মাটির মা-টিকে জগদাত্মা ভগবানের জগৎপালিনী বিশ্ব-বন্দিনী অ-রূপা কার্য্যশক্তিকে চিন্ময়ীমাতৃরূপে পান। তখন সাধক দেখেন:

দশ দিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি;
রয়েছে জীব যে যেখানে
সবাইকে সে ডেকে আনে,
সবার হাতে, সবার পাতে
অন্ন দেয় সে বাঁটি।
ভরেছে মন গীতে গানে
বসে আছি মহানন্দে,
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।

সাধকের এ প্রাণের সাধনার মহোৎসবে তিনি পান তাঁর সকল সত্তায় আনন্দময়ী মায়ের অমৃত স্পর্শ। এ প্রাণসাগরের মাঝে মহাপ্রাণগণের আত্ম-বিসর্জ্জনের মহোৎসব:

আকাশেতে ঢেউ দিয়েছে
বাতাস বয়ে যায়,
চার দিকে গান বেজে উঠে,
চার দিকে প্রাণ নেচে ছোটে,
গগন ভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।

* বিশ্বগু মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্ম্মণা ধৃতাম্। শিবাং স্যোনামনুচরেম বিশ্ব-হা। অথর্ববেদ ১২।১।১৭

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষঃভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফেরে
বাতাস বয়ে যায়।

সুভাষ বিশ্ব-মুক্তির জন্য প্রেমের এ অমৃত আহ্বান শুনেছিলেন, তিনি সে পাগল-করা ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাণ-সাগরের মাঝে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। আত্মরত-প্রাণ বড় ঠুন্‌কো, একটু আঘাতেই ঢ'লে পড়ে মরণের কোলে; রক্ত-মাংসের পাঁচিলের বাহিরে সে যেতে পারে না। আত্মবিমুখ, পরার্থনিষ্ঠ প্রাণ মরণজয়ী। আত্মজয়ী প্রাণ-সাগরের মাঝে ডুবে মরে; সে মরণে অনন্ত প্রাণের স্পন্দন তিনি প্রাণে পান। অনন্ত জগতের প্রাণ বেজে ওঠে তাঁর প্রাণের সুরে সুর মিলিয়ে।

প্রেমের পাগলকরা ডাক যিনি শুনেছেন, তাঁর দেবার আর কি বাকী থাক্‌তে পারে? তিনি আপনার ক্ষুদ্র রক্ত-মাংসের মরণের মাঝে পূর্ণ মানুষত্বকে পান। নিজেকে বলি দিতে না পারলে, আপনাকে ভালবাসলে, আপনার যশ চাইলে, আধিপত্য চাইলে সে তো আপনারই সেবা! সুভাষের মা, মাটির মা নন—তিনি চিন্ময়ী মানসী, বিশ্বকারণ ভগবানের জগত্তারিণী, বিশ্বপালিকা কার্য্যরূপা শক্তির মাতৃরূপ। ভগবচ্ছক্তির প্রথমাভিব্যক্তি এই মাতৃরূপকেই সুভাষ ভালবেসেছিলেন আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে। বাংলার এই বিশ্বমিত্রকে মিত্র বলে অনেকে চিন্‌তে না পারলেও তিনি বিশ্বমাতার সন্তানগণকে দেখেছিলেন মিত্রের চোখে বিশ্বপ্রাণের প্রেমপরশ এ আত্মভোলা সকলখানি পেয়েছিলেন। তিনি প্রাণ-সাগরের মাঝে ডুবে প্রাণ নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণ পেয়েছেন। কালকাঞ্চনজয়ী স্বদেশ-

প্রেমিক "জগৎ-বিস্ময়", তিনি কণ্টক-মুকুট বলে হীরের রাজমুকুট ফেলে দিয়েছেন। বিয়ের কথা জিজ্ঞেস্ করা হ'লে আত্মভোলা বলেছিলেন—"তা তো ভাববার অবসর পাই নি।" যে আপনাকে একবার হারিয়ে ফেলেছে এ বিপুল বিশ্বের মাঝে, সে আপনার কাছে নিঃশেষে মরে গেছে—তার কি বিয়ের তুচ্ছ কথা ভাববার অবসর হয়?

বঙ্গমাতার এই শ্রেষ্ঠ সন্তান চিরকালই অপরিচিত রইল অন্ততঃ বাংলার কাছে তিনি কখনো ঢাক-পেটা ভক্ত তৈরী করেন নি। এ বিশ্ব-প্রেমিক সর্বত্যাগী সেবানন্দে চিরতৃপ্ত ছিলেন; তাঁর সতীর্থেরাও তাঁরই মত নীরবকর্মী। তাঁকে কল্পনা-বিলাসী বলে অনেকে উপহাস করে। কি কল্পনায়, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি কংগ্রেসে, কি কারাগারে, কি নির্বাসনে সর্বত্রই বাংলার এই সুকৃতী সন্তানের লোকাতীত মহত্ত্ব এবং বিরাটত্ব পরিস্ফুট।

সুভাষ তাঁর জীবনের সাধনার সাধ্য বস্তু বা লক্ষ্য দেখতে পেয়েছিলেন এই জয়হিন্দের মধ্যে। সুতরাং লক্ষ্যসর্বস্বতার জন্য তিনি কি রাজরোষ, কি শত্রুর বৈরিতা, কি নিন্দকের নিন্দা বা ঈর্ষান্বিতের বিদ্রূপ কিছুই জানতে পারেন নি। তাঁর ধ্যানের পবিত্রতার বিমল প্রভায় ইংরেজের অন্ধকারময় কারা জ্যোতিঃপূর্ণ সাধনাগারে পরিণত হয়েছিলো, এবং তাঁকে যে কত উচ্চ হতে উচ্চতর মহত্ত্বে উন্নীত করেছিলো তা তাঁর মান্দালয় জেলের পত্র এবং আমরণ অনশন-সংকল্পজ্ঞাপক ইংরেজ সরকারের নিকট লিখিত পত্র পাঠ করলেই বোঝা যায়। ইংরাজের কারাকক্ষে তাঁর তেজের বিকাশ হয়েছিল বাংলার মরা বুকে জীবনের স্পন্দন জাগাতে, তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতের জগতের মানবাত্মার মুক্তির মহামন্ত্র "জয় হিন্দ্"।

আমরা পূর্বেই বলেছি তাঁর জন্মভূমি মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী, মানসী—বিশ্বাত্মা ভগবানের প্রেমের অভিব্যক্তিরূপিণী সৃষ্টিমূলা মা জননী। জয় শব্দের মানে এখানে নিঃশেষ আত্মোৎসর্গ। তাঁকেই উৎসর্গ যিনি বিশ্বকারণ পরমেশ্বরের কার্যরূপা জগদ্ধাত্রী মোক্ষবিধায়িনী শক্তি। তিনি প্রাণরূপ অন্নে পূর্ণা—অন্নদা। তিনি অরূপ অনামী এবং জয় হিন্দ্ মন্ত্রে অভিব্যক্ত। মায়ের সন্তানগণ অরূপ কারণের অভিব্যক্ত কার্য; তারা ভক্তির দ্বারা মাকে রূপায়িত করেন। সুভাষ—বিশ্বাত্মার কর্মাভি-ব্যক্তরূপ মাতৃশক্তিকে পূজা করে তাঁরই শব্দপ্রতীক "জয় হিন্দ্"এ তাঁকে পেয়েছিলেন। তিনি এই মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানদা মোক্ষদা শক্তিকে স্বদেশরূপে লাভ করেছিলেন, তিনি মাকে অভয়া বলে জেনেছিলেন। মা তাঁকে প্রেম দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর সকল সন্তানকে প্রেমের চক্ষে দেখেছিলেন। যুগে যুগে "জয় হিন্দ্" বা মাতৃ উপাসনা নানা শব্দপ্রতীকে পরিব্যক্ত হয়ে একই মহাসত্য প্রেম বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার করেছে। রসুলের প্রচারিত মহাবাণী মুসলমানের প্রাণের মাঝে যেমন অমৃতনির্ঝর মহম্মদের কথা জাগিয়ে তোলে, তাঁর প্রাণময়ী বাণীর অমৃত শক্তি ও ভগবানের উপাসনা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঠিক তেমনি "জয় হিন্দ্ এর শব্দশক্তি, সাধকের প্রাণের মাঝে জাগিয়ে তোলে মায়ের উপাসনা, স্বাদেশিকতা এবং মায়ের রূপ—মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন এবং কি হবেন। "জয়হিন্দ্" বলতেই স্বাধীনতার সুপ্রভাতের আনন্দ কলরব দেয় প্রাণের মাঝে ঢেউ তুলে, জগৎ আনন্দে দোলে—

বেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী
ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি আনন্দ,
সে কি মা হর্ষ।
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল
গভীর রাত্রি।
বন্দিল সবে জয় মা জননী! জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী।

সাধক বিশ্বকারণ জগদাত্মার কার্যরূপা জননী জন্মভূমি মায়ের সেই মহিমোজ্জ্বল জগন্মোহিনী জগদ্ধাত্রী তারিণী রূপটি দেখতে দেখতে সহসা দেখলেন, মা শৃঙ্খলিতা, শোকাতুরা ভিখারিণী। কি রোমহর্ষণ দৃশ্য। কি মর্মন্তুদ ব্যথা। রাজরাজেশ্বরী মা ভিখারিণী. অশ্রু-স্নাতা! গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র নদের অশ্রুপ্রবাহে প্লাবিতবক্ষা! সে অন্নদা মায়ের চারিধারে কোটি কোটি বুভুক্ষু সন্তান অন্ন দে, অন্ন দে, অন্ন দে, 'মা আমাদের বলে চীৎকার কচ্ছে! মায়ের কোটি কোটি মনুষ্যত্বহারা সন্তান, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই কঙ্কালসার—মায়ের চারিধারে মরণের কোলে অনাহারে ঝরে পড়ছে! শৃঙ্খলিতা অসহায় মা দেখছেন—অর্ধমৃত সন্তানকে জননীর কোল হতে শৃগাল কুকুরে টেনে খাচ্ছে! সর্বত্র নরকের পৈশাচিক কলরব! নর-পিশাচেরা স্নেহ-মমতা ভুলে ভাইয়ের বুকে বিষের ছুরি হানছে! রক্তারক্তি হানাহানি দেখে দেবতা স্বর্গে স্তব্ধ!

আবার সাধক দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, মুক্তশৃঙ্খলা জ্যোতির্ময়ী সর্বশক্তিময়ী মা, শোভাময়ী শান্তিময়ী। তিনি রিপুদলবারিণী দুর্গতিহারিণী, তিনি অন্নপূর্ণা অন্নদা, অজস্র অমৃতদানে ত্রিলোক আপ্যায়িত কর্চ্ছেন। তাঁহার কঙ্কালসার সন্তানগণ চোখ জুড়ানো রূপে জগৎ আলো কর্চ্ছে। তারা মাকে ঘিরে বসেছে, তারা সবাই পবিত্র। এখানে ছোট বড় নেই—অমৃতময়ী মায়ের সন্তান সবাই অমৃত। সে কি আনন্দ! সে কি প্রেম! তারা ডেকে এনেছে দেশের ছোট বড় সবাইকে মায়ের স্নেহের আঁচলখানির উপর বসিয়ে তাদের মায়ের ভালবাসা দিয়ে মায়ের সন্তান বানাতে—তাদের মত মানুষ বানাতে। অনন্ত কল্যাণ-রূপিণী মায়ের চরণে মুক্তি—বক্ষে অনন্ত শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। বিশ্বপালিনী, মোক্ষ-বিধায়িনী মা সকল অমঙ্গল নাশ করে জগতে মুক্তির অজস্রধারে অমৃত বর্ষণ কর্চ্ছেন। বিশ্ব-মানবের মুক্তির মহোৎসবে, মায়ের আঁচল খানির উপর—শত স্বর্গের আনন্দ—শত স্বর্গের শোভা ও শান্তি নেমে এসেছে। প্রেমানন্দে কবি ভুবনে ভুবনে অমৃত বর্ষণ করে গেয়ে উঠলেন:

জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার
অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার
বিতর মুক্তি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া
স্পর্শ,
গাহিল জয় মা জগন্মোহিনী জগদ্ধাত্রী ভারতবর্ষ।

কে এ মা, সুভাষের আরাধ্যা কোন্ এ ভারতবর্ষ! এ যে জগৎ-কারণ বিশ্বাত্মার শক্তির কার্য-রূপ অভিব্যক্তি "মা!" অমৃতরূপিণী বিশ্ব-বন্দিনী।

মনের গতি

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

মন ইন্দ্রিয় পথে বাহিরের জগতে আসিয়া অহরহ ভিতরের সহিত বাহিরের একটি যোগ রাখিতেছে। মনের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে কর্ত্তা হইতে পারে না, সে করণ। মন তার কর্ম্মসম্পাদক এজেন্ট। সুতরাং অভ্যন্তরে একজন তৃতীয় সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই তৃতীয় সত্তা যে মন ছাড়া স্বতন্ত্র কেহ, যুক্তি-তর্ক ব্যতিরেকেও নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া ইহা উপলব্ধ হয়। হইতে পারে সে কোন দেবতা বা ঈশ্বরের শক্তি অথবা কোন ভূত-প্রেতের শক্তি কিংবা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনরূপ রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ। সে যাহাই হোক না কেন সে যে জগতের আমিত্ববোধক সংজ্ঞা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। সেই কারণে সে তৃতীয় বা প্রথম পুরুষ নয়, একেবারে উত্তম পুরুষ।

মন সর্ব্বদা বাহিরে আসিতেছে যাইতেছে এবং ভিতরের সেই সত্তার সহিত বাহ্য জগতের যোগাযোগ রাখিতেছে। তাহার এই বাহিরে আসাটা কিরূপ? ইন্দ্রিয়-পথে আসে বটে, কিন্তু যখন আসে তখন কি একেবারেই চলিয়া আসে? ভিতরের সহিত কি আর কোন সম্পর্ক থাকে না? একটা মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশপরিমিত কালের জন্য হইলেও সেই সময়টুকুর জন্য সে কি দেহকে একেবারেই ছাড়িয়া আসে? না, তা আসেনা। গৃহ-কর্ত্তার আদেশে বাড়ীর কোন লোক যদি দূর দেশে চলিয়া যায়, সে কি বাড়ীটিকে একেবারে ভুলিয়া থাকিতে পারে? একটা আভ্যন্তরিক সংযোগ যে তার সব সময়ই বিরাজ করে। সেই আকর্ষণের জোরেই আবার তাহাকে ফিরিতে হয়। যে একেবারেই বাড়ী ছাড়িয়া যায় বাড়ীর প্রতি মায়ার জন্য তাহার কষ্টের একশেষ হয়। মনোমালিন্য বা গৃহের অশান্তির জন্য যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণই আনন্দ; ঢুকিতে গেলে কষ্ট পায়, তবু ঢোকে; নিজের বাড়ী, উপায় নাই! কিন্তু গৃহের সহিত একটা অদৃশ্য সংযোগ তার সকল সময়ই আছে। এখানেও তদ্রূপ। মনেরও একটা আভ্যন্তরিক অবস্থা আছে। মন বাহিরে গেলে সেই অবস্থার দ্বারা সে দেহের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। যতদূরেই সে যাক্ না কেন, বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কখনই ছাড়িয়া যাইতে পারে না। দেহকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে হইলে কষ্ট হয় অপরিসীম, তাহাই মৃত্যু। মৃত্যুতে সকলেরই অনিচ্ছা। গৃহে যার অশান্তি অর্থাৎ দেহে যার ব্যাধি সে অন্যমনস্ক থাকিতে পারিলেই অর্থাৎ বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াই আনন্দ অধিক পায়।

দেহের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া মনের এই বহির্বিচরণ করাটা অনেকটা যেন স্থিতি-স্থাপকের মত। এক প্রান্ত দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে আর এক প্রান্ত বাহিরের বস্তু গ্রহণ করিতেছে; যেন টেলিফোনের তারের এই যোগসূত্র বা তারের মধ্য দিয়া বাহিরের জগৎ সূক্ষ্মভাবে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারি, কি দেখিলাম বা শুনিলাম। তাহাই জাগতিক জ্ঞান। জগৎ সম্বন্ধে আমাকে

পরিচয় দিবার জন্য মন অহরহ বাহিরে থাকিয়া টেলিফোন যোগে আমায় সংবাদ পাঠাইতেছে। এইমাত্র দেহের সন্নিকটস্থ কোন বস্তুতে হয়তো মন সংলগ্ন ছিল আবার পরক্ষণেই সেই ইন্দ্রিয় পথেই হয়তো বহুদূর চলিয়া গেল। পায়ের পাশে ভূমির উপর দৃষ্টি দিতে না দিতেই আবার তখনই হয়তো নদীর ওপারের দিকে চাহিতে হইল। পাশের লোকের সহিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সদরে কে ডাকিতেছে সেইখানে কান চলিয়া গেল। ঠিক স্থিতিস্থাপকের মত; টানিলেই, আকর্ষণ করিলেই, বাড়িয়া যায়। অথচ একটা মুখ ভিতরে ঠিক ধরাই আছে।

মনের এই অবস্থা, ভিতরের সংযোগ ও বহির্জগতের জ্ঞাতব্য বিষয়কে একত্র লইয়া জ্যামিতির বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভিতরে যাহার সহিত সংযুক্ত আছে তাহা কেন্দ্র। বাহিরের জগৎ বৃত্তের পরিধি আর যোগসূত্রটি ব্যাসার্দ্ধ। পরিধি কখনও ছোট হইয়া যায়, কখনও বা প্রকাণ্ড হয়। ব্যাসার্দ্ধ কিন্তু সকল সময়ই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই বৃত্তের একটির অধিক ব্যাসার্দ্ধ অসম্ভব। একটি ব্যাসার্দ্ধই কেন্দ্রকে পরিধির সকল স্থানের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে। টেলিফোনের তার খাটাইবার মত যখন যেখানে দরকার সেইখানে ছুটিয়া যায়, যেন বৃত্ত আঁকিতেছে! ইহাই মনের স্বাভাবিক গতি। এই গতিপথে একই সময়ে, সেই সময় যত ক্ষুদ্রই হোক, তার মধ্যে মন পরিধির দুইটি স্থানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারে না। কেন্দ্রের সহিত দুইটি radius বা ব্যাসার্দ্ধ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তি একই সময়ে একের অধিক কাজ করিয়া থাকেন। হয়তো এক সঙ্গে দুইখানি চিঠি লিখাইতেছেন, সেই সঙ্গে আবার টেলিফোনে কথা কহিতেছেন কিংবা একযোগে হয়তো দুইখানি পত্রের পাঠ শুনিয়া তাহার সহিত আবার হয়তো নিজে একখানা লিখিতেছেন। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। চঞ্চল মনের অস্থিরতাকেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। মন চলিয়া বেড়ায় কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী কাজের বাহিরে তাহাকে মোটেই নড়িতে দেওয়া হয় না। তাহার এই চলা ফেরা এত দ্রুত সংঘটিত হয়, মনে হয় যেন সে সর্ব্বত্রই একই সময়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা যথেষ্ট সাধনা-সাপেক্ষ।

চেষ্টা করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে আর একভাবেও এই কাজ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় একটিমাত্র বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি বস্তুও দৃষ্টিপথে আসে। সেখানে মনের সংযোগ না থাকিলেও নৈকট্যসম্পর্কে তাহাদের উপর একটা প্রভাব যাইয়া পড়ে। টর্চের ফোকাস্ একটু কোন বস্তুর উপর ফেলিয়া রাখিলে তাহার পাশাপাশি কয়েকটা বস্তুতে সরাসরি ফোকাস্ না থাকিলেও তাহার রশ্মিতেই যেমন কতকটা আলোকিত হয় ইহাও কতকটা তদ্রূপ। গুরুত্ব অনুসারে একটি কার্য্যের সহিত মনকে সংযুক্ত রাখিয়া অপরাপর লঘুতর কার্য্যের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। সেখানেও মন ঐ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হইতে ছুটাছুটি করিয়া যাওয়া আসাই করিতে থাকে। স্থূলভাবে ধারণা জন্মায় এক সঙ্গেই বুঝি সব স্থানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। প্রথম অবস্থায় এইভাবের চেষ্টা একাগ্রতাসাধনের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহা মনের চঞ্চলতাকে সমর্থন করিয়া তাহার উপর শাসন-অধিকার আনয়ন। চিত্তকে এক বিষয়ে নিবিষ্ট রাখাই সরল পথের সাধনা। অবাধ্য পোষ্যকে কঠোর শাসনের দ্বারা বা তাহার মতে মত মিলাইয়া দুই ভাবেই আয়ত্তে রাখা

চলে। তবে কঠোরতা অবলম্বন করাই উৎকৃষ্ট; মন যখন অবাধ্য হয়, তখন কি করিয়া তাকে বিশ্বাস করা যায়! একাগ্রতার পথে যাহারা অগ্রসর হইয়াছে এই কাজ তাহাদের আয়ত্তাধীন; আবার এই কাজে অভ্যস্ত হইলে একাগ্রতার পথেও কতকটা আগাইয়া দেয়।

মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণ করিয়া বাহিরের জগৎকে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধরূপে ভিতরে প্রবেশ করাইতেছে। যে ইন্দ্রিয়ের পথে বাহ্য জগৎ ভিতরে আসে জগৎকে তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সমধর্ম্মী হইয়া, সমান উপাদানযুক্ত হইয়া আসিতে হয়। তাই আমরা কান দিয়া দেখি না, চোখ দিয়া শুনিতে পাই না, ত্বকের দ্বারা গন্ধ অনুভব করিতে পারি না। বাহিরে যেই উপাদান ভিতরেও সেই উপাদান। সমধর্ম্মী বা সমপর্য্যায়ের না হইলে মিলন অসম্ভব। পশুর সহিত পক্ষীর মিলন হয় না। পশুতে পশুতে বা পক্ষীর সহিত পক্ষীর মিলন হওয়াই স্বাভাবিক। আবার মিলন না হইলে জ্ঞানও হয় না। ঘনিষ্ঠতার পথেই জ্ঞানের অভিযান। চক্ষে দৃষ্টি-শক্তি আছে? সে রূপের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া যায়। দ্রষ্টব্য বা রূপবান বস্তুর দুই অবস্থা; আলোক ও অন্ধকার। যাহার সাহায্যে রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় তাহাই আলোক। চোখের সাহায্যে বাহিরের রূপ ভিতরে যায়; সুতরাং চোখ আলোক। বাস্তবিক সমস্ত দেহের মধ্যে চোখই আলোক। চোখ দিয়া যেমন বাহিরের বস্তু দেখা যায়, ভিতর সম্বন্ধেও বুঝা যায় ভিতরের অবস্থা লইয়া কল্পনা করিলেও তাহা রূপ সম্বন্ধেই জ্ঞান সুতরাং দেখারই কার্য্য। চক্ষুরূপ প্রদীপটি বহির্মুখী বলিয়া ভিতরের দেখা বাহিরের মত জাজ্বল্যমান হয় না। ভিতরের দেখা অনেক কষ্টসাধ্য, কতকটা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। চক্ষু দেখায় তাই আলোর উপাদানই চক্ষের উপাদান। আলোর গুণই চক্ষের গুণ। চোখ যদি আলোক, চোখ যদি দেখাইবার ক্রিয়া করিয়া থাকে তবে অন্ধকারের মধ্যে দেখায় না কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমপর্য্যায়ের না হইলে মিলন হয় না। বাহির এবং ভিতরে একই উপাদান বর্ত্তমান। ভিতরে আলো থাকে বলিয়াই বাহিরের আলোর সহিত চক্ষের পথে তাহার মিলন হয়। নিজে কখনও নিজেকে দেখিতে পায় না। ভিতরের আলো ও বাহিরের আলো একই অংশভূত; তাই চক্ষুদ্বারা আলো দৃশ্য হয় না। বাহিরের আলো ও ভিতরের আলো উভয়েই একই উপাদানে গঠিত হইলেও দুইয়ের মধ্যে দুইটি বিরুদ্ধ গুণ বর্ত্তমান। একটিকে Negative আর একটিকে Positive বলা যাইতে পারে। বাহিরের আলো জড়, ভিতরের আলো চৈতন্যযুক্ত। জড় ও চৈতন্যের মিশ্রণ বা সংঘাতেই সৃষ্টি। Negative, Positive এর মিলনে ক্রিয়া ও শক্তির উদ্ভব হয়। বাহিরের ও ভিতরের আলোর মিশ্রণেই দেখার কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুইটি আলো পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। দুই আলো যেখানে প্রতিহত হয় মন তাহাকেই বুঝে, তার সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ করে। প্রতিহত না হইলে দৃষ্টির উপকারিতা নাই। আলোয় আলোয় মিশিয়া যায়, মধ্যে যদি কিছু না থাকে, তবে তাহাতে আলোর উপভোগ হয় না—কি ভিতরের কি বাহিরের।

শ্রুতির বেলাও সেইরূপ। শব্দ কানেই বাজে, শব্দের উপাদানেই কান গঠিত। শব্দ-গ্রাহ্য যন্ত্রটিকে মন সক্রিয় রাখিলেই আহত শব্দ কর্ণে প্রতিহত হয়। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে একমাত্র কর্ণের ভিতরই অহরহঃ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বাহিরের শব্দ জড়; আকাশের মধ্যে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট হইয়া আকাশেই প্রতিনিয়ত মিশিয়া যাইতেছে। বায়ু-সমুদ্রের এক একটা বুদ্বুদও তরঙ্গবিশেষ। কত উঠিতেছে, নিভিতেছে আবার উঠিতেছে এই

তার ক্রিয়া। কিন্তু কানের মধ্যে সকল শব্দ পৌঁছায় না। দুইটি সমগুণবিশিষ্ট হইয়া শূন্যেই ভাসিয়া যায়। ভিতরের শব্দ মনোযুক্ত হইলে চৈতন্যের সংস্পর্শে সে ভিন্নগুণবিশিষ্ট হয়। তখনই শ্রুতির উৎপত্তি এবং বাহিরের শব্দ শ্রাব্য হইয়া ধরা দেয়।

গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ প্রত্যেকের সম্বন্ধেই একই নিয়ম। বাহিরে যে উপাদান, ভিতরেও সেই উপাদান। দাতা ও গ্রহীতার মত, ভোগ্য ও ভোক্তার মত দুইটি ভিন্নগুণসম্পন্ন। ভিতরের নির্দ্দিষ্ট পথে মন বাহিরে আসিয়া সমপর্য্যায়ের গুণবিশিষ্টকে আঘাত করিলেই তার স্ফূর্ত্তি তার ব্যক্তভাব ফুটিয়া ওঠে। তাহা না হইলে ভাব অনাহত শব্দ, অপ্রকাশিত রূপের মতই শূন্যে বিলীন হইয়া থাকে।

জাগতিক ক্ষেত্র ছাড়া মনের আর একটি গতি-উপলব্ধি হয়। এই গতি তাহার অভ্যন্তরে। মন সেই সময় ভিতরেই বিচরণ করিতে থাকে, এই কার্য্যের জন্য তার স্বতন্ত্র সময়ের আবশ্যক হয় না। যে সময় সে বাহিরের সহিত সংযোগ রক্ষা করে, ইহাও প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে। মন দেখিয়া শুনিয়া গন্ধ লইয়া এবং স্পর্শ করিয়া জগতের বিষয় ও বস্তু হইতে যাহা কিছু বুঝে সমস্তই সে নিজের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চয়ই তাহার মেধা বা স্মৃতি। ইহা অনেকটা যেন ফটোগ্রাফের মত। যাহার মধ্যেই মন গিয়াছে তাহারই একটা ছাপ সে উঠাইয়া লইয়াছে। সময়মত সেই সকল ছাপ বা চিত্রগুলি আবার দেখিতে থাকে। মনের এখানে আর এক রকমের গতি। সে সেখানে চঞ্চলই থাকে; অথচ বাহিরে নয়, কেবলমাত্র ভিতরে। যতক্ষণ স্মৃতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কবে কোন্ অতীতে কি দেখিয়াছিল শুনিয়াছিল, পুরাতন পাতা ঘাঁটিয়া সেই ছবিখানিকে খুঁজিয়া বেড়ায়, ততটুকু কাল সে বাহিরে আসে না, ভিতরেই কাজ করিতে থাকে। স্মৃতির দিক্ দিয়া একাদিক্রমে সেখানে সে অতি অল্পকালই দাঁড়ায়। এক বিষয়ে কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া চট্ করিয়া মানুষের মনে পড়িয়া যায় সেই জাতীয় আর এক বস্তু, সেই বস্তুই বা আর একদিন কবে সে কোথায় দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল! ইহাই তাহার স্মৃতির চিত্র দেখা অথবা স্মরণ করা। সহসা দেখিতে না পাইলে ভিতরে অনুসন্ধান করিতে থাকে। আবার তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া আসে, আবার ভিতরে যাইয়া দেখে বা দেখিবার জন্য চেষ্টা করে; এই ভাবে তাহার কার্য্য চলিতে থাকে। কখনও বাহিরের কোন ইঙ্গিত না পাইয়াই সে নিজের প্রয়োজনবোধেই ভিতরে স্মৃতির মধ্যে ঘোরে! কিন্তু সেই সময়ও সে বাহিরের কোনও না কোন বিষয়ের মধ্যে অনবরতই যাতায়াত করে।

কাহারও স্মৃতিশক্তি প্রবল, কাহারও দুর্ব্বল! দেখা শোনা প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে মনোযোগের তারতম্য অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি। মন যাহাকে পরিপূর্ণ শক্তির দ্বারা গ্রহণ করে তাহাকে সে ভুলিতে পারে না। আর দুর্ব্বল শক্তিতে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ অন্যবিষয়ে আকর্ষণ হেতু মন চঞ্চল হইয়া উঠিলে, তাহার আগ্রহ এবং মনোযোগ শিথিল হইয়া যায়।

কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে, কি ভিতরে কি বাহিরে মন সকল সময়ই কোন না কোন স্থানে ছুটিয়া যাইতে চায়। যে দিন হইতে জ্ঞান হইয়াছে, সে দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্রও তাহার বিশ্রাম নাই। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে অনবরতই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনকে যদি কতকগুলি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, সে চায় তার নিজের খেয়ালে ঘুরিয়া বেড়াইতে। তাহাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাকে একবার আপন মনে চলিতে দিলে, সে বাঁধন-কাটা পোষা গরুর ন্যায় কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া কত দুর্গম ও অগম্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি-পূজা—আগামী ১৭ই পৌষ, শুক্রবার, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পঞ্চনবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে পূজানুষ্ঠান হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২২শে নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দ মহারাজ ৫৭ বৎসর বয়সে ম্যাঙ্গালোরে অপরাহ্ন ১-৩০ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ত্রিচুর ক্যালিকট কন্নাটোর প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া ১৯শে নভেম্বর ম্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। পরদিন রাত্রে তিনি পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলে প্রাতে তাঁহাকে স্থানীয় শুশ্রূষা-সদনে পাঠান হয়। স্বামী অনন্তানন্দজী অনেক দিন অন্ত্রক্ষত রোগে ভুগিতেছিলেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে ঐ ক্ষত ফাটিয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

স্বামী অনন্তানন্দজী কানাই মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১০ সনে কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২১ সনে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হন। কানাই মহারাজ কয়েক বৎসর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের এবং কিছু কাল শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সেবা করেন। তিনি কিছুদিন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষরূপে কার্য করিয়াছেন। কানাই মহারাজ যথার্থ সাধু এবং জনপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

ইন্দো-ব্রিটিশ সম্প্রীতি (Goodwill) মিশন—ভারতীয় জাতির সঙ্গে ইংরেজ জাতির সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লণ্ডনস্থ বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দজীর নেতৃত্বে গঠিত এই মিশনের কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য কিছু দিন হয় ভারতে আগমন করিয়াছেন।

গত ১৫ই নভেম্বর দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে এই সভ্যগণকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত একটি সভায় কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মাননীয় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভ্যগণকে অভিনন্দিত করেন। স্বামী অব্যক্তানন্দ ও মিস্ জেনকিন্‌স্ উপযুক্ত উত্তর দেন।

অতঃপর মিশনের সভাগণ কনখল হরিদ্বার দেরাদুন লক্ষ্ণৌ প্রয়াগ কাশী গয়া পাটনা ও দেওঘর পরিদর্শন করিয়া গত ২রা ডিসেম্বর কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানে মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জন্মতিথি উৎসব—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ভক্তপ্রবর মাহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৯৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২২শে নভেম্বর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা দিবসে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঊষাকালে মঙ্গলাচরণের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, ভোগরাগ আরাত্রিক হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত দিনব্যাপী ভজন ও সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন-সমিতি কর্তৃক মাতৃনাম-কীর্তন সকলের আনন্দ বর্ধন করে। অপরাহ্ণে রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বালকাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজী ও শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাত্মা রামচন্দ্রের পূত জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। উৎসবে বেলুড় মঠের কতিপয় সাধু ও বহু ভক্ত-নরনারী যোগদান করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ই অগ্রহায়ণ রাত্রিকালে ৮০ বৎসর বয়সে ৫৩।৩ বসু পাড়া লেনে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজেন বাবুর আদি নিবাস ছিল ভবানীপুর চাউলপটি রোডে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার খুল্লপিতামহ ছিলেন। অতি বাল্যকালে রাজেন বাবু পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাসীর বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতুল-পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুর উদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও কয়েকবার তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রাচীন বরাহনগর মঠেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সহিত তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজেন বাবু শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটী

আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "কাশীপুরের কৃষ্ণগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না?...আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল, বাকী ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি) জড়িত। বাস্তবিক ওটাই আমাদের প্রথম মঠ।...ওটা ত নিতেই হবে...কাশীপুরেরটা বিশেষ চেষ্টা দেখ।"

কাশীপুরের এই বাগানবাটী (৯০-৯০।২ কাশীপুর রোড) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য-স্মৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রিয় শিষ্যগণ সহ তিনি অন্তিম দিনগুলি অতিবাহিত করেন। এখানেই তাঁহাদের শ্রীগুরুর ঐকান্তিক সেবা এবং তাঁহার শেষ নির্দ্দেশানুযায়ী নিরন্তর সাধন ভজন ও কঠোর তপশ্চর্য্যা-সহায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ জীবনের কল্পতরু-লীলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও এখানেই তাঁহার মহাসমাধি।

তাই তাঁহার ভক্ত ও জগতের সকল মতের ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর নিকট এই উদ্যান এক মহাতীর্থ এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইহা একটি উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ।

বহু বৎসর যাবৎ ঐ স্থানে শূকর-হত্যা ও শূকর-মাংস বিক্রয় প্রভৃতি জঘন্য অনাচার চলিত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব্বে এখানে কিছু করা সম্ভব হয় নাই। গত বৎসর তাঁহারা বহু চেষ্টায় ও প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত উদ্যানের অর্দ্ধাংশ ক্রয় করিয়াছেন। অন্যান্য লোক-হিতকর কার্য্য সম্পাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট অপরার্দ্ধ মিশনকে ক্রয় করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহার মূল্য বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা অবিলম্বে জমা দিতে বলিয়াছেন। তদুপরি উদ্যানস্থ গৃহটি সুরক্ষিত করার জন্য তাহার আমূল সংস্কার আবশ্যক। এইজন্য মোট দুই লক্ষ টাকার আশু প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের তহবিল শূন্যপ্রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত এই বাগানটির সংরক্ষণ এবং যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছাপূরণ স্বাধীন ভারতের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর একটি বিশেষ দায়স্বরূপ। তাই সমগ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট আমাদের একান্ত নিবেদন তাঁহারা যেন এই উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থসাহায্য প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রচেষ্টা সফল করেন :—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

২। কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, পোঃ ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

কৃতজ্ঞতা সহকারে সকল সাহায্যের প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

৪৯শ বর্ষ

(১৩৫৩ মাঘ হইতে ১৩৫৪ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩৲]

[প্রতি সংখ্যা ।৶৹

Swami Vivekananda's Works

Bhakti-Yoga—6th Edition, with a lovely portrait of the Swami. Pages 142, *Price : Re. 1/-*

The Chicago Address—Ninth Edition. Contains a half-tone picture of the Swami. Pages 33. *Price : As. 8. To subscribers of Udbodhan, as. 7.*

Christ, The Messenger—An interesting lecture the Swami delivered at the Harvard University in America. *Price : As. 6. To subscribers of Udbodhan, as. 5.*

Realisation and its methods—6th Edition. Pages 115. Contains a beautiful portrait of the Swami. *Price : Re. 1. as. 4. To subscribers of Udbodhan, Re. 1. as. 2.*

The Science and Philosophy of Religion—A comparative study of Sankhya, Vedanta and other systems of thought. 5th Edition, Pages 111. *Price : Re. 1. as 4. To subscribers of Udbodhan, Re. 1 as 2.*

Pavhari Baba—(The celebrated Saint of Gazipur). 5th Edition. 24 Pages. *Price : As. 4. To subscribers of Udbodhan, as. 3.*

A Study of Religion—4th Edition. Contains a beautiful portrait of the Swami. *Price: Re. 1. as. 8. To subscribers of Udbodhan, Re. 1. as. 6.*

Vedanta Philosophy—At the Harvard University—4th Edition. A lecture and discussion. Pages—63. *Price : As. 10 to subscribers of Udbodhan, As. 9.*

Thoughts on Vedanta—Fourth Edition. Pages 66. Contains a beautiful portrait of the Swami. *Price : As. 14. To subscribers of Udbodhan, as. 12.*

Vedanta—its Theory and Practice—Swami Saradananda. *Price : As. 10. To subscribers of Udbodhan, as. 8.*

Paramhamsa, Ramakrishna—By P. C. Majumder. 3rd Edition. *Price : Anna 1.*

Sister Nivedita's Works

Civic and National Ideals—Containing a nice portrait of the Sister. Third Edition. *Price : Re. 1-4.*

Hints on National Education in India—(Third Edition) being valuable suggestions for the education of men and women of India. *Price : Re. 1-8.*

Siva and Buddha—Prescribed by the University of Calcutta as a Prize and Library book. (*Vid Cal. Gazette*, 24th August, 1921) Second Edition. *Price : As. 10.*

Kedarnath and Badrinarayan A Pilgrim's Diary—(With a route-map to Kedarnath and Badrinarayan, and a beautiful photogravure of Kedarnath and Badrinarayan Temple). Second Edition. Nicely got-up. 86 Pages *Price : Re. 1/-*

UDBODHAN OFFICE—1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Calcutta.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত—সপ্তম সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী বালক বালিকাদের জন্য সরলভাষায় লিখিত। মূল্য ॥০ আনা।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ প্রণীত (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানা ছেলেমেয়েদের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন গঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য ৸৵০ আনা।

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ প্রণীত (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। ছোট বড় ছেলে মেয়ে সকলের উপযোগী। মূল্য ৸৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে পাঁচ অধ্যায়ে স্বামীজির জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য ॥৵০ আনা।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৩য় সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই পুণ্য-জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া জনসাধারণ, বিশেষতঃ আমাদের নারীসমাজ বিশেষ উপকৃত হইবেন। মূল্য ।৵০ আনা।

স্বামীজির কথা—স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—নবম সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ২৲ টাকা।

দশাবতার চরিত—২য় সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। চরিত-কথায় গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১।০ আনা।

নিবেদিতা—২য় সংস্করণ। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ॥০ আনা।

ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত (৩য় সংস্করণ)। বহু সমস্যাসঙ্কুল বর্ত্তমানকালে জাতীয় জীবনের যথার্থ পথ নির্ণয়ে সহায়তা করিবে। মূল্য ১।০ আনা।

বিবেকানন্দ-বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ আনা।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্র—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের পত্রের সংগ্রহ। মূল্য ১৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ আখ্যান। মূল্য ॥৵০ আনা।

প্রেমানন্দ—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ। প্রথম ভাগ। মূল্য [illegible] আনা। দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ৸৶০ আনা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ [illegible] বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, [illegible] সংস্কৃত স্তোত্রাদির [illegible] সঙ্কলন। [illegible] সমূহে উচ্চ প্রশংসিত। মূল সংস্কৃত, [illegible], অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ৩৲ টাকা।